ায় মনোবিজ্ঞানের
কয়েক পাতা

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ, এম, এ,
ক আশুতোষ কলেজ ফর উইমেন, কলিকাতা
ৃন অধ্যাপক কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও
শিলচর গুরুচরণ কলেজ

শান্তি দত্ত, এম, এ, ; টি, ডি (লণ্ডন) ;
এম, এ, এড্, (লণ্ডন)
্যুট্ অব্ ট্রেণিং ফর উইমেন্, হেষ্টিংস্ হাউস্, কলিকাতা
ডেভিড্ হেয়ার ট্রেণিং কলেজ, কলিকাতা



নলেজ হোম
৫৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

প্রকাশ করেছেন ঃ

এম. কে. মুখার্জী

৫৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

ছেপেছেন ঃ

শ্রী [illegible]

[illegible] প্রেস

[illegible] লেন,

কলিকাতা-[illegible]

[illegible] টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

যিনি দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও অন্তরের প্রশান্তি হারান নাই, জীবনের সমস্ত দুঃখ, বেদনা ও বঞ্চনা সত্ত্বেও যিনি ভগবদ্‌বিশ্বাসে অটল ছিলেন, যিনি গভীর প্রীতি, নিষ্ঠা ও ক্ষমা দ্বারা আমাদের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন, যাঁহার অসীম ধৈর্য্য ও বিদ্যানুরাগ আদর্শস্থানীয় ছিল, যিনি এই পুস্তকের প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতেন, সেই পুণ্যময়ীকে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া, এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

শ্রাদ্ধবাসর—
৩রা মাঘ, ১৩৫৯ সাল।
৭-জে, এস. আর. দাশ. রোড্
কালিঘাট, কলিকাতা-২৬

বিভুরঞ্জন গুহ

আমার জ্যেষ্ঠা ও একমাত্র সহোদরা ভগিনী, ৺সুষমা দেবীর পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইল।

শান্তি দত্ত

এই পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ অর্থের কিয়দংশ, কোন দুঃস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ব্যয়িত হইবে, অথবা কোন আরোগ্যশালায় দান করা হইবে।

গ্রন্থকার পরিচিতি

এই বহুতথ্যপূর্ণ পুস্তকের লেখক ও লেখিকা শিক্ষা ও অধ্যাপনায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে দুজনেই শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন, ও দুজনেই ছাত্রাবস্থায় বর্ত্তমান ফলিত মনোবিজ্ঞানের পারদর্শিতা লাভ করায়, বর্ত্তমান পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপনায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। তার উপর, লেখিকা শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে বিদেশী উপাধি লাভ করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় লাভ করেন। এহেন কৃতবিদ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদ্বয় একত্র হয়ে "শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা" নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে তাঁদের জ্ঞান লিপিবদ্ধ করায় জিজ্ঞাসু ও বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের একটা প্রকাণ্ড অভাব দূর হোল। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করে, তাঁরা বহু তথ্য একত্র সমাবেশ করেছেন, তাতে এ শাস্ত্রের আধুনিকতম সিদ্ধান্তের সন্ধান, এক জায়গায় পাওয়া সম্ভব হোল। পুস্তকখানি শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্য করেই প্রধানতঃ লেখা। পশ্চিম বাংলা ও পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষায়তনের পঠন পাঠন কার্য্যের সৌকর্য্য ইহাতে প্রভূত সাধিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। পুস্তকটির হিন্দী অনুবাদ হলে ইহা ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও সাদরে গৃহীত হবে বলে আমি মনে করি, কেননা আধুনিকতম গবেষণাপূর্ণ বহু চিত্রসম্বলিত, এইরূপ একটি পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা সর্বত্র আছে এই বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

পুস্তকটির ভাষার চমৎকারিত্ব ও সাহিত্যরস-সিক্ততা পাঠকের মন স্বতঃই আকৃষ্ট করে। পঁচিশ বৎসর এই শাস্ত্রের পরীক্ষক হিসাবে ও তদধিককাল মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শিক্ষক হিসাবে, আমি বলতে পারি, যে কোনও প্রয়োজনীয় বিষয় এই পুস্তকটিতে বাদ পড়েনি। কাজেই নিশ্চিন্তভাবেই একে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

এম, এ, বি এল ; পি, আর, এস ;

দর্শনসাগর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক,

বানারসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, ভারতীয় মনোবিজ্ঞান

সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ইত্যাদি—

ভূমিকা

'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা' পড়িলাম; পড়িয়া খুব আনন্দিত হইলাম কারণ সহজ বাংলায় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বই বেশী নাই। শ্রীবিজুরঞ্জন গুহ ও শ্রীমতী শান্তি দত্ত এই বইখানি প্রণয়ন করিয়া বাংলা দেশের শিক্ষকদের উপকার করিলেন। এই বইখানির অধ্যায়গুলিও বেশ সুন্দররূপে সাজানো হইয়াছে ও লেখা হইয়াছে; মনোবিজ্ঞানের দুরূহ শব্দ সম্পদগুলিও সহজভাবে বসান হইয়াছে ও ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই বইখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এখন শিক্ষণ শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন এটী সুলক্ষণ। শিক্ষণ শিক্ষার জন্য যাঁহারা বর্তমানে প্রস্তুত হইতেছেন ও ভবিষ্যতে হইবেন তাঁহাদের এই বইখানি উপকারে লাগিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে একপ্রকার মানসিক বিকার প্রায় লক্ষিত হয়। তাঁহাদের ব্যবহারিক জ্ঞান কিছুই থাকে না। সংসারের উদ্দীপনা তাঁহাদিগকে বিচলিত করে না। কার্য তৎপরতা তাহারা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন। এই জন্য যাঁহারা শিক্ষকতা করিবেন তাঁহাদের কাছে মনোবিজ্ঞান যে সকল ব্যবহারিক জ্ঞান আনয়ন করে তাহা অত্যন্ত আবশ্যকীয়। মানবজাতির সাধারণ প্রবৃত্তি, বংশপরম্পরাগত প্রবৃত্তি ও প্রত্যেক মানবের ব্যক্তিগত অনুরক্তির উপর শিক্ষার সৌধ গঠিত হইতেছে, অথচ এই তিনটি বিষয়ের জ্ঞানলাভের চেষ্টা সম্যক্‌রূপে হয় না কারণ এই সকল বিষয়ে বাংলাভাষায় বই খুব কম আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের যেমন অনেক বিষয়ে অনুরক্তির অভাব আছে, সেইরূপ শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা যায় যে শিক্ষণ শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের অনেকের শিক্ষাকার্যে যথেষ্ট অনুরক্তি নাই। শারীরিক ক্রিয়ার ন্যায় আমাদিগের চিন্তাগুলি অনুরক্তির বশবর্তী। যে ভাববৃত্তি দ্বারা আমাদের কর্তব্যগুলি নির্ধারিত হয় ও তাহাদের মূল্য স্থিরীকৃত হয় তাহাকে কর্তৃনিষ্ঠ অনুরক্তি বলে; বিষয়ের চিত্তাকর্ষক শক্তিদ্বারা মন যখন বিষয় বিশেষে আকৃষ্ট হয় তাহাকে বিষয়ঘটিত অনুরক্তি বলা হয় ও কার্যগত অনুরক্তিদ্বারা চেতন ক্রিয়াশীল হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। এই বিভিন্ন প্রকার অনুরক্তিই শিক্ষকদের কার্যে উদ্যম ও জ্ঞান আনয়ন করে। কিরূপে এই সকল কার্য সাধিত হয়, মানবের শরীর ও মনের অবস্থা কিরূপে পরিবর্তিত হয়, তাহার কার্য ও প্রবৃত্তিগুলি কোন দিকে ধাবিত হয় বা ধাবিত হইবার সম্ভাবনা থাকে এইগুলির কোনরূপ মাপক আছে কিনা এই সকল বিষয়গুলিই শ্রীযুক্ত গুহ ও শ্রীমতী দত্ত তাঁহাদের প্রণীত বইখানিতে বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা বাংলা দেশের শিক্ষকদের নূতন দৃষ্টি আনয়ন করুক এই প্রার্থনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১লা আষাঢ়, ১৩৬০

জিতেন্দ্রমোহন সেন,
অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়.

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ঈশ্বরানুগ্রহে 'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বেশ কিছুদিন আগেই বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। কাগজের অভাব এবং অন্যান্য নানা বিপর্যয়ের জন্য প্রকাশক বইখানার তৃতীয় সংস্করণ যথা সময়ে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের যে অসুবিধা হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি। কিন্তু যে সব বাধা-বিপত্তির জন্য এ সংস্করণের প্রকাশ বিলম্বিত হইল তাহা দূর করিবার সাধ্য আমাদের ছিল না। কাজেই ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশই কেবলমাত্র করিতে পারি।

এ সংস্করণে 'শিক্ষায় সংক্রামণ' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লেখা হইল। অন্যান্য অধ্যায়েও কিছু কিছু নূতন উপাদান যোগ করা হইল। অন্যান্য যে সব সংস্কার করিবার ইচ্ছা ছিল তাহা আর সম্ভবপর হইল না।

বিভিন্ন সংবাদপত্র পুস্তকখানার যে সপ্রশংস আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন শিক্ষায়তনের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ পুস্তকখানা ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যহিসাবে অনুমোদন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে ছাত্রছাত্রীদের আনুকূল্যে পুস্তকখানা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে—তাহাদেরও ধন্যবাদ জানাই। কোন কোন সংবাদপত্র ও সহকর্মী পুস্তকখানাব উন্নতির জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়াছেন—সে অনুযায়ী পুস্তকখানাকে ছাত্রদের অধিকতর উপযোগী করার চেষ্টা করিয়াছি। প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীকমলাক্ষ দত্ত এম, এস-সি, একটি অধ্যায়ে কিছু কিছু ভ্রম সংশোধন ও নূতন উপাদান যোগ করিতে সাহায্য করিয়াছেন। এই উৎসাহী তরুণ বন্ধুটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

এই পুস্তক রচনায় যে যে দেশী ও বিদেশী গ্রন্থকার ও প্রবন্ধ লেখকদের নিকট হইতে অকৃপণভাবে সাহায্য পাইয়াছি—তাহাদের নিকট অকুণ্ঠচিত্তে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

সর্বশেষ এই আশা পোষণ করি যে পুস্তকখানা পূর্বের ন্যায় শিক্ষণেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট আদৃত হইবে। ইতি

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ
শ্রীমতী শান্তি দত্ত

বিদ্বজ্জনের অভিমত

* * * *

অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ ও অধ্যাপিকা শান্তি দত্তের মনোবিজ্ঞানের বই পড়ে খুব খুশী হলুম। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বইখানি সত্যই ভাল উত্‌রেছে।

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ এম. এ. ডি. লিট্

* * * *

শিক্ষার সহিত জীবনের যে অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক স্বীকার্য ও অপরিহার্য, তা' ভাব ও ভাষার সাহচর্যে এই বইখানিতে অপূর্ব প্রকাশমাহাত্ম্য লাভ করেছে।

ডাঃ সরোজকুমার দাস, এম্-এ., পি. আর এস্., পি. এইচ-ডি

* * * *

বাংলা ভাষায় শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ মনোজ্ঞ পুস্তক আর আছে বলিয়া জানি না।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় এম্. এ., পি, এইচ-ডি
অধ্যক্ষ, চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা।

* * * *

এই পুস্তকের আলোচনা বেশ সুষ্ঠু ও সু-পাঠ্য হইয়াছে। বাংলায় এরূপ পুস্তকের বহুলপ্রচার ও আদর বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুহৃৎ চন্দ্র মিত্র, এম্. এ., পি. এইচ-ডি, এফ, এন্, আই

* * * *

পরীক্ষার সুবিধার জন্য বইটি লেখা হয়ে থাকলেও যেমন তেমন করে অতি সংক্ষেপে বা গোঁজামিল দিয়ে পাঠ্য বিষয়কে উপস্থিত করা হয় নি। মনোবিজ্ঞানের বহু দিক এবং একাধিক মতামত আলোচনা করা হয়েছে, পাঠক পাঠিকারা একটু খোলা মন নিয়ে পড়লে ব্যাপকতার একটি আভাস পাবেন।

...বইটি সত্যই ভালো হয়েছে। গ্রন্থকারদ্বয় কেবল যে পড়াশোনা করেছেন তা নয়, তাঁরা গ্রন্থখানিকে তথ্যবহুল ও প্রামাণিক করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এবং পরিশ্রম তাঁদের সার্থক হয়েছে।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা

* * * *

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলির আরম্ভ যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি প্রসঙ্গ ক্রমপ্রসারণের স্তরগুলি সুবিন্যস্ত হওয়ায় হেতু-প্রত্যাশা উদ্বোধক।........................

ইংরাজি পাঠ্য তালিকায় James, Ross, Sandiford তিনজনের তিনখানা বই মিলিয়ে যে সম্পূর্ণ পাঠ পরিচয় ঘটান হয়, এ পুস্তক একাই সে সবের অনেকখানি ভার নিয়েছে। অথচ কোন আলোচনাই অসম্পূর্ণ নয়, বরং ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশীই।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

*　　　　*　　　　*　　　　*

বাংলা ভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ মূল্য আছে এবং ইহার উপযুক্ত সমাদর হইবে, আমি আশা করি।

প্রফুল্লকুমার গুহ

অধ্যক্ষ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

*　　　　*　　　　*　　　　*

আপনাদের এই সুলিখিত বইয়ের জন্য উত্তর বাংলার শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বহুদিন আপনাদের নিকট ঋণী থাকিবে। শিক্ষণ-শিক্ষালয় সমূহের ছাত্রছাত্রীদের নিকট এই পুস্তক খুবই প্রয়োজনীয় হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আবদুল হাকিম, এম, এ, (ক্যাণ্টাব)

এ, ডি, পি, আই (জেনারেল) ইষ্ট বেঙ্গল।

*　　　　*　　　　*　　　　*

অধ্যাপক শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ এবং অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি দত্ত প্র॥ত "শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা" এ বিষয়ে একখানি সেরা বই, বোধহয় একমাত্র বই।

ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় সূচি

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষা যে প্রয়োজনীয়, আর শিক্ষকের উপরই যে শিশুর শিক্ষার অনেকখানি দায়িত্ব আছে, সে সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই। শিশুর পিতামাতা বা শিক্ষক যিনিই শিক্ষার ভার নিন না কেন, এ কাজটি সুসম্পন্ন করতে হ'লে শিশুর মনটিকে জানতে হবে, এ কথাটা আমাদের কাছে আজ স্বতঃসিদ্ধ মনে হতে পারে। কিন্তু দু'শো বছর আগেও এ কথাটা মানুষের কাছে এত সহজ মনে হ'ত না। শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের বিদ্যা আর শাসন-ক্ষমতা কতটা, এটাই জিজ্ঞাস্য ছিল। যে শিশুরা শিক্ষা পাবে তাদের একটা মন বা মতের বালাই আছে অথবা তা থাকলেও শিক্ষার ব্যাপারে সেটা বিবেচনার প্রয়োজন আছে, এ কথাটা প্রাচীনেরা মনে করতেন না। শিশুরা গৌণ, নগণ্য, শিক্ষা-গ্রহণের আধার মাত্র, এই ছিল ধারণা। তাই ইংল্যাণ্ডে বনেদী পরিবারে শিশুদের ব্যবহারের আদর্শ ছিল, Children should be seen and not heard. অর্থাৎ তারা শান্ত সুবোধ হয়ে চলবে, হৈ-হল্লা করবে না, তাদের কণ্ঠ যেন শোনা না যায়, তারা হবে পিতামাতা আর প্রতিবেশীর নয়নানন্দকর সাজানো গোছানো জীবন্ত পুতুল! শিক্ষার এই প্রাচীন নির্বোধ আদর্শকেই শিশু-দরদী রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসস্নিগ্ধ তীক্ষ্ণ উপহাস দিয়ে বিদ্ধ করেছেন অমর রচনা "তোতা কাহিনী"তে।[১]

বর্তমান যুগে য়ুরোপে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন, এ কথা সবল ও স্পষ্ট ভাষায় প্রথম প্রচার করেন রুশো (Rousseau ১৭১২-১৭৭৮)। তাঁরই অনুগামী পেষ্টালজি (Pestalozzi ১৭৪৬-১৮২৭)। তিনি এ কথা বললেন যে শিক্ষকের প্রধান প্রয়োজন, শিশুর মনকে জানা। শিশু মনস্তত্ত্বের নির্ভুল জ্ঞানের উপর ভিত্তি স্থাপন না করলে কোন শিক্ষা পদ্ধতিই সফল হ'তে

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লিপিকা।

পারে না। শিশুর মন একটা জীবন্ত, বাড়ন্ত চারা গাছের মত, তা জড় আধার মাত্র নয়। প্রত্যেক শিশু একটি বিশিষ্ট সত্তা। কাজেই প্রত্যেক শিশুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে,—তবেই না প্রত্যেকটি চারা গাছ তার সম্ভাবনার পরিপূর্ণতায় বেড়ে উঠে মহীরূহের সার্থকতা লাভ করবে। পেষ্টালজি বলেছিলেন, "সমস্ত সার্থক শিক্ষার মূল ছাত্রের মনেই জন্মকালে বিদ্যমান এবং শিক্ষাটা ছাত্রের ভিতর থেকেই আকর্ষণ করতে হবে[২]।"

পেষ্টালজি শিক্ষায় যে নূতন ধারা প্রবর্তন করলেন তা ক্রমেই পুষ্টিলাভ কচ্ছে। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু গৌণ নয়। তাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার সার্থকতা। স্যার জন্ এ্যাডামস্ বলেছিলেন, শিক্ষা-ক্রিয়ার দুটি কর্ম আছে, একটি হচ্ছে ছাত্র, আর একটি হচ্ছে বিষয়। শিক্ষক জন্‌কে ল্যাটিন ভাষা শেখাবেন। শিক্ষকের তাই ল্যাটিন ভাষায় যেমন ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, জন্‌এর মনটিকেও তেমনি জানা চাই। "শিক্ষা-ক্রিয়ার দুটি কর্ম, একটি হচ্ছে ছাত্র আর একটি হচ্ছে বিষয়বস্তু। যথা, শিক্ষক মশাই জন্‌কে ল্যাটিন শেখাচ্ছেন।"[৩] পেষ্টালজি শিক্ষা পদ্ধতির এটি একটি মৌলিক বিশেষত্ব যে তা শিশুকে মর্যাদা দিয়েছে। ফ্রোএবেল (Froebel ১৭৮২-১৮৫২) এবং মন্টেসরী (Montessori ১৮৭০-১৯৫২) শিক্ষাপদ্ধতিতে এ বৈশিষ্ট্য আরো বেশী প্রকট।

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে মতই আমরা গ্রহণ করি না কেন,—শিশুর মনকে জানতে হবে, সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই গড়ে তুলতে হবে, এ কথা নিঃসন্দেহ। "শিশুশিক্ষায় যিনি আগ্রহশীল তাঁর কাছে শিশুর ব্যবহার জানা তার শিক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথাটা এতই স্পষ্ট যে শিশুশিক্ষাকে শিশুমনস্তত্ত্বের উপর স্থাপন করবার প্রশংসা প্রথম রুশোরই প্রাপ্য এটাই বেশী বিস্ময়ের কথা, না রুশোর এ পরীক্ষা তাঁর কালের তুলনায় অতিশয় অগ্রসর বিবেচিত হয়েছিল, এটাই বেশী আশ্চর্য, তা জানি না।"[৪]

২ "All true and educative instruction must be drawn out of the pupils themselves, and must be born with them. Corrie Gordon—Essays on the Child and his education : Pestalozzi.

৩ "Verbs of teaching govern two accusatives, one of the person, another of the thing; as Magister Johannem Latinum docuit—the master taught John Latin." Adams : Herbertian Psychology Primer on Teaching.

৪ "...the fundamental importance of a knowledge of children's ways to any one who aspires to teach them, is so obvious, that one knows not whether to be more surprised that Rousseau should be credited with

৫পেষ্টালজি রুশোর কাছ থেকেই তাঁর শিক্ষানীতির মূলসূত্র গ্রহণ করেছিলেন যে, শিক্ষাবিদের পক্ষে মনোবিজ্ঞান অপরিহার্য। কথাটা একটু আলোচনা করা যাক্।৶

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত আছে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ তাদের তিনটি দলে ভাগ করেছেন এবং হাল্কাভাবে উপমার সাহায্যে তাদের স্বরূপ বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথম পদ্ধতিকে তিনি নাম দিয়েছেন—"Jug and mug" theory—বড় জলপাত্র ও ছোট জলপাত্র মতবাদ। দ্বিতীয় হচ্ছে "Potter and the clay" theory—কুম্ভকার ও মৃত্তিকা মতবাদ। তৃতীয়ের নামকরণ করেছেন "Gardener and the plant" theory—মালি ও চারাগাছ মতবাদ।

প্রথম মত হচ্ছে, শিশুর মন একটি শূন্য নিষ্ক্রিয় আধার। মাপেও সে আধার ছোট। তাই তাকে বলা হয়েছে Mug! শিক্ষকের মন হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ড, সে জ্ঞানভাণ্ড, উপুড় করে শিক্ষক ছাত্রের মনকে ভরে তুলবেন। শিক্ষক হচ্ছেন বৃহৎ ভাণ্ড Jug, আর শিশুর মন হচ্ছে ক্ষুদ্র পাত্র Mug, আর শিক্ষার কাজটা হচ্ছে—' pouring in" অর্থাৎ ঢালাঢালির ব্যাপার।

দ্বিতীয় মতটা হচ্ছে, শিশুর মন নিষ্ক্রিয় নরম কাদার তাল, শিক্ষক তাকে নিজ আদর্শ ও রুচি অনুযায়ী রূপ দেবেন।

(তৃতীয় মত হচ্ছে, শিশুর মন বাড়ন্ত চারা গাছ—তার প্রকৃতি অনুযায়ী, তার প্রয়োজন অনুসারে তার সার্থক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে, শিক্ষক তাকে লালন করবেন, যত্ন করবেন, প্রয়োজন বোধে ছাঁটাই করবেন, আলোর দিকে তার বাড়তির স্বাভাবিক গতির পথে বাধা যথাসাধ্য অপসারণ করে তাকে নিজ স্বকীয়তায় বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করবেন।৬

having been the first to base education entirely on the child to be educated, or that in doing so he was so much before his time. W. Drummond : The Child.

৫ "The child is the mug (I speak in metaphors !) and the teacher is the jug. The jug tips its contents into the mug and that's that. What was in the teacher's mind is now in the child's or rather, in ninetynine cases out of a hundred, it is not."

"The teacher is the potter and the child the clay. The potter has decided what he wants the clay to become, and he moulds it and shapes it to his own particular pattern, and eventually the clay becomes what the potter wants it to be. The difficulty here is that the potters have

এখন এই প্রত্যেকটি মতের পেছনেই রয়েছে শিশুর মনের স্বরূপ সম্বন্ধে এক একটা ধারণা, এবং আমরা যদি বলি তৃতীয় মতটি নিঃসন্দেহে সত্য, তাহ'লে তা আমাদের প্রমাণ করতে হবে মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়েই।

শিক্ষার আদর্শের প্রশ্ন মনস্তত্ত্বের অন্তর্গত নয়—অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে নয়। কারণ মনস্তত্ত্ব হচ্ছে সদর্থক বিজ্ঞান Positive science। সে আলোচনা করে মানুষের মনের উপাদান ও প্রক্রিয়াগুলো কি, এবং কেমন ভাবে তাদের পরিণতি ঘটে। এ বিজ্ঞানের কাছে কি ঘটে ও কি ঘটে না, এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়, কিন্তু কি হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। কাজেই শিক্ষার আদর্শের প্রশ্ন, নৈতিক মূল্যের প্রশ্ন মনস্তত্ত্বের অন্তর্গত নয়।[৬] কিন্তু আদর্শ যদি মূল্যহীন এবং অসম্ভব না হতে হয়, তবে তার বাস্তব ভিত্তি হবে মানুষের, বিশেষ করে শিশুর মনের স্বরূপ সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বের সুচিন্তিত মত। বাঘের স্বরূপ যদি হয় যে সে মাংস খাবেই, তবে তার জন্যে বৈষ্ণব নিরামিষ আদর্শ অর্থহীন। প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত করাই তো শিক্ষার আদর্শ। "বাঘের বাচ্চারে, বাঘ না করিনু যদি কি শিখানু তবে ?"[৭]

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ শিক্ষা' কবিতায় গুরু গোবিন্দ শিক্ষার মূল কথাটাই প্রকাশ করেছেন।

রস্ (Ross) ঠিকই বলেছেন, "যদিও মনোবিজ্ঞান শিক্ষার আদর্শ বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে না তথাপি যে মনোবিজ্ঞানের উপর আমরা নির্ভর করতে

some queer ideas about design, they are not always very skilled at their job, and the clay—if it could speak—might want to be something quite different."

"The teacher is the gardener and the child the plant. The plant has certain common characteristics with all other plants, some peculiar to its own species, and some quite individual to itself. Moreover it is growing, whether the gardener likes it or not, according to the laws of its being The job of the gardener is to water when necessary, manure when necessary, prune when necessary, transplant when necessary, or in other words to help the plant to grow, but not to try and turn it into something else or to interfere with its normal and proper development." J. W. Newsom—The child at School.

৬ "Although psychology cannot formulate the aim of education, a reliable psychology will tell us at once whether an aim is hopelessly in the clouds or whether it is possible of achievement."

৭ রবীন্দ্রনাথ—কথা ও কাহিনী।

পারি তা আমাদের তৎক্ষণাৎ বলে দেয় শিক্ষার কোন বিশেষ আদর্শ নিতান্তই অবাস্তব আকাশকুসুমবৎ, অথবা তার রূপায়ণ সম্ভব।"[৮]

কোন শিক্ষার আদর্শ সত্য কিনা, তার পরীক্ষা করতে হলে তা মনস্তত্ত্বানুযায়ী কিনা, এ প্রশ্ন নিরর্থক নয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মধ্যযুগীয় নিরানন্দ কঠোর নির্মম শিক্ষা-পদ্ধতির নিগড় থেকে প্রথম শিশুকে মুক্তি দিয়েছেন রুশো। এ জন্যে শিক্ষার জগতে তার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। মধ্যযুগীয় শিক্ষা-পদ্ধতির মূলে ছিল এই ভ্রান্ত মনস্তত্ত্ব, যে মানব-শিশু স্বভাবতঃই দুষ্ট-প্রকৃতি, অলস, অমনোযোগী তাই শিক্ষার আদর্শ ছিল মানুষের মনের এই স্বাভাবিক বিকৃতিকে শাসন দিয়ে শোধন করা। শিক্ষার অর্থ-ই ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, তাকে শাসন, সংযম এবং সম্ভব হ'লে, তার সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন। রুশো প্রচার করলেন, শিশু স্বভাবতঃ সরল, নিষ্পাপ ও জ্ঞান-পিপাসু। আমাদের পাপপঙ্কিল সমাজ ও পারিবারিক পরিবেশ তার মনকে বিকারগ্রস্ত করে। তাই শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে, তার "স্বভাবে" তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিক্ষার অর্থ হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা নয়—"to work with nature and not against nature." রুশো বলছেন, "প্রকৃতির হস্ত থেকে যা আসে তাই কল্যাণকর—whatever proceeds from the hand of nature is good". শিক্ষকের কাছে তাই তাঁর হৃদয়স্পর্শী আবেদন, "শৈশবের প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দাও; শিশুর প্রতি সদয় হও। এ তোমার প্রধান কর্ত্তব্য; শৈশবকে ভালবাসো, তার ক্রীড়া তার আনন্দ তার শুভ প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দাও।"[৯]

ভ্রান্ত মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর স্থাপিত মধ্যযুগীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছিলো রুশোর সহৃদয় মতবাদের কাছে। ফ্রেডেরিকা ম্যাকডোনাল্ড লিখেছেন, "সারা ইউরোপ জুড়ে রুশোর দৃপ্ত কণ্ঠ মানুষের অধিকারের কথা ঘোষণা করেছিল কিন্তু তার চেয়েও অশান্ত বাগ্মিতায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন শিশুর অধিকার। মধ্যযুগ মানুষের আদিম ও মজ্জাগত পাপে বিশ্বাস করতো এবং এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে নির্মম শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তার অবসান ঘটলো।"[১০]

---

৮ Ross—Ground work of Education Psychology.

৯ John Morley, Rousseau Vol. II. Encourage childhood; O men, be humane! It is your foremost duty; love childhood, encourage its sports, its pleasures, its amiable instincts."

১০ F. Macdonald, Rousseau, "Throughout Europe Rousseau's voice

কিন্তু রুশোর মতবাদও অভ্রান্ত ছিল না। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তিনিও ভুল করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, শিশু স্বভাবতঃই সরল ও নিষ্পাপ, এবং প্রকৃতির নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। পরবর্তীকালে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে শিশু শয়তানের বাচ্চাও নয়, দেবশিশুও নয়। ভাল ও মন্দ দুই-এর বীজই রয়েছে শিশুর আদিম প্রকৃতির মধ্যে। তাই রুশোর মহৎ আদর্শও শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু ভালবাসা, শুধু মাধুর্যই যথেষ্ট নয়। তাতে শাসন ও কঠোরতারও স্থান আছে। গিলবার্ট হাইএট ঠিকই বলেছেন "শিশুকে পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়েও নির্বোধ এবং জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হবার অনুপযুক্ত করে তোলা যায়।"[১১]

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলা, আর শিশুর মন-ভোলানো ছড়া ও ছবির অনেকখানি স্থান আছে, কেননা তা মনস্তত্ত্ব-সম্মত। কিন্তু এটা শিশু-মনস্তত্ত্বের একটা দিক। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সফল হয়েছে ততখানিই, যতখানি এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই "মন-ভোলানো শিক্ষারও" বিপদ আছে। একে আব্রে ডি সেলিনকোর্ট ঠাট্টা করে বলেছেন "Sugarplum habits"—মোয়া দিয়ে ছেলেভুলানো। এর বিপদ হচ্ছে, এব্যবস্থায় শিশুর মনের একটা তথ্যের উপরই জোর দেওয়া হচ্ছে। তাই সেলিনকোর্ট বলেছেন "ছোট শিশুর পক্ষে মিষ্টি মোয়া ভালই ; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনির পরিমাণটা কমিয়ে আনা দরকার, যাতে স্কুল ছাড়বার আগে সে তার বিদ্যার ভোজে স্বাস্থ্যপ্রদ তিক্ত ও ঝাল আস্বাদেও রস পায়।"[১২]

যাক্, শিক্ষার বিভিন্ন আদর্শের গুণাগুণ বিচার করবার স্থান এ নয়। আমরা এ কথাটাই এতক্ষণ বলতে চেয়েছি যে মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করে, বা উপেক্ষা করে, শিক্ষার কোন আদর্শই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শিক্ষা মনস্তত্ত্ব

---

went proclaiming with even more restless eloquence than it had proclaimed the rights of man, the rights of childhood. Harsh systems founded on the old mediaeval doctrine of innate depravity were overthrown."

১১ Gilbert Highet—The Art of Teaching, "you can give a child as much love as it can absorb and still make it an idiot unfit to face the world."

১২ Aubrey de Selincourt—The School-master. "Sugarplums are well enough for infants ; but the sugar must be diminished in quantity as the children grow, and before they leave school they must be able to relish a wholesome asperity and bitterness in their intellectual diet."

অনুযায়ী হতেই হবে। কোন আদর্শের সত্যতা শুধু মাত্র তার "মহত্ত্ব" এর উপর নির্ভর করে না।

শিক্ষার পদ্ধতি ও আদর্শ নির্ধারণ করতে মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করতেই হবে। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও পদে পদে মনস্তত্ত্বের সাহায্য দরকার।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। ক্লাসে শৃংখলা রক্ষা শিক্ষকের একটা প্রধান দায়িত্ব। নূতন শিক্ষকের পক্ষে এটা একটা বিভীষিকা। মিষ্টার চিপিং গেছেন ব্রুকফিল্ড স্কুলে প্রথম চাকরী করতে মেলব্যরী স্কুল থেকে। প্রথম ক্লাসেই ছাত্রেরা মিঃ চিপিংকে অপদস্থ করলো। ওয়েদারবি ছিলেন সে স্কুলের ঝানু হেডমাষ্টার, তিনি চিপিংকে ডাকালেন। তাঁদের কথোপকথন, ও ওয়েদারবির উপদেশ নীচে দিচ্ছি—

"ও—আমি-মানে-শুনতে পেলাম মেলব্যরী স্কুলে শৃংখলা রক্ষার কাজে আপনার খুব সুনাম ছিল না?

চি—হ্যাঁ স্যর, সম্ভবতঃ তা ছিল না।

(ও—যাই হোক্, সে জন্যে ভাববেন না; আপনি এখন তরুণ যুবক; এটা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। আপনি এখানে আর একবার নূতন সুযোগ পেলেন। গোড়ার থেকেই শক্ত হোন্, এই হচ্ছে এ বিষয়ে সাফল্যের মূল কথা।"১৩)

এখানে প্রধান শিক্ষকের উপদেশ "গোড়াতেই শক্ত হও"। এটা তাঁর শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ভূয়োদর্শনের ফল। উপদেশ তাই মূল্যবান্।

আর একটি উদাহরণ। সারদামণির ইচ্ছে হয়েছে লেখাপড়া শিখবেন। কেউ উৎসাহ দেয় না। বরং ভাগ্নে হৃদয় "সারদার হাত থেকে কেড়ে নিল বই। বললে, মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই। শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?" এই যে যুক্তিহীন বাধা আর অবিশ্বাসের পথ, এ হচ্ছে মনস্তত্ত্বজ্ঞান বিবর্জিত নির্বোধের পথ! কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি করলেন?

"কাছে বসে স্নেহস্বরে বলছে রামকৃষ্ণঃ বই শাস্ত্র ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার পথ বলে দেয়। পথ জানা হয়ে গেলে আর বই শাস্ত্রের দরকার কি? তখন নিজে কাজ করতে হয়।"

আবার বলছেন, "পড়ার চেয়ে শোনা ভালো। শোনার চেয়ে দেখা ভালো। গুরুমুখে সাধুমুখে, শুনলে ধারণা বেশি হয়। আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা

১৩ J. Hilton—Goodbye Mr. Chips.

করতে হয় না। শোনার চেয়ে দেখা আরো ভাল। দেখলে আর সন্দেহ থাকে না।"[১৪]

নিরক্ষর রামকৃষ্ণ মনস্তত্ত্ব বুঝতেন। তাঁর শিক্ষা তাই ব্যর্থ হয় নি। সারদামণি সত্যি জ্ঞানলাভ করেছিলেন, কারণ তাঁর গুরু তাকে মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী সত্যপথই দেখিয়েছিলেন।

কি করে মনঃসংযোগ হয়, কেন আমরা ভুলে যাই, মানুষের বুদ্ধি জিনিষটা কি, কেন শিশুরা মিথ্যা কথা বলে, যারা জড়বুদ্ধি তাদের শিক্ষা কি করে দেওয়া যেতে পারে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন হাজারো সমাস্যার সমাধান মনস্তত্ত্ব না জানলে চলেই না। বর্তমান শিক্ষা একটা আন্দাজের ব্যাপার নয়, বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত, আর তাই নিত্য নূতন পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ চলছে শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতির জন্যে।

শিক্ষকের মনস্তত্ত্ব জানতেই হবে, কিন্তু সে মনস্তত্ত্ব বাস্তব 'কেজো' জিনিষ। শুদ্ধ (abstract) মনস্তত্ত্বের আলোচনা শিক্ষকের কাছে নিরর্থক। তাই শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের পরিধি সাধারণ মনস্তত্ত্ব (General psychology) অপেক্ষা সংকীর্ণ। তাই স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) শিক্ষা মনস্তত্ত্বের সংজ্ঞা দিচ্ছেন "শিক্ষামনস্তত্ত্ব হচ্ছে ইস্কুলের নানা সমাস্যার ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ, তার চেয়ে বেশী বা কম কিছু নয়।"[১৫]

রস্ (Ross) শিক্ষামনস্তত্ত্বের পরিধি সম্বন্ধে বিস্তৃততর ভাবে বলছেন, "যিনি বাস্তবিক শিক্ষকতা কচ্ছেন, বা যিনি ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চান, তিনি মনোবিজ্ঞানের কাছে প্রথমতঃ এ দাবী করেন যে তা শিক্ষক ও ছাত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করতে সক্ষম হবে।...দ্বিতীয়তঃ তিনি এ বিজ্ঞানের কাছে থেকে একথাটি জানবার আশা রাখেন কি করে একজনের ব্যক্তিত্ব দ্বারা অন্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারা যায়, কি করে সমষ্টিজীবন ব্যক্তিজীবনকে পরিবর্তিত করতে পারে।...তৃতীয়তঃ তিনি নিশ্চিতই আশা করবেন যে এ বিজ্ঞান শিক্ষাদানরূপ প্রাচীন কর্ম সম্বন্ধে পথনির্দেশ করতে পারবে।"[১৬]

এক অর্থে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তো মনস্তত্ত্বের বিষয়ীভূত। যা আমরা

---

১৪ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ, প্রথম খণ্ড।

১৫ Peter Sandiford—Educational Psychology, "Educational Psychology...is nothing more nor less than the application of Psychological Principles to the problems of the school-room".

১৬ J. S. Ross—Ground work of Educational Psychology.

প্রত্যক্ষ করি, যা আমরা কল্পনা করি, যা আমরা অনুভব করি, যা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, যা আমরা চিন্তা করি, যা আমরা অনুমান করি সবই তো মনের ব্যাপার। তাই মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত। কিন্তু শিক্ষক শুধু মনোবিজ্ঞানের সেই অংশ সম্পর্কেই উৎসাহী যা তার শিক্ষার সহায়ক হবে। শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ এবং এর মধ্য দিয়ে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ কি করে হবে, মনোবিজ্ঞানের সে সব সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যই মূলতঃ শিক্ষকের প্রধান জ্ঞাতব্য।

(শিশুর মন কি, তার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নটি আলোচনা করতে গেলেই বংশানুক্রম (Heredity) এবং পরিবেশ (Environment) সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। শিশু তার দেহ যেমন পায় পিতামাতার থেকে, তার মনের গড়নও কতকটা পায় সেই সূত্রেই। সৎ ও বুদ্ধিমান্ পিতামাতার সন্তান মোটামুটি সৎ ও বুদ্ধিমানই হয়। "বাপ্ কা বেটা,"—আম গাছের বীজ থেকে আম গাছই হয়, কাঁঠাল গাছ হয় না। কাজেই বংশানুক্রম জিনিষটা কি, কি করে পিতামাতার গুণাগুণ শিশুতে সংক্রামিত হয়, সে কথাটা আমাদের জানা দরকার।

কিন্তু বীজই সব নয়। বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত যত্ন পেলে, উপযুক্ত পরিবেশেই বেড়ে ওঠে। কাজেই পরিবেশের প্রভাব সামান্য নয়। "ভাল ঘরের ছেলে," "ভাল বংশের মেয়ে" হলেই কি শিক্ষা ভাল হবে? তা হ'লে তো শিক্ষকের কাজ অনেকটা সহজ হোত। তাঁর কাজ হোত ভাল বংশের ছেলে মেয়ে বাছাই করে স্কুল গড়া। কিন্তু তাতো নয়। (শিশুর মন শুধু পিতামাতার থেকে বংশানুক্রমিক সূত্রে যা পায়, তাই নয়। তার ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, তার সমাজ, তার গৃহ ও প্রতিবেশী, তার খেলাধূলার সঙ্গী সাথী, তার শিক্ষক ও উপদেষ্টা,—তার সমগ্র সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক পরিবেশও তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে—তার মনকে বিস্তার করে, বিকশিত করে, তার গতি নির্ধারণ করে, অথবা বাধা দেয়, বিকৃত করে, পঙ্গু করে। তাই শিশুর মনের উপর তার পরিবেশের প্রভাব, বংশানুক্রমের প্রভাবের চেয়ে কম নয়।) শিশুর বংশানুক্রমের ব্যতিক্রম করা শিক্ষকের সাধ্যের উপর নির্ভর করে না, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তনেরও ক্ষমতা শিক্ষকের নেই—তথাপি তার নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ প্রভাবান্বিত করবার ক্ষমতা শিক্ষকের কতকটা আছে। অন্ততঃ, এটা একটা মূল প্রশ্ন, বংশানুক্রম বা পরিবেশ, কার প্রভাব কতটা—তাদের সম্বন্ধ কি? এ প্রশ্নের সদুত্তরের উপর শিক্ষার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত, তা নির্ভর করবে।—উডওয়ার্থ প্রশ্ন

করছেন, "ভাল ফল পেতে হলে মালি কিসের উপর বেশী নির্ভর করবে? জমি সম্বন্ধে চাষ ও সারের উপরে, না ভাল বীজ বাছাইর উপরে?"[১৭]

মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বুঝতে গেলে দেহের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধও বুঝতে হয় কারণ দেহ মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে দেহের যে যে অংগ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাদের কথা মোটামুটি ভাবে জানা দরকার। তাই মস্তিষ্ক, স্নায়ুকেন্দ্র, স্নায়ুমণ্ডলী, মেরুদণ্ড, পেশী, শিরা; গ্ল্যাণ্ড ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।

শিক্ষার ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই আমাদের কতগুলি বৃত্তি জন্মগত (Instinctive), কতগুলি আয়াসলব্ধ (acquired)। সুতরাং জন্মগত বৃত্তিগুলির স্বরূপ, তাদের ব্যাপকতা, শিক্ষার কাজে এ বৃত্তিগুলিকে কতটা ভিত্তি করা যায়,—বুদ্ধি, অনুভূতি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ, ঐ সব কথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষার একটা প্রধান পথ ইন্দ্রিয়গুলি। তারা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেয়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এ জ্ঞান অবিভাজ্য[১৮] হলেও যুক্তির দিক থেকে তাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শিক্ষালাভের আর একটা পথ স্মৃতি। মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া, কি করে হয়, কি করে অর্জিত শিক্ষাকে মন সংগ্রহ করে রাখতে পারে, সে কথা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ। তার শিক্ষায় কল্পনার স্থান সামান্য নয়। কাজেই তার স্বরূপ ও বিকাশ বোঝা দরকার।

মনঃসংযোগ না হলে শিক্ষা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষককে জানতে হবে মনঃসংযোগ এবং মনোযোগ আকর্ষণের নীতি ও তথ্যগুলি।

বস্তুবিবর্জিত জ্ঞান, যুক্তির ব্যবহার, একেবারে শিশুদের পক্ষে সচেতন ভাবে সম্ভব নয়। তথাপি এ জ্ঞানের অঙ্কুর শিশুর মনেও প্রত্যক্ষ করা যায়; কি করে ক্রমে ক্রমে সচেতন ভাবে শিশু যুক্তির ব্যবহার করতে শেখে তা আমাদের বুঝতে হবে। এই সম্বন্ধেই জানতে হবে শিশুর ভাষা জ্ঞান কি ভাবে বিকশিত হয়।

জানা বা learning কি করে সুষ্ঠুভাবে আয়াসের অপব্যয় না ঘটিয়ে হতে

---

১৭ Shall the gardener pin his hope on careful cultivation of the soil or on selection of the best seed? Woodworth—Psychology.

১৮ War—Psychological Principles.

পারে, তা আমাদের আলোচনা করতে হবে। কি করে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী হতে পারে এ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বহু হয়েছে, তার ফলাফলগুলি এবং জানার মূলনীতিগুলি (Laws of Learning) আমাদের বুঝতে হবে। জ্ঞানচর্চার ফলে অবসাদ আসতে পারে। তাতে শিক্ষার কাজ ব্যাহত হয়। বিরক্তিও শিক্ষালাভের পথে বাধা। অবসাদও বিরক্তির স্বরূপ, এবং তা বিদূরণের বা প্রশমনের উপায় শিক্ষকের জ্ঞাতব্য বিষয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিভিন্নতা স্বীকার করতেই হবে। বুদ্ধি জিনিষটা কি, তার মাপ কি করে হতে পারে, তা কি ভাবে বাড়ানো যায়, কতটা বাড়ানো যায়, সেটা শিক্ষকের পক্ষে জানা দরকার। বুদ্ধির মাপে যারা অসাধারণ প্রতিভাশালী শিশু (exceptionally gifted) এবং একেবারে বুদ্ধিহীন (idiots) তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও বিভিন্ন হতে হবে। শিক্ষককে সে কথাও জানতে হবে। যাদের মন বিকারগ্রস্ত বা দুষ্ট (abnormal or delinquent) তাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। শুধু বুদ্ধি নয়, মানসিক ও দৈহিক সমস্ত গুণ ও দোষ সকলের এক রকমের নয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এ প্রভেদ নিয়ে নানা আলোচনা কচ্ছেন। এ বিভেদগুলি পরিমাপের নানা উপায় ও পদ্ধতিও আমাদের জানতে হবে।

শিশুর জীবনে অনুভূতির (emotions) স্থান সামান্য নয়, তাই শিশুর অনুভূতির স্বরূপ জানতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিকূল ও অনুকূল প্রভাব বিবেচনা করে শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।

চঞ্চলতা, কর্মমুখরতা শিশুর ধর্ম। খেলার মধ্য দিয়ে সে শেখে, বেড়ে ওঠে, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ খোঁজে। সে অনুকরণ করে। একটু পরিণত হলে সে বিবেচনা করে কাজ করতে শেখে। তার মনের এই দিকটাও তাই বুঝতে হবে। শৃংখলা ও শাসন কি উপায়ে তার চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায় হতে পারে—শিক্ষককে তা ভাল করে জানতে হবে। মনের বিকারের সমস্যা শিক্ষকের বিশেষ বিবেচ্য। কেন এই বিকার ঘটে, কি করে এর নিরাময় সম্ভব, এ সব কথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমরা শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের এ মূল প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি ক্রমে ক্রমে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে নাকি লেখা আছে, নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের অপরাধে মানবের আদিম পিতামাতা স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এ কথাটা কতদূর সত্য তার ঐতিহাসিক বিচার সম্ভব নয় তবে জ্ঞানবৃক্ষের ফলে যে মানুষের রুচি আছে,—এতে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ বিধাতার অশান্ত সন্তান। সে অন্যান্য প্রাণীর মত তার জীবন ও পরিবেশ মেনে নেয় নি। তাই কেবলই তার প্রশ্ন, কি, কেন, কে, কবে, কোথায়? অন্যান্য প্রাণীও তার পরিবেশ সম্বন্ধে কতকটা সচেতন। কিন্তু সে চেতনার পরিধি বিস্তীর্ণ নয়। জীবধর্মের আশু প্রয়োজনে বাহ্যপরিবেশকে যতটুকু জানা দরকার ততটুকুই ইতর প্রাণীরা জানে। পার্সোনালিটি অব এ্যানিম্যালস্ বইয়ে লেখক লিখেছেন, এই বাহ্যবস্তু জানা সম্বন্ধে মানুষের ও পশুর মধ্যে যথেষ্ট তফাত রয়েছে। মানুষ একটা জিনিষকে তার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও একই জিনিষ বলে জানে। কিন্তু পশু সম্ভবতঃ, একটা জিনিষকে সব সময় একই জিনিষ বলে জানে না। বেড়ালের কাছে ইঁদুরছানা চুপ করে বসে থাকলে সে কিছু বলে না, কিন্তু ইঁদুরছানা দৌড়ে পালালেই বেড়াল তাকে খাবার জন্যে থাবার আঘাত করে। অর্থাৎ, পলায়মান মূষিকশাবককেই সে খাদ্য হিসাবে জানে, মূষিকশাবক মাত্রকেই সে খাদ্য মনে করে না। ১

বাহ্যপরিবেশ জানার মধ্যে তবু অন্য প্রাণীতে ও মানুষে মিল আছে। কিন্তু অন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষ অনেকখানি তফাত এ বিষয়ে, যে মানুষ তার মানস-পরিবেশকেও জানতে চায়। এই মন জানতে চাওয়ার আগ্রহ আছে বলেই মানুষের সমাজ আছে, সভ্যতা আছে, নীতি-বোধ আছে, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য আছে। বাইরের পরিবেশকে জানবার চেয়েও বুঝি বেশী প্রয়োজন মানুষের নিজের মনকে ও পরের মনকে জানবার। বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে

১ Munro Fox—Personality of Animals.

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, বাহ্য-পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের নিবিড় আগ্রহের পরিচয় বহন কচ্ছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মানুষের নিজ সম্পর্কে জ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় সামান্য। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ এবং অপরিমেয় লোভের প্রতিযোগিতায় যে দুঃসহ দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয়েচে তার একটা কারণ, মানুষ বাহ্যপ্রকৃতির জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অজ্ঞ থাকায় নিজেকে শাসন ও সংযত করতে পারছে না, তাই তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মানবকল্যাণে নিয়োগ না করে, সে মানুষের সর্বনাশের কাজেই নিয়োগ কচ্ছে। তাই ডীন ইঞ্জ (Dean Inge) পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান চর্চা কিছুদিন বন্ধ থাকাই ভালো—Science should take a holiday. এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ আমাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন, কাজেই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের মন জানার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই, এবং গত শতাব্দীতে এ সম্পর্কে বহু গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

জড় জগতের সঙ্গে মনোজগতের তফাতটা সহজেই চোখে পড়ে। ইট, কাঠ, পাথর জড় পদার্থ, এরা অনড়। আবার গাড়ীর চাকা, আকাশে ওড়া ঘুড়ি, সূর্য, চন্দ্র, তারাও জড়পদার্থ কিন্তু তারা সচল। তারা প্রাণহীন, অচেতন। আর মানুষ? তার প্রাণ আছে, চেতনাও আছে। মানুষ অন্যান্য জড়পদার্থের মত শুধু স্থান অধিকার করেই থাকে না, তার ইচ্ছা আছে, প্রবৃত্তি আছে, ভালবাসা আছে, দুঃখবোধ আছে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি আছে, অভিনিবেশ আছে, সংকল্প আছে। এ জন্যে আমরা বলি মানুষের মন আছে।

কিন্তু মন বলতে কি বুঝি? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু সহজ নয়। অত্যন্ত প্রাচীন যুগ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আমরা দেখতে পাই।

প্রাচীন গ্রীসদেশে মন বা আত্মা (nous) বলতে তাঁরা বুঝতেন মানুষের দেহাভ্যন্তরে অ-জড় জ্যোতির্ময় আশ্চর্য কোন সত্তা, যা মানুষের দেহকে চালিত করে, সঞ্জীবিত রাখে, যা তার সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রত্যক্ষজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত জীবন ও চেতনার মূলীভূত। এ আশ্চর্য পদার্থ দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ; মৃত্যুতে সে হয় বিদেহী, ছায়া কালো কালো ভূত বা প্রেতাত্মা। জীবিত অবস্থায়ও আত্মা কখনো কখনো দেহকে ছেড়ে বাইরে আসে, যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, এবং আত্মার

এই অভিনব বিচরণকেই মানুষ বলে স্বপ্ন। ম্যাক্‌ডুগাল (Mcdougall) লিখছেন "অতি প্রাচীনকালে আত্মাকে সাধারণতঃ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলেই বিবেচনা করা হত।....যদিও এ পদার্থ দেহের প্রত্যেক অংশেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তথাপি এর দেহাতিরিক্ত পৃথক সত্তা আছে। দেহের মৃত্যুর পরেও এ আত্মা দেহের অস্পষ্ট ছায়া বা ভূতরূপে বিরাজ করে। জীবিত কালেও এ আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে অন্যত্র বিচরণ করতে পারে, যেমন ঘটে স্বপ্নে বা মোহাবিষ্ট অবস্থায়।"[২]

প্লেটো (Plato) ভূত বা প্রেতাত্মা বিশ্বাস না করলেও মানবআত্মাকে (soul) রহস্যময় ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কিন্তু বুদ্ধিগম্য পদার্থ বলে মনে করেছেন এবং তিনিও মানুষের চেতনার কারণ ও মূল হিসাবে এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কাজেই মানুষকে মনের বিচিত্র লীলা বুঝতে গেলে, আমাদের এই আত্মার স্বরূপকেই জানতে হবে; এই ছিল সেকালের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা।

এ্যারিষ্টটল (Aristotle) ই প্রথম প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিকভাবে মনো-বিজ্ঞানের আলোচনা সুরু করেন। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ডি এনিমা (De Anima)তে মনকে বুঝতে গেলে তার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার (Process) বিশ্লেষণ ও তাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। মানুষের মনকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ বলে মনে করেছেন এবং প্রাণী জগতের সঙ্গে মানুষের মূলতঃ সাদৃশ্য আছে এবং মানুষের মনকে বুঝতে গেলে ইতর প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করে তার স্বরূপ বুঝতে হবে, একথা তিনিই বলেন। বিভিন্ন প্রাণীর আত্মার বিকাশের স্তরবিভাগ তিনি স্বীকার করেছেন এবং সমস্ত প্রকৃতিতে (সুতরাং মানব প্রকৃতিতে) একটা উদ্দেশ্যমুখীন গতি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। কাজেই মনোবিজ্ঞানকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের অনু-সন্ধিৎসার অংশ বলেই মনে করেছেন।[৩]

এ্যারিষ্টটল মনকে একটা দ্রব্য হিসাবে দেখেননি, দেখেছেন কতকগুলি প্রক্রিয়া হিসাবে।[৪] "আত্মা এমন একটা অদ্ভুত পদার্থ নয়, যেটা দেহে প্রবেশ করে,

২ Mcdougall—Psychology P. 13.

৩ Cushman—A Beginner's Histoy of Philosophy, P. 196-97.

৪ "The soul is not a thing which comes into the body and goes out of it. It is not a thing at all. It is a function." Stace—A Critical History of Greek Philosophy. P. 302.

আবার দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়। বাস্তবিক মন একটা পদার্থ নয়। মন হচ্ছে কতগুলি প্রক্রিয়া।"

মধ্যযুগেও মনোবিজ্ঞানের কাজ এই আত্মারূপ পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়েই পর্যবসিত ছিল। তাঁরাও আত্মাকে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ, অথচ অজড়, অবিনশ্বর পদার্থ হিসাবেই গণ্য করতেন, এবং মানুষের শুভবুদ্ধিসূচক সমস্ত মনের ক্রিয়াই এই আত্মা দ্বারা পরিচালিত একথা তাঁরা মনে করতেন। লোভ, ভয়, কাম ইত্যাদি নিকৃষ্টবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান নিতান্ত স্থূল দৈহিক ব্যাপার। আত্মার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। কাজেই মনস্তত্ত্ব বুদ্ধির নানা প্রক্রিয়ার আলোচনার সংকীর্ণ গণ্ডীতেই আবদ্ধ রইলো এবং মনের প্রক্রিয়াগুলিকে নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে উচ্চ, নীচ ভাগ করা হল, এবং নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ভাবে স্থূল দৈহিক ব্যাপার বলে, মনের অধিকাংশ প্রক্রিয়া অপাংক্তেয় হয়ে রইল। বাস্তবিকপক্ষে —সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হওয়ার ফলে মধ্যযুগ বহির্জগৎ সম্বন্ধে বীতরাগ, তাই তা বিজ্ঞান চর্চার বিরোধী ছিল।[৫]

বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন উঠিল, যে আত্মা যদি ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যময় অজ্ঞাত তত্ত্বমাত্র হয় তবে তা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে গৃহীত হতে পারে কিনা। অজানাকে জানা দিয়ে ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানসম্মত, জানাকে অজানা দিয়ে ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিপরীত। কাজেই মনোবিজ্ঞান গড়ে তুলতে গেলে রহস্যময় আত্মাকে ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে পরিত্যাগ করতে হয়।

বর্তমান যুগের গোড়াতে ডেকার্ট (Descartes) সমস্ত বিশ্বজগৎকে দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করলেন, একটা জড়-জগৎ আর একটা মনোজগৎ। এই দুই জগতের মূলে দুইটি মূল পদার্থ তিনি স্বীকার করলেন, জড় (matter) এবং মন (mind)। জড়ের ধর্ম হচ্ছে স্থান অধিকার করে থাকা (extension), আর মনের ধর্ম হচ্ছে চেতনা (consciousness)। এর মধ্যে অস্পষ্টতা বা রহস্য কিছু নেই। এই দুটি জগৎই নির্দিষ্ট যান্ত্রিক নিয়ম (mechanical laws) অনুসারে চলে।

ডেকার্ট আত্মাকে অস্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, আমাদের জ্ঞানের মূলে কতকগুলি জন্মগত সংস্কার (innate ideas) রয়েছে, সেগুলিকে মেনে নিতেই হবে। ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এ রকম

৫ B. Russell—A History of Western Philosophy, P. 320.

জন্মগত সংস্কার। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব হিসাবে তিনি আত্মার পরিবর্তে মন (mind)-কে গ্রহণ করলেন। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের একটা নূতন সংজ্ঞা পাওয়া গেল — মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের মন সম্বন্ধে আলোচনা। এই মনেরই বিভিন্ন প্রকাশ হচ্ছে বুদ্ধি, ইচ্ছা, ভালবাসা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি। ডেকার্ট কিন্তু তাঁর দর্শনকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (observation) ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন না। তাঁর পদ্ধতি ছিল অবরোহানুমান (deductive), কিন্তু তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের মনকে একটা জটিল যন্ত্র হিসাবেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার মধ্যে রইলো ভবিষ্যৎ জড়বাদের (materialism) ইঙ্গিত। অবশ্য ডেকার্ট-এর পূর্বেই বেকন (Bacon) এবং হবস্ (Hobbes) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে আরোহানুমান (Induction) এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতির ব্যবহার আমরা হবস্, লক্ (Locke) বার্কলে (Berkeley) ও হিউম (Hume)-এ দেখি। মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করে, তাদের স্বরূপ বুঝবার অধিকতর আগ্রহ দেখা যেতে লাগল। লক্ মানুষের জ্ঞান বিশ্লেষণ করে বললেন, মানুষের মন জন্ম-সময়ে একটা অ-লেখা শ্লেটের মত (tabula rasa), তাতে অভিজ্ঞতার কোন দাগ পড়েনি। ইন্দ্রিয়গুলির রাস্তা দিয়ে ক্রমে ক্রমে মনে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। তিনি ডেকার্ট এর জন্মগত সংস্কার-বাদ অস্বীকার করে বললেন, মন কতগুলি সংস্কার নিয়ে জন্মায় না। এই মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) নামে খ্যাত। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতঃপর অভিজ্ঞতাবাদীরা এই দাবী করিয়াছিলেন যে, এই বিজ্ঞানের বিষয় হবে 'মন' নামক পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় নয়, মনের বিভিন্ন চেতন প্রক্রিয়ার (states of consciousness) প্রকৃতি ও সম্বন্ধ নির্ণয়। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞনের সংজ্ঞাটা বদলে হোল "মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন চেতন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু আলোচনা—Psychology is the science of consciousness" অবশ্য এটা অনেক পরের কথা। লক্ তাঁর মতবাদের চূড়ান্ত ও যুক্তিসম্পন্ন পরিণতিতে পৌঁছতে পারেননি। তিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আশ্রয় নিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের। অভিজ্ঞতাবাদ জড়বাদের পথ প্রশস্ত করে, য়ুরোপীয় দার্শনিকদের বিচলিত করল। লক্-এর পর বার্কলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণের পথে জড়বাদকে ধ্বংস করতে চাইলেন এবং প্রমাণ করলেন যে জড়ের অস্তিত্বই

নেই। যা আছে, তার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ, যে তারা আছে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়,—esse est percipi। হিউম কিন্তু এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণের পথেই এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌছলেন, যে মন বা আত্মা বলে কোন পদার্থের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। এটা নিতান্তই একটা প্রাচীন যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার মাত্র। কাজেই হিউম্-এ এসে য়ুরোপীয় দর্শন একটা শূন্য নাস্তিক্যবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের মুখোমুখি দাঁড়াল। এই অজ্ঞেয়বাদ অবস্থা সম্বন্ধে উইল ডুরাণ্ট (Will Durant) বলেছেন—"ফলটা দাঁড়াল এই যে বার্কলে যেমন জড়ের অনস্তিত্ব প্রমাণ করলেন, হিউম তেমনি নিশ্চিতভাবেই মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। তাতে হোল, যে কিছুরই আর অস্তিত্ব রইল না। দর্শন নিজের যুক্তি দিয়েই নিজের ধ্বংস ডেকে আনলো। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে একজন রসিক ব্যক্তি বলেছিলেন—"বেশ হোল, আর কোন তর্কের দরকার নেই, সব ল্যাঠা চুকেছে জড়ও নেই, ভাবনাও নেই।"[৬]

য়ুরোপীয় দর্শনের ত্রাণকর্তারূপে দেখা দিলেন কাণ্ট (Kant)। তিনিও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, যে বস্তুজগৎ (Things in themselves) আছে, তারা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত ক'রে, জ্ঞানের উপাদান (materials of knowledge) আমাদের পৌছে দেয়, কিন্তু মানুষের মন তাদের 'স্বরূপে' জানতে পারে না, কেন না মানুষের মনে কতগুলো নির্দিষ্ট কাঠামো বা ছাঁচ রয়েছে (Froms of knowledge) তাতে ঢালাই না ক'রে সে জানতেই পারে না।[৭]

যাক, কাণ্ট-এর দার্শনিক মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর মতটা আমাদের কাজে লাগবে। আত্মার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করলেন, কিন্তু তিনি বললেন, মন-পদার্থকে

৬ Will Durant—A Story of Philosophy. p. 195. "The result appeared to be that Hume had as effectually destroyed mind as Berkeley had destroyed matter. Nothing was left ; and philosophy found itself in the midst of ruins of its own making. No wonder that a wit advised the abandonment of the controversy, saying : "No matter, never mind."

৭ "What we call the world of nature or the Physical world is, then, but the appearance to us of some reality of whose real nature we can form no idea, because the nature of these appearances or phenomena is determined so largely by the constitution of our own minds." Mcdougal—Psychology : The study of behaviour p. 15

প্রত্যক্ষভাবে জানবার পথ নেই। তার যে প্রকাশ তাই আমরা জানতে পারি; তাই হবে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।[৮-৯]

কাজেই মনোবিজ্ঞান মন-পদার্থকে জানবার চেষ্টা নয়, মনের প্রকাশমান প্রক্রিয়াগুলির প্রকৃতি, সম্বন্ধ ও তাদের মূল নিয়মগুলি জানবার সুসংবদ্ধ আগ্রহ। কাণ্ট মনের প্রক্রিয়াগুলিকে জ্ঞান (thinking), অনুভূতি (feeling) ও ইচ্ছা (willing) এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করলেন। তিনি আরও বল্লেন মন নিষ্ক্রিয় (Passive) পদার্থ নয়,—মনের ক্রিয়া হচ্ছে বিচ্ছিন্নকে একীকরণ। কাণ্ট-এর পর থেকে মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃই অভিজ্ঞতামূলক (empirical) এবং বিশ্লেষণধর্মী (analytical) হতে থাকে। জড়বাদের প্রভাবে মানসিক প্রক্রিয়াগুলি স্বপ্রধান এবং বিচ্ছিন্ন (separate and independent) বলে মনে করা হতে থাকল, কোন আত্মাবস্তু তাদের একতার সূত্রে বাঁধছে এ কথা অস্বীকৃত হ'ল। মনোবিজ্ঞানের এই গতির (tendency) স্পষ্ট রূপ আমরা দেখি হার্টলের অনুষঙ্গ (Associationism) মতবাদে। অনুষঙ্গবাদ বলে, মন বলে কোন দ্রব্য নেই, মন হচ্ছে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সমষ্টি মাত্র। এই প্রক্রিয়াগুলি স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন, মনের কোন নিজস্ব গতি নেই, যা দিয়ে এই বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াগুলো সংযুক্ত হয়। সংযোগের কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সহজতম মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ অধিকতর জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন উপাদান যেমন কতগুলি মৌলিক পদার্থ হ'তে উৎপন্ন হয় তেমনি মৌলিক কতগুলি মানসিক অবস্থার (states) সংযোগ ও বিন্যাস দ্বারা মনের জটিলতর প্রক্রিয়াগুলি সৃষ্টি হয়।[১০]

৮ "It is legitimate to conclude that there can be no knowledge unless there is a subject, self or soul, but we have no right to infer that this knower is a self-existent, simple, indecomposable, self-indentical substance." Thilly—History of Philosophy. p. 410.

৯ "He argued that our minds also are inaccessible to our direct observation and that we have direct knowledge only of mental phenomena or appearances." Mcdougall—Psychology. P. 15.

১০ "Hartley accepted Locke's conception of compound ideas. A group of revived sensations might cohere so as to form a mental product. But this mental product, was to be conceived as a parallel to a physical product a group of nerve-excitations. He delighted in reducing complex experiences to the elementary sensations which by association constituted them. Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology. P. 25.

সে জন্য একে মানসিক রসায়ন (Mental Chemistry) বলা হয়েছে। হবস্ এই মতের সূত্রপাত করেন। তবে হার্টলে প্রথম একে সম্পূর্ণ রূপ দেন।[১১]

আধুনিককালের জেস্টল্ট (Gestalt) মতের মনোবিজ্ঞানীরা উপহাস করে একে নাম দিয়েছেন ইট ও সুরকী মতবাদ (Brick and Mortar theory)। দালান যেমন গড়ে ওঠে ইটের পর ইট গেঁথে, মনোবিজ্ঞানও তেমনি মনের ইমারত গড়ে তোলে সহজতম মানসিক ক্রিয়া, সংবেদন (sensation) এবং কল্প বা প্রতিরূপে (image) ইট দিয়ে দিয়ে।[১২]

কাণ্ট মনের প্রক্রিয়াগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করেছিলেন—জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা (thinking, feeling and willing)। তাঁর পূর্বে বিশ্লেষণ-ধর্মী মনোবিজ্ঞানীরা মনকে কতগুলি শক্তিতে (faculty) ভাগ করেছিলেন। মনের এই মৌলিক কয়টি ক্ষমতা ও সম্ভাবনা দিয়েই তাঁরা সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতেন। যেমন, আমরা চোখে দেখি কেন? যেহেতু প্রত্যক্ষ করবার 'ক্ষমতা' মনের আছে। উলফ্ (Wolff-১৭৩৪ তাঁর র‍্যাশন্যাল সাইকলজী (Rational Psychology) গ্রন্থে এই মতকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। এই মতবাদকে ফ্যাকাল্টি সাইকলজী বলা হয়।[১৩]

এতে আপাততঃ একটা সুবিধা আছে সত্য, কারণ, কোন মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলেই বলা চলত মনের অমুক শক্তির (faculty) জন্যে এটা

---

১১ Woodworth says "the wonderful achievements of chemistry led to the idea of a 'mental chemistry' which should analyse mental compounds into their elements. The term association was stretched to cover all sorts of combinations, the notion of an analytical psychology that should take its cue from chemistry and work out elements and compounds in the mental sphere, took firm hold at that time." Woodworth—Contemporary Schools of Psychology. P. 6.

১২ "The Gestalt psychologist called this a brick and mortar psychology, with emphasis on the brick, because the trouble was to find the mortar. The mortar problem had been a serious one for the associationists. Some of them had seen no problem, and others had appeared satisfied with the mere word 'associations' as an answer to the question 'what holds the elements together'?" Woodworth—Contemporary Schools of Psychology. P. 101.

১৩ "For this school a faculty was the capacity of the soul to carry out a certain activity. This gives us a double enumeration of all mental processes; there is not only the specific process of remembering, but the power of remembering". Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology. P. 30.

৭৫০৭

হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক কোন প্রক্রিয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এতে মিলে না। জড়বাদের প্রভাবে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শরীরবিদ্যা ও প্রাণী-তত্ত্বের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের নিবিড় সম্বন্ধ আছে, একথা মনোবিজ্ঞানীরা অনুভব করতে লাগলেন এবং বিশেষ করে, মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের (brain) মধ্যে নানা পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এটা তাঁরা বুঝলেন। ডেকার্ট এই তথ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, এবং যদিও তিনি মন ও দেহকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু বলে মত প্রচার করেছিলেন, তথাপি দেহ ও মন পরস্পরের সঙ্গে মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থিতে (Pineal gland) যোগাযোগ রক্ষা করে (Interaction-ism) এ মতবাদ প্রচার করেছিলেন। এটা অবিশ্যি একটা গোঁজামিল ছিল, এবং তাঁর পরবর্তীরা দেহ ও মনের সম্পর্ককে অধিকতর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করবার নানা চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে লাইবনিজএর (Leibnitz) পূর্বকৃত সমন্বয় (Pre-established harmony) মতবাদ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে দেহ মন দুটি বিভিন্ন ঘড়ির মত কিন্তু সৃষ্টিকর্তা গোড়ার থেকেই এই দুটি ঘড়িতে এমন মিল করে দিয়েছেন, যে একটিতে কোন পরিবর্তন হ'লে, অন্যটিতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটবে। এটাও অবিশ্যি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে সন্তোষজনক নয়। গল্ (Gall) উনবিংশ শতাব্দির গোড়াতে আবিষ্কার করলেন যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধ-যুক্ত। পুরানো ফ্যাকাল্টি মনোবিজ্ঞান (Faculty Psychology) এতে আরো জোর পেলো। মস্তিষ্কবিজ্ঞান (Phrenology) বলে একটা ভুয়া বিজ্ঞান গড়ে উঠল, এবং মানুষের মনের গতি ও মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তার মস্তিষ্কের গড়ন দেখেই বলে দেওয়ার চেষ্টা হল। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান পুরোপুরিভাবে জড়বাদী ও দেহবিজ্ঞানে পরিণত হতে চলল। গল্এর অনুমান ছিল যে কোন নির্দিষ্ট মানসশক্তির ক্রিয়া নির্ভর করে মস্তিষ্কে সে শক্তির একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের বিকাশের উপরে। মস্তিষ্কে এরূপ কেন্দ্রের বিকাশের ফলে সে স্থানে করোটিতে (skull) চাপ লাগতে থাকে, তাতে এ জায়গাটা ফুলে ওঠে, এবং এতে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন করোটি আঙ্গুল দ্বারা স্পর্শ করে, কোন কোন কেন্দ্র, বিশেষ কোন মানসিক শক্তির কেন্দ্র তা অনুভব করা যায়, এবং তা থেকে ব্যক্তির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যও নির্ধারণ করা যায়।"[১৪]

মনোবিজ্ঞানের যতই উন্নতি হ'তে লাগল ততই তা পরীক্ষামূলক ও

১৪ Murphy, Historical Introduction to Modern Psychology. p. 55.

ব্যবহারিক হতে থাকল। অন্যান্য বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষাকে (Observation and Experiment) জ্ঞান আহরণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। মনোবিজ্ঞান যতই দর্শনশাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন একটি বিজ্ঞানের মর্যাদা দাবী করতে সুরু করল, ততই তাতে পরীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হ'তে লাগল। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation) এবং তার কারণ বা উত্তেজক (stimulus) এর পরিমাণগত (Quantitative) সম্বন্ধ নির্ণয়। এ পরীক্ষা করেছিলেন ওয়েবার (Weber) এবং (Fechner) এবং নিয়মটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তা তাঁদের সম্মিলিত নাম বহন কচ্ছে (Weber-Fechner Law)।

পূর্বেই বলা হয়েছে মনোবিজ্ঞান আত্মা বা মন-পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ, এ সংজ্ঞা ছেড়ে, চেতন প্রক্রিয়াসমূহের (conscious states and processes) সম্বন্ধ ও পরণতি নির্ণয়, এ সংজ্ঞাতে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এ সংজ্ঞা সম্বন্ধে আপত্তি দুদিক থেকে উত্থিত হল। এঁদের একদল হলেন ফ্রয়েড (Freud) ও তাঁর অনুগামী মনঃসমীক্ষণ বাদী (Psycho-analyst)দের দল, আর একদল হলেন ওয়াটসন্ (Watson) এর মতানুবলম্বী ব্যবহারবাদী (Behaviourist)দের দল।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) ছিলেন ডাক্তার। হিষ্টিরিয়া উন্মাদ-রোগ ইত্যাদির চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখলেন এ ব্যাধিগুলি শুধুমাত্র শরীর যন্ত্রের বৈকল্য বা বিকৃতি থেকে ঘটে না। এগুলির মূলে রয়েছে রোগীর মনে বিস্মৃত কতগুলি গোলযোগ। তার চেতন মনে তার ফলটা মাত্র দেখা যায়। অর্থাৎ তিনি বুঝলেন মনের সামান্য অংশই চেতনার আলোকে সুস্পষ্ট, তার অধিকাংশই রয়েছে প্রায়ান্ধকার অবচেতনায়। যখন কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের বাইরে চলে যায়, তা সুস্পষ্ট চেতনায় থাকে না বটে, তবু মনের মধ্যে থাকে। তাকে চেষ্টা করলে স্মৃতির পথে, মনের সামনে আবার হাজির করা চলে। তিনি বহু শত রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলেন, এমন অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা, লজ্জাকর অসামাজিক ইচ্ছা আছে, যাকে মানুষ স্বীকার করতে চায় না, তাদের ঠেলে দেয় স্মৃতির অতলতলে, মনের গভীর অন্ধকারে। এগুলি আমাদের মনেরই অঙ্গ, তবু আমাদের চেতন মন তাদের সঙ্গে এতটুকু সম্পর্কও স্বীকার করতে চায় না। তারা হচ্ছে মনের রাজ্যের বনবাসিনী দুয়োরাণী। তাদের চেতন মনের সামনে ডেকে আনতে গিয়ে

আমাদের সামাজিক নৈতিক বুদ্ধিরূপ সুয়োরাণীর চোখ রাঙানী সইতে হয়। সাদা কথায় বলি, ফ্রয়েডের মত মনের তিনটে স্তর, একটাকে তিনি বলছেন চেতন স্তর (conscious), সেটা মনের সামনে রয়েছে, দ্বিতীয়কে তিনি বলেছেন প্রাক্‌চেতন স্তর (pre-conscious), যেটা রয়েচে স্মৃতির অস্পষ্টতায়; তৃতীয়কে তিনি বলেছেন—অবচেতন স্তর (unconscious), যা মনের গোপন গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে।[১৫] বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েচে তার চেতন মনে নয়, সেটা মানুষের "পোষাকী" রূপ; তার প্রকৃত পরিচয় তার 'অবচেতন' আদিম বর্বর মনে। কাজেই তিনি বললেন, মনোবিজ্ঞান এতদিন মানুষের পোষাকী মন নিয়ে সৌখীনভাবে নাড়াচাড়া করেচে, সে বিজ্ঞান তাই অবাস্তব। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা তাই বদলানো দরকার, গোটা মানুষটার মন বুঝতে গেলে, 'অবচেতন'-এর কাদায় নামতে হবে "সেই নিম্নে নেমে এস, নহিলে, নাহিরে পরিত্রাণ!" বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞান ফ্রয়েডের মনো-বিকলন মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত।

ব্যবহারবাদীদের (Behaviourist) আক্রমণ এল আর একদিক থেকে। ওয়াট্‌সন্ বললেন, মনের পরিচয় পাই কতগুলি শারীরক্রিয়ায়, প্রাণীর ব্যবহারে (behaviour)। এটা বস্তুগত (objective) প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু আমরা যখন বলি অন্তরের কতগুলি প্রক্রিয়া, সে গুলিই মন, তখন মন জিনিষটা হত নিতান্তই ব্যক্তিগত (subjective), এর একমাত্র পরিচয় আছে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, তার অন্তঃবিশ্লেষণে (introspection)। আমার 'মনে' কি হচ্ছে, তা কেবল আমিই জানি, অন্যের 'মন' প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। সেটা আন্দাজ করি, তার ব্যবহার দিয়ে। কাজেই মনস্তত্ত্ব যদি বিজ্ঞানই হয়, তবে তাকে বস্তুগত ভিত্তির উপরই দাঁড় করাতে হবে। মানুষের ব্যবহারটাই (behaviour) যখন একমাত্র বস্তুগত ঘটনা (objective fact), তখন তার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ণয়ই তো মনোবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (subjective experiences) যার উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, যাকে বৈজ্ঞানিক কোন মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না, তা পরিত্যাগ করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। রাগ হলে পেশীগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, রক্তের চাপ বাড়ে, হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুত হয়, এগুলি

১৫ **Hart.—Psychology of Insanity.**

'প্রত্যক্ষ' ব্যাপার। এ পরিবর্তনগুলি আমরা মাপতে পারি, কাজেই এদের বৈজ্ঞানিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব। তাই কেন করা হোক্ না? আমরা বলব, 'রাগ মানে হচ্ছে মানুষের সে রকম ব্যবহার, যখন তার পেশীগুলি দ্রুত সঙ্কুচিত প্রসারিত হয়, স্বর উচ্চ হয়, রক্তের চাপ বাড়ে, হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হয়, যখন সে আঘাত করতে প্রবৃত্ত হয়'। এখানে 'মন', 'চেতনা' এ সব অবাস্তব বিষয় না স্বীকার করলেও তো চলে। বাস্তবিক ব্যবহারবাদীরা সে দাবীই করলেন এবং মনোবিজ্ঞানের নূতন সংজ্ঞা দিলেন, "মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের ব্যবহারের সম্যক আলোচনা।"[১৬] ওয়াট্‌সন্ বলেছেন "ব্যবহারবাদীদের চোখে মনোবিজ্ঞান হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি অংশ, যা শুদ্ধ বস্তুগত ও পরীক্ষাগত। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের ব্যবহার কি অবস্থায় কি হবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা, এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা। এ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে অন্তঃদর্শনের বিশেষ কোন মূল্য নেই। এ বিজ্ঞান এখন এমন স্তরে পৌঁচেছে যে মনোবিজ্ঞানের পক্ষে 'চেতনা' শব্দটি পরিত্যাগ করতে হবে। এখন মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা, 'চেতনা', 'মানসিক ক্রিয়া', 'মন', 'অন্তঃকরণ', 'ইচ্ছা', 'কল্পনা' এবং অনুরূপ কথাগুলি বাদ দিয়েও করা যেতে পারে।...এ বিজ্ঞানের আলোচনা এখন উত্তেজক (stimulus) এবং প্রতিক্রিয়া (response), অভ্যাস গঠন, অভ্যাস-সংযোগ ইত্যাদি কথা দিয়েই করা যেতে পারে।[১৭] ওয়াটসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পিলস্‌ব্যেরী (Pillsbury) বললেন, "মনোবিজ্ঞানের প্রাচীন সংজ্ঞা হচ্ছে এ চেতনাক্রিয়ার বিজ্ঞান, অথবা ব্যক্তির অনুভূত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা। এ সংজ্ঞাগুলির সুবিধে থাকলেও এরা ত্রুটিশূন্য নয়। 'মন' কে আমরা জানি মানুষের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। কাজেই মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, 'মানুষের ব্যবহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান' দিলে সঙ্গত হয়।...অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার মত, মানুষকে বাইরের দিক থেকে বস্তুগত ভাবে আলোচনা করা যায়। সে কি অবস্থায় কি করে, এ কথা আলোচনা করলেই তাকে আমরা বুঝতে পারি। এদিক থেকে দেখলে মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সমস্ত কর্ম ও ব্যবহারকে বুঝতে চেষ্টা করা।"[১৮]

১৬ Watson—Behaviourism.

১৭ Watson—Behaviour : An Introduction to comparative psychology.

১৮ Pillsbury—Essentials of Psychology.

ক্যাটেল (Cattel), টিচ্‌নার (Titchener), ম্যাকৃডুগ্যাল্ (Mcdougall), থর্নডাইক্ (Thorndike), স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford), ল্যাস্‌লী (Lashley), উডওয়ার্থ (Woodworh),—অর্থাৎ, বর্তমান যুগের প্রধান মনোবিজ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা সবাই অল্পবিস্তর ব্যবহারবাদকে স্বীকার করে দিয়েছেন। আমরা যাকে মানুষের প্রক্রিয়া বলি, সেগুলি জীবধর্মেরই রূপ। জীবনের লক্ষণই হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম ও সহযোগিতার পথে জীবদেহের বোঝাপড়া (adjustment to the environment)। কাজেই মানুষের মনের সম্যক্ পরিচয় পেতে হ'লে, তার দেহের বাহ্য ও অন্তরের প্রতিক্রিয়া এবং পরিবর্তনগুলি বোঝা নিতান্ত দরকার। কিন্তু তা বলে দৈহিক প্রতিক্রিয়া আর মানসিক প্রক্রিয়া কি একই জিনিষ? দেহবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞানে কোন তফাত নেই? এই জড়বাদী ও যান্ত্রিক সিদ্ধান্তই কি সকলে মেনে নিয়েছেন? যখন আমি রাগ করি, তখন আমার পেশী, রক্তসঞ্চালন, দেহের উত্তাপ ইত্যাদির পরিবর্তন সব যদি বিবৃত করা হয় তবেই কি আমার 'রাগ' জিনিষটার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়ে গেল? আমি প্রত্যক্ষভাবে যা অনুভব করি, যা বোধ করি, সেটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দিয়ে মাপা যায় না বলেই কি তা মিথ্যে? বাস্তবিকপক্ষে গোড়া ব্যবহারবাদীরা এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি। 'মন' এবং 'চেতনা'কে মনোবিজ্ঞান থেকে বাদ দেবার উৎসাহে তাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যকেও অস্বীকার করলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠতম মননক্রিয়া হচ্ছে বস্তুবরহিত চিন্তা (abstract thinking), তাকেও তাঁরা উড়িয়ে দিলেন 'বাগযন্ত্রের অস্ফুট কণ্ডুয়ন' বলে—thought is but subvocal speech। জেমস্ (James) 'মনোবিজ্ঞান মনবস্তুর স্বরূপ নির্ণয়' এ মতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, এবং অনুভূতির (emotion) ব্যাখ্যাও শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির পরিবর্তন সাপেক্ষ, এমন মত সকলে প্রচার করেছিলেন। কাজেই, তিনি মূলতঃ ব্যবহার-বাদীদের সমধর্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই একথা মেনে নিতে পারেন নি, যে মন একটা জড়বস্তু, এবং মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে নিজস্ব কোনো বেগে সংযুক্ত হয়। তিনি চেতনাকে তুলনা করেছেন বহমান স্রোতস্বতীর সঙ্গে, তিনি বলেছেন চেতনার স্রোত (stream of consciousness)। মনকে তিনি কর্মগতিবহুল ও জীবন্ত বলেই স্বীকার করছেন। মনে পড়ে আমাদের অ্যারিস্টটলের কথা, 'মন একটা পদার্থ নয়, মন হচ্ছে কতগুলি প্রতিক্রিয়া।' বাস্তবিক পক্ষে ব্যবহারবাদীরাও এক ধরনের অনুষঙ্গবাদী।

তাঁদের কাছে মনে হচ্ছে কতগুলি উত্তেজক (stimulus) এবং প্রতিক্রিয়ার (reaction) সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই উত্তেজক এবং প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধন কি করে হয়? একটা সংযোগের জীবন্ত সূত্র না থাকলে মানুষের মন তো অর্থহীন। একজন জীবন্ত ইচ্ছাসম্পন্ন সক্রিয় ব্যক্তির ব্যবহার হিসাবেই ব্যবহারগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। একথাটাই ওয়ার্ড (Ward) বলেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন 'মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি কেন্দ্রিক'—"The science of psychology is individualistic"। ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন, সুখ, দুঃখ, আশা, ইচ্ছার কোন মানে হয় না। তার অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করেই তার বর্তমানের কোন মানসিক প্রক্রিয়াকে আমরা বুঝতে পারি। জেমস এ কথাটা বলেছিলেন, এ ভাবে—"প্রত্যেকটি চেতনক্রিয়াই আপেক্ষিক, একদিকে তা অপেক্ষা রাখে একজন ব্যক্তির, অন্যদিকে অপেক্ষা রাখে তা অন্য আর একটি চেতন ক্রিয়ার"।[১৯] ম্যাকডুগ্যাল একজন পাকা ব্যবহারবাদী, কিন্তু তিনিও ওয়াট্‌সনের উগ্র ব্যবহারবাদকে সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন ব্যবহার একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়—জীবন্ত প্রাণীর ব্যবহার আর জড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াকে ঠিক একভাবে দেখা যেতে পারে না। প্রাণীর ব্যবহারের এটাই বিশেষ লক্ষণ যে তা উদ্দেশ্যমুখী (purposeful), কাজেই তিনি মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিলেন "মনোবিজ্ঞান হচ্ছে উদ্দেশ্যমুখী ব্যবহারের শাস্ত্র"—"ব্যবহারের চিহ্ন হচ্ছে যে তাতে উদ্দেশ্যের লক্ষণ, অথবা উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে আগ্রহ বা চেষ্টা স্পষ্ট দেখা যাবে। আর জীবিত প্রাণীরই এটা ধর্ম যে তার 'ব্যবহার' (behaviour)।"[২০] তিনি জড়বস্তু আর জীবিত প্রাণীর ব্যবহারে পার্থক্য খুব স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন। "বিলিয়ার্ড খেলার একটা গোলক পকেট থেকে তুলে টেবিলের উপর রাখা যাক্। গোলকটি সেখানেই থাকবে, যতক্ষণ না বাইরের থেকে তার উপর কোন শক্তি ক্রিয়া করে। যদি কোন দিকে গোলকটিকে ধাক্কা দেওয়া যায় সেটা গড়াতেই থাকবে, যতক্ষণ না ধাক্কার শক্তিটা ফুরিয়ে যায়, অথবা টেবিলের ধারের কুশনে লেগে অন্যদিকে না

১৯ All states of consciousness are relative,—relative to a subject and relative also to other states of consciousness. Wm games—Principles of Psychology.

২০ Ward—Psychological principles. "Psychology is the science of purposeful behaviour" "The manifestation of purpose or the striving to achieve an end is, then, the mark of behaviour; and behaviour is the characteristic of living things."

যায়। গোলকের গতিপথ বাইরের শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট। এটা হচ্ছে জড়ের যান্ত্রিকক্রিয়ার লক্ষণ। এর সঙ্গে এবার জীবিত প্রাণীর ব্যবহারের তুলনা করা যাক্।...ধরা যাক্, একজন মানুষ যে তার দেশকে ভালবাসে, জীবিকার্জনের জন্যে তাঁকে দূর দেশে চাকুরী নিতে হয়েছে।...তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজ দেশে ফিরে গিয়ে নিজের একটি বাড়ী তৈরী করবার মত যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করা; তাঁর সমগ্র কর্ম এই একটি উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"[২১]

তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন মানুষের ব্যবহারের সম্পূর্ণ যান্ত্রিক-ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। "এ ব্যক্তির ব্যবহারের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কখনই সন্তোষজনক হ'তে পারে না। এ ব্যাখ্যায় মানুষের প্রাণবন্ত ব্যবহার বুঝবার সাহায্য হয় না এবং তা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হয় না।"

ওয়াট্‌সন্ মনোবিজ্ঞানে অন্তদর্শন (introspection) এর পন্থা সম্পূর্ণ পরিহারের পক্ষপাতী। তাঁর পূর্বে ভুণ্ড (Wundt) এবং টিচনার প্রভৃতি অন্তদর্শনের নানা অসুবিধাব কথা আলোচনা করেছিলেন এবং এই প্রত্যক্ষ পন্থায় যে মালমশলা পাওয়া যায় তার বৈজ্ঞানিক মূল্য অনেক সময় সন্দেহজনক, এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু তথাপি এ পন্থায়ই মনের খবর সোজাসুজি পাওয়া যেতে পারে। তাই মনোবিজ্ঞানে এ পন্থা অপরিহার্য, এটা বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াট্‌সন্ একেবারেই এ পন্থাকে বাতিল করে দিলেন। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা ব্যবহারবাদে বিশ্বাসী হ'লেও এবং বস্তুগত অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষণের উপর জোর দিলেও অন্তঃবিশ্লেষণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি। ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেছিলেন, "মনোবিজ্ঞান শুধু চেতনক্রিয়ার বিজ্ঞান এই সংকীর্ণ ও অফলপ্রসূ ধারণা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে না থেকে, মনোবিজ্ঞানীকে সাহস করে এ দাবী করতে হবে যে মনোবিজ্ঞান মনের পরাবিদ্যা; এ আলোচনা করবে মনের সমস্ত দিক, সমস্ত ক্রিয়া।"[২২]

এই "সমস্ত দিক্, সমস্ত ক্রিয়া" বলতে তিনি অন্তর্দর্শন দিয়ে যে মালমশলা পাওয়া যায়, তা বাদ দেন নি। অনুরূপভাবে উড্‌ওয়ার্থ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন "ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার সম্যক্ আলোচনা"—the science of the activities of the individual."। এবং তার পরেই 'ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া' কথাটাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন "এতে শুধু তার বিভিন্ন শরীরক্রিয়া, যেমন হাঁটা,

২১ Mcdougall—Psychology. p. 21. 23.

২২ Mcdougall—Psychology.

কথা বলা ইত্যাদিই বোঝায় না, তার জ্ঞান বা বোধের বিভিন্ন ক্রিয়া যেমন, দেখা, শোনা, মনে রাখা, চিন্তা করা, এবং অনুভূতির বিভিন্ন ক্রিয়া যেমন, হাসি, কান্না, সুখী হওয়া, দুঃখিত হওয়াও বোঝায়"।[২৩]

মনোবিজ্ঞান শুধু মাত্র শারীরবিদ্যা নয়। মনের আলাদা একটা সত্তা আছে, এ কথাও উড্‌ওয়ার্থ স্পষ্টভাষায়ই বলেছেন, "আমরা যদি মনোবিজ্ঞানে মানুষের 'ব্যবহার'এর ব্যাখ্যা খুঁজি, তবে কি এ বিষয়ে যতটা জানা সম্ভব, তা আমরা শারীরবিদ্যার (physiology) কাছ থেকেই পেতে পারি না? যদি ব্যক্তির ক্রিয়াগুলিকে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াতেই সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা যায়, তবে ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে আলোচনার আর প্রয়োজন কি? এর উত্তর হচ্ছে, শারীরবিজ্ঞান আমরা যা জানতে চাই তার একটা অংশের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দেয় মাত্র। আমরা জানতে চাই সমগ্র ব্যক্তিকে। এ ব্যক্তি ভালবাসে, ঘৃণা করে, সাফল্যলাভ করে বা অকৃতকার্য হয়, এ ব্যক্তি অপর দশ জনের সঙ্গে নানা কর্মের দ্বারা যুক্ত হয়, মোটামুটিভাবে সুখ ও সাফল্যের সহিত তার পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারে। তার চারপাশে যে জগৎ আছে, তার সঙ্গে সমগ্রভাবে ব্যক্তিটি বিবিধ ও বিচিত্র সম্বন্ধ ও প্রতিক্রিয়া দিয়ে যুক্ত, এবং এই ব্যক্তিটির এই বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমগ্রভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। মনোবিজ্ঞান এই বিশেষ দায়িত্বটি গ্রহণ করে। তার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত সম্পর্কের আলোচনা।" অন্তর্দর্শন প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শন মানে নিজের নানা সাংসারিক অশান্তি নিয়ে একা বসে চিন্তা করা নয়, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নানা দুঃশ্চিন্তা ভোগ করাও নয়। এমন কি, এর উদ্দেশ্য নিজের কৃতকর্মের একটা সুব্যবস্থা করবার চেষ্টাও নয়। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের একটা বিশিষ্ট রূপ।"[২৪]

কাজেই দেখা যাচ্ছে—মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রথম ছিল আত্মার বস্তুর সন্ধান, তারপর হোল 'মনের স্বরূপ নির্ণয়,' তারও পরে হোল 'চেতন প্রক্রিয়াসমূহের আলোচনা'। বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি সংজ্ঞাটার ঝোঁক হচ্ছে মানুষের 'ব্যবহারের' আলোচনার দিকে, কিন্তু সে সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না।

২৩ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 4.

২৪ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 4.

মনোবিজ্ঞানের গতির যে ধারার বিবরণ দেওয়া হ'ল তাকে একটি পরিহাস রসপূর্ণ ছত্রে এক মনোবিজ্ঞানী প্রকাশ করেছেন—"প্রথম মনোবিজ্ঞান হারালো তার আত্মা, তার পর হারালো তার মন, তার পর চেতনা ; তবে এখন পর্যন্ত তার 'ব্যবহার'টা রয়ে গেছে।"[২৫]

বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানের ধারার আলোচনায় আর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—এ হচ্ছে জেস্টল্ট সমগ্রবাদী মনোবিজ্ঞান (Gestalt psychology)। সমগ্রবাদ প্রচলিত অনুষঙ্গ মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। মন কতগুলি খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র, এ মত তাঁরা একেবারেই গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে মনের ধর্ম হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সমগ্রতাকে খোঁজা। খণ্ড-সমগ্রতার থেকে বৃহত্তর সমগ্রতার দিকে তার গতি। গতিপরায়ণতা এবং অখণ্ড সমগ্রমুখীনতা হচ্ছে মনের বিশিষ্ট লক্ষণ। "সমগ্রবাদীরা অনুষঙ্গবাদীদের পরম বিরোধী। এদের মতে খণ্ড খণ্ড চেতনার কোন অস্তিত্ব নেই। চেতনার সমগ্রতাকেই কেবল আমরা জানি। চেতনার খণ্ডাংশগুলির কোন অস্তিত্ব নেই, আর যদিই বা থাকে, যে সমগ্রের তারা অংশ, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত ও সংযুক্ত হয়েই তাদের তাৎপর্য।"[২৬] সুতরাং মনোবিজ্ঞান হচ্ছে, মনের এই ধর্মের বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা।

বর্তমান যুগ যেমন মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানও তেমনি মানুষের মনকে মর্যাদা দিয়েছে। সে অসীম শ্রদ্ধাভরে অপরিসীম ঔৎসুক্য নিয়ে মানুষের শিশুকাল, এমন কি ভ্রূণস্থ অবস্থা থেকে বার্ধক্য এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত মনের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি জানতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে। সে পাপী বলে চোরকে ঘৃণা করে না, উন্মাদ বলে অপ্রকৃতিস্থকে দূরে রাখে না। স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, শিশু ও বয়স্ক, চেতন ও অবচেতন মনের সমস্ত অবস্থাকেই সে সমান আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে। বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সে বিশ্বাসী, তাই কত সহস্র রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে মানুষের মন নিয়ে হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। তার ফলে, গত পঞ্চাশ বছরে এই বিজ্ঞানে যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে, তা বিগত দুই হাজার বছরেও হয়নি। যত নূতন পরীক্ষা ও আলোচনা হচ্ছে ততই এ বিজ্ঞানের নূতন নূতন দিক আবিষ্কৃত হচ্ছে, নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে।

---

২৫ "First, psychology lost its soul, and then it lost its mind ; then it lost consciousness. It still has behaviour of a kind. Quoted by Woodworth—Psychology.

২৬ Woodworth—Contemporary Schools of psychology.

এ-যুগ অহংকার করে বলেনি "সব জানা হয়ে গেছে"। বরং পূর্বের চেয়ে যতই জ্ঞানবৃদ্ধি হচ্ছে, ততই সে জানছে আরো অনেক অজানা রয়ে গেল। বিভিন্ন বিজ্ঞান যথা, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির সঙ্গে এই বিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্কের কথা ক্রমেই অধিকতর বোঝা যাচ্ছে, আর তাই এ বিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশঃই জটিলতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। এ যুগ ক্রম-বিবর্তনবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়াছে। শুধু বিশ্লেষণ নয়, বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করার দিকে ঝোঁক এসেছে। মনোবিজ্ঞানকে এ যুগ কেবল মাত্র তথ্য আহরণের দিক থেকে বাড়িয়ে তোলেনি, এর ব্যবহারিক মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে ও মনোবিজ্ঞানী সচেতন হয়ে উঠেছেন। এ বিজ্ঞানের ব্যাপকতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা আলাদা আলাদা করে আলোচনার (specialisation) প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কাজেই মনোবিজ্ঞানও বহু শাখায় বিভক্ত হয়েছে। তার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হোল।

সাধারণ মনোবিজ্ঞান (General Psychology)—সুস্থ ও পরিণত বয়স্ক মানুষের মনের প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ জানতে সাধারণ ভাবে চেষ্টা করে, এবং মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে চায়।

বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান (Analytical Psychology)—মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ করে, তাদের স্বরূপ, সম্বন্ধ ও পরিণতি আলোচনা করে থাকে।

শিশু মনোবিজ্ঞান (Child Psychology)—শিশু মন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করে এবং শিশু প্রকৃতি নিরূপণ করতে চেষ্টা করে। শিশুমন বয়স্ক মনের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র এ ধারণা সত্য নয়। শিশুর মনের রীতি অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক মনের চেয়ে ভিন্ন। অপরিণত বুদ্ধি, বিকৃত বুদ্ধির শিশুর মন এবং যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলো না তাদের মন সম্বন্ধে আলোচনা, এ বিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উৎপত্তি অনুসন্ধানী মনোবিজ্ঞান (Genetic Psychology)—মনের প্রক্রিয়াকে স্থিতিশীল অবস্থা মনে করে না এবং তাহাদের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয় না। এ বিজ্ঞান মানব মনের প্রক্রিয়াগুলির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ কি করে হয়, তা পরীক্ষা করে। বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানের এই আলোচনার ধারা উল্লেখযোগ্য।

তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান (Comparative Psychology)—মানুষের মনকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করে না। পশুর মনের সঙ্গে তার একটা ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের সংযোগ আছে। তাই মানুষের মন বুঝতে মনোবিজ্ঞানের এ শাখা পশুর মন নিয়ে নানা পরীক্ষায় রত আছে। এতে অনেক মূল্যবান্ তথ্য জানা গেছে। এ মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে থর্নডাইক (Thorndike), কয়হ্‌লার (Kohler), প্যাভ্‌লভ্ (Pavlov) এঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধি (Intelligence), শিক্ষা (Learning) ইত্যাদি অনেক মূলসূত্র ইতর জন্তুদের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে।

বিকৃত মনের বিজ্ঞান (Abnormal Psychology)—অসুস্থ দেহ যন্ত্রের আলোচনা ও পরীক্ষা দ্বারা সুস্থ দেহের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। তেমনি মানুষের মনের অনেক খবর জানা যায়, অসুস্থ মনের পরীক্ষা দ্বারা : ফ্রএড্ এ পথে অগ্রসর হয়ে, যে সব বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌছেছেন তাতে মনোবিজ্ঞানের চেহারা বদলে গেছে। তা ছাড়া, অসুস্থ ও বিকৃত মনের আলোচনার নিজস্ব মূল্য আছে। মনস্তত্ত্বের ব্যাপকতর জ্ঞানলাভে মানসিক ব্যাধির সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।

পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology)—মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে ক্রমেই নানা রকম পরীক্ষণ সম্ভব হচ্ছে এবং এর দ্বারা এ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে, মনোবিজ্ঞানের এ শাখা মনের নানাবৃত্তি ও প্রক্রিয়ার পরিমাণগত মাপ নির্ধারণ করার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা কচ্ছে, অনেকটা সফলও হয়েছে।

শিল্প ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology and Industrial Psychology)—শিক্ষার ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের নিয়মগুলি ব্যবহারের বিরাট সুযোগ রয়েছে। বর্তমান মনোবিজ্ঞান ব্যবহারিক। মনোবিজ্ঞান যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে, শিক্ষাবিদ্‌দের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফল সংগ্রহ করে। শিশু কি করে শেখে, কি করে সহজে মনঃসংযোগ হয়, কি করে মনে রাখা যায়, এ সব প্রশ্নের উত্তর সকল মানুষের কাছেই মূল্যবান। এ সব প্রশ্নের আলোচনা, বিশেষ ভাবে মনোবিজ্ঞানের এই শাখাতে করা হয়। শিল্প, বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নানা মূল্যবান পরীক্ষা চলেছে। কেন ক্লান্তি হয়, বিরক্তির কারণগুলি কি, উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা ও গতি কি করে বাড়ান যায়, কি করে শ্রমিকদের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়,

অপচয় নিবারণে উৎসাহিত করা যায়, পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রম-ক্ষমতার সম্বন্ধ, এ সব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করা হচ্ছে, এবং তাদের কাজে লাগান হচ্ছে।

বলাই বাহুল্য, মনোবিজ্ঞানের এ শাখাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিপরীত নয়। অধিকতর ফল লাভের জন্য মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শ্রেণীর ঘটনাগুলিকে বিভিন্ন বিজ্ঞানে ভাগ করা হয়েছে। এদের সমন্বয়ে সমগ্র মানুষের মনকে জানবার চেষ্টা চলছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি

The Methods of Psychology

নদীর উপর একটা পুল তৈরী হবে। বৈজ্ঞানিককে জানতে হবে নদীর স্রোতের বেগ বিভিন্ন ঋতুতে কতটা, জোয়ার ভাটায় জল কতটা বাড়ে কতটা কমে, বর্ষাকালে নদীর বিস্তার কত, যখন শীতকালে জল নেমে যায় তখনই বা বিস্তার কতটা ; নদীর তলদেশে যে মাটি সেটা কতটা মজবুত, কতটা সে ভার সইবে। নদীর তীরের মাটির শক্তিই বা কতটা ; কতটা তফাত শক্তির তারতম্যে। বৈজ্ঞানিক এ সব তথ্য জানবেন কি করে ? বিভিন্ন তিথি, বিভিন্ন ঋতুতে নদীর জল সম্বন্ধে নানা সূক্ষ্ম ও নির্ভুল মাপ ইত্যাদি করতে হবে। এই যে সতর্ক মাপজোখ, একে বলে পর্যবেক্ষণ—obeservation। শুধু উপর উপর দেখা নয়, মনোযোগ দিয়ে দেখা। পর্যবেক্ষণ হচ্ছে প্রাকৃতিক দ্রব্য বা ঘটনার সযত্ন প্রত্যক্ষীকরণ—Observation is careful perception of facts or phenomena, presented in nature। এখানে ঘটনার উপর আমাদের হাত নেই, যে অবস্থার মধ্যে ঘটনা ঘটেছে, তাও আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। এ হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চার একটা প্রধান উপায় (Method)।

আবার পরীক্ষা করে দেখা গেল যেখানে হাওয়া আছে সেখানে শব্দ শোনা যায়। কিন্তু সব অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে শুধু হাওয়াটুকু সে স্থান থেকে নিঃশেষে সরিয়ে নেওয়া যাক্। এবার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, যদিও আগের মতই ঘণ্টাটা জোরে জোরেই নড়ছে। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল বাতাসই হচ্ছে শব্দের বাহন। একে বলে পরীক্ষা (experiment)। এখানে ঘটনা ঘটেছে আমাদের চেষ্টার ফলে, এখানে ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে আমাদের হাতে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছিবার এ হচ্ছে আর একটি মূল্যবান্ উপায়।

সমস্ত বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে এ দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। মনস্তত্ত্বকে আমরা বলি বিজ্ঞান। তাহ'লে এ বিজ্ঞানেও চাই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা।

কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের তফাৎ আছে। নদীর স্রোতকে দেখা যায়, মাপা যায়, কিন্তু মানুষের মনের গতি ও পরিবর্তন তো বাইরে থেকে দেখা যায় না। তোমার মন তো আমার কাছে প্রত্যক্ষগম্য নয়, তোমার কল্পনা, তোমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, তোমার বিরক্তি, বিদ্বেষ, প্রীতি বা ভালবাসা আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাকে জানতে পারি গৌণভাবে, তোমার হাবভাবের মধ্য দিয়ে, তোমার কথা বা লেখা থেকে। প্রত্যেক মানুষের কাছে তার নিজের মনটাই প্রত্যক্ষ। তাই মনোবিজ্ঞানের একটি পদ্ধতি হচ্ছে নিজের মনকে প্রত্যক্ষভাবে জানা। একে বলে—অন্তর্দর্শন (introspection)। মন এখানে নিজের দিকেই দৃষ্টি ফিরিয়েছে। আমি আমার মনের বিভিন্ন ভাব লক্ষ্য করছি, তুমি তোমার মনের ভাব প্রত্যক্ষ কচ্ছ, সুরমা তার মনকে বিশ্লেষণ কচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান তো ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠতে পারে না। সেটা সর্বজনস্বীকার্য (universal) হওয়া চাই। মনোবিজ্ঞানে তা সম্ভব হবে কি করে? বহু ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলনা করলে দেখা যাবে, একই জাতীয় অভিজ্ঞতা সব মানুষেরই হয়, যেমন সবারই রাগ হয়। অবস্থার খুটিনাটি তফাৎ হবেই, তবু তুলনা করলে দেখা যাবে, যখন আমাদের রাগ হয়, তখন কতগুলি অবস্থা (conditions) সব ক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকে। এমনি করে বহুলোকের রাগ, দুঃখ, কল্পনা, স্মৃতি, বোধ ইত্যাদি তুলনা করলে, মনের কতগুলি রীতি (laws) আবিষ্কার করা যায়। ওয়ার্ড বলেছেন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তার মানে হচ্ছে কোন মানসিক প্রক্রিয়া বুঝতে গেলে, তা ব্যক্তিবিশেষের জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই বুঝতে হয়। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ব্যক্তির সমগ্র মানস-প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য কোন প্রক্রিয়া অর্থহীন। এ কথা সত্য, কিন্তু তার মানে এ নয় যে মানব-প্রকৃতির মধ্যে কোন মিল নেই, মনোজগতে কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি (laws, principles) নেই। বাস্তবিক পক্ষে মানব-প্রকৃতির মধ্যে মিল, বা মানুষের মনোজগতের নীতি আবিষ্কারই মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এবং তা আবিষ্কার করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে অন্তর্দর্শন (introspection)। আর একটা পথ হচ্ছে মানুষের হাবভাব, দৈহিক পরিবর্তন, বাক্য বা কার্য পর্যবেক্ষণ করে গৌণভাবে তার মনকে জানতে চেষ্টা করা। যেমন, রাগ হ'লে তা বোঝা যায় মানুষের ব্যবহারে, তার ভাব-ভঙ্গী, কথা-

বার্তা, কাজের মধ্য দিয়ে। এটা হচ্ছে মনের বহিরঙ্গ। এ পথকে তাই বলা যায়—বহির্দর্শন বা বাইরের থেকে দেখা—(**method of extrospection** বা **method of external observation**) এটা অবশ্যই অন্তর্দর্শনের উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া পরীক্ষাও যে একেবারে সম্ভব নয়, তা নয়। গজ, ফুট বা সের ছটাক দিয়ে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে মাপা যায় না সত্য, কিন্তু পরীক্ষণ (**experiment**) এর যেটা মূল কথা,—সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে একটি অবস্থার পরিবর্তন করে, ফলে (**effect**) কি পরিবর্তন হয়, তা সাবধানে লক্ষ্য করা,—তা কিছুটা পরিমাণে মনের বেলায়ও ব্যবহার করা চলে। উত্তেজক ইন্দ্রিয়ে এসে আঘাত করার কতক্ষণ পরে বোধ জন্মে (**reaction-time experiment**), কতটা জিনিষে এক সঙ্গে মন দেওয়া যায় (**span of attention experiment**), পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে শেখাটার কতটুকু উন্নতি হয় (**experiment on improvement of learning by repetition**), স্মৃতিশক্তির উন্নতি সম্বন্ধে পরীক্ষা (**experiments on the improvement of memory**)—এ রকম বহু পরীক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা করেছেন, এবং তার ফলে মন সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আহরণ করা গেছে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞানের ঝোঁকই হচ্ছে, পরীক্ষণের দিকে, এবং মনোবিজ্ঞানেও এই পদ্ধতিটি ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার কচ্ছে।✓

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে অন্তর্দর্শন-এর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানীরা এ পদ্ধতির নানাবিধ অসুবিধা ও ত্রুটি সম্বন্ধে বেশী সচেতন এবং ব্যবহারবাদীরা এ পদ্ধতি একেবারেই বর্জনের পক্ষপাতী। এ পদ্ধতির ত্রুটিগুলি বিবেচনা করা যাক্।

১। এ পদ্ধতি অনুসারে মন নিজেই দ্রষ্টা (observer) ও দৃশ্য (observed)। মন এখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নিজেই নিজেকে দেখছে—এটা অসম্ভব বলেই কেউ কেউ মনে করেন। অসম্ভব না হলেও কাজটা যে কঠিন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এটার জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন। স্টাউট (Stout) বলেন, "এতে মনকে দুইটি জিনিষে যুগপৎ ভাগ করতে হয়, এক হোল মনের প্রক্রিয়া (process), দ্বিতীয় হচ্ছে বিষয় (object)"। এর অসুবিধা সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে "যদিও অন্তর্দর্শন পদ্ধতি কঠিন, কিন্তু তা অসম্ভব নয়, এবং এর ত্রুটিগুলি দুরারোগ্য নয়।"[১]

---

১ **Stout—Manual of Psychology. P. 44.**

২। মনের কোন প্রক্রিয়ার দিকে মন দিতে গেলে, সে প্রক্রিয়াটির স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ধর, তুমি খুব রাগ করেছ, তখন যদি এই রাগটা কেমন, তা জানবার কৌতূহল হয়, তা হ'লে রাগ আর থাকে না, হয়তো হাসি পেয়ে যায়। কাজেই যে মুহূর্তে রাগ কচ্ছি, সেই মুহূর্তেই রাগটা কেমন, তা দেখা চলে না। জেমস্ বলেন, "এসব ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শনের বিশ্লেষণ হচ্ছে একটা ঘুরন্ত লাট্টুর ঘুরণটা কেমন, তা দেখবার জন্যে খপ করে সেটা হাতে তুলে নেওয়ার মত, অথবা অন্ধকারটা কেমন, তা দেখবার জন্যে টপ করে আলোটা জ্বেলে দেওয়ার মত।"[২] তাই অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন আমরা অতীত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি স্মরণ করতে পারি (retrospection), কিন্তু বর্তমান মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যথাযথ পর্যবেক্ষণ করা খুবই কঠিন।

৩। ব্যবহারবাদীরা বলেন অন্তর্দর্শন পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য নয়, এবং এর উপরে ভিত্তি করে যে মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠে তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বাইরের কোন ঘটনা দশ জনে দেখলে,—কতক্ষণ পরে যদি এই দশজনকে তাঁদের মন থেকে ঘটনার বিবরণ দিতে বলা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে তাদের বিবরণে পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। এ সম্বন্ধে একটা মজার পরীক্ষার উল্লেখ করা যাচ্ছে। "গোটিন্‌জেন্ সহরে মনোবিজ্ঞান মহাসভা (Psychological Congress) বসেছে। হঠাৎ সভাগৃহে দৌড়ে একটি ক্লাউন্ ঢুকলো, আর ঠিক তার পিছনে ছুটে আসলো একটি নিগ্রো। নিগ্রোটি ক্লাউনকে ধরে তার উপর লাফিয়ে পড়ল, এবং তাকে মেঝেতে ফেলে চেপে ধরল। একটা ধস্তাধস্তি চললো এবং একটি পিস্তলের গুলি শোনা গেল। ধস্তাধস্তি তখন শেষ হয়েছে। এর পর ক্লাউনটি মাটি থেকে উঠে ঘর থেকে সবেগে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তার পিছে পিছে নিগ্রোটিও ছুটল। এই সমস্ত ঘটনা পূর্ব থেকেই শেখানো ছিল এবং তার ফটোও আগেই তোলা ছিল। এবং ঘটনাগুলি ঘটতে মোট বিশ সেকেণ্ড-এরও কম সময় লেগেছিল। সভাপতি এবার সমবেত মনোবিজ্ঞানীদের জানালেন যে ঘটনাটি সম্পর্কে ফৌজদারী মামলা করা প্রয়োজন হতে পারে কাজেই তিনি অনুরোধ করলেন, যাতে উপস্থিত সভ্যরা প্রত্যেকেই যেন ঘটনার একটা বিবরণ লিপি পাঠান।

২ "The attempt at introspective analysis in these cases is, in fact, like seizing a spinning top to catch its motion, or trying to turn up the gas quickly enough to see how the darkness looks." James—Principles of Psychology.

চল্লিশটি বিবরণ পাওয়া গেল। এগুলির মধ্যে মাত্র একটি বিবরণী পাওয়া গেল, যাতে মূল ঘটনা সম্বন্ধে শতকরা কুড়িটির কম ভুল আছে। চৌদ্দটি বিবরণীতে ভুলের সংখ্যা, শতকরা কুড়ি থেকে চল্লিশ। তেরোটি বিবরণীতে ভুলের সংখ্যা, শতকরা পঞ্চাশের বেশী। চব্বিশটিতে, শতকরা দশটি এমন ঘটনার উল্লেখ ছিল, যা নিতান্তই কল্পনা-প্রসূত। বাস্তবিক পক্ষে দশটি বিবরণ ছিল নিতান্তই মিথ্যা, একেবারে কাহিনীর পর্য্যায়ের, চব্বিশটি ছিল অর্দ্ধ-কাল্পনিক, আর ছটিকে বলা যেতে পারে, ঘটনার সত্য বিবরণ হিসাবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।"[৩]

বাইরের ঘটনা সম্পর্কেই যদি আমাদের স্মৃতি এত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য, তাহ'লে আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে অন্তর্দর্শন আরো অনেক কম নির্ভরযোগ্য। কারণ এখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি ও ধারণা আমাদের দেখার উপর প্রভাব বিস্তার করবেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক, তা ব্যক্তিগত ধারণার (personal factor) প্রভাবমুক্ত হওয়া চাই। যিনি মনোবিশ্লেষণে যত পটু তিনিই ভুল করবেন তত বেশী, কারণ তিনি মনের প্রক্রিয়ার মধ্যে যা দেখতে ইচ্ছুক, বা যা দেখতে আশা করেন তাই দেখতে পাবেন। জোড্ (Joad) বলেছেন, এই কারণে ব্যবহারবাদীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে অন্তর্দর্শনপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।[৪]

ব্যবহারবাদীরা বলেন, মন ব'লে যদি কিছু পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তা হচ্ছে বিভিন্ন নির্দিষ্ট অবস্থায় মানবদেহের বিভিন্ন পরিবর্তন বা ব্যবহার। দেহের বিভিন্ন ব্যবহার পর্যবেক্ষণ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তার উপরে নির্ভর করে মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠবে। জৈবিক নানা পরিবর্তন, যেমন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, রক্তের চাপ, দেহের উত্তাপ ইত্যাদিই হচ্ছে ব্যবহার। এদের মাপা যায়, পর্যবেক্ষণ করা যায়, অনেক সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে বাড়ানো কমানো যায়। তাই এরাই হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য। (বাস্তবিক পক্ষে ব্যবহারবাদীরা 'মন' বলে কোন পদার্থ, বা মানসিক প্রক্রিয়া ব'লে কোন

৩ Walter Lipptman—Public Opinion.

৪ "The more psychology you know, the more certainly will you find what you expect to find, with the result that introspection has been chiefly used to provide psychologists with data for the theories of mind in the interests of which they resorted to introspection. Results of this kind are of course, completely unscientific. C. E. M. Joad—The Mind and its Workings, P. 29

প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।) কাজেই তাঁদের মতে, অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিজ্ঞানেরও পদ্ধতি হচ্ছে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ, তা সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ (objective) এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, খামখেয়ালীপনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত (free from subjective bias).

ব্যবহারবাদীদের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। অন্তর্দর্শন অসম্ভব কিনা, সেটা প্রত্যেকেই পরীক্ষা করে দেখতে পারে, এবং এটা যে সম্ভব এ বিষয়ে খুব বেশী মতভেদ আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, এর সুবিধা হচ্ছে মনো-বিজ্ঞানীর কথা সত্য কি মিথ্যা, সেটা নিজেদের মন দিয়েই আমরা অনেক সময় বিচার করতে পারি। দেহের পরিবর্তনটাই কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের বস্তু, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিগুলি বস্তুগত ও সত্য নয়, এ যুক্তি খুব ভালো বলে আমরা মানতে পারি না। রাগটা শুধুই দৈহিক ব্যাপার, এতে 'মানসিক' কিছু নেই, এ দাবীর মধ্যে যুক্তির চেয়ে জবরদস্তি বেশী। তাই অন্তর্দর্শন এর অসুবিধাগুলো মেনে নিয়েও, একে সম্পূর্ণ অস্বীকার আমরা করি না। অন্তর্দর্শনকেও তাই আমরা মনোবিজ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বলে মনে করি। এ বিষয়ে আমরা জেমস্ ষ্টাউট, উডওয়ার্থ এর মত অনুসরণ করি। উডওয়ার্থ বলছেন, "আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অন্তর্দর্শন বাদ দিতে পারি না, কাজেই মনোবিজ্ঞান থেকেও একে বাদ দেওয়ার কোন হেতু থাকতে পারে না। অবশ্য এটা সত্য যে অন্তর্দর্শন পদ্ধতিতে নির্ভুল জ্ঞান পেতে গেলে পূর্বে এবিষয়ে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন। কারণ এ পদ্ধতিতে যে উপযুক্ত শিক্ষা পায়নি, সে শুধু তার মনের চিন্তা, অনুভূতি ক্রিয়া যেগুলি ঘটে তার বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হয়না সে সেগুলি ব্যাখ্যা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়।"[৫]

যাক্, (প্রত্যেকের নিজের মনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উপায় হচ্ছে অন্তর্দর্শন।) কাজেই আত্মজীবনী মনোবিজ্ঞানীর কাছে মূল্যবান। বহু ব্যক্তির অন্তর্দর্শনের ফল মিলিয়ে নিলে মনের প্রকৃতি ও নিয়ম আমরা জানতে পারি। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েচে এ পথে অন্যের মনের খবর মিলবে না। সেটা জানতে গেলে অন্যের চোখ, মুখ, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি লক্ষ্য করতে হবে, ব্যবহার দেখতে হবে। এ পথেও অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ এতে মনের খবর পাওয়া যাচ্ছে অপ্রত্যক্ষভাবে। দ্বিতীয়তঃ, সব সময় আমাদের মনের কথা চোখে মুখে প্রকাশ আমরা করি না। কখনো কখনো একই দৈহিক পরিবর্তন দ্বারা বিভিন্ন অনু-

৫ Woodworth Psychology. P. 16.

ভূতির প্রকাশ হয়ে থাকে। তবে বহু জনের ব্যবহার ও দৈহিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করলে, আমরা দেখতে পাই, একই ধরণের মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে একই ধরণের দেহের ভঙ্গী বা পরিবর্তন সংযুক্ত থাকে। তার থেকে মনের ধর্ম আমরা জানতে পারি। বিশেষ বিশেষ মুখভঙ্গী বা দৈহিক পরিবর্তন বিশেষ বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ করে এ কথাটি ভাল অভিনেতা জানেন। এ জ্ঞান মনস্তাত্বিকের কাছেও প্রয়োজন। ফেলেকি (Feleky) তাঁর 'ফিলিংস্ এ্যাণ্ড ইমোশানস্' (Feelings and Emotions) গ্রন্থে এ রকম বহু অভিজ্ঞ অভিনেতাদের দ্বারা অনেক অনুভূতি প্রকাশের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বাইরের দিক থেকে মনকে জানবার আরো অনেক উপায় আছে। একটা উপায় হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনেতিহাস সংগ্রহ (case history)। জীবনী যদি অপক্ষপাত ভাবে লেখা হয়, তা হ'লে তার থেকে মানুষের মনের নানা মূল্যবান তথ্য জানা যেতে পারে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন সাধারণের চেয়ে বেশী জটিল ও উন্নততর বা অধিকতর বিকশিত, কাজেই তাদের মূল্য বেশী। আবার লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কর্মী, সমাজসেবক,—তাঁদের লেখা বা সৃষ্টি বা কর্মের মধ্য দিয়েও গৌণভাবে মানুষের মনের তথ্য আমরা জানতে পারি। তেমনি সমষ্টিগত মানুষের মন তাদের নানা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি, আচার পদ্ধতির মধ্য দিয়েও জানা যায়।

বর্তমানে আর একটি পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেছেন জি এস হল্ (G. S. Hall)। সে হচ্ছে প্রশ্নমালা পদ্ধতি (Questionnaire method)। অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা এ প্রশ্নমালা তৈরী। তার উত্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির বুদ্ধি, রুচি, অনুভূতি ও ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগ ক্রমবিকাশ (evolution) এ বিশ্বাসী। মানুষের মন ইতর জন্তুর মন থেকেই উদ্ভুত, তাই পশু পক্ষীর নানা ব্যবহারের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারাও মানুষের মনের মূল তথ্য অনেক আহরণ করা যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে—থর্নডাইক (Thorndike), কয়হলার (Kohler), এবিংহজ (Ebbinghaus), শেরিংটন্ (Sherrington), প্যাভলভ (Pavlov) ইত্যাদি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা জন্মগত সংস্কার, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পশুর জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছেন।

কাজেই এ সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয় যে, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শন,

বাহ্য পর্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্র বিশেষে, পরীক্ষণ এ তিনটিই প্রধান পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞান দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে শেষোক্ত দুইটি পথ ধরেই, এবং যতই এ বিজ্ঞান অগ্রসর হবে, ততই অন্য বিজ্ঞানের মত এখানেও নূতন নূতন পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কায়দা (technique) আবিষ্কৃত হবে। উডওয়ার্থ এর সাথে আমরা একমত যে "বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। আবার এই বিজ্ঞানের বহুতথ্য পরীক্ষণ এবং ব্যক্তির বিকাশের ধারা অনুসরণ করেও পাওয়া যায়। কিছু মূল্যবান্ তথ্য অন্তর্দর্শনের দ্বারাও পাওয়া যায়। এ পথে ব্যক্তি তার মনের নানা ক্রিয়া লক্ষ্য করে থাকেন। অধিকাংশ তথ্য পাওয়া যায় বাহ্য পর্যবেক্ষণের পথে এবং এ ক্ষেত্রে মানুষের মনের নানা ক্রিয়াকে বস্তুগত ভাবে দেখা হয়।"[৬]

৬ Woodworth Psychology. P. 19.

চতুর্থ অধ্যায়

দেহযন্ত্র

"পড়াশোনায় মন দেব কি? শরীরটাই ভাল থাকছে না। হজম ভাল হয় না, রাত্রে ঘুম হয় না, সমস্তটা দিন য়্যাতো খারাপ লাগে, কোন বইয়ে মন দিতে পারি না, কোন পড়া মনে রাখতে পারি না।"

"তুই বলিস্ শরীরের জন্যে মন, কিন্তু শরীর ভাল থাকবে কি করে, মনে যদি শান্তি না থাকে? চিঠি পেয়েছি বাবার গুরুতর অসুখ, চিকিৎসার টাকা নেই। ছোট ভাইটার নাম কাটিয়ে দিয়েছে, মাইনে বাকী পড়েছে স্কুলে, সেজন্যে। আর একজনকে বড় বিশ্বাস করেছিলাম, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই চূড়ান্ত অপমান করতেও তার বাধলো না। মনে হচ্ছে হাত-পা আমার ভেঙে গেছে। মন ভাল থাকলে, তবে তো শরীর থাকবে।"

হষ্টেলে পরীক্ষার আগে দুটি ছেলের কথোপকথন। দেহ ও মনের সম্বন্ধটা বাস্তবিক কি, এ নিয়ে দার্শনিক পণ্ডিতেরা যত খুসী তর্ক করুন, কিন্তু সাধারণ মানুষ ও শিক্ষাবিদ্ এ বাস্তব কথাটাই মেনে নেন, যে দেহ ও মন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত, একটি আর একটিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। এ জন্যেই শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীকে দেহযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া জানতে হয়। অবশ্য দেহতত্ত্ববিদের মত তাঁরা দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহে উৎসুক নন। মোটামুটি দেহযন্ত্রের ক্রিয়া, বিশেষ করে যেসব মানসিক প্রক্রিয়ার (যেমন প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, অভ্যাস ইত্যাদি) সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তারা কিভাবে দেহযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, এ কথা আমাদের জানা দরকার।

মানুষের ব্যবহার (behaviour) তার মনের পরিচায়ক। এই ব্যবহার প্রকাশের উপায় হচ্ছে মানুষের দেহযন্ত্র—it is a behaving organism. এ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেহযন্ত্রকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করতে পারি—

১। **দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি**—যার মধ্য দিয়ে আমরা দেহের বাইরের ও ভেতরের সব খবর পাই, এদের বলা হয় সংগ্রাহক (Receptors), বা সাংখ্যের ভাষায় বলতে পারি জ্ঞানেন্দ্রিয়।) এদের মধ্য দিয়ে দেহ পরিবেশের জ্ঞান লাভ করে।[১]

[১] "Their function is to receive the stimuli from the environmental world."—Sandiford—Educational Psychology P. 65.

যেমন, চোখ দিয়ে গ্রহণ করি আলো, বর্ণ, আকারের জ্ঞান, কান দিয়ে গ্রহণ করি শব্দ ইত্যাদি।

২। **দেহের পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি**—(যাদের বলতে পারি কর্মেন্দ্রিয়, যার মধ্য দিয়ে দেহের সমস্ত ক্রিয়া ও গতি সম্পন্ন হয়।) এদের তাই ইংরেজীতে নাম দেওয়া হয়েছে Effectors। পেশী (Muscle) দিয়ে আমরা নড়ি-চড়ি, কাজ করি। গ্রন্থি (Gland) গুলির মধ্য দিয়ে দেহের নানারূপ ক্ষরণের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৩। দেহের সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত ক্রিয়ার সংযোগ সাধন করে ও সমন্বয় করে **সমগ্র মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী**। এ অংশকে তাই বলা যেতে পারে—সংযোজক (Connectors)।

কোষ ও তন্তু

Cells and Tissues

মানব দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির বিস্তৃত আলোচনার আগে দেহযন্ত্রের মূল উপাদানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। মানব দেহ লক্ষ কোটি জীব-কোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রাণসম্পন্ন ক্ষুদ্রতম বস্তুর নাম জীবকোষ (cells)। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি যন্ত্র, প্রত্যেকটি অংশ, বিভিন্ন জাতীয় কোষ দ্বারা গঠিত। ত্বক্ ও রক্ত, চক্ষু ও জিহ্বা, অস্থি ও মজ্জা,—এদের প্রত্যেকেরই মূল উপাদান জীবকোষ। কিন্তু ত্বক্ যে জাতীয় কোষ দিয়ে তৈরী, রক্ত ঠিক সে জাতীয় কোষ দিয়ে তৈরী নয়। বিভিন্ন জাতীয় কোষের গঠনভঙ্গী প্রায় একই রকমের। প্রত্যেক কোষের কেন্দ্রে থাকে একটি প্রাণকেন্দ্র (nucleus)। তার চারিদিকে থাকে জালের একটি আবরণ (membrane) ও বালুকণার মত পদার্থ (granules), আর থাকে কোষের পুষ্টি ও স্থিতির সহায়ক তরল ও অর্দ্ধ-তরল প্রোটোপ্লাজম (protoplasm) নামে পিচ্ছিল পদার্থ। কোষের প্রাণ হচ্ছে নিউক্লিয়স। তার মধ্যে আছে গোলাকার ছোট ছোট একটি বা দুটি পদার্থ, তাদের নাম নিউক্লিয়লাস্ (nucleolus)। নিউক্লিয়াস বা প্রাণ-কেন্দ্রের বাইরেই ছোট ছোট গোলাকার পদার্থ আছে, তাদের বলা হয় সেণ্ট্রোসোম্ (centrosome) বা আকর্ষণ কেন্দ্র। এক হিসাবে প্রত্যেকটি কোষ এক একটি সম্পূর্ণ সত্তা। প্রত্যেকটি জীবকোষ

নিজ অন্তর্নিহিত ক্রিয়া দ্বারাই বিভক্ত হয়ে, নূতন নূতন কোষ সৃষ্টি করতে পারে। "প্রোটোপ্লাজমের প্রধান ধর্ম হচ্ছে গতিদান, পুষ্টিসাধন ও বংশবৃদ্ধিকরণ।" কি করে এটা ঘটে, 'বংশানুক্রম ও পরিবেশ' প্রবন্ধে তা দেখিয়েছি।

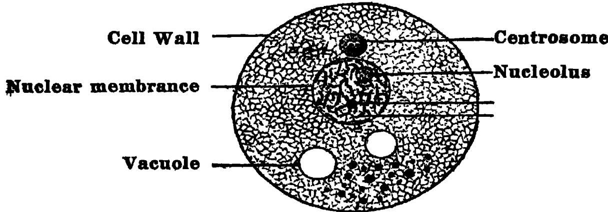


FIG. 1. Illustration of a cell showing reticulated nucleus, nucleoli and the protoplasmic substance of the cell filled with granules. (From J. D. Lickley. The Nervous System—Longmans Green & Co)

কোষগুলি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে, তন্তু (tissues) তৈরী হয়। এই তন্তু দিয়েই দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় গঠিত। এই কোষ ও তন্তুকে চারটি দলে ভাগ করা যায়। যথা—

১। আবরক বা এপিথেলিয়াল (Epithelial) কোষ দিয়ে তৈরী এপিথেলিয়াল তন্তু।

২। সংযোজনী (connective) কোষ দিয়ে তৈরী সংযোজনী-তন্তু।

৩। পেশী (muscle) কোষ দিয়ে তৈরী পেশী-তন্তু।

৪। স্নায়ু (nerve) কোষ দিয়ে তৈরী স্নায়ু-তন্তু।

এপিথেলিয়েল তন্তু দ্বারা সমস্ত দেহ ও সমস্ত দেহ-যন্ত্রের আবরণ তৈরী। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বহিরাবরণ এই তন্তু দিয়েই গঠিত। ত্বক্ এই আবরক তন্তুরই সমষ্টি।

সংযোজনী তন্তু বা সংযোজক তন্তু দিয়ে তৈরী দেহের কাঠামো। অস্থি, তরুণাস্থি (cartilage), সন্ধিবন্ধনী (ligaments) এ সবই সংযোজক তন্তু দিয়ে গঠিত।

পেশী কোষ দিয়ে গঠিত দেহের সমস্ত পেশী। এই পেশী দিয়ে নড়াচড়া ও সকল প্রকার শারীরিক গতি সম্ভব হয়।

স্নায়ুতন্তু দিয়ে কেন্দ্রীয় ও উপান্ত স্নায়ুমণ্ডল (central and peripheral nervous system) গঠিত।

জীবদেহে লক্ষ কোটি কোষ পরস্পর সংবদ্ধ। এই বিষম জটিল যন্ত্রটির জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ ও ক্রিয়ার মূলে আছে এই কোষসমূহের সজীব সক্রিয়তা।

এখন দেহযন্ত্রের তিনটি প্রধান বিভাগের অধীন যে উপবিভাগগুলি আছে, সংক্ষেপে তা সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

(ক) জ্ঞানেন্দ্রিয় (Receptors) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা সর্বজনবিদিত। বর্তমান মনস্তত্ত্ব ও দেহতত্ত্ববিদ্‌রা ত্বককে একটিমাত্র ইন্দ্রিয় বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে ত্বকে তিনটি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বর্তমান, স্পর্শেন্দ্রিয় (Pressure sense), উত্তাপ-ইন্দ্রিয় (temperature sense) ও বেদনা-ইন্দ্রিয় (pain sense)।[২] এ সব ইন্দ্রিয় ছাড়াও শেরিংটন-এর মতে আরও কতগুলি ইন্দ্রিয় আছে; যেমন (১) পেশী, কণ্ডরা (tendon) বা অস্থির সন্ধিস্থল (Joint) এর সঙ্কোচন, প্রসারণ বা পরিবর্তন জনিত প্রত্যক্ষ-অনুভূতি, যাদের নাম দেওয়া হয়েচে,—চেষ্টাবেদন (Kinaesthetic sensations) ; (২) দেহের ভারসাম্য বোধ (equilibrium sense)—এর জন্যে কানের মধ্যে তরল পদার্থপূর্ণ তিনটি অর্দ্ধচক্রাকার অস্থি আছে (semicircular canals)।[৩] দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানবার এবং সমগ্র দেহের কল্যাণ ও অকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত আরো কতগুলি প্রত্যক্ষানুভূতি আছে যাদের,—ষ্টাউট বলেছেন আর্গানিক সেন্‌সেশন্‌স্ (organic sensations), এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে,—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বমন, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। হেরিক (Herrick) আন্তরযন্ত্র সম্পর্কিত বোধের দলে (visceral senses) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বমন, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসরোধ, রক্তিমতা, হৃদযন্ত্রের আতঙ্ক, যৌনক্রিয়া বোধ, রন্ধ্রাদির প্রসারণ, আন্তরযন্ত্রের বেদনা ও গভীর আবেগ এর সঙ্গে সংযুক্ত তলপেটের সঙ্কোচন ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করেন।[৪]

(খ) কর্মেন্দ্রিয় (Effectors)। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের কথা আছে। কিন্তু বর্তমানের দেহতত্ত্ববিদ্ আরো সূক্ষ্মতর বিভাগ করেছেন। প্রাচীনেরা গ্রন্থির (Gland) কথা জানতেন না। বর্তমান দেহ-বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী কর্মেন্দ্রিয়ের বিভাগ দেখানো যাচ্ছে—

২ Sandiford—Educational Psychology, P. 65

৩ Sherrington—The Integrative Function of the Central Nervous System.

৪ Herrick—Neurological Foundations of Animal Behaviour, P. 27.

- কর্মেন্দ্রিয় Effectors
  - পেশী Muscles
    - ডোরাকাটা বা ঐচ্ছিক পেশী Striped or voluntary muscles
      - বৃহৎ পেশী The skeletal muscles (lean meat of the body)
    - অ-ডোরাকাটা বা অনৈচ্ছিক পেশী Unstriped or involuntary muscles
      - শিরা, ধমনী, পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্র ও জননেন্দ্রিয়। Veins, arteries, stomach, intestine, urinary and genital organs.
    - হৃদ্‌পেশী Cardiac muscles
      - হৃদ্‌যন্ত্র The heart
  - গ্রন্থি Glands
    - সনালী গ্রন্থি Duct glands (external secretion—বহিঃক্ষরণ)
      - Salivary glands. লালাগ্রন্থি
      - Gastric glands. পরিপাক গ্রন্থি
      - Liver. যকৃৎ
      - Pancreas. অগ্ন্যাশয়
      - Kidney. বৃক্ক
      - Sweat glands. ঘর্ম গ্রন্থি
      - Sebaceous glands. মেদগ্রন্থি
      - Lachrymal glands. অশ্রু গ্রন্থি
      - Mucous glands. শ্লেষ্মা গ্রন্থি
      - Wax glands. জতু গ্রন্থি
      - Sex glands. জনন গ্রন্থি
    - নালীহীন বা এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি Ductless or endocrine glands (internal secretions—অন্তঃক্ষরণ)
      - Thyroid gland. থাইরয়েড্ গ্রন্থি
      - Parathyroid gland. প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থি
      - Thymus gland. থাইমাস গ্রন্থি
      - Pineal gland. পিনীয়াল গ্রন্থি
      - Pituitary gland. পিটুইট্যারী গ্রন্থি
      - Suprarenal gland. সুপ্রারেনাল গ্রন্থি
      - Mucosa of duodenum. গ্রহণী গ্রন্থি
      - Pancreas (in part). প্যানক্রিয়াস্ গ্রন্থি (অংশতঃ)
      - Sex glands (in part). জনন গ্রন্থি (অংশত) ৫

San liford—Educational Psychology.

দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-সমূহ সম্পাদিত হয় পেশীগুলির সাহায্যে। আমরা হাত নাড়ি, ঘাড় ফেরাই, হাঁটি, দৌড়াই, লাফাই,—এ সব স্বেচ্ছাকৃত কাজের জন্যে যে বড় বড় পেশীগুলি (skeletal muscles) সক্রিয় হয় তাদের কতকটা ডোরাকাটা (striped) অসমান চেহারা। দেহের বাইরে কোন পরিবর্তন সাধন করতে হলে এই পেশীগুলির দরকার। কিন্তু দেহের মধ্যে কতগুলি কাজ চলছে নিজ থেকেই, সেগুলি আমাদের চেষ্টা সাপেক্ষ নয়। যেমন রক্তচলাচল, পরিপাক ইত্যাদি। এগুলো করতেও পেশী চাই। কিন্তু সে পেশীগুলি মসৃণ, আকারে ছোট (smooth muscles বা unstriped muscles)। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া যে হৃদযন্ত্রের সাহায্যে করি, সেটাও একটা পেশী বটে, কিন্তু সেটা অনেকটা ঐচ্ছিক পেশীর মত।

যন্ত্রজগতে লিভার (lever) গুলি যে কাজ করে দেহের মধ্যে বড় পেশীগুলো (striped muscles) সেই কাজ করে। এরা বিপরীতধর্মী,—যেমন পেশীগুলো সংকুচিত হতে পারে, প্রসারিতও হতে পারে। এরা যখন কাজ করে না তখনও তাদের মধ্যে একটা সতেজ (tonicity) ভাব থাকে। পক্ষাঘাত হলে পেশীগুলি শুধু নিষ্ক্রিয় হয় না, তাদের সতেজতাও হারায়। হাতে পক্ষাঘাত হলে হাতটা কেমন ঝুলে পড়ে। এই সতেজতা আছে বলেই সুস্থ পেশীর ক্রিয়া সহজ ও মসৃণ।

পেশীগুলি দীর্ঘকাল ক্রিয়া করলে, শুধু যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই চালনা হয় তা নয়,—সমগ্র দেহ, এমন কি স্নায়ুমণ্ডলীতেও তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। দেহের পুষ্টির জন্যে খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন,—কিন্তু এই খাদ্য পরিপাকের জন্য কিছুটা পরিমাণ পেশী সঞ্চালন প্রয়োজন। তাতে ফুসফুস অধিকতর সক্রিয় হয়—অধিক পরিমাণ অক্সিজেন দেহ গ্রহণ করে। তাতে রক্তে যে দূষিত পদার্থ দেহযন্ত্রের ক্ষয়ের জন্য সঞ্চিত হয়, তা বিশোধিত হয়। আবার পেশীগুলি অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে ফল বিপরীত হয়। তখন রক্ত সঞ্চালন দূষিত পদার্থ সঞ্চারে ভারাক্রান্ত হয়, এবং স্নায়ু-সঙ্গমগুলিতে (synapse) বাধা (resistance) বেড়ে যায়। তখন আসে ক্লান্তি (fatigue)। এ অবস্থায় মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় স্নায়ু-মণ্ডলীও ভাল কাজ করতে পারে না, তাই পরিশ্রান্ত দেহে নতুন কিছু শেখা, কিছু মনে রাখা কঠিন হয়। সেজন্যে নিয়মিত পেশী-সঞ্চালন, যারা মস্তিষ্কের কাজ করেন তাদের পক্ষেও খুব দরকার। "মনের ক্ষুরধার রাখতে গেলে নিত্য দেহচর্চার শান দেওয়া দরকার"—"The razor-edge of the mind needs

daily honing through physical exercise"—এই হচ্ছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মত। অবশ্য প্রাচীন ব্যায়ামবিদরা ভাবতেন মাংসপেশীর পরিপুষ্টিই (the cult of the big muscle) হচ্ছে বলিষ্ঠ দেহের আদর্শ। কিন্তু বর্তমানে এ মত ভ্রান্ত বলেই পরিত্যক্ত হয়েছে। বর্তমান আদর্শ হচ্ছে, সুসমঞ্জস দেহ ও উৎসাহদীপ্ত মন।

বৃহৎ পেশী (Skeletal muscle) গুলি হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়ার যন্ত্র। কিন্তু মসৃণপেশী (smooth muscle) গুলির সাহায্যে দেহের মৌলিক জৈব-ক্রিয়াগুলি (vegetative function) চলে। মৌলিক প্রাণক্রিয়ার জন্যে মসৃণপেশীগুলি বৃহৎ পেশীর চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। সমস্ত দেহে স্বাস্থ্য

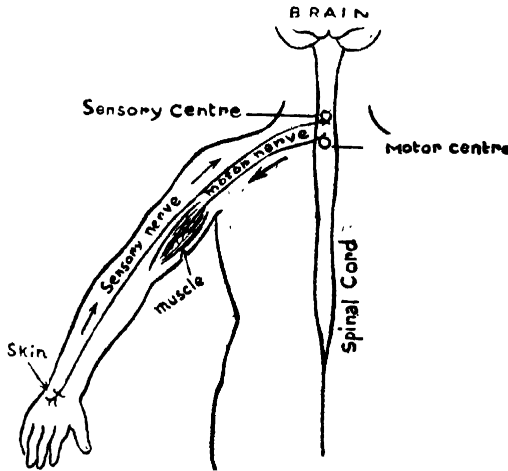


FIG. 2—পেশী ও নার্ভের ক্রিয়া—from Psychology—R. S. Woodworth. P. 248 —Methuen.

ও স্বাচ্ছন্দ্যের আভা তখনই দেখা যায়, যখন এই মসৃণ পেশীগুলি সুষ্ঠুভাবে কাজ করে। তা ছাড়া মানুষের প্রধান অনুভূতি (ভয়, রাগ ইত্যাদি) গুলির সঙ্গে এই মসৃণপেশীগুলি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। "কাজেই সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাজে মসৃণ পেশীগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।"

* "The movement of smooth muscles are closely connected with emotional states and therefore with the personality as a whole". Fisher and Fisk—How to live.

পেশীগুলি হচ্ছে দেহের ভৃত্যতন্ত্র, ওরা কাজ করে। প্রত্যেক পেশী কাজের হুকুম পায় কোন স্নায়ুকেন্দ্র থেকে, যার সঙ্গে পেশীর যোগ ঘটে, কোন চেষ্টীয় নার্ভ (motor nerve) এর সাহায্যে।

জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, যে দেহের সঙ্গে পরিবেশের সামঞ্জস্য বিধান। এ সামঞ্জস্য বিধান (adaptation) এর একটা প্রধান উপায় হচ্ছে গতি, আর এই গতির মূলে রয়েছে পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ। কাজেই পেশীগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে একথা সহজেই বোঝা যায়।

উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে হাতের চামড়ায় পিনের খোঁচার অনুভূতি সংবেদ নার্ভ (sensory nerve) বাহিত হয়ে স্নায়ুকেন্দ্রে পৌছেছে। সে সংবাদ স্নায়বিক ক্রিয়াকেন্দ্রে চালিত হল। সে কেন্দ্র থেকে চেষ্টীয়নার্ভ (motor nerve) বাহিত হয়ে হাতের পেশীতে পৌছাতে, হাতটা সরিয়ে নেওয়া হ'ল।

গ্রন্থি—Glands.

রসক্ষরা গ্রন্থি—দেহ থেকে মল, মূত্র, ঘর্ম এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের জন্যে কতগুলি গ্রন্থি (Glands) আছে—এরা সনালী—ductile। চোখ থেকে যে জল পড়ে, মায়ের স্তন থেকে যে দুধ আসে, এদের পেছনে আছে সনালীগ্রন্থি। এদের ক্ষরণগুলি বাহ্য (external)। কিন্তু দেহের ভেতরে আরো কতগুলি আছে যাদের ক্ষরণ অন্তর্মুখী। রক্তপ্রবাহের মধ্যে এদের থেকে অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ ক্ষরণ হয়,—কিন্তু যে রাসায়নিক তরল পদার্থগুলি ক্ষরিত হয় তা অত্যন্ত শক্তিশালী। এই গ্রন্থিগুলিকে বলে অনালী গ্রন্থি অথবা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (ductless glands or glands of internal secretion)।

"এই এণ্ডোক্রিন বা অনালী গ্রন্থিগুলির কোন বহিঃক্ষরণ নেই। তাদের থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয় তা রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সর্বত্র বাহিত হয়…এই ক্ষরিত সক্রিয় পদার্থগুলি ভেষজ জাতীয়, এবং এরা দেহের দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত প্রত্যঙ্গাদির উপরও প্রভাব বিস্তার করে বলে, এদের রসায়নিক বার্তাবহ (chemical messenger) বলা হয়। এদের অন্যান্য নাম হর্মোন (hormones) ও অটোকয়েড্স্ (autocoids)। এদের ক্রিয়া উত্তেজক বা নিরোধক দুইই হতে পারে এবং এরা অন্যান্য এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি-

গুলিকেও প্রভাবান্বিত করে।"[৭] এদের থেকে যে তরল দ্রব্য ক্ষরিত হয় তার নাম হর্মোন (hormones)। এদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব বেশী দিনের নয়। এদের ক্রিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা শাসিত নয়। কিন্তু এরা নানা দৈহিক ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে থাকে। "এই হর্মোন বা রাসায়নিক বার্তাবহদের সাহায্যে একটা রাসায়নিক সমন্বয় ঘটে থাকে। হর্মোন কথাটা প্রথম ব্যবহার

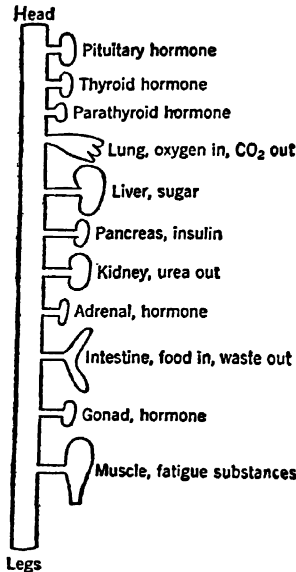


FIG. 3—Organs contributing substances to the blood stream. (Woodworth—Psychology. P. 166 Fig. 22—Methuen.)

করেন বেলিস ও ষ্টার্লিং (Bayliss and Starling)। তাঁরা ত্রিশ বছরেরও বেশী আগে আবিষ্কার করেছিলেন যে প্যানক্রিয়াসে (pancreus) সমস্ত নার্ভের জোগান বন্ধ করে দিলেও খাদ্যগ্রহণের পর প্যানক্রিয়াস থেকে রসক্ষরণ হতে থাকে। কাজেই পরিষ্কার বোঝা যায় প্যানক্রিয়াসের উত্তেজক পদার্থ রক্তস্রোত থেকেই প্যানক্রিয়াসে পৌছে।[৮]

৭ Sandiford—Educational Psychology.
alker K.—Human Physiology P. 139.

খাদ্যবিজ্ঞানে ভিটামিন এর আবিষ্কার যেমন যুগান্তকারী, দেহ-বিজ্ঞানের পক্ষে হর্মোন এর আবিষ্কারও তেমনি বিস্ময়কর। এণ্ডোক্রিন গ্রন্থিগুলি আকারে অনুল্লেখযোগ্য এবং তাদের ক্ষরণের পরিমাণ নগণ্য, কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ক্ষরিত বস্তুর প্রভাব অসামান্য। আমাদের প্রবল অনুভূতিগুলি এড্রেনাল গ্রন্থির ক্ষরণের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। এ সব কারণে বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও দেহবিজ্ঞানে গ্রন্থি সম্বন্ধে আলোচনায় যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ক্যানন্ (Cannon) এই গ্রন্থিগুলি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। এই গ্রন্থিগুলির মধ্যে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে থাইরয়েড ও পিটুইট্যারী (pituitary) সব চেয়ে বেশী দরকারী। বিভিন্ন গ্রন্থি, তাদের প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা কচ্ছি।

থাইরয়েড—Thyroid—এই গ্রন্থিটি থাকে ঘাড়ের নীচে শ্বাসনালীর কাছে। এর আকার, ডানা মেলা ছোট একটি প্রজাপতির মত। এর ক্ষরিত দ্রব্যের রাসায়নিক নাম থাইরক্সিন্ (thyroxin)। এর রাসায়নিক উপাদানের ফর্মুলা হচ্ছে $C \quad H_{11} O_4 NI_4$; কার্ব্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen), অক্সিজেন (Oxygen), নাইট্রোজেন (Nitrogen) অত্যন্ত সাধারণ উপাদান। থাইরক্সিন এর একটি বিশেষ উপাদান হচ্ছে আয়োডিন (Iodine)। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেন, "মানুষের ব্যবহারের উপর থাইরয়েড গ্রন্থির প্রভাব অসামান্য। সমস্ত দেহের উপর এর নিয়ামক ক্রিয়া (regulator) বর্তমান। এই থাইরয়েড-এর স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর সমস্ত দেহের ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে, কাজেই মানব ব্যবহারের উপর এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়।"[১]

এই হর্মোনের অভাব ঘটলে দেহের চামড়া শিথিল, চক্ষু নিষ্প্রভ, আকার ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এসব ব্যক্তি উৎসাহহীন, অলস ও বুদ্ধির দীপ্তিহীন হয়। এর অভাবে যে সব রোগ হয় তার নাম মাইক্সেডিমা (myxoedima) ও ক্রেটিনিজম্ (cretinism)। আবার এর অতিরিক্ত ক্ষরণে শরীরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়। বাড়তিটাও হয় অতি দ্রুত। এ রকম ব্যক্তি চঞ্চল, অসন্তুষ্ট ও অস্থিরচিত্ত

১ The thyroid gland......has a profound influence upon behaviour. It acts as a regulator of the whole body...upon its normal functioning depends normal mental and physical development with all that these mean in the realm of behaviour. Sandiford—Educational Psychology. P. 74.

হয়ে থাকে। তার বুদ্ধির কিছু বৃদ্ধি হয় না। থাইরয়েড হর্মোন এর অভাবে মেষের থ্যাইরয়েড খেতে দিলে কিছুটা উপকার হয়। এই হর্মোন কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হচ্ছে।[১০]

সুপ্রারেনাল্ বা এড্রেনাল্ গ্রন্থি—**Suprarenal or Adrenal Glands**—এরা হচ্ছে একজোড়া ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থি—অবস্থান, মূত্রাশয়ের ঠিক উপরেই। এদের আবিষ্কারক হচ্ছেন ডাঃ এ্যাডিসন্ (Dr. Addison)। এক রকম ক্ষয়রোগে দেখা যায় যাতে পেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, চামড়ার রং তামাটে হয়ে যায় এবং ক্রমে ক্রমে রোগী মারা যায়। এই ব্যাধিকে আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী বলা হয়, এ্যাডিসনের ব্যাধি (Addison's disease)। এ্যাডিসন্ সন্দেহ করেন যে, সুপ্রারেন্যাল্ গ্রন্থির ক্ষয় থেকেই এ রোগ হয়। এই গ্রন্থির ক্ষরণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভেষজ পদার্থ—তার নাম এড্রেনালিন্ (adrenalin)। এই তরল পদার্থ রক্তে মিশ্রিত হলে রক্ত-শর্করা (blood-sugar) মুক্তি পায়, তাতে পেশীর শক্তি বৃদ্ধি পায়। এতে রক্তের চাপ বাঁধবার ক্ষমতা বাড়ে। পরিপাক যন্ত্রের কাজ ব্যাহত হয়। ক্যানন্ দেখান যে, প্রবল ভয় ও রাগে এই গ্রন্থি থেকে প্রচুর রসক্ষরণ হয়, তাতেই পেশীগুলি পলায়ন বা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শক্তি পায়। তাঁর মতে এড্রেনালিন্ ক্ষরণের ফলে দেহের নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে—

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুততর ও অধিকতর সতেজ হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, পেশীগুলিতে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং তাদের বল বৃদ্ধি হয়, ফুসফুসের বায়ুবহা নাড়ীর মুখ খুব বেশী খুলে যায়, তার ফলে রক্তে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালিত হয়। পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন্

---

১০ When this gland is destroyed by disease the individual loses his former vim and alertness and sinks into a sluggish condition known as myxoedema." The skin is puffy. The muscles and brain are inert. The individual is slow, stupid, forgetful and unable to concentrate or to think and act effectively......when the thyroid is greatly over active the individual is restless, tense, irritable, worried, unstable......his growth is rapid especially in length and he becomes physically just the opposite of the cretin dwarf. It does not appear however that his mental growth is accelerated or his intelligence raised.........One of the dramatic discoveries of endocrinology was the cure of myxoedema. It was found that simply feeding sheep's thyroid quickly restored the normal state as if by magic. An extract of the gland can be taken with the same results. Woodworth—Psychology. A study of mental life, P. 167-171.

(Glycogen) বিশ্লেষিত হয়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে, পেশীর শ্রান্তিবোধ দূর করে, ঘাম খুব বাড়িয়ে দেয়, চোখের তারা দুটিকে প্রসারিত করে।

ক্যানন্-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এ গ্রন্থি মানুষকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঁচতে সাহায্য করে, কাজেই জৈব প্রয়োজনের দিক থেকে এর যথেষ্ট মূল্য আছে।

"এড্রেনালিন্ যুদ্ধ বা পলায়নের জন্য মানুষকে তৈরি করে। এ গ্রন্থি হচ্ছে বিশেষ করে যোদ্ধা বা নিতান্ত কাপুরুষের সহায়ক। কাজেই বিষম পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকবার জৈব প্রয়োজনে, এ গ্রন্থি বিশেষ সাহায্য করে।[১১] এর থেকেই তিনি প্রবল অনুভূতি (emotion) সম্বন্ধে, 'আপৎকালীন প্রয়োজন' (emergency theory) এই মতবাদে পৌছেন।

পিটুইট্যারী গ্রন্থি—**Pituitary Gland**—এটার অবস্থান হচ্ছে গলার উপরে, মস্তিষ্কের (brain) ঠিক নীচে। মটর দানার মত ছোট দেখতে। এর দুটি ভাগ আছে—সামনের (anterior) ও পিছনের (posterior)। এ গ্রন্থিকে বলা হয় 'গ্রন্থির রাজা' ("the master gland")[১২], কারণ অন্যান্য গ্রন্থির সুষ্ঠু ক্রিয়া এই গ্রন্থির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। সম্ভবতঃ, কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ আছে। এর সামনের অংশটি রুগ্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেহের উত্তাপ কমে যায়, হাত-পা টলে, শরীর শুকিয়ে যায় ও পেটের অসুখ চলতে থাকে। আর এ অংশ থেকে ক্ষরণ বেশী হলে মানুষ বিরাটকায় (giants) হয়। যদি দেহের পূর্ণ বিকাশ হয়ে গেলে, এ গ্রন্থি থেকে অতিমাত্রায় ক্ষরণ হতে থাকে, তা হ'লে হাত পা নাক অতিমাত্রায় লম্বা হয়—একে বলে এক্রোমেগালি (acromegaly)। আর শিশুকালে, যখন শরীর বৃদ্ধির বয়স তখন এর ক্ষরণ কম হ'লে বাড়তি থেমে যায়, আর মানুষটি হয় 'ক্ষুদে'। এদের বলে মিজেটস্ (midgets)। এদের দেহ কিন্তু ক্রেটিন্ (cretin) দের মত অসমান নয়। মিজেটদের বুদ্ধিও সাধারণ থেকে কম হয় না।[১৩]

ক্ষুদ্রকায় পিটুইট্যারীর সামনের অংশ এতগুলো কাজ কি ক'রে করে সেটা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। অনেকে তাই মনে করেন, পিটুইট্যারী প্রত্যক্ষভাবে অন্য গ্রন্থিগুলিকে পরিচালনা করে না।[১৪]

১১ Cannon—Bodily changes in Pain, Hunger, Fear and Rage.

১২ Sandiford—Educational Psychology P. 75.

১৩ Woodworth—Psychology P. 174.

১৪ The anterior pituitary is regarded as being responsible for eat gr

এর পেছনের অংশ বিশেষভাবে মস্থণ পেশীগুলির সতেজভাব রক্ষার সহায়ক এবং মূত্রাশয় (kidnely), স্তন্যদুগ্ধক্ষরা গ্রন্থি (mammary gland) ও জরায়ুর (uterus) উপর এর যথেষ্ট প্রভাব আছে।[১৫]

জ্ঞানেন্দ্রিয়—Receptors

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক্। এ ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্য-জগতের সংবাদ সংগ্রহ করে। এ ইন্দ্রিয়গুলি বহিরিন্দ্রিয় (end organs)। এদের প্রত্যেকটিই স্নায়ুসূত্র (nerves) দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত। ইন্দ্রিয়-গুলির বহির্ভাগের কোষসমূহ বাইরের উত্তেজক (stimuli) দ্বারা উত্তেজিত হ'লে অন্তর্মুখ নার্ভের (afferent nerves) পথ ধরে, সে শক্তি সর্বশেষে জ্ঞানদায়ী স্নায়ুকেন্দ্রে (sensory centres in the forebrain) আলোড়ন আনে। তখন আমাদের বোধ (sensation) জন্মে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক বিভিন্ন (the physical stimulus in each case is different) এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুসূত্র বা নার্ভের প্রকৃতিও বিভিন্ন।

সূত্র বা নার্ভের "যে দীর্ঘ স্নায়ুসূত্র দর্শনক্রিয়ার জন্য দায়ী, তা অক্ষিপট (retina) এর কোষ (cells) থেকে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘ্রাণক্রিয়ার জন্য যে স্নায়ুসূত্র দায়ী, সেগুলি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কোষগুলিরই শাখা।... এদের প্রত্যেকটি স্নায়ুসূত্রই বিভক্ত হয়ে বাইরের দিকে শরীরের ত্বকে অবস্থিত কোন গ্রাহক-ইন্দ্রিয় (receptor) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ভিতর দিকে সুষুম্নাকাণ্ড (chord) বা মস্তিষ্কে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত।"[১৬]

---

many functions and it is difficult to understand how so many secretions can be formed within a structure that is no bigger than a large pea. This has led to the suggestion that it works as an activator of the other glands, producing its effects indirectly rather than directly. Walker K.—Human Physiology P. 146.

১৫ Woodworth—Psychology P. 174.

১৬ "The axons of the optic nerve come from cells in the retina the light-sensitive part of the eye and extend into the brain the axons for the sense of smell are branches of the cells in the nose......Each of these axons divides and extends outward to a receptor in the skin or elsewhere and inward into the cord or brain so providing a path of connection from that receptor to the nerve-centre." Woodworth—Psychology: A Study of Mental life. P. 251-52.

চক্ষু—The Eye

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে চক্ষু। আলো, রং, ও আকারের জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে পাই চোখের মধ্য দিয়ে। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক হচ্ছে ইথার তরঙ্গ (Ether waves)। এ তরঙ্গগুলি সব সমান নয়। দীর্ঘতম এবং হ্রস্বতম তরঙ্গগুলি আমাদের দেহতটে আঘাত করলেও উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাবে কোন বোধ জাগায় না। দীর্ঘতম তরঙ্গ হচ্ছে, লাল-উজানী-আলো (Infra-red) আর হ্রস্বতম হোল, বেগনীপারের-আলো (ultra-violet)। মধ্যবর্তী-তরঙ্গ-গুলির মধ্যে দীর্ঘতম যে তরঙ্গগুলি চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুতন্তু আঘাত করে, তারা বোধ জাগায় লাল রং-এর। তার চেয়ে ছোট তরঙ্গ-বোধ জাগায় হলুদ রং এর, তার চেয়ে ছোট সবুজ-এর, তার চেয়ে ছোট নীলের, আর সব চেয়ে ছোট ইথারের ঢেউ, বোধ জাগায় বেগুনী রং এর। ঢেউগুলির উচ্চতাও সব সময়ে সমান নয়। ঢেউগুলি উঁচু হলে রংগুলি উজ্জ্বল হয় (intense), নীচু হ'লে হয় ফিকে। সাদা আলো যে রং এর সঙ্গে যত কম মেশে তত সে রং অমিশ্র বা saturated হয়।

বাইরের বস্তু থেকে উত্থিত ইথার তরঙ্গ অক্ষিগোলক ভেদ করে চক্ষুর ভেতরে অক্ষিপটের (retina) স্নায়ুতন্তুগুলিতে গিয়ে আঘাত করে। স্নায়ু তন্তুগুলির আকার ছোট ছোট লাঠি ও ত্রিকোণীর মত, তাই এইগুলিকে বলে রডস্ ও কোন্স্ (rods and cones)। সেখান থেকে দৃষ্টিবহা স্নায়ুশিরা (optic nerve) সে উত্তেজনাকে বহন করে নিয়ে যায় মস্তিষ্কের প্রধান স্নায়ু-কেন্দ্রে (visual centre in the occipital lobe)। (ডান চোখের শিরার শেষ গন্তব্যস্থল বাঁ দিকের কেন্দ্র, আর বাঁ চোখের শিরার শেষ গন্তব্যস্থল ডান দিকের কেন্দ্র। মাঝ পথে শিরাগুলি পরস্পরকে অতিক্রম করে।) এ বিপরীত ব্যাপারটা সব ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেলায়ই ঘটে। ছবি এঁকে দিলে বুঝতে সুবিধে হবে।

চোখের গঠন হচ্ছে ফটো তুলবার ক্যামেরা (camera) র মত। বরং উল্টে বল্লে কথাটা বেশী ঠিক হয়—চোখের অনুকরণে মানুষ তৈরী করেছে ক্যামেরা। ক্যামেরাতে বাইরের জিনিষের ছবি ভেতরে একটি তীক্ষ্ণ অনু-ভূতিশীল (highly sensitive) পর্দার উপর স্পষ্ট করে প্রতিফলিত হবার ব্যবস্থা রয়েচে। দুরত্ব অনুসারে বাইরের জিনিষ থেকে যে আলো প্রতিফলিত

হচ্ছে তাকে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে (focussing) পৌছে দেওয়া হয়। আলোর পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো কমানো চলে, যাতে করে' ছবিটি ভিতরে পর্দায় (sensitised film) পরিষ্কার ফুটে ওঠে। ক্যামেরার বেলায় এ সব কাজই হয় যান্ত্রিক উপায়ে। চোখেও এই কাজগুলি হয়, কিন্তু তা হয় অনেক

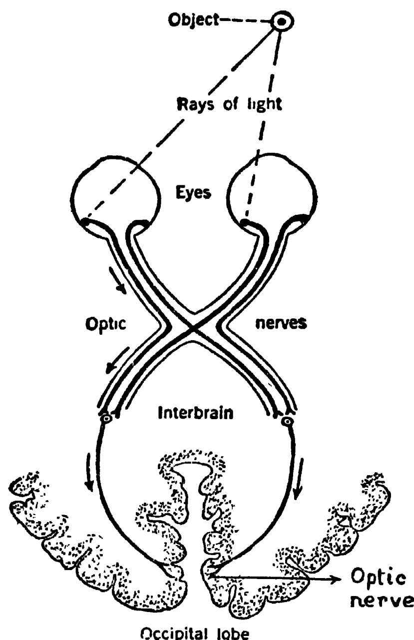


FIG. 4—Path of light and nerve currents from a visible object of the visual area of the brain. An object on the right affects the left half of each retina, the left side of the inter brain and the left occipital lobe. (Woodworth —Psychology P. 272 ; Fig. 51.—Methuen.)

সহজে, কতগুলি জৈব উপায়ে। ক্যামরায় ফিল্মে একটা ছবি উঠলে আর সেটায় অন্য ছবি তোলা চলে না কিন্তু চোখের পর্দায় (retina) ছবির পর ছবি উঠচে, সেখানে ফিল্ম বদ্‌লাবার কোন প্রয়োজন হয় না। ক্যামেরাতে আলো কেন্দ্রীভূত করা, আলোর পরিমাণ, নিয়ন্ত্রণ, এ সবই হিসাব করে বাইরের থেকে করে দিতে হয়। চোখের বেলা, এ সব কাজ হচ্ছে, আপনা থেকে। এর পর যদি

আমরা স্মরণ রাখি যে চোখ কত ছোট জায়গার মধ্যে এতগুলি জটিল কাজ এত সহজে করে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, যে যন্ত্রী এই চক্ষু-যন্ত্রকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর বুদ্ধি ও নিপুণতার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির তুলনা হতে পারে না। এবার চোখের বিভিন্ন অংশের ছবি দেওয়া যাচ্ছে।

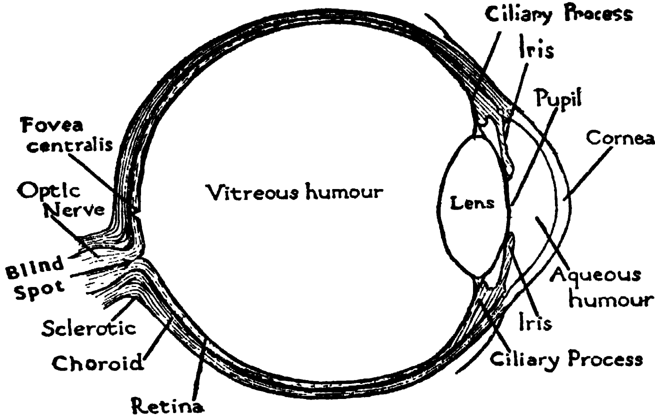


FIG.—The Eyeball showing the different parts. (Sandiford—The Mental and Physical Life of School children P. 113. Longmans Green & Co.)

একটি অক্ষি গোলকের ছবি দেওয়া হল। এটিকে স্বস্থানে ধরে রাখবার জন্যে এবং এর নড়াচড়ার জন্যে, এর চারিদিকে যে পেশীগুলি আছে, তা দেখান হল না। অক্ষিগোলক (eye-ball) হচ্ছে, বাস্তবিকপক্ষে অভ্যন্তরের তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন স্নায়ুতন্তুর (retina) যে তল (surface),—যাতে বাইরের জিনিষের ছবি ফুটে ওঠে, তার মজবুদ্ ও নিরাপদ আবরণ। এটা হচ্ছে ক্যামেরা বাক্সটা। এই গোলকের বহির্ভাগে কয়েকটি স্তর আছে যারা চোখের অন্তবর্ত্তী সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন স্নায়ুতন্তুগুলিকে বাইরের সমস্ত সাধারণ আঘাত থেকে রক্ষা করে। একেবারে বাইরের স্তরটির নাম শ্বেতমণ্ডল (sclerotic coat)। তার ভেতরে কালো আর একটি স্তর আছে তার নাম কৃষ্ণমণ্ডল (choroid)। এ হচ্ছে ক্যামেরার লাইনিং। সকলের ভিতরের যে স্তর, সেই তলটিই হচ্ছে অক্ষিপট (retina)। যে উপাদান দিয়ে দৃষ্টির স্নায়বিক কেন্দ্র ও স্নায়ুশিরা গঠিত, বাস্তবিক পক্ষে সেই উপাদানই ছড়িয়ে গেছে চোখের ভিতরের স্তরে,

সেখানেই জাগে অনুভূতি। সেখানেই জাগে ছবি। এটা হচ্ছে ক্যামেরার ফিল্ম বা প্লেট (sensitised film বা plate)। এই অক্ষিপটের মধ্যে সব চেয়ে তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন স্থানটি ছোট্ট একটুখানি হলদে টোল খাওয়া, তার নাম পীতবিন্দু (Fovea centralis অথবা yellow spot)। সেখানেই ছবি ফোটে সবচেয়ে স্পষ্ট। তার নীচে যেখানে দৃষ্টির স্নায়ুসূত্র (optic nerve) চক্ষুগোলককে প্রবেশ করেছে—সেখানে দৃষ্টির কোন অনুভূতি জাগে না। তাই সে স্থানটিকে বলে অন্ধবিন্দু (Blind spot)। এবার চোখের সামনের দিকে আসা যাক। এখানে শ্বেতমণ্ডল স্বচ্ছ আবরণে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখান দিয়ে আলো বা দ্রব্যের ছবি প্রবেশ করে চোখে। এই স্বচ্ছ বহিরাবরণকে বলে অচ্ছোদপটল (Cornea)। এ হচ্ছে ক্যামেরার বাইরের লেন্স (lens)। এর ভিতরে প্রবেশ করলেই আমরা পাই স্বচ্ছ জলের একটি থলে—এটাকে বলে, স্বচ্ছ রসভাণ্ড (Aqueous humour)। এর পরেই আমরা পাই একটা কালো বা বাদামী বা নীল গোল পর্দা, তার মাঝখানে আর একটি কালো ফুটো। পর্দাটিকে বলে কনিণীকা (Iris)। চোখের দিকে তাকালে অক্ষিগোলকের শ্বেত মণ্ডলের মধ্যস্থলে এ পর্দাটি আমাদের চোখে পড়ে। এ পর্দাটি ভারী অদ্ভুত। চোখে বেশী আলো পড়লে এটি প্রসারিত হয়, অন্ধকারে সঙ্কুচিত হয়। এর ফলে তার মধ্যস্থিত কালো ফুটোটি, যাকে বলে চক্ষুতারকা বা pupil, সেটি কখনও ছোট কখনও বড় দেখায়। অন্ধকারে বেড়াল বা ছোট শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখবে সেটা অনেকটা বড় হয়েছে। অর্থাৎ, তখন ভাল দেখবার জন্যে চোখের মধ্যে অনেকটা বেশী আলো ঢোকা দরকার, তাই উপরের পর্দা, মানে কণীনিকা, সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। তাই চোখের তারা (pupil) বড় দেখাচ্ছে। এ তারা হচ্ছে ক্যামেরার এ্যাপারচার (aperture)। এর পেছনেই হচ্ছে দুপিঠওয়ালা ডিম্বাকৃতি লেন্স (double convex lens)। এ লেন্স দিয়ে বাইরের দ্রব্য থেকে যে আলো বা রশ্মি এসে পড়েছে, তা কেন্দ্রীভূত (focus) করে অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে ফেলা হয়। দ্রব্যের দূরত্ব অনুসারে লেন্সটা কখনও বা বেশী প্রসারিত কখনও বেশী উত্তল (convex) হয়, কারণ রশ্মিকে কেন্দ্রীকরণের জন্যে এটা দরকার। ক্যামেরার ভেতরেও অনুরূপ লেন্স আছে। সে লেন্স সামনে পেছনে আনবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা, রশ্মি কেন্দ্রীকরণ (focussing) কাজটা হয়। চোখের মধ্যে কিন্তু লেন্স এক জায়গায় থাকে। কিন্তু সেটা নমনীয় পদার্থ। উপরের দুই মাথা থেকে চাপ দিলে সেটা বেশী

বেঁকে যায়—টান পড়লে সেটার বাঁকা ভাব (convexity) কমে। এ কাজটা হয়, লেন্স-এর উপর দিকে ছোট ছোট কয়েকটি পেশী আছে, তাদের সাহায্যে। সেগুলিকে বলে সিলিয়ারী প্রোসেসেস্ (ciliary processes)। দূরের জিনিষ দেখতে হলে লেন্সটার উপর কম চাপ পড়ে, সেটা কম বাঁকা হয়। কাছের জিনিষ দেখতে হলে লেন্সএর উপর চাপ পড়ে, তাই সেটা দুদিকেই বেশী বেঁকে যায়। তাই দূরের জিনিষ দেখতে চোখ স্বস্তি পায় বেশী। কাছের জিনিষ দেখতে চোখের পরিশ্রম (strain) বেশী। এই লেন্স এর গঠনে ক্রটি থাকলে বা সিলিয়ারীগুলি ঠিক কাজ না করলে আমরা বলি 'চোখ খারাপ হ'য়েছে। ভিতরের লেন্স-এর ক্রটি তখন বাইরে চশমার লেন্স দিয়ে সংশোধন করি। লেন্স-এর পেছনেই আছে অনেকখানি জলভর্তি একটি থলে—এ জলটা কতকটা অস্বচ্ছ, তাই এর নাম হচ্ছে অস্বচ্ছ জলভাণ্ড (vitreous humour)। চোখের বেশী অংশই এই জল। চোখ দিয়ে আমরা যে ঘনত্বের (solidity) বোধ পাই তার একটা কারণ হচ্ছে—চোখের মধ্যে এ খালি জায়গা। ক্যামেরাতেও আছে এ খালি জায়গার ব্যবস্থা। তা ছাড়া এই জলভাণ্ড চোখের আকারটি ঠিক রাখে, আর ভেতরের তন্তুগুলিকে পোশণ করে। গ্লকোমা (Glaucoma) রোগ হ'লে এ জলটা বৃদ্ধি পায়—তখন চোখের আভ্যন্তরীন তন্তুগুলির উপর চাপ পড়ে, সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাহ'লে, দৃষ্টিশক্তি একদম নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। সে জন্যে কখনও কখনও অচ্ছোদপটল ফুঁড়ে ভেতরের জলটা নিষ্কাশন করা হয়। এই অস্বচ্ছজলভাণ্ডের পেছনের অক্ষিপটই (Retina), দৃষ্টির বাস্তবিক ইন্দ্রিয় (receptor)। পূর্বেই বলা হয়েছে অক্ষিপট অত্যন্ত স্পর্শানুভূতিশীল স্নায়ুতন্তু দিয়ে গঠিত—চোখের সব চেয়ে ভেতরে তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল লাইনিং এই অক্ষিপট আবার কয়েকটি স্তরে গঠিত। তবে যে স্তরে দৃষ্টির অনুভূতি জাগে, সে হচ্ছে রড্‌স্ ও কোন্‌স্ (rods and cones) স্নায়ুতন্তু দিয়ে গঠিত। আবার অক্ষিপটের সব অংশও সমান অনুভূতিসম্পন্ন (sensitive) নয়। এর মধ্যে যে অংশে বাহিরের দ্রব্যের রশ্মি সোজাসুজি এসে পড়ে, আর সব চেয়ে স্পষ্ট ছবি জাগায়, সে স্থানটিকে বলে পীতবিন্দু (fovea centralis)। এ স্থানটিতে রড্‌স্ ও কোন্‌স্ ঠাসাঠাসি ভিড় করে আছে। এ স্থানটিকে কেন্দ্র করে সামান্য কতটুকু জায়গা, লাল ও সবুজ রং এর অনুভূতি জাগাতে সমর্থ। ঠিক এ অংশকে ঘিরে আর একটি বৃহত্তর অংশ নীল (ও হলদে)

এর অনুভূতি জাগায়। এই অংশ (area) তে রড্‌স্ ও কোনস্ (rods ও cones) দুইই আছে। একে ঘিরে আর একটি বৃহত্তর অংশ (কতকটা ডিম্বাকৃতি) সেখানে অনুভূতি জাগে সাদা ও কালোর। এ অংশের উপাদান শুধুমাত্র রড্‌স্ (rods)। এখানে কোন কোন্‌স্ (cones) নেই। কোন কোন লোক আছে রং-কাণা (colour-blind), এদের মধ্যে খুব কমই সম্পূর্ণ রং-কাণা (completely colour-blind)। এরা সমস্ত জিনিষকে সাদা-কালো বা ধুসর রংয়ের দেখেন। এদের চোখের অক্ষিপটে অন্তবর্তী দুটি অংশ (areas) বিকশিতই হয়নি, তাই তারা লাল-সবুজ বা নীল-হলুদ দেখতে পান না। আবার সামান্য কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সাদা-কালো-লাল-সবুজ দেখতে পান—কিন্তু নীল-হল্‌দে দেখতে পান না। এদের চোখে অক্ষিপটের তিনটি মণ্ডলের মধ্যে বাইরের ও ভেতরের মণ্ডলটি আছে—মাঝেরটি নেই। এ রকম উদাহরণ খুবই কম। কিন্তু আর একদল আছেন যাঁরা লাল-সবুজ কাণা। এদের সংখ্যা কিন্তু একেবারে সামান্য নয়। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ড্যালটন্ (Dalton) এরকম লাল-সবুজ কাণা ছিলেন। তার থেকে এই রোগকে ড্যালটনিজম্ (Daltonism) নাম দেওয়া হয়েছে। গল্প আছে, ড্যালটনকে খৃষ্টান সম্প্রদায়—কোয়েকারদের এক সভায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কোয়েকার সরলতা ও পবিত্রতাকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করেন এবং সর্বদা সাদা পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। ড্যালটন্ সভাতে যখন উপস্থিত হলেন তখন দেখা গেল, তাঁর পায়ের মোজা দুটি লাল রংএর। অনেকে এতে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। ডালটনের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করা হলে তিনি নিজ পায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন “কৈ আমি তো সাদা মোজাই পরে এসেছি।” তখন ধরা পড়লো যে তিনি রং কাণা। এই রং কাণা যারা, তাদের সম্পর্কে শিক্ষার দিক থেকে সমস্যার উদ্ভব হয়, তা বুঝতেই পারা যায়। যে শিশু রং-কাণা সে এই বর্ণময় পৃথিবীতে কিছু অসুবিধায় পড়বেই। যাতে রং এর বোধ প্রয়োজন, এমন কোন বিদ্যা তার পক্ষে আহরণ করা অসম্ভব। কাজেই শিক্ষকের জানা দরকার, কোন শিশু রং-কাণা। তার শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুটা পৃথক হওয়া দরকার। এবং লাল-সবুজ রংকাণা যারা, তাদের জীবিকার ক্ষেত্রেও সমস্যা। কারণ রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেনে, রাত্রে চলাচলের নিরাপত্তার জন্যে, লাল-সবুজ আলোর সিগন্যাল (signal) একান্ত প্রয়োজন। যদি কোন সিগন্যালার (signaller) বা চালক লাল-সবুজ কাণা হয়, তাহ'লে গুরুতর বিপদ ঘটতে পারে, এটা বোঝা কঠিন নয়। মেয়েদের মধ্যে রং-কাণার সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম।

কর্ণ—The Ear

চোখের তুলনায় কাণ অনেক বেশী জটিল যন্ত্র। বর্ত্তমান বিজ্ঞানীদের মতে কাণ শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় নয়; কাণের মধ্যেই একটা অংশ ভারসাম্য বোধের ইন্দ্রিয়ও বটে। শ্রবণের বাহ্য উত্তেজক হচ্ছে বায়ু তরঙ্গ (air waves)। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করে স্বরগ্রাম (pitch)। সা, রে, গা, মা এই যে সুরের বিভিন্নতা, এটা হোল স্বরগ্রাম। আবার তরঙ্গের উচ্চতা বা শক্তির উপর নির্ভর করে স্বরের উচ্চতা (loudness)। সা, জোরেও শব্দিত হতে পারে, আস্তেও হতে পারে। আর বিভিন্ন তরঙ্গের মিশ্রণে তরঙ্গের যে আকৃতি দাঁড়ায়—তার ফল হোল টিম্বর (timbre)। বাঁশীতে 'সা' আর বেহালাতে 'সা' ঠিক একই স্বরগ্রাম (pitch) ও একই উচ্চতা (loudness) হলেও তাদের মধ্যে তফাৎ আছে। সে তফাৎটা হচ্ছে, দুটো ক্ষেত্রে তরঙ্গের আকৃতি বিভিন্ন। এ বিভিন্নতা হোল টিম্বর। যেখানে বায়ু-তরঙ্গ অনেকগুলো এলোমেলো ভাবে মিশ্রিত হয় তার ফল হ'ল গোলমাল (noise); আর যেখানে তরঙ্গগুলি মিশ্রিত হ'য়ে নিয়মিত ভাবে নামে ওঠে, তাকে বলি সুর (music)।

এবার কাণের যন্ত্রটার বর্ণনা দেওয়া যাক্। এ যন্ত্রের তিনটে অংশ, একটা বাইরের (External ear), একটা মাঝের (middle ear), আর একটা একেবারে ভেতরের (internal ear)। বায়ু-তরঙ্গ কাণের ভিতরের অংশে কতগুলো ধাক্কার আকারে পৌছে। সে ধাক্কা বাহিত হয় ভিতরের অংশে— তার ফলে ভিতরের কাণের হাড়ের নলের মধ্যস্থিত তরল ও কণা পূর্ণ পদার্থ সঞ্চালিত হয়। তার ফলে সেই হাড়ের নলের ভিতর দিকে সংলগ্ন চুলের মত শ্রবণ-স্নায়ুতন্তুগুলিতে আন্দোলন জাগে। সম্ভবতঃ, তখন সেগুলি বাদ্যযন্ত্রের তারের মত শব্দিত হয়ে ওঠে। সেই তন্তুগুলি থেকে শ্রবণ শিরা বেরিয়ে চলে গেছে মস্তিষ্কের শ্রবণ অনুভূতি কেন্দ্রে। তখন আমরা শব্দ শুনি।

বহিঃকর্ণ (External Ear)—এ অংশে প্রথম হচ্ছে পিন্না বা কংকা (Pinna or Concha),—কাণের যে অংশটা আমাদের বাইরের থেকে চোখে পড়ে। 'কাণমলা' দিলে কাণের এই অংশটাতেই মলি। বাইরের শব্দ-তরঙ্গ এ অংশ দিয়েই সংগৃহীত ও কেন্দ্রীভূত হয়। তার মধ্যস্থলে যে ছিদ্রপথ কাণের ভেতরে চলে গেছে, তাকে বলে কর্ণ-গহ্বর বা কানের ফুটো (External auditory meatus)। সেটা শেষ হয়েছে গিয়ে, একটা পাৎলাচামড়ার ঝিল্লীতে, সেটাকে বলে কর্ণপটহ (Ear drum)। শব্দতরঙ্গ এসে এই

ঝিল্লীকেই স্পন্দিত করে। কর্ণপটহের চারিদিকেই রয়েছে অস্থি প্রাচীর। এর পর থেকে সুরু হ'ল Middle Ear। ঠিক কর্ণপটহের গায়ে লাগা, তিনটি পরস্পর-সংবদ্ধ হাড়ের মালা—একটির আকার কতকটা হাতুড়ির মত, তাই তার নাম হাতুড়ি (hammer), আর একটি হচ্ছে নেহাইর মত, তাই তার নাম নেহাই (Anvil), আর একটি জীন্ দেওয়া ঘোড়ার পিঠে চাপলে যে পা-দান তার মত, তাই তার নাম পাদান (stirrup)। এর পরেই আবার একটি হাড়ের দেয়াল—কিন্তু তাতে পাৎলা আবরণ দেওয়া দুটি ফুটো, একটি কতকটা ডিম্বাকৃতি। পা-দানের মাথাটা সেই ছিদ্রের মুখে এঁটে থাকে। এটির নাম ডিম্বাকৃতি বিবর (oval foramen)। আর তার নীচে, আর একটা গোলাকৃতি মুখবন্ধ ফুটো। সেটা হচ্ছে গোলক বিবর (round foramen)। মধ্যকর্ণের দুদিকে হাড়ের দেয়াল নীচের দিকে একটি নলের আকারে নেমে গলার

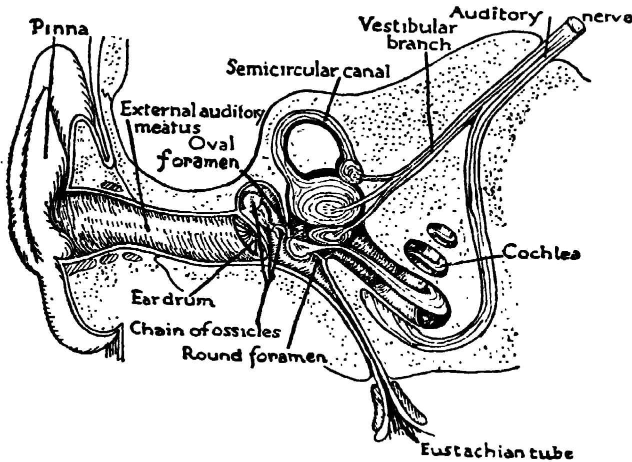


FIG. 6—Semi-diagrammatic section through the right ear (Sandiford —The Mental & Physical life of School children P. 117. Longmans Green & Co).

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—এ নলের নাম ইউষ্ট্যাসিয়ান্ টিউব (Eustachian tube), এর প্রয়োজন হচ্ছে—কর্ণপটহের উপর বায়ুর চাপটা বাইরের ও ভেতরের দিক থেকে সমান রাখা। কাণ, গলা, নাক এই নলের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত, তাই একটিতে কোন দোষ (infection) হ'লে আর একটিতে ছড়িয়ে পড়ার

সম্ভাবনা থাকে। তাই হাসপাতালে দেখা যাবে, কান, নাক, গলার (ear, nose, throat), চিকিৎসার জন্যে এক বিভাগ। এটার পরের যে অংশ সেটা হ'ল অন্তঃকর্ণ (internal ear)। এটা হচ্ছে সব চেয়ে জটিল। এ একটা

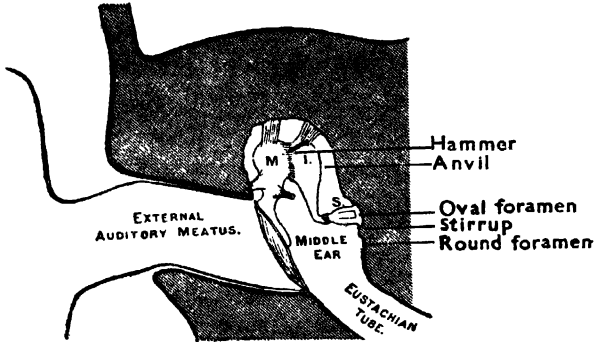


FIG. 7—Schematic drawing of the middle ear showing the positions of bones. (Lickley—The Nervous System ; Longmans Green & Co).

অদ্ভুতদর্শন ফাঁপা হাড়ের নল—তরল ও বালুকণার মত পদার্থে ভর্তি। এর মাঝখানটা মোটা, তারি গায়ে গোলাকৃতি বিবর (round foramen) এবং এখান দিয়েই অন্তঃকর্ণের সঙ্গে মধ্য কর্ণের সংযোগ। এ মাঝখানের মোটা

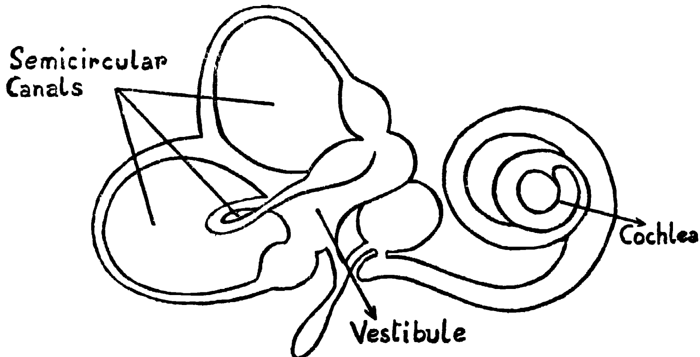


FIG. 8—The membranous labyrinth. Lickley—The Nervous System. P. 104, FIG. 8. Longmans Green & Co.

অংশের নাম অলিন্দ (vestibule)। সামনের দিকটায় তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফাঁপা নল, তারা এসে মিশেছে অলিন্দে (vestibule)। এগুলিকে বলে অর্ধ-

বৃত্তাকৃতি জল-নালী (semi-circular canals)। দেহবিজ্ঞানীদের মতে এটি হচ্ছে মানবদেহের ভারসাম্য বোধের ও দিকদর্শনের ইন্দ্রিয়। এর ভিতরের তরল পদার্থের গতি দিয়েই নাকি অন্ধকারে আমাদের দিগ্‌বোধ হয়। অবশ্য চক্ষু, ত্বক্‌ ও পেশী ইত্যাদিও এ বোধ হতে সাহায্য করে। হাড়ের নলটা পিছনের দিকে একটা শঙ্খের মত প্যাঁচানো। এটাকে বলে ককলিয়া (cochlea)। পাশ থেকে এটাকে কাটলে দেখা যায়, একটা ঘোরানো সিঁড়ির মত। ভিতরে হাড়ের নলটা ঘুরে ঘুরে গেছে। অন্তঃকর্ণের এই জটিল হাড়টিকে গোলক-ধাঁধা বা Labyrinth বলে। নামটা অসার্থক নয়। এই ঘোরানো সিঁড়ির ভিতরের তল (inner surface) নরম ফিতের মত স্নায়বিক উপাদানে গঠিত। তাতে সহস্র সহস্র সরু-মোটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারের মত

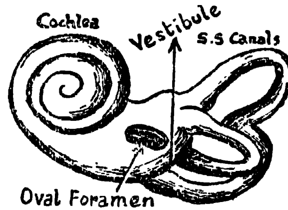


FIG. 9—The labyrinth showing the oval foramen, the bony cochlea and the semicircular canals. (K. Walkar—Human Physiology, Penguin Books. P. 133).

স্নায়ুতন্তু আছে। এদের বলে কর্টির ইন্দ্রিয় (organs of Corti)। হেলম্‌হোৎস্‌ (Helmholtz) এর মতে এই তন্ত্রীগুলো হচ্ছে সেতারের তারের মত এবং এদের স্পন্দনেই আমাদের শ্রবণের অনুভূতি। এই ককলিয়া (cochlea) ভেদ করে শ্রবণ-স্নায়ু-শিরাগুচ্ছ (auditory nerve) মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে শ্রবণ স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেচে। আর একগুচ্ছ স্নায়ু-শিরা অলিন্দ থেকে বেরিয়ে মস্তিষ্কে চলে গেছে।

ত্বক—The Skin

দেহের এই বহিরাবরণ একাধিক প্রত্যক্ষ অনুভূতির আধার। এ আধার জল নিরোধক, বায়ু-নিরোধক, বীজাণু-নিরোধক। এ বাইরের আঘাত থেকে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে রক্ষা করে। ত্বকের দ্বারা আমরা পাই স্পর্শানুভূতি

(touch sensation) ও চাপের অনুভূতি (pressure sensation), বেদনার অনুভূতি (pain sensation), উষ্ণতার অনুভূতি (warmth sensation) ও শৈত্যানুভূতি (cold sensation)। আগে মনে করা হোত, ত্বকের সব অংশই বুঝি এই বিভিন্ন অনুভূতি জাগায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ত্বকের ঠিক নীচে চার রকমের বিভিন্ন স্নায়ুতন্তু আছে, —কতকগুলির আকার জড়ানো স্প্রিংএ'র মতো, এদের নাম "প্যাসিনিয়ান্ কর্পাসলস্" (Paccinian corpuscles), কতগুলি টাকুর (Spindle) আকার, এগুলির নাম মীস্নার কর্পাসলস্ (Meissner corpuscles) আর কতগুলি গোলকের (ball) আকার, ক্রস্এস্ কর্পাসলস্ (Krause's corpuscles), আর কতগুলি পদ্মপাতার মত, নাম রূফিনিজ্ কর্পাসলস্ (Ruffini's corpuscles)। আবার দেখা যায়, কতগুলি স্নায়ুশিরা কোন কর্পাসলের সঙ্গে যুক্ত নয়—তারা ঠিক ত্বকের নীচে সূক্ষ্ম কতগুলি উপশিরায় পাৎলা শিকড়ের মত ছড়িয়ে গেছে। চামড়ার উপরটা ভাল করে কামিয়ে একটি সরু চুল খুব হাল্কা ভাবে চামড়ার উপর বুলিয়ে নিলে দেখা যায়, কোন কোন বিন্দুতে স্পর্শানুভূতি খুব তীক্ষ্ণ, কোন কোন বিন্দুতে তা নয়। আবার একটি তীক্ষ্ণ ছুঁচ খুব আস্তে বুলিয়ে নিলে কোন কোন বিন্দুতে তীক্ষ্ণ বেদনা বোধ জাগে, কিন্তু কোন কোন বিন্দুতে তা জাগে না। আবার একটা ভোঁতা তামার তার ৪৫° সেণ্টিগ্রেড মাত্র উত্তপ্ত করে চামড়ার উপর বুলালে কোথাও কোথাও স্পষ্ট উত্তাপের অনুভূতি জাগে, কোথাও তা জাগে না। অনুরূপভাবে সেই তারটি ৫° সেণ্টিগ্রেডে ঠাণ্ডা করে নিলে চামড়ার উপর কোন কোন স্থানে স্পষ্ট শৈত্যানুভূতি হয়, কোথাও তা হয় না। আবার সিরিঙ্গোমাইয়েলিয়া (syringomyelia) রোগে দেখা যায়, রোগীর ত্বকে স্পর্শানুভূতি রয়েছে, কিন্তু সে শৈত্য ও উত্তাপের বোধ হারিয়েছে। গলায় কোকেন্ (cocaine) এর প্রলেপ দিলে বেদনা ও চাপের অনুভূতি লুপ্ত হয়, কিন্তু শৈত্য ও উষ্ণতার অনুভূতি থেকে যায়। হেড্ ও রিভার্স (Head & Rivers) দুজনে কতগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন স্পর্শানুভূতিও দুরকমের এপিক্রিটিক্ ও প্রোটোপ্যাথিক্ (Epicritic ও Protopathic)। এপিক্রিটিক স্পর্শানুভূতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, যেমন আঙ্গুলের ডগা দিয়ে আমরা খুব অল্প দূরত্বের ব্যবধানও ধরতে পারি। কিন্তু প্রোটোপ্যাথিক্ অনুভূতি ছড়ানো (diffuse), অস্পষ্ট এবং পেশীর অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত। এ সবের থেকে এ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত যে ত্বকে অন্ততঃ চার রকম ইন্দ্রিয়

(receptor) আছে—যার দ্বারা আমরা চারিটি বিভিন্ন অনুভূতি পাই।) স্পর্শানুভূতি অনেক সময়ই দেহের পেশী ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত, বা আস্বাদনের অনুভূতির সঙ্গে জড়িত থাকে। ত্বকের যে বিভিন্ন অনুভূতি, তাদের পরস্পরের সঙ্গেও বোধ হয় যোগ আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

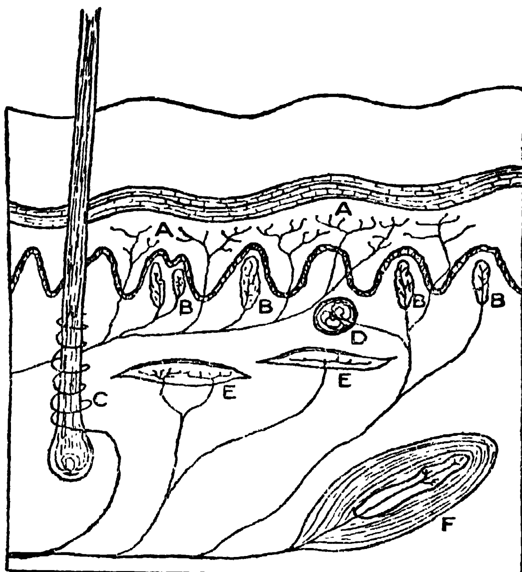


FIG. 10—The cutaneous sense organs. A is a free nerve ending .in, the sense organ for pain ; B is a Meissner corpuscle, the sense for light pressures ; C is a nerve-ending coiled around a hair, a sense organ for pressures aroused by movement of the hair ; D is a Krause's corpuscle probably a sense-organ for cold ; E is a Ruffini's corpuscle probably a sense organ for warmth ; F is a Paccinian corpuscle probably a sense organ for deep pressure or for warmth. Sandiford—Educational Psychology, Fig. 14. P. 61. Longmans Green & Co.

আঙ্গুলের ডগায়, জিবের ডগায় স্পর্শানুভূতি খুব তীক্ষ্ণ, কিন্তু ঘাড়ের বা পায়ের গোড়ালীর উপরের চামড়ার স্পর্শানুভূতি অস্পষ্ট। ঠোঁটের স্পর্শানুভূতিও তীক্ষ্ণ। চোখের উপরের আবরণ অচ্ছোদপটলের বেদনাভূতি খুব তীক্ষ্ণ। গালে উষ্ণতার অনুভূতি সহজে হয়—কাণে হয় সহজে শৈত্যানুভূতি।

ত্বকের উপরে এই বিভিন্ন অনুভূতির কেন্দ্রগুলি এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। দেহাভ্যন্তরে যে সব যন্ত্র আছে তারা সাধারণতঃ কোন স্পর্শানুভূতি জাগায় না। কোন কোন যন্ত্রে উত্তাপ ও শৈত্যের কিছু বোধ জাগে। এ যন্ত্রগুলিতে যখনই বেদনার অনুভূতি হয় তখনই বুঝতে হবে দেহের পক্ষে এটা বিপদের সংকেত।

জিহ্বা—Tongue

জিহ্বা হচ্ছে স্বাদেন্দ্রিয়। জিহ্বা কর্মেন্দ্রিয়ও বটে, কারণ জিহ্বার সাহায্যে কথা বলি। জ্ঞানেন্দ্রিয় হিসাবে এর মূল্য বেশী নয়, কিন্তু জৈব-প্রয়োজনে স্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রিয় হিসাবে জিহ্বার মূল্য সামান্য নয়। সুখাদ্য দেহরক্ষা ও পুষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক, আর সুখাদ্য চিনবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে যে তা সুস্বাদুও বটে। খাদ্য মুখে এলে দাঁত তাকে চর্বণ করে, বিশ্লেষণ করে। খাদ্যকণা জিবের লালার সংস্পর্শে এলে কতগুলি রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। এ রাসায়নিক প্রক্রিয়া জিহ্বার আবরণের ঠিক নিচেই অবস্থিত কতগুলি স্নায়ুতন্তুকে উত্তেজিত করে,—সেগুলিকে বলে স্বাদ কলিকা বা প্যাপিলি (taste buds বা papillae)। সেখান থেকে যে স্নায়ুশিরা মস্তিষ্কের স্বাদ-কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেচে, তা বেয়ে উত্তেজনা সেখানে পৌঁছলে আমাদের স্বাদবোধ হয়। স্বাদ-ইন্দ্রিয় অনুভূতির কেন্দ্র হিসাবে যথেষ্ট সূক্ষ্ম। ১০০ সি সি জলে কুইনীন এক গ্রাম্ এর অতি সামান্য ভগ্নাংশ মিশিয়ে জিবে লাগালেও তিক্ত আস্বাদন পাওয়া যায়। স্বাদ ব্যাপারটা অত্যন্ত মিশ্র অনুভূতি, স্বাদের সঙ্গে শৈত্য, উষ্ণতাবোধ, গন্ধ, পেশীর বোধ ইত্যাদি জড়িত থাকে। তা ছাড়া বিভিন্ন স্বাদও এমনি জড়িয়ে থাকে যে বিশ্লেষণটা সোজা কাজ নয়। যেমন কফি, চা ও কুইনীন—সব কয়টিরই মূল স্বাদ তিক্ত, কিন্তু এদের স্বাদে কত ভিন্নতা। যদি একই উত্তাপে কফি, চা ও কুইনীন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জলে গুলে' চক্ষু বুজে এবং নাকে তুলো গুঁজে ধীরে ধীরে আস্বাদ করা যায় তবে আমরা তফাত করতে পারি না। সব কটিই শুধু তেতো লাগে। তেমনি চোখ নাক বুজে আপেল, মূলো আর আলুর আস্বাদ প্রভেদ করা যায় না। চারিটি মূল স্বাদ সাধারণতঃ স্বীকার করা হয়—মিষ্ট, টক, লবণ, তিক্ত। কেউ কেউ ঝাল ও কষায়কেও মূল স্বাদ মনে করেন। সম্ভবতঃ এ স্বাদ দুইটি মিশ্র। জিহ্বার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্বাদের জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী মনে

হয়। তেতো আস্বাদ লেগে থাকে জিবের গোড়ায়, মিষ্ট স্বাদ জিবের ডগায়, টক দু'পাশে। লবণ, ঝাল জিবের মাঝখানে।

আগেই বলা হয়েছে, সুখাদ্য—সুস্বাদু বটে। খাদ্য সুস্বাদু হ'লে যথেষ্ট লালা নিঃসরণ হয় এবং পরিপাকের কাজে সাহায্য হয়। কাজেই সুগৃহিণীকে ও সুমাতাকে ভাল রান্না শিখতে হবে। সাধারণতঃ স্বভাবজ খাদ্য সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ, যেমন, দুধ ও ফল। এগুলি স্বভাবতঃ শিশুদের ভাল লাগা উচিত। কিন্তু অনেক সময় কু-অভ্যাস দ্বারা আমরা শিশুদের রুচি-বিকার ঘটাই। এটা আমাদের কৃত্রিম জীবনের একটা পাপ। আমরা শিশুকাল থেকেই ছেলে-মেয়েদের অতিরিক্ত ভর্জিত, অতিরিক্ত তৈলপক, অতিরিক্ত মশলা মিশ্রিত বা অতিরক্ত মিষ্ট খাদ্যে অভ্যস্ত করি। এতে তাদের স্বাভাবিক স্বাদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয়—স্বাস্থ্যেরও হানি করা হয়। রুশো এমত খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করেছেন, এবং আমাদের মনে হয়, এ মতের মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে।

নাসিকা—The Nose

নাসিকাও জিহ্বার মত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দুই-ই বটে। নাক দিয়ে গন্ধ পাই,—নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও নিই। এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গন্ধ পাই, জ্ঞান হিসাবে তার মূল্য বেশী নয়, কিন্তু জৈব-প্রয়োজন সাধনে এর অনুভূতি যথেষ্ট দামী। গন্ধ অনেক সময় বিপদের সংকেত। নিম্ন প্রাণীদের বেলায় এ কথা তো খুব বেশী সত্য। নানা সুখকর ও বিরক্তিকর অনুভূতির সঙ্গে গন্ধ বিশেষ-ভাবে জড়িত, তাই নানা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে গন্ধদ্রব্যের এত বহুল প্রচলন।

নাসিকার অভ্যন্তরে যে ঝিল্লী আবরণ আছে তার নীচে আছে গন্ধ-স্নায়ুকোষ (olfactory bulbs)। সেখান থেকে স্নায়ুশিরাগুচ্ছ চলে গেল মস্তিষ্কের গন্ধ অনুভূতি কেন্দ্রে। বাতাসের সঙ্গে আঘ্রাত দ্রব্যের বায়বীয় কণা এসে পৌঁছে নাকে, আর তার ফলে কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া সুরু হয়। তার উত্তেজনা গন্ধকোষগুলোকে উত্তেজিত করে।

গন্ধ অনুভূতিও যথেষ্ট সূক্ষ্ম। ঘরের বাহিরে একটা ছোট ব্যাং পচলেও গন্ধে ঘরে টেকা দায় হয়। জবাকুসুম তেল অল্প কয়েক ফোঁটা মাথায় মেখে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে পাশে থেকে সেটা টের পাই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কস্তুরীর অতি ক্ষুদ্র কণা ঘরে ছড়িয়ে দিলে তার গন্ধ পাওয়া যায়।

গন্ধও অনেক সময়ই মিশ্রবোধ। হেনিং (Henning) পরীক্ষা করে ছ'টি মূল গন্ধ আছে, এই সিদ্ধান্ত করেছেন :—

১। মশলার গন্ধ—(**spicy**)—লঙ্কা, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ।

২। ফুলের গন্ধ—(**Flowery**)—গোলাপ, যুঁই, শেফালী।

৩। ফলের গন্ধ— (**Fruity**)—আম, আপেল, আনারস।

৪। ধূপের গন্ধ—(**Resinous**)—ধূপ, তার্পিন।

৫। পচা গন্ধ—(**Foul**)—পচা ইঁদুর, শুটকী মাছ।

৬। পোড়া গন্ধ—(**Scorched**)—ভাত ধরে গেলে যেমন।

প্রেয়সীর এলো চুলের গন্ধকে ঘিরে অনেক মোহ, অনেক কাব্য রচনা হয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এখনও এ বিষয়ে অপূর্ণ—হয়তো বা তাই এখনও মোহের ঘোর কাটেনি।

সংযোজক—The Connectors.

স্নায়ুমণ্ডল—The Nervous System

বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়কে চালনা করা, তাদের সমন্বয় করা, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা, দেহের মধ্যে এ কাজ কে করে? এ গুরুদায়িত্ব স্নায়ুমণ্ডলীর (The Nervous System)। এ দেহকে একটি জটিল শাসনতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে, কিন্তু দেহের কোন অঙ্গ, কোন যন্ত্রই স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়। শাসন ব্যবস্থায় যেমন, কর্তব্য ও দায়িত্ব অনুসারে বড়, ছোট, মাঝারি ভাগ করা যায়; আবার প্রত্যেকেরই যেমন কতকটা স্বাধীনতা থাকলেও, চূড়ান্ত স্বাধীনতা নেই, দেহ-যন্ত্রের মধ্যেও তেমনি। সমস্ত দেহযন্ত্রের শাসন ও পরিচালনার ভার স্নায়ুমণ্ডলীর। আবার স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যেও দুটি ভাগ—**কেন্দ্রীয় মণ্ডল ও উপান্ত মণ্ডল**। কেন্দ্রীয় মণ্ডলের দায়িত্ব ও গুরুত্ব উপান্ত মণ্ডলের চেয়ে বেশী। আবার কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে প্রধান অংশ হচ্ছে মস্তিষ্ক। সেখানেই রয়েছে বোধের কেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র, সেখানেই রয়েছে স্মৃতি, কল্পনা, ভাবনা ও ইচ্ছার যন্ত্র। এই স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে দেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম স্থূল ও সূক্ষ্ম অসংখ্য স্নায়ু-শিরা (nerve) দ্বারা সংযুক্ত।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের দুটি অংশ—**মস্তিষ্ক (Brain) ও মেরুদণ্ড (Spinal Chord)**।

মস্তিষ্কের আবার তিনটি প্রধান ও দুটি অপ্রধান অংশ—

(ক) **গুরুমস্তিষ্ক—Cerebrum** বা **Fore brain ;**

(খ) মধ্যমস্তিষ্ক—**Basal ganglia,** বা **Interbrain** বা **Mid brain.**

(গ) লঘুমস্তিষ্ক—**Cerebellum** বা **Hind brain.**

অপ্রধান অংশ দুটি হচ্ছে—সুষুম্নাশীর্ষক **Medulla oblongata** ও পনস্ **Pons.**

উপান্তস্নায়ুমণ্ডলেরও দুটি অংশ—

(১) মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নির্গত নার্ভ—**Cerebrospinal Nerves—** মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড থেকে প্রসারিত অসংখ্য স্নায়ু-শিরা উপশিরা। এদের সাহায্যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীসমূহের সংযোগ সাধিত হচ্ছে। মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে ১২ জোড়া স্নায়ুশিরা, আর মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়েছে ৩১ জোড়া।

(২) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডল—**Autonomous Nervous System—** এরা প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংযুক্ত নয়—কিন্তু দেহাভ্যন্তরে কতগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও প্রক্রিয়া এই মণ্ডলের দ্বারা শাসিত।

এ মণ্ডলের আবার তিনটি ভাগ—উর্ধ্ব (Upper), মধ্য (Middle) ও অধঃ (Lower)। উর্ধ্ব স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডল (Upper autonomic nervous system) হৃদযন্ত্র ও পরিপাক যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মধ্য স্বয়ং-ক্রিয় মণ্ডল (Middle autonomic nervous system বা sympathetic system) এর বিশেষ প্রভাব এড্রেনাল গ্রন্থি ও অন্ত্রস্থ মসৃণ পেশী (smooth muscles of the viscera)-র উপর। প্রবল অনুভূতির বেলায় এড্রেনাল গ্রন্থি থেকে প্রচুর রসক্ষরণ হয়, এবং অন্ত্র মধ্যে নানা প্রক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু এক হিসাবে, মধ্য স্বয়ং-ক্রিয় মণ্ডলের ক্রিয়া উর্ধ্ব স্বয়ং-ক্রিয় মণ্ডলের বিপরীত। কারণ উর্ধ্ব মণ্ডল পরিপাক ক্রিয়াকে সাহায্য করে, কিন্তু পেশীর ক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। আবার মধ্য মণ্ডলের দ্বারা পেশীর ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয় কিন্তু পরিপাক ক্রিয়া বাধ্যগ্রস্ত হয়। নিম্ন স্বয়ং-ক্রিয় মণ্ডল (The Lower autonomic system) বা ত্রিকাস্থি মণ্ডল (sacral system) জননেন্দ্রিয়ের গ্রন্থিগুলিকে

পরিচালনা করে। মধ্য মণ্ডল ভয় ও ক্রোধের উদ্রেক করে, কিন্তু কাম অনুভূতি এ দুটিরই বিরোধী, সেজন্য ত্রিকাস্থি মণ্ডলকে মধ্য মণ্ডলের বিরোধী বলা যায়। অবশ্য এ কথাটা স্থূলভাবেই সত্য। বাস্তবিকপক্ষে দেহযন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশই

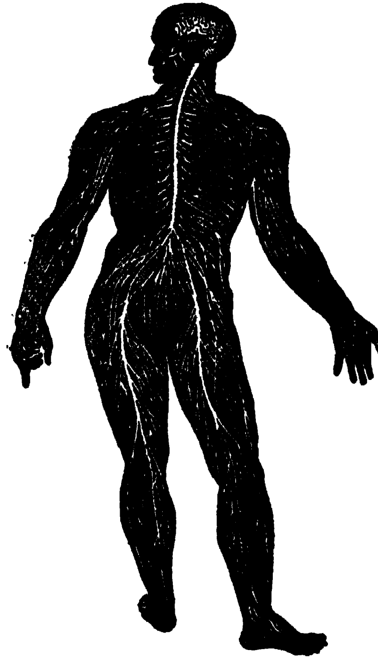


FiG. 11—The Nervous system, showing brain, spinal chord and nerves (after Martin). Woodworth—Psychology: A study of Mental life, P. 247. Fig. 32.—Methuen.

অন্য সমস্ত অংশের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত এবং সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলের তাই একটি অখণ্ড সত্তা আছে, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এর কোন অংশই সম্পূর্ণ বা স্বাধীন নয়।

স্নায়ুকোষ (The Neurons)—স্নায়ুমণ্ডলের উপাদান যে বিশেষ জাতীয় কোষের দ্বারা তৈরী তার নাম স্নায়ুকোষ বা নিউরন্ (Neurons)। অন্যান্য কোষের চেয়ে স্নায়ুকোষ অনেক বেশী উন্নত ধরণের। তবে তাদের গঠন

মোটামুটি একই। স্নায়ুমণ্ডল গঠিত হয়েছে কোটি কোটি স্নায়ুকোষ দ্বারা। এই স্নায়ুকোষ পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে তন্তু (tissues), শিরা (nerves) ও স্নায়ুকেন্দ্র (nerve-centre) তৈরী হয়। মস্তিষ্কে অধিকাংশ স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত—সেখানে আছে ঘন সন্নিবিষ্ট কোষের সমষ্টি। এই কেন্দ্রগুলির সঙ্গে দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ও অংশই সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু আমরা যদি মনে করি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় থেকে নলের মত শিরা সোজাসুজি মস্তিকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তাহলে আমরা খুব ভুল করব। মস্তিষ্কের অল্প কয়েকটি স্নায়ু-শিরা ব্যতীত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরাগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে মেরুদণ্ডের

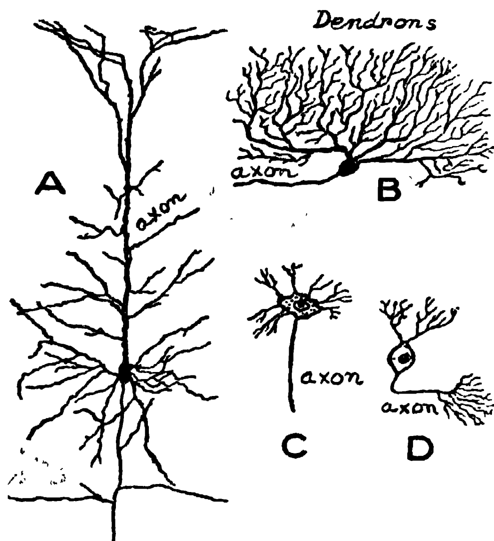


FIG. 12. Typical forms of neurons. A is a pyramidal cell from the cortex. B a neuron from the cerebellum. C a motor neuron from the spinal chord. D is a connecting neuron (Sandiford—Educational Psychology, P. 101, Fig. 26. Longmans Green & Co).

মধ্য দিয়ে ক্রমে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। স্নায়ুকোষগুলিরও (neurons) বিভিন্নতা আছে। জ্ঞানকেন্দ্র গঠনকারী, কর্মকেন্দ্র গঠনকারী ও সংযোগকারী—(sensory, motor ও connective) এই তিন দলে তাদের ভাগ করা চলে।

এই স্নায়ুকোষদের পরস্পর সংযোগ কি ভাবে হয়? প্রত্যেক স্নায়ুকোষের নিউক্লিয়স (Nucleus) এর চারদিকে ঝিল্লী আবরণ আছে, আর তা থেকে সরু সুতোর মত শিরা উপশিরা বেরিয়েছে।) এ শিরাগুলি দুরকমের, এ্যাক্সনস্ (Axons) আর ডেনড্রনস্ (dendrons) বা ডেনড্রাইটিস্ (dendrites)। এ্যাকস্নগুলো সাধারণতঃ লম্বা, কখনো কখনো কয়েক ফুট পর্যন্ত লম্বাও হতে পারে,—সেগুলি মসৃণ ও অভঙ্গ, কিন্তু ডেনড্রনস্ সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে খুব ছোট এবং তা খুব সরু সরু শাখা-প্রশাখায় ভেঙে যায়। অধিকাংশ স্নায়ুকোষের (nuron) একাধিক ডেনড্রন্ থাকে। অনেক স্নায়ুকোষের ডেনড্রনের সংখ্যা কুড়ি; কোন কোন কোষের ডেনড্রনের সংখ্যা শতাধিক হতেও দেখা যায়। বোধদা স্নায়ুকোষ (Sensory neuron)দের সাধারণতঃ একটি এ্যাকস্ন (Axon)ই থাকে, তাই তাদের একমেরু (unipolar) বলা হয়। কর্মদা স্নায়ুকোষের (Motor neurons) এ্যাক্সন (Axon) সাধারণতঃ একাধিক দিকে ছড়িয়ে যায়, তাই তাদের বলে বহুমেরু (Multipolar)। (একটা স্নায়ুকোষের এ্যাক্সনের শেষ অংশ (end brush) আর একটা স্নায়ুকোষের ডেন্ড্রাইটিস্ (dendrites) এর শাখা-প্রশাখাকে স্পর্শ করে; কিন্তু সেই সন্ধিস্থলে তারা জোড়া লাগে না। এই সন্ধিস্থলকে বলে স্নায়ুসন্ধি (synapse)।) বুঝতেই পারা যায় স্নায়ুমণ্ডলীতে বহু কোটি স্নায়ুসন্ধি আছে। একটা স্নায়ুকোষ থেকে শক্তি বা আবেশ অন্য স্নায়ুকোষে সঞ্চারিত হয় এই সন্ধিস্থলের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেখানে শক্তিকে কিছুটা বাধা অতিক্রম করতে হয়। (সোজাসোজি একটা স্নায়ুকোষ থেকে আর একটা স্নায়ুকোষে শক্তি জলের কলের নলের মত বয়ে যায় না।) স্নায়ুকোষগুলোকে জলপূর্ণ নল মনে করা খুব ভুল। বরং বলা যেতে পারে এরা অন্তরিত (insulated) বৈদ্যুতিক তারের মত। স্নায়বিক শক্তি বা উত্তেজনাও কতকটা বৈদ্যুতিক শক্তির মত—তরল পদার্থ নয়। কিন্তু বৈদ্যুৎ শক্তির সঙ্গে স্নায়ু শক্তির তফাতও রয়েছে। বৈদ্যুৎ শক্তির গতি অতিশয় দ্রুত; কিন্তু স্নায়বিক শক্তির গতি অনেক মন্থর। স্নায়ুসন্ধিগুলির বাধা অতিক্রম করে স্নায়বিক শক্তিকে কিছুটা ধীরে অগ্রসর হতে হয়। একটা স্নায়ুকোষের এ্যাক্সন্ একাধিক অন্য স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটস্এর সঙ্গে স্নায়ুসন্ধি দ্বারা সংযুক্ত। কাজেই এক স্নায়ুকোষ থেকে শক্তিটা কোন দিকে যাবে? যে পথ দিয়ে অনুরূপ শক্তি পূর্বে গেছে, সেই পথ দিয়ে যাওয়ারই ঝোঁক থাকে। একবার স্নায়বিক শক্তি

কোন স্নায়ুসন্ধির বাধা অতিক্রম করে গেলে, বাধাটা পরের বার কমে যায় বারে বারে শক্তিটা একই পথ দিয়ে গেলে স্নায়ুসন্ধির বাধা দুর্বল হয়ে পড়ে।

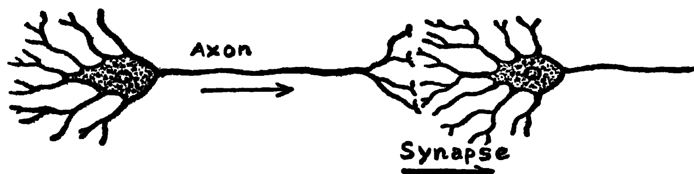


FIG. 13. Diagram of a synapse. (Woodworth—psychology, P. 252. Fig. 37. Methuen)

এই হচ্ছে অভ্যাসের মূল কথা, আর তাই অভ্যাস গঠনের কলকাঠি রয়েছে স্নায়ুসন্ধির হাতে। শক্তিটা যদি একবার মাত্র একটা স্নায়ুসন্ধির বাধা অতিক্রম করে একটা পথ ধরে যায়, আর যদি সেটা পুনরাবৃত্ত না হয় তবে স্নায়ুসন্ধির বাধা আবার প্রবল হয়ে ওঠে। নূতন কিছু শিখতে গেলে, নূতন অভ্যাস স্থাপন করতে গেলে পুরাতন অভ্যাসের ফলে স্নায়ুসন্ধির যে প্রবণতা, তা নষ্ট করতে হয়। শক্তিকে নূতন পথে চালিত করতে গেলে, স্নায়ুসন্ধির যে প্রবল বাধা তা জয় করতে হয়—এটা হচ্ছে শিক্ষার (learning) স্নায়বিক দিকটা। ক্লান্তির ফলে যে বিষ সঞ্চয় হয়, তার বিশেষ প্রভাব স্নায়ুসন্ধির উপর। তাতে স্নায়ুসন্ধির বাধা বেড়ে যায়। তাই ক্লান্ত দেহে নূতন পড়া বা নূতন কাজ শেখা কঠিন হয়। এ্যালকোহল (Alcohol), ক্লোরোফর্ম (Chloroform) ইত্যাদি মাদক দ্রব্যেরও ফল হচ্ছে স্নায়ুসন্ধির বাধা বৃদ্ধি। এ সব মাদক দ্রব্য তাই শিক্ষার পথে বাধা। আবার চা বা কফি সাময়িকভাবে স্নায়ুসন্ধির বাধা হ্রাস করে। তাই অল্প পরিমাণে এ সব মৃদু উত্তেজক পদার্থ ক্লান্তি নিবারক ও শিক্ষার সহায়ক।

স্নায়ুকোষগুলির দুটি প্রধান কাজ, উত্তেজনা (irritability) ও শক্তি স্থানান্তরণ (conductivity)। সামান্য উত্তেজনায়ই এরা স্পন্দিত হয় এবং স্নায়বিক শক্তি, স্নায়ুকোষকে অবলম্বন করেই ইন্দ্রিয়াদি থেকে স্নায়ুকেন্দ্রে, বা স্নায়ুকেন্দ্র থেকে কর্মেন্দ্রিয়গুলিতে বাহিত হয়। প্রত্যেক কোষেই এমন উপাদান আছে যা দিয়ে সমস্ত স্নায়ুকোষটির পোষণ (nutrition) হতে পারে। বিভিন্ন প্রকারের স্নায়ুকোষ—জ্ঞানদা, কর্মদা ও সংযোগী,—(sensory,

motor ও connective), তাহাদের ছবি দেওয়া হোল। স্নায়ুসন্ধির সাহায্যে সংযোগ কি করে হয় তাও দেখান হ'লো (Fig. 12 and 13)।

স্নায়ুশিরা (**Nerves**)—কোন জটিল শাসন ব্যবস্থা চালাতে গেলে মূল কেন্দ্রের সঙ্গে অধস্তন কেন্দ্রের ও বিভিন্ন বিভাগের পরস্পরের মধ্যে ও তাদের সঙ্গে মূলকেন্দ্রের সংযোগের সুব্যবস্থা থাকে। দেহযন্ত্রে এই সংযোগের কাজ বিস্ময়কর দক্ষতার সঙ্গে করে, স্নায়ুশিরাগুলি (nerves)। কেন্দ্রীয় স্নায়ুকেন্দ্র, অধস্তন স্নায়ুকেন্দ্র, মেরুদণ্ড ও তাদের থেকে যে সব শিরা উপশিরা বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ সাধন কচ্চে, তাদের খুব সামান্য একটু ধারণা আগের ছবিতে দিতে চেষ্টা করা গেছে (Fig. 11) (মস্তিষ্ক যেন একটা বিরাট টেলিফোন এক্সচেঞ্জের প্রধান কার্যালয়) দেহের প্রতিটি অংশ থেকে সংবাদ গিয়ে সেখানে পৌঁছচ্ছে, আবার সেখান থেকেই আদেশ বাহিত হচ্ছে, প্রত্যেক কর্মবিভাগে। এই জটিল সংযোগ সাধনের টেলিফোনের তার হচ্ছে স্নায়ুশিরা বা নার্ভস্।

এদেরও তিন দলে ভাগ করা হয়—(ক) জ্ঞানদা (sensory), (খ) কর্মদা (motor), (গ) সংযোগী (connective).

(a) জ্ঞানদা স্নায়ুশিরার (Sensory nerve) কাজ হচ্ছে ইন্দ্রিয় (receptors) গুলি থেকে ঊর্ধ্বতন বা মধ্যবর্তী স্নায়ুকেন্দ্রে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। এরা অন্তর্মুখী তাই তাদের অন্তর্মুখী স্নায়ুশিরাও (in-carrying nerves) বলে। এরা বোধ জন্মায়, তাই এদের নাম জ্ঞানদা শিরা (afferent nerves)।

(b) কর্মদা স্নায়ুশিরার (Motor nerve) কাজ হচ্ছে মূল কর্মকেন্দ্র (motor centres) হ'তে পেশী বা গ্রন্থিতে শক্তি বা আবেগ সঞ্চারিত করে দেওয়া। এরা বহির্মুখী তাই এদের নাম বহির্মুখী শিরা (out-carrying nerves)। এরা কাজ করে, তাই এদের কর্মদা শিরাও (efferent nerves) বলে।

(c) সংযোগী স্নায়ুশিরা (Connective nerves) বোধ-কেন্দ্র ও কর্ম-কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

যাতে বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা দরকার এমন চিন্তা বা কাজ করতে গেলে মূল স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হওয়া দরকার। মূল স্নায়ুকেন্দ্রের স্থান মস্তিষ্কে। তাই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা দেহের বিভিন্ন বোধসম্পন্ন অংশ থেকে, সোজাসুজি না হলেও,

গৌণভাবে মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুশিরার সাহায্যে যোগ স্থাপিত হয়। আবার মস্তিষ্কের মূল কর্মকেন্দ্র থেকে শিরা উপশিরা বেরিয়ে সমস্ত পেশী ও গ্রন্থির সঙ্গে সোজাসুজি না হলেও, অপ্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন করে।

কিন্তু যে ক্রিয়াতে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই, তার কেন্দ্র মস্তিষ্কে নয়, মেরুদণ্ডে।

তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া চাপ (The Reflex Arc)—হঠাৎ হাত দিয়েছ গরম কেৎলীতে। তৎক্ষণাৎ হাতটি সঙ্কুচিত হল। এ হচ্ছে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া (Reflex action)। বাইরের উত্তেজনার অব্যবহিত পরেই ক্রিয়া, যাতে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই—তেমন ক্রিয়াকে বলে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া। এ হচ্ছে জরুরী অবস্থা (emergency) অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা। এখানে চটপট কাজ হওয়া দরকার। তাই দেহের আক্রান্ত অংশ থেকে বিপদ সংকেত তৎক্ষণাৎ বেয়ে চল্ল জ্ঞানদা স্নায়ু শিরার (Sensory nerve) সূত্র দিয়ে। সে শিরা (nerve) জরুরী বোধ কেন্দ্রে (Lower

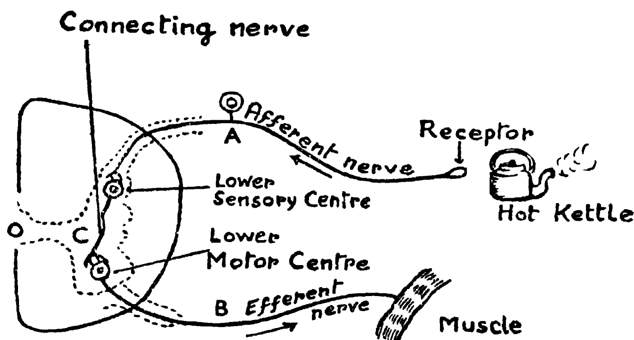


FIG. 14—A Reflex arc. Transverse section through left half of the chord to illustrate reflex action. K. Walker. Human Physiology P. 115. FIG. 26. Penguin Books.

sensory centre) এ সংবাদ পৌঁছে দিলে। সেখান থেকে ফোন করা হোল জরুরী কর্মকেন্দ্রে (Lower motor centre)এ। অর্থাৎ বোধকেন্দ্র থেকে সংযোজক স্নায়ুশিরা (connective nerve) বেয়ে আবেগ পৌঁছল গিয়ে কর্মকেন্দ্রে। এবার কর্মকেন্দ্র জাগ্রত হল। সে হুকুম পাঠালে কর্মদা স্নায়ুশিরার (motor nerve) সাহায্যে উপযুক্ত পেশীর কাছে। পেশী ঝটপট হুকুম

আমিল কল্লে। এই যে বোধ ও ক্রিয়ার সহজতম চাপ বা চক্রাংশ, একে বলে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া চাপ (the reflex arc)। ছবি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যাচ্ছে। কিন্তু, যেখানে বিচার বিবেচনা দরকার, সেখানে চক্রটি অনেক বেশী জটিল, কেন না মস্তিষ্কের মূল বোধকেন্দ্র ও মূল কর্মকেন্দ্র উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়ে উঠা চাই। সেখানেও স্নায়ুশিরা বা নার্ভরাই সংবাদ গ্রহণ, সংযোজন ও ক্রিয়ার আবেগ বহনের কাজ করবে। তবে রাস্তাটা এবার অনেক বড় হবে। কারণ পথটা মস্তিষ্ক পর্যন্ত যাবে এবং সেখানে থেকে নিম্নতর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে পেশী পর্যন্ত পৌছবে।

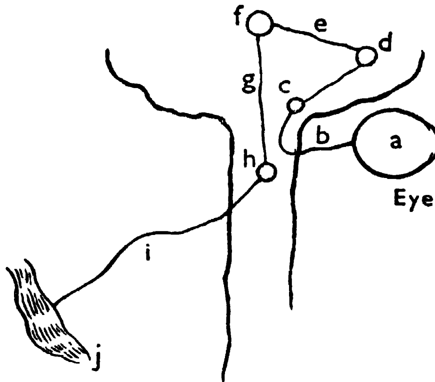


FIG. 15—Nerve path in voluntary action (a) receptor organ, (b) sensory nerve, (c) Lower sensory centre, (d) Higher sensory centre in the brain, (e) Connective nerve, (f) Higher motor centre in the brain, (g) Motor nerve from the brain, (h) Lower motor centre in the spinal chord, (i) Motor nerve from the spinal chord, (j) Muscle.

(মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া স্নায়ু শিরা বেরিয়েছে, তারা মুখমণ্ডলের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের সংযোগ সাধন কচ্ছে। এদের বলে করোটি স্নায়ু শিরা (cranial nerves)। আবার মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়েছে ৩১ জোড়া, তারা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রধান পেশী, আভ্যন্তরীণ জীবন-ক্রিয়ার প্রধান কয়টি যন্ত্রের সঙ্গে মেরুদণ্ডে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রের সংযোগ সাধন করে। এদের নাম সুষুম্না শিরা (spinal nerves)।

সুষুম্না কাণ্ড (The Spinal Chord)—মেরুদণ্ড কতগুলি ছোট-

ছোট অস্থির সংযোগ দিয়ে তৈরী, যেন একটি হাড়ের মালা। এদের মধ্যস্থলে ছিদ্র দিয়ে স্নায়বিক উপাদানে গঠিত একটি ফিতে চলে গেছে—একেই বলে সুষুম্না কাণ্ড (spinal chord)। এ অস্থিখণ্ডগুলিকে বলে কশেরুকা (vertebræ)। দুটি অস্থিখণ্ডের সংযোগস্থল হ'তে দুদিকে বেরিয়ে গেছে প্রধান স্নায়ু শিরা (nerve) গুলি—তাদের শাখা-প্রশাখাই ছড়িয়ে গেছে দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়গুলিতে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড একই কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল (central nervous system)-এর বিভিন্ন অংশ। বাস্তবিক পক্ষে মেরুদণ্ডটা (spinal column) যেন একটা করিডর (corridor) বা সুড়ঙ্গ, যার মধ্য দিয়ে দেহের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয় থেকে জ্ঞানদা (sensory) এবং কর্মদা শিরা (motor) এসে সর্বশেষে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুকেন্দ্রগুলির সঙ্গে মিশেছে। মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে যে ফিতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত, তা ছাড়া মেরুদণ্ডের সমান্তরাল স্নায়ুসূত্রে গ্রথিত কতগুলি কোষগুচ্ছ আছে। কতগুলি স্নায়ুকোষ এক এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিম্নস্থ স্নায়ুকেন্দ্রস্থল (lower sensory and motor centres) হয়েছে। এদের বলে গ্যাংলিয়া (ganglia)। উপরের দিকে মেরুদণ্ডটি মোটা হয়ে যেখানে মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে সে অংশকে বলে সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla oblongata)। এখানে যে সব স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত তা শ্বাস-প্রশ্বাস রক্তচলাচল পরিচালনা করে। মেরুদণ্ডের ভিতর এই সম্পূর্ণ যান্ত্রিক তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র অবস্থিত। মধ্য স্বয়ং-ক্রিয় মণ্ডল (Sympathetic system)—যার অন্তর্গত হচ্ছে অন্ত্র (viscera) ইত্যাদি মসৃণ পেশী (smooth muscles) ও কয়েকটি গ্রন্থি, তাদের শাসন কেন্দ্রও সুষুম্না কাণ্ডে। এই মধ্য-স্বয়ংক্রিয় মণ্ডলের গুরুত্ব এ কারণে, যে প্রবল অনুভূতির সময় এই কেন্দ্র, বিশেষ করে সক্রিয় হয় এবং এ্যাড্রেনাল্ গ্রন্থি থেকে রক্তপ্রবাহে রসক্ষরণ হওয়াতে পেশীগুলি বল লাভ করে,—যাতে যুদ্ধ (fight) বা পলায়ন (flight) এ দুই জৈব-ক্রিয়ারই সাহায্য হয়। জনন গ্রন্থি (Sex Glands) বা গোনাড্‌স্ সুষুম্না (Gonads) কাণ্ডের নিম্নদিকে অবস্থিত কেন্দ্র দ্বারা শাসিত হয়।

মস্তিষ্ক (The Brain)—মস্তিষ্ক হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সদর দপ্তর। সমগ্র মস্তিষ্কটি একটি মোটা বৃন্তের উপর রক্ষিত একটি ফুলকপির মত দেখতে। এর উপরে সাদা রংএর মগজের আবরণ ও ভিতরে ধূসর রংএর স্নায়ু-পদার্থ। এ ধূসর পদার্থ (grey matter) হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট স্নায়বিক উপাদান। এ জিনিষ

যে মানুষের মস্তিষ্কে যত বেশী সে তত বেশী বুদ্ধিমান্। সবচেয়ে বেশী পরিমাণ এ পদার্থ যাতে মস্তিষ্কে স্থান পেতে পারে, সে জন্যে মস্তিষ্কের আবরণটা অনেক

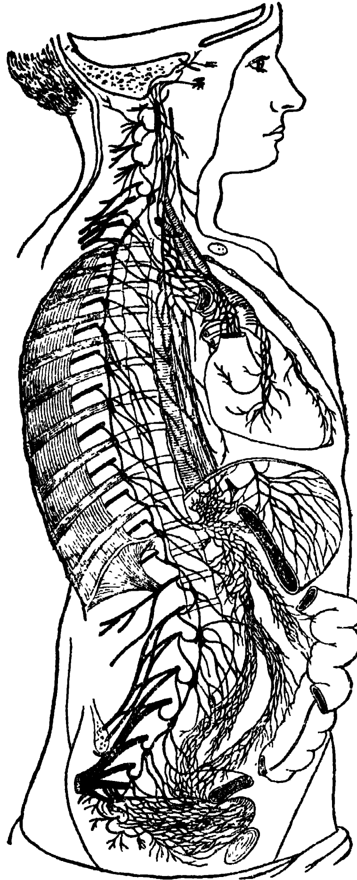


Fig. 16—Spinal column, showing the right sympathetic chain (Lickley the Nervous system P. 29, Fig. 30. Longmans Green & Co).

জায়গায় কোঁচকানো আর ভাঁজ করা। সমস্ত মস্তিষ্কটার মাঝখান দিয়ে একটি বিদারণ রেখা মস্তিষ্ককে দুটি অর্ধাংশে (lobes or hemispheres) ভাগ করেছে। দুটি ভাগের গঠন একই রকম। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার এই যে,

মস্তিষ্কের বাম অর্ধাংশে দেহের ডানদিকের সব শিরা উপশিরা এসে শেষ হয়েছে, আবার মস্তিষ্কের ডান অর্ধাংশে দেহের বাঁদিকের সব শিরা উপশিরা এসে শেষ হয়েছে। অর্থাৎ মস্তিষ্কের বাম অর্ধাংশ দেহের ডানদিকের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদিকে পরিচালনা করে, আর ডান অর্ধাংশ দেহের বামদিকের সমস্ত অংশকে শাসন করে। মস্তিষ্কের প্রত্যেক অর্ধাংশেই কতকগুলি গভীর ও অগভীর খালের মত আছে, তাদের মধ্যে প্রধান দুটির নাম রোলাণ্ডোর নালী (Fissure of Rolando) ও সিলভিয়াস্-এর নালী (Fissure of Sylvius)। এগুলি প্রত্যেক অর্ধাংশকে চারটি ভাগে ভাগ করে। সামনে থেকে সুরু করে, —সম্মুখ (Frontal,) মধ্য (Parietal), পশ্চাৎ (Occipital) ও নিম্ন (Temporal)। মস্তিষ্কের খাল (fissures or sulci) ও কুঞ্চন (convolusions) বেশী হলেই ধূসর পদার্থ বেশী থাকবার জায়গা পায়—কাজেই বুদ্ধিও বেশী হয়। বাস্তবিক পক্ষে, বুদ্ধিমান্ লোকদের মগজ তুলনায় বেশী ভারী, আর তাতে কুঞ্চন ও বিদারণ রেখাগুলি সংখ্যায় বেশী, খালগুলির গভীরতাও বেশী। শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মৃত্যুর পর তাদের মস্তিষ্কের ওজন নিয়ে দেখা গেছে যে দেহের মাপের তুলনায় তাদের মস্তিষ্কের গুরুত্ব সাধারণ লোকের চেয়ে অনেকটা বেশী। বিশেষ করে, এঁদের মস্তিষ্কে কুঞ্চন ও রেখা সংখ্যায় অধিকতর ও জটিলতর। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায় যে সব প্রাণী বেশী বুদ্ধিমান্, তাদের মগজের ওজনও দেহের তুলনায় বেশী। তার চেয়েও বড় কথা, যে প্রাণী যত বেশী বুদ্ধিমান, তার মগজে কুঞ্চন ও বিদারণ রেখার সংখ্যাও বেশী, তাদের জটিলতা ও গভীরতাও বেশী। সাধারণ প্রচলিত ধারণা, পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্। বাস্তবিকপক্ষে পুরুষের মগজের ওজন স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশী, কিন্তু দেহের ওজনের তুলনায় মেয়েদের মগজের ওজন পুরুষের চেয়ে কিছু বেশী। মস্তিষ্কটি স্নায়ু ও তাদের পরস্পর সংযোগ দিয়ে একেবারে ঠাসা, কারণ এখানেই হচ্ছে প্রধান বোধ ও কর্মের স্নায়ুকেন্দ্র—এখানেই হচ্ছে বুদ্ধি, বিবেচনা, স্মৃতি, কল্পনা, ধ্যান, ধারণা, আদর্শের আশ্রয়স্থল।

পূর্বেই বলা হয়েছে মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান ও দুইটি অপ্রধান অংশ। দুটি অপ্রধান অংশ সুষুম্নাশীর্ষক,—যেটাকে মেরুদণ্ডের উর্ধ্বাংশ বলা যেতে পারে। এর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পনস্ (Pons) সম্বন্ধে এটুকু জানলেই যথেষ্ট যে গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum) ও লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum) এর মধ্যে সংযোগ সাধনের একটি প্রধান উপায়।

লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum)—এটি গুরুমস্তিষ্কের নীচে ঘাড়ের দিকে অবস্থিত। দেহের ভারসাম্য রক্ষার কেন্দ্র এখানে। সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া ইত্যাদি ক্রিয়া, যেখানে অনেকগুলি পেশীর সমন্বয় প্রয়োজন, তার কেন্দ্রও এইখানে। পেশীগুলির সুস্থতা ও বল রক্ষায়ও লঘুমস্তিষ্কস্থিত কেন্দ্রের দায়িত্ব আছে। লঘুমস্তিষ্ক ও গুরুমস্তিষ্কের ন্যায় দুটি অর্ধাংশে (lobes) বিভক্ত।

মধ্যমস্তিষ্ক **(mid-brain, Inter-brain or basal ganglia)**—এটি মস্তিষ্কের প্রধান অংশ গুরুমস্তিষ্কের নীচে এবং লঘুমস্তিষ্কের উপরে অবস্থিত। এর মধ্য দিয়ে মেরুদণ্ড থেকে স্নায়ুশিরাগুলি গুরুমস্তিষ্কের মূল বোধ ও কর্মকেন্দ্রে

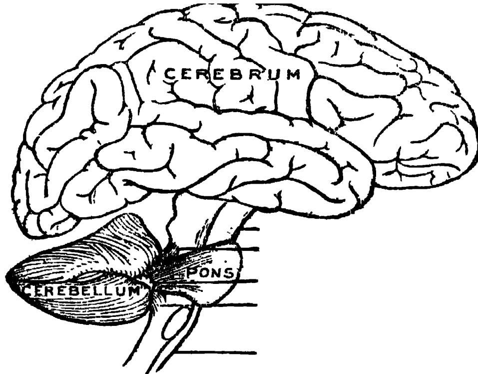


Fig. 17.—The brain and its parts. (Lickley, The Nervous System. P. 21. Fig. 22, Longmans Green & Co.)

গিয়ে পৌঁছে। এখানে অবস্থিত থ্যালামাস্ (thalamas) সম্ভবতঃ সুষুম্নাশীর্ষকে অবস্থিত কেন্দ্রগুলিকে ও মধ্য স্বয়ংক্রিয় মণ্ডলকে প্রভাবান্বিত করে। চোখের চলাচলের পেশী এবং ইচ্ছা দ্বারা চালিত পেশীগুলির (voluntary muscles) উপরও মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রের প্রভাব আছে।

গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)—আগেই বলা হয়েছে এটি স্নায়ুমণ্ডলীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা জটিল অংশ। এতে দুটি গোলার্ধ (hemispheres বা lobes) আছে, তাও আগেই বলেছি। এর আকুঞ্চিত ও বিভিন্ন অংশে বিদীর্ণ আকারের কথাও বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা ছবি থেকে পাওয়া যাবে। (Fig. 18) এখানেই বোধ ও কর্মের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। সমগ্র স্নায়ু-

কেন্দ্রের অন্যান্য অংশের ক্রিয়ার সমন্বয়-সাধনের ভার গুরুমস্তিকের। এর ক্ষমতা আছে নিম্নতর কেন্দ্রগুলিকে উত্তেজিত করবার বা বাধা দেবার বা তাদের

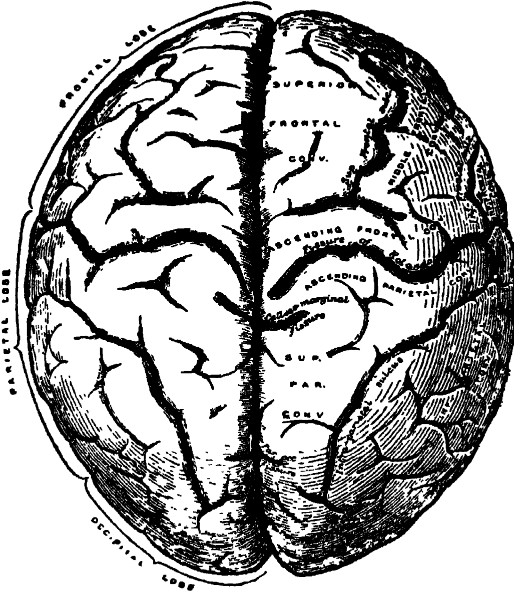


FiG 18.—Convolutions and sulci on the upper surface of the cerebral hemispheres. (Lickley, The Nervous System P. 50, Fig.57. Longmans Green & Co.)

ক্রিয়াকে সমন্বয় করার বা বিভক্ত করার। স্টাউট বলেছেন, "গুরুমস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, মধ্যমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক বা অন্য স্নায়ুকোষের প্রক্রিয়াগুলি আরম্ভ করে, আবদ্ধ করে, একত্র করে বা বিযুক্ত করে।" [১৭]

সমগ্র গুরুমস্তিষ্ক কেন, সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীই এক হিসাবে একটি অখণ্ড যন্ত্র। কারণ এর প্রত্যেক অংশই প্রত্যেক অংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত; কিন্তু তথাপি পরীক্ষায় জানা যায় গুরুমস্তিকের বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বোধ বা কর্মের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় দেখা যায়, গুরুমস্তিকের একটি অংশ ছেদন করলে, অথবা রুগ্ন হ'লে—একটি বিশেষ

১৭ Stout. Manual of Psychology.

অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা অবশ হ'য়ে পড়ে। আবার অন্ত একটি অংশ বিকল হলে কোন ইন্দ্রিয় বোধ-শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে। আবার কৃত্রিমভাবে মস্তিষ্কে কোন কেন্দ্রকে উত্তেজিত করলে একটি অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। অস্ত্র করে হাতটা কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এমন মানুষের বোধের একটি কেন্দ্র বৈদ্যুত শক্তি দ্বারা উত্তেজিত করে দেখা গেল, সে হাওয়ায় চুলকাচ্ছে—সে জায়গায়, যেখানে তার সুস্থ হাতটা ছিল। এ সব থেকে দেহবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন গুরুমস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ, বিশেষ বিশেষ বোধ, কর্ম বা সংযোগের কেন্দ্র; অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কে সংবেদনস্থান (sensory areas), কর্মস্থান (motor area) ও সংযোগস্থান (association areas) এ রকম ভাগ আছে। একে বলে গুরুমস্তিষ্কে বিভিন্ন স্থান বিভাগ (Localisation of functions in the cerebrum)।

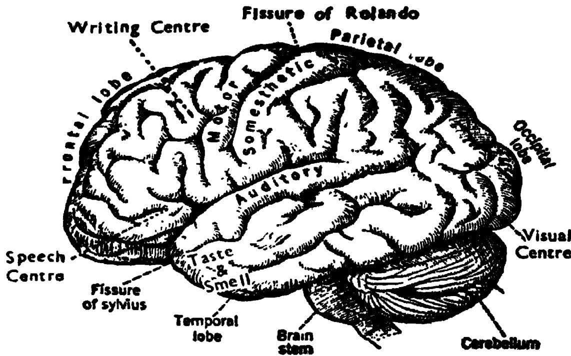


FIG. 19—Localisation of functions in the Cerebrum. Woodworth—Psychology, P. 26, FIG. 48. Methuen.

কর্মস্থান প্রথম আবিষ্কৃত হয়। গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখ প্রকোষ্ঠে (Frontal lobe) কেন্দ্রীয় নালী রেখা বা রোলাণ্ডোর. নালীর পাশাপাশি, এবং এই নালীর বাঁয়ে ও প্রাক্-কেন্দ্রীয় আবর্তের (pre-central gyrus) ডানের অংশটায়, মূল কর্মকেন্দ্র (cortical motor area) অবস্থিত। উপরের দিক থেকে নীচে নেমে এলে আমরা কর্মকেন্দ্রগুলি এভাবে সাজানো দেখি—পায়ের আঙুল, পা, হাঁটু, জঙ্ঘা, হাত, মুখ (Toe, Feet, Knee, Hip, Arm, Face)। কথা বলার কেন্দ্র (speech centre), কর্মস্থানের নীচ দিকে। লেখার কেন্দ্র (writing centre), কর্মস্থানের বাঁয়ে, প্রাক্-কেন্দ্রীয় আবর্তেরও (pre-central gyrus) বাঁয়ে।

সংবেদ স্থানগুলি (sensory area) নানা জায়গায় ছড়ানো। মধ্য মস্তিষ্কার্ধে (Parietal lobe) রোলাণ্ডো নালীর ডাইনে, কর্মস্থানের সমান্তরাল, রোলাণ্ডো নালী ও উত্তর কেন্দ্রীয় আবর্তের (Post central gyrus) মধ্যবর্তী অংশ হচ্ছে স্পর্শ ও পেশীর বোধের কেন্দ্র (Somaesthetic area)। শ্রবণের কেন্দ্র (Auditory area) সিলভিয়াসের নালীর (Fissure of Sylvius) ডাইনে, গুরুমস্তিষ্কের সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠের উপরে অবস্থিত। এই নিম্ন প্রকোষ্ঠে (Temporal lobe) সিল্‌ভিয়াসের নালীর ডাইনে, নীচ দিকে, স্বাদ ও গন্ধের কেন্দ্র (Taste and Smell area)। গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে (Occipital lobe), নীচের দিকে দৃষ্টিকেন্দ্র (Visual area)।

মস্তিষ্কের অনেক অংশ সম্বন্ধে দেহবিজ্ঞানীদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। অনেকগুলি কেন্দ্র আছে যেখানে বিভিন্ন বোধ ও ক্রিয়ার মধ্যে সংযোগের কাজটি সম্পন্ন হয়। এদের বলে সংযোগ কেন্দ্র (Association centres)।

গল্‌ (Gall) প্রথমে এই বিভিন্ন কেন্দ্র আবিষ্কার করার পর, তিনি ও তাঁর পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা ইত্যাদি বিভিন্ন মনোবৃত্তির কেন্দ্র আবিষ্কারে উৎসাহী হলেন। এ বিষয়ে বেশ বাড়াবাড়িই সুরু হ'ল। কেউ কেউ বললেন, মস্তিষ্কের গঠন, মস্তিষ্কের নানা দিকে ফুলা (bulges) লক্ষ্য করে' একজন লোকের চরিত্র বলে' দেওয়া যেতে পারে। এর থেকেই জন্ম হ'ল ফ্যাকাল্‌টি মনোবিজ্ঞানের (Faculty Psychology)। এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হয়েছে। কর্মস্থান ও সংবেদস্থানের অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকটি সংযোগকেন্দ্রের সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া গেছে। কিন্তু তার বাইরে গুরুমস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও অন্ধকারে আছেন। এখানে আবারও বলা দরকার যে মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ পৃথক বা স্বাধীনভাবে কাজ করে না। সমস্ত মস্তিষ্কটিই একসঙ্গে কাজ করে। এর সমস্ত অংশ ও কেন্দ্র পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এ কথাটা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। ফ্লুরেন্স (Flourens) ও ল্যাস্‌লী (Lashley) এ কথার উপর খুব জোর দিয়েছেন।

স্নায়ুমণ্ডলী তাদের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া সহজে ও সংক্ষেপে বুঝতে পরপৃষ্ঠার চার্ট সাহায্য করবে।

এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সংবেদ-কেন্দ্র মোটামুটি নির্দিষ্ট। সেই সেই ইন্দ্রিয়ের স্মৃতির স্থানও মোটামুটিভাবে সেই সংবেদ-

কেন্দ্রের কাছাকাছি পাওয়া যায়। তাই শব্দ শোনার স্মৃতির স্থান শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংবেদ-কেন্দ্রের কাছাকাছি, কিন্তু সেই শব্দ-দেখার স্মৃতির স্থান দর্শনেন্দ্রিয়ের সংবেদ-কেন্দ্রের নিকটে। আবার সেই শব্দ-লেখার স্মৃতি অঙ্গুলির পেশী সঞ্চালক কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত; কাজেই শব্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্মৃতি যাকে বের্গস বা ক্যাটেল্ বলবেন true memory। সেটার জন্যে সমগ্র মস্তিষ্কের সক্রিয়তাই প্রয়োজন। বিশেষ করে বিচার, বিবেচনা ইত্যাদি উচ্চতর চিন্তার ব্যাপারে মস্তিষ্কের কোন একটি বিশেষ অংশকে দায়ী করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র মস্তিষ্কই সেখানে ক্রিয়া করে। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কেন্দ্রের কিছু স্নায়ু কোন কারণে রুগ্ন বা নষ্ট হলে অন্য কেন্দ্রের স্নায়ু সে কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

ক্যাটেল্ বলেন, মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে ক্রম-পরিণতির চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট। একেবারে নিম্নতম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের থেকে মানুষে এসে পৌঁছলে এটা দেখা যায়, গুরুমস্তিষ্কটি বিকশিত হয়েছে অনেক পরে ও ধীরে ধীরে। জীবনের জটিলতর প্রয়োজন মেটাবার জন্যই গুরুমস্তিষ্কের ক্রমপরিণতি এবং এই ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মস্তিষ্কের গঠনও ক্রমশঃ জটিলতর হয়েছে এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগসূত্র ক্রমশঃই বেড়েছে। নিম্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অপেক্ষাকৃত সরল অপরিণত মস্তিষ্ককে বলা যায়—the old brain। এই মস্তিষ্ক জীবনের স্থূলতম প্রয়োজন মেটাবার জন্যই সৃষ্ট। এই মস্তিষ্কে প্রধান প্রধান সংবেদকেন্দ্র (যথা—আস্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও দর্শন) ও প্রধান প্রধান পেশী সঞ্চালনের কর্মকেন্দ্র বর্তমান। জীবনের এই অবস্থায় আবেগসমূহ প্রবল, স্থূল ও পরিচালনাবিহীন। কিন্তু গুরুমস্তিষ্কের পরিণতির সঙ্গে এসেছে কর্ম ও আবেগের বিচার, শাসন ও পরিচালনা। এ অংশ ক্রমপরিণতির ধারায় আগন্তুক। তাই এই অংশকে বলা হয়েছে—the new brain। জীবনশক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত এলে এই অংশই বিকল হয় সকলের আগে এবং এ অংশের রোগের চিকিৎসা সবচেয়ে কঠিন।

সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে এই একটি সাধারণ নিয়ম দেখা যায়, যতই আমরা মেরুদণ্ডের থেকে সুরু করে মস্তিষ্কের দিকে উঠতে থাকি—ততই গঠন জটিলতর—নিম্নতর স্নায়ু-কেন্দ্রগুলি, উচ্চতর কেন্দ্র দ্বারা শাসিত, সংযত ও পরিচালিত। সেই কেন্দ্রগুলি আবার উচ্চতর কেন্দ্রের অধীন এবং প্রয়োজন হলে উচ্চতর কেন্দ্র নিম্নতর কেন্দ্রের কাজ চালাতে পারে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বা ক্রিয়া খুব একটা যুক্তি-সঙ্গত প্ল্যান্ অনুসারে গঠিত তা নয়—বহু ব্যতিক্রম, বহু বৈপরীত্য, বহু পুনরুক্তি দোষ এখানে ঘটেছে। তাই ক্যাটেল্ মস্তিষ্কের পরিণতিকে তুলনা করেছেন বৃটিশ কন্‌সটিট্যুসনের সঙ্গে, পুরোনো কাঠামোর উপরই জোড়াতাড়া দিয়ে নতুন ইমারত গড়া হয়েছে—এর সুবিধে হচ্ছে পুরোনোর সঙ্গে নূতনের একটা সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে যায়নি—এতে এসেছে একটা স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা—অসুবিধের মধ্যে হচ্ছে একেবারে নতুন অবস্থার সঙ্গে এ খুব দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।

মোট কথা স্নায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে যতই বেশী জানা যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে এর অনেক বেশীই এখনও অজানা রয়ে গেল।[১৮]

---

১৮ R. B. Cattell—Your Mind & Mine P. 28-34.

পঞ্চম অধ্যায়

সংবেদন বা প্রাথমিক বোধ—Sensation

ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে মনের কাছে সংবাদ পৌঁছে, বাইরের বিশ্বের ও দেহের অভ্যন্তরের। এই প্রত্যক্ষ প্রাথমিক বোধকে ইংরাজীতে বলে, sensation। ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুতন্তু উত্তেজিত হ'লে সে উত্তেজনা স্নায়ু-শিরা বয়ে উপনীত হয় মস্তিষ্কের স্নায়ু কেন্দ্রে—তখন বোধ জাগে। একথা ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনায় সময় বলা হয়েছে। এই প্রাথমিক বোধই হচ্ছে বস্তুজ্ঞানের, স্থান ও কাল জ্ঞানের মূল উপাদান। বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ইংরাজীতে বলে perception। সংবেদন (Sensation) হচ্ছে তারও পূর্বের অবস্থা। সংবেদন সম্বন্ধে সালীর (Sully) সংজ্ঞা, "সংবেদন হচ্ছে সহজতম মানসক্রিয়া। এটা ঘটে যখন কোন সংবেদ-স্নায়ুশিরার (afferent nerve) শেষাংশ উত্তেজিত হয়, এবং এ উত্তেজনা অন্তর্মুখে মস্তিষ্কে বাহিত হয়।"[১] স্যাণ্ডিফোর্ডের সংজ্ঞাও অনুরূপ, "কোন গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়স্থান থেকে স্নায়বিক শক্তি মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রে বাহিত হলে যে সহজ চেতনার উৎপত্তি হয়, তাকে সংবেদন বলে।"[২]

'ঢং ঢং ঢং',—বায়ুতরঙ্গ ভেসে এসে আঘাত করলো কর্ণপটহে (drum-membrane)। এ আঘাত মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের জটিল অস্থিমালা ও যন্ত্রাদির গোলক ধাঁধা উত্তীর্ণ হয়ে, স্নায়ুশিরা বয়ে, মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়ে উপনীত হলে আমরা শব্দগুলি শুনি,—এ হোল সংবেদন (sensation)। কিন্তু যখন এই ঢং ঢং ঢং শুনে বললাম—বাসার পূর্বদিকে দুশো গজ দূরে কলেজের ঘণ্টাটা বাজছে —তখন এই পূর্ণতর জ্ঞানকে বলি, প্রত্যক্ষজ্ঞান (perception)। বাস্তবিক পক্ষে, অমিশ্র সংবেদন বলে কোন মানসিক প্রক্রিয়া নেই—মানসিক ক্রিয়ার সুরু হয় প্রত্যক্ষজ্ঞানে। ওয়ার্ড তাই বলেছেন, "বিশুদ্ধ সংবেদন মনোবিজ্ঞানের

১ "A sensation is a simple psychical phenomenon resulting from the stimulation of the peripheral extremity of an afferent nerve, when this is propagated to the brain." Sully—A Textbook of Psychology.

২ "A sensation is...the simple consciousness aroused by the transmission of nervous energy from a receptor or sense organ to some part of the cerebral cortex." Sandiford—Physical & Mental life of School Children.

একটা মিথ্যা কথা"—A pure sensation is a psychological myth। যুক্তিগত বিশ্লেষণ দিয়ে আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূল উপাদান হচ্ছে সংবেদন (sensation)। এই প্রাথমিক একাধিক বোধকে সমন্বয় করে, যখন বস্তুজ্ঞান জন্মে, তখন তা হোল প্রত্যক্ষজ্ঞান (perception)। প্রত্যক্ষজ্ঞান হোল সংবেদনের তাৎপর্যবোধ।[৩]

সংবেদন তা হ'লে শুধুমাত্র গুণের বোধ যা তখনও বস্তুর জ্ঞানে পরিণত হয়নি। ওটা লাল, এটি শক্ত, এ মিষ্টি—এই পর্যন্ত বোধকে বলি সংবেদন, কিন্তু যখন জেনেছি ওটা লাল আপেল, এটি শক্ত লোহার হাতল, এ মিষ্টি সন্দেশ, তখন তা প্রত্যক্ষজ্ঞানের শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। অবিশ্যি খুব ঠিক করে বললে 'ওটা লাল' বলার মধ্যেও তাৎপর্যবোধ এসে গেছে, কাজেই তাও প্রত্যক্ষজ্ঞান। তবে অতটা সূক্ষ্মভাবে সংবেদন কথাটা নেওয়া হয় না।

সংবেদনের ধর্ম (Characters of sensation)—একটা সংবেদন আর একটি সংবেদন থেকে তফাত করতে পারি কি ভাবে? এ তফাতটা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করতে পারি—

(১) গুণ (Quality)—গুণ বা Quality দিয়ে এক সংবেদনকে আরেক সংবেদন থেকে আলাদা করা যায়। শব্দ, এই বোধের থেকে, স্বাদ এই বোধ গুণে তফাত। এ গুণের তফাত কেন হয়? উত্তেজক বা stimulus বিভিন্ন হওয়ার জন্যে ও ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতার জন্যে। ইথার তরঙ্গ থেকে পাই রং, যা চক্ষু দিয়ে বোধ করি, আবার বায়ু তরঙ্গ থেকে পাই শব্দ, যার বোধ জন্মে কান দিয়ে। দর্শন যে স্নায়ুর উত্তেজনা থেকে জন্মে, তা শ্রবণের স্নায়ু থেকে আলাদা। ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য থেকে যে বোধের গুণের পার্থক্য, তাকে বলে মৌলিকগুণগত পার্থক্য (Generic difference in quality)। আবার একই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও তো বিভিন্ন গুণের পার্থক্য হ'তে পারে—যেমন চোখ দিয়ে লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং দেখি। এ রকম পার্থক্যকে বলে গুণগত বিশিষ্ট পার্থক্য (specific difference in quality)। এখানেও স্নায়ুর পার্থক্য আছে। মুলার (Muller) এটা প্রমাণ করেছেন এবং তিনি এটাও প্রমাণ করেছেন যে বোধের জন্যে যে স্নায়ুশিরা ব্যবহৃত হয়, কর্মের জন্য

৩ "Perception is the interpretation of sensations—it is the organisation of sensations into the cognition of objects. It is the objectification and localisation of sensations."

সে স্নায়ুশিরা ব্যবহৃত হয় না। মূলারের মতকে বিভিন্ন স্নায়ুশিরার শক্তির প্রভেদ (the theory of the specific energy of nerves) বলা হয়।

(২) **পরিমাণ (Quantity)**—পরিমাণ দিয়েও এক সংবেদন আর এক সংবেদন থেকে পৃথক হতে পারে, যেমন—একটা লাল রং ঘোর, আর একটা ফিকে, একটা জল খুব গরম, আর একটা সামান্য গরম, তফাতটা এ সব ক্ষেত্রে গুণগত নয়,—পরিমাণগত।

(৩) **স্থান-ব্যাপ্তি (Extensity)**—স্থান বা দেশ (space) এর পরিপূর্ণ জ্ঞানের মূল, প্রাথমিক বোধের মধ্যেই অস্পষ্টভাবে থাকে—স্টাউট, জেমস্ ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীরা এই মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, আমরা যখন স্পর্শ করি, সেই বোধের মধ্যেই আছে এই বোধও, যে এটা কতকটা জায়গা জুড়ে আছে। চোখ দিয়ে শুধু রংই দেখি না—সেটা কতটা ছড়িয়ে আছে, সে বোধও সঙ্গে সঙ্গেই আসে। এমন কি শব্দের বেলায়ও এ রকম ছোট, বড়, বোধ হয়। শ্লেট-পেনসিলের শ্লেটের মধ্যে কিচ্ কিচ্ শব্দে, আমাদের বোধ হয় এটা অল্প জায়গা জুড়ে আছে, আর বজ্রের গুরুগর্জনে বোধ জন্মে, এক বিশাল বিস্তারের। হাতের চামড়ার উপরে একটি ডাকটিকিট এঁটে দিলে, কতকটা জায়গা জুড়ে আছে সে বোধ জন্মে। পাশে যদি আর একটি ডাকটিকিট আঁটি, তখনই বুঝি আরো বেশী জায়গা জুড়ে আছে।[৪]

(৪) **কালব্যাপ্তি (Protensity বা duration)**—মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রত্যেক বোধের মধ্যে কালের বিস্তারের বোধও থাকে। পেনটা দিয়ে লিখছি। স্পর্শবোধ, যে এটা শক্ত, তাতো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে এ বোধও আছে, কতটা সময় পেনটাকে ছুঁয়ে আছি। চোখ দিয়ে দেখছি, একটা দেশলাইর কাঠি পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বোধ হল, এটা খুব অল্পক্ষণের ব্যাপার। আবার সিনেমার ছবি দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে বোধ হল, বেশ কিছুটা সময় ধরেই দেখাটা চলেছে।

(৫) **স্থানীয় বিশেষত্ব (Local character)**—একই ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশের বোধ অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন। একটা ডাকটিকিট হাতের তালুতে আঁটা হোল, আর একটা কপালে, আর একটা পিঠে—তিনটাতেই স্পর্শবোধ জাগাচ্ছে—তিন ক্ষেত্রেই পরিমাণও সমান, কিন্তু তবুও তফাত,—সেটা ইন্দ্রিয়ের স্থানভেদের পার্থক্য।

Stout—Manual of Psychology.

(৬) **ভাল মন্দ লাগা (Feeling tone)**—অনেক বোধের সঙ্গেই আবার অস্পষ্টভাবে ভাল লাগা, মন্দ লাগা—এ রকম অনুভূতির পার্থক্যও থাকে। খুব কড়া আলো—তার শুধু পরিমাণটাই বেশী, নয়, সেটা অস্বস্তিকর। আবার গরম দিনে এক গ্লাস সরবৎ তাতে মিষ্টত্ব ও শীতলতা বোধই শুধু জাগায় না, তার সঙ্গে থাকে একটু তৃপ্তিরও আমেজ।

ওয়েবার ফেক্‌নার সূত্র—Weber-Fechner Law—একটা উত্তেজক বোধ জাগায়। বোধ হতে গেলেই উত্তেজক থাকা চাই (Hallu-ciationএর কথা বাদে)। এটাও সাধারণ অভিজ্ঞতা যে উত্তেজকের পরিমাণ বাড়লে, বোধও স্পষ্টতর হয়। ৫ ক্যাণ্ডল্‌-পাওয়ারের একটা আলোতে যত স্পষ্ট দেখি, ৬০ ক্যাণ্ডল্‌ পাওয়ারের আলোতে তার চেয়ে বেশী স্পষ্ট দেখি। তা হ'লে উত্তেজক (stimulus) ও বোধ (sensation) এর সঙ্গে সম্বন্ধটা কি এই, যে উত্তেজক যে পরিমাণে বাড়বে, বোধও ঠিক সেই পরিমাণে বাড়বে? এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন যে ব্যাপারটা তা নয়। উত্তেজক ও বোধ সমান তালে বাড়ে না। বোধ হতে গেলে উত্তেজকের একটা নিম্নতম পরিমাণের সীমা (Liminal intensity) পেরোতে হবে। ক্লাসে পেছনের বেঞ্চে বসে দুটি ছেলে ফিস্‌ ফিস্‌ করে খুব সন্তর্পণে কথা বলছে—শিক্ষক বসে আছেন অনেকটা দূরে, তাই ওদের কথা তাঁর কানে যাচ্ছে না। এখানে উত্তেজক (stimulus) আছে, কিন্তু বোধ (sensation) নেই। শব্দটা তখনই শুনি, যখন সেটা কিছুটা জোরে এসে কর্ণপটহে আঘাত করে। এই নীচের দিকে যে সীমা, উত্তেজক না পেরোলে বোধ জাগে না, তাকে বলে বোধের উপান্ত সীমা (threshold of sensibility)। আবার উপরের দিকেও বোধের একটা সীমা আছে। আলোটা বাড়াতে বাড়াতে এমন একটা স্তরে গিয়ে উত্তেজক পৌছবে, যেখানে আর বোধটা বাড়বে না। পরিপূর্ণ রোদের আলোতে ১০০০ ক্যাণ্ডল পাওয়ারের বাতি জ্বাললেও আর বেশী পরিষ্কার দেখা যাবে না। এটা হোল বোধের উচ্চতম সীমা (upper limit of sensibility)।

এই দুই সীমার মাঝখানে যে জায়গা—তাতে উত্তেজকের পরিমাণের সঙ্গে বোধের পরিমাণের সম্বন্ধ কি? এ দুই-ই কি সমান তালে বাড়ে? এ নিয়ে পরীক্ষা করলেন প্রথমে জার্মাণ মনোবিজ্ঞানী ওয়েবার (Weber)। তিনি বিভিন্ন বোধ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে উত্তেজক বাড়লেই, বোধ বাড়ে না। বোধের বাড়তির হার, উত্তেজকের বাড়তির হারের চেয়ে মন্থর। একটা

চার তোলার ওজন হাতের তালুতে রাখলাম, একটা ভার বোধ হ'ল। আমি হাত বাড়িয়ে রেখে, চোখ বুজলাম এবং অন্য কেউ খুব ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে আর একটু বেশী ওজন হাতের তালুতে রাখতে লাগলো। এক রতি, দু' রতি, চার রতি বাড়ালেও আমার বোধের কোন পরিবর্তন হোল না। উত্তেজক বেড়ে চললো, কিন্তু বোধ বাড়লো না। যখন ওজনটা হোল পাঁচ তোলা, তখন বোধ হোল, যে ওজনটা বেড়েছে। এতক্ষণে তা হ'লে বোধ বাড়লো। এখন তা হ'লে মনে হতে পারে যে এক তোলা ওজন বাড়লেই ভারবোধও বাড়বে। কিন্তু পরীক্ষা করে ওয়েবার দেখলেন, যে তা হয় না। ৪ তোলার পর বোধ বাড়লো ($৪ \times \frac{৫}{৪}$) $=$ ৫ তোলায়। কিন্তু ৫ তোলার পর ৬ তোলাতে, ঠিক বোধ বাড়লো না। বাড়লো গিয়ে $৫ \times \frac{৫}{৪} = (৪ \times \frac{৫}{৪} \times \frac{৫}{৪}) = ৬\frac{১}{৪}$ তোলায়। আবার ৮ তোলার বেলায়ও দেখা গেল যে ৯ তোলায় গিয়ে ভারবোধ বাড়েনি। বেড়েছে $৮ \times \frac{৫}{৪} = ১০$ তোলায়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ৪র যতগুণ ৫ (অর্থাৎ $\frac{৫}{৪}$), ঠিক ততগুণ দিয়েই উত্তেজক সর্বদা বাড়িয়ে যেতে হবে, বোধের পরবর্তী বৃদ্ধি পেতে গেলে। তাই ওয়েবার এই সূত্রটি প্রকাশ করলেন, "কোন বোধের ঠিক পরবর্তী বৃদ্ধিটি পেতে গেলে, উত্তেজককে সর্বদাই পূর্ণসংখ্যা ১ এর অধিক নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হবে, অর্থাৎ উত্তেজকের বৃদ্ধির হারকে একটি গুণোত্তর শ্রেণীতে (geometric series) সাজানো যায়।" বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বোধ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ওয়েবারের সূত্রটি মোটামুটিভাবে সত্য, তবে যে ভগ্নাংশ দিয়ে সর্বদা গুণ করতে হবে, তা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। ভ্যুণ্ড্ (Wundt) এর পরীক্ষা থেকে জানা যায়, আলোর বেলায় ভগ্নাংশটি হচ্ছে $\frac{১০১}{১০০}$, পেশীর বেলায় $\frac{১৮}{১৭}$, চাপের বেলায় $\frac{৪}{৩}$, উত্তাপ বোধে $\frac{৪}{৩}$, শব্দের বেলায়ও $\frac{৪}{৩}$।

পরবর্তীকালে আর একজন মনোবিজ্ঞানী ফেক্‌নার, ওয়েবারের পরীক্ষা নিয়ে আরো অগ্রসর হলেন এবং চেষ্টা করলেন বোধের বৃদ্ধিকেও (increment of sensibility) একটা অঙ্ক দিয়ে প্রকাশ করতে। তিনি বললেন যে, ৪ তোলা থেকে ৫ তোলায় গেলে, প্রথম, বোধের দিকে বৃদ্ধি বোধ করা যায়; আবার ৫ তোলা থেকে পরবর্তী বোধের বৃদ্ধি হয়, ৬$\frac{১}{৪}$ তোলায়। এখন এই বোধের বৃদ্ধি দুই ক্ষেত্রেই সমান, একথা যদি ধরে নেওয়া যায়, তা হ'লে একটা সুন্দর আংকিক সূত্র দিয়ে উত্তেজকের বৃদ্ধি ও বোধের প্রত্যেক বৃদ্ধির সম্বন্ধটা প্রকাশ করা যায়। বোধের প্রত্যেক বৃদ্ধিকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি, +১ এই

অংক দিয়ে। তা হ'লে ফেক্‌নারের মতে বোধের বৃদ্ধি হয় সর্বদা একটি পূর্ণসংখ্যা যোগ করে করে (+ ১, + ১, + ১), আর উত্তেজকের বৃদ্ধি হয়, সর্বদা একটি ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে করে। "বোধের বৃদ্ধিকে একটি সমান্তর শ্রেণীতে (arithmetic series) সাজাতে হলে (অর্থাৎ + ১, + ১, + ১, এভাবে), উত্তেজকের বৃদ্ধিকে সাজাতে হবে গুণোত্তর শ্রেণীতে (geometrie series) (অর্থাৎ × $\frac{৫}{৪}$, × $\frac{৫}{৪}$, × $\frac{৫}{৪}$, এভাবে)। অথবা আরো পরিপাটি করে বলা যায়, বোধের বৃদ্ধির অনুপাত শক্তি উত্তেজকের লগারিদ্‌মের সমান।"[৫] কাজেই যে উদাহরণ উপরে দেওয়া হয়েছে, তা ফেক্‌নারের ভাষায় প্রকাশ করা যাবে এই ভাবে—

উত্তেজক	বোধ
৪ তোলা	বো
৪ × $\frac{৫}{৪}$ = ৫ তোলা	বো + ১
৫ × $\frac{৫}{৪}$ = ৬$\frac{১}{৪}$ তোলা	বো + ১ + ১
৬$\frac{১}{৪}$ × $\frac{৫}{৪}$ = ৭$\frac{৶}{১৬}$ তোলা	বো + ১ + ১ + ১

এই সম্বন্ধটা ছবি এঁকে দেখানো হচ্ছে ঃ

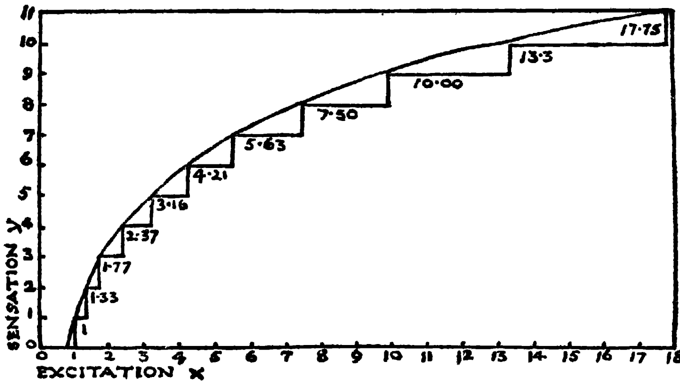


FIG. 20.—Curve to indicate the Weber-Fechner law as a logarithmical relation between excitation and sensation. (Sandiford. Mental and Physical Life of School Children P. 110. Longman Green & Co.)

বোধের ব্যাপারে এই ওয়েবার-ফেক্‌নার সূত্র যেমন মোটামুটি সত্য, অনুভূতির ব্যাপারেও তাই। দশ টাকা যার মাইনে তার যদি একটাকা বেতন বৃদ্ধি হয়, তাতে তার যে আনন্দ হবে, হাজার টাকা যার মাইনে, তার সে

৫ Sandiford—Mental & Physical life of School children, P. 110.

আনন্দ হবে, যদি বেতন বৃদ্ধিটা হয়, একশো টাকা! একটা রসগোল্লা খেলে যে আনন্দ হয়, দুটো খেলে তার ডবল আর তিনটা খেলে তার তিনগুণ আনন্দ হয় না। ১০টা রসগোল্লা খাওয়ার পর, আনন্দের পরিমাণটা ক্রমেই কমে আসে।[৬] অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাপ্তির হারের ক্রমসঙ্কোচন নীতি (Law of diminishing return) এই সূত্রেরই প্রকাশ বলা যেতে পারে।

কিন্তু বাস্তবিকই কি এটা একটা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক সূত্র? পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, এটা মোটামুটিভাবে সত্য। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে, এ নিয়মের বহু ব্যতিক্রম দেখা যাবে। বোধের উচ্চতম সীমা (upper limit of sensibility) এবং নিম্নতম সীমার (the threshold of sensibility) কাছাকাছি এ নিয়মটা খুব ঠিক ঠিক খাটে না। নিম্নতম সীমা পেরিয়ে অল্পদূর পর্যন্ত বোধের বৃদ্ধি, সূত্রে যা বলে, তার চেয়ে দ্রুততর, আর উচ্চতর সীমার কাছাকাছি, বৃদ্ধিটা আইন অনুযায়ী যা হওয়া উচিত, তার চেয়ে মন্থরতর।

ফেক্‌নার যে ভাবে সূত্রটি প্রকাশ করেছেন তা নিয়ে আরো গুরুতর আপত্তি আছে। তিনি ধরে নিয়েছেন, বোধের বৃদ্ধির পরিমাণটা সব সময় সমান। এটা অনুমান মাত্র, এবং প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করবার কোন উপায় নেই, কারণ বোধের কোন বস্তুগত মাপকাঠি নেই। কিন্তু উত্তেজক একটা পদার্থ, তার বস্তুগত মাপ চলে। ফেক্‌নার কিন্তু দুইটিকেই একই জাতীয় বলে গণ্য কচ্ছেন। এটা ঠিক নয়। তা ছাড়া জেমস্ ঠিকই বলেছেন যে উত্তেজক বাড়ালে বোধের যে পরিবর্তন, তাকে পরিমাণগত পার্থক্য বললে ঠিক হয় না। ঘোর লাল রং এর বোধকে কি অনেকগুলি হাল্কা লাল রং এর যোগফল বললে ঠিক হয়? বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেকটি বোধই বিশিষ্ট ও অবিভাজ্য। কাজেই মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এ কথা বলা অর্থহীন, যে একটা বোধ আর একটা বোধের চেয়ে এতটা বেশী বা কম।[৭]

এ সব আপত্তি একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয়। তবে ওয়েবার-ফেক্‌নার সূত্রের মূল কথাটা সত্য এবং এই সূত্রে উত্তেজকের সঙ্গে বোধের সম্বন্ধটা বেশ সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আপত্তিগুলি বিবেচনা করে, এটাও বুঝতে পারি যে ফেক্‌নার যে ভাবে সূত্রটি প্রকাশ করেছেন, তার চেয়ে ওয়েবার যে ভাবে প্রকাশ করেছেন, তা কম আপত্তিজনক।

৬ Ibid, P. 111.

৭ W, James—Principles of Psychology.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বংশানুক্রম ও পরিবেশ

"হবে না? কত বড়ো বাপের বেটা!"

"কিন্তু বাপ বড়ো হ'লেই ছেলে বড়ো হয় না, ছাখ না, অতো বড়ো মহাপ্রাণ নেতার ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে তার কি পরিণতি হোল!"

বাসে চলতে চলতে দুই বন্ধুর বাক্যালাপের টুক্‌রো একটি অংশ। কিন্তু যে প্রশ্ন উঠেছে, সেটা শিক্ষাবিদের কাছে একটা মৌলিক ও গুরুতর প্রশ্ন। বংশানুক্রম (heredity) বড়, না পরিবেশ (environment) বড়? পরস্পরের সম্বন্ধ কি?

একই ক্ষেতে পাশাপাশি পোঁতা হোল দুটি বীজ,—একটি বেড়ে হোল আমগাছ,—আর একটি কাঁঠাল গাছ। তফাতটা কেন? নিশ্চয়ই বীজের তফাত।

আবার একই বীজ বুনে দেওয়া হোল দুটি সমান ক্ষেতে। একটিতে সার দেওয়া হোল, আর একটি রইল বিনা সারে। একটির ফলন হোল তিন মণ ধান,—অন্যটির দশ গুণ। তফাতটা কেন? নিশ্চয়ই মাটির যত্নে।

প্রত্যেক মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি, রুচি, অভ্যাস, ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে বহু বহু কারণের উপরে,—তার পিতামাতা, সমাজ, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক প্রভাব, কত কি। কিন্তু এ সমস্ত কারণকে চূড়ান্তভাবে দুটি মূল কারণে আমরা ভাগ করে বলতে পারি,—বংশানুক্রম ও পরিবেশ, যাকে নান্ (Nunn) বলেছেন Nature and Nurture।[১] বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ওদিকে অনেক লোকের গোদ হয়। এ রোগের কারণ ফাইলেরিয়া ক্রিমিকীট (filarial worms*)। এ রোগের বাহক হচ্ছে একজাতীয় মশা (Wuchereria Bancrafti)। সে সব দেশে এ মশার আধিক্য। এখানে কারণটাকে পরিবেশগত বলে নির্দেশ করতে পারি। আবার মার কটা চোখ তার ছেলে মেয়েদেরও তাই। এখানে কারণটা প্রকৃতিগত বা বংশানুক্রমজনিত। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এই দুটি শক্তি কাজ-

১ Nunn, P.—Education. Its Data and principles.

* Filarial worms—carrier certain kinds of mosquitoes Wuchererioa Bancrafti.

কচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে বলা যায়, ব্যক্তি বংশানুক্রম ও পরিবেশের গুণফল। এখানে কোন একটিকেই আলাদা করে নেওয়া যায় না। একটি ক্ষেত্রের পরিমাণ (বর্গফল = area) নির্ভর কচ্ছে তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফলের উপরে। তুটি ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে সমান হলেই তাদের ক্ষেত্রফল সমান হবে না। আবার তুটি ক্ষেত্র অসমান দৈর্ঘ্য সত্বেও ক্ষেত্রফলে সমান হতে পারে। তেমনি তুজন মানুষ একই পিতামাতার সন্তান, তবু তারা তফাৎ। আবার বিভিন্ন পরিবারের তুটি ছেলে, অথচ বুদ্ধি বিবেচনায় তারা প্রায় কাছাকাছি। মানুষকে বুঝতে গেলে, তাদের মধ্যে তফাত ও মিল বুঝতে গেলে, তুটিই জানতে হবে। কোনটিকেই বাদ দেবার উপায় নেই।

এ কথা মেনে নিলেও ঝগড়া বাধে। কথা থেকে যায়,—এ তুটির মধ্যে কোনটির প্রভাব বেশী। একদল, তারা বংশানুক্রমের উপর বেশী জোর দিচ্ছেন,—তাঁরা বলছেন ভাল ফসল পেতে হলে, ভাল বীজ চাই-ই। ইংরাজী প্রবাদ আছে,—You can not make a silk-purse out of a sow's ears—অর্থাৎ শূকরের কান দিয়ে রেশমী রুমাল হয় না। আর একদল বলেন, —চাই যত্ন, চাই নিষ্ঠা, ঘসতে ঘসতে পাথরও ক্ষয়ে যায়,—মরুভূমিতে সোনা ফলে। পরিবেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। মহাপাপিষ্ঠ জগাই মাধাই নিমাইয়ের মত গুরুর সঙ্গ পেয়ে হোল মহাভক্ত, পরশ পাথরের ছোঁয়া লেগে ধূলিমুষ্টিও হোল সোনা।*

উডওয়ার্থ বলেছেন, "কোন একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করি, তার মধ্যে কোন শক্তি প্রবলতর, তা হ'লে প্রশ্নটার কোন মানে হবে না, কারণ এই তুটি

* আমরা ফরাসী মনীষী Helve'tius (1704-71), দার্শনিক John Locke (1632-1704), সমাজতত্ত্ববিদ্ Robert Owen (1771-1858) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি, যাঁরা বংশানুক্রমের প্রভাবকে অস্বীকার করে পরিবেশকে বড় করে দেখেছেন। অপর পক্ষে Francis Galton ও তাঁহার অনুগামী Karl Pearson এর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, যাঁরা বংশানুক্রমকে বড় বলে দেখেছেন। Galton এর মতবাদ অনুসারে Galtonian School গড়ে উঠেছিল। "The basis of Galton's life-work was the conception that nature for man is more important than nurture, that this principle can be established quantitatively, and that only when it is fully realised will humanity be able to raise itself in the scale of mental and physical fitness."

—*K. Pearson*. "Some Recent Misinterpretations of the Problem of Nature & Nurture" Eugenics Lab. Lecture Series.
Quoted by *F. S. Freeman*. "Individual Differences." P. 78.

শক্তির সম্মিলনেই (যোগফলে নয়, গুণফলে) মানুষটি। কিন্তু দুইজন বা দুদল মানুষের মধ্যে তফাত,—কেন হয়, কোন শক্তি এ ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী এ প্রশ্ন সঙ্গত। একটা মোটর গাড়ীর চেয়ে আর একটা ভাল চলে, তার কারণ হতে পারে একটার চেয়ে আর একটার মোটর ভাল, অথবা একটার চেয়ে আর একটায় ভাল তেল ব্যবহার করা হচ্ছে।"

কিন্তু প্রশ্নটার বা প্রশ্নগুলির বিচারের আগে বোঝা দরকার,— বংশানুক্রম (heredity) কাকে বলি, আর পরিবেশই (environment) বা কাকে বলি। উডওয়ার্থ থেকেই আবার জবাবটা নিচ্ছি—"মানুষ যা নিয়ে তার জীবনটা সুরু করল তাকে বলি বংশানুক্রম। জীবনটা সুরু হয়েছে তার জন্মসময়ে নয়, তারও প্রায় ন'মাস আগে। আর পরিবেশ বলতে বুঝি এর পর থেকে ব্যক্তির উপর যা কিছু প্রভাব বিস্তার করে।[২]

একই পিতামাতার কয়টি সন্তান, তাদের বংশগতি কি এক? মোটামুটি এক, তথাপি সম্পূর্ণ এক নয়। পিতামাতার সার্থক সঙ্গমের মুহূর্তে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হোল, তা কোন সময়ই পিতামাতার দেহের সম্পূর্ণ একই উপাদান বহন করে না। এমন কি, দুইটি যমজ সন্তানের বংশগতি বহুলাংশে এক হলেও, সম্পূর্ণ এক নয়। আবার পরিবেশ স্থূলভাবে এক হলেও, বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ এক নয়। একই মাটি থেকে আমগাছ যে রস সংগ্রহ কচ্ছে, নিমগাছও সেই রসই সংগ্রহ করে না। তাই একই পরিবারে একই ভাবে বর্ধিত হলেও দুটি শিশুর পরিবেশ এক নয়। উড্‌ওয়ার্থ তাই কার্যকরী পরিবেশ (effective environment) কথাটা ব্যবহার করেছেন। ইভ্ ক্যুরী (Eve Curie) তাঁর মার বিখ্যাত জীবন-কাহিনীতে লিখেছেন যে মাদাম ক্যুরী কৈশোরেই বই পড়তে ভালবাসতেন। তাঁর অন্যান্য ভাই-বোনেদেরও কতকটা সে গুণ ছিল। কিন্তু মাদাম ক্যুরী এমন নিবিষ্ট হয়ে যেতেন, যে তার আশে পাশে শত গোলযোগেও তার ধ্যান ভঙ্গ হত না। ক্যুরী ঘরে বসে তন্ময় হয়ে পড়ছেন, তাঁর ভাই বোন যোজিয়া, হেলা, ব্রনিয়া মিলে কাঠের টুল টেবিল চেয়ার দিয়ে উঁচু করে দুর্গ তৈরী করলো। হঠাৎ চীৎকার করে ধাক্কা দিলে, এবং দুর্গ দুব্‌দাব্

২ "Heredity covers all the factors that were present in the individual when he began life (not at birth, but at the time of conception, about nine months before birth) while environment covers all the outside factors that have acted on him since that time." Woodworth and Marquis : Psychology, P. 152.

করে ভেঙে পড়লো। চকিত হয়ে ক্যুরী চোখ তুলে চমকে চাইলো অপ্রসন্ন মুখে, শুধু একবার বললে—একি বোকামী! —তারপর আবার বইয়ে ডুবে গেলো।[৩] এখানে এই যে আসবাবপত্রের পরিবেশ এটা ক্যুরীর কাছে থেকেও নেই, এটা কার্যকরী পরিবেশ (effective environment) নয়, তার কাছে। ঠিক তেমনি, কলেজে কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু প্রজাপতি নবনীতা তার পেছনের বেঞ্চটিতে বসে, মুগ্ধ ভক্ত-বৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে, ফিস্ ফিস্ করে গল্প করে,—শাড়ীর দোকানের, গাড়ীর গুণাগুণ, সিনেমা-এ্যাক্‌ট্রেস্ আর নিজ অপূর্ব 'অভিজ্ঞতার'। এখানে কলেজের মনোজগৎ চপলা নবীনতার কাছে অর্থহীন! অথবা রবীন্দ্রনাথের 'যথাস্থান' কবিতায় দেখছি,—

> পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত
> মেহগিণির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
> সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা
> অ-স্বাদিত মধু যেমন, যূথী অনাঘ্রাতা।[৪]

'ভাগ্যবন্ত'দের কাছে এই গ্রন্থের সংগ্রহ ঐশ্বর্য-বিকাশের একটা বাহ্য উপায় মাত্র। পরিবেশ এখানে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না,—ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বিমুখতা।

বীজের থেকেই গাছ সত্যি। কিন্তু অনুকূল জমিতে বীজ যতক্ষণ না পড়লো, ততক্ষণ,—তা শুধুই সম্ভাবনা। আবার জমিতে হাজারো সার দিচ্ছি, যত্ন কচ্ছি, কিন্তু বীজ পোতা হোল না। তাতে অঙ্কুরও গজাবে না। বীজের মধ্যে সম্ভাবনাকে বাস্তব করে প্রকাশ করে বা ক্ষুণ্ণ করে ক্ষেতের মাটির গুণাগুণ, আর মালির যত্ন বা অবহেলা।

হাঁসের ডিমের থেকে হাঁসই জন্মে, মুরগী নয়। আবার হাঁসের বাচ্চাকে জন্মের থেকে অন্য হাঁসের বাচ্চার থেকে আলাদা করে মুরগীর বাচ্চার সঙ্গে 'মানুষ' করা হোল। তাকে দেওয়া হোল না কোন জলাশয়ের কাছে যেতে, পুরো একটি বছর। তারপর ঝুপ করে তাকে ছুঁড়ে দিলাম পুকুরের মাঝখানে। প্রথম খানিকটা হকচকিয়ে, অল্পক্ষণের মধ্যেই দিব্যি সাঁতার কাটতে লাগলো, অন্য হাঁসের মতো। অনুরূপ একটা মুরগীর ছানাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে

৩ Eve Curie—Life of Madame Curie.

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ক্ষণিকা।

সেটা ডানা ঝাপটে জল খেতে খেতে ডুবে মরল। এটা বংশগতির প্রভাব, সন্দেহ নেই। তবে কি বংশগতি একটা অন্ধ, অমোঘ অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য শক্তি যার প্রকাশ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না? এ কি গ্রীক্ ট্র্যাজেডীর অদৃষ্ট (fate)?[৫] যারা বংশগতির গোঁড়া পক্ষপাতী, তাঁরা এ কথাই বলবেন। লোমব্রোসো (Lombroso) বলবেন,—অপরাধী যতটা জন্মগত ততটা শিক্ষাগত নয় (Criminals are more born than made)। জেলের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা অনেকে বলবেন—জাত-অপরাধী (criminal types) আছে, জন্মের থেকে যাদের প্রবৃত্তি বিকৃত। কথাটা হয়তো একবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু আবার অন্য কতকগুলো ঘটনাও সত্য। কতকগুলো সমুদ্রের মাছের ডিম ফোটবার আগে চব্বিশ ঘণ্টা কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যে রাখা হোল। যখন ডিম ফুটল তখন দেখা গেল তাদের দুটো করে দু'দিকে চোখ না হয়ে একদিকে একটা বড় চোখ। উদ্ভিদ্ ফল ফুল নিয়ে যারা পরীক্ষা করেছেন তারা নানা রাসায়নিক সার, আলো ইত্যাদি পরিবর্তন করে নানা রকমের নূতন ফুল তৈরী কচ্ছেন। রাশিয়াতে লাইসেন্‌কো (Lysenko) এবং তাঁর অনুবর্তীরা এ রকম নানা পরিবেশের পরিবর্তন করেই গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের অদ্ভুত উৎকর্ষ বিধান করেছেন, এবং গোঁড়া পরিবেশবাদীরা বলেন, পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা ব্যক্তিত্বের যে কোন পরিবর্তনই প্রায় সম্ভব। নূতন রাশিয়াতে এ মত অত্যন্ত প্রবল।[৬] মানুষের ক্ষেত্রেও এ রকম পরীক্ষা বিরল নয়। নিতান্ত গাধা বখাটে ছেলে, বুদ্ধিমান্ চরিত্রবান্ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের প্রভাবে সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে ঘটনাগুলি এমন জটিল আর আপাত-পরস্পরবিরোধী যে প্রশ্নগুলির একটা সোজা হাঁ বা না উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সম্ভবতঃ এ কথা বলা যায়,—বংশানুক্রম বা heredityর মধ্যে যে সম্ভাবনা একেবারেই নেই, পরিবেশ তাকে কোন প্রকারেই সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু কোন্ ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে কি বংশগতি লুকিয়ে আছে তা নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। পরিবেশের মধ্যেই সেই শক্তি, সেই সম্ভাবনা রূপ পায়। তবে বংশগতি অনিবার্য নয়। বংশগতির অবাঞ্ছনীয় কোন কোন গতি চেষ্টা দ্বারা, পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা রুদ্ধ করা যায়।

---

৫ Dumville—The Child Mind.

৬ Dyson Carter—Soviet Science.

এ দুরূহ প্রশ্নের জবাব সহজ নয়, তবুও প্রশ্নগুলি সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা সবাই ভালো ফসল চাই, ভালো ফল চাই, ভালো মানুষ চাই। শিক্ষককে এ প্রশ্নের জবাব পেতেই হবে। তার উপর যে নির্ভর কচ্ছে তার শিক্ষাপদ্ধতি। যদি বংশগতিকেই চূড়ান্ত শক্তি বলে মানতে হয়, তবে শিক্ষকের কাজ হবে ভাল বংশের ছেলে-মেয়ে সংগ্রহ করে বিদ্যালয় গড়া, সমাজ মনকে সচেতন করে তোলা,—সুসন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ; আর বংশের উৎকৃষ্টতা, নিকৃষ্টতা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করে, অধিকার ভেদে নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু যদি পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা, যত্নের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা, উৎকৃষ্টতর শিক্ষার পদ্ধতি দ্বারা, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ও অবাঞ্ছনীয় অসামাজিক প্রবৃত্তির নিরাকরণ সম্ভব হয়, তবে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাকে হাল ছাড়লে চলবে না। যে ছাত্র আপাত-দৃষ্টিতে বুদ্ধিহীন, মেধাহীন, মিথ্যাবাদী, স্বভাবতঃ দুর্বিনীত তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথায় মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে, তা আবিষ্কার করে যত্নবান হতে হবে, তাকেও বড় করে তুলতে, সুন্দর সম্পূর্ণ মানুষ করে তুলতে। ভারতবর্ষ এ কথা বিশ্বাস করেছে, সে বলেছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম-স্বরূপ লুকিয়ে আছে। শিক্ষকের কাজ হবে সেই কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মশক্তিকে জাগ্রত করা। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব নিহিত রয়েছে তাকে বিকশিত করা—Education is the bringing out of the divinity that is already in men. মনোবিজ্ঞানে যতটুকু আমরা জেনেছি তাতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই বেশী সত্য বলে মনে হয়। কাজেই একদিকে শিক্ষকের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়ার সঙ্গত কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার বিরাট দায়িত্ব। কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই, যে শিক্ষক শিক্ষার দ্বারা একদল ছাত্রকে উন্নত করতে পারেন। সে উন্নতি হ'ল সেই ব্যক্তিদের পক্ষে অর্জিতগুণ (acquired characteristic)। সেটা তাদেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই উৎকর্ষ পরবর্ত্তী বংশধরেরা জন্মের সূত্রে পাবে না। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, "পরিবেশ হচ্ছে বংশগতির পরিপূরক ; পরিবেশ কেবল মাত্র নির্ধারণ করে, বংশগতির কোন্ লক্ষণটি কতটুকু পরিমাণে বিকাশ লাভ করবে। বংশগতির মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তাকে বিকশিত করাই যদি পরিবেশের কাজ হয়, তা হ'লে শিক্ষা, যা হচ্ছে পরিবেশের একটা অঙ্গ, তা দ্বারা যা সম্পন্ন করা যেতে পারে তার গণ্ডী নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তা হলে শিক্ষার দ্বারা

জাতির স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়, যদিও অবশ্য শিক্ষা একটা পুরুষকে (generation) গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম।"[৭]

আগেই বলেছি বংশানুক্রম আর পরিবেশ এমনি জড়িয়ে থাকে যে তাদের আপেক্ষিক প্রভাব নির্ধারণ দুরূহ ব্যাপার। আরও দুরূহ এ কারণে, যে আগেই দেখিয়েছি যে বংশানুক্রম একটা সহজ শক্তি নয়, পরিবেশও সহজ শক্তি নয়,—দুটোর মধ্যেই অনেক জট রয়েছে। যাই হোক্, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করতে গেলে বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেই তা করতে হবে। যদি নিছক বংশানুক্রমের প্রভাব কতটা তা বুঝতে হয়, তবে বংশানুক্রম স্থির রেখে, পরিবেশ পরিবর্তন করে, ফলটা লক্ষ্য করে দেখতে হবে। আবার পরিবেশের প্রভাব নির্ধারণ করতে গেলে, পরিবেশ স্থির রেখে, তাতে বিভিন্ন বংশানুক্রমের উপর কি ফল হয়, তা দেখতে হবে। এ ছাড়াও বিষয়ের জটিলতার জন্যে আরো বহু রকমের পরীক্ষা করা হয়েছে বা হচ্ছে তার কিছু পরিচয় পরে আমরা দেবো। কিন্তু তার আগে বংশগতির মূল উপাদান এবং বংশানুক্রম কি ভাবে এবং কি রীতি অনুযায়ী কাজ করে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

বংশগতির কল কৌশল—Mechanism of heredity—পিতা ও মাতার সঙ্গমের ফলে মাতার গর্ভে ভ্রূণের প্রথম প্রাণ সঞ্চার হয়। ভ্রূণের সেই প্রথম অবস্থার নাম যাইগোট (zygote)। এই যাইগোট (zygote) একটি এক কোষবিশিষ্ট (unicellular) প্রাণকেন্দ্র। এতে পিতা ও মাতার দৈহিক উপাদান সমভাবে থাকে। এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোষটি দ্রুত ভেঙে, এক হ'তে দুই, দুই হ'তে চার, এই ভাবে বিভক্ত হয়ে, বেড়ে উঠে শিশুর সমস্ত দেহ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কোষের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নিউক্লিয়স (nucleus)। এই নিউক্লিয়সের মধ্যে থাকে ২৪ জোড়া ক্রোমোজোম (chromosome)। শ্রীযুত গোপাল হালদার 'ক্রোমোজোম' কথার বাংলা করেছেন রঞ্জনিক।[৮] (মানুষের বেলায় ২৪ জোড়া,—উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাধারণতঃ অনেক কম)। এই ক্রোমোজোম এর একটি এসেছে পিতার দেহ থেকে আর একটি এসেছে মাতার দেহ থেকে। একটি কোষের নিউক্লিয়স ভেঙ্গে যখন দুটি কোষ হয়, তখন প্রত্যেক কোষেই এই ২৪ জোড়া ক্রোমোজোম সম্পূর্ণ দেখা যায়। সুতরাং দেহের প্রত্যেকটি

৭ Sandiford—Educational Psychology.

৮ গোপাল হালদার—বাজে লেখা পৃঃ ১৫।

কোষেই পিতামাতার দেহের বা বংশগতির উপাদান ছড়িয়ে আছে কেমন করে এক কোষ দুই হয়, তার ছবি দিচ্ছি।

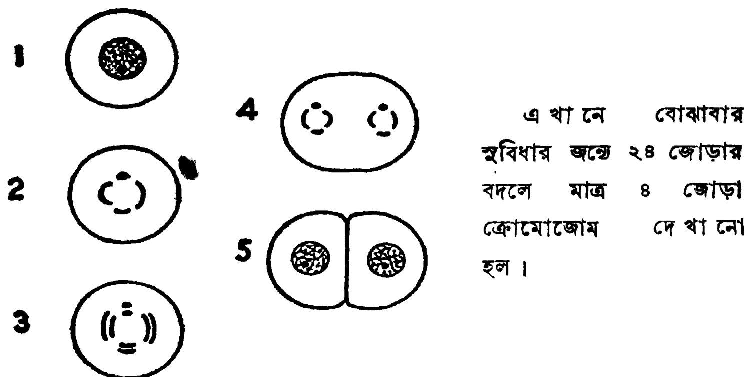


Fig. 21. Cell division and chromosomes—from Woodworth. Psychology —A study of Mental life, P. 197, Fig. 24. Methuen.

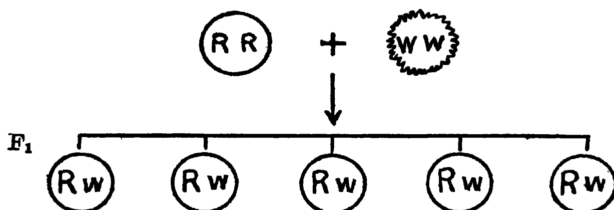
এই ক্রোমোজোমগুলির উপর দেহের নানা বৈশিষ্ট্য (যেমন কালো চোখ, কটা চোখ, বেঁটে হওয়া, ঢ্যাঙা হওয়া ইত্যাদি) নির্ভর করে। পূর্বে মনে করা হোত এগুলিই বংশানুক্রমের মূল উপাদান। কিন্তু পরবর্তী কালে আরো সূক্ষ্ম পরীক্ষার ফলে জানা যাচ্ছে যে ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে নানাভাবে সাজানো নানা আকারের অতি ক্ষুদ্র সূতার টুকরোর মত জিনিষ থাকে। এগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। এরা যে ভাবে সাজানো থাকে সে ক্রম নির্দিষ্ট এবং সব কোষের মধ্যে এদের সংখ্যা প্রায় সমান থাকে। এদের বলে জীন্‌স্ (genes)। মানুষের বেলায় এই জীন্ (gene) এর সংখ্যা সহস্রাধিক। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে এই জীন্ (gene)গুলোকেই বংশগতির মূল উপাদান বলে মনে হয়।

মেণ্ডেলের সূত্র (Mendel's law)—যোহন গ্রেগর মেণ্ডেল (Johann Gregor Mendel—1822-1884) ছিলেন জাতিতে জেক্ (Czech) এবং জীবিকা ছিল তাঁর পৌরোহিত্য। তিনি বংশানুক্রমের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কারের জন্যে ১৮৫৬ সালে মটরদানা নিয়ে পরীক্ষা করতে সুরু করলেন। মটরদানা নিয়ে পরীক্ষার সুবিধে হল এই যে, এদের ফলন দ্রুত—, দুই তিন পুরুষের বংশানুক্রমের ধারা অনুসরণ করা কঠিন নয়। তা ছাড়া

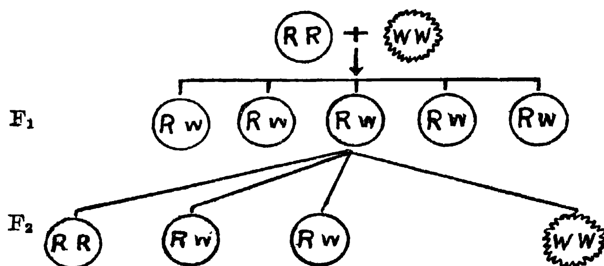
তাদের ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাত্র সাতটি, এবং তাদের মধ্যে বিভিন্নতাও সাত রকমেরই। সুতরাং ক্রোমোজোমগুলির জন্যেই এই সাত রকমের বিভিন্নতা হচ্ছে, এ সিদ্ধান্ত করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি। বাস্তবিক পক্ষে ক্রোমোজোম আবিষ্কার মেণ্ডেল্ করেন নি। এ নামও তিনি দেন নি। তিনি বলেছিলেন 'ইউনিট ক্যারেকটার'। কিন্তু বংশানুক্রমণের মূল সূত্রটির তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ ৩৪ বৎসর তাঁর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তাঁর আবিষ্কৃত বংশানুক্রমণের সূত্র প্রায় এক সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডি ভ্রিজ (De Vries), কোরেন্‌জ্ (Correns) ও স্যারম্যাক্ (Tschermak) পুনঃ আবিষ্কার করেন। 'মেণ্ডেলের 'ইউনিট্ ক্যারেকটার' কেই তাঁরা বললেন ক্রোমোজোম্, এবং মেণ্ডেলের স্মৃতির সম্মানার্থ তাঁদের পুনরাবিষ্কৃত সূত্রকে তাঁরা মেণ্ডেলের বংশানুক্রমের সূত্র নাম দিলেন। আরও দেখা গেল এক এক জোড়া ক্রোমোজোমের (পিতার দেহ থেকে এক, মাতার দেহ থেকে এক) সঙ্গে এক এক জোড়া গুণের সম্বন্ধ আছে। আবার এক জোড়া ক্রোমোজোমের গুণের সঙ্গে অন্য জোড়া ক্রোমোজোমের গুণের কোন সম্বন্ধ নেই। যেমন একটা ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে, যে মটরের পাকা দানাটা সম্পূর্ণ মসৃণ গোলাকার (Round), এর জোড়া ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে যে দানাটার উপরের চামড়াটা কুঁচকানো (Wrinkled) আবার আর একটা ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে লতাটা বেশ উঁচু হবে, এর জোড়াটার গুণ যে লতাটা বেঁটে হবে। এখন গোল দানা বা কুঁচকানো দানা এইগুণের সঙ্গে গাছের উঁচু হওয়া বা বেঁটে হওয়ার কোন নিয়ত সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ ক্রোমোজোম-গুলি বিচ্ছিন্ন কতগুলি শক্তি (unit character), যেগুলি আলাদা আলাদা ভাবে সন্তানে সংক্রামিত হয়।

এবার গোল দানা মটরের সঙ্গে (যার পিতামাতা দুইই গোলদানাওয়ালা) যদি আর একটি গোলদানা মটরের মিশ্রণ হয়, তবে ফলটা অমিশ্র গোলদানা মটরই হবে (RR)। তেমনি কুঁচকানো দানা মটরের সঙ্গে যদি কুঁচকানো দানা মটরের মিশ্রণ হয়,—ফল অমিশ্র কুঁচকানো দানা মটর হবে (WW)। এটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু গোলদানা মটরের সঙ্গে কুঁচকানো দানা মটরের মিশ্রণ করা হোল, ফল কি হবে? এখানে ফলগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই R এবং W ক্রোমোজোম তো রয়েছে। কিন্তু দেখা গেল ফলগুলি গোলদানা মটরই হয়েছে। এখানে R.ক্রোমোজোমই প্রাধান্য পেয়েছে, W ক্রোমোজোম হটে গেছে। এখানে তাই R কে বলা হোল প্রকট (Dominant) আর W কে

হোল অপসৃত (Recessive)। অর্থাৎ প্রকট ক্রোমোজোমকে (dominant chromosome) বড় অক্ষর আর অপসৃত ক্রোমোজোমকে (recessive chromosome) ছোট অক্ষর দিয়ে যদি লিখি, তবে ব্যাপারটা প্রকাশ করতে পারি এভাবে,



এতো গেলো প্রথম পর্যায়, First filial generation বা F_1র বেলায়। এখন (Rw) দের যদি পরস্পরের মধ্যে মিশ্রণ করা যায় তাহ'লে কিন্তু, পরবর্তী পর্যায়ে (F_2) সব মটর দানা গোল হবে না। তিনটে (শতকরা ৭৫) হবে গোল, একটি (শতকরা ২৫) হবে অমিশ্র কুঁচকানো দানা (WW)। আবার তিনটি গোলদানার মধ্যে ১টি (শতকরা ২৫) হবে অমিশ্র গোলদানা (RR) আর দুটি হবে মিশ্র গোলদানা (Rw)। অর্থাৎ ছবি দিয়ে বোঝালে—



এর পর পর্যায়ে, অর্থাৎ F_3 পর্যায়ে, (RR) অমিশ্র গোলদানার ব্যবহার প্রথম পর্যায়ের (RR) অমিশ্রগোলদানার মতই হবে। অর্থাৎ এর দানা সর্বদাই অমিশ্র গোলই হতে থাকবে। তেমনি (WW) অমিশ্র কুঁচকানো দানার বেলায়ও, সর্বদাই তার থেকে (WW) দানাই পাওয়া যাবে। কিন্তু (Rw) দানাগুলি নিজেদের মধ্যে মিশ্রণ করলে আগের পর্যায়ের মত ১টি

৫(২৫%) (RR) একটি (২৫%) (WW) এবং বাকী দুটি (৫০%) হবে মিশ্র গোলদানা (Rw)। অর্থাৎ মোট গোলদানা হবে ৩ (৭৫%), আর কুঁচকানো দানা হবে ১ (২৫%)। ছবি এঁকে দেখাই—

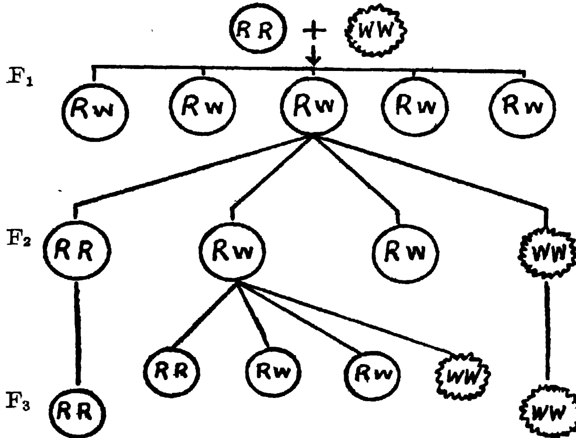


FIG. 22—Mendel's Law, from Sandiford—Educational Psychology. Longmans Green & Co.

এ রকমভাবে চলবে।

মেণ্ডেল যে বংশানুক্রমের রীতি ও ধারা (Laws of heredity) আবিষ্কার করলেন তার ব্যাখ্যার তিনটি মূলনীতি হচ্ছে—

১। যদিও একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ দৈহিক দিক দিয়ে অখণ্ড, তবু বংশানুক্রমের দিক থেকে তাতে একাধিক বিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রধান গুণ থাকে। একটা মটর দানা গোল বা কুঁচকানো হলে, তার গাছটা উঁচু হতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

২। বিপরীত গুণ উপস্থিত থাকলেও একটা গুণই প্রকাশ পায়, সেটাকে বলি প্রকট (dominant)। আর যে গুণটা বীজের মধ্যে থেকেও প্রকাশ পেলো না তাকে বলি অপসৃত (recessive)।

৩। ক্রোমোজোমে বিপরীত দুটি গুণ থাকলেও সন্তান উৎপাদনকারী কোষে দুটি বিপরীত গুণের একটি মাত্রই থাকতে পারে। তাই উৎপন্ন সন্তানে একটি গুণই প্রকাশ লাভ করে।[৯]

---

[৯] There are three fundamental elements in Mendel's explanation. These are :

মেণ্ডেল যখন ১৮৬৫ সালে তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন, তখন এবং তার পরেও অনেক বৎসর পর্যন্ত এর বিশেষ কোন মূল্য প্রাণীতত্ত্ববিদরা দেন নি। অবশ্য মেণ্ডেলের মূলসূত্রগুলি ঠিক হলেও এ সূত্র একেবারে নির্ভুল নয়। তিনি ক্রোমোজোমগুলিকে বংশানুক্রমের মূল উপাদান মনে করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। পরবর্তী পরীক্ষায় দেখা গেল ক্রোমোজোমই মূলতত্ত্ব নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে বহু জীন্‌স্‌ (genes)। এদের উপর নির্ভর কচ্ছে জীবদেহের নানা লক্ষণ। কাজেই বংশানুক্রমের ধারা জীন্‌এর সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাপারটা যথেষ্টই জটিল হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে জীন্‌এর সংখ্যা সহস্রের উপর, কাজেই এদের বিভিন্ন সংযোগ বিয়োগে মানুষের গুণও হবে অজস্র। তা ছাড়া তিনি কোন গুণের প্রকটতা (dominance) সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচার করেছিলেন সেটাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রকট ক্রোমোজোমের কাছে অপসৃত ক্রোমোজোম সম্পূর্ণ হার মেনে হটে যাবে, এটা সব সময় সত্য নয়। কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে দুই বিপরীত

(1) Independent unit character. Any organism, although physiologically a unit, from the standpoint of heredity is a complex of a large number of heritable units. Roundness or wrinkledness, for example, is independent of the nature of the plant, as a whole. Each is an independent unit. The plant may be tall or short, but the roundness or the wrinkledness of the ripe peas is unaffected by the size of the plant.

(2) Dominance—Certain characters, like roundness or tallness, dominate and become visible when present, even though wrinkledness or dwarfness is present also. They are thus termed dominant characters. The opposite character which recedes, as it were, in the presence of the dominant one, is called the recessive.

(3) Purity of the gametes (reproductive cells)—A better name for it is, segregation. The reproductive cell can only contain one of the two alternative characters. It can, for example, contain the character for roundness or wrinkledness, but not both. If two germ-cells, each containing the factor for wrinkledness, unite to form a zygote (fertilised egg), the resultant pea will be wrinkled ; if one contains the factor for roundness and the other the factor for wrinkledness, the pea will be round owing to the dominance of roundness. Alternative characters are segregated in the formation of the germ cells, and no germ-cell can contain both. Sandiford—Educational Psychology, P. 32.

ক্রোমোজোমের সংযোগে মাঝামাঝি এক গুণ সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবশ্য মেণ্ডেলও পরে স্বীকার করেছেন। আর তিনি ক্রোমোজোম মিশ্রণের ফল বংশানুক্রমে ৩ : ১ এই অনুপাত বলেছেন। সে কথাটাও মোটামুটি সত্য, একেবারে নির্ভুল সত্য নয়।

যাক্ মেণ্ডেলের সূত্র নূতন করে মর্যাদা পেয়েছিলো ১৯০০ সালের কাছাকাছি। তখন থেকে জীন্ ফ্যাকটর আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাণতত্ত্বে মেণ্ডেলের সূত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এই জীন্ ফ্যাকটর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন টি. এইচ. মরগ্যান্ (T. H. Morgan)। যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ খুব দ্রুত ফল উৎপাদন করে (যেমন আরসোলা, ইঁদুর, মাছি) তাদের উপর পরীক্ষা করেও মোটামুটিভাবে মেণ্ডেলের সূত্রের সমর্থন পাওয়া গেছে। মানুষের বেলায়ও মেণ্ডেলের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে কতগুলি লক্ষণ সম্বন্ধে, যেমন নীল বা বাদামী চোখ, কোঁকড়া শক্ত চুল, পুরু ঠোঁট, চামড়ার কর্কশতা, পাগলামী, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা ব্যাধি ইত্যাদি। কিন্তু চোখের রং সম্বন্ধে এবং আরো কয়েকটি অনুল্লেখযোগ্য লক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি মেণ্ডেলের সূত্রের সমর্থন পাওয়া গেলেও মানুষের অধিকাংশ দোষ, গুণ, প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। মানুষের দেহের কোষে রয়েচে সহস্র জীন্, তাদের বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে বংশানুক্রমের ধারা এতই জটিল হয়ে পড়ে যে পিতামাতার দেহের লক্ষণ মোটামুটি জানা থাকলেও সন্তানের দেহে তার কোন লক্ষণটির দেখা পাওয়া যাবে, কোনটা পাওয়া যাবে না, কোনটা কি ভাবে পরিবর্তিত হবে এ সব হিসাব করে বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই উডওয়ার্থ ও মারকিস্ লিখছেন, "সন্তান দেহের সমস্ত জীন্ই পিতামাতার থেকে আসে, কিন্তু সেই জীন্গুলির মিশ্রণ তার পিতা বা মাতা বা তার প্রত্যেকটি ভাই বা বোনের থেকে বিভিন্ন, এবং একটি মানুষের মধ্যে যে যে জীনের মিশ্রণ আছে, ঠিক সেই মিশ্রণটি আর কোন মানুষের দেহে দেখা যায় না। এই জীনের মিশ্রণ এত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যে তা বাস্তবিকপক্ষে অসংখ্য। প্রত্যেক শিশুর দেহের জীনের মিশ্রণ একান্তভাবে তারই। কাজেই প্রত্যেক শিশুর বংশগতিও একান্তভাবে তারই নিজস্ব ধর্ম (The child's heredity is his own unique combination of genes.)।"[১০]

আবার উড্ওয়ার্থ তাঁর 'সাইকোলজী'তে লিখছেন "শুদ্ধ প্রাণ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সন্তান বংশগতির সূত্রে, পিতামাতার কাছ থেকে, কি পায়? উত্তরাধিকার

সূত্রে সে পায় ক্রোমোজোম, সে পায় জীনস্। তার দেহের জীন্‌গুলি তার পিতামাতার দেহের জীন্‌গুলির যোগফল নয়। সে তার পিতা বা মাতার প্রত্যেকের দেহে যে জীন্‌এর মিশ্রণ আছে, প্রত্যেকের কাছ থেকে তার অর্ধেক সংখ্যা মাত্র পায়। যেহেতু প্রাণিতত্ত্বের দিক থেকে তার দেহের জীনের মিশ্রণ তার পিতামাতার দেহের জীনের মিশ্রণ থেকে পৃথক কাজেই তার দেহের গঠন ও ব্যবহার তার পিতা বা মাতার প্রত্যেকের থেকে বিভিন্ন। পরিবেশের প্রভাবের কথা ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র বংশগতির দিক থেকেও প্রত্যেকটি সন্তান তার পিতামাতা ও ভাই বোনের থেকে মোটের উপর পৃথক।

'বংশগতি', 'উত্তরাধিকার' কথাগুলি এক হিসাবে মিথ্যা ধারণার উদ্ভব করে, কারণ একথাগুলি পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় কিন্তু কোন শিশুর বংশগতি বুঝতে তার দেহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীনের মিশ্রণের কথাই আমাদের বোঝা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির বংশগতি বাস্তবিকপক্ষে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত।" ১১

জীন্ ফ্যাক্‌টর্ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে মেণ্ডেলের সূত্রের কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হয়েছে সত্য, কিন্তু মেণ্ডেলের সূত্রের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব আরো স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে এবং এই সূত্রের কেন বা whyর উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কেন, এক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে বা এক পরিবারের লোকদের মধ্যে এত গভীর সাদৃশ্য থাকে, বংশানুক্রমের এই সর্বজন-স্বীকৃত লক্ষণটি জীন্ ফ্যাক্‌টর্ দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি।

বৈসাদৃশ্য ও অর্জিত গুণ (Variations and Acquired characters)—কিন্তু সাদৃশ্য যেমন থাকে বৈসাদৃশ্যও তেমনি থাকে এবং এই পরিবর্তনগুলিও জীন্ ফ্যাক্‌টর পরিবর্তনের জন্যেই ঘটে। এই বৈসাদৃশ্য বা variations বংশানুক্রমের ধারায় মেণ্ডেলের সূত্র অনুযায়ী পরবর্তী পুরুষে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু অনেকগুলি পরিবর্তন ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় অর্জিত বা বর্জিত,—তাদের বলে অর্জিত গুণ (acquired characters)। যেমন, এক ব্যক্তি চেষ্টা করে ভাল বাঁশী বাজাতে শিখল। এ গুণও কি পরবর্তী পুরুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে ? পূর্বে অনেকের (যথা, লামার্ক) ধারণা ছিল যে এই অর্জিত গুণগুলিও পরবর্তী পুরুষে বর্তে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় এক

১০ Woodworth & Marquis—Psychology, P, 164.

১১ Woodworth—Psychology, P. 199.

একটা পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে, ভালো ভালো খেলোয়াড়, অথবা ভাল আঁকিয়ে, বা ভাল গাইয়ে দেখা গিয়েছে। কিন্তু বহু সহস্র পরীক্ষার পরে নিশ্চিতভাবে না হলেও, মোটামুটি এই সিদ্ধান্তই সত্য বলে মনে হচ্ছে যে. অর্জিত গুণ সন্তানে বর্তে না। ভাইস্‌ম্যান (Weismann) বলেন, যে পরিবর্তনটা জার্মপ্লাজম্ (Germplasm) থেকে উদ্ভূত নয়, অথবা, আমরা বলব, যেটা জীন্ ফ্যাক্টর্ (Gene factor) থেকে আসেনি, সেটা পরবর্তী পুরুষে পৌছে না। ভালো আঁকিয়ের ছেলে ভালো আঁকিয়ে হয়, তার কারণ (পরিবেশবাদীরা বলেন) পরিবেশটা এ গুণ আয়ত্ত করবার পক্ষে শিশুর অনুকূল। অবশ্য তার প্রকৃতির মধ্যে আঁকবার স্পৃহা এবং ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকা চাই। সে হিসাবে অর্জিত গুণেরও অনেক সময় একটা প্রকৃতিগত মূল থাকে। ড্রামণ্ড বলেছেন, "অর্জিত গুণ বলতে আমরা এমন কোন গুণ বুঝি যার উৎপত্তি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। আমরা ব্যক্তির তেমন গুণগুলি বুঝি, যা এসেছে ব্যবহার, অব্যবহার বা প্রত্যক্ষভাবে বাইরের কোন প্রভাবের ফলে। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি কুকুরের লেজ কেটে ফেলা হয়, তা হলে এটা তার পক্ষে অর্জিত গুণ। তেমনি কোন মানুষের যদি শক্ত অসুখের ফলে চুলগুলি সব পড়ে যায়, তা হলে সেটাও হবে, সে মানুষের পক্ষে অর্জিত গুণ। কিন্তু যদি কোন যুবকের চুল প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতিরেকে অকালে পেকে যায়, অথবা যদি তার দাড়ি গজায় তা হলে কিন্তু এগুলি অর্জিত গুণ নয়। যে মানুষের চুল এমনি অকালে পাকে সম্ভবতঃ সে মানুষের ছেলেও এ গুণ (না দোষ?) উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে। কিন্তু যে কুকুরের লেজ কাটা হোল তার লেজকাটা বাচ্চা হবে না। দুর্ঘটনা জনিত বা পরীক্ষামূলক অঙ্গহানির দুই একটি উদাহরণ ছাড়া এটা অবশ্য অপ্রমাণিত রয়েছে যে অর্জিতগুণ পরপুরুষে বর্তায়। তবে সমস্ত অর্জিত গুণেরই একটা জন্মগত ভিত্তি থাকে।......এটা সত্য যে ভাল গাইয়ে বাজিয়ের ছেলে যে ভাল গাইয়ে বাজিয়ে হতেই হবে, এমন নয়। অবশ্য সে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারে, যদি তার প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন থাকে। পিতামাতার কাছ থেকে সে পেশী বা স্নায়ুর গঠন পায়, কারণ তার পিতার পক্ষেও তা প্রকৃতিদত্ত বা বংশগত ছিল। কাজেই সে গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে উত্তর পুরুষে বর্তায়। প্রয়োজনীয় পেশী, স্নায়ু ইত্যাদির গঠন যদি তার থাকে তবে তার পিতা যেমন যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছিলেন, সেও তেমনি হতে পারবে, তবে সম্ভবতঃ তার পক্ষে সেটা আরও সহজ হবে, কারণ

তার পিতার রুচি ও অভ্যাস, তাঁর যন্ত্রাদি, তাঁর বন্ধুবান্ধব ও যশ তাকে প্রভাবান্বিত করবে।"[১২]

অর্জিত গুণ পরপুরুষে প্রবর্তিত হয় না, শিক্ষাবিদের কাছে এ সিদ্ধান্তের তাৎপর্য কি? এর তাৎপর্য এই যে, শিক্ষক এ ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবেন না যে পিতামাতা যখন কতগুলি সদগুণ আহরণ করেছেন, তখন সন্তানেরাও স্বভাবতঃই এ গুণের অধিকারী হবে। শিক্ষকের যত্ন ও চেষ্টা দ্বারাই শিশুও সে সদ্গুণ পেতে পারে। কাজেই শিক্ষকের পক্ষে নিশ্চিন্ত আলস্যের অবকাশ নেই। আবার অবাঞ্ছিত গুণ যদি কিছু পিতামাতা অর্জন করে থাকেন (যেমন জুয়াখেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি) তাও শিশুতে বর্তাবেই এ আশঙ্কার সঙ্গত কারণ নেই। শিক্ষকের চেষ্টা তাই হবে, শিশুর চারপাশের পরিবেশটি নির্মল, উৎসাহশীল, স্নেহ ও বিশ্বাসপূর্ণ রাখা, যাতে শিশু সদাচারে অভ্যস্ত হয় এবং যাতে কুৎসিত অভ্যাস বা আচরণে সে লিপ্ত না হয়।

আমরা যদি নির্বিচারে অনেক সহস্র মানুষকে পরীক্ষা করি তা হলে দেখা যায় মানুষের মধ্যে কোন গুণের পরিবর্তনগুলি (variation) সম্ভাব্যতার রীতি (Law of Probability বা chance) অনুসারে একটা বাঁকা রেখায় (curve) ছড়িয়ে আছে।* আর দেখা যায় বংশানুক্রমের একটা ঝোঁক রয়েচে মাঝারির (average) দিকে। যেমন, পিতামাতা দুইজনই খুব লম্বা, সন্তানেরাও লম্বা হবে সন্দেহ নেই,—কিন্তু সাধারণতঃ, তারা গড়ে পিতামাতার চেয়ে কম উঁচু হয়ে থাকে।

বংশগতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কয়টি বিষয়ঃ—

(১) বংশগতির নিয়মানুযায়ী সন্তানেরা পিতামাতার সদৃশ হয়। তাই বলে, "বাপকা বেটা" "যেমন মা! তেমন ছা।" কিন্তু সন্তানেরা হুবহু পিতা বা মাতা কারু মতই হয় না।

(২) বংশগতগুণ শুধু পিতামাতার থেকেই সন্তানে বর্তায় না। পিতা ও মাতার যারা পূর্বপুরুষ তাদের গুণও উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানে দেখা দেয়। পূর্বপুরুষদের সংখ্যা যতই পিছনের পর্যায়ে যাওয়া যায় ততই গাণিতিকসূত্রে নির্দিষ্টভাবে বেড়ে যায়—যেমন প্রথম পূর্বপুরুষ ২ (পিতা ও মাতা), দ্বিতীয় পর্যায়ের পূর্বপুরুষের সংখ্যা ৪, তার পর পর্যায়ে ৮, তার পর পর্যায়ে ১৬,

১২ Drummond—The child.

* 'ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এরকম ভাবে বাড়তে বাড়তে চলে। বংশানুক্রম সম্বন্ধে গ্যাল্‌টনের (Galton) সূত্র হচ্ছে, সন্তান পিতামাতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তার $\frac{১}{২}$ পায়, পিতামহের ও পিতামহীর পর্যায় থেকে $\frac{১}{৪}$, তার পূর্বপর্যায় থেকে $\frac{১}{৮}$, তার পূর্ব পর্যায় থেকে $\frac{১}{১৬}$ গুণ পায়।

(৩) কখনো কখনো কোনো সন্তানে অনেক পূর্বপর্যায়ের কোনগুণ হঠাৎ আবার দেখা দেয়। যেমন, হঠাৎ একটি ছেলে তার বৃদ্ধপ্রপিতামহের কটা চোখ পায়। তার ভাই, বোন, বাপ, মা, ঠাকুরদা বা ঠাকুরমা কারু চোখ কিন্তু কটা নয়। কিন্তু বৃদ্ধপ্রপিতামহের চোখ কটা ছিল। এ জাতীয় ঘটনাকে বলে পশ্চাদাবর্তন (regression, atavism)। কখনো কখনো মনুষ্যেতর প্রাণীর কোন গুণও এভাবে দেখা দেয়।

(৪) অর্জিতগুণ পরপুরুষে সংক্রামিত হয় না।

(৫) পিতামাতার ব্যাধি উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানে সংক্রামিত হয় এমন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। মাতৃগর্ভে ভ্রূণে অবশ্য মাতার দেহের ব্যাধি সংক্রামিত হতে পারে।

(৬) বিশেষ বিশেষ নিপুণতা পিতামাতা থেকে সন্তানে বর্তায় না, কারণ এগুণগুলি চেষ্টালব্ধ ও অর্জিত। তবে সাধারণ কতগুলি গুণ যেমন, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে।

(৭) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণ সব জন্মকালেই প্রকাশ পায় না। অনেকগুণ দৈহিক ও স্নায়বিক পরিণতি সাপেক্ষ। তাই বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত কালে বংশগত গুণ বা দোষ প্রকট হয়।

(৮) কখনো কখনো দেখা যায় পিতা বা মাতার কোন কোন দোষ (রং-কানা হওয়া—colour blindness, বা রক্তে জমাট বাঁধবার গুণের অভাব—haemophilia) ঠিক পরপুরুষেই দেখা যায় না। দ্বিতীয় পর্যায়ে এদোষ পুরুষসন্তানদের মধ্যে দেখা যায় না কিন্তু মেয়েসন্তানদের মধ্যে দেখা দেয়। এই রকম মেয়ের সুস্থ ও স্বাভাবিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হলে, তাদের পুরুষ-সন্তানদের অর্ধেকের মধ্যে এ দোষ দেখা যায়। পিতা ও মাতা দুজনের মধ্যেই এ দোষটি থাকিলে তাদের মেয়ে সন্তানদের অর্ধেকের মধ্যেও এ দোষ বর্তাবে। একে লিঙ্গগত উত্তরাধিকার বা sex-linked heredity বলে।

(৯) কখনো কখনো দুটি বিপরীত গুণের মিশ্রণে একটি প্রকট ও আর একটি অপসৃত না হয়ে, এদুটি গুণের সব রকম মিশ্রণই সন্তানদের মধ্যে

দেখা যায়। বাদামী দানা ও সাদা দানা যবের মিশ্রণে, সাদার থেকে সুরু করে, গভীর বাদামী পর্যন্ত পাঁচ বিভিন্ন পোঁছের রং-এর দানাযুক্ত যব পাওয়া যায়, একে বলে মিশ্রিত উত্তরাধিকার—Blended heredity।

বংশগতির বিভিন্ন উপাদান—Factors in heredity.

কোন্ ব্যক্তিতে কোন্ কোন্ গুণ প্রকাশ পাবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শক্তি বা সম্ভাবনার উপরে। এই উত্তরাধিকারের উপাদানগুলিকে পাঁচ ভাগে (factors) ভাগ করা যেতে পারে। গণ (species), জাতি (race), পরিবার (family), লিঙ্গ (sex) এবং ব্যক্তিত্ব (individuality)।

১। গণ—species—মানুষের সন্তানের দৈহিক গঠন, কথা বলবার ক্ষমতা, মানষিক বৃত্তি মানুষের মতই হবে, গরু বা ছাগলের মত হবে না। এগুণগুলি মনুষ্যগণের (species) লক্ষণ। অন্য প্রাণীর মত তার কতগুলি সাধারণ আদিম প্রবৃত্তি যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি থাকবেই কিন্তু তার প্রকাশের মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য থাকবে।

২। জাতি—Race—সন্তানের মধ্যে যেমন গণগত কতগুলি লক্ষণ বিদ্যমান তেমনি কতগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্যও থাকবে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—

(ক) দেহের উচ্চতা—জাপানীরা বেঁটে বেঁটে, কিন্তু পাঠানেরা লম্বা। ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে তা নগণ্য।

(খ) মাথার গড়ন—নিগ্রো জাতির মাথার খুলি ও চোয়াল লম্বাটে ও অপরিসর, নর্ডিক জাতির গড়ন ডিম্বাকৃতি, আর চীনারা হোল "চ্যাপটা সুধাংশু।"

(গ) অবয়বের গঠন—এক এক জাতের এক এক রকম,—রাশিয়ানরা হচ্ছে গোলগাল, লম্বা-চৌড়া গড়নের; ইহুদীরা হচ্ছে লম্বা চিম্‌সে, নাক উঁচু; নিগ্রোর হচ্ছে পুরু ঠোঁট ইত্যাদি। চোখের গড়ন, চোখের রং ও বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন রকম। অবশ্য ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি সবই বংশগত একথা বলা চলে না। পরিবেশ যেমন, ভৌগোলিক অবস্থান, খাদ্য ইত্যাদিও কতকটা দায়ী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ঘ) চুল—চুলের রং এবং ধরণ বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকম। বাঙ্গালীর চুল কালো, দীর্ঘ; ইংরেজদের চুল সোনালী ও সরু; নিগ্রোদের চুল কড়া ও কোঁকড়ানো।

(ঙ) মেজাজ—দৈহিকগুণ যেমন জন্মগত, তেমনি মানসিক গুণও অনেকসময় জন্মগত, যেমন ফরাসীরা রসিক, আলাপী, ভদ্র; ইংরেজ গম্ভীর, হিসাবী, সাবধানী; নিগ্রোরা আমুদে ও লঘুস্বভাব; স্লাভজাতি বিষণ্ণ ও চিন্তাশীল।

৩। পরিবার—প্রত্যেক পরিবারেরও ধারা আছে পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে (ক) স্বাস্থ্য (খ) বুদ্ধি (গ) বিশেষ নৈপুণ্য বা অনৈপুণ্য।

এক এক পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রচুর স্বাস্থ্যবান্,—আমরা কথায় বলি তাদের 'জোয়ানের গুষ্টি।' আর এক পরিবারের ছেলেমেয়েরা রোগাটে।

শিশুকাল থেকেই একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বুদ্ধির যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। কাজেই মনে করা যায় এ পার্থক্য জন্মগত। অবশ্য বুদ্ধির পার্থক্য পরিবেশের উপরও কিছুটা নির্ভর করে, সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করব।

বিশেষ বিশেষ নিপুণতা (যেমন গাইবার ক্ষমতা, অংক কষবার ক্ষমতা বা অক্ষমতা) এক এক পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেন স্বাভাবিক। এর কতটা জন্মগত ও কতটা পরিবেশ ও শিক্ষাগত তা নিয়ে বহু তর্ক আছে। তবে কিছুটা যে বংশগত, এটা সঙ্গতভাবে মনে করা যেতে পারে।

৪। লিঙ্গ—লিঙ্গেরও পার্থক্য জন্মগত, এবং এ প্রভেদ কতগুলি দৈহিক ও মানসিক প্রভেদের কারণ।

পুরুষ ও নারীর দৈহিক প্রভেদ পরিণত বয়সে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নারীদেহের প্রধান সুর মাধুর্য ও ছন্দোময়তা; পুরুষ দেহের প্রধানসুর কাঠিন্য, দৃঢ়তা। জৈব প্রয়োজনেই এটা হয়েছে। লিঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট অবয়বাদির প্রভেদ ছাড়াও আরও প্রভেদ আছে। পুরুষের হাড়, নারীর চেয়ে স্থূলতর, দৃঢ়তর। নারীর পেশী কোমল ও অধিকতর নমনীয়। অল্প বয়সে মেয়েদের শরীরের 'বাড়' ছেলেদের তুলনায় দ্রুততর। কিন্তু পরে ছেলেরা মেয়েদের ছাড়িয়ে যায়।

তাদের মানসিক পার্থক্য নিয়ে কাব্যে ও সাহিত্যে অনেক বিপরীত মতামত প্রচলিত আছে। সেগুলি অধিকাংশ সময়ই অনির্ভরযোগ্য। বৈজ্ঞানিক আলোচনাও অনেক হয়েছে ও হচ্ছে। সেখানেও যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। জৈব প্রয়োজনে দৈহিক প্রভেদ যেমন আছে, মানসিক প্রভেদও তেমনি থাকবে, এটা মনে করা অসঙ্গত নয়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে কয়েকটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আগে কথা বলতে শেখে, কিন্তু ছেলেদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর।[১৩] টারম্যানের (Terman) পরীক্ষায় দেখা যায়,

অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলেদের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় বেশী, আবার ডব্লিউ, এফ ব্রুক ও জে. এল্. মিভোজ নামে দুই বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় দেখা যায়, মানসিক ন্যূনতা সম্পন্ন (mentally deficient) ছেলের সংখ্যাও মেয়েদের তুলনায় বেশী। টি. হাণ্ট নামে আর এক বিজ্ঞানী বলছেন, ছেলেদের নানা সংবাদ রাখবার সামাজিক গুণ বেশী, কিন্তু মেয়েরা সমাজে অনেক বেশী মানিয়ে চলবার ক্ষমতা রাখে। প্রাচীনেরা নারী ও পুরুষের পার্থক্যকে অলঙ্ঘ্য বলে মনে করতেন। কিন্তু নারীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে নারী এমন সব দৈহিকগুণের পরিচয় দিচ্ছে, যা এককালে নিতান্তই পুরুষোচিত বলে বিবেচিত হত। মানসিক দিক থেকেও তাদের হীনতার অপবাদ নারী সম্পূর্ণ অস্বীকার কর্তে সুরু করেছে। 'সবলা' আজ দৃপ্তকণ্ঠেই বলছে, 'যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী।'—বর্ত্তমান কালে অনেক মনোবিজ্ঞানীও মনে করেন, মানসিক শক্তির সম্পর্কে নারী ও পুরুষের পার্থক্য, প্রাচীনেরা যতটা বেশী মনে করতেন বাস্তবিকপক্ষে তা নয়।[১৪]

৫। ব্যক্তিত্ব—পূর্বেই বলা হয়েছে প্রত্যেক সন্তানের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তগুণের সমষ্টি বিভিন্ন। প্রত্যেক মানুষ তাই বিভিন্ন। একই পিতামাতার যমজ সন্তানদের বংশগত বা উত্তরাধিকার সবচেয়ে কাছাকাছি, কিন্তু তার মধ্যেও পার্থক্য আছে। প্রত্যেক সন্তানের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য অনুসারেই ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার কাজই হবে প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তাকে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া। এ বিকাশ উপযুক্ত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

পরিবেশ—Environment—ধাতুগত অর্থে, যা বেষ্টন করে থাকে, তা পরিবেশ। প্রত্যেক শিশু জন্মমাত্র এমন কি মাতৃগর্ভেও কতকগুলি অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত। এ সবই তার পরিবেশ। শিশুর জন্মস্থানের ভৌগোলিক বিশেষত্ব, তার খাদ্য, গৃহ, বন্ধু, শিক্ষক, সমাজ, ধর্ম এই সবই তাকে ঘিরে থাকে, তাকে প্রভাবান্বিত করে, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সমাজের এ পরিবেশ তার প্রকৃতির মধ্যে এমন ভাবে মিশে যায় যে তাকে তার বংশগতি বা উত্তরাধিকার থেকে পৃথক করা যায় না। তাই অনেক সময় 'সামাজিক উত্তরাধিকার' বা social heredity কথাটি ব্যবহার করা হয়। এ ব্যবহার খুব বিজ্ঞান-সম্মত নয়।

---

১৩ Norsworthy Whitley—Psychology of childhood ch. II.

১৪ M. F. Nimkoff—The child P. 37.

পরিবেশকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান ভাগ করা হয়—(১) গৃহ (২) বিদ্যালয়, (৩) সমাজ।

গৃহ বলিতে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের স্নেহ, প্রীতি, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা ইত্যাদিও বোঝায়। ঘরের গড়ন, আলো, বাতাস, খাদ্য ইত্যাদি তো বোঝায়ই। গৃহের পরিবেশ শিশুর জীবনে গভীরতম প্রভাব বিস্তার করে, কারণ, শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন সে সম্পূর্ণ অসহায়—সে তখন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজনের উপর। এ সময়ে প্রীতি ও যত্নের অভাব, পিতা মাতার মধ্যে বিরোধ, গৃহের বাহ্যিক ও মানসিক আবহাওয়া তার জীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। এখানেই সে শেখে বিভিন্ন সু-অভ্যাস বা কু-অভ্যাস। এখান থেকেই সে পায় তার ভাষা, তার জীবন-দর্শনের প্রথম ইঙ্গিত। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানী তাই এ কথাটির উপর বারে বারে জোর দেন, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন, সুন্দর, নির্মল শান্তিপূর্ণ গৃহপরিবেশ।

বিদ্যালয় বলতে শিক্ষার সব উপাদানকে বোঝায়, শুধু স্কুল ঘর নয়, শিক্ষক, পুস্তক, বন্ধু, খেলা ধূলা; ঘরের বাইরে, বাড়তি বয়সে তার সুশিক্ষা বা কুশিক্ষার সব উপায় বা উপাদানকে বলা যায় বিদ্যালয় পরিবেশ। শিশুর দেহ যখন বাড়ছে, মন যখন উৎসুক, তখন গৃহের পরেই বিদ্যালয়ের প্রভাব সবচেয়ে গভীর। এখানে আছে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব।

সমাজ বলতে ধর্ম আচার ব্যবহার ভাষা, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রতিযোগিতা, নানা সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, এ সব বোঝায়। মানুষের জীবন এ সবের দ্বারা গঠিত, প্রভাবান্বিত, পরিবর্তিত হয় এ কথা বোঝা কঠিন নয়। তাই বর্তমান যুগে মানুষ, 'আদর্শ অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কোনটি?' এ প্রশ্ন কচ্ছে, এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্যে নানা পরীক্ষা নানা প্রচেষ্টায় ব্রতী হচ্ছে। সমস্ত সংগঠন, সংস্কার ও বিপ্লবের পেছনে রয়েছে এ বিশ্বাস, যে সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা মানুষকে উন্নততর জীবনের অধিকারী করা যায়। মানুষ একক চেষ্টায় তার জীবনকে গড়ে না, সামাজিক পরিবেশটি অনুকূল হওয়া চাই। রাশিয়া আজ এ কথাটির উপর সবচেয়ে জোর দিচ্ছে।[১৫]

বংশানুক্রম ও পরিবেশ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা—

এবার আমরা বংশানুক্রম ও পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব সম্পর্কে যে বিবিধ পরীক্ষা হয়েছে তার সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। প্রায় সব পরীক্ষার

১৫ Beatrice King—Changing Man; The Soviet Educational system.

মধ্যেই বুদ্ধির প্রভেদটা কতটা জন্মগত, আর কতটা পরিবেশগত, (nature or nurture) এ প্রশ্নের জবাব খোঁজা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাধারণ রীতি অনুযায়ী বংশগতি বা উত্তরাধিকার যাদের মোটামুটি এক, বিভিন্ন পরিবেশে তাদের পরিবর্তন লক্ষ্য করে পরিবেশের প্রভাব নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার একই পরিবেশে লালিত বিভিন্ন বংশের ছেলেমেয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করে, বংশগতির প্রভাব নির্ধারিত হয়েছে। এ পরীক্ষাগুলিকে আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিত ছয়টি দলে ভাগ করতে পারি।

(ক) পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ—বিখ্যাত ও কুখ্যাত কয়েকটি বংশের (কয়েক পুরুষ ধরে) পর্যালোচনা।

(খ) নানা ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বংশানুক্রম ও পবিবেশ (বিশেষতঃ পরিবেশ) নির্ধারণ।

(গ) একেবারে শিশুকাল হতে পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্য পরিবারে পালিত পোষ্য সন্তানের সম্বন্ধে আলোচনা।

(ঘ) একই পরিবেশে বর্ধিত বিভিন্ন পরিবারের শিশুদের সম্পর্কে (যেমন অনাথাশ্রম, বেদের দল, বোর্ডিং হাউসে পালিত) আলোচনা।

(ঙ) খুব নিকট সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের (যমজ, ভাই-বোন, পিতামাতা-সন্তান) সম্বন্ধে আলোচলা।

(চ) শিশুদের বুদ্ধির সঙ্গে তাদের পিতামাতার আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা।

(ক) বংশমালা সংগ্রহ—

গ্যাল্‌টন্ (Galton) বংশপরম্পরার প্রভাব সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাসী। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গ্যাল্‌টন-ডারুইন (Galton-Darwin—নিকটতম সম্পর্ক-বিশিষ্ট দুইটি বংশ) পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন (Hereditary Genius)। এই ইতিহাসই সম্পূর্ণতর করেন কার্ল পিয়ার্সন্ (Kral pearson)। তিনি বহু পরিশ্রমে প্রায় এক হাজার বৎসর ব্যাপী ওয়েজউড্-ডারুইন-গ্যাল্‌টন্ (wedgewood-Darwin-Galton) পরিবারের বংশে তালিকা তৈরী করেন (The life, Letters and Labours of Francis Galton Vol. 1 Pedigree plates)। এই পরিবার কয়টিতে ইংল্যাণ্ডের বহু বহু বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মেছেন,—যাঁরা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে নিজ

নিজ কীর্তি রেখে গেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে ডারুইন পরিবারে, —সোজাসুজি পর্যায়ে, পাঁচ জন অত্যন্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন্মেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, জীবজগতে অভিব্যক্তিবাদ (theory of biological evolution) প্রচার করেছিলেন যে চার্লস্-ডারুইন, তিনি এঁদের মধ্যে অন্যতম। বংশগতির সমর্থকেরা এর থেকে সিদ্ধান্ত করে থাকেন, যে বংশানুক্রমের প্রভাব অনস্বীকার্য। কথাটার পেছনে জোর আছে, কিন্তু কেবলই বংশানুক্রম এই উৎকর্ষের জন্য দায়ী এবং পরিবেশের প্রভাব নগণ্য, এ রকম সিদ্ধান্ত করাটা অনুচিত হবে।

আর. এল. ডাগ্‌ডেল (R.L. Dugdale), নিউইয়র্ক স্টেটে কারাগারসমূহের বড়কর্তা ছিলেন। অনেক বৎসরের কয়েদীদের নাম দেখে দেখে, তাঁর খেয়াল হ'ল একটা বংশের নাম বারে বারে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি তিন বছর বহু অনুসন্ধান করে করে, বের করলেন যে, পরিবারটির গোড়া পত্তন হয়েছে একজন দুশ্চরিত্র এবং ভবঘুরে শিকারীর থেকে। তিনি জ্যুকস্ (Jukes) এই ছদ্মনাম ব্যবহার করে এই পরিবারটির বহু বৎসরব্যাপী বংশ-তালিকা সংগ্রহ করে দেখান যে, এই পরিবারের অধিকাংশ লোকই চোর, ডাকাত, খুনে ইত্যাদি। সৎলোক এ পরিবারের যাদের পাওয়া গেল, কেউই উল্লেখযোগ্য ছিল না।[১৬] এ থেকে ডাগ্‌ডেল্ ও গ্যাল্‌টন্ এর মত বংশানুক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছেন। কিন্তু এই পরিবারটির পরবর্তী ইতিহাস সংগ্রহ করেন ডাঃ এ. এইচ. ইস্টারব্রুক্ (Dr. A. H. Easterbrook) এবং ১৯১৫ সালে তিনি এদের ইতিহাস প্রকাশ করেন। তিনি দেখলেন জ্যুকরা তাদের আদিম বাসস্থান (সেখানে সিমেণ্ট-এর কারখানায় অধিকাংশ জ্যুকরা কাজ করত, এবং সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে চলে যায়) ছেড়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হওয়াতে অপেক্ষাকৃত ভাল এবং নূতন বংশে বিবাহাদি করার ফলে এই পরিবারটির বংশধরদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েচে। কাজেই এখানে বংশানুক্রম এবং পরিবেশ এ দুয়েরই প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।[১৭]

অনুরূপ একটি প্রসিদ্ধ বংশমালা সংগ্রহ করেছেন এইচ্. এইচ্. গডার্ড (H. H. Goddard) এবং সে বংশটির কল্পিত নাম হচ্ছে ক্যালিক্যাকস্

১৬ R. L. Dugdale—The Jukes, 1877.

১৭ Dr A. H. Easterbrook—The jukes 1915.

(Kallikaks)। বাহুল্য বোধে এর আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম, তবে এখানেও বংশানুক্রম ও পরিবেশ দুইয়ের প্রভাবই কাজ কচ্ছে এ রকম সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত হবে।[১৮]

(খ) প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ—

গ্যালটন্ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে আলোচনা, তাদের বংশ ও পরিবেশ নিয়ে নানা প্রশ্ন করে তার উত্তর সংগ্রহ করে, সিদ্ধান্ত করেছেন বংশানুক্রমের প্রভাবই প্রধান।[১৯]

ক্যাটেল্ অনুরূপ ভাবে আমেরিকার প্রসিদ্ধ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের জীবনী পুংখানুপুংখ ভাবে আলোচনা করে গ্যালটন্ এর সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তিনি লিখছেন "দেশের বিভিন্ন অংশে যে বিজ্ঞানীরা আছেন অঞ্চল বিভেদে তাদের সংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। গ্যাল্টনের এই সিদ্ধান্ত যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উৎকর্ষের জন্য বংশগতিই দায়ী, উপরোক্ত ঘটনা তার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি। বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বুদ্ধির উৎকর্ষ লোক বসতির ঘনতা, বিত্ত, সুযোগ, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্কার ও আদর্শের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।[২০]

টারম্যান্ (Terman) কালিফর্ণিয়ার একহাজার তীক্ষ্ণধী ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির মাপ, পিতামাতার বুদ্ধির মাপ, পিতার আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করে বংশানুক্রমের পক্ষেই সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু এ সমস্ত ছেলেমেয়েদের সাংসারিক পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুকূল ছিল কাজেই তার কোন প্রভাব নেই, এরকম সিদ্ধান্ত অনুচিত হবে।[২১]

(গ) অন্য পরিবারে পালিত সন্তান—

মিস্ বারবারা বার্কস্ (Miss Barbara Burks) ২০৪টি একরকম ছেলেমেয়ে যারা এক বছর বয়স হবার আগেই অন্য পরিবারে পালিত হয়েছে তাদের নিয়ে তাঁর পরীক্ষা চালান। আপন পিতামাতার বুদ্ধির মাপ ও এই শিশুদের বুদ্ধির মাপ, আবার পালক পিতামাতার বুদ্ধির মাপ এবং পালিত এই শিশুদের বুদ্ধির মাপ ইত্যাদি তুলনা করে দেখিয়েছেন—বংশানুক্রমের প্রভাব

---

১৮ H. H. Goddard The Kallikaks family 1914.

১৯ Galton—English men of science 1874.

২০ Cattell—A Statistical study of American men of science.
(Scince 1906 N. S. 24, pp. 732-742)

২১ Terman—Study of a thousand gifted children in California.

অস্বীকার করবার উপায় নেই আবার পরিবেশও যে প্রভাব বিস্তার করে তাও বোঝা যায়।

তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, "গৃহপরিবেশ বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.—বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ প্রবন্ধ দেখ) এর বিভিন্নতার ১৭%এর জন্য দায়ী ; পিতামাতার বুদ্ধিমত্তা প্রায় ৩৩% বিভিন্নতার কারণ। বংশগতির মোট প্রভাব সম্ভবতঃ ৭৫% থেকে ৮০%। [২২] বার্কস্ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে যে প্রকার সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, ১৯৩৫ সনে মিনেসোটাতে লীহি (Leahy) অনুরূপ একটি পরীক্ষা করে প্রায় একই প্রকার সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। উভয় পরীক্ষার ফলাফল একটি গ্রাফের সাহায্যে পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

ফ্রীমান্, হোল্‌ৎজিঙ্গার ও মিচেল (Freeman, Holzinger and Mitchell) কয়েক জোড়া ছেলেমেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাদের মধ্যে একজন নিজ পিতামাতার কাছেই বড় হয়, আর একটি অন্য পরিবারে দত্তক হিসাবে গৃহীত হয়।

তাঁদের পরীক্ষার ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, ভালো পরিবারে যত্নের সঙ্গে পালিত হলে, দত্তক সন্তানদের, নিজ পরিবারের চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি হয়। তবে বংশপরম্পরার প্রভাবও পরিবেশের চেয়ে কম নয়,—দুটোর প্রভাবেই প্রায় সমান।

(ঘ) অনাথ আশ্রম ইত্যাদিতে পালিত ছেলেমেয়ে—

অনাথ আশ্রমে একই পরিবেশে পালিত ছেলেমেয়েরা বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণে সমান হবে, যদি পরিবেশের প্রভাবই প্রধান হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা দেখা যায় না। বিভিন্ন পরিবারে পালিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যতটা পার্থক্য থাকে, এখানেও প্রায় তাই দেখা যায়। কাজেই উগ্র পরিবেশবাদীদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু যাযাবর, ভবঘুরে, নৌকার মাঝি, বিচ্ছিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাহত হয়েছে এ রকম সিদ্ধান্ত করবার সঙ্গত কারণ আছে। এ সম্বন্ধে গর্ডন্ (Gordon) [২৩] এবং এ্যাসার্ (Asher) [২৪] এর পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য।

২২ "Home environment contributes about 17% of variance in I. Q.; parental intelligence accounts for about 33%. Total contribution of heredity probably is between 75% to 80%." Burks—Relative importance of nature and nurture upon mental development, 27th Year Book of the (American) National Society for the Study of Education 1928.

(ঙ) অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সাদৃশ্য—

সঙ্গমকালে মাতার যোনিস্থ একটি অণ্ড (ovum) পিতার দেহস্থ একটি শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত (fertilized) হ'লে গর্ভসঞ্চার হয়। কিন্তু

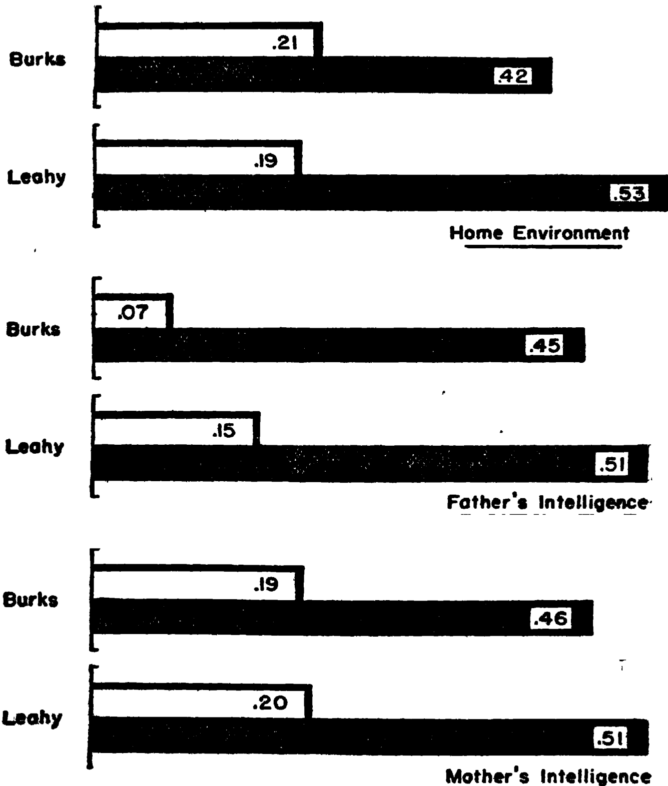


Figure 23. A comparison of foster child and true child correlations. (Quoted from H. E. Jones—Environmental influences on mental development. Manual of Child Psychology Ed. L, Carmichael, P. 622.)

কখনও কখনও এই নিসিক্ত অণ্ড (fertilized ovum) ভেঙে দুটি হয়। তাতে একই লিঙ্গ-বিশিষ্ট যমজ সন্তান হয়। এদের বলে আইডেন্টিক্যাল্ টুইনস্ (Identical twins)। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যমজ সন্তান হয়, তার কারণ, মাতার যোনিস্থ দুইটি বিভিন্ন অণ্ড দুইটি বিভিন্ন শুক্রকীট দ্বারা নিসিক্ত হয়। এদের বলে ফ্রেটারন্যাল্ টুইনস্ (fraternal twins)। আর আলাদা আলাদা জন্ম, একই পিতামাতার সন্তানদের বলে সিবলিংস্ (siblings)।

পরীক্ষা করে দেখা যায় আইডেন্টিক্যাল্ টুইনস্‌দের মধ্যে বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণে সাদৃশ্য খুব বেশী। তাদের লিঙ্গ এক, আগেই বলা হয়েছে, তাদের চেহারার মধ্যেও আশ্চর্য সাদৃশ্য থাকে (woodworth and Marquisএর Psycholgyর ১৭০ পৃঃ ছবিটি দ্রষ্টব্য)। এমন কি এদের দুজনের একই সময়ে একই ধরনের অসুখ করে,—যদিও এরা দূরে দূরে থাকে। আবার ফ্রেটারন্যাল্ টুইনস্‌দের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তা আইডেন্টিক্যাল টুইন্‌স্‌দের চেয়ে কম। আবার সিবলিংস্‌দের মধ্যে মিল ফ্রেটারন্যাল্ টুইনস্‌দের তুলনায় কম কিন্তু অনাত্মীয় দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকে তার চেয়ে বেশী। (বুদ্ধির হার বা I. Q. এর তফাতটা এসব ক্ষেত্রে কত হয়, এ বিষয়ে নানা পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া হোল।

AVERAGE DIFFERENCE IN I. Q. POINTS			
Between Identical twins	Between Fraternal twins	Between brothers and sisters (sibling)	Between unrelated individuals
5	9	11	15

এতে বংশানুক্রমের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ফ্রেটারন্যাল্ টুইনস্ এবং সিবলিংস্‌দের বংশগত জীন্‌স্-এর পার্থক্য তো সমান, কাজেই তাদের বেশী সাদৃশ্যের কারণ এই যে, তাদের পরিবেশ অনেকাংশেই এক। আইডেন্টিক্যাল টুইনস্‌দের সাদৃশ্যেরও এটাও নিশ্চয়ই একটা কারণ যে, তাদের পরিবেশ (যেমন পিতামাতার যত্ন, বাড়ীঘর, বন্ধু-বান্ধব) অনেকাংশেই এক।

২৩ Gordon—Studies of English gypsies and Canal-boat children.

২৪ Asher—Study of Children in East Kentucky mountains.

এ বিষয়ে, অল্প বয়সে বিচ্ছিন্ন আইডেন্টিক্যাল্ টুইনস্—যারা বাল্যকাল থেকে বিভিন্ন পরিবেশে বড় হয়েছে, তাদের নিয়ে পরীক্ষার ফল মূল্যবান। কারণ এখানে বংশগতি প্রায় এক, পরিবেশ বিভিন্ন। এ রকম অল্প কয়েকটি উদাহরণ মাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। ১৯২৯ সালে জেসেল্ ও টম্সন (Gessel & Thompson) দুটি যমজ শিশু নিয়ে যে পরীক্ষা করেছিলেন তার বিবরণ ও সিদ্ধান্ত পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল। ভাই-বোন এবং সন্তান ও পিতামাতার সাদৃশ্য সম্পর্কে কয়টি পরীক্ষাও দেওয়া হল।[২৫] মোটামুটিভাবে বলা যায় যে সন্তান ও পিতামাতার সাদৃশ্য (correlation co-efficient) হচ্ছে +·3 থেকে +·6 ; এবং বিভিন্ন গৃহে প্রতিপালিত ভাইবোনের সাদৃশ্য হচ্ছে +·15।

(চ) পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে শিশুর বুদ্ধি ইত্যাদির সম্বন্ধ—

সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানদের বুদ্ধির মাপ নিয়ে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানেরা মোটের উপর বেশী বুদ্ধিমান্। অবশ্য একজাতীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানদের মধ্যেও প্রচুর ভিন্নতা দেখা যায়। কাজেই এই পরীক্ষাতেও পরিবেশ ও বংশানুক্রম দুইএর প্রভাবই প্রমাণিত হয়। উডওয়ার্থ ও মারকিস্ লিখছেন ক্ষেতচাষী ও অনিপুণ শ্রমিকের ছেলেদের বুদ্ধির হার নীচু, ডাক্তার, শিক্ষক ও শিল্প পরিচালকদের ছেলেদের বুদ্ধির হার উঁচু, কিন্তু খুব তফাত এই দুই দলের কতক ছেলেদের বুদ্ধির হার, সমাজের সাধারণ বুদ্ধির হারের চেয়ে বেশী তফাত নয়। ক্যালিনস্, গুডেনাফ্ জোনস্, এবং টারম্যান্ (Collins, Goodenough, Jones & Terman) এ বিষয়ে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে পিতার জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সন্তানদের বুদ্ধির বিভিন্নতার সম্বন্ধ অনস্বীকার্য। নীচে ফলটা মার্ফি ও নিউকোম্ (Murphy & Newcomb) এর বই থেকে দেওয়া হ'ল—

Occupation	*No. of families*	*Family Inter quartile Range (Middle 50 p. c.)*	*Median Family I. Q.*
Professional	90	106—126	116
Managerial	165	104—123	112
Clerical	131	105—122	113
Trade	413	100—120	110
Foreman	106	98—118	109
Skilled labour	569	94—114	104
Unskilled labour	877	85—108	95

Author Date	Topic	Subject	Methods	Findings	General Remarks.
Gesell, A., and Thompson, H. (1929)	Effect of environmental change with heredity held constant.	A pair of identical twins studied from birth.	One twin given 6 weeks' training in stair-climbing beginning at age of 46 weeks. Other given 2 weeks' training at 53 weeks. Motion picture.	Motion picture showed nearly equal stairclimbing speed. At 79 weeks, twin with greater training climbed with greater alacrity and was more active in other motor situations.	"...Superior training did not make any tremendous difference in actual capacity, for achievement, but.........the advantage may have given the trained twin a sense of confidence...and consequently a real increase in amount of climbing."
Hildreth, G. H. (1925)	Resemblance of siblings in intelligence and achievement.	578 pairs of sibs with and without nursery-school experience, entering 1st. grade.	Intelligence test scores available, Correlations made for sibs living together, apart, and non-sibs.	Composite r for sibs with age partialed out, +41 ; for sibs reared apart (corrected for curtailed range), + ·50. Unrelated children reared apart yield same results as unrelated children reared together.	"True siblings reared apart for part of their lives still resemble each other about as much as true sibling pairs reared together. Unrelated children reared together for part of their lives resemble each other in intelligence no more closely than unrelated children chosen...at random."
Jones, H. E. (1928)	Intelligence resemblance between parents and children.	105 New England families : native born white of native born stock, from rural districts of Mars., N. H., Vt 210 parents, 317 children.	Army Alpha (5 or 7) used with parents and children above 10 yrs. ; Stanford-Binet with the 213 children between 3½ and 14 yrs.	Average r of ·55 between intelligence of parents and children. Mother's influence greater than father's 5 points higher r ; unreliable but consistent difference Like—Sex r's about same as unlike—Sex r's.	Material throughout is consonant with Pearson's thesis that "physical characters......are inherited within board lines in the same manner and with the same intensity." Not considered proof. २३

२४ Murphy & Newcomb : Experimental Social psychology, P. 32.

বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বিবেচনা করে শেষ সিদ্ধান্ত—

এ সব পরীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয়, যে বংশানুক্রম বা পরিবেশ এ দুইএর কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না। বংশানুক্রম হচ্ছে সম্ভাবনা, কিন্তু সে সম্ভাবনা কতটুকু বা কি ভাবে বাস্তবরূপ নেবে, তা নির্ভর কচ্ছে পরিবেশের উপর। Ex nihilo nihil fit—শূন্যের থেকে কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। বীজের মধ্যে শক্তি বা সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাই গাছ হ'তে পারে। কিন্তু বীজ জমি থেকে কি রস পাচ্ছে, তার উপর নির্ভর কচ্ছে, গাছ সতেজ হবে না দুর্ব্বল হবে। কিন্তু সম্ভাবনার একটা সীমা আছে,—শত যত্নেও সে সীমা অনতিক্রম্য। কিন্তু কোন একজন মানুষের সম্ভাবনা কতটা তা নির্ভুল ভাবে আগে থেকে জানবার কোন উপায় নেই। বুদ্ধি ও কাজের নানা পরীক্ষার (Intelligence ও Performance test) ফলাফল থেকে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ একটা ধারণা আমাদের হতে পারে। তবে এটা অবিশ্যি জোর করেই বলা যায় যে একেবারেই জড় বুদ্ধি (idiots বা morons) কোনদিনই প্রতিভাবান্ (genius) হবে না, শত চেষ্টাতেও। কাজেই শিক্ষক যদি তাঁর শিক্ষার ফল সম্বন্ধে অসম্ভব আশা রাখেন তাহ'লে তাকে নিরাশ হতে হবে। তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে বংশানুক্রমের গুণ একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ (limiting factor)। তাই ভাল ফল পেতে হ'লে ভাল জাতের ছেলে বাছাই করা তাঁর পক্ষে অন্যায় হবে না। কিন্তু বংশানুক্রম পরিবর্তন করবার ক্ষমতা তো তাঁর হাতে নেই,—আর বাছাই করে যারা "নীরস" ধরনের তাদের ভারও তো শিক্ষকের উপর। ভাল শিক্ষা, ভাল সঙ্গ, উপযুক্ত উৎসাহ এটা শিক্ষক দিতে পারেন। এটা দেওয়া তাঁর কর্তব্য। নিকৃষ্ট বংশানুক্রমের কতকগুলি কু-সম্ভাবনাকে বাধা দেওয়া যেতে পারে সুশিক্ষার দ্বারা, এটা সামান্য কথা নয়। আর উৎকৃষ্ট সম্ভাবনা যাতে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে, তারও উপায় আছে সুশিক্ষার মধ্যে। আর যারা মধ্যম তাদেরও মান কিছুটা উন্নত করা যায়। যত্ন পেলে প্রত্যেক ছেলেরই কিছু না কিছু উন্নতি হয়ই। এটা শিক্ষকের আশার কথা, এবং এটা সামান্য কথা নয়। "যাঁরা গণতন্ত্রের (democracy) গুণ বিচারে রত এমন ব্যক্তি, শিক্ষক বা সমাজ কর্মীর দৃষ্টিতে এ সম্ভাবনা যথেষ্ট মূল্যবান্। যদিও প্রত্যেক ঝাড়ুদারের ছেলে বড় ইন্‌জীনীয়ার হয়তো হতে পারবে না কিন্তু সে সার্ভেয়ার বা ডাক বিভাগের কেরাণী নিশ্চয় হতে পারে এবং সমগ্র জনসাধারণের বুদ্ধিহার পাঁচ অঙ্কও যদি উন্নত করা যায় তার

ফল হবে সুদূরপ্রসারী।"[২৬] সুশিক্ষা দিয়ে শুধু কয়েকটি ব্যক্তি নয়, একটা জাতেরও কতখানি উন্নতি হতে পারে, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে রাশিয়া। সেই সঙ্গেই সাহসী পরীক্ষা চালাচ্ছেন, নয়া চীন। ইংলণ্ড, আমেরিকাতেও এ কথা সত্য। আজ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে সে সব দেশবাসী, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। তার সুফল সে সব দেশে সুস্পষ্ট। বুদ্ধির বিকাশ যেমন অনুকূল পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত, ব্যক্তির রুচি ও চরিত্র,—তার সমস্ত ব্যক্তিত্বই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত। কাজেই শিক্ষক, সমাজ-সেবী, রাজনীতিবিদ্ সকলের চেষ্টা হওয়া উচিত পরিবেশকে উন্নত করবার। রাশিয়া সে অসম্ভব সাহস করেছে,—তার সমগ্র সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের কাঠামো সে ভেঙ্গেচুরে বদলে দিয়েচে। তার ফল কি হয়েচে তা যে দেখতে পায় না সে অন্ধ। একটা পর্যায় যদি নূতন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয় তার সুফল কি পরবর্তী পুরুষে কিছুটা প্রতিফলিত হবে না? ব্যক্তির পক্ষে অর্জিত গুণ বংশানুক্রমিক না হতে পারে, কিন্তু 'সামাজিক বংশগতি' কথাটার বৈজ্ঞানিক কোন নির্দিষ্ট মানে না থাকলেও, সেটা মিথ্যে নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাটাই একটা সামাজিক উত্তরাধিকার। "সামাজিক উত্তরাধিকার বলতে বোঝা যায় একটা নূতন পর্যায়ের উপর পূর্বপুরুষেরা তাদের কার্য ও পুস্তকাদি দ্বারা যে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। স্পষ্টতই শিক্ষা হচ্ছে এই সামাজিক উত্তরাধিকারের অঙ্গ।"[২৭] আজ রাশিয়ার বিজ্ঞানী মিচুরিন্, লাইসেংকো (Michurin, Lysenko) ইত্যাদি বিশ্বাস কচ্ছেন,—বংশানুক্রম কৃত্রিম ভাবে পরিবর্তন করা সম্ভবপর। এ কথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হলে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

অতখানি আশাবাদী যদি নাও হই, তবু শিক্ষার ফলে মানুষের ও সমাজের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলি দূর করা ক্রমে ক্রমে যেতে পারে, এ আশা শিক্ষক নিশ্চয়ই করতে পারেন। যে সব পরীক্ষা এ যাবৎ হয়েছে তা অধিকাংশই বুদ্ধির পার্থক্যের মাপজোঁখ নিয়ে ব্যস্ত। রাশিয়াতে এই বুদ্ধির মাপের উপর বেশী মূল্য আর দেওয়া হয় না। মানুষ কেবল বুদ্ধি দিয়েই গড়া নয়, তার সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের পক্ষে পরিবেশের দাম অমূল্য, উন্নততর শিক্ষা প্রণালীর ফলে যদি বুদ্ধির উন্নতি নাও হয়, কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হয়, তার মূল্যও সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে অসীম। তার শিক্ষার ফলে সমাজের

২৬ Murphy and Newcomb—Experimental Social Psychology. P. 53.

২৭ Godfrey and Thompson—A modern Philosophy of Education P. 136.

কৃত্রিম বিভেদগুলি যদি দূর হয়, তবে বংশানুক্রমের উপরও তার প্রভাব দেখা দেবে। তখন দরিদ্র কিন্তু বুদ্ধিমান্, স্বাস্থ্যবান ও চরিত্রবান যুবকের পক্ষে অনুকূল পরিবেশে প্রতিপালিত ধনীর দুলালীর পাণিগ্রহণ অসম্ভব হবে না, এবং পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারা শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ যদি সকলে পায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তা ছাড়া সুপ্রজনন বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করে, তাদের ব্যাখ্যা করে, শিক্ষক ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতির সহায়ক হতে পারেন। কাজেই সোজাসুজি ভাবে বর্তমান বংশানুক্রমকে শিক্ষক পরিবর্তন না করতে পারেন কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নততর বংশধর সৃষ্টির সম্ভাবনাকে তার শিক্ষা দ্বারা তিনি ত্বরান্বিত করতে পারেন। "এটা সত্য যে আজ যে পর্যায় চলছে, তাদের বংশানুক্রম আমরা পরিবর্তন করতে পারব না। কিন্তু নূতন যে বংশধরেরা আজও জন্ম নেয়নি, তাদের বংশগতির উন্নতির সম্বন্ধে আমরা কিছু করতে পারি। কোন যুবক ও যুবতী যখন তার জীবনসঙ্গিনী বা সঙ্গী নির্বাচন কচ্ছে, তখন সে পরবর্তী পুরুষের উত্তরাধিকারকে অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবে কিছুটা পরিবর্তন কচ্ছে। যে যুবক যুবতীদের দেহ সুগঠিত, যাদের মানসিক নানা সদ্গুণ আছে, যারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিন্তু যাদের আর্থিক উপার্জন যথেষ্ট নয়, তাদের সন্তান প্রজনন, পালন, সুশিক্ষা ব্যাপারে সাহায্য করে, সমাজও এবিষয়ে কিছু আনুকূল্য করতে পারে। তাহলে এদের সন্তানদের মোটের উপর বংশগতি অনুকূল এবং গৃহপরিবেশও সন্তোষজনক হবে। বুদ্ধিমান্ ও সুস্থ, শান্ত পিতামাতার সন্তানেরা জীবনযাত্রার পথে শ্রেষ্ঠ পাথেয় নিয়ে অগ্রসর হবে। এ জাতীয় সুসন্তানের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধিপায় সে চেষ্টাই করা কর্তব্য—অন্ততঃ এদের সংখ্যা যাতে হ্রাস না পায়, তা করতেই হবে।"[২৮]

বর্তমান যুগের দায়িত্ব রয়েছে ভবিষ্যৎ যুগের কাছে সে দায়িত্ব হচ্ছে উন্নততর মানুষের সম্ভাবনার পথ সুগম করে তোলা। শিক্ষক, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ্, এক কথায় সমস্ত চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই তাই অক্লান্তভাবে চেষ্টা করতে হবে একদিকে পরিবেশকে অধিকতর অনুকূল করে তুলতে আর অন্যদিকে আত্মানুশীলন দ্বারা নিজেকে উন্নততর করে, নিজ আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও শিক্ষার দ্বারা উন্নততর যুব সমাজ সৃষ্টি করতে, যার ফলে আসবে ভবিষ্যতের উৎকৃষ্টতর জনক জননী আর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ বলিষ্ঠ বংশধর।

২৮ Woodworth and Marquis.

সপ্তম অধ্যায়

সহজাত সংস্কার—Instinct

মাছরাঙা ঝুপ্ ক'রে জলে ঝাঁপ দিয়ে মাছ ধরে, অব্যর্থ তার লক্ষ্য।

শামুক ভয় পেলে নিজ খোলের মধ্যে ঢুকে, টুপ করে ডুবে যায়। সজারু ভয় পেলে একসঙ্গে সবগুলি কাঁটা খাড়া করে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে।

ছানা কেড়ে নিলে, মাদী-কুকুর হিংস্রভাবে কামড়ে দেয়, বেড়ালও তাই করে।

পাখী ডিম পাড়বার আগে খড়কুটো সংগ্রহ করে বাসা বাঁধে। ডিম হ'লে তাদের তা দেয়। চোখ না ফোটা পর্যন্ত নানা জায়গা থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে অসহায় বাচ্চাগুলোকে খাওয়ায়। বাচ্চাগুলো বড় হয়। ডানা বেরোয়,—হঠাৎ একদিন মার সঙ্গে সঙ্গে বাসা ছেড়ে ওরা আকাশে ওড়ে, প্রথমে অল্প দূর, ক্রমে দূরত্ব বাড়ে.—তারপর নিজ খুসী মত যেখানে ইচ্ছা উড়ে যায়। আবার হাঁসের বাচ্চা একটু বড় হ'লে মার সঙ্গে সঙ্গে জলে নামে, প্রথমটা কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে,—তারপর স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটে।

মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে মায়ের স্তন থেকে। ইউরোপের নদী-খাল বিলের সমস্ত ঈল্ মাছ দশ বছর বয়স হ'লে ডিম পাড়তে যায় দুস্তর আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে।

এক রকম কাঁকড়া আছে তারা সমুদ্রের অগভীর জলে থাকে। তারা সমুদ্রতীর মাইল দেড়মাইল অতিক্রম করে, নারকেল গাছ বেয়ে ওঠে। তারপর নারকেলের চোখগুলি যেদিকে থাকে, দাঁড়া দিয়ে সেই মুখের ছোবড়াগুলি ছাড়িয়ে ফেলে। সেই চোখগুলির অপেক্ষাকৃত নরম জায়গা দিয়ে দাঁড়া ঢুকিয়ে, ভেতরের জল ও শাঁস খায়।

কতকগুলি অতি সাধারণ ও অ-সাধারণ উদাহরণ দেওয়া হ'ল সহজাত সংস্কার বা Instinctএর।

'ইন্‌স্‌টিংট' কথাটা অনেক সময় বড় শিথিলভাবে ব্যবহার করা হয়,—যেমন আমরা বলি দক্ষ পিয়ানো বাদকের হাতের আঙুলগুলি ঠিক সময়ে ঠিক ঘাটটিই টিপে দেয়, সম্পূর্ণ অজান্তে, ইন্‌স্‌টিংটিভ্‌লী (instinctively)।[১] অথবা একটা

বিলিতি খেলাধুলার কাগজে লিখছে, "কুকুরের স্বাভাবিক সহজাত সংস্কারই হচ্ছে মানুষের সেবা করা—" The natural instinct of dogs is to be of service to men.[২] যথেষ্ট বিচার বিবেচনাহীন অভ্যস্ত কাজকে সহজাত সংস্কার বা instinct বলা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

সহজাত সংস্কার কি, এ নিয়ে এত মতভেদ আছে যে চট করে এর চূড়ান্ত একটা সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া ইন্‌স্‌টিংট বললে একটা অদ্ভুত, অপ্রাকৃত শক্তি এ রকম ধারণা জন্মায়। এই কারণে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী যেমন উডওয়ার্থ, জন্‌সন্‌ ইত্যাদি ইন্‌স্টিংট কথাটা বাদ দিলে—অশিক্ষিত আগ্রহ (Unlearned motives) কথা ব্যবহারের পক্ষপাতী।[৩] তবে যে উদাহরণ-গুলো উপরে দেওয়া হয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে, সহজাত সংস্কারের সাধারণ লক্ষণগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

(১) প্রথমেই দেখা যায়, সহজাত সংস্কার শিক্ষার ফল নয়। মাছরাঙাকে ঝুপ করে মাছ ধরতে, শিশুকে মায়ের বুকে খাদ্য সংগ্রহ করতে, পাখীকে বাসা তৈরী করতে কেউ কি শিখিয়েছে? না। সহজাত সংস্কার হচ্ছে অশিক্ষিত পটুত্ব। "প্রত্যেকটি অশিক্ষিত দৈহিক প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে সহজাত সংস্কার: যা আমরা জন্মেই করতে পারি যেমন, চোখের পাতা খোলা, বন্ধ করা, স্তনপান করা ইত্যাদি।"[৪] সহজাত সংস্কার যে শিক্ষালব্ধ নয় এটা খুব ভাল করে বোঝা যায়, যখন দেখি, কোন কোন প্রাণীর জীবনে এই কাজটি একটিবারই মাত্র সম্পন্ন হয়। কেউ তাদের শেখায় না। যেমন শুঁয়াপোকা নিজের চারদিকে গুটি তৈরী করে নিজে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়। প্রথমবারই বিশেষ ধরনের গুটিটি তারা নির্ভুলভাবে তৈরী করে।

হয়তো বলা যেতে পারে বাচ্চা পাখী উড়তে শেখে, বাচ্চা-হাঁস জলে সাঁতার কাটতে শেখে, মাকে দেখে। কিন্তু এ প্রবৃত্তি ও শক্তি নিশ্চয়ই সহজাত। সাঁতার কাটবার প্রবৃত্তি, আকাশে উড়বার প্রবৃত্তি আর অনুকরণের প্রবৃত্তি নিয়েই চিলের ছানা বা হাঁসের বাচ্চা জন্মেছে, এটা শিক্ষার ফল নয়। এ প্রবৃত্তিটাকে—এই ক্ষমতাকেই বলি সহজাত সংস্কার। এই প্রবৃত্তির থেকে

১ Ross—Educational Psychology, p. 55.
২ H. M. Fox—The personality of Animals P. 114.
৩ Woodworth—Psychology P. 368.
৪ West—Education and Psychology P. 194.
৫ H. M. Fox—The personality of Animals P. 106.

যে ক্রিয়া তাকে বলা যেতে পারে সহজাত ক্রিয়া।"[৬] এ কাজগুলোর সম্পূর্ণরূপ কখনো কখনো অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তির উপর নির্ভর করতে পারে; কিন্তু প্রবৃত্তিগুলি সহজাত।[৭]

(২) এ কথাটা যে সত্য তা আমরা আর একদিকে বিবেচনা করে বুঝতে পারি। প্রত্যেক সহজাত সংস্কারের পিছনেই একটা নির্দিষ্ট দৈহিক গঠন রয়েছে। এই গঠনের ভিন্নতার উপরেই সহজাত সংস্কারগুলির প্রকাশও ভিন্ন হয়। কাকের বাচ্চার গড়ন আর হাঁসের বাচ্চার গড়ন ভিন্ন ভিন্ন, তাই কাকের বাচ্চা বড় হলে আকাশে উড়ে, আর হাঁসের বাচ্চা জলে সাঁতার কাটে। তাদের গঠনের ভিন্নতা জন্মগত।

"এ কথা বিশ্বাস করার সঙ্গত হেতু আছে, যে বিভিন্ন প্রাণীর সহজাত সংস্কারের মূলে আছে তাদের বিভিন্ন শারীরিক গঠন।[৮] প্রত্যেক প্রাণীর গঠনের সঙ্গে তার সহজাত সংস্কারের যোগ আছে। কুকুরে তাড়া করলে বেড়াল ওড়ে না বা ডুব দেয় না, হাঁস তাড়া খেয়ে গাছ বেয়ে ওঠে না বা নখ দিয়ে যুদ্ধ করে না। কচ্ছপ বিপদ থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে না অথবা খরগোশ আত্মরক্ষার জন্যে নিজের চামড়ার মধ্যে লুকিয়ে যায় না। গরুর দাঁত ও পাকস্থলীর গড়ন ঘাস খাবার সহজাত প্রবৃত্তির উপযোগী তেমনি সিংহের শারীরিক গড়ন মাংস খাবার উপযোগী করে তৈরী।"[৯]

(৩) সহজাত সংস্কার শুধু জন্মগত নয়, বংশানুক্রমিকও বটে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে বিড়াল ইঁদুর শিকার করে, মৌমাছি চাক তৈরী করে, তাতে মধু-সঞ্চয় করে।

(৪) বংশানুক্রমের ধারায় একই প্রকার দৈহিক গঠন চলে আসছে বলে এ

৬ Drever—Dictionary of Psychology.

৭ Ross—Educational Psychology P. 56—"there must be certain innate dispositions or engram-conplexes, behind these modes of behaviour ...We might say that an instinct is an innate or inherited mode of behaviour. For example, in a dangerous situation, we instinctively seek safety, and we might therefore talk of the instinct of escape. The chief objection to such a mode of definition is simply that the behaviour does not always take place. It would be better, since we have power of inhibiting the behaviour itself, to define an instict as an impulse toward a certain mode of behaviour.

৮ Kirkpatrick—Fundamentals of child study, P 35

৯ „ „ „ „ P. 34

জাতীয় সমস্ত প্রাণীর সহজাতক্রিয়াগুলিও একই প্রকারের (uniform)। সব হাঁস একই ভাবে সাঁতার কাটে। সব চড়ুই পাখী একই ধরনের বাসা বানায়।

(৫) সহজাত ক্রিয়াগুলি, অধিকাংশ সময়ই অপরিবর্তনীয়। একই অবস্থায় একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যাবে। এক রকমের বোলতা আছে, তারা বাসা বানায় না। তারা মাটির নীচে গর্ত ক'রে, সেখানে বাচ্চা পাড়ে। বাচ্চা পাড়বার আগে বোলতা একটি ফড়িংকে হুল ফুটিয়ে অজ্ঞান ক'রে তার লম্বা শুঁড় (antennae) ধরে টেনে গর্তের ভিতরে আনে। তারপর ফড়িংএর গায়ে ডিম পেড়ে, গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। ডিম থেকে তারা বেরিয়ে ওই ফড়িংএর দেহ থেকে খাদ্য আহরণ করে। এখন এই ফড়িংএর শুঁড়টা কেটে দিলে, কিছুতেই আর বোলতা সেই ফড়িংকে টেনে নিতে পারে না, যদিও এতটুকু বুদ্ধি থাকলে ফড়িংএর পা ধরেই বোলতা তাকে গর্তে টেনে নিতে পারতো। মৌমাছি যে চাক বানায় তার গঠন সর্বদাই একই রকম। এর মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায় না। সে জন্যে বিহেভিয়ারিস্টরা (যারা মন বা মানসিক বৃত্তি বা প্রক্রিয়া অস্বীকার করেন, তারা) সহজাত সংস্কারকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক একটা জটিল প্রক্রিয়া বলেই মনে করেন। যখন কোন প্রাণী একটা জরুরী উত্তেজক (stimulus) অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন বিচার বিবেচনা না করে তার দেহযন্ত্রে তৎক্ষণাৎ কতগুলি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাকে বলে তৎক্ষণাৎ-প্রতিক্রিয়া (Reflex)। যেমন, গরম লোহায় অখেয়ালে হাত লাগলে তৎক্ষণাৎ আমরা হাত সরিয়ে নিই। এখানে কোন বুদ্ধিবিবেচনার স্থান নেই। এটা সহজ এবং সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া। এ রকম একটার পর একটা তৎক্ষণাৎ-প্রতিক্রিয়াকে জাগিয়ে তুলে, যদি একটা শৃংখল তৈরী হয়, তবে তাকে বলে, সহজাত সংস্কার। তাই সহজাত সংস্কারকে তারা বলেন 'তৎক্ষণাৎ-প্রতিক্রিয়া শৃংখল' (a chain of reflexes)। সহজাত সংস্কার হচ্ছে অনেক দাঁতওয়ালা এক চাবি, যেটা টিপলে একটার পর একটা লিভার (lever) খুলে যায়। একটা সম্পূর্ণ অন্ধ ও যান্ত্রিক পদ্ধতি। নান্ (Nunn) বলছেন, "পূর্বে একথা মনে করা হোত যে সহজাত সংস্কার হচ্ছে, একটা জটিল স্নায়ু ও পেশীর যান্ত্রিক সমাবেশ। কোন নির্দিষ্ট একটি উত্তেজকের ধাক্কায় এ যন্ত্র সমাবেশ গঠন দ্বারা নির্দিষ্ট একটার পর একটা ক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এটাই মূলতঃ বিহেভিয়ারিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের মত।[১০]

---

১০ Nunn—Education, p. 171.

লোএব (Loeb) এই মত প্রবর্তন করেন। এ মত আমরা গ্রহণ করি না, এবং পরে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। সহজাত সংস্কার সম্পূর্ণ অন্ধ ও যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া এ কথাটা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৬) সহজাতসংস্কার মূলতঃ বুদ্ধিচালিত নয়। যেখানে বুদ্ধি, সেখানেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, সেখানেই দ্বিধা ও বিলম্ব। কিন্তু জীবনের নিম্নতর স্তরে এই দ্বিধা ও বিলম্বের স্থান নেই। প্রকৃতি তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে জীবদেহে কতগুলি যান্ত্রিক গঠন দিয়েছেন যাতে তার উদ্দেশ্য সহজে এবং অব্যর্থভাবে সিদ্ধ হ'তে পারে। কাজেই অধিকাংশ সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে একটা আশ্চর্য সম্পূর্ণতা ও অব্যর্থতা আছে। "নির্দিষ্টসহজাত সংস্কারগুলি...প্রায় সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে ক্রিয়া করে। এ সব ক্রিয়া চেতনা দ্বারা চালিত নয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া বিনা বাধায় সম্পন্ন হতে থাকে, ততক্ষণ কোন চেতনার উদ্ভব হয় না, হলেও অতি সামান্যই হয়। যেখানে একই জাতীয় ক্রিয়াই বারে বারেই একই উত্তেজকের ফলে সম্পন্ন হয়, সেখানে চেতনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"[১১]

বহু উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে, আর একটিও দিচ্ছি। মুনরো ফক্স এক প্রকার বন্য হাঁসের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। হাঁসের একটি বাচ্চা একা পালিত হয়েছিল। প্রথম যখন তাঁকে একটা নদীতে সাঁতার দেবার জন্যে নাবিয়ে দেওয়া হয়, তখন হঠাৎ একটা কুকুর দেখে সে ভয় পেয়ে যায়। তক্ষুনি সে জলে মাথা ডুবিয়ে দিল, আর ডুব সাঁতার কেটে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। সে জীবনে অন্য হাঁসকেও ডুব দিতে আগে দেখে নি।[১২]

(৭) এই জন্যেই দেখা যায় সহজাত সংস্কারগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের এক আশ্চর্যসমন্বয়। পাখী বাসা বানায়, কাঁকড়া গাছে উঠে নারকেল ছুলে খায়, মৌমাছি চাকে মধুসঞ্চয় করে, এর প্রত্যেকটি ক্রিয়া এমন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়, যে মনে হয় যে কাজগুলি বুদ্ধি বিবেচনা করে, যেখানে যেমনটি দরকার, তেমনি করা হয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রকৃতির এ এক পরম বিস্ময়কর পরীক্ষা। কখনো কখনো এও মনে হতে পারে—প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্যই বুঝি ছিল সহজাত ক্রিয়ার ক্ষিপ্র কার্যকারিতার পথে জীবনকে সম্পূর্ণ চালনা করা। হয়তো এ রাজ্যে হঠাৎ চেতনা বা চিন্তার আকস্মিক আবির্ভাব প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনের প্ল্যান কেমন করে বানচাল করে দিল। কিন্তু সত্যই

১১ Kirkpatric—Fundamentals of Child study. P. 37.

১২ H. Munro Fox—The Personality of animals. P. 105.

কি তাই? চেতনা ও চিন্তাই তো দিয়েছে জীবনের অন্ধ আবেগকে মুক্তি ও দৃষ্টি। আঁরি বের্গসঁ (Henry Bergeson) সত্যই বলেছেন প্রকৃতির মূল আবেগ,—এলান্ ভাইটল (Elan vital) এর উল্লেখযোগ্য শৃংখল-মুক্তি ঘটল যখন সহজাত সংস্কারের অন্ধ জাল ছিন্ন করে, সে অনিশ্চিত পরীক্ষা ও বিবেচনার পথে মোড় নিল।[১৩] এতে দুঃখ করবার কারণ নেই,—আনন্দ করবার কারণ আছে। বাস্তবিক পক্ষে সহজাত ক্রিয়ার গণ্ডী বড় সংকীর্ণ। জীবনের শৈশবে এ সংকীর্ণ গণ্ডীই উপযোগী। কিন্তু জীবন-বিহঙ্গম ডানা মেলে আকাশের অনিশ্চিত বিস্তারের দুঃসাহসিক অভিযান যদি না করতো তবে পৃথিবীর বুকে মানুষেরই আবির্ভাব ঘটতো না। তা ছাড়া যে সংকীর্ণ নির্ভয় গণ্ডীর মধ্যে সহজাত ক্রিয়া অভ্রান্ত অব্যর্থতায় আমাদের বিস্মিত করে সেই সহজাত ক্রিয়ার হাস্যকর অকার্যকরতা ধরা পড়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে। "সহজাত সংস্কার-চালিত কীট পতঙ্গের জীবন তাদের স্বাভাবিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে আশ্চর্যজনকভাবে উপযোগী, কিন্তু ফেবার (Fabre) ঠিকই বলেছেন অস্বাভাবিক জরুরী অবস্থার মুখোমুখি এ সংস্কারগুলির মধ্যে দেখা যায় সীমাহীন মূর্খতা। সহজাত সংস্কারগুলি নিম্নতম জীবনযাত্রার চিন্তাহীন। অভ্যস্ত ক্রিয়ার পক্ষেই উপযোগী।" সহজাত সংস্কারের শোচনীয় ও হাস্যকর ব্যর্থতার উদাহরণ দিচ্ছি। একজাতীয় শুঁয়োপোকার স্বভাব হ'ল তারা দল বেঁধে একটির পেছনে আর একটি চলে লম্বা লাইনে। এই দলবদ্ধতায় তাদের জোর, আর এ ভাবে একেবারে লাগালাগি পিছে পিছে চললে তাদের পথ হারাবার ভয় থাকে না। এখন এ রকম একটা মস্ত দলকে চেষ্টা করে, একটা বৃত্তাকারে সাজিয়ে দেওয়া গেল। তারা চলতে সুরু করল অবিরাম ভাবে ওই একই চক্রে পুরো একটি সপ্তাহ ধরে।[১৪]

(৮) সহজাত সংস্কার যদিও উদ্দেশ্য-চালিত নয়,—তবু সেগুলি জৈব প্রয়োজন মেটাবার মূল উপায়। সহজাত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবের আত্মরক্ষা, আত্মবিস্তৃতি ও বংশরক্ষার প্রধান কাজগুলি সাধিত হয়। বাঘের থাবা, গরুর শিং, সজারুর কাঁটা, কচ্ছপের খোল, এগুলোর ব্যবহার সহজাত। এরা প্রাণীর আত্মরক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। সঞ্চয় ও সংগ্রহের আদিম প্রবৃত্তি এই জীবনের বিস্তৃতির প্রধান উপায়। স্ত্রী-পুরুষের প্রতি স্বভাবজ আকর্ষণ, নীড়

১৩ H. Bergson—Creative Evolution.

১৪ H. Munro Fox—The Personality of Animals

বাঁধবার প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি স্নেহমমতা এই সব সহজাত প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে বংশরক্ষা হয়।

(৯) প্রত্যেকটি সহজাত ক্রিয়াই যথানির্দিষ্ট সময়ে দেখা দেয়। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে তারা লুপ্ত হয়ে যায়। কতগুলি সহজাত সংস্কার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয়,—আমৃত্যু তারা বর্তমান থাকে,—যেমন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। কতগুলি প্রবৃত্তি জীবের কতগুলি বিশেষ অবস্থা বা পরিণতির উপর নির্ভর করে,—যেমন পাকস্থলীর এক বিশেষ অবস্থায় জাগে খাদ্যান্বেষণের প্রবৃত্তি, পাখীর ডানা ভাল করে গজালে, তখন জাগে আকাশে উড়বার সাধ। রক্তে কতগুলি হর্মোন (hormone) মুক্ত হলে পরিণত পশুর মনে জাগে সঙ্গমের প্রবৃত্তি। আবার প্রয়োজন ফুরালে প্রবৃত্তিও লোপ পায়। যেমন স্তন্যপানের প্রবৃত্তি।

(১০) সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে অনুভূতির নিবিড় যোগ আছে।[১৫] যেমন মাদী কুকুরের বাচ্চা ছিনিয়ে নিলে অথবা ক্ষুধার্ত কুকুরের খাদ্য কেড়ে নিলে সে ক্ষেপে কামড়ে দেয়। প্রবৃত্তির সঙ্গে অনুভূতির প্রকৃত সম্বন্ধ কি এ নিয়ে আলাদা আলোচনা পরে আমরা করব।

সহজাত সংস্কার সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর মত-Biological and Psychological Views of Instinct—কোন কোন বিজ্ঞানী সহজাত ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ দেহগত যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ কথা পূর্বেই আমরা দেখেছি। তাঁরা সহজাত সংস্কারকে জৈব প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়, এ পর্যন্ত স্বীকার করতে রাজী আছেন। এ দলে আছেন বিহেভিয়ারিস্টরা। জেম্‌স্‌ ও থ্যাণ্ডিফোর্ড মোটামুটি এই মতেরই পোষক। জেমস্‌ সহজাত ক্রিয়াকে বলেছেন, কতগুলি প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি (a bundle of reactions)। কিন্তু অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী সহজাত সংস্কারকে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখবার পক্ষপাতী। এ দলের মধ্যে ম্যাকডুগ্যাল, স্টাউট্‌, এঞ্জেল এবং শিক্ষাব্রতী নান্‌ ও রস্‌ এর নাম করা যেতে পারে। সহজাতক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক এবং চেতনার সঙ্গে তার সংযোগ রয়েচে, এই তাঁদের মত। নান্‌ বলছেন "সহজাত সংস্কার হচ্ছে জন্মগত কোন

[১৫] Ross—Educational Psychology.—"Any definition of instinct, then, which omits this essential element of 'emotional experiences is bound to be incomplete."

নির্দিষ্ট ক্রিয়ার দিকে ঝোঁক। এ সংস্কার বা ঝোঁক থেকে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তা মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট ছক্ অনুযায়ী ঘটে, আবার কখনও গোড়ার থেকেই ক্রিয়াগুলি নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হতে পারে। যে অবস্থার মধ্যে ক্রিয়াগুলি ঘটে তা দ্বারা সেগুলি প্রভাবান্বিত ও বিকশিত হতে পারে।"[১৬]

সহজাত ক্রিয়া কি অন্ধ—Are Instincts Blind ?—সহজাত ক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। সুতরাং এ ধারণা হওয়া আশ্চর্য নয়, যে তারা অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া (blind mechanical processes)। লোএব্ সহজাত ক্রিয়াকে উদ্ভিদের সূর্যের আলোর প্রতি অন্ধ গতি (tropism) জাতীয় প্রক্রিয়া বলে মনে করেছেন। লতা সূর্যের আলোর দিকেই হেলে। একে ট্রোপিজম্ বলে। এ জাতীয় ব্যাপার আমরা পতঙ্গের মধ্যেও দেখি। লোএব বলছেন, "আলোর রশ্মি যদি কোন পতঙ্গকে এক পাশে আঘাত করে তা হলে, যে পেশীগুলি পতঙ্গের মাথা আলোর দিকে ফেরায়, সেগুলি বিপরীত পাশের পেশীগুলির তুলনায় বেশী সক্রিয় হয়ে উঠে, ফলে পতঙ্গের মাথাটি আলোর দিকে হেলে।" [১৭] অধিকাংশ সহজাত ক্রিয়া জন্মকালেই সম্পূর্ণ এবং অবস্থার পরিবর্তনে তাদের ক্রিয়ার কোন পরিবর্তন হয় না। তৎক্ষণাৎ-প্রতিক্রিয়া ও সহজাতক্রিয়া যে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক তা এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে মাথাকাটা একটা সাপ একটা কাঠিকে যেমন তৎক্ষণাৎ জড়ায়, একটা গন্গনে লাল গরম লোহার ডাণ্ডাকেও তেমনি জড়ায়। কাজেই অনেকে মনে করেন সহজাত সংস্কার সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি-বিবেচনার সংস্পর্শ বিহীন।

কিন্তু বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে এ মত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েচে। অনেক সহজাতক্রিয়া যেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনি আবার এমন সহজাতক্রিয়াও যথেষ্ট আছে, যেগুলি অবস্থার পরিবর্তন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে পরিবর্তিত হয়। জলের উপর পোকামাকড় দেখলে গিলে ফেলা মাছদের সহজাত সংস্কার। মানুষ বঁড়শীতে পোকামাকড় গেঁথে মাছের এই সংস্কারকে কাজে লাগায়,—মাছ ধরে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায় মাছগুলিও "চালাক" হয়ে উঠেছে।[১৮]

---

১৬ Nunn—Education. P. 171.

১৭ J. Loeb—Forced Movements, Tropisms and Animal Conduct.

১৮ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study. P. 43.—"Where the chances are nearly equal as to what forms of reaction to certain stimulli will be favourable, the instinct is plastic, so that the best mode of reaction in the present environment may be developed by imitation and by the individual's own experience. Even quite fixed instincts need to be

বুদ্ধি ও সহজাত সংস্কার—সহজাতক্রিয়া যদি অন্ধ অচেতন প্রক্রিয়া না হয়, তবে তার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ কি? পূর্বে এ কথাই মনে করা হোত, যে সহজাত সংস্কার ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ চালিত হয় বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা, আর পশুরা চালিত হয় সহজাত সংস্কার দ্বারা। কিন্তু বর্তমান কালে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর মতে সংস্কার ও বুদ্ধির মধ্যে সীমা-রেখাটা পাকা নয়। খিদে পেলে খাদ্যসংগ্রহ সহজাত সংস্কার, কিন্তু এই খাদ্যসংগ্রহ প্রাণী নির্বিচারে করে না, তাহাতে গ্রহণ, বর্জন অর্থাৎ বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ আছে। স্টাউট্ বলেন সহজাত ক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্ধ আবেগ বা যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়। এটা সত্য, সহজাত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট সচেতনতা প্রাণীর থাকে না। এ দিক থেকে তাকে কিছুটা অন্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু খুব নিকট ভবিষ্যৎ, অন্ততঃ পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা প্রাণীদের আছে,—তাদের ব্যবহারে এ কথা অনুমান করা যায়। পাখী বাসা গড়তে খড়কুটো সংগ্রহ করে। নিশ্চয়ই এতটা বিবেচনা তার ক্রিয়ার পেছনে নেই,—যে ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় স্থানের ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু খড়কুটা তার কাজের উপযুক্ত মশলা, এ অস্পষ্ট জ্ঞান তার আছে। তারপর সব খড়কুটাই সে গ্রহণ করে না, সে বাছাই করে। অতীত অভিজ্ঞতার ফল সে কিছুটা স্মরণ রাখে এবং সে অনুযায়ী ক্রিয়ার পরিবর্তন করে। দেখা যায় মুরগীর বাচ্চা ডিম ফুটে বেরিয়ে সামনে পোকা মাকড়, ইটের টুক্‌রো সবই নির্বিচারে ঠোঁট দিয়ে ঠোকে (pecking), কিন্তু কতক্ষণ পরেই দেখা যায় সে ইটের টুক্‌রো বা পাথর ঠোকে না। এরকম শুঁয়াপোকা আছে তাদের নাম সিনাবার ক্যাটারপিলার্স (cinnabar caterpillars), এগুলি মুরগীর খাদ্য নয়। প্রথমবার মুরগীর বাচ্চা এই শুঁয়াপোকাকেও ঠোঁট দিয়ে ঠুকে মুখে তোলে,—কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা ফেলে দেয় আর ভবিষ্যতে কখনও এরকম শুঁয়াপোকাতে তারা মুখ দেয় না। ইতর প্রাণীরাও 'শেখে'। অবস্থার পরিবর্তনে সহজাত ক্রিয়ারও অনেক সময় পরিবর্তন হয়। জৈব

---

plastic, so that these may be ready adaptation to changes in environment. In past ages it was universally advantageous for fish to take all worms and grasshoppers dropping into the stream; but when man came on the scene with hooks, the instinct often had bad results. Probably the native instinct to snap at every worm has been destroyed; but the more intelligent fish have the instinct modified by experience, as many fishermen can testify."

প্রয়োজনের তাগিদে এ রকমটা হতে বাধ্য। যে প্রাণী এ রকম পরিবর্তন সাধন করতে পারে না তার ধ্বংস অনিবার্য। বাস্তবিক পক্ষে এ রকম ঘটনা জীব-জগতের ইতিহাসে অনেকবার ঘটেছে, তার সাক্ষ্য ভূগর্ভস্থ স্তরে অধুনা বিলুপ্ত বহু জাতির আবিষ্কারের ফলে আমরা জানতে পেরেছি। কাজেই তারা সম্পূর্ণ সহজাত সংস্কার চালিত এবং সহজাত সংস্কার সম্পূর্ণ বুদ্ধি-বিবেচনার লেশশূন্য এ কথা সত্য বলে মনে হয় না।[১৯]

বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সহজাত সংস্কারকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে, পরিবর্তিত করে—কখনো কখনো তাকে লুপ্ত বা রুদ্ধ করে দেয়। যে সমস্ত প্রাণী শিকার ধরে, যেমন সিংহ তারা তাদের বাচ্চাদের শেখায়। তারা আহত জন্তু বাড়ী নিয়ে আসে এবং এদের উপর বাচ্চারা দাঁত ও নখ ব্যবহার করতে শেখে। সিংহশাবক আরো বড় হলে বাবা মা ওদের শিকার অভিযানে সঙ্গে নিয়ে যায়। তারা তখন অনুকরণ আর অভ্যাসের দ্বারা শেখে।[২০]

মানুষের সহজাত সংস্কার—মানুষও প্রাণী, কাজেই অন্যান্য প্রাণীদের মত তারও জীবনের মূল উৎস হচ্ছে সহজাত সংস্কার। কিন্তু বুদ্ধির পরশপাথরের ছোঁয়া লেগে তাদের এমনি রূপ পরিবর্তন ঘটে যে তাদের আর চেনাই যায় না। মানুষের সহজাত সংস্কারের এই আত্মগোপন ও অলংকরণকেই বলে সভ্যতা। অন্যান্য প্রাণীদের মত মানুষের ক্ষুধা আছে, তার পরিতৃপ্তিও স্বভাবতঃই সে খোঁজে, কিন্তু এই তৃপ্তিকে সে শোভন করেচে, নানা সামাজিক রীতি ও আচারে। মানুষের সঙ্গমেচ্ছা স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে মানুষের বুদ্ধি লজ্জার আবরণ দিয়ে, কাব্যের অলংকার দিয়ে সুন্দর করে। একেই ফ্রএডপন্থীরা বলেন উদ্‌গতি (sublimation)।

সহজাত সংস্কার ও অভ্যাস—বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সহজাতক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করে, তাকে নির্দিষ্ট অভ্যাসে পরিণত করে। লয়েড মর্গান বলেছেন যে সমস্ত মাছ বাইরে থেকে খাওয়ানোতে অভ্যস্ত, তারা পুকুরের কাছে কেউ এলেই ভেসে ওঠে আর খাবার ঠুকরে খেতে তৈরী থাকে।[২১]

উইলিয়ম জেম্‌স্ সহজাতসংস্কারকে অন্ধ বলে মনে করেছেন, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজাতসংস্কারকে সদভ্যাসে পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ উপলক্ষে তিনি সহজাতসংস্কার সম্বন্ধে দুটি বিধি বা নিয়মের উল্লেখ করেছেন,

১৯ Stout—Manual of Psychology. P. 148.

২০ Kirkpatrick—Fundamentals of Child study.

২১ Lloyd Morgan—Habit and Instinct, P. 96.

একটিকে তিনি বলেছেন সহজাত সংস্কারের অনিত্যতা (The law of transitoriness of instincts) যথা, স্তন্যপান প্রবৃত্তি একটা বয়সের পরে আপনিই চলে যায়। আর একটিকে বলেছেন অভ্যাসদ্বারা সহজাত ক্রিয়ার রোধ (The law of inhibition of instincts by habits)। তাঁর মতে সহজাতক্রিয়াকে অভ্যাস দ্বারা রুদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করা যায়।[২২] স্তন্যপান মানব-সন্তানের স্বাভাবিক সহজাত সংস্কার। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা এ সংস্কারকে সংযত বা বৃদ্ধি করা যায়।

সহজাত সংস্কার ও তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া—Instincts and Reflexes—কোন কোন মনোবিজ্ঞানী সহজাতসংস্কারকে অন্ধ এবং জটিল তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া মাত্র বলে মনে করেন। পূর্বেই বলেছি তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে জরুরী অবস্থায় বাহ্য উত্তেজকের ফলে প্রাণীর দেহযন্ত্রের ক্ষিপ্র ও বিবেচনাহীন প্রতিক্রিয়া। নাকে নস্য দিলে তৎক্ষণাৎ হাঁচির উদ্রেক হয়।

যদি সহজাত ক্রিয়া সম্বন্ধে "যে কোন অশিক্ষিত ক্রিয়া"—"any unlearned activity"—এই সংজ্ঞা মেনে নেওয়া যায় তাহ'লে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়াকেও সহজাত বলতে হয়। দুই এর তফাত শুধু জটিলতার পরিমাণে, এবং সহজাত ক্রিয়াকে বলা যায় তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল ("a chain of reflexes")। ওয়াটসন্ সহজাত সংস্কারের অর্থ করছেন, "জন্মগত ও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, যা উপযুক্ত উত্তেজকের আঘাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান।"[২৩] এ মত সকলে গ্রহণ করেন নি। কোন কোন বিজ্ঞানী তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া ও সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদগুলি লক্ষ্য করেছেন।

১। তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া সর্বদা নির্ভর করে বাহ্য উত্তেজক (external stimulus)-এর উপর। সহজাত ক্রিয়ার বেলায় বাহ্য উত্তেজক উপস্থিত থাকতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা আভ্যন্তরিক অস্বস্তিও (an internal uneasiness) বর্তমান থাকে। যদিও এ ক্রিয়াগুলি যথাযথ বাহ্য উত্তেজক থেকেই সুরু হয়, তথাপি এগুলি আভ্যন্তরিক কতগুলি অবস্থা বা উত্তেজকের উপর নির্ভরশীল।[২৪]

২২ Wm. James—Principles of Psychology Vol. II. P. 394.

২৩ Watson—Psychology from the standpoint of a Behaviourist P. 231.

২৪ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study.

২। তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেহযন্ত্রের সামান্য একটা অংশের উত্তেজনার ফল, কিন্তু সহজাত ক্রিয়ার সঙ্গে সমগ্র দেহযন্ত্র, অন্ততঃ তার একটা বৃহৎ অংশের সম্বন্ধ আছে।

৩। তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়াগুলি সরল ও মৌলিক এবং তাদের পরিবর্তন বড় ঘটে না। কিন্তু সহজাত ক্রিয়া জটিল এবং যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তার ক্রিয়াগুলিও অপরিবর্তনীয়,—সব ক্ষেত্রে তা নয়।

৪। তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেহযন্ত্রের একটা সামান্য অংশের মঙ্গলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সহজাত সংস্কারের উপর সমগ্র জীবদেহের মঙ্গল নির্ভর করে। "ধুলি পড়তে থাকলে চোখ বোজা বা হাতের উপর গরম জল পড়লে তৎক্ষণাৎ হাত ঝাঁকুনী দেওয়া, শুধুমাত্র চোখ বা হাতটিকেই রক্ষা করে, কিন্তু খাদ্য গ্রহণে শুধু মুখেরই উপকার নয়, সমস্ত দেহেরই উপকার; তেমনি বিপদ থেকে পলায়ন শুধু পা দুটিকেই রক্ষা করে না, সমস্ত প্রাণীকেই রক্ষা করে।"[২৫]

সহজাত সংস্কার এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির জীবরক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান ও মৌলিক অস্ত্র এবং দুইই সাধারণতঃ জীবনের সরল অবস্থায় অত্যন্ত উপযোগী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সহজাত সংস্কার ও আবেগ—Classification of emotion— জৈবপ্রয়োজন সাধনে সহজাত সংস্কারের উপযোগিতার কথা অনেকবার বলা হয়েছে। সহজাত সংস্কারকে বুদ্ধি বা অনুভূতি বা মনের অন্য প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। প্রাণের ধর্ম হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য,—**adjustment to the environment**। সহজাত ক্রিয়া এই মূল উদ্দেশ্য সাধনের একটি প্রধান উপায় সত্য, কিন্তু একমাত্র উপায় নয়, এবং এই উদ্দেশ্য সাধন অনুভূতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে হ'তে পারে না। ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতে অনুভূতিই সহজাতক্রিয়ার প্রাণ। অনুভূতি ও আবেগই সহজাতক্রিয়ার গতি ও প্রকৃতি নির্দেশ করে দেয়। "সহজাত সংস্কার মনের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শক্তি নয়, এরা হচ্ছে প্রাণীর পক্ষে তার পরিবেশকে বুঝতে পারার সাধারণ ক্ষমতা, যা জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন, আর তার পরিবেশের সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্যে সক্রিয়।"[২৬] মাইকেল ওয়েস্ট বলেছেন, "সহজাত সংস্কার হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলবার

২৫ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study. P. 34.

২৬ Nunn—Education. P 157.

মৌলিক ক্ষমতা।"[২৭] রস্ বলেছেন "ম্যাক্‌ডুগ্যালের যুক্তির বিশেষ কথাটি হচ্ছে তাঁর এ বিষয়ের উপর জোর, যে প্রত্যেক সহজাত ক্রিয়ার অপরিবর্তনীয় মূল কেন্দ্র হচ্ছে বিশেষ একটি আবেগ।"[২৮]

সংস্কারের শ্রেণী বিভাগ—Instinct and Emotion—ম্যাকডুগ্যালের যুক্তি অনুসারে সহজাত সংস্কারগুলি হচ্ছে জীবনের অপরিবর্তনীয় মৌলিক অনুভূতিগুলির অঙ্গাঙ্গিভূত প্রকাশ। এক একটা প্রধান আবেগের সঙ্গে এক একটি সহজাতক্রিয়া তাই অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। তিনি চৌদ্দটি প্রধান আবেগ এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযুক্ত এক একটি সহজাতক্রিয়ার নাম দিয়েছেন। এই আবেগগুলিকে তিনি বলেছেন মৌলিক আবেগ। আবার একাধিক অনুভূতি যেখানে মিশ্রিত হয়েছে সেখানে একাধিক সহজাতক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হবে তাদের প্রকাশ। এই প্রকার মিশ্র অনুভূতিকে তিনি বলেছেন মধ্যম পর্যায়ের আবেগ (secondary emotions)। তিনি সহজাতক্রিয়া ও আবেগের সম্বন্ধসূচক যে পরিচ্ছন্ন তালিকাটি দিয়েছেন তা নীচে দেওয়া হল।

সহজাত সংস্কার Instincts	সংস্কারের সঙ্গে সংযুক্ত আবেগ Emotional qualities accompanying the instinctive activities
Escape—পলায়ন	Fear—ভয়
Combat—যুযুৎসা	Anger—ক্রোধ
Repulsion—ঘৃণা, বিকর্ষণ	Disgust—বিরক্তি
Parental—বাৎসল্য	Tender Emotion—স্নেহমমতা
Appeal—অনুনয়	Distress—দুঃখ
Mating—যৌনতা	Lust—কাম
Curiosity—কৌতূহল	Wonder—বিস্ময়
Submission—বশ্যতা, আনুগত্য	Negative self-feeling—হীনমন্যতা, আত্মাবমাননা
Self-assertion—আত্মপ্রতিষ্ঠা	Positive self-feeling—আত্ম-গৌরব বোধ
Gregarious—যূথ-চরতা	Feeling of loneliness—একাকীত্ব-বোধ

---

২৭ M. West—Education and Psychology, P. 192.

২৮ Ross—Educational Psychology, P. 63.

Food-seeking—খাদ্যান্বেষণ Gusto—ক্ষুধা, আস্বাদন
Acquisition—সঞ্চয় Feeling of ownership—স্বাধিকার বোধ
Construction—নির্মাণ বা গঠন Feeling of creativeness—সৃজনী স্পৃহা
Laughter—হাস্য Amusement—আনন্দ[২৯]

সহজাত সংস্কার হচ্ছে জীবনের মূল উৎস—তাই সহজাতক্রিয়ার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও ইচ্ছা (Cognition, Emotion and Conation) এই তিনেরই চিহ্ন বর্তমান। তাই সহজাত সংস্কারের সংজ্ঞা দিচ্ছেন ম্যাক্‌ডুগ্যাল "সহজাত সংস্কার হচ্ছে প্রাণীর মজ্জাগত গঠন, যার ফলে তার এক শ্রেণীর দ্রব্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সে দ্রব্যের উপস্থিতিতে সে আবেগের উত্তেজনা অনুভব করে এবং তাতে কোন বিশেষ ধরনের কর্মপ্রবৃত্তি জাগে। এর প্রকাশ হয় সে দ্রব্যের প্রতি প্রাণীর ব্যবহারের বিশেষ ধরনে।"[৩০] আবেগ ও সহজাতক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সম্পর্কে ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে অনেক মনোবিজ্ঞানী সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, ড্রেভার (Drever) এ কথা অস্বীকার করেন না। তবে তিনি মনে করেন যে সহজাতক্রিয়ার সঙ্গে আবেগের নিয়ত সম্পর্ক নেই। যেখানে সহজাতক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানেই আবেগ দেখা দেয়। যেখানে যুযুৎসা (combativeness) সেখানে ক্রোধ (Anger) এটা ম্যাক্‌ডুগ্যালের মত। কিন্তু যুযুৎসা থাকলেও ক্রোধ না থাকতে পারে। খাবার কেড়ে নিলে কুকুর রেগে যায়। এখানে সহজাতক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েচে বলে অনুভূতি দেখা দিল। কিন্তু যেখানে কুকুর ক্ষুধার্ত নয়, সেখানে তার সামনে থেকে খাদ্য সরিয়ে নিলে কুকুরের ক্রোধের সঞ্চার হয় না। "যেমন ক্রোধের সঙ্গে যুযুৎসার সম্বন্ধ অনিবার্য নয়, তেমনি ভয়ের সঙ্গে পলায়নের সম্বন্ধও নিত্যনিয়ত নয়—এসম্বন্ধ অনিয়মিত।"[৩১] হেড্ (Head) এবং মায়ার্স (Myers) এর মতে

২৯ McDougall—An outline of Psychology, P. 324.

৩০ McDougall—An outline of Psychology. P. 11. "an innate disposition which determines the organism to perceive (pay attention to) any object of a certain class, and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which finds expression in a specific mode of behaviour in relation to that object."

৩১ Nunn—Education, P. 176.

মনের ক্রমবিকাশের পর্যায়ে সহজাতসংস্কারের আগে আবেগ দেখা দিয়েছে তাই তাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে এ কথা সত্য নয়, যদিও অনেক সময়ই তাদের একত্র দেখা যায়।[৩২] উইলিয়াম জেম্‌স্ সহজাত সংস্কার ও আবেগের প্রভেদ সম্বন্ধে লিখেছেন "আবেগ হচ্ছে বিশেষ ধরনের অনুভব, আর সহজাত-ক্রিয়া হচ্ছে এক ধরনের ক্রিয়া।" আরও বলেছেন "আবেগ সহজাতক্রিয়ার তুলনায় পশ্চাদবর্তী, কারণ আবেগের প্রতিক্রিয়া প্রাণীর নিজ দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সহজাতক্রিয়া আরো দূরপ্রসারী, কারণ তা উত্তেজনার বিষয় যে দ্রব্য, তার সঙ্গে নানা 'কেজো' ভাবে সংযুক্ত।" [৩৩]

সহজাত সংস্কারের সঙ্গে আবেগের নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করে নিলেও ম্যাক্‌ডুগ্যাল যে ভাবে সহজাতক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ করেছেন তা অনেক মনোবিজ্ঞানীর মনঃপূত নয়। কেউ কেউ বলেছেন ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে ম্যাক্‌ডুগ্যালের শ্রেণীবিভাগ অতিমাত্রায় সরল। অনুভূতি ও সহজাত সংস্কারের জটিল মূল জীবনের সর্বপ্রক্রিয়ার মধ্যে এমন সুদূরপ্রসারী যে তাদের এত সহজ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া যে পরিচ্ছন্ন জ্যামিতিক ছক্ কেটে তিনি মৌলিক আবেগ থেকে মধ্যম পর্যায়ের আবেগ এবং তাদের জোড়া দিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের আবেগের তালিকা তৈরী করেছেন, তাতে অনেকে পুরানো ফ্যাকাল্টি মতবাদের গন্ধ পেয়েছেন। ম্যাক্‌ডুগ্যাল প্রথম সাতটি সহজাত সংস্কার ও সাতটি মৌলিক আবেগ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে করেন চৌদ্দ। কিন্তু তাঁর এই "চৌদ্দ দফা দাবীর" বিরুদ্ধে দুদিক্ থেকে অভিযোগ এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, সহজাত সংস্কার বলতে ম্যাক্‌ডুগ্যাল যখন কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া দুইই ধরছেন তখন সহজাত সংস্কারের সংখ্যা অনেক বেশী। উইলিয়াম জেম্‌স্, আমরা পূর্বেই দেখেছি, সহজাতক্রিয়াকে অভ্যাসের দাস বলে মনে করেছেন এবং সহজাত ক্রিয়াগুলোকে বলেছেন কতগুলি সুনির্দিষ্ট অভ্যাস, এবং তাঁর মতে সহজাত ক্রিয়ার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ এবং পরিচ্ছন্নতার আকাঙ্ক্ষাও

৩২ C. S. Myers—An introduction to Experimental Psychology.

৩৩ W. James—Principles of Psychology Vol. II. P. 442. "An emotion is a tendency to feel and an instinct is a tendency to act". আরও বলেছেন,—"Emotions fall short of instincts in that the emotional reaction usually terminates in the subject's own body, whilst the instinctive reaction is apt to go farther and enter into practical relations with the exciting objects."

তিনি বলেন, একটা সহজাত সংস্কার। প্রেয়ারও সহজাত ক্রিয়ার এক লম্বা লিস্ট দিয়েছেন। "প্রেয়ার সহজাত সংস্কারের তালিকায় পাঁচমিশেলী নানা ক্রিয়ার যে ফর্দ দিয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি ক্রিয়াকে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া থেকে পৃথক করা মুশকিল। আবার তিনি এমন ক্রিয়ারও নাম দিয়েছেন সেগুলি মূলতঃ সহজাত হলেও তাদের সম্পূর্ণ প্রকাশের পিছনে বুদ্ধির সহযোগিতা প্রয়োজন।"[৩৪] আবার আর এক বিপরীত দিকে আমরা দেখি ফ্রএড্ একটি মাত্র মূল সংস্কার স্বীকার কচ্ছেন, এবং সে হচ্ছে আদিম কাম (Libido or Sex-instinct)।

আমরা পূর্বেই বলেছি সহজাত সংস্কারগুলোকে কতগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তি বলে আমরা মনে করি না। এরা হচ্ছে জীবনের প্রয়োজন মেটাবার কতগুলি মূল উপায়। তাই এটা বিশ্বাস করা সঙ্গত যে ক্রমবিকাশের সূত্র ধরে সহজাত সংস্কারেরও স্তরবিভাগ আছে। প্রথম প্রাণের বিকাশ দেখা দিয়েছে অত্যন্ত সরল এক কোষবিশিষ্ট প্রাণকেন্দ্র এমিবাতে (amoeba)। তাদের না আছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়াদির বিভাগ, না আছে অনুভূতি বা ক্রিয়ায় বৈচিত্র্য। সেই আদিম প্রাণীর মধ্যে সহজ দুটি ক্রিয়া বা সংস্কার আমরা দেখি, সে হচ্ছে গ্রহণ ও বর্জন। তখন সম্ভবতঃ স্পর্শ ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় ছিল না,—মস্তিষ্কের বিকাশ তখন হয়নি, কাজেই তাতে ছিল না বুদ্ধির দীপ্তি,—ছিল না বিচার বিবেচনা। ছিল কেবল জীবনের আদিম প্রয়োজনে জীবন রক্ষার সহজ প্রবৃত্তি। কিন্তু ক্রমবিকাশের গতিতে জীবদেহযন্ত্র জটিলতর হল। এলো সুখ দুঃখের অনুভূতি, সঙ্গে সঙ্গে মূল সহজাত সংস্কার-গুলিও এই ভাল লাগা মন্দ লাগা অনুভূতির জালে জড়িয়ে জটিল ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করল। ক্রমে এলো দেহযন্ত্রের আরো জটিলতা, হোল মস্তিষ্কের বিকাশ—বুদ্ধির বিকাশ। সহজাত সংস্কারের সংখ্যা ও জটিলতাও তাই বেড়ে গেল। কারণ যেখানে বুদ্ধি, সেখানেই বিচার (choice), সেখানেই ব্যক্তিত্ব, পৃথকত্ব, বিশেষত্ব (Personality, separateness, variety)। কাজেই ম্যাক্‌ডুগ্যালের পরবর্তী যুগে অনেকেই কতকগুলি ধারাবাঁধা সহজাত প্রবৃত্তির ছকে মানুষের জীবনকে ফেলে দেখতে অস্বীকার করেছেন। অলপোর্ট (Allport) বলেন যে, কতগুলি তাড়না (motive) আছে, যাদের বিকাশ বা স্ফুরণের পেছনে হয়ত কতগুলি আদিম জন্মগত

৩৪ Drummond—The Child.

সংস্কার আছে, কিন্তু তাদের থেকে পরবর্তী এই তাড়নাগুলি স্বাধীনভাবে ও নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে, তারা মানুষের চেষ্টার ফলে পরিবর্তনীয়। তাড়না বা আগ্রহগুলি নানা প্রকারের, স্বপ্রধান ও বর্তমান উদ্দেশ্যের পরিপোষক। কিন্তু যদিও অতীত উদ্দেশ্য ও ক্রিয়ার থেকেই এদের জন্ম, তথাপি এদের ক্রিয়াশীলতা অতীতের বন্ধনমুক্ত হতে পারে।"[৩৫] এইচ. এ. মারে (H. A. Murray) এক্‌স্‌প্লোরেসনস্ ইন্ পারসোনালিটি (Explorations in Personality) বইতে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি নানা পরীক্ষার ফলে বলেছেন যে, জন্মগত প্রবৃত্তি বা সংস্কার আমাদের কতটা বা কি আছে, তা বলা শক্ত; কিন্তু কতগুলি মূল চাহিদা আছে, যার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না এবং তিনি সে চাহিদার এক বিরাট তালিকা দিয়েছেন, তা ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর সহজাত সংস্কারের তালিকার চেয়ে ঢের বড়। ডাবলিউ. আই. টমাস্ (W. I. Thomas') একটি রিপোর্টে ('The unadjusted Girl') মানুষের চারটি মূল চাহিদার (fundamental needs) তালিকা দিয়েছেন—

(১) নূতন অভিজ্ঞতা ও বিপজ্জনক কার্যের প্রতি আগ্রহ

(২) নিরাপত্তার জন্য আগ্রহ

(৩) সক্রিয় সহযোগিতার আগ্রহ

(৪) অন্যের দ্বারা নিজমূল্য স্বীকৃতির জন্য আগ্রহ

মাইকেল ওয়েস্টও অনুরূপ কথাই বলেছেন। তাঁর মতে জীবনের মূল প্রয়োজন মেটাবার প্রধান ও আদিম উপায় হিসাবে সহজাত সংস্কারগুলোকে শ্রেণী বিভাগ করা উচিত। তিনি বলেছেন "জীবনের যে যে মূল আগ্রহ মেটায়, সে অনুযায়ী সহজাতসংস্কারগুলিতে শ্রেণী বিভাগ করা কর্তব্য। আমাদের মূল আগ্রহ ও তা মেটাবার উপযোগী সহজাত সংস্কার হচ্ছে—

(১) আত্মরক্ষা	;	ব্যক্তিকেন্দ্রিক সহজাতসংস্কার
(২) নূতনকে জানা	;	মানিয়ে চলবার সংস্কার
(৩) দলভুক্তি	;	সমাজকেন্দ্রিক সংস্কার

সমাজের কৃত্রিম সৌধের স্বাভাবিক ভিত্তি হচ্ছে এই সহজাত সংস্কার ও মৌলিক আগ্রহগুলি।

৩৫ Allport, G. W.—Attitudes, Handbook of Social Psychology. Ed. C. Marchison.

কাজেই সহজাত সংস্কারগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করতে পারি :—

১। ব্যক্তিকেন্দ্রিক
আত্মপ্রতিষ্ঠা
সংগ্রহ
খাদ্য অন্বেষণ
যুযুৎসা
বংশবৃদ্ধি

২। মানিয়ে চলবার সংস্কার :
খেলা
অনুকরণ

৩। সমাজকেন্দ্রিক :
বশ্যতা
অপত্যস্নেহ
যূথচরতা
গঠন ও নির্মাণ
আত্মপ্রকাশ
ধর্ম

সহজাত সংস্কারের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী······কিন্তু মানুষের মূল আগ্রহ হচ্ছে উপরে যে কয়টি উল্লেখ করা গেল ; তারাই জীবনের সমস্ত কর্মের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। তারা হচ্ছে জীবনের প্রশস্ত ও প্রধান কয়েকটি ধারা।[৩৬] মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির বশে কাজ করে, এ কথা না বলে', কতগুলি মূল চাহিদার প্রেরণায় কাজ করে, সেগুলি অপরিবর্তনীয় নয়, এ দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষের উপর সমাজের প্রভাবকে অনেকটাই মেনে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিদ্ পার্সি নান্ (Percy Nunn) ও মনস্তত্ত্ববিদ্ সিরিল বার্ট (Cyril Burt) মানুষের জীবনের মূল চাহিদাকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু এঁদের মতে এই চাহিদাগুলিও জন্মগত, যদিও তাদের পরিবর্তন সম্ভব।[৩৭] পৃথিবীর সন্তান মানুষ, কতকগুলি সংস্কার নিয়ে জন্মায়। হয়ত তাদের ঠিক পরিচ্ছন্ন একটা ছকে ফেলা যায় না, যেমন ম্যাক্‌ডুগ্যাল ফেলেছেন। সভ্যতার অগ্রগতি ও শিক্ষার ফলে ঐ সংস্কারগুলি পরিবর্তন হলেও তাদের প্রভাব মানুষের জীবনে অসীম।

সহজাত সংস্কার ও শিক্ষা—Instinct and Education—পূর্বে 'শিক্ষা' বলতে বোঝা যেত শুধু বুদ্ধির চর্চা। অর্থাৎ মানবমনের এই বৃত্তিটিকে জীবনের অন্য সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাই

৩৬ M. West—Educational Psychology, P. 194.

৩৭ Burt, C.—The Case for Human Instincts, "British Journal of Educational Psychology, 1941, P. 155-72.

ছিল শিক্ষকের কর্তব্য। কিন্তু ধীরে ধীরে এ মতের পরিবর্তন ঘটছে। শিক্ষকরা বুঝতে পেরেছেন মনের বৃত্তিগুলির কতগুলিকে প্রয়োজনীয় আর কতগুলিকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে, বিচ্ছিন্ন কতগুলি বৃত্তির বিকাশ সম্ভব নয়, এবং সম্ভব হলেও বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনের যে মূল উপাদান তাকে উপেক্ষা করে শিক্ষাটা হাওয়ার উপর স্বর্গ তৈরীর মত নিষ্ফল। বিশেষ করে, ক্রমবিকাশবাদ মনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এ বোধ যেদিন থেকে এসেছে সেদিন থেকে 'শুধু' বুদ্ধি তার কৌলিন্য হারিয়েছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নিতান্ত অপাংক্তেয় সহজাত সংস্কার ও অনুভূতি উত্তরোত্তর মর্যাদা লাভ করেছে। ফ্রএডএর যুগান্তকারী আবিষ্কার, যে অবচেতন মনই চেতনমানস ও ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি, শিক্ষার ক্ষেত্রেও মানবমনের আদিম বৃত্তিগুলির দিকে শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অতীতের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার ও অপূর্ণতার একটি প্রধান কারণ শিক্ষার উপায় সম্পর্কে এই ভুল ধারণা। রুশো বলেছিলেন শিক্ষা হতে হবে স্বভাব অনুযায়ী। কাজেই মানুষের স্বভাবের যা মূল ভিত্তি তা শিক্ষারও মূল উপাদান। তাই তো শিক্ষকের জানা চাই মানুষের মধ্যে কি সহজাত সংস্কার আছে—তাদের স্বরূপ কি,—কিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কাজে লাগাতে পারি। "এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শিক্ষাবিদের কাছে মানুষের সহজাত সংস্কারগুলির স্বরূপ জানা একান্ত দরকার, কারণ সমস্ত শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি।" [৩৮]

ব্যবহারের আলোচনায় সহজাত সংস্কার ও আবেগগুলির খুবই গুরুত্ব রয়েছে ; কাজেই শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষার ব্যবহার নির্ধারণে এদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।" চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান হচ্ছে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি, সুতরাং শিক্ষকের প্রতি কাজেই এদের ব্যবহার করতে হয়...কাঠ পালিশ করতে যেমন কাঠের রগের উল্টোদিকে কাজ করা যায় না তেমনি শিক্ষককেও কাজ করতে হয় সহজাত সংস্কারগুলির সহযোগিতায়, বিপরীত পথে নয়—The educator must work with the grain, not against it." [৩৯]

বাল্যকালে মানবশিশু অন্যান্য ইতর পশু প্রাণীর শাবকের চেয়ে অনেক বেশী অসহায়,—কারণ তার ইন্দ্রিয়াদি অপরিণত, তার শক্তি অপরিস্ফুট, তার সহজাত

৩৮ Ross. Educational Psychology, P. 56.

৩৯ Ibid P. 68—69.

সংস্কার অনেক কম বিকশিত। কিন্তু ইতর প্রাণীর শাবকেরা কতকগুলি নির্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ কার্যকরী সহজাত সংস্কার ও শক্তি নিয়ে জন্মায়। প্রকৃতি তাদের হয়ে লড়াই করে। তাদের পরিবেশ অনেক কম জটিল, তাদের কাছে 'সমস্যা' খুব বেশী নেই,—তাদের পরিবেশের উপযুক্ত দৈহিক গঠন ও শক্তি দিয়েই প্রকৃতি তাহাদের পৃথিবীতে পাঠায়। কিন্তু এতে মনে হতে পারে সুবিধাটা বুঝি পশুদেরই। কিন্তু ফলতঃ দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রাণী-শ্রেষ্ঠ। তার কারণ তার শক্তিগুলি অপূর্ণ হলেও অসীম সম্ভাবনা পূর্ণ। তার সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে এবং বিচার বিবেচনা দ্বারা সে নূতন অবস্থার মধ্যে নূতন পথ তৈরী করে নিতে শেখে। "ক্যাঙ্গারু শাবকের মত মানবশিশুর অসহায়তা শুধু অ-পরিণতির ফল নয়! এটা মানবশিশুর আর একটি গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যে গুণটি খুব চমকপ্রদ নয়, কিন্তু তার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর সে গুণটি হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা।"[৪০]

মানব শিশুর সংস্কারগুলি নমনীয় (plastic)। শিক্ষকের কর্তব্য হবে সেই সংস্কারগুলিকে নির্দিষ্ট গতি দেওয়া, সীমাবদ্ধ করা, উন্মেষিত ও উৎসাহিত করা এবং কখনো কখনো, প্রয়োজন বোধে রুদ্ধ করা। শিশুর বিচার বুদ্ধি বিকশিত নয়, সুতরাং শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিচার ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সুফল পাওয়ার আশা করা যায় না। শিশু চুরি করেছে। তাকে নীতিকথার উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা বৃথা। কারণ তার নীতিবোধই তখনো জাগরিত হয় নি। সেখানে তার ভয়ের সংস্কার, লজ্জার সংস্কারের সাহায্যেই তাকে শাসন করে, বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে হবে। শিক্ষককে এটা বুঝতে হবে যে "শিশু কাজ করে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে এবং শিশুর সমস্ত কর্মের পিছনের প্রবলতম বেগ,—বলা যেতে পারে, একমাত্র আগ্রহ-হচ্ছে, এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। শিশুকে দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করতে হলে শিক্ষককে এই প্রবৃত্তি-গুলির দুয়ারেই হাত পাততে হবে। শিশুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নীতি জ্ঞানের দোহাই দেওয়া নিরর্থক কারণ নীতিজ্ঞান শিশুতে তো বিকশিত হয়নি বরং তার প্রবৃত্তি, যেমন ঘৃণা, পলায়ন, আত্মপ্রতিষ্ঠা, বশ্যতা এদের সাহায্য নিতে হবে।"[৪১]

শিশুমনের একটা প্রধান সহজাত সংস্কার হচ্ছে কৌতূহল (curiosity)।

৪০ Ross. Educational Psychology, P. 69.

৪১ Ibid P. 69.

(এ সংস্কার শিক্ষকের একটি প্রধান সহায়।) তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করতে হ'লে প্রথম অবস্থায় এ অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করে তাকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করে দিতে হবে। হয়তো অনেক প্রশ্ন শিশু করবে যা নিরর্থক, যা বিরক্তিকর, যা হয়তো বড়দের কাছে মনে হবে অসভ্যতা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বাভাবিক শিশুর প্রশ্নের মধ্যে জানবার ইচ্ছাই থাকে। সে স্বাভাবিক বৃত্তিকে অন্যায়ভাবে রুদ্ধ করলে শিশুর বাড়ন্ত মনকে পঙ্গুই করে দেওয়া হয়। বাস্তবিক অসঙ্গত, অশ্লীল, অসভ্য প্রশ্ন শিশু করে না—কারণ সে বোধই তার নেই। বড়রাই তাদের অসঙ্গত ইঙ্গিত, এবং অকারণ গোপনতা বা এড়াবার চেষ্টা দিয়ে তাদের মনে অন্যায় কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। কাজেই সুশিক্ষক যিনি, তিনি একদিকে যেমন শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলকে উৎসাহ দেবেন তেমনি তিনি সাবধানে লক্ষ্য করবেন যাতে শিশুর কৌতূহল অনভিপ্রেত বিষয়ে লিপ্ত না হয়। (তা করবার প্রধান উপায় প্রকৃত স্নেহ ও সহানুভূতি এবং শিক্ষকের নিজ চরিত্রের প্রভাব।) কখনো কখনো শিক্ষককে কঠোর হতেও হবে—শিশুকে জানতে দিতে হবে কতগুলি সীমালংঘন লজ্জাকর, শাস্তিযোগ্য, সুতরাং অন্যায়। প্রথমতঃ শিশুর অনুসন্ধিৎসার নির্দিষ্ট একীভূত কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না। তার প্রথম প্রশ্নগুলি যে কোন দ্রব্য, যে কোন ঘটনা সম্বন্ধে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে শিশুর প্রশ্নগুলিকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলা—দ্রব্য ও ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসাকে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা একতার অনুসন্ধানে পরিণত করা। "শিশুর কৌতূহলের এ বিপদ আছে যে তা অলস কৌতূহল মাত্র হবে, কারণ শিশুর ক্রিয়াগুলি এখন ত অনির্দিষ্ট; শিশুর স্বভাব হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারেই নাক গলানো। তার অনুসন্ধিৎসার বিষয়ও বিচিত্র, তাই তাকে উৎসাহিত কর্তে হবে, নির্দিষ্ট বিষয় নিয়মিতভাবে শিখতে, কখনো যদি তাতে আবেগের বাহুল্য থাকে তাতে ক্ষতি নেই। তার শিক্ষার আর একটা দিক হচ্ছে বাস্তব জীবনের সমস্যা নিরূপণে বিভিন্ন ঘটনা ও দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ, এতেও তাকে উৎসাহ দিতে হবে।" [৪২]

শিশুর আর একটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে, গড়ে তোলা (constructiveness)—সে বালু দিয়ে পাহাড় গড়ে, নদী, গুহা বানায়, কাদা দিয়ে পাখী, মানুষ তৈরী করে। রং তুলি বা শ্লেট পেনসিল পেলে সে আঁকে ফুল, মানুষ, ঘোড়া। তার গড়া ঘরবাড়ী, তার আঁকা ছবি আমাদের বয়স্কদের

৪২ Michael West—Education Psychology, P. 223.

কাছে মনে হ'তে পারে উদ্ভট, অসম্ভব, হাস্যকর; কিন্তু শিশুর কাছে সেগুলি ভয়ঙ্করভাবে সত্য, নিখুঁত সুন্দর। শিশুর এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি শিক্ষকের আর একটি প্রধান সহায়। শিশুর এই গঠন প্রবৃত্তিকে শিক্ষক উৎসাহিত ক'রে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করবেন, তাকে সমাজের একজন মূল্যবান কর্মী হিসাবে গড়ে তুলবেন। এখানেও প্রথম অবস্থায় দেখা যাবে শিশু যা সৃষ্টি করছে তা খেয়ালী ও উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু শিক্ষকের লক্ষ্য হবে শিশুর এই বৃত্তিকে কার্যকরী ও উদ্দেশ্যমুখীন করে তোলা, তার গঠনের আবেগকে স্বার্থের ক্ষুদ্রকেন্দ্র থেকে মুক্ত করে সমাজসেবার কাজে লাগানো। নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় তাই হাতের কাজের উপর এত জোর দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ ও মন দুইই বিকশিত ও সুসম হয়ে উঠতে পারে।

(শিশুর আর একটি আনন্দময় সংস্কার খেলা।) শিশু খেলতে ভালবাসে,—খেলা দেখতে ভালবাসে, খেলার কথা শুনতে ভালবাসে। বড়দের চোখে খেলা হচ্ছে কাজের বিপরীত, কাজ ফাঁকি দেওয়া। তাই প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিভাবক ও শিক্ষক শুধুই বলেন "বাঁদর ছেলে, সারাদিন কেবল খেলা আর খেলা, আরে মানুষ হতে চাস্ তো খেলা ছেড়ে পড়, আরো পড়। বৃথা সময় নষ্ট করিস্ নি।" এ মূল্যবান্ উপদেশ যাঁরা দেন, তাঁরা ভুলে যান শিশুর কাছে খেলা 'খেলা' নয়,—এটাই তার সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ, সবচেয়ে দরকারী কাজ, এবং এর মধ্য দিয়ে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কর্মচাঞ্চল্য যেমন সহজ আনন্দে উৎসারিত হয়, তাতে কোন শিক্ষক একে উপেক্ষা করে,' কোন শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুললে তাকে নিতান্ত অন্ধ ও কল্পনাশক্তিবিহীন বলতে হবে। প্রাচীনেরা বড় জোর খেলাকে শিশুর বাহুল্য-শক্তির প্রকাশের পথ বলে মনে করেছেন এবং নিতান্তই যেন অনিচ্ছায়, বড় ভয়ে ভয়ে, বড় সাবধানে 'পড়া' ও 'কাজ' এর ফাঁকে সামান্য কিছু সময় অপচয় করতে রাজী হয়েছেন খেলার জন্যে। শিক্ষার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্যে খেলাকে তাঁরা স্বীকার করেছেন—কারণ নাকি "শুধু কাজ আর কাজ, আর খেলা বারণ, এতে ছেলে ভোঁতা হয়ে যায়"—All work and no play makes jack a dull boy. কিন্তু ইংলণ্ডে প্রায় দুশো বছর আগে রবার্ট ওয়েন (Robert owen) প্রথম এক অদ্ভুত কথা বললেন যে ছোট শিশুদের স্বচ্ছন্দ আনন্দ ও চঞ্চলতা রুদ্ধ করে দিয়ে বই-পত্র নিয়ে ক্লাসে বসিয়ে বই পড়ানো সম্পূর্ণ নিরর্থক। শিশু শিখুক, তার স্বাভাবিক আনন্দের মধ্যে দিয়ে। তারপরে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনয়ন কল্লেন-

মন্তেসরী (Montessori) খেলাকে শিক্ষার কেন্দ্র করে। খেলাটা শিক্ষার পরিপূরক শুধু নয়,—খেলাই হওয়া উচিত শিশুশিক্ষার প্রধান ভিত্তি। খেলার মধ্যে শিশুমনের প্রধান ক'টি সংস্কার এসে মিশেছে,—এতে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠা (self-assertion,) সহযোগিতা (gregariouseness), যদেচ্ছা (pugnacity), বাধ্যতা (self-abasement), অনুকরণ (imitation), গঠন (construction), অঙ্গ-সঞ্চালন (locomotion), প্রশংসা-লাভ ইত্যাদি প্রবৃত্তির বিকাশ। (এ বৃত্তিগুলির সম্যক ও সুসম বিকাশেই তো চরিত্র গঠন। তাই উদারপন্থী আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা খেলার মধ্য দিয়ে শেখা (play-way in education)কেই সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে স্থায়ী শিক্ষা বলে মনে কচ্ছেন।) এ পরীক্ষা কতদূর সার্থক, ভবিষ্যৎ কাল এর চূড়ান্ত বিচার করবে, তবে এ পর্যন্ত যে ফল পাওয়া গেছে তাতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতীদের সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ আছে।

শিশুর অন্য সমস্ত সহজাত সংস্কারকেও শিক্ষার কাজে লাগানো যেতে পারে। বাহুল্যবোধে সে আলোচনা থেকে বিরত হওয়া গেল।

অষ্টম অধ্যায়

বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ

Intelligence and Intelligence Tests.

আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমতী বলে মনে করে থাকি, কিন্তু 'বুদ্ধি' জিনিষটার সংজ্ঞা দিতে বলা হলে আমরা দেখি, কাজটা একেবারেই সোজা নয়। সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন হলেও, বুদ্ধির নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ দেওয়া চলে—

১। উদ্দেশ্যের সাথে উপায়ের সামঞ্জস্যকরণ– Adaptation of means to ends.

২। বস্তুবিবর্জিত সাধারণ চিন্তার ক্ষমতা—The power of abstract general thinking. এ ক্ষমতা উচ্চতর মনন প্রক্রিয়ার যেমন, concept, judgment and reasoningর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

৩। নূতন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে, নূতন সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন—ability to face relatively new situations.

৪। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ (Profit by past experience) ও নূতন শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা। মানসিক দিক থেকে (subjectively) এ লক্ষণগুলি বলা হোল, কিন্তু বুদ্ধির একটা দৈহিক দিকও আছে। মস্তিষ্ক বা মগজকে (central nervous system) আমরা বুদ্ধির ইন্দ্রিয় বলতে পারি এবং সেদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, বুদ্ধি মগজের ব্যাপার—(a function of the central nervous system.) যে ব্যক্তির মগজের মধ্যে বিভিন্ন পথ ও প্রক্রিয়াগুলো সহজে এবং দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়, তাকেই আমরা বলি বুদ্ধিমান্, আর যার মগজের মধ্যে এই সংযোগের কাজটা হয় দেরীতে, অথবা যেখানে সংযোগটা সহজেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাকে আমরা বলি স্থূলবুদ্ধি। আমরা রাগ করে বলি, কিন্তু সত্য কথাই বলি, "ওদের মগজে ঢোকে না।" "যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে স্নায়ুসূত্রগুলির সংযোগ সুসংযত ও বহুক্ষণস্থায়ী সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, তার বুদ্ধির দীপ্তি আছে। কিন্তু যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে স্নায়বিক সংযোগগুলি সহজে হয় না, হলেও দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হয় না, অথবা সংযোগ শীগগিরই নষ্ট হয়ে যায়, সে নিশ্চয়ই নির্বোধ ও ক্ষীণবুদ্ধি।"*

* এই অধ্যায়ের শেষে বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণ বুদ্ধি (g) আর বিশেষ বুদ্ধি (s)—বুদ্ধি এক, না বহু ?

কারো কারো দেখা যায় যন্ত্রপাতির ব্যাপারে মাথা বেশ খোলে, কিন্তু ইতিহাসে সে পায় 'গোল্লা'। আবার কেউ অঙ্কে বেশ ভাল, কিন্তু সাহিত্যে বেজায় কাঁচা। তাহ'লে বুদ্ধি জিনিষটা কি বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি ? নানারকমের বুদ্ধি আছে ?

আবার দেখি যার সাধারণ বুদ্ধি (common sense) যথেষ্ট আছে, সে বিভিন্ন ব্যাপারেও যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। চট্‌পটে চালাক ছেলে দিয়ে সব বিষয়েই কাজ ভালো চলে।

এ নিয়ে দুরকম মত আছে। একটা হচ্ছে স্পীয়ার্‌ম্যান্ (Spearman আর তাঁর অনুগামীদের, আর একটা হচ্ছে থর্ণডাইক (Thorndike)-এর। স্পীয়ারম্যান্ বলতে চান,প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা সাধারণ বুদ্ধি (general intelligence) আছে,—সমস্ত কাজের মধ্য দিয়েই সে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এটার পরিমাণ এক এক ব্যক্তির এক এক রকম (variable), এটাকে তিনি নাম দিয়াছেন "g"। কিন্তু একই ব্যক্তির মধ্যে "g"-টা নির্দিষ্ট (constant)। আবার বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন রকমের বুদ্ধি, তাকে তিনি বলছেন "s"। একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন কাজের বিশেষ বুদ্ধির-"s" (special ability) পরিমাণে প্রভূত তারতম্য থাকতে পারে। বাজনা বাজাতে তার "s" হয়তো যথেষ্ট, কিন্তু অঙ্ক কষতে সেই ব্যক্তিরই "s" নগণ্য হতে পারে। কিন্তু তা হলেও সমস্ত বিশেষ বুদ্ধি "s"-এর মধ্য দিয়ে একই "g" কাজ কচ্ছে। কোন বিশেষ ব্যাপারে ব্যক্তির সাফল্য তার "g" আর "s"-এর সম্মিলিত গুণফলের উপর নির্ভর করে। এই "g" আছে বলেই একই ব্যক্তির বিভিন্ন কাজের মধ্যে মোটামুটি একই বুদ্ধির মানের (positive correlation) ‡ পরিচয় পাওয়া যায়।

থর্ণডাইক কিন্তু বলেন, কোন ব্যক্তির বুদ্ধি কতগুলি বিভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন শক্তির যোগফল মাত্র। তাদের মধ্যে সাধারণ একটা শক্তি কাজ কচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা সাধারণ যোগসূত্র আছে, এটা ঠিক নয়। সাধারণতঃ একই ব্যক্তির বিভিন্ন বুদ্ধির মধ্যে একটা ধনাত্মক নিকট-সম্বন্ধ (positive correlation) দেখা যেতে পারে, কিন্তু দেখা যেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিভিন্ন ক্ষমতা (abilities)-র মধ্যে ঘনিষ্ঠ ধনাত্মক নিকট-সম্বন্ধ (high

‡। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

positive correlation) যেখানে দেখা যায় সেখানে সেই ক্ষমতাগুলির মধ্যে একই ধরনের উপাদান বর্তমান।

আমরা যখন বুদ্ধির পরিমাপ করি, তখন কি মাপি? স্পীয়ারম্যানের উত্তর হবে 'g'। আর থর্ণডাইক বলবেন সেটা হচ্ছে 's' গুলির যোগফল।* স্পীয়ারম্যান্ এই 'g'কে অপরিবর্ত্তনীয় জন্মগত ক্ষমতা মনে করেন। তিনি স্বীকার করেন যে 'g'কে সোজাসুজি মাপবার উপায় নেই—'s' বা বিশেষ ক্ষমতা (special abilities) গুলির মাপের মধ্য দিয়েই অপ্রত্যক্ষভাবে তাদের মাপা যায়। বুদ্ধির স্বরূপ ও পরিমাপ সম্বন্ধে যাঁরা প্রথম দিকে আলোচনা করেছিলেন (যেমন ষ্টার্ণ, বিনে‡ ইত্যাদি) তাঁরা বুদ্ধিকে একক শক্তি (single factor) বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তারপর টারম্যান্, স্পীয়ারম্যান্ নানা ধরণের বুদ্ধির 's' কথা বলেন। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে স্পীয়ারম্যান্ বহু ধরণের বুদ্ধির মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ বুদ্ধি 'g'র পরিচয় মেলে এ কথাও বলেছিলেন। থর্ণডাইক তিনটি বা চারটি প্রধানত বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধি (Multiple factor)র উপর জোর দেন এবং বলেন এই বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলির মধ্যের সংযোগ ও সহযোগিতা মস্তিষ্কে বিভিন্ন স্নায়বিক সম্বন্ধের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। পরে থর্ণডাইক এ মত কিছুটা পরিবর্তন করেন এবং বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একটি সুসংগমতার সম্বন্ধ (integrative relationship) স্বীকার করেন। সুতরাং এমত স্পীয়ার-ম্যানের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী নয়। ট্যারম্যান্ বুদ্ধিমান্ ও বোকা বহু ছেলে-মেয়েকে পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে বুদ্ধির বিশেষলক্ষণ হোল বস্তুনিরপেক্ষ সাধারণ চিন্তার শক্তি—the ability to think abstractly.

কোফকা (Koffka) ইত্যাদি জেষ্টল্ট্ মতবাদীরা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সমন্বয়ের শক্তিকেই বুদ্ধির লক্ষণ বলেছেন। বিভিন্ন শক্তির মধ্য দিয়ে এ সমন্বয়ী ক্ষমতারই প্রকাশ ঘটে। এমতও তাই স্পীয়ারম্যানের মতের বিরোধী নয়।

কিন্তু স্পীয়ারম্যানের মতে সাধারণ বুদ্ধি 'g'কে সোজাসুজি মাপা যায় না। 's' গুলির মধ্য দিয়েই তার সন্ধান মিলবে। এখন বিশেষ শক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি সাধারণ বুদ্ধির সম্যক্ পরিচয় দেয় তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে।

* Spearman যে আংকিক সূত্র দিয়ে তাঁর মতের ব্যাখ্যা করেছেন, তা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে।

‡ বিনের মত পরে পরিবর্তিত হয়। তিনিও থর্ণডাইকের মত বুদ্ধিকে কতগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তির যোগফল বলে মনে করেছিলেন। "Only a bundle of varied and unrelated abilities—a crowd of faculties" R. B. Cattell—Your mind and Mine. P 47.

টমসন বললেন বিভিন্ন শক্তিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বা আলাদা আলাদা কাজ করে না। তারা দল বেঁধে থাকে (group factor theory)। এই দলগুলির প্রত্যেকটির উৎকর্ষ এবং তাদের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই বুদ্ধির পরিমাপ হয়।

নানা প্রকার বুদ্ধির মাপক—Forms of Intelligence tests.

আগেকার দিনের স্থূল এবং হাস্যকর বুদ্ধি পরিমাপের উপায়গুলির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। তারপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুদ্ধি পরিমাপ করবার প্রথম যে চেষ্টাগুলি হয় সেগুলিও সফল হয়নি। চেহারা দেখে (ল্যাভেটর ১৭৭২) বা মাথার গড়ন দেখে (গল্ ১৮১০) বুদ্ধির বিচার, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল ভ্রান্ত। হাতের লেখা, বানান বা চটপট হিসাবে পারদর্শিতা দিয়ে বুদ্ধির বিচার হয় না, কারণ অনেক বাস্তবিক বুদ্ধিমান্ লোকের হাতের লেখা জঘন্য, বানানে আর মৌখিক হিসাবে তাদের বহু ভুল হ'য়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, (sense acuity)—যা মাপা যায় প্রতিক্রিয়ার সময় দিয়ে (উত্তেজকের কত পরে ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা সংবেদন হয়,—যেমন ২৫ ফিট দূরে একটা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালা হোল, এবং ষ্টপওয়াচ টিপে সময়টা নির্ধারণ করা হোল,—আবার অনুভূতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ষ্টপওয়াচ টেপা হল। দেখা গেল এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময় দুই ঘটনার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, সব মানুষের প্রতিক্রিয়ার সময়—reaction time—সমান নয়, সব ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়ার সময়ও সমান নয়) বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্মতার পরীক্ষা, (চোখের সামনে একই রংএর সামান্য পৃথক কয়েকটি কার্ড একসঙ্গে বা একটির পর একটি রাখা হোল বা দেখান হোল এবং তফাতটা অনুভূত হলে তৎক্ষণাৎ বলতে বলা হ'ল, —দেখা গেল সকলের ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা সমান নয়) দিয়েও বুদ্ধির বিশ্বাসযোগ্য মাপ পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞান-সম্মত নির্ভরযোগ্য বুদ্ধির পরীক্ষা (Intelligence Test) প্রথম আবিষ্কার করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিনেঁ (Binet) তাঁর সহকর্মী সিমন্ (Simon)র সাহায্যে, ১৯০৫ সালে। তারপর তাঁরা এ নিয়ে বহু পরীক্ষা চালান। আরো বহু পরিবর্তন করে ১৯১০ সালের কাছাকাছি সিমন্-বিনের আদর্শ মাপ (Simon-Binetএর Standard scale) য়ুরোপের বহু দেশে ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত হ'তে থাকে। ১৯১১ সালে বিনেঁ মারা যান, কিন্তু তিনি বুদ্ধি পরিমাপের যে ধারা প্রবর্তন করে যান তা অনুসরণ করে আরো নানা রকমের

বুদ্ধির পরীক্ষা আবিষ্কৃত হয়। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মাণী এই পরীক্ষা ব্যাপারে য়ুরোপে অগ্রণী। তারপর আমেরিকাতে এ ঢেউ এসে পৌছানর পর, এত নানা রকম পরীক্ষা চলতে থাকে এবং এত রকমারী পরীক্ষা আবিষ্কৃত হয় যে এখন শতাধিক Tests (নানা প্রকারের) প্রচলিত হয়েছে।

বিনেঁ দেখেছিলেন বুদ্ধি ব্যাপারটা এমন নয় যে কারু আছে, আর কারু একেবারেই নেই। অর্থাৎ এটা যাকে বলে 'yes—no' classification তা নয়। বুদ্ধির তারতম্য আছে। আর একটা জিনিষ সবাই জানে, বুদ্ধির সঙ্গে বয়সের একটা সম্বন্ধ আছে। কাজেই "ওই ছেলেটা বুদ্ধিমান্" এ কথাটা খুব স্পষ্ট নয়। বুদ্ধি ব্যাপারটা তুলনামূলক (relative), কাজেই কোন ছেলেকে বুদ্ধিমান্ বললে তখনই এ কথাটা আসবে, "কার তুলনায় বুদ্ধিমান্?" সুতরাং বুদ্ধির একটি মাপকাঠি চাই। যে ছেলেটাকে বুদ্ধিমান্ বলচি, যদি দেখা যায় সেই বয়সের অধিকাংশ ছেলের তুলনায় তার বুদ্ধি বেশী, তা হলেই "ছেলেটি বুদ্ধিমান্" কথার বৈজ্ঞানিক মানে হয়। কিন্তু তার পরেও কথা থাকে সাধারণ সেই বয়সের ছেলেদের তুলনায় তার বুদ্ধি কতটা বেশী। এটা মাপা যাবে কি করে? বিনেঁ আর একটা জিনিষ দেখলেন কেবল একটি মাত্র পরীক্ষা দিয়ে বুদ্ধির তৌল করা চলে না। কাজেই অনেকগুলি পরীক্ষা করে স্কেল্ তৈরী করতে হবে। তিনি প্রথমে এক বয়সের নানা শ্রেণীর ছেলে-মেয়ে নিয়ে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে নির্ধারণ করতে চেষ্টা করলেন এমন একটা মান, যেটা সে বয়সের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের বুদ্ধির মাপ বলে ধরা যেতে পারে। এই রকম করে বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন মান তৈরী করা হোল। তিনি ৩ বছর থেকে ১২ বছরের মান বা standard নির্ধারণ করে বিনেঁ স্কেল তৈরী করলেন। বিনেঁ বুদ্ধির মাপ করলেন মনের পরিণতি (Mental Age) দিয়ে। একটা ছেলের মনের পরিণতি ৯ বৎসর বললে বোঝা গেল, তার বুদ্ধিটা নয় বছরের ছেলের মত, তার বাস্তবিক বয়স যাই হোক্। তিনি মনের পরিণতি বা Mental Age দিয়ে বুদ্ধি মাপবার রীতি প্রচলন করলেন। বিনেঁর মতে নয় বছরের নীচে কোন ছেলের মানসিক পরিণতির বয়স তার প্রকৃত বয়সের চেয়ে দু বৎসর কম হলে, বুঝতে হবে, সে ছেলে বোকা। আর নয় বছরের উপরে, মানসিক পরিণতির বয়স তিন বৎসর কম হলে, তবেই তাকে বোকা বলা যায়। ট্যারম্যান্ বললেন, তা হলে বুদ্ধি মাপতে হলে, মানসিক বুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত বয়সের সম্বন্ধটা একত্র করে প্রকাশ করে দেখানো দরকার। এটাকে বলা হয় আই, কিউ

(I. Q) বা বুদ্ধ্যঙ্ক। বুদ্ধি মাপবার এ আংকিক পদ্ধতি প্রচলন করলেন টারম্যান্। অবশ্য তাঁর আগে এ পদ্ধতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন জার্মান মনোবিজ্ঞানী ষ্টার্ণ (Stern)। ৯ বছরের ছেলেদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট মানের উদাহরণ দেওয়া যাক—"কাঠ ও কয়লার মধ্যে মিল আর প্রভেদ বলতে হবে। এ রকম ৪ জোড়া জিনিষকে তুলনা করে তাদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলতে পারা চাই।" এখন মনে করা যাক, আমরা যে ছেলেকে বুদ্ধিমান্ বলছি তার বয়স হচ্ছে আট। তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে তার বাস্তবিক বয়স ৮ হলেও তার মনের বা বুদ্ধির পরিণতি হচ্ছে ৯ বছরের, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, ৮ বছরের ছেলে হলেও তার বুদ্ধি ৯ বছরের ছেলের মত। এ কথাটাকেই অংকে প্রকাশ করলেন ট্যারমান্, বললেন ছেলের বুদ্ধির পরিমাণ বা বুদ্ধ্যঙ্ক বা Intelligence Quotient (সংক্ষেপে I, Q.) হোল $\frac{৯}{৮}$ অথবা ১.১২। যে ছেলে সাধারণ (Average) তার I. Q. হোত $\frac{৮}{৮}$ = ১.০০। দশমিক বিন্দু বাদ দিলে দাঁড়ায় সাধারণ ছেলের I. Q. = ১০০। আর এই বুদ্ধিমান ছেলেটির I. Q. = ১১২; I. Q. বের করবার পদ্ধতি হচ্ছে মানসিক বয়সকে (Mentel Age) এমনি বয়স (Chronological Age) দিয়ে ভাগ করে, ভগ্নাংশ এড়াবার জন্যে ১০০ দিয়ে গুণ করা

$$I.Q. = \frac{M.A}{C.A.} \times 100.$$

বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধির মাপ—

বিনের বুদ্ধির পরীক্ষাটা হচ্ছে ব্যক্তিগত (Individual)। কাজেই তাতে সময় লাগে যথেষ্ট। এক একটি ব্যক্তির নির্ভরযোগ্য বুদ্ধির মাপ পেতে গেলে অনেকগুলো প্রশ্ন করতে হয়। একটা বড় শ্রেণীর সব ছাত্রদের পরীক্ষা করতে হয়তো বৎসর কেটে যাবে। কাজেই সময় সংক্ষেপের জন্য দল বেঁধে পরীক্ষা (Group tests) উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে থাকে। এ পরীক্ষায় বিশেষ করে সফল হন প্রথম ওটিস (Otis)। তারপর আরও কয়েকটি দলগত পরীক্ষার নাম করা যেতে পারে—যেমন ট্যারমান্‌গ্রুপ টেষ্ট অফ মেণ্টাল এবিলিটি (Terman Group Test of Mental Ability), দি ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স টেষ্ট (The National Intelligence Test), হ্যগারটি ডেল্টা

* আধুনিক বুদ্ধির মাপের বিবরণ Description of a standardised Intelligence Test.

II (Haggerty Delta II) ইত্যাদি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা সৈন্য-বিভাগে বুদ্ধি অনুসারে সৈন্যদের ভাগ করে, সে অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। তার থেকেই আসে আর্মি আলফা টেষ্ট (Army Alpha Test) ও পরে অশিক্ষিত বা বিদেশীদের জন্যে আর্মিবীটা টেষ্ট (Army Beta Test)।

এই দলগত পরীক্ষাগুলোতে নানা বিষয়ে অনেক রকমের প্রশ্ন ও সমস্যা ছোট ছোট বইয়ের আকারে ছাপিয়ে পরীক্ষার্থীর প্রত্যেককে একখানা করে দেওয়া হয়। এই প্রশ্নগুলির সমাধান খুব অল্প কথায়ই লেখা যায় (যেমন হাঁ বা না, অথবা একটা তারিখ বা সংখ্যা) ; আধ ঘণ্টার মধ্যে এ রকম ২০০ প্রশ্নের জবাব লিখতে হয়। এক সঙ্গে বহু ছাত্রের এ রকম পরীক্ষা নেওয়া চলে। এর সুবিধের জন্যে আজকাল অ্যামেরিকার ইস্কুল ইত্যাদিতে এ ধরণের পরীক্ষা নেওয়াটাই সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিনেঁ টেষ্ট বা ওটিস টেষ্টগুলো ভাষাগত বুদ্ধি পরীক্ষা (Tests involving language) কিন্তু ভাষায় যারা পারদর্শী নয়, বা যারা বিদেশী (অর্থাৎ যে ভাষায় পরীক্ষা হচ্ছে তা ভাল জানে না) তাদের বেলায় এ পরীক্ষাগুলো উচিত নয় (unfair)। এমন ছেলে অনেক আছে, যাদের ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয় কিন্তু নানা কাজ-কর্মে তারা যথেষ্ট চতুর, কাজেই যদিও বিনেঁ টেষ্টে তাদের আই, কিউ, হয়তো ১০০র নীচে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তারা সাধারণের চেয়ে কম বুদ্ধিমান্ নয়। কাজেই মনস্তাত্ত্বিকদের, কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধি মাপবার (Performance tests) ব্যবস্থা করতে হ'ল। যেমন, একটা কাঠের বোর্ডে নানা আকারের ও নানা মাপের ছিদ্র করা আছে। ঠিক সেই আকারের ও সেই মাপের কাঠের টুক্‌রোগুলো সেখানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে। আবার হয়তো কতগুলোতে ছবি অসম্পূর্ণ আঁকা হয়েছে, তার অসম্পূর্ণ অংশগুলো এঁকে ছবিগুলোকে পূর্ণ করতে হবে। না হয়তো, একটা বেড়াল আঁকা আছে একটা অনেক বাধাযুক্ত গোলকধাঁধার বাইরে। ঠিক মধ্যস্থলে আঁকা আছে বেড়ালের খাদ্য, ইঁদুর। বেড়াল কোন পথ ধরে গেলে, ইঁদুরকে পৌঁছতে পারবে, পেন্সিল দিয়ে, সে পথটি দেখিয়ে দিতে হবে চটপট। ভুল করলে নম্বর কাটা যাবে। এ পরীক্ষাগুলোর ব্যবহার হয়েছে পিণ্টনার-পেটার্‌সন্ স্কেল অব পারফরমেন্স টেষ্ট্‌স্ (Pintner-Paterson Scale of Performance test) এ বা পোর্টিয়াস্ মেইজ টেষ্ট্‌স্ (Portaus Maze tests) এ।

এগুলোও ব্যক্তিগত বুদ্ধিপরীক্ষা (Individual tests)। দলবেঁধে কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষাও আছে, যেমন ডিট্রয়ট্ ফার্ষ্ট গ্রেড ইন্‌টেলিজেন্স টেষ্ট (Detroit First Grade Intelligene Test), বা পিণ্টনার কানিংহাম্ প্রাইমারী মেণ্টাল টেষ্ট (Pintner Cunningham Primary Mental Tests)।

কোন ছাত্রের বুদ্ধির নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ মাপ পেতে গেলে, নানা রকম ভাষাগত বুদ্ধির পরীক্ষা এবং কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়া উচিত। তা ছাড়া অনেক কাজে যেমন ব্যক্তিগত দক্ষতা দরকার, তেমনি কোন কোন কাজ আবার অনেকে মিলেমিশে একত্র করতে হয়। তার মধ্য দিয়েও বুদ্ধির পরিচয় মেলে। কাজেই আলাদা আলাদা পরীক্ষা এবং দলগত পরীক্ষা মিলিয়ে নিয়ে ব্যক্তির আই. কিউ. স্থির করতে হয়।

বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষায় বা স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের কতটা ব্যুৎপত্তি জন্মেছে তা জানবার জন্যে নানা রকম ব্যবসার পরীক্ষার (Trade test বা Achievment test) ব্যবহার আছে। তবে এ পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্র এত সংকীর্ণ যে তা দিয়ে বুদ্ধির মাপটা খুব নির্ভুল বোঝা যায় না।

একটি আধুনিক বুদ্ধির মাপের বিবরণ—Description of a Standardised Intelligence Test.

বিনে-সিমন্ বুদ্ধি-পরিমাপক স্কেলের সংস্কার হয় ১৯১৬ সালে ষ্ট্যান্‌ফোর্ড রিভিস্তনে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই ষ্ট্যান্‌ফোর্ড রিভিস্তন্‌ই বুদ্ধি পরীক্ষার মোটামুটি সর্ব্বত্র-গ্রাহ্য স্কেল ছিল। কিন্তু বহু বৎসর ব্যবহার ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এর অনেক দোষ-ত্রুটি অপূর্ণতা ধরা পড়েছে। পাঁচ বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কদের বুদ্ধির পরীক্ষার উপায় হিসাবে ষ্ট্যান্‌ফোর্ড রিভিসন্ যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। কিন্তু দশ বছরের উপরের বয়স্কদের পরীক্ষায় ক্রমশঃই এ স্কেল্ অ-নির্ভরযোগ্য। একেবারে ছোট বয়সের বাচ্চাদের বুদ্ধি পরীক্ষার বেলায়ও এ স্কেল সব সময় উপযোগী নয়, কারণ বিনে-সীমন্ স্কেলের মত এ স্কেলও অনেকাংশে ভাষা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল (verbal test)। আর শিশুদের পরীক্ষার বেলায় নানা কাজ করার পরীক্ষা (Performance test) অধিকতর আকর্ষণীয় ও তাদের পক্ষে উপযোগী। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ষ্ট্যান্‌ফোর্ড রিভিস্তন্ স্কেলের দ্বারা যে ফল পাওয়া যাচ্ছিল তা সম্পূর্ণ সত্য ছিল না (low validity), এ পরীক্ষায়

নম্বর দেওয়া ব্যাপারটাও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ গোলমেলে ছিল (difficulty of scoring)। এ সব কারণে টারম্যান্ ষ্ট্যান্‌ফোর্ড রিভিস্তনকে আবার নূতন ক'রে সংস্কারের কাজে হাত দেন। দশ বৎসর পরিশ্রম ও বহু পরীক্ষার পর ১৯৩৭ সালে নূতন সংস্কৃত স্কেল্ প্রকাশ করেন। এ কাজে তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন ডাঃ মেরিল। বর্ত্তমান সময়ে এই নতুন স্কেলই আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।* এ স্কেল্ দুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত। একটিকে বলা হয় এল্ ফর্ম (L. form), আর একটিকে বলা হয় এম্ ফর্ম (M. form)। দুইটি অংশের পরীক্ষার বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও একই বয়সের পক্ষে তারা সমান কঠিন বা সমান সহজ। এ দুটি ফর্মই প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় ব্যবহার্য এবং দুটিতেই বুদ্ধির মাপে একই ফল পাওয়া উচিত। এল্ ফর্ম বিনে'র মূল স্কেলের ভিত্তিতে গড়া; এম্ ফর্মএ হাতের কাজের পরীক্ষা বেশী। এ নতুন স্কেলে পরীক্ষার বিষয় আগের স্কেলের তুলনায় অনেক বেশী। বিনে'র প্রথম স্কেলে পরীক্ষার বিষয় ছিল ৫৪। ষ্ট্যান্‌ফোর্ড রিভিস্তনে তা বেড়ে হয় ৯০, আর এই নবতম সংস্কারে পরীক্ষার বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৯টিতে। এ নতুন রিভিস্তনে প্রাপ্তবয়স্কদের পরীক্ষার স্কেল নতুন করে তৈরী করা হয়েছে এবং যারা পিছিয়ে পড়ে, আব যাঁরা অসামান্য বুদ্ধি বা প্রতিভার অধিকারী এ দুই শ্রেণীর অ-সাধারণ ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এ স্কেলের বিভিন্ন বয়সের বুদ্ধি পরীক্ষার প্রশ্নমালার (এল্ ও এম্ দুই ফর্মেরই) কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া যাচ্ছে—

৩ বৎসর বয়সের পরীক্ষা (এল্ ফর্ম)

১। সুতো পরানো

উপকরণ : একটি বাক্সে এক রঙের ৪৮টি পুঁতি বা মাঝখানে ফুটো কাঠের টুকরো, ১৬টি গোল, ১৬টি চৌকা, আর ১৬টি লম্বাগোল, আর এক জোড়া ১৮ ইঞ্চি লম্বা জুতো বাঁধবার ফিতে।

* বার্ট (Burt), ক্যাটেল্ (Cattell), কেন্ট (Kent) ও স্পীয়ারম্যান (Spearman) অবশ্য এ পরীক্ষা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের প্রধান আপত্তি হচ্ছে এ পরীক্ষায় সাধারণ বুদ্ধির মাপের (general intelligence) থেকে বরং গ্রুপ ফ্যাক্টরের (group-factors) মাপ হয়। বার্ট এর অধীনে একটি কমিটি 'এল' ফর্মের একটি নূতন সংস্কার (revision) করেছেন।

ব্যবহার: পরীক্ষক একটি জুতোর ফিতে নিয়ে, প্রত্যেক আকারের একটি পুঁতি ফিতেতে একটার পর একটা গাঁথবেন এবং বলবেন "এসো আমরা এই খেলাটা খেলি, দেখো।" শিশুকে আর একটি ফিতে দেবেন এবং তাকে পুঁতিগুলি গাঁথতে উৎসাহ দেবেন। শিশু যদি কোন এক বিশেষ আকারের পুঁতি বাছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পরীক্ষক তাকে বলবেন, যে-কোন আকারের পুঁতি হলেই চলবে। সময় দু মিনিট।

নম্বর দেওয়া: ৪টি পুঁতি গাঁথতে হবে। প্রত্যেক গাঁথা পুতির জন্য এক নম্বর।

২। ছবি দেখে দ্রব্যের নাম-করণ।

উপকরণ: সাধারণ পরিচিত দ্রব্যের ১৮টি ছবির কার্ড। প্রত্যেকটি কার্ড ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া।

ব্যবহার: পরীক্ষক প্রত্যেকটি ছবি আলাদা আলাদা করে শিশুকে দেখাবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, "এটা কি? এটার নাম কি?"

নম্বর দেওয়া: + ১২ নম্বর।

৩। কাঠের টুকরো দিয়ে গঠন—পুল তৈরী।

উপকরণ: ১২টি ১ ইঞ্চি চৌকা টুকরো।

ব্যবহার: পরীক্ষক শিশুর সামনে এলোমেলো ভাবে টুকরোগুলি ছড়িয়ে দেবেন। তারপর শিশুর নাগালের বাইরে তিনটি কাঠের টুকরো দিয়ে পুল তৈরী করে দেখাবেন আর বলবেন, "দেখো তো, এ রকম তৈরী করতে পারো কিনা"। একটা জায়গা দেখিয়ে বলবেন, "ঠিক এইখানে তৈরী করো।" পরীক্ষকের তৈরী পুল শিশুর সামনে থাকবে। প্রয়োজন হ'লে পরীক্ষক একাধিকবার তৈরী করে দেখাবেন।

নম্বর দেওয়া: শিশুর তৈরী পুল নড়বড়ে হলেও নম্বর পাবে। না পড়ে গেলেই হবে। নীচের দুটি কাঠের টুকরো লাগালাগি থাকলে চলবে না। দুটি টুকরোর মাঝখানে ফাঁক থাকবে, আর দুটি টুকরোর উপরে ভর করে আর একটি থাকবে। যদি পুল তৈরী করার পর আরো উঁচু করে টুকরোগুলি সাজায় তা হলেও নম্বর পাবে।

পরীক্ষকের আদেশের পর পুলটি তৈরী করবে। পরীক্ষার মধ্যে অন্য সময় যদি নিজে নিজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পুল গড়ে, তা হলে নম্বর পাবে না।

৪। ছবির স্মৃতি

উপকরণ: জানোয়ারের ছবি আঁকা চারটি কার্ড।

ব্যবহার: প্রথম ছবি দেখিয়ে "এটি কি? হাঁ এটি গরু।" শিশু নাম না জানলে বা ঠিক বলতে না পারলে পরীক্ষক ঠিক নামটি বলে দেবেন। এবার ছবিটি সরিয়ে নিয়ে, অন্য ছবি দেখাবার আগে বলবেন, "এবার আমরা গরুর ছবিটি খুঁজে বের করব।" সব ছবিগুলি একসঙ্গে শিশুর সামনে ধরে প্রশ্ন করবেন পরীক্ষক, "গরুর ছবি কোনটি? প্রয়োজন হলে বলবেন "আমাকে ছবিটি দেখাও বা ছবিটির উপর তোমার আঙ্গুল রাখ।"

এ রকম করে দ্বিতীয় ছবি দেখিয়ে জন্তুর নাম জিজ্ঞাসা করবেন। শিশু না জানলে নাম বলে দেবেন। ছবিটি সরিয়ে অন্য ছবি দেখাবার আগে বলবেন, "আমরা গরু ও ঘোড়া খুঁজে বের করব।" অন্য ছবিগুলি একসঙ্গে শিশুর সামনে ধরে প্রশ্ন করবেন পরীক্ষক "গরুর ছবি কোনটি? ঘোড়ার ছবি কোনটি?"

নম্বর দেওয়া: +১, শিশুর ঠিক ঠিক ছবিটি দেখানো চাই। যেটা দেখাতে বলা হোল তা ছাড়া অন্য জিনিষ দেখালে নম্বর — (বিয়োগ) হবে।

৫। একটি বৃত্ত দেখে অংকন করা

উপকরণ: একটি ছোট কপি বইয়ে বৃত্ত ছাপা আছে।

ব্যবহার: শিশুকে একটি পেন্সিল দেবেন, তারপর বৃত্তটি দেখিয়ে বলবেন, "ঠিক এ রকম আর একটি আঁক। ঠিক এই জায়গাটায় আঁক" তিন বার তাকে চেষ্টা করতে দিন। তিন বারই স্পষ্ট করে আদেশ দিন "ঠিক এ রকম আর একটি আঁক। ঠিক এ জায়গাটায়।" শিশুকে বৃত্তটির দাগে দাগে আঁকতে দেবেন না।

নম্বর দেওয়া: + ১ নম্বর।

৬। তিনটি সংখ্যা পুনরুক্তি করা

ব্যবহার: পরীক্ষক বলবেন "শোন, বল, ৪-২। "এবার বল, ৬-৭-১"। ইত্যাদি।

(ক) ৬-৪-১, (খ) ৩-৫-২, (গ) ৮-৩-৭

পরীক্ষক প্রত্যেকটি সংখ্যা সমান জোর দিয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন, প্রত্যেক সেকেণ্ডে একটি করে।

নম্বর দেওয়া: +১। একবার পড়ার পর সব কয়টি সংখ্যা নির্ভুলভাবে শুনে শুনে উচ্চারণ করা চাই।

অথবা

কাঠের মধ্যে করা, তিনটি ফুটো আকারের কাঠের টুকরো জায়গামত বসাতে হবে।

উপকরণ: ফুটো করা বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো বসানো কাঠের বোর্ড (Form board)

ব্যবহার: ত্রিকোণাকার বোর্ডটির ভূমির দিকটি শিশুর দিকে দিয়ে একটি একটি করে টুকরো বোর্ড থেকে খুলে আনবেন। শিশু পরীক্ষকের কাজ লক্ষ্য করবে। এবার কাঠের টুকরোগুলি ত্রিভুজাকার বোর্ডটির পাশে পাশে সাজিয়ে বোর্ডটি ঘুরিয়ে ত্রিভুজাকার বোর্ডটির শীর্ষ শিশুর দিকে ঘুরিয়ে পরীক্ষক বলবেন, 'এবার কাঠের টুকরাগুলি বোর্ডের ফুটোর মধ্যে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখো।" সময়ের নির্দিষ্ট সীমা নেই। দুবার পরীক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়বারেও প্রথম বারের মতই আদেশ দিতে হবে।

নম্বর দেওয়া: +২। তিনটি কাঠের টুকরোই যথাস্থানে বসাতে হবে।

৩বৎসর বয়সের পরীক্ষা (এম ফর্ম)

১। কাঠের টুকরো দিয়ে গঠন: পুল তৈরী, এল ফর্মের মতই।

২। ছবি দেখে দ্রব্যের নামকরণ: এল ফর্মের মত, তবে এখানে ছবির কার্ডের সংখ্যা ১৭টি। এবং নম্বর +১০।

৩। ব্যবহারের দ্বারা দ্রব্য চেনা:

উপকরণ: একটা কার্ডে ছোট ছোট সংসারে নিত্যব্যবহৃত দ্রব্য যেমন, ষ্টোভ, বিছানা, পাইপ, চেয়ার, ধূলো ফেলবার পাত্র, কাঁচি ইত্যাদি।

ব্যবহার: শিশুকে কার্ডে আটকানো ছটি ছোট ছোট দ্রব্য দেখিয়ে পরীক্ষক বলবেন, "আমাকে দেখাও কোনটি—" অথবা "এর মধ্যে কোনটি—?"

(ক)—যাতে আমরা রাঁধি।

(খ)—যাতে আমবা ঘুমাই।

(গ)—যা দিয়ে ধূমপান করে।

(ঘ)—যাতে আমরা বসি।

(ঙ)—যাতে আমরা ধূলো ঝেড়ে ফেলি।

(চ)—যা দিয়ে আমরা কাটি।

নম্বর দেওয়া: +৫। শিশুর ঠিক ঠিক জিনিষটি আঙ্গুল দিয়ে দেখানো

চাই। নম্বর বিয়োগ (−) হবে যদি ভুল জিনিষটিকে দেখায়, নাম ঠিক ঠিক বলতে পারলেও।

৪। খাড়াখাড়ি একটি রেখা অঙ্কন

ব্যবহার : পরীক্ষক শিশুকে পেন্সিল কাগজ দেবেন। তার কাগজে একটি খাড়াখাড়ি রেখা এঁকে বলবেন, "এ রকম একটি আঁকো, এইখানটায় আঁকো।" একবার শুধু এঁকে দেখাবেন পরীক্ষাও একবার মাত্র।

নম্বর দেওয়া : মোটামুটি একটি মাত্র খাড়া রেখা হওয়া চাই। হিজিবিজি অনেকগুলি রেখা হলে নম্বর বিয়োগ হবে।

৫। দ্রব্যের নাম বলা :

উপকরণ : জুতো, ঘড়ি, টেলিফোন, নিশান, ছুরি, ষ্টোভ।

ব্যবহার : একটি একটি করে দ্রব্য শিশুর সামনে ধরবেন, শিশুকে প্রত্যেক দ্রব্যের নাম বলতে বলবেন। জিজ্ঞাসা করবেন "এটি কি ? এটির মানে কি ?"

এভাবে একটির পর একটি জিনিষ শিশুর সামনে ধরতে হবে (ক) জুতা (খ) ঘড়ি (গ) টেলিফোন (ঘ) নিশান (ঙ) ছুরি (চ) ষ্টোভ।

নম্বর দেওয়া : +৫।

৬। তিনটি সংখ্যা পুনরুক্তি—এল্ ফর্মের মতই, তবে সংখ্যাগুলি বিভিন্ন যথা, (ক) ৭-৪-৯ (খ) ৯-৬-১ (গ) ২-৫-৩

অথবা

কাঠের মধ্যে ফুটো করা, তিনটি আকারের কাঠের টুকরো জায়গামত বসাতে হবে (এল্ ফর্মের মতই)।*

প্রাপ্ত বয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষা—প্রাপ্ত বয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষায় সাধারণতঃ এ কয়টি বিষয় থাকে। (প্রধানতঃ রেক্স নাইট্ এর ইন্‌টেলিজেন্স অ্যাণ্ড ইন্‌টেলিজেন্স টেষ্ট থেকে সংগৃহীত)।

(১) বিমূর্ত্ত শব্দের অর্থবোধ (Abstract words)—যেমন সততা, মিষ্টত্ব, ভগবদ্ভক্তি ইত্যাদি এ সব শব্দ দিয়ে কি বোঝায় তা প্রকাশ করতে বলা হয়।

(২) সমস্যার-সমাধান—যেমন,

(i) তিনজন শ্রমিক যদি এক মিনিটে সাতাশটি বাক্স তৈরী করতে পারে, তাহলে পাঁচজন শ্রমিক সাত মিনিটে কয়টি করতে পারবে ? (ii) একজন ব্যক্তিকে একটি পাঁচ সের জল ধরে এমন ও আর একটি তিন সের জল

*Terman & Merrill—Meaesuring Intelligence বই থেকে

ধরে এরূপ মাপের দুটি পাত্র দিয়ে বলা হল, চ'সের দুধ আনতে,—সে কি ভাবে ঠিক মাপ করে আনবে ?

(৩) শ্রেণীবিভাগ (Classification)—কতগুলো শব্দ দেওয়া থাকবে, যারা একই বিশেষ দলভুক্ত ; শুধু এমন একটি শব্দ থাকবে, যা ঐ দলের নয়। সেটিকে বের করতে হবে। যেমন, সেতার, বীণা, এস্রাজ, চেয়ার, বেহালা।

(৪) বিপরীত উপমা (Opposite analogies)—তিনটি শব্দ দেওয়া থাকবে, প্রথম দুটির মধ্যে একটি সম্বন্ধ থাকবে, তৃতীয় শব্দটির সঙ্গে ঠিক ঐ প্রকার সম্বন্ধ বিদ্যমান, এমন চতুর্থ শব্দটি খুঁজে বার করতে হবে। যেমন রোদ উঠলে ভেজা জিনিষ শুকোয়, বৃষ্টি নামলে—(মেঘ হয়, জল পড়ে, শুকনো জিনিষ ভেজে, নদী হয়, ব্যাঙ ডাকে।)

(৩) সাধারণ জ্ঞান :—বড়দের বুদ্ধি বাড়বার সীমা পার হয়ে গেলে বুদ্ধি বাড়ে না (Longitudinally), কিন্তু জ্ঞানের পরিধি বাড়ে (Horizontal growth)। সাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক প্রশ্নের নমুনা—

(১) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন ?
(২) পাকিস্তানের স্রষ্টা কে ?
(৩) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদ কোথায় ?
(৪) হেলেন কেলার কে ?
(৫) কেন লোকেরা কর দেবে ?

(৪) শূন্যস্থান পূরণ ও বাক্য রচনা

একটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে পূর্ণ করা, যেমন (১) মানুষই বোধ হয় একমাত্র প্রাণী যার চিন্তা করার ——— আছে। (২) জাহাজ ডুবির পর (i)——— যখন (ii)——— দেখল, তখন তার (iii)——— বোধ করল, কারণ (iv) ——— আসার সম্ভাবনা ছিল।

(i) পুলিশের দল, ভ্রমণকারিগণ, নাবিকরা, সামুদ্রিক পাখী।
(ii) আগুন, খাবার, বৃষ্টি, পার।
(iii) রাগ, স্বস্তি, আনন্দ, আগ্রহ।
(iv) ঝড়, মাছ, বন্দর, ডাকাত।

(৫) সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার কৌশল (Codes)—উদাহরণ,

সাংকেতিক ভাষা—DPNF UP DBMDVUUB

আসল অর্থ—COME TO CALCUTTA

এখানে বর্ণমালা অনুযায়ী প্রতিটি অক্ষরের পরের অক্ষরটি ব্যবহার করাই হল সংকেত।

(৬) বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ বার করা। (Number Series)—যেমন,

1	3	4	—	6	8
3	9	12	21	18	—

এই সংখ্যারাশির উপরে ও নীচের সংখ্যাগুলির মধ্যে একটি সম্বন্ধ বর্তমান। সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী শূন্য স্থানগুলিতে সংখ্যা বসাতে হবে।

(৭) মৌলিক প্রভেদ বোধ (Essential differences)—যেমন, বীজ ও ডিম, ভস্মীভূত ও দ্রবীভূত, ইত্যাদি।

(৮) দিক নির্ণয়—যেমন (১) মনে কর, তুমি উত্তর দিকে যাচ্ছ, তারপর প্রথমে ডানদিকে ঘুরলে, তারপর আবার ডানদিকে, তারপর বাঁয়ে ঘুরলে। এখন তুমি কোনদিকে যাচ্ছে ?

(৯) প্রবাদবাক্যের অর্থবোধ—যথা গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না' কেন ?

পরীক্ষাগুলির বিশুদ্ধমান নির্ণয় (Standardization of Tests)— বুদ্ধি বিচারের প্রয়োজন এবং নানা রকম বুদ্ধি বিচারের কথা বলা হ'ল। কিন্তু যে মাপকাঠি দিয়ে বুদ্ধি মাপা হবে—সেটা নির্ভুল হওয়া চাই। তা না হ'লে সমস্ত বিচারটাই ব্যর্থ হবে। কাজেই বিভিন্ন টেস্টগুলোরও পুনঃ পুনঃ ও সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে মাপকাঠিতে কোন গোলযোগ নেই। কোন মাপকাঠি গৃহীত হওয়ার আগে নীচের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। **সত্যতা-Validity**—অর্থাৎ মাপকাঠি যার মাপকাঠি বলে পরিচিত সেই জিনিষই সত্যি মাপছে কিনা সেটা দেখতে হবে। যেটা বুদ্ধির মাপকাঠি বলে দাবী কচ্ছে সেটা সত্যই বুদ্ধিই মাপছে এটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। পরীক্ষার সত্যতা দিয়ে বোঝায়, যে জিনিষটি সেই পরীক্ষা পরিমাপ করতে চাচ্ছে, তা সত্যি সে পরীক্ষায় মাপা হচ্ছে। যদি পরীক্ষাটা হয় বুদ্ধির, তবে দেখতে হবে তা' বুদ্ধিকেই সত্যি মাপছে। বুদ্ধির যে প্রশ্ন করা হবে বা যে কাজ দেওয়া হবে তাতে বুদ্ধিরই পরীক্ষা হচ্ছে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এক মত হওয়া চাই। একটা বুদ্ধির পরীক্ষায় ছাত্রের বুদ্ধির ভবিষ্যৎ

পরিণতি সম্বন্ধে যদি বিচার থাকে, তবে সে পরীক্ষা সত্য বলে গৃহীত হবে, যদি দেখা যায় ভবিষ্যতে সত্যিই ছাত্রটির বুদ্ধির সেই রকম পরিণতিই ঘটেছে।

২। **নির্ভরযোগ্যতা—Reliability**—মাপকাঠির মাপটা নির্ভুল হওয়া চাই। যে মাপটা নির্ভুল তার উপরই আমরা নির্ভর করতে পারি। নিম্নলিখিতভাবে পরীক্ষার নির্ভুলতা বিচার করা হয়। "একই পরীক্ষা অল্পদিন বাদে বাদে অন্ততঃ দুবার, একই ছাত্রের ওপর ব্যবহার করে, বিচারের ফল যদি একই রকম হয় (high co-efficient of correlation) তবে পরীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। অথবা একই পরীক্ষার দুটি অংশ, যেমন টারম্যান-মেরিল্ সংশোধিত টেস্টের এল (L) আর এম (M) ফর্ম একই দল ছাত্রের উপর ব্যবহার করে যদি একই রকম ফল হয়, তবে পরীক্ষাটি ভাল। যদি দুই পরীক্ষার ফলের মিলের পরিমাণ (co-efficient of correlation) ০.৯০র নীচে হয় তবে পরীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত।" গ্যারেট ও টমসনও এইভাবে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের কথা বলেছেন। স্পীয়ারম্যান্ খুঁটিনাটি বহু হিসাব-সম্বলিত অন্য পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন।

৩। **বস্তুনিষ্ঠা বা নৈর্ব্যক্তিকতা—Objectivity**—ব্যক্তিগত মতামত বা সংস্কার যাতে মাপকাঠিকে বিকৃত না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। "বস্তুনিষ্ঠা বলতে আমরা বুঝি পরীক্ষাটি যে পরিমাণে ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা অ-প্রভাবান্বিত।" অ্যামেরিকার বুদ্ধির পরীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায় নিগ্রোদের গড় বুদ্ধির পরিমাণ (Average Intelligence Quotient) শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কম। পরীক্ষকদের জাতীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধি যদি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হয় নি।

৪। **ব্যবহারে সহজতা—Ease of administration and scoring**—টেস্ট এমন হওয়া চাই যাতে এটা পরীক্ষার কাজে সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে। নম্বর দেওয়ার ব্যাপারটা খুব বেশী গোলমেলে হ'লে সেটা পরীক্ষার ত্রুটি বলেই বিবেচিত হবে।

৫। **শ্রেণী বিভাগের উপযুক্ততা—Satisfactoriness of the norms**—যে শ্রেণীর বা বয়সের বা দলের মাপ হিসাবে টেস্টটা ব্যবহার করা হবে—ঠিক ঠিক তার উপযোগী হওয়া চাই। যেমন, ধরা যাক্ সাত বছরের ছেলেদের উপযুক্ত একটা টেস্ট (to determine the Mental Age of 7 yrs. old children) তৈরী করতে হবে।

যদি দেখা গেল শতকরা ৭০ জনই সে পরীক্ষায় ফেল কচ্ছে বা শতকরা ৯০ জনই সহজে পাশ করে যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই বোঝা যাবে—যে মাপটা সে বয়সের ঠিক উপযুক্ত হয় নি। এটা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অথচ এটি না হলে টেস্টটা মূল্যহীন হয়ে যাবে। সাত বছর বয়সের জন্য টেস্ট তৈরী করতে হ'লে বাবাছাই করা নানা রকমের ৭ বছরের অনেক ছেলে নিয়ে একটা গড় বুদ্ধির পরিমাণ (the Median or Average Score) স্থির করতে হবে। এ রকম ৫০০ ছেলে পরীক্ষা করে গড় বুদ্ধির অঙ্ক (Median Score) স্থির করা গেল। কিন্তু আরও ৩০০ ছেলে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় গড়বুদ্ধির অঙ্কের অনেকটা তফাত হচ্ছে, তাহ'লে বুঝতে হবে—পরীক্ষাটা তখনও সন্তোষজনক (satisfactory) নয়। এ রকম বারে বারে পরীক্ষা করে যে পর্যন্ত না একটা নির্দিষ্ট (constant) গড়-বুদ্ধির অঙ্ক পাওয়া যায় সে পর্যন্ত পরীক্ষাটা গ্রহণযোগ্য হবে না।

একটা দলের উপযোগী টেস্ট তৈরী করবার সময় দেখতে হবে তার প্রশ্নগুলো কোন একটা দলের অনুকূল না হয়। সিনেমা বা খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রশ্ন (যাতে সহরে ছেলেদের আগ্রহ বেশী) যদি একটা টেস্টে প্রাধান্য লাভ করে, তাহ'লে সেই টেস্টে সহরে ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান বলে প্রমাণিত হবে ; কিন্তু তাহ'লে টেস্টটা একপেশে হোল, এটা উচিত (fair) হোল না, এবং এর ফলটা বৈজ্ঞানিক ভাবে গৃহীত হ'তে পারে না। তাই টেস্টগুলো যাতে সর্বগ্রহণযোগ্য (standardised) হয়, সে জন্যে কতটা পরিশ্রম, ধৈর্য এবং দৃষ্টি থাকা দরকার, তা নীচে উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যাবে। কথাগুলো টারম্যান-মেরিল্ সংস্করণে কি করে মান নির্দিষ্ট করা হোল, সে সম্পর্কে। "এই সংশোধনে (বিনেঁর জীবিতকালে তিনবার তাঁর স্কেল সংশোধন করেন) পরীক্ষকেরা প্রাক্-বিদ্যালয় বয়স থেকে, পরিণত যৌবন বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন নানা প্রকারের সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সমস্যা (test items) সংগ্রহ করেন, যার সংখ্যা কয়েক সহস্র। এগুলির মধ্যে যে প্রশ্নগুলি সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচনা করা হোল সেগুলি প্রথম ১,৫০০ ছাত্রদের উপর পরীক্ষা করা হোল। এর মধ্যে যে প্রশ্নগুলি সে বয়সের ছেলেদের আগ্রহ আকর্ষণ করতে অক্ষম হোল, সেগুলি ছাঁটাই করা হোল। কারণ কোন পরীক্ষা সফল হতে গেলে, এবং বুদ্ধির নির্ভুল মাপ পেতে গেলে যাদের পরীক্ষা করা হবে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। কোন উত্তরের নম্বর

দেওয়ার বেলায় যদি বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বর বিভিন্ন হোল, তা হ'লে নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির সংশোধন করা হোল। একটা প্রশ্ন যদি এমন হোল, যে ৭ বছরের অল্প কয়টি ছাত্র মাত্র তার উত্তর দিতে পারল, আট বছরের প্রায় অর্ধেক ছেলে তার উত্তর দিতে পারল, এবং নয় বছরের প্রায় সব ছেলেই তার উত্তর দিতে পারল, তাহলে বোঝা গেল প্রশ্নটি, যাদের মানসিক বয়স ৮ বৎসর তাদের উপযোগী। ১৫০০ ছাত্রদের যে সহস্র প্রশ্নগুলো দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে বাছাই করে দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্যে ৪০০ প্রশ্ন নেওয়া হোল। এবার ২ বছর থেকে সুরু করে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত আরো ৩০০০ শ্বেতকায় অ্যামেরিকান্ ছাত্রদের ওপর ব্যবহার করা হোল। এ ছাত্ররা যদিও অ্যামেরিকায়ই জন্মেছে তবু এদের বংশ ও জাতি বিভিন্ন। সমগ্র দেশের জন্য যাতে পরীক্ষাগুলো উপযোগী হয়, সেজন্য ভারমণ্ট ও ভার্জিনিয়া থেকে ক্যালিফর্নিয়া পর্যন্ত ১১টি স্টেট্ থেকে পরীক্ষার জন্য ছাত্র নেওয়া হয়েছিল। দেশের শ্বেতকায় অধিবাসীদের যে অনুপাতে গ্রাম ও সহর অঞ্চল আছে এবং বিভিন্ন জীবিকা অনুযায়ী দেশের অধিবাসীরা ছড়িয়ে আছে সেই অনুপাতেই বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন পরিবার থেকে ছাত্র নেওয়া হয়েছিল। এই দ্বিতীয় পরীক্ষার পরে ১২৯টি প্রশ্ন ও সমস্যাযুক্ত দুটি পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হোল। এ পরীক্ষাগুলোর মান বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্দিষ্ট হোল এবং তা বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের মানসিক পরিণতি (Mental Age) মাপবার উপযোগী বিবেচিত হোল।...এমন কি এখনও আমরা আশা করতে পারি না যে পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ ও সার্থক।" (Woodworth-Psychology).

বুদ্ধির স্তরবিভাগ—Levels of Intelligence—আমের মধ্যে যেমন জাতের প্রভেদ আছে, মানুষের বুদ্ধিরও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাত আছে। আমের মধ্যে ল্যাংড়া আম কুলীন জাতের, কিন্তু গুটির আম নিতান্ত বজ্জ। তেমনি বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) দিয়ে বা মানসিক বয়স (M. A.) দিয়ে বুদ্ধির আমরা জাত বিচার করি। যারা খুব উঁচু জাতের বুদ্ধিসম্পন্ন, যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০-এর ওপরে, অথবা যাদের মানসিক বয়স ২৪ বৎসর, তাদের আমরা বলি প্রতিভাবান্ (Genius)। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫-এর ওপরে, কিন্তু ১৪০-এর নীচে, তাদের বলি Superior। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ বা কাছাকাছি, তারা হোল Normal বা Average। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০, তাদের নীচ জাতের বুদ্ধি, তাদের বলি

ক্ষীণবুদ্ধি (Morons বা feeble-minded)। তার চেয়েও যারা ক্ষীণবুদ্ধি যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০, তারা জড়বুদ্ধি (Imbecile)। তার চেয়েও যারা নীচুতে, একেবারেই হাবা, তাদের বলি নির্বোধ (Idiots)। তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০, বা কাছাকাছি। এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নয়, সর্বজন গৃহীতও নয়। তবে বুদ্ধির যে জাতের তফাত আছে এটা অনেকেই স্বীকার করেন। উপরের শ্রেণী বিভাগটি উডওয়ার্থের মত অনুযায়ী। টম্‌সন্ (G. G. Thompson-Child Psychology) এর শ্রেণী-বিভাগ নীচে দেওয়া হোল। এটা টারম্যানের মতানুসারী।

বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)	শ্রেণী
১৪০ এর ওপর	প্রায়-প্রতিভা বা প্রতিভা
১২০—১৪০	অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি
১১০—১২০	তীক্ষ্ণবুদ্ধি
৯০—১১০	সাধারণ বা মোটামুটি বুদ্ধি
৮০—৯০	বুদ্ধির ন্যূনতা—একেবারে ক্ষীণবুদ্ধি বলা যায় না
৭০—৮০	সীমান্তবর্তী বুদ্ধির ন্যূনতা, ক্ষীণবুদ্ধিই বলা যায়
৭০ এর নীচে	নিশ্চিতভাবে ক্ষীণবুদ্ধি

ক্ষীণবুদ্ধির মধ্যে ৭০ থেকে ৫০ যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের বলে মোরোন্‌স্ (উঁচু, মাঝারি, নীচু), ২০।২৫ থেকে ৫০ যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা হোল জড়বুদ্ধি (Imbeciles) আর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০।২৫ এরও নীচে, তারা একেবারেই নির্বোধ (idiots)।

বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা—Constancy of the I. Q.—এই জাত-বিচারে দেখা যায় যে এ বিভেদটা পাকা, অর্থাৎ যারা জড়বুদ্ধি (Imbecile) বা ক্ষীণবুদ্ধি (Morons) তাদের শত চেষ্টা করেও তীক্ষ্ণধী বা প্রতিভাবান্ করা যায় না (Superior or Genius)—"গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না।" অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় প্রতিকূল অবস্থা, যেমন অসুখ বা ইন্দ্রিয়ের কোন ত্রুটি, অভিভাবক বা শিক্ষকের দুর্ব্যবহার বা সহানুভূতির অভাব বা অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারা ইত্যাদি কারণে বুদ্ধির উপযুক্ত বিকাশে বাধা ঘটে। শিক্ষকের তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার, যে কোন ছেলে এ রকম কোন আকস্মিক বা অবান্তর কারণে পিছিয়ে আছে কিনা। শিক্ষকের শিক্ষার গুণে ছাত্রদের উন্নতি ঘটে ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রেরই একটা নির্দিষ্ট বুদ্ধির সীমা

আছে তার ওপরে সে উঠতে পারে না। সেইজন্যে বুদ্ধির পরীক্ষা বিশেষ দরকারী, আর বিশেষ যত্ন করে, বিভিন্ন উপায়ে, কিছু দিন বাদ দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে ছেলেদের বুদ্ধ্যঙ্ক ঠিক করতে হবে। যদি পরীক্ষাটা নির্ভরযোগ্য হয় তাহ'লে দেখা যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ্যঙ্ক সামান্য বাড়লে কমলেও মোটামুটি একই থাকে। বহু সহস্র ছেলেকে বহুবার পরীক্ষা করে এ ফলটি পাওয়া গেছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। একটি মেয়ের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬ বছরে পাঁচবার মাপা গেল—নীচের ফলটা থেকে দেখা যাবে তার বুদ্ধ্যঙ্কের খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি।

	বাস্তবিক বয়স	মানসিক বয়স	বুদ্ধ্য
প্রথম পরীক্ষা	৬ বৎসর ৮ মাস	৫ বৎসর ৬ মাস	৮৩
দ্বিতীয় ,,	৭ ,, ১ ,,	৫ ,, ৪ ,,	৭৫
তৃতীয় ,,	৮ ,, ২ ,,	৬ ,, ১০ ,,	৮৪
চতুর্থ ,,	৮ ,, ৭ ,,	৭ ,, ০ ,,	৮২
পঞ্চম ,,	১২ ,, ১০ ,,	৯ ,, ১০ ,,	৭৭

বর্তমানে অনেক মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, বুদ্ধ্যঙ্ক অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত। দুঃখ বা উদ্বেগজনক পারিবারিক বা সামাজিক অবস্থা বর্তমান থাকলে অধিকাংশ ব্যক্তিরই বুদ্ধ্যঙ্কের অবনতি ঘটে। আবার আনন্দময় ও তৃপ্তিকর অবস্থায় সেই সব ব্যক্তিরই বুদ্ধ্যঙ্কের প্রভূত উন্নতি ঘটে। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী কিন্তু রাশিয়াতে তার বিপরীত। তারা তাই এই বুদ্ধির পরীক্ষার ওপর সামান্য গুরুত্বই আরোপ করে থাকেন।*

বুদ্ধির দুরকমের বৃদ্ধি,—উচ্চতায় ও বিস্তারে—Vertical and horizontal growth in Intelligence—যদিও বুদ্ধির জাতটার

* Burks—On the relative contributions of nature and nurture to average group differences in intelligence. Proc. Nat. Acad. Sci. 1938, 24. P 276-282 ; Stoddard.—The Meaning of Intelligence ; The thirtyninth N. S. S. E. Year Book ; Newman, H. F., Freeman, F. N., and Holzinger, K. J.—Twins : a study of heredity and environment ; Honzik. M. P., Macfarlane, J. W., and Allen, L.—The stability of mental test performance between two and eighteen years. J. Exp. Edn. 1948, 17, P 309-324 ; Beatrice King—Russia goes to school ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

(Quality) বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়, কিন্তু তার পরিমাণ (Quantity) নিশ্চয়ই বাড়ানো চলে। এই বৃদ্ধির দিকটাকে স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন বুদ্ধির বিস্তার (Horizontal growth in intelligence)। দুটি ছেলেরই বুদ্ধ্যঙ্ক ধরা যাক ৯৫। শিক্ষক যত্ন করলে হয়তো তার বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ হবে না, কিন্তু তার বুদ্ধির বিস্তার নিশ্চয়ই বাড়ানো যাবে। তাই বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনীয়, এ আবিষ্কারে উদ্যোগী শিক্ষকের নিরাশ হওয়ার সঙ্গত কারণ নেই। শিক্ষকের চেষ্টায় ছাত্রের বুদ্ধির বিস্তার ঘটানো যাবেই। অবশ্য এটা দেখা যায় যে যাদের বুদ্ধির জাতটা ভালো, তাদের বুদ্ধির বিস্তারের সম্ভাবনাও বেশী। এ সম্বন্ধটা স্যাণ্ডিফোর্ড নীচের ছবিতে বোঝাতে চেয়েছেন।

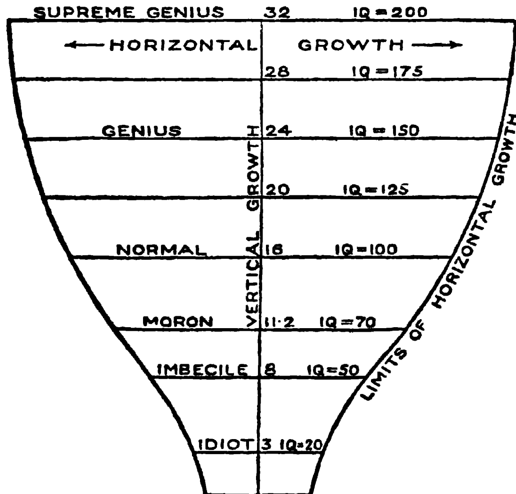


Fig. 24.—Vertical and horizontal growth of intelligence— Sandiford—Educational Psychology P. 150 Fig. 36 Longmans Green & Co.

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধি সম্বন্ধে 'উচ্চতা' বা 'বিস্তার' এরকম কথা ব্যবহারের বিরোধী। তাঁরা বলেন, এতে করে এ রকম একটা ভুল ধারণা জন্মায় যে বুদ্ধি বুঝি একটা বস্তু। তাঁরা বুদ্ধির বিস্তার কথার পরিবর্তে বুদ্ধির পরিপক্কতা (maturation) বলার পক্ষপাতী।

বুদ্ধির উন্নতির সীমা—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির উন্নতি (vertical growth) হয়, কিন্তু সেটার একটা সীমা আছে। দেখা যায় ৫।৬ বছরের পর থেকে বুদ্ধি দ্রুত বাড়তে থাকে ১৩।১৪ বৎসর পর্যন্ত, তারপর অধিকাংশেরই ১৬ বৎসরের পর বুদ্ধি প্রায় বাড়েই না বা সামান্যই বাড়ে। কাজেই সাধারণতঃ বলা যেতে পারে মানুষের বুদ্ধির সীমা ১৬ বৎসর। ১৬ বৎসর মানসিক পরিণতিই (Mental Age) হচ্ছে সাধারণ সুস্থ-মানুষের (Average) বুদ্ধির শেষ সীমা। তারপর বছর গুণে বৎসর (Chronological Age) বেড়ে গেলেও মানসিক পরিণতি ১৬ই থেকে যায় বা সামান্যই বাড়ে। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে বুদ্ধির উন্নতি ৩০।৩১ বছর বয়স পর্যন্ত হয় দেখা গেছে। তারপর অনেক দিন পর্যন্ত বুদ্ধি প্রায় এক অবস্থায়ই থাকে। শেষে বুড়ো বয়সে "ভীমরতি ধরে"—মানে বুদ্ধি তখন কমতে থাকে, আর তার বিকৃতি ঘটে। যাদের বুদ্ধির জাতটা ভাল তাদের পরিণতিও হয় সাধারণের চেয়ে বেশীদিন ধরে, আর যাদের বুদ্ধির জাতটা খারাপ তাদের বুদ্ধি পরিণতি লাভ করে অনেক আগে। তাই দেখা যায় যারা বোকা, তারা অল্প বয়সেই "পেকে ওঠে।" নীচের ছবিতে জিনিষটা বোঝানো হয়েছে।

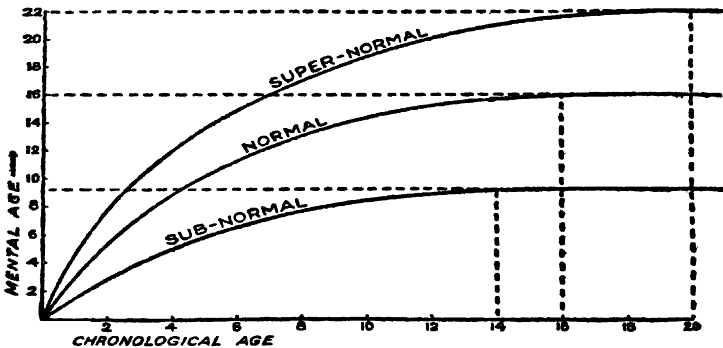


Fig. 25, Curve of the growth of different grades of intelligence
Sandiford—Education Psychology P. 148, Fig. 35
—Longmans Green & Co.

পরিণত বয়স্কদের বুদ্ধির স্কেল্ নির্মাণ করা অত্যন্ত কঠিন। বহু চেষ্টা করে এখন পর্যন্ত যে স্কেল্‌গুলি তৈরী করা হয়েছে তাতে দেখা যায় সাধারণ মানুষের

পরিণত বয়সের বুদ্ধির মাপ ১৬ বৎসরের নবযুবকের সমান। হয়তো এটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, হয়তো পরিণত বয়সেও বুদ্ধি বয়সের সঙ্গে বাড়ে, কিন্তু তা মাপবার কোন নির্ভরযোগ্য উপায় আমাদের এখনও জানা নেই। বুদ্ধির পরিণতি বোঝার জন্য যে বক্ররেখাগুলি ব্যবহার করা হোল তাদের মানে এ নয়, যে ১৬ বৎসরের ছেলে যা জানে, ৪০ বৎসরের পরিণত মানুষ তার চেয়ে বেশী কিছু জানে না। এ দিয়ে শুধু এই বোঝাচ্ছে যে বুদ্ধির যে সব ক্রিয়াকে বুদ্ধির প্রচলিত নানা মাপ দিয়ে আমরা বিচার করি তাতে পরিণত বয়স্ক মানুষ আর ষোল বছরের ছেলের সফলতা সমান (Sandiford-Educational Psychology)। অবশ্য ১৬ বৎসর সাধারণ-মানুষের বুদ্ধির পরিণতির শেষ সীমা হলেও, বুদ্ধির বিস্তার বা পরিমাণ (Quantity) যে বাড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, আমরা দেখব যে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এক জিনিষ নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা সমন্বয় করবার ক্ষমতা বাড়ে। এখানে ১৬ বছরের ছেলের চেয়ে ৪০ বৎসরের পরিণত মানুষের উৎকর্ষ। যতগুলো পরীক্ষা প্রচলিত আছে সবগুলোতেই দেখা যায় সাধারণ মানুষের বুদ্ধির পরিণতি ঘটে ১৫ থেকে ১৮র মধ্যে। বিনেঁ এর পরীক্ষায় পরিণতির বয়স হচ্ছে ১৫, টারম্যানের পরীক্ষায় ১৬, ব্যালার্ডের পরীক্ষায় ১৬। ওটিস্ এবং মন্‌রো দুজনের পরীক্ষাই ১৮। ডল্‌এর পরীক্ষায় এ বয়সটা কমে ১২তে দাঁড়ায়, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্টের সৈন্য বিভাগের আলফা ও বীটা টেস্টের ফলও প্রায় অনুরূপ, তাতে বয়সটা দেখা যায় ১৩·০৮। হয়তো ভবিষ্যতে আরো সূক্ষ্মতর পরিমাপের উপায় আবিষ্কৃত হ'লে দেখা যাবে সাধারণ লোকেরও বুদ্ধি ১৬র পর খুব ধীরে ধীরে ২৩।২৪ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। এটা অবশ্য অনুমান।

বুদ্ধি কেমন করে ছড়িয়ে আছে—Distribution of Intelligence —আগেই বলা হয়েচে, বুদ্ধিটা এমন জিনিষ নয়, যে একজনের একবারেই নেই —আর একজনের আছে। বুদ্ধিটা নানা জনের নানা মাপের। কাজেই একটা বৃহৎ আবাছাই করা জনসংখ্যার বুদ্ধির মাপ করলে দেখা যাবে যে, শতকরা ৬০ জনের বুদ্ধি হচ্ছে মাঝারি, অর্থাৎ তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১১০র মধ্যে। বাকী সংখ্যা ক্রমে কমে কমে একেবারে নির্বোধ বা হাবা (idiots) পর্যন্ত এবং ক্রমে কমে কমে অত্যন্ত প্রতিভাশালী (Superior Genius) পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ; এই ছড়িয়ে থাকার ক্রমটা রসের মতে নিম্নলিখিত রূপ—(J. S. Ross.—Basic Psychology).

বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q)	তাৎপর্য	লোকসংখ্যার শতকরা হার
১৪৩ এবং তার ওপর	অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি	½
১৩১—১৪২	তীক্ষ্ণ বুদ্ধি	২½
১১৯—১৩০	উজ্জ্বল	১০
১০৭—১১৮	সাধারণের চেয়ে উর্ধ্বে	২১
৯৪—১০৬	সাধারণ	৩২
৮২— ৯৩	সাধারণের নীচে	২১
৭০— ৮১	বুদ্ধির ন্যূনতা	১০
৫৮— ৬৯	সীমান্তবর্তী বুদ্ধির ন্যূনতা	২½
৫৭ এবং নীচে	ক্ষীণ বুদ্ধি	½

বুদ্ধি ও পেশা—Intelligence and Occupation—সব কাজের জন্যই একটা ন্যূনতম পরিমাণ বুদ্ধি চাই। কিন্তু কোন কোন কাজে বুদ্ধি অন্য কাজের তুলনায় বেশী দরকার। মোটামুটি দেখা যায় খুব বুদ্ধিমান্ লোকেরা হন ডাক্তার, এন্‌জিনীয়ার, বৃহৎ ব্যবসায়ী, কেমিস্ট, শিক্ষক ইত্যাদি। যারা শিক্ষিত কারিগর তারাও বুদ্ধিমান; কিন্তু উপরের শ্রেণীর তুলনায় অতটা নন। যারা দিনমজুর তাদের বুদ্ধির জাতটা সবের তুলনায় খাটো। উডওয়ার্থ বলছেন, "গড় তুলনা করলে এটা নিশ্চিত দেখা যায় যে, বুদ্ধির পরীক্ষায় সবচেয়ে উঁচু স্থান অধিকার করেন স্বাধীন ব্যবসায়ীরা। হিসাবরক্ষক এবং কেরাণীরাও বেশ উঁচু স্থান পান, কলকব্জার কারিগররাও বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়, সবচেয়ে নীচুতে থাকে অশিক্ষিত শ্রমজীবীরা" (Woodworth—Psychology)। অবিশ্যি এটা দ্বারা একথা বোঝাচ্ছে না যে প্রত্যেক এন্‌জিনীয়ার, প্রত্যেক কলকারখানার মিস্ত্রীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। এটা হচ্ছে গড়পড়তা হিসাবের কথা। একথা লক্ষ্য করবার বিষয় যে স্বাধীন ব্যবসায়ীদের ছেলেমেয়েরাও মোটামুটিভাবে মুটে মজুরদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। নীচের তালিকা থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তালিকাটা তৈরী করেছেন টারম্যান্ ও মেরিল্ অ্যামেরিকার জনসংখ্যা অনুসন্ধান করে। পিতার জীবিকা অনুযায়ী শিশুদের গড় বুদ্ধির হার।

পিতার জীবিকা	শিশুর গড় বুদ্ধির হার
১। স্বাধীন ব্যবসায়ী	১১৬
২। অর্ধস্বাধীন ব্যবসায়ী ও পরিচালক	১১১

পিতার জীবিকা	পিতার গড় বুদ্ধির হার
৩। কেরাণী, নিপুণ কারিগর, খুচরা ব্যবসায়ী	১০৭
৪। গ্রাম্য সম্পন্ন গৃহস্থ, কৃষক ইত্যাদি	৯৫
৫। অর্ধশিক্ষিত কারিগর, ছোট অফিসের কেরাণী, ছোট দোকানদার ইত্যাদি	১০৪
৬। সামান্য শিক্ষিত শ্রমিক	৯৯
৭। সহর ও গ্রামের দিন মজুর	৯৬

এর কতটা বংশপরম্পরায় (heredity) ফল, কতটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার (environment) ফল, সেটা গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এ দুটো ব্যাপারই এখানে কাজ কচ্ছে।

সহর ও গ্রামে বুদ্ধির তারতম্য—Urban and Rural Intelligence—সাধারণতঃ দেখা যায়, সহুরে ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান্। মোটামুটি তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক কিছুটা বেশী। সহরের ছেলেদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে ১০০ বা তার কিছু ওপরে, গ্রামের ছেলেদের গড় হচ্ছে ৯০ থেকে ৯৫।" তবে গ্রামে যেখানে সুশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানের ছেলেরা সহরের ছেলের তুলনায় বুদ্ধির দৌড়ে হেরে যায় না।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য—Intelligence in different races—অ্যামেরিকায় এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যায়, মোটামুটিভাবে সব দেশের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি সমান—তবুও যেন কিছু ইতর-বিশেষ আছে। নীচে পরীক্ষার ফল দেওয়া হল—

শ্বেত অ্যামেরিকান্ পিতামাতার সন্তান—	১০০
চীন ও জাপানী পিতামাতার সন্তান	১০১
রেড্ইণ্ডিয়ানদের সন্তান	৮৬
নিগ্রো পিতামাতার সন্তান	৮৩

আবার দেখা যায় য়ুরোপ থেকে যারা অ্যামেরিকা এসেচে—তাদের বিভিন্ন দেশের মধ্যেও কিঞ্চিৎ তফাত রয়েছে—জার্মান ও ইহুদী ছেলেমেয়েরা ফ্রান্স ও ইটালী দেশ থেকে আগত ছেলেমেয়েদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান্। এ সমস্ত পরীক্ষা আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরো অনেক পরীক্ষা না করে মত স্থির করা ঠিক হবে না। হিটলারএর জার্মানীতে তাঁরা এই মত প্রচার করেছিলেন যে, জার্মান জাত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত—

(superior race)। প্রত্যেক জাতের মধ্যেই অল্পবিস্তর এ রকম ধারণা রয়েছে। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় এ বিশ্বাসটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে গেলে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে বুদ্ধির পরীক্ষাগুলো কোন এক দলের অনুকূল না হয়।

বুদ্ধির মাপের প্রয়োজনীয়তা

১। **মানসিক শক্তির ন্যূনতা বা বিকৃতি নির্ণয়—Diagnosis of mental deficiency**—মানসিক বিকৃতি যাদের আছে অধিকাংশ সময় তাদের বুদ্ধ্যঙ্কে তা ধরা পড়ে। সাধারণ লোকের চেয়ে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক অনেকটা কম দেখা যায়। তা'ছাড়া বুদ্ধির মাপের মধ্যে মোট বুদ্ধির পরিমাণ মাপবার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি আছে নানা রকম কাজে দক্ষতা মাপবার উপায়। কাজেই যাদের মানসিক বিকৃতি আছে তাদের কোন কোন দিকে বিশেষ অক্ষমতা আছে, সেটাও বোঝা যায়। তার চিকিৎসার জন্য এটা জানা দরকার।

২। **ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ—The grading of pupils**—বুদ্ধি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ করা ভালো। অ্যামেরিকা এবং অন্যান্য অগ্রসর দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরই তাদের বুদ্ধির মাপ নেওয়া হয় এবং বুদ্ধির পরিমাণ অনুযায়ী মোটামুটি তিন দলে—ভাল, মন্দ, মাঝারি (bright, medium and dull) এই ভাবে ভাগ করা হয়। এই মাপ অনুসারেই তাদের পড়া বা কাজ নির্ধারণ করা হয়। তাতে অনেক অপচয় ও অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়। ক্লাসে কাজও অনেক ভাল হয়। এক একটা দল একরকম বুদ্ধিমান্ (বা বুদ্ধিহীন) ছেলে বা মেয়ে নিয়ে তৈরী করা যেমন উচিত, তেমনি তাদের বয়সও একরকম হলে ভাল হয়। আমাদের দেশে স্কুলগুলিতে কোন রকম বাছাই করা হয় না। নানা বয়সের নানা রকম বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের জন্য একই পড়া, কাজ বা পরীক্ষার ব্যবস্থা। এতে ক্লাসের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় কারণ এটা খুব সত্য কথা যে "একটা শ্রেণীর সব চেয়ে নিকৃষ্ট যে ছেলে, সে যতটুকু অগ্রসর হয়, শ্রেণীটি সমগ্রভাবে ততটুকুই অগ্রসর হয়। বুদ্ধিমান্ ছেলেদেরই এতে ক্ষতি হয় বেশী। তারা আলস্যে ও

নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বোকা ছেলেদের সঙ্গে থেকে চালাক ছেলেরা পিছিয়ে পড়ে এবং তারা মন্থর ও অলসভাবে কাজ করবার অভ্যাস গঠন করে।" এতে বোকা ছেলেদেরও ক্ষতি হয়। সর্বদা ভালো ছেলেদের তুলনায় নিজেদের অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ফলে অনেক সময় তারা হিংসুক ও তিক্ত মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং কলেজগুলিতে ভর্তি করবার আগে বেশ কড়াকড়ি ভাবে বুদ্ধির পরীক্ষা করা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর ফল মোটামুটিভাবে ভালই হয়। কখনো কখনো কোন কোন স্কুল বা অভিভাবক তাদের ছাত্রদের কতগুলি বাছাই-করা প্রশ্ন ভালো করে মুখস্থ করিয়ে তাদের এসব কঠিন পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ করে দেন। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায়, ভবিষ্যতে গিয়ে এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অগৌরব ও নিজেদের কাছেও বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাক্‌রী তাঁর 'ট্যালেণ্টস্ এ্যাণ্ড টেম্পারা-মেণ্টস্' বইয়ে এ সম্বন্ধে কতগুলি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন।

৩। **শিশু পরিচালনা—Child guidance**—শিশুকে পরিচালনা করতে গেলে তার বুদ্ধির মাপটা জানা ভালো। অনেক সময় দেখা যায় বুদ্ধির স্বল্পতা অন্যায় ব্যবহারের মূল কারণ। কিন্তু সব সময় সেটা সত্য না হতে পারে। তার পরিবেশের প্রতিকূলতা বা মানসিক কোন সংঘাত এ জন্যে দায়ী হতে পারে। সেটার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন, তা হলেই শিশুকে সংশোধন করা সম্ভব। যে ছেলে বুদ্ধিমান্ তাকে সংশোধন করবার সম্ভাবনা বেশী। বার্ট বলছেন, "বুদ্ধির অভাবই তার দোষ-ত্রুটির প্রধান কারণ হতে পারে এবং বুদ্ধি থাকাটা তাকে সংশোধন করবার একমাত্র আশা" (Cyril Burt.—The Young Delinquent)। যারা অসাধারণ বুদ্ধিমান্, কখনো কখনো তাদের অ-সাধারণত্বই তাদের বিভ্রান্ত করে। তারা অতিমাত্রায় অভিমানী বা আত্ম-সচেতন হওয়ার ফলে বেশী আঘাত পায় এবং কখনো কখনো নিজেদের গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়। যাই হোক্, সব ক্ষেত্রেই মূল কারণটি জানা থাকলে ত্রুটি-সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে, এবং বুদ্ধির মাপ, এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

৪। **ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাচনে সহায়তা—Vocational guid-ance and selection**—কে কোন কাজের যোগ্য তা জানা এবং সে অনুযায়ী বাছাই করা যে দরকার, এটা আমরা সবাই বুঝি। "জুতো সেলাই থেকে

চণ্ডীপাঠ" পর্যন্ত সব কাজ একই লোক দিয়ে করানো, মাঝে মাঝে অবস্থা গতিকে, দরকার হতে পারে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই সুব্যবস্থা নয়। "যার কাজ তাকে সাজে, অন্যের তাতে লাঠি বাজে" এ প্রবাদটা মিথ্যে নয়। সব কাজেই বুদ্ধি চাই, তবে সব কাজে সমান বুদ্ধিও দরকার নেই, এক জাতীয় বুদ্ধিও কাজে লাগে না। এই জন্যে বুদ্ধির পরীক্ষা, দক্ষতার পরীক্ষা, নানা কারিগরী পরীক্ষা, রুচি ও উপযোগিতা পরীক্ষা ইত্যাদি খুব মূল্যবান। বাস্তবিক পক্ষে এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই এই পরীক্ষাগুলির জন্ম হয়েছে বা উন্নতি হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অ্যামেরিকায় (এবং যুদ্ধরত অন্যান্য সব দেশেরই) যুদ্ধের কাজে বহু লক্ষ লোক নিয়ে একটা প্রধান সমস্যা ছিল—মানুষকে কাজের জন্য বাছাই করা আর মানুষ অনুযায়ী কাজ বাছাই করা,—"**Fitting the job to the man and fitting the man to the job**". কাজ অনুযায়ী মানুষ নেওয়া আর মানুষকে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, এ সমস্যা তো যুদ্ধ-কালীন মাত্র নয়,—এটা সর্বদেশের সর্বকালের সমস্যা। যদি অপচয় নিবারণ করতে হয়,—সব-চেয়ে বেশী কাজ, সবচেয়ে ভালভাবে, সব-চেয়ে কম সময়ে পেতে হয়, তবে এ পরীক্ষাগুলির এখনও আরও প্রভূত উন্নতি হওয়া দরকার।

বুদ্ধির পরীক্ষাগুলির সীমা ও ত্রুটি—Limitations and defects of the Intelligence Tests—এ মাপগুলি এখনও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, সুতরাং কোন ব্যক্তির বিচার করতে হ'লে এগুলিকে চূড়ান্ত বলে মনে করলে ভুল হবে। বুদ্ধি মানুষের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ মাপ এতে পাওয়া যায় না। (G. G. Thompson-Child Psychology)। আর আগেই বলা হয়েছে বুদ্ধির পরিমাপ করতেও একটা মাত্র পরীক্ষা একেবারেই যথেষ্ট নয়। কাজেই নানা রকমের পরীক্ষা ব্যবহার করে ব্যক্তির বুদ্ধি ও ক্ষমতা মাপতে হবে। এ মাপগুলি সব দেশে ঠিক এক রকম হতে পারে না, এবং এগুলি নির্ভুল নয়, এ কথা মনে রাখা দরকার। পরিবেশের প্রভাব সকলের ওপর সমান নয় এবং পরিবেশকে সম্পূর্ণ করে মাপবার উপায় যে পর্যন্ত না হবে, ততদিন এই বুদ্ধির মাপগুলিও অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুযায়ী ছাত্রদের দলে ভাগ করার রীতি যে অভ্রান্ত নয়, বর্তমানে নানা গবেষণার ফল এ সাক্ষ্য দিচ্ছে। বুদ্ধ্যঙ্ক ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা ও

সম্ভাবনার একটা স্থূল মাপকাঠি মাত্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা বুদ্ধ্যঙ্ক যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। দুটি ছাত্রের বুদ্ধ্যঙ্ক সমান বলে, তাদের মানসিক সামর্থ্য সমান, অথবা মানসিক পরিণতি (maturation) সমান, একথা মনে করে তাদের একই দলে ফেলা সব সময় উচিত নয়। উপযুক্ত আগ্রহ সৃষ্টি (motivation) করলে অনেক সময় বুদ্ধ্যঙ্কের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। তাই শিক্ষার উন্নতি করতে হলে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও ছাত্রের আগ্রহের মূল উৎসের অনুসন্ধান ও তাকে কাজে লাগানো দরকার। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মূল্য ছাত্রের শিক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্য। এর কোন মাপ শুধু বুদ্ধ্যঙ্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ছাত্রের পরিণতির প্রকৃতি ও ছন্দ ভিন্ন ভিন্ন রকমের, তাই একই বুদ্ধ্যঙ্কের ছেলেদের একই কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার প্রথার পরিবর্তন প্রয়োজন। একই বিষয় তাদের শিক্ষণীয় হলেও প্রত্যেকের প্রকৃতি ও পরিণতির গতি অনুসারে বিষয়ের বিভিন্ন দিকে জোর দিতে হবে বা জোর কম দিতে হবে (C. V. Millard-Child growth and development P. 141-142)। ছাত্ররা বিষয়টি অধিগত করবে শিক্ষকের এটাই দৃষ্টি হবে না, তাঁর দৃষ্টি হওয়া উচিত প্রত্যেক ছাত্র তার পরিণতির ছন্দ অনুযায়ী যথাসাধ্য করবার আগ্রহ যাতে পায়, তা সৃষ্টি করা। "প্রচলিত ইস্কুলের শিক্ষার ব্যাপারে এই কথাটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যতই কড়াকড়ি সেখানের ব্যবস্থা করা হোক্ না কেন, প্রত্যেক ছাত্রই স্থায়ীভাবে যা শেখে তা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী। যদি একই বিষয়, একই ভাবে, এক শ্রেণীর. সব ছাত্রদের শিখতে হবে, এ আদর্শ ছেড়ে দিয়ে, অন্য আদর্শ গ্রহণ করা যায়, যে প্রত্যেক ছাত্রকে তার নিজস্ব পরিণতির ছন্দ অনুযায়ী অগ্রসর হ'তে আগ্রহান্বিত করতে হবে, তাহলে, আশ্চর্য মনে হলেও, এটা দেখা যায় যে এতে প্রত্যেক ছাত্রকে আলাদা আলাদা একই জিনিষ শিখিয়ে দিতে শিক্ষকের যে পরিশ্রম হয় তার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম প্রয়োজন হবে (C. V. Millard Child growth and development—P. 142.)।

বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা—Knowledge-Intelligence-Wisdom—যে ছেলে জানে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন্ ২ : ১ এই অনুপাতে মেশালে জল হয়, সে ছেলের, এ বিষয়টিতে অন্তত বিদ্যা আছে। বিদ্যা হচ্ছে নানা বিষয় সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান। যে ছেলে বিদ্বান্, সে অনেক সময়ই বুদ্ধিমানও বটে। কিন্তু বিদ্যা থাকলেও বুদ্ধি না থাকতে পারে। বিদ্যা হচ্ছে জ্ঞান আহরণ, আর

বুদ্ধি হচ্ছে আহৃত জ্ঞানকে কাজে লাগাবার মানসিক ক্ষমতা। ব্যালার্ড তাই বুদ্ধিকে বলেছেন "অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার মত মনের সাধারণ ক্ষমতা।" (P. B. Ballard-Mental Tests)। একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলছেন "বিদ্যার কিছু ভিত্তি না থাকলে জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান্ হওয়া যায় না, কিন্তু তুমি হয়তো সহজেই বিদ্যা আহরণ করতে পার, তথাপি জ্ঞান বুদ্ধি তোমার কিছু না থাকতে পারে।" একজন বিদ্বান্ রাজাকে বলা হোত "খ্রীষ্টান দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্বান্ মূর্খ"—"the wisest fool of Christendom।" রস্ বলছেন, "এতে বোঝা যাবে ঘটনা বা দ্রব্য সম্বন্ধে জানা, আর সে জানাকে ব্যবহার করবার ক্ষমতার মধ্যে যে পার্থক্য প্রচলিত, তা আমরা মেনে নিচ্ছি। অনেক অনেক গল্পে আমরা দেখতে পাই চালাক চতুর একটি লোক তার সামান্য বিদ্যাকেও কাজে লাগিয়ে বেশ সফলতা লাভ কচ্ছে, আবার তার উল্টো এমন প্রকাণ্ড বিদ্বান্ও আছেন, যিনি তাঁর বিদ্যার ভারেই এমন বিব্রত যে, জীবনের সাধারণ সমস্যাগুলিও তিনি সমাধানে অসমর্থ—" (J. S. Ross-Basic Psychology)। কিন্তু বুদ্ধিকে আমরা ভাল কাজেও লাগাতে পারি, আবার ভয়ানক খারাপ কাজেও লাগাতে পারি। যার বুদ্ধি ব্যক্তির বিভিন্ন শক্তিকে সুসমঞ্জস ভাবে সংহত করে, এবং কল্যাণপ্রসূ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে, তাঁকে বলি প্রজ্ঞাবান্। শুধু জ্ঞান আহরণ, শুধু বুদ্ধির কসরৎ দিয়ে মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব, সৃষ্টি হয় না। যিনি সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেন পরিপূর্ণ সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে, তিনিই লাভ করেছেন সুসম সুপরিণত ব্যক্তিত্ব। এঁকেই গীতায় বলা হয়েছে স্থিতধীঃ।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"

সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রজ্ঞালাভ। একজন প্রাচীন ইংরেজ লেখক লিখেছেন, "জ্ঞানই হচ্ছে প্রধান জিনিষ; সুতরাং সত্যজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হও এবং সমস্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে লাভ কর প্রজ্ঞা"—"Wisdom is the principal thing ; therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding."

আমরা বলেছি ১৬ বৎসরের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। কাজেই পঞ্চাশ

বৎসরের প্রৌঢ় আর ১৬ বৎসরের তরুণ যুবকের বুদ্ধির মান সমান। কিন্তু প্রজ্ঞার দিক দিয়ে প্রৌঢ় যুবকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কোন কোন মনীষী ব্যক্তি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এই অভিযোগ করে থাকেন যে এ শুধু বুদ্ধির চর্চার প্রতিই মনোযোগী কিন্তু প্রাজ্ঞতার প্রতি উদাসীন।

তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবান্ ছাত্র—Gifted Children.

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০ বা তারও বেশী স্বভাবতঃই তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। যারা ক্ষীণবুদ্ধি বা নির্বোধ তাদের শিক্ষারও যেমন সমস্যা আছে, যারা তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবান্ তাদের শিক্ষারও তেমনি সমস্যা আছে। তারা অসাধারণ বলেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণের থেকে পৃথক হওয়া প্রয়োজন। টারম্যান্ ১০০০ এমন তীক্ষ্ণধী ছেলেদের স্কুলের বয়স থেকে সুরু করে যৌবন পর্যন্ত নানা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ইত্যাদি নানা গুণ ও রীতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল (১৯২১-৪৬) অনুসন্ধান করে কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। (১) এ সব ছেলেরা গড়ে সাধারণ ছেলেদের তুলনায় দৈহিক দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট। তাদের বৃদ্ধির হারও দ্রুততর। (২) স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে তারা অন্যান্য ছাত্রদের সহজেই পিছে ফেলে যায়। এদের অধিকাংশই উচ্চ কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেখানেও তাদের মানসিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। (৩) সামাজিক গুণের বিকাশও তাদের মধ্যে অধিকতর। তারা সাধারণতঃ তাদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গেই মেশে। (৪) চরিত্রের দিক দিয়েও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। সততা, বিশ্বস্ততা, নৈতিক স্থৈর্য তাদের মধ্যে বেশী। (৫) তাদের পিতামাতারও সাধারণের তুলনায় বুদ্ধি, সংকল্প, অনুভূতি, নীতিজ্ঞান, শারীরিক ও সামাজিক গুণ বেশী দেখা যায়। (৬) উত্তর জীবনেও তাদের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষণীয়। তবে মানসিক বিকৃতি এদের মধ্যে সাধারণের তুলনায় কম নয়।

হলিংওয়ার্থ (Hollingworth) বুদ্ধ্যঙ্ক ১৮০ বা বেশী এ রকম ৩১টি ছেলেদের জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, এরা শিশুকালে অনেক আগে কথা বলতে শেখে, শব্দ ও বাক্যের ওপর দখল এদের বেশী হয়। এরা সাধারণের চেয়ে অনেক আগে এবং অনেক বেশী বস্তুবিবর্জিত চিন্তা ও শুদ্ধ প্রতীক (abstract symbols) ব্যবহারে পারদর্শী হয়। এরা কিন্তু খুব ভাল মিশুক হয় না। হলিংওয়ার্থ-এর মতে এরা অনেক সময়ই সমাজের

সঙ্গে ভাল মানিয়ে চলতে পারে না এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হয় না। তাঁর মতে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫ থেকে ১৫৫, তাদেরই সুস্থ ও সু-সমঞ্জস ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা আছে। এর চেয়ে যারা বেশী বুদ্ধিমান্ সংসার ও সমাজে তাদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা কম।

টারম্যান্ ও হলিংওয়ার্থ দুজনেই তীক্ষ্ণধীদের জন্যে পৃথক উন্নততর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।*

সংযোজনা—ক

বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা

আগেই বলা হয়েছে বুদ্ধি মানুষের একটা মৌলিক গুণ, কাজেই তার একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধির বিভিন্ন লক্ষণকে প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন। এ রকম কয়েকটি মত নীচে দেওয়া হোল।

বার্ট (Burt) বলেছেন "বুদ্ধি হচ্ছে নূতন অবস্থা ও নূতন সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে দেহ মনের চলবার সাধারণ ক্ষমতা"—"The power of readjustment to relatively novel situation by organising new psychophysical combinations"। স্টার্ণ (Stern) মোটামুটি এই কথাই বলেছেন,—"Intelligence is the general mental adaptability to new problems and conditions"। গডার্ড (Goddard)এর সংজ্ঞা স্টার্ণএর সংজ্ঞার অনুরূপ—জীবনের উপস্থিত সমস্যা সমাধানে এবং ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্বন্ধে পূর্বেই ধারণা করবার শক্তির পরিমাণ দিয়ে বুদ্ধির মাপ করা হয়—"The degree of availability of ones experiences for the solution of immediate problems and the anticipation of future ones."

আবার কেউ কেউ বলেন অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলে—the capacity to profit by experience। আরো চমকপ্রদ ভাষায় ক্যাটেল বললেন, বুদ্ধি হচ্ছে "the capacity to aquire capacity"

টারম্যান্ (Terman) বলছেন, সে অনুপাতেই এক ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, যতটা তার শক্তি আছে বস্তুবিবর্জিত চিন্তা করবার—"An individual is

*Terman-Genetic studies of genius : Mental and physical traits of a thousand gifted children ; Hollingworth-Children above 180 I. Q. ; Garrison—The psychology of exceptional children.

intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking।" বাস্তবিক বুদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ও পরিচয় বস্তুবিবর্জিত চিন্তায় এবং সমস্ত সমস্যা সমাধানে শুদ্ধ প্রতীক (abstract symbols) ব্যবহারে।

বিনে বুদ্ধির সংজ্ঞা দিচ্ছেন—"সমগ্রবোধ, আবিষ্কার, পরিচালনা ও নৈতিক বিচার এই চারটি কথা দিয়ে বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় করা যায়"—"comprehension, invention, direction and censorship : intelligence lies in these four words."

থর্ণডাইক্ বলছেন, "স্থান কাল পাত্র বিশেষে উপযুক্ত কর্তব্যটি খুঁজে নেবার ক্ষমতার নাম বুদ্ধি"—"The power of good response"। থর্ণডাইক্, বুদ্ধির একটি প্রধান লক্ষণ বস্তুবিবর্জিত চিন্তা, টারম্যানের এই কথাটির সঙ্গে একমত। তিনি নানা পরীক্ষার দ্বারা এ সংজ্ঞাকে আরো বিশদ করে বললেন, কোন ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপের তিনটি প্রধান উপদান (১) উচ্চতা (altitude) যে যত কঠিন কাজ করিতে পারে তার বুদ্ধি তত উঁচু (২) বিস্তার (breadth) একই রকম কঠিন কাজ যে যত বেশী পরিমাণে করতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্। (৩) দ্রুততা (speed) একই রকম কঠিন কাজ যে যত দ্রুত করতে পারে সে তত বুদ্ধিমান। এর মধ্যে প্রথম লক্ষণটিই বুদ্ধির পরিমাপের পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

থার্সটোন্ (Thurstone) বুদ্ধিকে বিচার করেছেন সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে, তিনি বলছেন "বুদ্ধি হ'ল, সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজের উপযোগী করে কাজে লাগাবার ক্ষমতা"—"the capacity for making the instincts socially advantageous"। থার্সটোন্ থর্ণডাইকের বুদ্ধির একাধিক উপাদান তত্ত্বে (Muti-factor) বিশ্বাসী। পরীক্ষার ফলে তিনি বুদ্ধির আটটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বাধীন উপাদান আবিষ্কার করেছেন, তাদের তিনি নাম দিচ্ছেন (১) ত্রি-তল বিশিষ্ট বস্তু বা স্থানের ধারণা করবার ক্ষমতা (space factor বা S) (২) সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা (Number factor বা N) (৩) বাক্যের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ ও ভাবগ্রহণের ক্ষমতা (Verbal comprehension factor বা V.) (৪) শব্দ সহজে ব্যবহারের ক্ষমতা (Word fluency বা W factor) (৫) স্মৃতি বা স্মরণ করে রাখবার ক্ষমতা (Memory factor বা M) (৬) আরোহ যুক্তির ক্ষমতা (Inductive

factor বা I) (৭) অবরোহ যুক্তির ক্ষমতা (Deductive factor বা D) (৮) দ্রুত বোধের ক্ষমতা (Flexibility and speed of closure factor বা F).

বিহেভিয়ারিষ্টরা বুদ্ধিকে দেহযন্ত্রের একটা কাজ বলে উল্লেখ করেছেন—তাঁরা বলতে চান বুদ্ধি হচ্ছে—"কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া"—"A function of the central nervous system" ।

এবিংহস (Ebbinghaus) বুদ্ধির একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন—তিনি বলছেন "বুদ্ধি হচ্ছে বিভিন্ন বস্তু ঘটনা বা গুণকে মনের মধ্যে সংযোগের সূত্র দিয়ে সমন্বয়ের ক্ষমতা"—"The ability to combine or integrate" ।

স্পীয়ারম্যান্ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধির মধ্যে তিনটি ক্ষমতা যুক্ত হয়ে আছে (১) নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করবার ক্ষমতা "The ability to observe one's own mental processes." (২) প্রত্যক্ষলব্ধ বা চিন্তালব্ধ জ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে গভীর সম্বন্ধ আবিষ্কারের ক্ষমতা "The ability to discover essential relations between items of knowledge, either perceived or thought of." (৩) বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ স্থাপন (বিপরীত বা অনুরূপ) করবার ক্ষমতা 'The ability to educe correlates."

এই তিনটি ক্ষমতাকে তিনি জ্ঞান লাভের সূত্র (noegenetic laws). বলে বিবৃত করেছেন। এরা হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধির তিনটি প্রধান সূত্র। প্রথমটির কাজ হচ্ছে—অভিজ্ঞতার তাৎপর্যবোধ—apprehension of experience ; দ্বিতীয়টির কাজ হচ্ছে সম্বন্ধ নির্ণয়—eduction of relations ; তৃতীয়টির কাজ হচ্ছে,—কোন ঘটনা, দ্রব্য বা গুণের বিপরীত বা অনুরূপ বলিতে পারা—eduction of correlates (Spearman—The Nature of Intelligence P. 552).

বার্ট, স্টার্ণ বা গডার্ডের সংজ্ঞা, যে "বুদ্ধি নূতন অবস্থার সঙ্গে দেহ-মনকে মানিয়ে নেওয়া", এর বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে, যে এই মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা একটা অবিমিশ্র সহজ ক্ষমতা নয়—বরং বলা যায় নূতন কোন সমস্যা সমাধান করতে অনেক রকমের ক্ষমতা দরকার। তা ছাড়া সব রকম সমস্যা সমাধানের জন্যে ঠিক একই রকম বুদ্ধি লাগে না ; যেমন অঙ্কের কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে যে বুদ্ধি, নূতন গানের সুর লিখতে ঠিক সেই বুদ্ধিই কাজ

করে না। অবশ্য সাধারণ বুদ্ধি এ সব বিভিন্ন বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে কাজ করে তা ঠিক। কাজেই নূতন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও বুদ্ধি ঠিক এক জিনিষ নয় যদিও নূতন সমস্যা সমাধান করতে গেলেই বুদ্ধির দরকার। টারম্যান্‌এর সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (যা বস্তুবিবর্জিত নয়) তাৎপর্য গ্রহণ করতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। বুদ্ধি সর্বদা বস্তুবিবর্জিত বা abstract হতে হবে এমন নয়। তবে এটা অবশ্যই ঠিক যে বস্তুবিবর্জিত চিন্তার ক্ষমতা উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক এবং যার এ ক্ষমতাটি যত বেশী, তাকে তত বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন বলা চলে।

তাছাড়া চিন্তা যদি উদ্দেশ্যমুখী না হয় তা হ'লে তাকে বুদ্ধি বলা চলে না। স্পীয়ারম্যান্‌এর বুদ্ধির বিবরণ অনেক বিশদ এবং পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির থেকে অনেকটা ক্রটিমুক্ত। কিন্তু তাঁর বুদ্ধির প্রথম লক্ষণটি দ্বিতীয় লক্ষণ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন দ্রব্য, ঘটনা বা গুণের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলে নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। স্পীয়ারম্যান্‌ নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন "দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষমতা দুইটি, যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা গেছে, তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, তাদের সম্বন্ধেই 'বুদ্ধি' নাম বিশেষভাবে প্রযোজ্য।" আবার বলছেন "প্রথম ক্ষমতাটি স্পষ্টতঃই বুদ্ধির লক্ষণ বলে দাবী করার ক্ষমতা সবচেয়ে কম রাখে" (Spearman—The Nature of Intelligence P. 582)। স্পীয়ারম্যান্‌এর বিবরণে আর একটি ক্রটি রয়ে গেছে, তিনি যে ক্ষমতাগুলির কথা বুদ্ধির লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন তার একটা উদ্দেশ্য সাধন বা লক্ষ্য থাকা চাই, এ কথাটি তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি।

কাজেই সব কথা বিবেচনা করে আমরা বুদ্ধির নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিতে পারি। "উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী রচনাত্মক সংযোগী অন্বয়ীকরণের ক্ষমতাকে বলে বুদ্ধি"—"Intelligence is the capacity for relational constructive thinking, directed towards the attainment of some end." নীচের তিনটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের সংজ্ঞাটির উপযোগিতা বোঝা যাবে। এই তিনটি উদাহরণই এমন, যে সবাই স্বীকার করবেন যে এরকম কাজে বুদ্ধির দরকার এবং বুদ্ধির মাপ করতে এ রকম উদাহরণই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১। একটি শিশুকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, "সাপ, গরু ও চড়ুই পাখী এই তিনের মিল আছে কিসে?" এবং সে উত্তর করে "এদের সবারই

প্রাণ আছে,"—তাহ'লে সে ছেলে বুদ্ধিমান্। এখানে সে সম্বন্ধনির্ণায়ক, গঠনাত্মক ও উদ্দেশ্যমূলক চিন্তার পরিচয় দিয়েছে।

২। শিশুকে প্রশ্ন করা হোল, "ঠাণ্ডার উল্টো কি?" সে জবাব দিলে "গরম।" এ ছেলেকে বলি বুদ্ধিমান্। এ ক্ষেত্রেও পূর্ববৎ সম্বন্ধ নির্ণায়ক গঠনাত্মক চিন্তার (eduction of corretes) পরিচয় দিচ্ছে।

৩। শিশুকে প্রশ্ন করা হোল "বরফ হোল সাদা, তাহলে রক্ত কি?" সে বল্ল, "লাল।" এ ছেলেও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে,—এখানেও দেখতে পাচ্ছি সে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে এবং কোন গুণ বা দ্রব্যের অনুরূপ কি তা বলতে পারে। তার চিন্তা গঠনাত্মক ও উদ্দেশ্যমূলক। আমাদের সংজ্ঞার উপরোক্ত লক্ষণগুলি উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক সমস্ত জ্ঞান বা কর্মের বেলায় আরো বেশী প্রযোজ্য (Rex Knight—Intelligence and measurement of Intelligence P. 16)।

সংযোজনা—খ

বুদ্ধির প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পীয়ারম্যানের মত, এবং তার দ্বি-উপাদান তত্ত্বের আংকিক ভিত্তি—The concept of Intelligence according to Spearman and the mathematical basis of Spearman's theory—

বিনে বুদ্ধি পরিমাপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে তা প্রকাশ করেছিলেন ১৯০৫ সালে। কিন্তু তারও এক বছর আগে (১৯০৪) বৃটিশ সৈন্য বিভাগের মানুষ স্পীয়ারম্যান্ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সে প্রবন্ধের বিষয় General Intelligence objectively determined and measured। তখন এ প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

তখন একটা তর্ক চলেছিল—বুদ্ধি বহু কিনা এ নিয়ে। বিনে বলেছিলেন, বুদ্ধি কতগুলি বিচ্ছিন্ন মানসিক শক্তি, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই—কাজেই কোন মানুষ হয়তো অঙ্কে খুব বড় পণ্ডিত হতে পারেন; কিন্তু সংসারিক ব্যাপারে তিনি নিতান্ত নির্বোধ। থর্ণডাইক বিনে'র এ মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না। তিনি স্বীকার করলেন বুদ্ধি কতকগুলি বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে বুদ্ধির মধ্যে কোন যোগই নেই এটা তিনি মানলেন না।

তিনি বললেন, অঙ্কে বুদ্ধি যার আছে সে ছেলে পদার্থবিদ্যা ও স্থপতিবিদ্যায়ও ভাল হবে কিন্তু এ ছেলে হয়তো গান বাজনায় খুব পটু হবে না। কাজেই বিভিন্ন বুদ্ধি একেবারেই বিচ্ছিন্ন একথা ঠিক নয়। অল্প কয়েকরকমের বুদ্ধি আছে—হাজারো রকমের আলাদা আলাদা বুদ্ধি নেই। বুদ্ধির বিভিন্ন রকমকে থর্ণডাইক সংক্ষেপে নামকরণ করলেন CAVD (completion, arithmetic, vocabulary and following direction.)

স্পীয়ারম্যানের কাছে এ দুটো মতের একটাও মনঃপূত হোল না। তাঁর মত হোল বিভিন্ন বুদ্ধির মধ্যে একটি সমন্বয়ীশক্তিই কাজ কচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে এ শক্তি জন্মগত ও প্রায় অপরিবর্তনীয় তবে বিভিন্ন ব্যক্তিতে এই বুদ্ধির পরিমাণ বিভিন্ন। বিভিন্ন ব্যাপারে একই ব্যক্তি সমান বুদ্ধির পরিচয় দেয় না—তা সত্য। কিন্তু এই বিভিন্ন ব্যাপারে মূলগত একই বুদ্ধি ক্রিয়া করে। একে তিনি বললেন 'g' (general ability)। বুদ্ধির কতগুলি বিশেষ শক্তিও তিনি স্বীকার করলেন—তাদের বললেন, 's'—special abilities। 'g'কে আলাদা মাপা যায় না। তা সর্বদা 's' গুলির সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করে। বুদ্ধির সম্বন্ধে তাঁর এই সিদ্ধান্ত দ্বিতত্ত্ব মতবাদ (two factor theory) নামে খ্যাত। তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে বহু পরীক্ষায় রত হয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা নানা জায়গায় পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। স্পীয়ারম্যান্ এসব পরীক্ষার ফল গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল প্রথমতঃ 'g'র ক্ষেত্রের প্রকৃত বিস্তার নির্ধারণ করা, এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ক্রিয়া ও কৌশলের মধ্যে 'g' এবং 's'এর সম্বন্ধ ও তাদের কার কতটা গুরুত্ব তা নির্ণয় করা। অঙ্কে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল তাই 'g' আর 's' এর সম্বন্ধটা আঙ্কিকভাবে তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন। কতকগুলি ফল নীচে দেওয়া হোল—

অঙ্কে—(Mathematics) সাফল্য sএর চেয়ে 'g'এর ওপর ৯ গুণ বেশী নির্ভরশীল।

বিভিন্ন প্রাচীন ভাষায় (classics) সাফল্য 's'এর চেয়ে 'g'এর ওপর ৯'৫ গুণ বেশী নির্ভরশীল।

যুক্তিতে (correct inference) সাফল্য 's'এর চেয়ে 'g'এর ওপর ৪ গুণ বেশী নির্ভরশীল।

সঙ্গীতে (music) সাফল্য 's' এর চেয়ে 'g' এর ওপর ৩ গুণ বেশী নির্ভরশীল

অংকনে (drawing) সাফল্য 's' এর চেয়ে 'g'র উপর ½ গুণ বেশী নির্ভরশীল

অর্থাৎ সমান আগ্রহ ও সুযোগ যদি দুই ক্ষেত্রে থাকে তবে অংক বা বিভিন্ন ভাষায় সাফল্য সঙ্গীত বা অংকনে সাফল্যের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধির নির্দেশক।

'g' ই যে বুদ্ধি পরিমাপের মাপকাঠি, সমস্ত বিভিন্ন ক্ষমতার s-এরমধ্য দিয়ে 'g'-ই যে ক্রিয়া করে, তা তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত ভাবে বুঝলেন। তিনি বার্কসায়ারের ছোট এক গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষমতা নিয়ে পরীক্ষা করলেন। একই রকম দেখতে অথচ বিভিন্ন ওজনের টুকরো তারা ওজন অনুযায়ী পরপর সাজালো, নানা রকমের মজার ধাঁধাঁর উত্তর দিল, কতগুলি বাক্যের মধ্যে স্বতঃবিরোধিতা (absurdities) তারা ধরিতে পারে কিনা তা দেখা হোল, বাক্যের মধ্যে ফেলে যাওয়া কথা (missing words in sentences) তারা পূরণ করল। ঠিক এই পরীক্ষাই তিনি একই বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে করলেন হ্যারোর প্রিপ্যারেট্যরী বিদ্যালয়ে। দুই ক্ষেত্রে একই রকম ফলই তিনি পেলেন।

তাঁর আংকিক পদ্ধতিটি যথেষ্ট জটিল। তবে তার মোটামুটি কথা হচ্ছে দুটি সম্পূর্ণ আপাতবিভিন্ন ক্ষমতা বা নৈপুণ্যের পশ্চাতে যদি একই সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ক্রিয়া করে, তবে একটি বিষয়ে ছাত্রদের উঁচু, নীচুর পর্যায়-ক্রম (যেমন—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি) অন্য বিষয়েও একই হবে। অর্থাৎ বীজগণিত শেখা ও সংস্কৃত শেখা এদুয়ের মধ্যে যদি একই সাধারণ বুদ্ধি ক্রিয়া করে, তবে বীজগণিতের ক্লাসে যে ছেলেরা প্রথম, দ্বিতীয়, সংস্কৃতের ক্লাসেও সে ছেলেরা প্রথম দ্বিতীয়ই হবে। এই দুই নৈপুণ্যের মধ্যে যদি সমতা থাকে তবে তাদের সামঞ্জস্যের ইতিবাচক সম্বন্ধকে (correlation co-efficient) +১ বলে নির্ধারন করা হবে। আবার যদি এমন হয় যে বীজগণিতে যে প্রথম, সংস্কৃতে সে ছেলে একেবারে সকলের নীচে, তবে এ দুই নৈপুণ্যের মধ্যে সম্বন্ধ হবে—১। আর যদি এমন হয়, যে এক বিষয়ে নৈপুণ্যের পর্যায়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের নৈপুণ্যের পর্যায়ের কোনই নির্দিষ্ট সম্বন্ধ নেই তবে সেখানে correlation co-efficent হবে 0। +, ইতিবাচক ও —, নেতিবাচক সম্বন্ধ নির্দেশক। +·৫০ correlation co-efficientএর চেয়ে +·৭৫ correlation co-efficient দুই বিষয়ের মধ্যে নিকটতর সম্বন্ধ বোঝায়। স্পীয়ারম্যান্ প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে বিভিন্ন নৈপুণ্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছিলেন, এবং বহু তুলনামূলক পরীক্ষাদ্বারা তিনি এই নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তেই পৌছেছিলেন যে 'g' ও 's'-এর মধ্যে ইতিবাচক নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান।

নানা পরীক্ষার ফলে তিনি জেনেছিলেন যে স্বতঃবিরোধিতা বা অদ্ভুতত্ব ধরতে পারার ক্ষমতা (Detection of absurdities) (২) অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করবার ক্ষমতা (Completion test), (৩) শ্রেণী বিভাগ ক্ষমতা (Classification) (৪) বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ক্ষমতা (Inference) এবং (৫) সমতা দর্শনের ক্ষমতার (Analogies) মধ্য দিয়ে 'g' র পরিচয় সবচেয়ে বেশী পরিমাণে (saturated) পাওয়া যায়। স্পীয়ারম্যান এই 'g' কে সাধারণ বুদ্ধি নাম দিতে ইচ্ছুক নন। তিনি বলেন "সাধারণবুদ্ধি" কথাটা এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, এটার কোন নির্দিষ্ট অর্থই নেই।"

তিনি বহু অংক কষে 'g' এবং 's' এর সম্বন্ধকে বীজগণিতের একটি সমতার সূত্রে প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, $s = a_1g + a_2s$, where the letters a_1 and a_2 represent the "weights" or "loads" of the two factors g and s respectively . এবার কতগুলি বিশেষ ক্ষমতা special abilities ও তাহাদের মধ্যে মিলের পরিমাণ ছক কেটে সাজানো যাক। একে বলা হয় correlation matrix.

	a Definition	b Problem	c Classification	d Antonym	e Inferences
a. Definition	—	·56	·48	·40	·32
b. Problem	·56	—	·42	·35	·28
c. Classification	·48	·42	—	·30	·24
d. Antonym	·40	·35	·30	—	·20
e. Inferences	·32	·28	·24	·20	—

বীজগণিত দিয়ে এ ব্যাপারটা প্রকাশ করলে তার চেহারা দাঁড়াবে—(r মানে correlation co-officient.)

	a	b	c	d	e
a	—	rba	rca	rda	rea
b	rab	—	rcb	rdb	reb
c	rac	rbc	—	rdc	rec
d	rad	rbd	rcd	—	red
e	rae	rbe	rce	rde	—

এখানে rba = rab, rca = rac ইত্যাদি—

স্পীয়ারম্যান লক্ষ্য করলেন এই তালিকার পাশাপাশি আর ওপর নীচ চারটি ছক নিয়ে যে সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রটি তৈরী হোল তাতে কোণাকোণি ছকগুলির গুণফল সমান—"that the cross-products of any square block of four co-efficients were approximately equal।" উদাহরণ নেওয়া যাক্—

·48	·40
·42	·35

কোণাকোণি পূরণ করে ফল পাওয়া যাচ্ছে
$\cdot48 \times \cdot35 = \cdot40 \times \cdot42$. অথবা
$(\cdot48 \times \cdot35) - (\cdot40 \times \cdot42) = 0$

এই সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে স্পীয়ারম্যান্ বলেছেন tetrad আর তাদের কোণাকোণি ছকগুলির গুণফলের সমতাকে তিনি বলেছেন—the tetrad equation.

এখন বীজগণিতের ভাষায় তিনি ওপরের সমতাকে রূপান্তরিত করলেন। তখন ব্যাপারটা দাঁড়ালো—

প্রথম tetrad equation হল tab. cd = rac. rbd—rad. rbc = 0

দ্বিতীয় tetrad equation হল tab. cd = rab. red—rad. rbc = 0

তাঁর যুক্তির পরবর্তী অংশ হ'ল যে বুদ্ধি যদি 'g' এবং 's' এই দুই উপাদানের মিলিত গুণফল হয়, অর্থাৎ যদি $s = a_1g + a_2s$ এ সম্বন্ধটি সত্য হয়, তবে tetrad equation, rab. rcd—rad. rbc = 0 এটা সত্য হ'তে হবে। আর বিপরীতভাবে যদি a, b, c, d এই রকম চারটি বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে tetrad equation সত্য হয়, তবে equation $s = a_1g + a_2s$ও সত্য হতে হবে। অর্থাৎ তাহ'লে বুদ্ধি g আর s এই দুই উপাদানের গুণফল এবং তাদের সম্বন্ধ নিয়ে যে কথা স্পীয়ারম্যান্ বলেছেন তা সত্য।

এখন বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় এ সমতা দেখা যায় না। স্পীয়ারম্যান্ ও হোলংজিঙ্গার বহু গবেষণা করে এমন একটা পদ্ধতি বের করেছেন, যাতে বোঝা যায় এই tetrad equation যেখানে সত্য হ'ল না, সেটা কি পরিমাণে ক্ষমতাগুলির মধ্যে বাস্তবিক পার্থক্যের জন্য, আর কি পরিমাণে ত্রুটিপূর্ণ উদাহরণ নেবার জন্য (errors of sampling)।

বুদ্ধির উপাদানগুলি দল বেঁধে থাকে এই মতবাদ—Group-factor theory—স্পীয়ারম্যান্-এর আংকিক প্রমাণ এবং তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে বহু সমালোচনা হয়েছে। এই সমালোচকদের মধ্যে ব্রাউন ও টমসন-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টমসন্ বললেন, বুদ্ধি সম্বন্ধে যত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ হয়েছে তা স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান মতবাদ ছাড়াও ব্যাখ্যা করা যায়। একটা সাধারণ উপাদান সমস্ত বুদ্ধির মধ্যে কাজ হচ্ছে—এটা ঠিক নয়, বরং কতকগুলি ক্ষমতা যেন একসঙ্গে জোট বেঁধে আছে, এবং এ রকম কতকগুলি দল বাঁধা শক্তি (group-factor) বিভিন্ন চিন্তা বা ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই দলগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু তারা এক সাধারণ সূত্রে (general factor) দিয়ে বাঁধা এটা প্রমাণিত হয় না।* ভার্ণন ও বার্টের মতে নিম্নলিখিত শক্তির দলগুলি প্রধান—

(১) ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা—Verbal ability (২) সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষমতা—Numerical ability (৩) যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা—Mechanical ability (৪) সুর, তাল, লয় ইত্যাদি জ্ঞান—Musical ability (৫) যুক্তিপূর্ণ চিন্তার ক্ষমতা—Logical ability (৬) অনেকক্ষণ ধরে মাথার কাজ করবার ক্ষমতা—The capacity for sustained intellectual effort

*Brown & Thomson—The essentials of mental measurement. Thomson—The Factorial Analysis of Human Ability.

(৭) বিশেষ বিশেষ ধরনের স্মৃতিশক্তি—যেমন কেউ ভাল মনে রাখতে পারেন মানুষের নাম, কেউ বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ইত্যাদি। সাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা এখানে বলা হচ্ছে না—Certain forms of memory, not memory in general but ability to remember say, words, things or ideas (৮) এক ধরনের কাজের থেকে অনায়াসে অন্য ধরনের কাজ বা চিন্তায় নিজেকে নিয়োগ করবার ক্ষমতা—The ability to change quickly and effectively from one mental task or train of thought to another (৯) স্কুলের নানা ধরনের কাজ, যেমন সাহিত্যিক আলোচনা, বিজ্ঞানচর্চা, হাতের কাজ, এ সবের মধ্যে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের কতকগুলি বুদ্ধির সমষ্টি—The different group-factors that enter into different types of school-work—literary, scientific and manual.

নবম অধ্যায়

কাজ শেখা—পড়া শেখা

Learning : Laws of Learning

"মা গ্যাখোসে, দেবযানী কেমন নিজে নিজে হাঁটতে শিখেচে।"

"তিন দিন ধরে দীপককে পঞ্চম উপপাদ্য বোঝাচ্ছি—তবু শিখতে পারলো না।"

এ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছোট্ট দুটি টুকরো ঘটনা।

আমরা কাজ শিখি, পড়া শিখি। জীবন ভরেই আমরা শিখচি,—ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।

সুমিত্রা আই. এ. পাশ করেছে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ভাল নম্বর পেয়ে। এ বিজ্ঞানের কিছু সে শিখেছে। নতুন কতগুলি তথ্য সে জেনেছে। আগে সে এগুলি জানতো না।

সুনন্দা প্রথম দিন মাছ রান্না করতে গিয়ে, যে জিনিসটা কড়াই থেকে নাবিয়েছিল, সেটাকে "মশলা পয়োধিজলে" কৈ মাছের সাঁতার দেওয়া বলা চলে। এখন সে দিব্যি রাঁধতে শিখেচে। তেল, মশলা, লবণ এখন ঠিক ঠিক আন্দাজ করে দেয়, মাছগুলো ঠিক মতো সাঁতলায়, ঠিক সময়ে নাবায়।

"পাঁচ আর চারে কত হয়?" ঘোণা অম্লান বদনে উত্তর দেয় 'ছয়'। ধমক দিয়ে বললুম, "গাধা ছেলে, পাঁচ আর চারে হয়, নয়। বল, বারে বারে বল, "পাঁচ আর চারে হয়, নয়'।" এতক্ষণে তবে ঘোণা ঠিক উত্তর দিয়েছে,—"পাঁচ আর চারে—নয়'।" এতগুলো উদাহরণের মধ্য দিয়ে আমরা শেখা ব্যাপারটার কতগুলি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

শেখা মানে নূতন কিছু আয়ত্ত করা,—সেটা কতগুলো ভাবও (ideas) হতে পারে কতগুলি কাজের কায়দাও (skills) হতে পারে।

কিন্তু নূতন যা আয়ত্ত করা হচ্ছে—তার মূলে রয়েচে, পুরোনো অভিজ্ঞতা। সেই পুরোনো অভিজ্ঞতা আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে নূতন অভিজ্ঞতার দিকে। যা একেবারেই নূতন, যার সঙ্গে পুরোনো অভিজ্ঞতার কোন জায়গায় কোন

মিলই নেই—সে তো আমরা আয়ত্তই করতে পারতুম না। আবার নতুন যে বর্তমান অবস্থা (situation), তাও বদলে দিচ্ছে আমাদের পুরোনো অভিজ্ঞতাকে। নতুন ও পুরোনোর মধ্যে বোঝাপড়া করেই হয় শেখা। হারবার্ট (Herbart) একে বলেন এ্যাপারসেপ্‌স্যন্ (Apperception)।

যেটা শেখা হো'ল সেটা রয়ে গেল,—সেটা পরিণত হোল অভ্যাসে। শেখাটা শুধু একবার একটা কাজ হঠাৎ ঠিক করে করা নয়। যেটা শেখা হো'ল ভবিষ্যতেও সেটার ফল থাকবে। শেখার পেছনে থাকে দেহ-মনের একটা উপযুক্ত পরিণতি। সব কাজ সব বয়সের জন্য নয়। দু' মাসের শিশুকে দর্শন শেখানো যাবে না। তার মস্তিষ্কের স্নায়বিক উপাদানগুলি এখনও অস্পষ্ট, স্নায়বিক সংযোগগুলিও গড়ে ওঠেনি। তেমনি দু' মাসের শিশুকে সাইকেল চালানোও শেখানো যাবে না। তার পেশী ইত্যাদির উপযুক্ত পুষ্টি চাই। জেসেল্ তাই বললেন শিক্ষার পশ্চাতে থাকতে হবে উপযুক্ত দেহ-মনের পরিপক্বতা (Maturation)। এই পরিপক্বতা নিজের নিয়মে ভেতর থেকে ঘটতে থাকে, আর শিক্ষাটা আসে বাইরের থেকে কিন্তু তাকে গড়তে হয় ভেতরের এই স্বাভাবিক ভিত্তির উপর (Gessell-Maturation and infant behaviour pattern ; Marquis—The criterion of innate behaviour Psych. Rev. 1930, 37, 334-349)।

শেখার গোড়াতে থাকে অনেক ভুল (wrong responses)। শেখা মানে এই ভুলগুলি শুধরে নিয়ে ঠিক ঠিক কাজটি করা, elimination of wrong responses and the establishment of right ones in their place। অর্থাৎ গোড়াতে কাজটা হয় এলোমেলো ভাবে, দেরীতে। অনেকগুলি পেশীর প্রতিক্রিয়াগুলি সুবিন্যস্ত তখনও হয়নি। শিশু যখন গোড়াতে ভাত খেতে শেখে তখন গায়ে মাথায় ছিটিয়ে ছড়িয়ে অনাসৃষ্টি করে। সে তখনও তার হাতের আঙ্গুল, পেশী, মুখ, জিহ্বা ইত্যাদির সুষ্ঠু সমন্বয় করতে পারছে না। সে তখনও খেতে শেখেনি। প্রথম শিশু পড়তে শেখে, একটি অক্ষর শিখতে তার যায় দুদিন, বর্ণশিক্ষা, ফলা বানান শিক্ষা হ'য়ে গেলে সে ঘণ্টায় চার পৃষ্ঠা অনায়াসে পড়তে পারছে।

এবার তবে শেখার সংজ্ঞা দেওয়া যাক্। শেখা হচ্ছে, অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো—"profiting by past experience"। অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের ব্যবহারে যে পরিবর্তনের ছাপ লাগে, তাই হোল শেখা—"a change

in performance with practice।" কাজেই শেখা মানে নতুনকে আয়ত্ত করা। যা আয়ত্ত হোল তা ভবিষ্যতের ব্যবহারকে প্রভাবান্বিত করবে। তাই উডওয়ার্থ ও মারকিস্ শিক্ষা সম্বন্ধে বলছেন "যে জিনিষটা শেখা হল সেটা ব্যক্তির বিদ্যা বা দক্ষতার সঞ্চয়ে নূতন কিছু যোগ করে। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে শেখা মানে নূতন কিছু করা। সেই নূতন ক্রিয়াটা ব্যক্তির আয়ত্ত হওয়া চাই, যেন আবার পরেও সেই ক্রিয়াটি করতে পারে (Woodworth, Marquis-Psychology)।" ম্যাকৃগিয়োক্ শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক, এবং তা কোন গরজ বা আগ্রহকে মেটায় এ কথার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর সংজ্ঞা হচ্ছে শিক্ষা অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সম্ভবতঃ সব ক্ষেত্রেই, এই পরিবর্তনের গতি হচ্ছে ব্যক্তির বর্তমান কোন আগ্রহের পরিতৃপ্তি।" (Mc Geoch—The Psychology of human learning. Manual of Child Psychology-তে Munn-এর সংজ্ঞা ও দ্রষ্টব্য P. 373)।

মানুষ যেমন শেখে,—পশুরাও তেমনি শেখে। বানর নাচতে শেখে, মানুষের সহজ হাবভাব নকল করতে শেখে, সার্কাসের হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ নানা খেলা শেখে। এমন কি মাছদের মধ্যেও শেখার ব্যাপারটা দেখা যায়। মোবিয়াস্এর একটা পরীক্ষার উল্লেখ করা যাচ্ছে। পাইক্ মাছের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে ছোট মিনো মাছ। এক কাঁচের জলভরা চৌবাচ্চায় ছুটো পাইক্ মাছ আর কয়েকটা মিনো মাছ ছেড়ে দেওয়া হোল। কিন্তু ছুই দলের মাঝখানে একটা স্বচ্ছ কাঁচের দেয়াল দেওয়া হোল। মিনোগুলিকে দেখে পাইক্ ছুটি চঞ্চল হয়ে উঠল—বারে বারে তেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু প্রত্যেক-বারই দেয়ালে মাথা ঠুকে আঘাত পেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল পাইক্ ছুটি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। আর তাড়া করে যাচ্ছে না। ওরা "ঠেকে শিখল।" এবার কতক্ষণ বাদে মাঝের দেয়াল তুলে নেওয়া হ'ল। কিন্তু পাইক্দের ভয় আর কাটে না। যেখানে দেয়াল ছিল সেখান পর্যন্ত এসে আবার ফিরে যেতে লাগল। অনুরূপ আরো অনেক পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহেই করা যায় যে ইতর প্রাণীরাও শেখে।

বাস্তবিক পক্ষে থর্ণডাইক, এবিংহজ্, প্যাভ্লভ্ ইত্যাদি মনোবৈজ্ঞানিকেরা প্রথমতঃ পশুদের নিয়ে নানা পরীক্ষা করেই, মানুষের মধ্যে শেখার ব্যাপারটাও অনুরূপ নিয়ম অনুযায়ী ঘটে, এই সিদ্ধান্ত করেন। এর কারণ আছে। মানুষের মনটা অনেক বেশী জটিল, কিন্তু পশুর জীবন তুলনায় অনেকটা সরল।

তাই মনের প্রাথমিক বৃত্তিগুলির স্বরূপ জানতে গেলে পশুদের নিয়ে পরীক্ষায় সুফল লাভের আশা বেশী। অবশ্য, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য যে সাবধানতা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা করতেই হবে। এই পরীক্ষাগুলির ফলে শেখা সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত প্রচলিত হয় তাদের মোটামুটি তিনটি দলে ভাগ করা যায়। ১। সংযোগ সূত্রস্থাপন মতবাদ (Connectionism) ২। উত্তেজক সাহায্যে কৃত্রিম প্রক্রিয়া সৃষ্টি মতবাদ (Conditioned reflex) ৩। সমগ্রতা মতবাদ (Gestalt and the Field theory of learning)। প্রথম মতবাদের সুস্পষ্ট প্রচার করেন থর্ণডাইক, দ্বিতীয় মতবাদের আবিষ্কর্তা প্যাভ্লভ্, এবং তৃতীয় মতের সমর্থকদের মধ্যে কোয়হ্লার, কফকা ও লিউয়িন এর নাম উল্লেখযোগ্য।

১। যোগসূত্র স্থাপন মতবাদ—Connectionism or the bond theory of learning.

থর্ণডাইক চাইলেন, শেখার সরলতম মূল সূত্রটি আবিষ্কার করতে। বয়স্ক মানুষের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তি বা বুদ্ধি সচেতনভাবে কাজ করে। তাতে দেখা যায় একটানা মনঃসংযোগে) continued attention), ফল লাভের উদ্দেশ্যে, চেষ্টার বিবিধ পরিবর্তন (persistance with varied effort), এবং কতটা ফল লাভ হোল বা না হোল সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা (appreciation of relative success and failure)। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, সমগ্র অবস্থার বিচার করে অগ্রসর হওয়া, উচ্চতর শিক্ষার বিশেষত্ব। কিন্তু পশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এর অনেকটা অভাব। অনেক সময় মানুষের শেখার সঙ্গে তুলনা করে আমরা তাদের মধ্যেও বিচার বিবেচনা আরোপ করি। এটা ভ্রান্ত অবৈজ্ঞানিক নীতি। কতটা সরল ভাবে একটা ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় তাই বিজ্ঞানের চেষ্টা হওয়া উচিত। কাজেই তিনি চেষ্টা করলেন ইতর প্রাণীদের শেখার ক্ষেত্রে মননশীলতা বা বিবেচনা বাদ দিয়ে জিনিষটা ব্যাখ্যা করতে। তিনি কতগুলি পরীক্ষা করলেন—যেমন, একটা ক্ষুধার্ত বেড়ালকে খাঁচায় আটকে রেখে, বাইরে থেকে সে দেখতে পায় এমন জায়গায় খাদ্য রেখে দিলেন। খাঁচার দরজাটা একটা সহজ ছিট্‌কিনি দিয়ে আটকানো। প্রথমটায় বেড়াল এলোপাথারী ভাবে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছুটাছুটি সুরু করলে, খাঁচার ভেতর দিয়ে পা গলিয়ে বা আঁচড়ে, খিমচে খাঁচার বাইরে খাদ্যের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ

একবার থাবা দিয়ে ছিট্‌কিনি সে খুলে ফেল্লে এবং খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু আবার তাকে পাক্‌ড়ে খাঁচায় বন্দী করা হোল। আবারও সেই আগের বারের মতই আঁকুপাকু সুরু হোল; কিন্তু আগের মত অতটা সময় লাগলো না, এবার খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসতে। বারে বারে পরীক্ষা করে দেখা গেল, মোটামুটিভাবে ক্রমে ওর ভুলগুলি কমে আসতে লাগলো, এবং আরো কয়েকবার পরীক্ষার পর দেখা গেল,— ও আর ভুল না করে একবারেই খাঁচাটা খুলে বেরিয়ে আসতে পারছে। থর্ণডাইক এর থেকে সিদ্ধান্ত করলেন যে বেড়ালের শেখাটা বুদ্ধি বা বিচারগত নয়, বহুলাংশে আকস্মিক এবং যান্ত্রিক (mechanical) ব্যাপার। তিনি একে বলছেন **trial and error learning**—ঠেকে, ভুল সংশোধন করে শেখা এবং তিনি আরো এগিয়ে এ সিদ্ধান্ত করলেন যে মানুষের শেখাটাও মূলতঃ এই। Stimulus বা উত্তেজক এবং response বা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে **ঠিক ঠিক সম্বন্ধ স্থাপনের** নামই হোল শেখা establishment of the right response to the right stimulus। যেমন ৫ + ৪ এই উত্তেজকের ঠিক ঠিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ৯। এই ঠিক প্রতিক্রিয়াটি ঠিক শিখতে গেলে ভুল (যেমন ৭, ১২ ইত্যাদি)গুলি ঠেকে ঠেকে দূর করতে হবে। এটার মধ্যে মননশীলতা না স্বীকার করলেও চলে। বাস্তবিক পক্ষে বিহেভিয়ারিষ্ট মনস্তাত্বিকেরা মন বা অন্তঃকরণ (consciousness) জিনিষটাকেই বাদ দিয়ে মানুষের জীবনটাকে ব্যাখ্যা করতে চান। তাঁরা বলতে চান মানুষের সমস্ত জীবনটা হচ্ছে অসংখ্য উত্তেজক-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। আর শেখাটাও হচ্ছে তাই একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন মাত্র। কাজেই থর্ণডাইক বললেন, "শিক্ষা হচ্ছে উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিক সম্বন্ধটি স্থাপন। এটা ঠেকে ঠেকে ভুল শুধরে অগ্রসর হওয়া-রূপ, অন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়া।" (Thorndike. The Psychology of learning 1913)

Thorndike's Laws of Learning—

এ সব পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর করে থর্ণডাইক্ শিক্ষার তিনটি মূল সূত্র আবিষ্কার করলেন—এদের নাম দিলেন—(১) ফললাভের সূত্র (The law of effect), (২) পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্র (The law of exercise), (৩) উন্মুখতার সূত্র (The law of readiness)। এ তিনটি প্রধান সূত্র ছাড়া তিনি আরো পাঁচটি অপ্রধান সূত্রও আবিষ্কার করেন। এ সূত্রগুলি

শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান্। এ সূত্রগুলি হচ্ছে কতগুলি সাধারণ অবস্থা (common conditions), যা শেখার বেলায় দেখা যায়। কাজেই এগুলিকে শিক্ষার নিয়ম (Laws of learning) বলা হচ্ছে।

ক। **ফললাভের সূত্র—The law of Effect**—খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে ক্ষুধার্ত বেড়াল তার ক্ষুধার তৃপ্তি পাবে, তাই খাঁচা খুলতে সে শেখে। ছিটকিনিটি উপরে ঠেলে দিলে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় তাই সেই ঠিক কায়দাটি তার মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে। এই যে বিশেষ একটি কর্ম যা ফল লাভের সহায়ক, তা মনের মধ্যে সংযুক্ত হল, এরই নাম শিক্ষা—**establishment of a bond or connection between the stimulus and the right response**। যে কর্মগুলোর পরিণতি (responses) অসাফল্য বা নিরাশা বা বিরক্তি, তারা হোল ভুল, সেগুলি মন থেকে সরিয়ে দেওয়া হোল। যেটার ফল প্রীতিপ্রদ, সেটা স্বভাবতঃই বারে বারে করা হয়, ফলে সেটা মনে গভীর হয়ে বসে যায়, সেটা শেখা হয়, আর যেটার ফল অপ্রীতিকর, সেটা ছেড়ে দেওয়া হয়। এই হচ্ছে খুব সহজ কথায় ফললাভের সূত্র,—"একটার বেলায়, উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধটি মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে অন্যটির বেলায় প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধটি মন থেকে বাইরে ঠেলে ফেলা হয়"—**The one stamps in the connection and the other stamps it out.** পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদেরা এটা জানতেন, যে বারে বারে একটা কাজ করলে সেটা শেখা হয়। কিন্তু কেন একটা কাজ বারে বারে করা হয়, থর্ণডাইকের নিয়মে তার একটা মৌলিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ঘোণাকে জিজ্ঞাসা করা হোল ৫+৪ কত? সে উত্তর দিলে ৬। অমনি তার কপালে জুটলো বকুনী আর কানমলা। সে বুঝলে, এ উত্তরটা (response) ভুল, এটা সে ছেড়ে দিলে।

প্রাণীর পক্ষে কতগুলি জিনিষ স্বভাবতঃই তৃপ্তিকর (**original satisfiers**)। আর কতকগুলি জিনিষ স্বভাবতঃই অপ্রীতিকর (**original annoyers**), জৈব প্রয়োজনেই, যা সুফলপ্রদ তা স্বভাবতঃ তৃপ্তিকরও বটে, যা কুফলপ্রদ তা স্বভাবতঃ অপ্রীতিকর। যেমন ক্ষুধার্ত প্রাণীর পক্ষে খাদ্য প্রয়োজন ও প্রীতিপ্রদ, আবদ্ধ হয়ে থাকা অনিষ্টকর ও অপ্রীতিপ্রদ। তাই যা খাদ্য আহরণ দ্বারা ক্ষুধার তৃপ্তি দেয়, তা প্রাণী শেখে যা তাকে আবদ্ধ অবস্থায় ফেলে, তা সে এড়ায়। যা স্বভাবতঃই প্রীতিপ্রদ বা স্বভাবতঃ অতৃপ্তিকর এমন অবস্থা নিয়েই থর্ণডাইক প্রথম পরীক্ষাগুলি করেন, এবং যে নিয়মগুলি জীবনের

সর্বদাই ভুল করে টাইপ করতেন "hte"। তিনি একদিন ইচ্ছা করেই hte কথাটা বারে বারে একনাগাড়ে প্রায় দু'শো বার টাইপ করলেন। ফলে 'hte' তাঁর এমনি পীড়াদায়ক হোল যে ভবিষ্যতে 'the' টাইপ করতে তিনি কখনই আর hte লেখেন নি। শুধু মাত্র পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্র যদি এখানে কাজ করতো তা হ'লে 'hte' ভুলটা পুনরাবৃত্ত হওয়ার ফলে আরো পাকা হ'য়ে যেতো। ফললাভের সূত্র দিয়েই মাত্র ঘটনাটার সুব্যাখ্যা করা চলে।

গ। **উন্মুখতার সূত্র—The Law of Readiness**—ক্লাশে ইতিহাসের শিক্ষক প্রশ্ন করলেন "আওরংজেবের ছেলেদের নাম কর।" উৎসাহের সঙ্গে অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আমি বলি স্যার ?" শিক্ষক হেসে বল্লেন 'বলো'। অশোক উত্তর দিলে শাহআলম, আজম ও কমবক্স; শিক্ষক বললেন, "ঠিক ঠিক।" শিক্ষক এখানে অশোকের শেখবার জন্যে উন্মুখতাকে কাজে লাগালেন। তার ইতিহাস শেখায় আগ্রহ বাড়লো। এর থেকে থর্ণডাইক্ সূত্র আবিষ্কার করলেন, যে পড়াটা শেখার জন্যে বা যে কাজটা শেখার জন্যে মনটা প্রস্তুত হয়ে আছে, সেটা পড়বার বা শেখাবার সুযোগ পেলে, শেখার সাহায্য হয়। বিপরীত হ'লে বাধা হয়। আবার যেখানে মনটা প্রস্তুত নেই, সেখানে শেখানোর চেষ্টাটা অপ্রীতিপ্রদ এবং তাতে ভাল ফলও পাওয়া যায় না। থর্ণডাইক বললেন, "যখন দেহ-মন কোন একদিকে ক্রিয়ার জন্য উন্মুখ, তখন সে কাজটি করলে তৃপ্তি হয়। আবার যখন দেহ-মন কোন এক বিষয়ে উন্মুখ, তখন সে কাজটি করতে না পারলেও বিরক্তি ঘটে।"*

থর্ণডাইক উপরে যে তিনটি প্রধান সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তা ছাড়া আরো পাঁচটি অপ্রধান সূত্রের কথা বলেছেন। সেগুলি আলোচনা করা যাচ্ছে—

১। **একই উত্তেজকের বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র—Law of Multiple response to the same external stimulus**—আগুন দেখলে পশুরা ভয় পায়, আগুনের সামনে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রায় সব সময় একই রকম। কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আগুনকে সব সময় ভয়ের বস্তু মনে করে না।

* "When any conduction unit is in readiness to conduct, for it to do so, is satisfying. When any conduction unit is not in readiness to conduct, for it to conduct, is annoying. When any conduction unit is in readiness to conduct, for it not to do so is annoying."

অনেক সময় আগুন নিয়ে সে খেলাও করে এবং তাই আগুন সম্বন্ধে তার প্রতিক্রিয়া সব সময় একই রকম হয় না। একটা মানুষকে কিল মারলে সব সময় সে চটেই যাবে তার মানে নেই। (অর্থাৎ একই দ্রব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া উন্নত বুদ্ধির লক্ষণ, এবং অবস্থাভেদে প্রতিক্রিয়াগুলি পরিবর্তন করা শিক্ষার একটা অঙ্গ। একই উত্তেজকের (stimulus) সামনে বিভিন্ন প্রতি-ক্রিয়ার মধ্যে কোনটা বেছে নেওয়া হবে, সেটা ফল লাভের সূত্র বা পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার সূত্রের উপর নির্ভর করে।) যতই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, ততই সামান্য উত্তেজক ও বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করে। একটা কালো পাথরের নুড়ি দেখে ভূতত্ত্ববিদ্ একটা দেশ ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে ক্রমবিকাশের কোন স্তরে আছে—সে সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। "ক্রমবিকাশের স্তর বেয়ে যে প্রাণী যত উঁচুতে ওঠে ততই তার প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা ও বৈচিত্র্যও বেড়ে যায়। এতে তার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও বাড়ে। তাছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রেও যে প্রাণী যত উচ্চ স্তরে ততই উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে তার উত্তেজক সামান্য প্রয়োজন হয়।" বোকা গাধাকে দশ ঘা মোটা লাঠি মেরে তোমার বাগান থেকে তাড়াতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও অভিমানী মানুষের পক্ষে একটি মুখের কথাই যথেষ্ট।

২। **মানসিক অবস্থা বা প্রস্তুতির সূত্র—Law of attitude, set or disposition**—ঘন বর্ষায় ছুটির দিনে বন্ধ ঘরে আলসেমী করতে ভাল লাগে, আর কাজের তাড়া থাকলে, বর্ষায় বাইরে যাবার অসুবিধা হচ্ছে, তাই মন বিরক্ত হয়। খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত বেড়াল খাঁচার মধ্যে শুয়েই ঘুমুবে, আর ক্ষুধার্ত বেড়াল খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছট্‌ফট করবে। থর্ণডাইক বললেন "একটা উত্তেজকের সম্বন্ধে দেহ-মনের বর্তমান অবস্থা ও প্রস্তুতিই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটি নির্দেশ করে দেয়। প্রতিক্রিয়াটি সুখকর বা অতৃপ্তিকর হবে তা দেহ-মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে।"

আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র—The Law of partial activity—সেলাই কলে বসে সেলাই কচ্ছ, সেলাইটা ভাল হচ্ছে না। তোমার অভ্যস্ত চোখে ধরা পড়্‌ল সুতোটা টান পড়ছে, একটা স্ক্রু বেশী আঁট ব'লে। যতই শিক্ষা উন্নত হবে ততই সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধটার স্পষ্ট ধারণা হ'বে এবং কোন ব্যাপারের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ আর বিচ্ছিন্ন ও অর্থহীন থাকবে না—সমগ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। থর্ণডাইক বললেন,

"একটা অবস্থার একটা অংশ বা উপাদানই কখনো কখনো সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে সমগ্র প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করে, যদিও সমগ্র প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করবার সম্পূর্ণ অবস্থাটি উপস্থিত নাও থাকতে পারে।" কাজেই শেখানো মানেই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্বন্ধটা লক্ষ্য করতে এবং বুঝতে ছাত্রকে সাহায্য করা। গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানীরা বিচ্ছিন্ন অংশকে সমগ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখাকেই শিক্ষার সর্বপ্রধান লক্ষণ মনে করেন।

৪। **উপমানের সূত্র—The Law of Assimilation or Analogy**—একটা অর্কিড (orchid) প্রথম দেখছি, এর সঙ্গে পরিচয় নেই। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ বন্ধু বলে দিলেন, এটা একজাতীয় ফুল। তখন শেখা হোল। শেখা মানেই সমজাতীয় বা কতকটা এক ধরনের জিনিষ বা ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে মনের মধ্যে সংযুক্ত করা। থর্ণডাইক বলছেন, "এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়া অনুরূপ অবস্থা দ্বারাও সৃষ্টি হতে পারে—যদিও পূর্বে সে অবস্থা স্বভাবতঃ সে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত না।" পরবর্তী শিক্ষাবিদেরা একে কখনো কখনো কোরেলেসন (correlation) বলেছেন। হার্বার্ট বলেছেন, এ্যাপারসেপসান্ (apperception)।

৫। **The Law Associative Shifting**—ছোটকালে অঙ্কে ছিলুম কাঁচা আর অঙ্কের মাষ্টারমশাইও ছিলেন বড্ড বদ্‌মেজাজী। রোজই কপালে জুটতো চড়-চাপড়টা, অঙ্কের ক্লাসে। ফলে অঙ্কের মাষ্টারমশাইয়ের উপর যে বিতৃষ্ণা ছিল সেটা গিয়ে চাপলো অঙ্ক শাস্ত্রটার উপরেই। একটা ঘটনা স্বভাবতঃ একটা প্রতিক্রিয়া জাগায়। কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়াই জাগতে পারে সেই ঘটনার সঙ্গে নিয়ত সংযুক্ত কোন অবস্থার দ্বারাও। এই সূত্রটিকে প্যাভ্‌লভ্ বলেছেন—**দি কনডিসনড রিফ্লেক্স—The Conditioned reflex**—সেটা এর পরেই আলোচনা করব। থর্ণডাইকের সূত্র বলেচে—"এক অবস্থা দ্বারা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা সেই অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত অন্য অবস্থার দ্বারাও সৃষ্টি হ'তে পারে।"*

থর্ণডাইক তাঁর সূত্রগুলির মধ্য দিয়ে শেখা ব্যাপারটার সম্পূর্ণ যান্ত্রিক (mechanical) ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ কথা অনেক সময় বলা হয়। কিন্তু

* Thorndike—"A response may be shifted from one situation to another which is presented at the same time."

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তিনি শেখা জিনিষটা পশুদের স্তরে কি ভাবে হয় এ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে শেখার মূল সূত্র পশু এবং মানুষ সর্বত্রই এক। সচেতন বিচার বিবেচনা বাদ দিয়ে যতটা সহজে শেখা ব্যাপারটা বোঝা যায় সে চেষ্টা তিনি করেছেন। কিন্তু তার সূত্রগুলির মধ্যে কোথাও মননশীলতার কোন স্থান নেই এ কথা বলা চলে না। তার সমস্ত সূত্রগুলির মূল, ফললাভের সূত্র—যা ভাল লাগে তা আমরা শিখি, যা ভাল লাগে না, তা আমরা এড়াই। কিন্তু এই ভাল লাগা, মন্দ লাগা ঠেকে ঠেকে ভুলগুলি বাদ দিয়ে শেখা (trial and error learning), এটা কি সম্পূর্ণ অন্ধ জৈব ও যান্ত্রিক ব্যাপার ? এ কথা আমাদের মনে হয় না। শিশু এমন কি পশুর মধ্যেও শেখার ব্যাপারে একটা অপরিণত ও অস্পষ্ট বিচার-বুদ্ধি থাকে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কোয়হ্লার তাঁর 'মেণ্টালিটি অব এপস্' গ্রন্থে যে সব পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন তাতেও এ কথাটাই খুব জোর দিয়ে তিনি বলেছেন যে শিশুদের শেখার ক্ষেত্রেও একটা অন্তর্দৃষ্টি (insight) থাকে। সেটা সম্পূর্ণ অন্ধ যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। এ কথা আমরা গেষ্টল্ট মতবাদ আলোচনা করবার সময় দেখবো। তা ছাড়া থর্ণথাইক এর আংশিক ক্রিয়ার সূত্রতেও গেষ্টল্ট এর মূল কথাই স্বীকৃত হয়েচে, এই আমাদের ধারণা। গেটস্ ও থর্ণডাইকের সূত্রগুলির সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। এ বিষয়ে তিনি স্যাণ্ডিফোর্ডের সঙ্গে একমত নন।

কৃত্রিম উত্তেজকদ্বারা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি মতবাদ—The Conditioned Reflex or the Conditioning Theory of Learning.

১৯০০ সনের কাছাকাছি রাশ্যান্ শরীরতত্ত্ববিদ্ প্যাভলভ (Pavlov) কতগুলি কুকুরের উপর পরিপাকক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করছিলেন। সে সময় তিনি একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেন। খাদ্য জিবের সংস্পর্শে এলে, জিবে জল আসবে (salivation), এটা একটা স্বাভাবিক জৈব প্রক্রিয়া (natural reflex)। কুকুরগুলিকে খাদ্য দিলে তাদের জিবে জল আসে এবং সে জল কতটা, তা মাপবার তিনি ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দেখলেন খাদ্য জিবের সংস্পর্শে আসবার আগেই তার দৃষ্টিমাত্রেও কুকুরের জিবে জল আসে, খাদ্যের পাত্র দেখলেও তার জিবে জল আসে, এমন কি যে রোজ খাদ্য দেয়, খাবার নিয়ে আসবার সময় হলে সে লোকের পদশব্দেও কুকুরের জিব জলসিক্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য খাদ্য জিহ্বার সংস্পর্শে এলে যতটা জলসঞ্চার হয়, এ সব ক্ষেত্রে ততটা হয়

না। এ প্রতিক্রিয়ার তিনি নাম দিলেন, কন্‌ডিসন্‌ড রিফ্লেক্স। এটা স্বভাবজ প্রতিক্রিয়া নয়, এটা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট, এবং যে অবস্থায় স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটে থাকে তার সঙ্গে এই কৃত্রিম অবস্থা (condition) নিয়ত যুক্ত থাকাতে এটা ঘটে,—"স্পষ্টতঃই এই প্রতিক্রিয়াটি জন্মগত নয়—আয়ত্তীকৃত, এবং যে অবস্থায় প্রাণীটিকে খাদ্য দেওয়া হয়েছে, তার উপর নির্ভর কচ্ছে। প্যাভ্‌লভ্‌ তাই একে পরিবর্ত অবস্থার উপর নির্ভরশীল ক্রিয়া বা কন্‌ডিসন্‌ড রিফ্লেক্স বলতেন।" * কিন্তু রিফ্লেক্স বা তৎক্ষণাৎ-প্রতিক্রিয়া কথাটার একটা নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বা সংকীর্ণ অর্থ রয়েছে, তাই অনেক এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়াকে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া (conditioned response) বলবার পক্ষপাতী।

প্যাভ্‌লভ্‌ এ নিয়ে আরো পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন যে খাদ্যের সঙ্গে সাধারণতঃ যে জিনিষের কোন সম্বন্ধ থাকে না, এমন অবস্থা ও (condition) যদি খাদ্যের সঙ্গে বারে বারে উপস্থিত থাকে, তা হ'লে অনেকবার পরীক্ষার পর সে অবস্থা, খাদ্যের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, খাদ্য যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো, তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়: যেমন কুকুরটিকে যখনই খাবার দেওয়া হয় তার ঠিক আগেই এক ঘণ্টা বাজানো হ'তে লাগল। এটা বারে বারে অনেকবার করা হোল। ঘণ্টা—খাদ্য জিবে জল আসা—এ একটি সম্পর্ক দৃঢ় ভাবে কিছুদিন পর গড়ে উঠল। এবার কিছুদিন বাদে দেখা গেল,—যখনই সে ঘণ্টা বাজছে তখনই কুকুরের জিবে জল এসে গেছে,—তারপর খাবার না এলেও। অর্থাৎ "ঘণ্টা" এই কৃত্রিম অবস্থাটাই (condition) এবার খাদ্যের বিকল্প উত্তেজক (substitute stimulus) হিসাবে কাজ করতে লাগল। অনুরূপভাবে খাদ্য দেবার আগেই একটি লাল আলো জ্বলে উঠত। একদিন, দুদিন, পাঁচদিন, দশদিন এরকম চলল—লাল আলো—খাদ্য—জিবে জল আসা। এবার দেখা গেল, লাল আলো জ্বলে উঠলেই কুকুরের জিবে জল আসছে।

প্যাভ্‌লভ এর থেকে সিদ্ধান্ত করলেন, শেখা জিনিষটাই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি (conditioning)। যে প্রতিক্রিয়াটি আমরা চাই—সেটা একটা বিকল্প অবস্থা দ্বারা সৃষ্টি করবার অভ্যাসকেই আমরা বলি শিক্ষা। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে অভ্যাস দ্বারা কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ করাও শিক্ষার অঙ্গ। যেমন ঘোড়া হঠাৎ উচ্চ শব্দে চকিত হয়ে দৌড় দেয়,—এটা তার স্বাভাবিক

*Woodworth—"It was obviously an acquired, response, dependent on the conditions under which the animal had been fed. Pavlov therefore called it a "conditioned retflex" Psychology. P. 333.

প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যুদ্ধের ঘোড়া যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা-বারুদের শব্দে ভয় না পায়, সে জন্যে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। হঠাৎ শব্দ শুনে ঘোড়া লাফিয়ে উঠলেই কড়াভাবে লাগাম কষা হয়, আর তৎক্ষণাৎ চড়াৎ করে পিঠে পড়ে নিষ্ঠুর চাবুক। বারে বারে এ অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হ'লে, ঘোড়া শিখবে যে উঁচু শব্দ হ'লেই দৌড় দিতে নেই। ভয়ে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তার থেকে তাকে মুক্ত করা হোল—এ হোল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রোধ (deconditioning)। কাজেই শেখা জিনিষটা হচ্ছে—কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস আর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রোধ। (conditioning বা deconditioning)। সুশিক্ষকের কাজ হবে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়াটি অভ্যস্ত করে দেওয়া (conditioning) আর অ-বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটি রুদ্ধ করিতে ছাত্রকে অভ্যস্ত করা (deconditioning)। ঘোনা যখনই বলে ৫ + ৪ = ৯ তখনই বলি "বাঃ" পিঠ চাপড়ে দি। ঘোনা ক্রমেই বুঝতে শেখে—পড়াশোনা শেখাটা ভাল। পড়াশোনা শেখা, ৪ + ৫ = ৯ বলা একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নয়, কিন্তু প্রশংসা পেলে খুসী হওয়াটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, শাস্তি পেলে বিমুখ হওয়া স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কৃত্রিম উত্তেজকটার গাঁট-ছড়া বেঁধে দিলে শিক্ষার কাজ এগোয়। অহেতুক ভয় শিশুর মনে বাসা বাঁধে কুশিক্ষার জন্যে—ভুল কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির (wrong conditioning) জন্যে। আদিম শিশু অল্প কয়েকটি অবস্থায়ই মাত্র স্বাভাবিক ভাবে ভয় পায়, যথা হঠাৎ শূন্যে ছেড়ে দেওয়া (sudden loss of support), হঠাৎ উঁচু শব্দ করা (sudden loud sound) ইত্যাদি। অন্ধকারে স্বাভাবিক ভাবে শিশু ভয় পায় না। কিন্তু অন্ধকারে "জুজুর ভয়" বড়রাই শিশুদের মনে ঢুকিয়ে দেয়। অন্ধকারে হঠাৎ যদি শিশুকে চমকে দিয়ে বলা হয় "ঐ জুজুবুড়ী" তা হ'লে অল্প কিছুদিনেই শিশু অন্ধকারকে ভয় করতে শেখে। এ অন্যায় ভয়টা ভেঙে দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য। সেটা এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মূল-সূত্র ধরেই করা সম্ভব। আবার যেখানে বিরত হওয়া উচিত (যেমন, আগুন থেকে দূরে থাকা বা শিশু আরো বড় হ'লে, পরের জিনিষ না নেওয়া) সেখানেও তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (যেমন, আগুনের দিকে হাত বাড়ান বা পরের জিনিষ নেওয়া) বন্ধ করাও শিক্ষার একটা অঙ্গ। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সূত্রটি মূল্যবান। বার্টরাণ্ড রাসেল্ (Bertrand Russell) মনে করেন বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখের মূল, অহেতুক ভয় এবং তার থেকেই উৎপন্ন নির্মমতা।

তাই তিনি শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে মিথ্যা ভয় দূর করাটা একটা প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। আলডুস্ হাক্সলী (Aldous Huxley) অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অতিরিক্ত মূল্য দানকে তাঁর "The Brave New World" উপন্যাসে তীব্র পরিহাস করেছেন।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। কন্‌ডিসনড রেস্‌পন্সটা কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া এবং এটার প্রভাব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মত অতটা স্থায়ী হয় না। যে কুকুরটার লাল আলো জ্বলে উঠলেই জিবে জল আসা অভ্যাস হোল,—যদি ক'দিন উপর্যুপরি লাল আলোর পরেই খাদ্য না দেওয়া হয়, তা হ'লে লাল আলো কদিন পরে আর জিবে জল আনা প্রতিক্রিয়া ঘটাবে না।

প্যাভ্‌লভ্‌ এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকে শিক্ষার মূলসূত্র বলে মনে করেন। বিহেভিয়ারিষ্টরা প্রথমে প্যাভলভ্‌ এর সূত্রকে স্বীকার না করলেও, ক্রমে এটার মূল্য দিয়েছেন এবং তারা মনে করেন—মানসিকতা (consciousness বা subjectivism) আমদানী না করেই এ সূত্র দিয়ে যান্ত্রিকভাবে শিক্ষা জিনিষটার ব্যাখ্যা করা যায়।

একথাটা আমাদের ঠিক মনে হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টিই একমাত্র সূত্র, এটা মেনে নেওয়া কঠিন। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিশ্চয় মস্ত বড় স্থান আছে। তা ছাড়া এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টির কার্যকারিতা নির্ভর করে পুনরাবৃত্তি (repetition) এবং সুফল লাভ (satisfaction) এর উপর। লাল আলোর পরে বারে বারে ক্ষুধার তৃপ্তি হয়, তাই না লাল অলো কুকুরের কাছে স্বাভাবিক উত্তেজকের বিকল্পের স্থান নিতে পেরেছে। তাই বলা যেতে পারে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সূত্রকে ফললাভের সূত্র ও পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সমগ্রতা মতবাদ-The Field or the Gestalt theory of learning—

শিম্পাঞ্জী নিয়ে কোয়হ্‌লার পরীক্ষা করেছিলেন বানরের বুদ্ধি সম্বন্ধে। একটা বড় তারের ঘরে রয়েছে শিম্পাঞ্জী। তার ঘরের বাইরে কিছু দূরে দেওয়া হল তাকে দেখিয়ে তার প্রিয় খাদ্য, কলা। তার ঘরে রেখে দিলেন দুটো বাঁশের কাঠি তার মধ্যে একটা বড়, আর একটা ছোট। এর মধ্যে আলাদা কোনটা দিয়েই কলাটা নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু বড় কাঠিটার মধ্যে ছোট কাঠিটা কিছুটা ঢুকিয়ে জোড়া দেওয়া যায়। তাহ'লে বেশ একটা লম্বা লাঠি তৈরী হয়। শিম্পাজী প্রথমতঃ কলা দেখে অস্থির হয়ে তার

ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তার দৃষ্টি পড়ল কাঠিগুলির দিকে। সে প্রথম তারের ফাঁক দিয়ে একটা কাঠি ঢুকিয়ে চেষ্টা করতে লাগল কলাটাকে টেনে আনতে। তারপর আরেকটা কাঠি দিয়ে চেষ্টা করল। বারে বারে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে, সে যেন হাল ছেড়েই খাঁচার এক কোণে নিরাশ হয়ে বসে রইল। আবার কিছুক্ষণ পরে, সে কাঠি দুটো নিয়ে পরীক্ষা করতে সুরু করলে। অল্পক্ষণ সেগুলি নাড়াচাড়া করে হঠাৎ নিতান্তই অকস্মাৎ সে ছোট কাঠির ডগাটা বড় কাঠিটির ফাঁকে গুঁজে দিলে এবং দৌড়ে গিয়ে এবার জোড়া দেওয়া বড় লাঠিটা দিয়ে কলাটা ঘরে টেনে নিয়ে খেয়ে ফেল্ল। পরদিন আবার একই পরীক্ষা করা হল। কিছুক্ষণ লাঠিগুলি নাড়াচাড়া করেই শিম্পাঞ্জী ঠিক ঠিক কাঠি দুটিকে জুড়ে নিয়ে কলাটা টেনে নিলে।

এবার ঘটনাটার ব্যাখ্যা করা যাবে কি করে? এটা সম্পূর্ণ বিচার বিবেচনা-শূন্য যান্ত্রিক পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার ফল নয়। পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্র দিয়ে তাই এর ব্যাখ্যা চলে না। ঠেকে শেখাও (trial and error learning) এটা নয়, —বারে বারে টুক্‌রো টুক্‌রো করে শেখাটা এখানে হচ্ছে না। হঠাৎ একটা আলোর ঝলকের মত যেন সমগ্র অবস্থাটা পরিষ্কার করে বুঝতে পেরেছে শিম্পাঞ্জী; হঠাৎ যেন অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পেরেছে— a sudden flash of insight। এটা বিচার বুদ্ধিগত যুক্তিমূলক চিন্তার (logical thinking) ফল নয়। তবু এটা একেবারে অন্ধ যান্ত্রিক ব্যাপারও নয়। স্যাণ্ডিফোর্ড থর্ণডাইকের শিক্ষার সূত্রকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে এ শেখার পদ্ধতিকে অন্ধ ও যান্ত্রিক মনে হয়। গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানীরা এজন্যে এ পদ্ধতিকে নিন্দা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এতে মনে হয় যেন পরীক্ষা করে করে যে শেখা হয়, তাতে সমস্যার সমাধানটা নিতান্তই আকস্মিক ভাবে, হঠাৎ দেখা দেয়। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয়। উডওয়ার্থ থর্ণডাইকের পরীক্ষা আর ভুল করে শেখা (trial and error learning) ব্যাপারটাকে ব্যবহার-বাদীদের দৃষ্টিতে উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়া (stimulus-response) সূত্র দিয়ে নূতন করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে দেখা যায় শিক্ষার মধ্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতা, এবং সাফল্য ও অসাফল্য বোধের ফলে পদ্ধতির পরিবর্তন, এদুটি লক্ষণ থাকে। শিক্ষার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে, তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি স্তর দেখিয়েছেন।

১। একটা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মনের প্রস্তুতি ২। উদ্দেশ্য পর্যন্ত

সমস্ত পথ পরিষ্কার দেখতে না পারা ৩। সমস্যা-সমাধানের জন্যে অবস্থাটার চারিদিক অস্পষ্টভাবে ঘুরে দেখা ৪। অস্পষ্ট বিচার দ্বারাই হোক্, আর আকস্মিক ভাবেই হোক্, কোন একদিকে একটু পথের ইঙ্গিত পাওয়া ৫। এ ইঙ্গিত অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার অপটু চেষ্টা ৬। কোন একটা পথ ব্যর্থ হলে, সে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথের ইঙ্গিত ধরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা ৭। সর্বশেষ একটি সফল পথের অনুসন্ধান এবং সে সূত্র ধরে উদ্দেশ্যে পৌঁছা। প্রাণী স্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যে পৌঁছাবার পথ যখন পায় না, তখনই পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন করে শিখবার রীতি গ্রহণ করে। সে হিসাবে কিছুটা 'অন্ধতা' আছে এ পদ্ধতিতে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। কতদূর এগিয়ে গিয়ে অনেক সময় পেছনের পথটার তাৎপর্য সে বুঝতে পারে। একেই উডওয়ার্থ বলেছেন পশ্চাৎ দৃষ্টিতে (hindsight)।*

সমগ্রতা তত্ত্বে বিশ্বাসী মনস্তত্ত্ববিদ্ যাঁরা, তাঁরা বলেন শেখা ব্যাপারটা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার টুক্‌রো জোড়া দিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে, এটা ঠিক নয়। একটি মুখের চেহারা যখন দেখি, তখন চোখ, মুখ, নাক, কান, ভুরু, চুলগুলো আগে আলাদা আলাদা করে দেখে, পরে সেগুলিকে একত্র করে সমস্ত মুখখানা বুঝি না। গান যখন শুনছি, তখন কি আলাদা আলাদা তাদের সুরগুলিকে জোড়া দিয়ে গানটাকে বুঝছি ? তা নয়। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাই একটা সমগ্রতা নিয়ে আমাদের সামনে আসে। প্রথম অবস্থায় হয়তো সে সমগ্রতা অস্পষ্ট, ধীরে ধীরে তার অংশগুলোকে বিশ্লেষণ করে সবটার একটা স্পষ্ট ধারণা করি। কিন্তু অংশের সঙ্গে অংশের যোগ করে, সেই সমগ্র অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না। গানটা, গানের সবগুলি বিচ্ছিন্ন সুরের যোগফল মাত্র নয়। তার একটা সামগ্রিক রূপ আছে। এই মতবাদের নাম গেষ্টল্ট (Gestalt) কারণ গেষ্টল্ট এই জার্মান কথাটার মানে হচ্ছে রূপ বা form। সমস্ত অভিজ্ঞতারই একটা সামগ্রিক রূপ আছে—বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপটি ঠিক আমরা ধরতে পারি না। ফন্ এহ্‌রেন্‌ফেলস্ (Von Ehrensels) বলেছিলেন, "সমগ্রের একটা সম্পূর্ণ রূপ আছে যা তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে থাকে না।" একটা গান যে সুরে প্রথম গাওয়া হল তারপর হয়তো তার উঁচু স্কেলে এটা গাওয়া হোল, তাতে গানের প্রত্যেকটি সুরের পরিবর্তন ঘটলেও, তার রূপ বা from-টা বদলে গেল না,—আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না, এ একই গান। কোন

* Woodworth & Marquis—Psychology.

একটা অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন অংশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, নিজের জোরে নয়—সমগ্রের সংগে সংযুক্ত হয়ে। বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলোকে একটা সমগ্রতার কাঠামোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট করে দেখার নামই শিক্ষা। সে জন্যে শেখা জিনিষটাকে তাঁরা বলেন প্যাটার্ণ সৃষ্টিদ্বারা রূপসৃষ্টি (pattern forming বা configuration)। আকাশের কতকগুলো তারার সমষ্টিকে কল্পনা করা গেল এক বিরাট পুরুষ, মাথা হেলিয়ে, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন, কোমরে তার মণিময় কটিবন্ধ, তাতে লম্বিত দীপ্ত তরবার; জানলুম কাল-পুরুষকে; যেখানে ছিল রূপহীন বিচ্ছিন্নতা তা গ্রথিত হল একটা সুঠাম সমগ্রতায়। শিক্ষার কাজই হচ্ছে 'সূত্রে মণি গণাইব'—বহুকে একের মালায় গেঁথে, সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা। অথবা কথাটা ঠিক হোল না, কারণ শিশুর মনের অভিজ্ঞতাগুলো তো বিচ্ছিন্ন বহু মাত্র নয়,—সেগুলোও তো গোড়া থেকেই একটা অস্পষ্ট সমগ্রতা নিয়েই শিশুর মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরেছে, শিক্ষক সেই অস্পষ্ট সমগ্রতাকে স্পষ্টতর করে তুলবেন—সংকীর্ণ সমগ্রতাকে বৃহত্তর সমগ্রতার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

যখন এই সমগ্রের রূপটা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে হঠাৎ দেখা দেয়, তাকেই বলা হয় অন্তর্দৃষ্টির হঠাৎ আলোর ঝলকানি-a flash of insight। এই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের সামনের পথটা দেখিয়ে দেয়। আমরা খুসী হয়ে বলি, 'ওঃ বুঝেছি'—'Eureka, Eureka'! তাই একে আমরা অগ্র-দৃষ্টি ও (foresight) বলতে পারি। কিন্তু সমগ্র সমস্যাটা আমাদের কাছে আলোকোজ্জ্বল হয়ে সামনের সবটা পথ নাও দেখাতে পারে। হয়তো হঠাৎ কিছুটা এগিয়ে পিছনের পথটা বুঝতে পারি, সমগ্র সমাধানটার কিছু একটা অস্পষ্ট ধারণার পথ ধরে কিছুটা এগুতে পারি, ক্রমে ক্রমে শেষ সমাধানে পৌঁছতে পারি। কিন্তু সমগ্রতার রূপটাও ক্রমে বদলে যাচ্ছে। যেন একটা ভাঙ্গা ছবি ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হয়ে আসচে। প্রথম ধারণার অস্পষ্টতা শিশুকে উৎসাহ জোগাচ্ছে স্পষ্টতর ধারণার পানে অগ্রসর হ'তে। এরি নাম তো আলোকের পথে, ভূমার পথে অভিযান। "যখন ব্যক্তি একটা অবস্থা সমগ্রভাবে দেখে কিছু শেখে, তখন সে শিক্ষাকে বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি-পূর্ণ শিক্ষা। সমস্যা সমাধানের বেলায় এই অন্তর্দৃষ্টির মানেই হচ্ছে সমগ্র সমাধানটা হঠাৎ যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে।" উড-ওয়ার্থ বলছেন, "এই অন্তর্দৃষ্টি যাকে বলা হচ্ছে, তা কখনও বা অগ্র-দৃষ্টি (foresight), কখনও বা পশ্চাৎদৃষ্টি (hind-sight)। শিম্পাঞ্জী যখন ছুটো

কাঠি জোড়া দিয়ে খাঁচার সামনের দিকে কলাটা পাড়বার জন্যে দৌড়ে গেল, তখন সেটা হচ্ছে অগ্রদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। অগ্রদৃষ্টির ফলে উদ্দেশ্যে পৌঁছবার পথে অগ্রসর হওয়ার আগে পথটা দেখা যায়, আর পশ্চাৎ-দৃষ্টি হচ্ছে একটা পথ ধরে কতটুকু অগ্রসর হয়ে বোঝা যায় যে ঠিক পথেই যাওয়া হচ্ছে। যখন একটা সমস্যার সবটাই সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাবে সামনে ধরা আছে, সেখানে জীবের পক্ষে অগ্রদৃষ্টি সম্ভবপর, কিন্তু যেখানে সমস্যার মূল ও প্রয়োজনীয় অংশগুলি ছবির বাইরে গোপন রয়েছে সেখানে জীবের বড় জোর কিছুটা পশ্চাৎদৃষ্টি থাকবে, এ আশা করতে পারি।" হার্টম্যানের ভাষায় শিক্ষা ব্যাপারটা হচ্ছে "একটা অসম্পূর্ণ চিত্রকে সম্পূর্ণ দান করা। চিত্রটা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না, বলেই 'সমস্যা'র সৃষ্টি হয়েছে কারণ এতে শিক্ষার্থীর মনে একটা অনিশ্চয়তা ও অতৃপ্তির (tension) সৃষ্টি হয়, যার থেকে সে মুক্তি খোঁজে।"

ভেরথাইমার (Wertheimer), কোয়হ্‌লার (Kohler) ও কোফকা (Koffka) গেষ্টল্ট মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করেন। কার্ট লিউয়িন (Kurt Lewin) এঁদের সহকর্মী হিসাবে এঁদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনিও সমগ্রবাদ (Gestalt) তত্ত্বে বিশ্বাসী। তবে তিনি অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যায় অনুরাগী, এবং মনের ক্রিয়া (dynamics) অঙ্ক ও পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য সমগ্রবাদীদের মত তিনিও মনে করেন, যে মন একটা পদার্থ (substance) নয়, কতগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তির সমষ্টিও নয়। মন হচ্ছে কতগুলি ক্রিয়া (functions), কিন্তু এ ক্রিয়াগুলি অনেক জটিল পরিবেশ ও আনুষঙ্গিকের মধ্যে ঘটে। এই সমগ্র আনুষঙ্গিক অবস্থা, পরিবেশ ও শক্তির আকর্ষণ, বিকর্ষণও সম্বন্ধ না জানলে ক্রিয়াটির ব্যাখ্যা হয় না। বস্তুর বেলায় যেমন, মনের বেলায়ও তাই। বস্তুর স্বরূপ নির্ধারিত হয় তার অন্তর্গত সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর গতি ও সম্বন্ধ দ্বারা। এই সম্বন্ধ যেমন একটি জটিল বৈদ্যুৎক্ষেত্র (magnetic field) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মনের ক্রিয়াও তেমনি মানসিক, সামাজিক নানা আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে এই ক্ষেত্রের (field) ধারণার ব্যবহার লিউয়িনের বিশেষ অবদান।

প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার পরিণতির দিকে একটা স্বাভাবিক গতি আছে। সে স্বাভাবিক পরিণতি বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রিয়াটি বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রত্যেক অসম্পূর্ণ ক্রিয়াই একটা অস্বস্তি ও অতৃপ্তি (tension) সৃষ্টি করে। যে

ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এই অতৃপ্তি, তার থেকে মুক্তি পেতে হলে নানা ভাবে ক্ষেত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রত্যেক প্রাণীই এটা করে। সে অতৃপ্তিকর ক্ষেত্রের প্রসার বা সংকোচ দ্বারা বা ক্ষেত্রটিকে অন্য তলে (level) উন্নয়ন বা অবনমন করে বাধাটি দূর করে, অস্বস্তি ও অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি খোঁজে (reduction of tension)। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। একটি ছেলে বন্ধুদের অনুরোধে সিনেমায় যাবে স্থির করেছে। তার ক্রিয়ার একটি মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হোল, কিন্তু বাবা নিষেধ করলেন যেতে। তার ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হল; কিন্তু ক্রিয়াটির এখানেই সমাপ্তি হল না। নানা ভাবে ক্ষেত্র অর্থাৎ আনুষঙ্গিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়েই কেবল মাত্র তার ইচ্ছা ক্রিয়াটি সফল পরিণতি লাভ করতে পারে। ধরা যাক্, বাবা কড়া মানুষ, তাঁর নিষেধের বাধা অনতিক্রম্য। তা হলে বাস্তবক্ষেত্রে সিনেমা যাবার ইচ্ছাটার পরিতৃপ্তি ঘটবে না। তখন ছেলে অবাস্তব কল্পনার তলে (Irreal phantasy level) তার মানস ক্রিয়ার ক্ষেত্রকে উন্নয়ন করে সেখানে তার ইচ্ছার পরিতৃপ্তি খুঁজবে। আর যদি নিষেধটা পাল্টে দেবার কোন উপায় থাকে (যেমন, মাকে ধরে') তা হ'লে ছেলে তার ক্রিয়ার ক্ষেত্রকে অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন করে তার ইচ্ছার পরিতৃপ্তি চাইবে। জাইগারনিক (Zeigernik) কতগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন কোন কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে মনের মধ্যে দাগ রেখে যায় না, কিন্তু যে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে বাধাপ্রাপ্ত হোল, তা অস্বস্তি সৃষ্টি করবে, এবং স্মৃতির মধ্যে থাকবে (Zeigernik effect) তীব্র ইচ্ছা হঠাৎ কঠিন বাধাপ্রাপ্ত হ'লে (frustration) অনেক সময় দেখা যায় শিশুর স্বাভাবিক মানসিক পরিণতি শুধু ক্ষুণ্ণ হয় না, অনেকটা পূর্ববর্তী অবস্থায় অবনতি ঘটে। এটাকে ফ্রয়েড-পন্থীরা বলেছেন পশ্চাদপসরণ (Regression)। লিউয়িনের ক্ষেত্র তত্ত্ব (field theory) দিয়ে এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে। (Barker, Dembo, Tamara and Lewin—Frustration and Regression দ্রষ্টব্য। G. G Thomson—Child Psychology P192-93-তেও এ পরীক্ষার সচিত্র বিবরণ দেওয়া আছে)। মানুষের সমস্ত ক্রিয়াই জীবন দেশে (life-space) ঘটে জীবনের আয়োজনের সঙ্গে সমস্ত মানসিক ক্রিয়া সংযুক্ত।

শিক্ষা, জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। বলা যেতে পারে এটা জীবনের বিকাশেরই একটা অঙ্গ। কাজেই জীবনের বিকাশের যে মূল ধর্ম তা' শিক্ষার

মধ্যেও বর্তমান। জীবনের অগ্রসরণের মূল ধর্ম হচ্ছে,—অব্যক্ত থেকে ব্যক্ততায়, অবিভক্ত অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্ট বিভিন্নতায়,—বিচ্ছিন্নতা থেকে সংশ্লিষ্টতায় পরিবর্তন। কাজেই তাতে একীকরণ ও বিশ্লেষণ দুই-ই হাত ধরাধরি করা চলে।*

এ মতবাদকে ক্ষেত্র-তত্ত্ব (Field theory) বলা হয়, কারণ শিক্ষাকে তাঁরা জীবের প্রয়োজনের সঙ্গে তার ক্ষেত্র বা পরিবেশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সংযুক্ত বলে মনে করেন। "এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষাকে প্রাণীর প্রয়োজন, পরিবেশ বা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষা অর্থই প্রাণীই পরিবেশ বা ক্ষেত্রের পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস এবং এই পুনর্বিন্যাস অনুযায়ী ব্যবহারের রীতিরও পরিবর্তন।"

জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ, তাই যা এ প্রয়োজনকে মেটাতে পারে জীব তা শিখতেই উৎসাহিত হয়। কিন্তু শেখাটা একবার সুরু হলে তা নিজেই উৎসাহ সৃষ্টি করে'—তাকে পূর্ণতার দিকে ঠেলে দেয়। তাই ক্ষেত্র-তত্ত্বের দুটি মূলসূত্র হচ্ছে,—"শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী লক্ষ্য স্থির করে, সে অভিমুখে অগ্রসর হতেই সব চেয়ে বেশী আগ্রহ বোধ করে।

এই আগ্রহ একবার সৃষ্টি হলে, সে তার নিজস্ব স্বাধীন শক্তিতেই অগ্রসর হয়। আগ্রহ তার অভীপ্সিত লক্ষ্যে না পৌঁছাতে পারলে, সেই অসম্পূর্ণতাই তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তখন প্রথম লক্ষ্য বস্তুর উপর আর তা নির্ভর করে না।"

বিভিন্ন মতের সমন্বয়—Asynthesis of the different theories —এর মধ্যে কোন মতই সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্ব অবস্থায় প্রয়োজ্য নয়। এক একটি মত শিক্ষার এক একটা দিকের উপর আলোকপাত করেছে। প্রত্যেকটিই তাই কতকাংশে সত্য। এদের মধ্যে আপাতবিরোধ থাকলেও, সম্ভবতঃ এদের সামঞ্জসীকরণ অসম্ভব নয়। শিক্ষার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে

*"Learning is not just a matter of construction or 'building up'—it also involves stages where analysis occurs. Those two are complementary phases of the more fundamental process of growth and maturation. The life cycle of all organisms including man reveals a progression from a relatively undifferentiated homogenous stage to a more elaborate and internally differentiated condition. When this activity occurs with the perceptual controls of conduct, we call is learning. Kurt. Lewin—Field theory and Experiment in Social Psychology.

এ বোধ যে, এটা একটা উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কতগুলি ধরাবাঁধা অভ্যাস বা কতগুলি তথ্য অন্ধভাবে সংগ্রহের 'কায়দা' মাত্র নয়। শিক্ষাকে জীবের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখতে হবে। তার একটা নির্দিষ্ট গতি থাকবে, যেটা উদ্দেশ্যমুখী। শিক্ষকের সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। শিশুর কাছেও শিক্ষা প্রাণবন্ত হবে তখনই, যখন তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রয়োজনের সঙ্গে তা যুক্ত থাকবে। যেটা শিখবে সেটা যেন শিশুর কাছে একটা মজার ধাঁধা (a live interesting problem) হয়। তা যেন তার কৌতূহলকে জাগ্রত করে, তার চেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করে। ক্ষেত্র-তত্ত্ব শিক্ষার এই জীবনধর্মের দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিক্ষাটা উদ্দেশ্যমূলক, তাই এতে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সামঞ্জস্যীকরণ, সাগ্রহ ইন্দ্রিয়সংযোগ, ফলাফলের সার্থকতানির্ণয়, ভুল পরিহার, ঠিক অভ্যাসটি আহরণ, এবং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা উপযুক্ত উপায়টি আয়ত্ত করা ইত্যাদি লক্ষণ তাতে থাকবে। তাই দেখা যাচ্ছে থর্ণডাইকের ভুল শুধরে শুধরে শেখা, ব্যবহারবাদীদের, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি দ্বারা শেখা ইত্যাদি কোনটাই শিক্ষার ক্ষেত্রে অবান্তর নয়। শিক্ষাকে আমরা এতদিন কতগুলি যান্ত্রিক অভ্যাস এবং বিদ্যালয়কে এ অভ্যাস কায়েম করার 'কল' মনে করে এসেছি বলেই, শিক্ষাটা নিতান্ত প্রাণহীন মামুলী ব্যাপার হয়ে, শিশুর প্রাণ ও মনকে আকর্ষণ করতে পারেনি। সে বিদ্যাস্থানে ভয়ে ভয়েই এসেচে। নূতন যুগের শিক্ষার আদর্শ ভিন্ন, তাই শিক্ষা ব্যাপারটা শিশুর কাছে একটা দুঃসাহসিক অভিযান (adventure)—এতে তার প্রাণের সোৎসাহ সম্মতি আছে।

আধুনিক অ্যামেরিক্যান্ শিক্ষাবিজ্ঞানী জন্ ডিউই (John Dewey) শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন যে "শিক্ষা একটা অনুভূত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা।" "কাজেই শিক্ষাতে আছে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সামঞ্জস্যীকরণ। শিক্ষা-ক্রিয়াতে তাই ফল সম্পর্কে সচেতনতা থাকে; তাতে ভুল প্রতিক্রিয়াগুলি দূর করা হয়, আর পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা ঠিক প্রতিক্রিয়াটি স্থাপন করা হয়, আর শিক্ষাতে থাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসরণ।"...এতদিন যাবৎ বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের বিদ্যা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, তার কারণ সেখানে ছাত্রদের উপর চাপানো হয়েছে রুটিন্ বাঁধা কাজ, যেটা ছাত্রেরা শিখছে সেটার সঙ্গে তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের সক্রিয় সংযোগ আছে এ কথাটি অবহেলা করা হয়েছে। যা শেখানো

হয় তা তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন তা কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করে।"*

শিক্ষার মূলে আগ্রহ—Motivation of learning—কোন ব্যবহার একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে একটা বিশেষ গতি যখন নেয় তখন বলি, প্রাণীর ইচ্ছা তার পেছনে রয়েছে, তাকে বলা হয় আগ্রহান্বিত (motivated)। এই আগ্রহের মধ্যে উত্তর পাই ব্যবহারের "কেন"র। কোন প্রাণীর বাহ্য পরিবেশ থেকেই বলা চলেনা তার ব্যবহারের গতি ও স্বরূপটা কি হবে! সে জন্যে প্রাণীর প্রয়োজন, স্বার্থ ও আগ্রহটার খবরও নিতে হয়। একেই বলি তার আগ্রহের মূল।†

শিক্ষাও যখন একটা 'ব্যবহার' (behaviour), তার সম্বন্ধেও একথা বলা চলে, তারও পিছনে থাকবে একটা আগ্রহ বা 'চাড়'। এ নিয়ে থর্ণডাইক একটা গোটা বইই লিখে ফেললেন—দি সাকোলজী অব্ ওয়াণ্টস্, ইণ্টারেষ্টস্ এ্যাণ্ড এ্যাটিটুড্স্ (1935)। এতে তিনি দেখিয়েছেন বাইরের পরিবেশের চেয়ে প্রাণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অভাববোধ ও প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গী ও আগ্রহ ব্যবহারের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে অধিকতর কার্যকরী। এই ভিতরের ধাক্কা প্রাণীকে ও তার পরিবেশকেও এমন ভাবে পরিবর্তিত করে যাতে তার ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। এই আগ্রহ বা ভিতরের ধাক্কাই প্রাণী কোন কর্ম করবে আর কোনটা পরিত্যাগ করবে, কোনটা তার প্রীতিপ্রদ, আর কোনটা অপ্রীতিকর তা নির্ধারণ করে। শিক্ষার মূল, আগ্রহ সম্পর্কেও কথাগুলি প্রযোজ্য। এতে দেখা যাচ্ছে থর্ণডাইক্ পূর্বে শেখা ব্যাপারটাকে যে অন্ধ যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া মাত্র মনে করতেন সে মত তিনি পরিবর্তন করেছেন এবং তাঁর মত সমগ্রবাদ বা ক্ষেত্র-তত্ত্বর অনুগামী হয়েছে।

মানুষ তার কাজের প্রেরণা কোথা থেকে পায় ও এই প্রেরণার সংখ্যা কি হতে পারে, সে গবেষণা এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা চলে না। যদি শুধু সহজাত প্রবৃত্তিগুলির তাড়নায়ই মানবজীবন চলত, তা'হলে সমস্যা অনেক সহজ হতো। কিন্তু শুধু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যৌনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনেই মানুষ তৃপ্ত নয়। অমৃতের পুত্র মানব অনেক কিছু চায়। তার জীবনদর্শন, ধর্মজিজ্ঞাসা,

* John Dewey. Experience and Education

†"The individual's needs, his interests, his attitudes and their relation to the situation must be taken into account. These are commonly grouped under the more general heading of 'motivation'" Ryans—Motivation in learning, 41st Year Book of the N. S. S. E.

রাষ্ট্র ও সমাজ—সব মিলিয়ে বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে—যার সমাধানে মানুষ নিয়ত ব্যস্ত। শিক্ষকদেরও এ কথা মেনে নিতে হবে। "মানুষের আগ্রহের রূপ ও বস্তু বিচিত্র ও প্রায় সংখ্যাতীত এই কথাটির স্বীকৃতির উপর শিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তিস্থাপন করলে লাভবান্ হবেন। মানুষের মধ্যে এত অসংখ্য জাত, আর তাদের আগ্রহ বস্তুও এত অসংখ্যরকম বিভিন্ন, যে চারটি মাত্র ইচ্ছা বা আঠারোটি বাসনা বা এদের একটি বা সবরকম সংযোগ বিয়োগ দিয়ে এ সমস্ত আগ্রহের উপযুক্ত ব্যাখা সম্ভব নয়।" (Gates, Jersild etc-Educational Psychology vol. I. P312) শিক্ষককে তার প্রতিটি ছাত্রকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতে হবে। ছাত্রের প্রকৃতি, রুচি, অতীত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, এসবের উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করতে হবে তার শিক্ষার কাঠামো ও পদ্ধতি। তাহলেই শিক্ষা হয়ে উঠবে জীবন্ত ও আনন্দপূর্ণ, বিদ্যালয়-জীবনটা হবে অর্থপূর্ণ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বা বিদ্যালয়ে যে প্রেরণাগুলি পড়া ও কাজ শেখাকে সাহায্য করতে পারে, মোটামুটিভাবে তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দিচ্ছি। এখানে পূর্বেই বলা ভাল যে মানুষের জীবনে কতগুলি সাধারণ চাহিদা (fundamental needs) আছে, তাদের মেনে নিয়েই এই তালিকা তৈরী করছি। অন্তরের দিক থেকে দেখলে অভাববোধ ও চাহিদা, প্রকৃতি বা স্বভাবের বিশেষ ধর্ম, দৃষ্টিভঙ্গী, আগ্রহ, অভ্যাস ও কার্যদক্ষতা, উদ্দেশ্য, ভাব ও আবেগ মানুষের কাজে প্রেরণা জোগায়, আর বাইরের দিক থেকে দেখলে পুরস্কার, তিরস্কার, প্রশংসা, নিন্দা ও প্রতিযোগিতার বিশেষ মূল্য আছে। পুরস্কার যে সর্বদা বস্তুগত হতে হবে তার কোন মানে নেই, অনেক সময় সামান্য উৎসাহ বাক্য, প্রশংসা বা সাফল্যের আনন্দই বড় পুরস্কার হয়ে দাঁড়ায়। তা'ছাড়া, দলের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করা ও সবার কাছে নিজের মূল্য বেড়ে যাওয়ার আনন্দেও শিশুরা এগিয়ে চলে সাফল্যের পথে।

পুরস্কার বা তিরস্কার দিয়ে শিক্ষক আগ্রহ সৃষ্টি করেন এর মন্দ দিকও আছে। অনেক সময় বিদ্যালয়ে নম্বর বা star দিয়ে অর্থাৎ পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে পড়াতে মন দেওয়ান হয়। কিন্তু পুরস্কার লাভের পর পড়ার প্রচেষ্টা থেমেও যেতে পারে, যদি না নিছক পড়ার আনন্দই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হয়ে দাঁড়ায়। তারপর প্রতিযোগিতা অনেক সময় ঈর্ষা ও অসামাজিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে, সেদিক দিয়ে আত্ম-প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি অনেক বেশী কার্য্যকরী। কোন

পুরস্কার বা তিরস্কার (incentive) কখন কার্যকরী হবে, সে কথা শিক্ষকই নিরূপণ করতে পারবেন ভাল। তবে তাঁকে মনে রাখতে হবে ছাত্রের বয়স ও ক্ষমতা, পরিবেশ ও অতীত অভিজ্ঞতা। সে অনুযায়ী তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে আগ্রহ, ইচ্ছা ও চাহিদা।

কিন্তু ছাত্রদের শুধু বর্তমান আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই শিক্ষার সৌধ নির্মাণ করা সম্পূর্ণভাবে উচিত হবে না। বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও আগ্রহকে ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-পূর্ণ কাজগুলিকে বেছে নিতে হবে। এরোপ্লেন তৈরী করতে যে ভালবাসে, সে শুধু সারাক্ষণ এরোপ্লেনই তৈরী করবে না নিশ্চয়ই। তাকে ইতিহাস, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, ও সমাজতত্ত্ব ঐ আগ্রহের ভিত্তিতেই শেখানো যাবে। গঠন কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা প্রণালীর (Project Method) মূলেও এই একই নীতি রয়েছে।

আগ্রহের ক্রিয়া—Functions of motives—শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রেরণাগুলি যেভাবে কাজ করে, তাকে তিন ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি : **প্রথমত:** ব্যক্তির ইচ্ছা ও অভাববোধ তাকে কর্মঠ ও তৎপর করে তোলে, সে সচেষ্ট হয় তার অভাবকে পূর্ণ করতে। একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রস্তুতির ভাব নিয়ে সে পরিবেশকে পর্য্যবেক্ষণ করে এবং সেই অভাববোধের সঙ্গে বাইরের ইন্সেন্টিভ যেমন নিন্দা বা প্রশংসা, পুরস্কার বা তিরস্কার, বিশিষ্ট স্থান লাভের আগ্রহ ইত্যাদির কোন একটির নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন সে কাজের পথে এগিয়ে চলে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি ও প্রকৃতি—সবার এক নয়। কোন প্রেরণা কারো কাছে অত্যন্ত মূল্যবান, কারো কাছে হয়ত মূল্যহীন। নিজস্ব প্রকৃতি ও অভাব অনুযায়ী উদ্দেশ্য ও কর্মপথ সে বাছাই করে নেয়। একই দৃশ্য, একই বক্তৃতা বা একই বই বিভিন্ন ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে। একই বক্তৃতার রিপোর্ট যখন অমৃতবাজার, Statesman, স্বাধীনতা ও আনন্দবাজারে বের হয়, তখন সে যে একই বক্তৃতার রিপোর্ট তা বিশ্বাস করা একটু শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই শিক্ষককে জানতে হবে, শিশুর পরিবেশ, প্রকৃতি ও রুচিকে এবং সে অনুযায়ী তাকে নির্দ্দিষ্ট কাজের ভার দিতে হবে। কোন কাজটি বেছে নেওয়া হবে, কোন কাজে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত হবে, তা নির্ভর করে তার আগ্রহের (motive) উপর।"*

* Thorndike—Psychology of Wants, Interests and Attitudes

পরিশেষে, প্রকৃতি, রুচি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ বাছাই-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত আছে প্রেরণার অপর একটি দিক। কর্মের গতি নিরূপণ করা প্রেরণার একটি বড় কাজ। শুধু অভাব-বোধ জাগ্রত হ'লেই কর্মের পথে সবাই এগিয়ে চলে না। যে বিশিষ্ট বস্তু সেই অভাব-বোধকে পূর্ণ করতে সক্ষম, তাকে বেছে নিয়ে সামনে তুলে ধরলে, এবং তার আংশিক পরিপূরণ যদি আনন্দদানে সক্ষম হয়, তবে কর্ম, ব্যবহার বা শিক্ষা এক বিশেষ উদ্দেশ্যমুখীন হয়ে বিশিষ্ট গতিতে ও পথে চলতে থাকে। সে কাজটি করবার জন্যে তখন শিক্ষকের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। কর্মের আনন্দেই সে চলতে থাকে, এবং শেখা হয়ে দাঁড়ায় সহজ।

শিক্ষার উন্নতি-Improvement in Learning—এতক্ষণ আমরা শেখা কাকে বলে, শেখার মূলসূত্রগুলি কি, এসব কথা আলোচনা করেছি। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষায় যে উন্নতি হয় সেটা কি ভাবে হয়, তা নিয়ে। উন্নতিটা কি সমান একটানা এক তালে চলে? আমরা কতটা শিখতে পারি তার কি একটা সীমা আছে? উন্নতিটার তাল যদি অসমান হয় তবে তা কেন অসমান হয়? এর তাল বাড়ানো কমানো কি আমাদের হাতে? তা হ'লে তার নিয়ম কি? একই শিক্ষায় সব ছেলেমেয়েই কি সমান তালে এগুবে? শিক্ষায় উন্নতি করবার বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলি কি, যাতে সময় ও শক্তির অপব্যয় কম হয়?

আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ধরো, চরকায় সুতোকাটা। প্রথম প্রথম একহাতে চরকা ঘোরানো, আর একহাতে তুলোর পাঁজ নিয়ে টাকু থেকে টেনে সুতো বের করা, এ দুটো কাজ একসঙ্গে হতেই চায় না। তুলো জট পাকিয়ে যায়,—ঘণ্টায় দুহাত সুতোই তৈরী হ'তে চায় না। আর যাও হয়, তাও অসমান। কিছুদিন পর কিন্তু কায়দাটা রপ্ত হয়ে যায়, তখন দ্রুত উন্নতি (Spurt) হতে থাকে, দিনের পর দিন সুতোর পরিমাণ বেশী হয়—সুতোর জাতও ভাল হতে থাকে। সবার কিন্তু সমান তালে উন্নতি হয় না। কাজ শিখতে কারু বেশী দিন, কারু কম দিন লাগে। একজন লোকের উন্নতিটাও একটানা সমান নয়। কিছুদিন দ্রুত উন্নতির পর আবার উন্নতির তালটা ঝিমিয়ে আসে—তখন আর উন্নতি হতে চায় না। এ সময় নিরাশা আসে। শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা কঠিন পরীক্ষার সময়। এটাকে মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেছেন শিক্ষার উন্নতির রেখায় উপত্যকা (Plateau of learning)। তখন

হয়তো একজন অভিজ্ঞ সুতো-কাটিয়ে ব্যক্তি পাঁজটা ধরবার বা সুতোটা টান রাখবার বা সুতো গুটাবার একটা নূতন পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ অভ্যাসের পর দেখা গেল এতে আবার একটা নূতন উন্নতির উর্দ্ধগতি দেখা যাচ্ছে,—এটাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন—**Spurt**। এর ফলে আবার কিছুদিন কিছুটা উন্নতি দেখা যায়। তারপর আবার একটা স্থিতিশীল অবস্থা আসে। হয়তো আবার নূতন কায়দায় সন্ধান পেলে, আবার উন্নতি কিছুদিন চলে। কাজটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ পরিণতির দিকে অগ্রসর হলে তখন একটা নতুন ও শেষ উন্নতির (end spurt) উত্তম দেখা যায়। কিন্তু এই উন্নতি অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে না, একখানে গিয়ে এর শেষ হয়। স্যাণ্ডিফোর্ড টরণ্টোর হাইস্কুল অব্ কমার্স এর টাইপরাইটিং এর ১০০০ ছাত্রের উপর পরীক্ষার ফল উল্লেখ করেছেন।

'স্কুলের ৩ বৎসর (3 school years) মোট ৩৬০ ঘণ্টা ব্যাপী এ পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। প্রতি সপ্তাহ পর পর (অর্থাৎ মোট পাঁচ ঘণ্টা টাইপ করা অভ্যাসের পর) একবার করে প্রত্যেক ছাত্রের গতি কতটা বেড়েছে (speed) এবং কতটা নির্ভুল ভাবে টাইপ করতে সে শিখলো (accuracy) সে পরীক্ষা নেওয়া হ'ল। সবগুলি ফল মিলিয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা হল,—

১। ছাত্রদের একজনের সঙ্গে আরেকজন উন্নতির যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। এতে সম্ভবতঃ বংশানুক্রমিক স্বাভাবিক শক্তির তারতম্যই সূচিত হয়। সকলের ক্ষমতা সমান নয়।

২। প্রত্যেক ছাত্রেরই আবার উন্নতির গতি অসমান। সোজা একটানা উন্নতি দেখা যায় না।

৩। লম্বা ছুটির পর (যেমন ৯০ ঘণ্টা থেকে ১০০ ঘণ্টার মধ্যে, আবার ২৩০ ঘণ্টা থেকে ২৫০ ঘণ্টার মধ্যে) উন্নতি বেশ কিছুটা পেছিয়ে যায়। তবে আবার অল্প কয়েক ঘণ্টা অভ্যাসের পরেই পূর্বের কুশলতা ফিরে আসে। প্রথমবার শিখতে যতটা সময় লেগেছিল,—ছুটির পর নূতন করে শিখতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে। তাতে বোঝা যায় অভ্যাস দ্বারা শিক্ষার ফলটা অনেকটাই থেকে যায়। সেটা, কাজ যখন চলছে না, তখনও চলতে থাকে (consolidation)।

৪। প্রথম বাধা কাটিয়ে উঠে, উন্নতির গতি গোড়ার দিকে বেশ দ্রুত, কিন্তু ক্রমেই গতি মন্থর হয়ে উঠে।

৫। প্রত্যেক ছাত্রেরই দেখা যায় এমন একটা সময় আসে, যখন তার আর উন্নতি হতে চায় না, এমন কি ৩০।৪০ ঘণ্টা অভ্যাসেও কোন ফল হয় না। এ অবস্থাটাকে উপত্যকা (plateau) বলা হয়েছে।*

অনেকদিন ধরে শিক্ষার গতির যদি একটা মাপ বা রেখা রাখা যায় তা হ'লে দেখা যায় সেটা একটা ঊর্দ্ধমুখী অসমান বক্ররেখার আকার ধারণ করে। এই রেখাকে বলে **শিক্ষার উন্নতির ঊর্দ্ধ বক্র রেখা** (practice curve অথবা curve of learning)। নীচে একটি ছবি দেওয়া হোল।

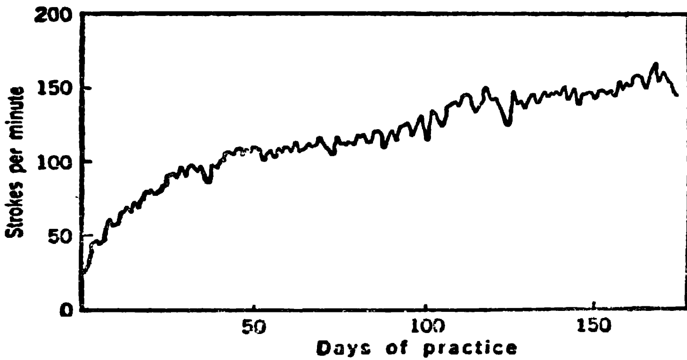


Fig. 26 : Curve of Learning (from Woodworth—Psychology, P. 317. Fig. 62).

শিক্ষার উন্নতিতে স্তব্ধতা (plateau) ব্যাপারটা প্রথম আবিষ্কার করেন ও এসম্বন্ধে আলোচনা করেন ব্রায়ান ও হার্টার (Bryan & Harter)। এঁরা টেলিগ্রাফি শিক্ষা (সংবাদ পাঠানো ও সংবাদ গ্রহণ করা) নিয়ে পরীক্ষা করেন। তখন তাঁরা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করেন। তাঁরা দেখলেন শিক্ষার ফলে কিছুদিন উন্নতির পর একটা স্থাণু অবস্থা আসে। সেই অবস্থাটাই অবশ্য স্থায়ী হয় না, যদি উন্নততর একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে, প্রথম শিখবার কায়দাটাকে উপযুক্ত ভাবে পরিবর্তন করা যায়। তখন আবার কিছুদিন একটা উন্নতি দেখা যায়। এই স্থাণু অবস্থাটা হ'ল plateau। আবার একটা অভ্যাস স্থায়ী হয়ে উঠতে চায়—যদি না আবার একটা উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। টেলিগ্রাফীতে প্রথম শিক্ষার্থী এক একটা অক্ষর আলাদা আলাদা ভাবে পাঠাতে বা গ্রহণ করতে

* Sandiford-Educational Psychology, P. 209-10.

অভ্যাস (letter habit) করে। তাতে প্রথম দিকে অভ্যাসের ফলে উন্নতি হ'তে থাকে কিন্তু কিছুদিন পর উন্নতি বন্ধ হয়ে যায়। আলাদা আলাদা অক্ষর টেলিগ্রাফ করে পাঠাতে বা গ্রহণ করতে অনেকটা সময় লাগে। অভ্যাসের ফলে এ সময় কিছুটা কমে, কিন্তু সে উন্নতি সীমাবদ্ধ। এর পর যদি শিক্ষার্থী এর চেয়ে ভাল একটা পদ্ধতি যথা, আলাদা আলাদা অক্ষরের পরিবর্তে গোটা শব্দ (word habit) পাঠাতে বা গ্রহণ করতে শেখে তাহ'লে, আবার বেশ খানিকটা উন্নতি দেখা যায়। এ উন্নতি আবার কিছুদিন চলে। আবার আসে অচল অবস্থা। তখন আবার উন্নতি হতে পারে যদি গোটা শব্দের পরিবর্তে গোটা বাক্য (sentence habit) পাঠাবার বা গ্রহণ করবার অভ্যাসটি শেখা যায়। ব্রায়ান ও হার্টার বলেন টেলিগ্রাফী কেবলমাত্র একটি সহজ অভ্যাস নয়, এ হচ্ছে ক্রমশঃ জটিলতর অভ্যাসের স্তরবিন্যাস। পরবর্তী জটিলতর অভ্যাস পূর্ববর্তী সহজ অভ্যাসের ভিত্তিতে গঠিত হয়··· কাজেই শিক্ষার উন্নতির রেখার যে স্থাণু অবস্থা, সেটা অপূর্ণভাবে শিক্ষিত সহজতর অভ্যাস যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে এরই লক্ষণ, এর চেয়ে বেশীও নয়, কমও নয়। এ বাধায় চেয়ে মুক্তি পেলেই উন্নততর ক্রিয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।" (Bryan and Harter. Studies in the Physiology and Psychology of Telegraphic Language. ch. I P. 27-53)

তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে উন্নতির এই স্থাণু অবস্থা সমস্ত শিক্ষারই একটা লক্ষণ। সব মনোবিজ্ঞানী একথাটা স্বীকার করেন না। সব পরীক্ষার ফলও সম্পূর্ণভাবে ব্রায়ান ও হার্টারকে সমর্থন করে না। বুক্ (Book) এই উন্নতির অচল অবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করেছেন—বিরক্তি বা boredom (Book-The Psychology of Skill)। কেউ কেউ বলেছেন, এর কারণ হচ্ছে আগ্রহ হ্রাস (Millard,—Child growth and development. P. 261) নূতন বিষয় শিখতে প্রথম যে উৎসাহ থাকে, সেটা] কিছুদিন পরেই প্রশমিত হয়। আবার নূতন পথ পেলে উৎসাহ বাড়ে। তবে অভ্যাসের স্তরভেদ (hierarchy of habits) আছে এটা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত। এবং যতই চেষ্টা করা যাক্, উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে না। দেহের শক্তি, মনের শক্তির একটা সীমা আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে এ সীমাটা বিভিন্ন।

শিক্ষার উন্নতির সীমা – Limit of Learning—নিপুণতার ক্ষেত্রেও যেমন সীমা আছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি একটা সীমা আছে। শিক্ষার

পরিধি যথেচ্ছভাবে বাড়ানো যায় না। চেষ্টার দ্বারা উন্নতি কিছুটা হবেই,—বিশেষ করে স্যাণ্ডিফোর্ড যেটাকে বলেছেন বিস্তার বৃদ্ধি (horizontal growth), তার ক্ষেত্রে। কিন্তু যে উন্নতি সীমাহীন ভাবে চলে না। দেহের শক্তির শেষ সীমাটাকে বলে ফিজিয়োলজিক্যাল্ লিমিট। সাধারণতঃ এ সীমা পর্যন্ত আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌঁছি না। কার্যতঃ উন্নতির সীমারেখাটা আরো নীচুতে—সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লিমিট। "কার্যতঃ উন্নতির সীমা দেহের শক্তির উন্নতির সীমার কাছাকাছি যেতে পারে কিন্তু এ দুটি কখনই সম্পূর্ণ এক নয়।" (Sandiford. Educational Psychology P. 218.)

সবচেয়ে কম সময়ে কি করে ভালো শেখা যায়—Principles of economy in learning—এলোপাথারী ভাবে কোন জিনিষ শিখলে—সময় ও শক্তির অপব্যয় হয়। শিক্ষা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে শেখায় সময় বাঁচানো যায়, বেশী ভাল করে শেখা যায়। 'শিক্ষার সূত্র' আলোচনার সময় আমরা জেনেছি শিক্ষার মূল সূত্রগুলি কি,—এবং তা থেকে আমরা বুঝতে পারি—কি কি অবস্থা (conditions) শেখার কাজকে সাহায্য করে।

(১) **অভ্যাস চাই**—শেখা পড়া, শেখা কাজ আমরা ভুলে যাই, যদি না আমরা মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করি। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় এটা বিশেষ দরকার। এটা হচ্ছে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্রের মূল কথা। একটা কবিতা বারে বারে না পড়লে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় না।

কিন্তু এই অভ্যাস যদি শুধু তোতাপাখীর মত অন্ধ আবৃত্তি হয় (cramming), তাহ'লে সেই শেখা কখনই ভাল হয় না, এবং বেশীদিন তা মনে থাকে না। এতে পরিশ্রমও বেশী, ফলও কম। এ জাতীয় অন্ধ শিক্ষাকে ইংরাজীতে learning by roteও বলে।

এজন্য দেখা গেছে, শিক্ষা উদ্দেশ্য-মূলক ও শিক্ষণীয় বস্তু অর্থপূর্ণ হলে শেখা সহজ হয়, কারণ সেখানে যুক্তি-সঙ্গত সম্বন্ধ (Logical relations) স্থাপন করা যায়। যেখানে শিক্ষার বিষয় যুক্তিগত সম্বন্ধহীন তালিকা, বা অর্থহীন বর্ণের সমষ্টি মাত্র (যেমন nonsense syllables) সেখানেও মনগড়া সম্বন্ধ তৈরী করতে পারলে শিখতে সময় কম লাগে। এবং সাধারণতঃ দেখা যায়,

ল্যাবটারিতে পরীক্ষিত ব্যক্তিরা চেষ্টা করে, অর্থহীন বর্ণসমষ্টির অর্থ খুঁজে বার করতে।*

সেজন্য, উড্‌ওয়ার্থ বলেছেন, "ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ ও ঘটনাসমূহের অর্থ সমাবেশের উদ্দেশ্যে সমনোযোগ তথ্যানুসন্ধানই"—হচ্ছে সহজে ভাল করে শেখবার মূলমন্ত্র। অর্থাৎ একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং সম্বন্ধনির্ণয়ের অভ্যাস শেখার কাজে সব চেয়ে বেশী কাজে লাগে।

অভ্যাসের পেছনে যদি শেখবার ইচ্ছা থাকে (will to learn) অর্থাৎ তা নিষ্ক্রিয় ও যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি না হয়ে যদি চেষ্টা ও আগ্রহপূর্ণ হয়, তা'হলে অল্প সময়ে ও অনায়াসে শেখা যায়। এবিংহজ (Ebbinghaus) একটা পরীক্ষা করেছিলেন।† তিনি বার বার কতগুলি অর্থহীন শব্দ বলে যান, শেখবার কোন ঐকান্তিক ইচ্ছা ও মনোভাব ছিল না। পঞ্চাশবার পুনরাবৃত্তি করা সত্ত্বেও তিনি একটি শব্দও শিখতে পারলেন না। তখন তিনি নিশ্চেষ্ট মনোভাব দূর করে—শিখতেই হবে, এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মনঃ সংযোগ করেন ও আবৃত্তি করেন, এবং অতি অল্প সময়েই শব্দগুলি মুখস্থ করে ফেলেন।

২। **কিন্তু অভ্যাসের সময়টা শিশুদের পক্ষে একটানা খুব লম্বা হওয়া উচিত নয়।** তাতে ক্লান্তি আসে, মনোযোগ স্থির থাকে না। তার বয়স, ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য অনুসারে সময়ের দৈর্ঘ্যটা স্থির করতে হবে।

৩। **এই অভ্যাসের মাঝে মাঝে বিরাম চাই।** তাতে ফল ভাল হয়। কেবল পড়া, কেবল পড়া, এতে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। একথাটা ছাত্রদের অভিভাবক ও শিক্ষকেরা অনেক সময় স্মরণ রাখেন না। "কোন ফাঁক না দিয়ে পুনরাবৃত্তি দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, তারচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়, কিছুটা

---

* একটি introspective report—"প্রথমে syllableগুলি মনে মনে আবৃত্তি করেছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভুলে গেছি। তারপর CAM ও LUM এর সঙ্গে "Panmunjon" নামের সম্বন্ধ মনে আসে। পরে YAX এর সঙ্গে YAK, ও MIS, TOH এর সঙ্গে জাপানী নাম Miss Toh এর সাদৃশ্য মনে পড়ে। DYP কথাটিকে deep কথা দিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করি। শেষের কথাগুলির সঙ্গে অন্য কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে না পারায় মনে থাকছিলো না"

—David Hare Training Collegeএর Psychological Bureauতে একটি পরীক্ষার নমুনা। Non-sense syllable এর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে Gestalt Theory র Law of Configurationকে দেখতে পাই। এ জন্যই Bartlett তাঁর "Remembering" নামক বইতে nonsense syllable দিয়ে Ebbinghaus এর স্মৃতি পরীক্ষার পদ্ধতিকে কঠোর সমালোচনা করেছেন।

† স্মৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সূচনা করেন এবিংহস্। তিনি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি পরীক্ষার রীতি প্রবর্তন করেন।

বিরামের পর পুনরাবৃত্তি করলে। মাঝে মাঝে বিরামের দ্বারা শিক্ষার ফলটা মনের মধ্যে পাকা হয়ে গেঁথে বসবার সুযোগ পায় (consolidation) এবং তা স্মৃতিপটে স্থায়ীভাবে আঁকা হয়ে থাকে। বেশ লম্বা সময় পুনরাবৃত্তির পর সামান্য কিছু সময় বিরাম দিলে, সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।"*

৪। **কোন পড়া বা কাজ শিখতে গেলে সবটা সম্পূর্ণ করে শিখলে ধারণাটা স্পষ্ট হয়।** চার চরণের (stanza) একটি কবিতা শিখতে হলে, সবটা কবিতাই প্রথম দু' তিন বার পড়ে নেওয়া ভাল। অবশ্য সব সময় এটা সত্য নয়। যদি পড়াটা মস্ত লম্বা হয় বা কাজটি বড় দীর্ঘ ও জটিল হয়, তবে সেটা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ভেঙে ভেঙে নিলেই শেখাটা ভাল হয়।

"একটা বড় কাজ বা পড়া শিখতে গেলে সবটা একেবারে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলেই সাধারণতঃ ভাল ফল পাওয়া যায়। কাজটা বা পড়াটা ভেঙে টুকরো করে' অংশগুলি মুখস্থ করবার চেষ্টা করলে তত ভাল ফল পাওয়া যায় না। এটা কিন্তু সব সময় সত্য নয়"†

একটা পরীক্ষার ফল দেওয়া যাচ্ছে—২৪০ লাইনের একটা পড়া সম্পূর্ণ একসঙ্গে ও টুকরো করে শেখার ফল।‡

শেখার পদ্ধতি	ক'দিন লাগলো	সবশুদ্ধ কত মিনিটে শেখা হোল
একদিনে ৩০ লাইন করে শেখা তারপর আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত সবটা পড়া।	১২	৪৩১
দিনে ৩ বার করে সবটা পড়া, যে পর্যন্ত না পড়াটা আয়ত্ত হয়।	১০	৩৪৮

এখানে দেখা যাচ্ছে, গোটা কবিতা বারে বারে মুখস্থ করে শিখতে মোট ৮৩ মিনিট সময় কম লাগছে। আগেই বলা হয়েছে, এটাকে সাধারণ নিয়ম বলা চলে না। নূতন শিক্ষার্থী খুব বড় কোন কাজ বা পড়া একচোটে আয়ত্ত করতে সাহস পায় না। ভেঙে ভেঙে নিলে সে বেশী ভরসা পায়। সেটা উপেক্ষা করবার বিষয় নয়। সে সব ক্ষেত্রে বাস্তবিক আংশিক শেখার পদ্ধতিই (part learning) বেশী ফলদায়ক।

* Woodworth—Psychology, p. 266

† Woodworth—Psychology p.269.

‡ Woodworth—Psychology. p. 270

৫। **সরব আবৃত্তি শেখার পক্ষে সহায়ক।** কোন পড়া শিখতে, শিক্ষণীয় বিষয়টা মনোযোগ দিয়ে তো পড়তে হবেই, তার সঙ্গে সরবে আবৃত্তি করলে কান ও চোখ সম্মলিত ভাবে মনঃসংযোগকে সাহায্য করে। এ বিষয়ে পরীক্ষার ফল অত্যন্ত স্পষ্ট। একটা উদাহরণ দেওয়া হল—

শিখবার ব্যাপারে সরব আবৃত্তির মূল্য*

যে জিনিষটা শেখা হল	১৬ অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি		মোট ১৭০টি শব্দ সমন্বিত ৫টি ছোট ছোট ছোট জীবন কাহিনী	
	পড়ার ঠিক পরেই শত-করা কতটা মনে রইল	চার ঘণ্টা পরে	পড়ার ঠিক পরেই শত-করা কতটা মনে রইল	চার ঘণ্টা পরে কতটা মনে রইল
সমস্তটা সময় নীরব পড়া	৩৫	১৫	৩৫	১৬
⅕ সময় আবৃত্তি	৫০	২৬	৩৭	১৯
⅖ সময় আবৃত্তি	৫৪	২৮	৪১	২৫
⅗ সময় আবৃত্তি	৫৭	৩৭	৪২	২৬
⅘ সময় আবৃত্তি	৭৪	৪৮	৪২	২৬

৬। **কাজ করে, বা পড়া শিখে ফল পেলে, প্রশংসা পেলে, উৎসাহ বাড়ে।** আর বারে বারে অকৃতকার্য্য হলে, অথবা অপ্রশংসা বা অবহেলা পেলে, উৎসাহ কমে যায়—তাতে শেখার কাজটাও পেছিয়ে যায়। ভাল শিক্ষক তাই লক্ষ্য রাখেন যাতে ছাত্রদের উৎসাহটা অক্ষুণ্ণ থাকে। এইটাই ফললাভের সূত্রের মূল কথা। "প্রয়োজনীয় ও ফলদায়ক সম্বন্ধগুলি আয়ত্ত করার ব্যাপারে সাফল্য উৎসাহ সঞ্চার করে।…প্রত্যেকেই চায় সফল হতে, তাই যে কাজটা আমরা ভাল পারি, সেটা স্বভাবতঃই আমরা অভ্যাস করি।"*

৭। **শান্ত অনুদ্বিগ্ন, প্রফুল্ল মন শেখার কাজ সহজ করে।** মানসিক উদ্বেগ, বা চাঞ্চল্য মনঃসংযোগের বিঘ্ন, কাজেই শেখার পক্ষেও বাধা সৃষ্টি করে। তবে বিষয়বস্তু কিছুটা আয়ত্ত হ'লে যে উত্তেজনা হয়, তাতে সম্ভবতঃ শেখার কাজের সাহায্যই হয়। "দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সব সময় ক্ষতিকর—দেহের দিক থেকেও বটে, শিক্ষার দিক থেকেও। তবে কোন একটা নূতন

* Woodworth, Psychology. P. 269

‡ Sandiford—Educational Psychology. P. 232

অবস্থায় যখন সমস্যাটার উপর কিছুটা প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছে, তার ফলে কিছুটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য শিখবার হারকে ত্বরান্বিত করে।"*

৮। **সুস্থ ও অনবসন্ন দেহ শেখার কাজে সহায়।** রোগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বদ্ধবাতাস ও ক্লান্তি, শেখার কাজ ব্যাহত করে। কিন্তু কোন কোন পরীক্ষার ফলে দেখা যায় সামান্য অসুস্থ দেহ বা ক্ষুধার্ত অবস্থা মনঃসংযোগের পক্ষে অনুকূল, সুতরাং শেখার কাজে সাহায্য করে।

কৃত্রিম উত্তেজক—যথা মদ্য, তামাক, চা, ষ্ট্রিক্নিন, ক্যাফিন্ নিয়েও কিছু পরীক্ষা করে শেখার কাজে এদের প্রভাব নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে। অধিক মাত্রায় মদ যে ধৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি কমিয়ে দেয় এতে কোন সন্দেহ নেই। অল্পমাত্রায় মদ কখনো কখনো মনঃসংযোগের অনুকূল। তামাক না খেলে কারু কারু নাকি বুদ্ধি খোলে না, 'বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া, দিলে নাকি কখনও কখনও কঠিন সমস্যা সমাধানে সাহায্য হয়। কিন্তু অধিকাংশ পরীক্ষার ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে তামাক, সিগারেট ইত্যাদি ধূমপানের প্রতিকূল। ষ্ট্রিকনিন্ এবং ক্যাফিন্ অল্পমাত্রায় মনঃসংযোগের সহায়ক। চা, কফি, কোকো ইত্যাদি পানীয়ও পরিমিত মাত্রায় শেখার কাজে সাহায্য করে। তবে দীর্ঘকাল যে কোন উত্তেজক পদার্থের অভ্যাস, সম্ভবতঃ, কিছু না কিছু কুফল উৎপন্ন করে।

৯। **প্রবৃত্তি ও রুচি** অনুযায়ী এক এক জনের এক এক জিনিষ শেখার স্বাভাবিক উৎসাহ থাকে। সে দিকে তার উন্নতিও বেশী হয়। শিক্ষকের উচিত শিশুর এই স্বাভাবিক মনের গতিকে লক্ষ্য করে, তাকে শিক্ষার কাজে লাগানো।

১০। **উৎসাহ সৃষ্টি**—সকলের থেকে শেষ কথা এবং বড় কথা যা শিখতে হবে, যা শেখাতে হবে সে সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। সেখানে আগ্রহ ও উৎসাহ নাই সেখানে শিক্ষা নীরস ও পীড়াদায়ক ও নিষ্ফল।

১১। **পরিপক্কতা**—বর্তমানে অনেক মনোবিজ্ঞানী এই কথাটির উপর জোর দিয়েছেন যে শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রের দৈহিক ও মানসিক পরিপক্কতার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যে কাজের জন্য শিশুর দেহ ও মন পরিপক্কতা লাভ করেনি তা শেখাতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।† মন্তেসরী তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে এ কথাটির উপর যথেষ্ট জোর দেন।‡

* Sandiford—Educational Psychology, P. 232

† Millard. Child Growth & Development P269

‡ Montessori—The Montessri Method P 104

দশম অধ্যায়

মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া—Memory

বিশ্বের মর্মমূলে একটি সুর বাজছে—"মনে রেখো"। তাই কতো আয়োজন অতীতকে মনের বেঁধে রাখবার,—সঞ্চয় করবার। কিন্তু তবু হারিয়ে যায় অতীতস্মৃতি, অতীত অভিজ্ঞতার চিহ্ন,—মানুষ ভুলে যায়। মনে রাখা, এও যেমন সত্য, ভুলে যাওয়া এও তেমনি সত্য। তাই মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া আমাদের আলোচনার বিষয়।

যেটাকে আমরা বলি স্মৃতি (memory) সেটা আসলে একটা বিশেষ্য নয়, এ একটা ক্রিয়া—স্মরণ করা। স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি একটা অভ্যাস,—যেটা অর্জিত হয় পুনঃ পুনঃ একটা বিষয়ের অধ্যয়ন দ্বারা। কোন একটা বিষয় বার বার পড়ে' বা করে, আমরা সেটা শিখি। অভ্যস্ত বিষয় আমরা পুনরাবৃত্তি করতে পারি। মনের মধ্যে সেই বিষয়টি সঞ্চিত বা সংরক্ষিত হয় বলেই তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়। স্মরণ করতে পারি তাতে প্রমাণ হয়, পূর্বে কিছু শেখা হয়েছে, এবং এটাও প্রমাণ হয় যে শেখা ও স্মরণের মাঝের সময়টাতে যেটা শেখা হোল, সেটা মনের মধ্যে থেকে যায়।"[১] মনে করা ব্যাপারটিকে তাহলে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি : (১) শেখা বা অধ্যয়ন (learning), (২) সঞ্চয় বা সংরক্ষণ (Retention), (৩) স্মরণ বা মনে করা (recall), ও (৪) পূর্বস্মৃতিরূপে সম্যক পরিচয়, (recognition)।

(১) **নূতন বিদ্যার আয়ত্তীকরণ বা Learning**—সম্বন্ধে আলোচনা করেছি পূর্বেই।[২] ঐ অধ্যায়ে আমরা কি ভাবে শিখি ও কি কি উপায় গ্রহণ করলে অল্প আয়াসেই শেখা যায় ও ভাল মনে রাখা যায়, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। চেষ্টা করে, কতটা জিনিস মনের মধ্যে একসঙ্গে গাঁথতে পারি (Span of memory) নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। এ বিষয়ে এবিংহজ্-এর অর্থহীন বর্ণসমষ্টি (Non-sense syllables) শিখবার পরীক্ষাগুলি বিখ্যাত। অপরিচিত কতগুলি বর্ণসমষ্টির তালিকা যদি এক সেকেণ্ড শিক্ষার্থীর

১ Woodworth—Experim, Psychology.

২ নবম অধ্যায়।

সামনে রেখে, তারপর সেটা সরিয়ে নিয়ে, তাকে সে বর্ণসমষ্টির তালিকাটি মুখস্থ বলতে বলা হয় তবে দেখা যায়, একসঙ্গে চারটি বা পাঁচটি বর্ণসমষ্টির বেশী শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারে না। এটা হোল তার তৎক্ষণাৎ মনে ধরে রাখতে পারার ক্ষমতার মাপ (immediate memory span)। অনুরূপ ভাবে কতগুলি অঙ্ক (digits) নিয়েও পরীক্ষা করা যায়। এতে দেখা যায় বিভিন্ন ব্যক্তির শিখবার ক্ষমতা সমান নয়। এটা দেখা যায় যে, যে ছেলে যত বুদ্ধিমান্ সে তত দ্রুত এবং তত বেশী সংখ্যা বর্ণ বা অঙ্ক একসঙ্গে মনে গেঁথে নিতে পারে। চার থেকে ছয় বৎসরের শিশুর সাধারণ ক্ষমতা হচ্ছে একসঙ্গে চারটি বর্ণ বা অঙ্ক আয়ত্ত করা। অভ্যাসের দ্বারা এ ক্ষমতা অবশ্যই বাড়ে। আর এ বর্ণ বা অঙ্কগুলির মধ্যে যুক্তিগত বা কৌতুকযুক্ত সম্বন্ধ বা মিল আবিষ্কার করতে পারলে, শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষমতাটা বেড়ে যায়। এটা সমগ্রবাদ (গেষ্টল্ট) সূত্র অনুযায়ীই ঘটে। বড় তালিকা মনে গেঁথে রাখতে এটা অত্যন্ত দরকার। আর একটা জিনিষ দেখা যায়। এক সেকেণ্ডে চারটে অক্ষর মনে গাঁথা গেল, তাই বলে চার সেকেণ্ডে ষোলটা অক্ষর মনে গেঁথে রাখা যাবে, তা নয়। প্রথম সেকেণ্ডের শেখাটার জের চলতে থাকে তাই দ্বিতীয় সেকেণ্ডের শেখাটার কিছু বাধা হয় (interference)। তাই বড় তালিকা শিখতে গেলে পুনরাবৃত্তি অবশ্য প্রয়োজন।

(২) **মনে থাকা বা Retention**—এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি ভাবে মনে রাখি। শেখা ও মনে রাখা কি এক কথা? যে পড়াটা শেখা হোল, বা যে কাজটা শেখা হোল, "সেটা আমার মনে আছে", এ কথাটা যখন বলি, তখন কি এই বুঝি, যে মনে মনে সে পড়াটা বা কাজটার ক্রমাগতই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? তা নিশ্চয়ই নয়। "মনে থাকাটা নিশ্চয়ই, যা শেখা হয়েছে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি নয়।" যে পড়াটা, নামতাটা, বা কাজটা "মনে আছে" সেটা ঘুমের মধ্যেও মনে আছে। "মনে থাকাটা, যা শেখা হোল, তার নিষ্ক্রিয় অবস্থান; এটা হচ্ছে দেহের, বিশেষ করে মস্তিষ্কের (nervous system) মধ্যে একটা পরিবর্তন,—যেটা ঘটেছে, পড়া বা কাজটি শেখবার ফলে। "শিক্ষার ক্রিয়াটি প্রাণীর দেহে বিশেষ করে, তার মস্তিষ্কের স্নায়ু উপাদানের পরিবর্তনের ছাপ রেখে গেছে।" এই পরিবর্তনের ছাপকে বলা হয় স্মৃতির চিহ্ন। "যেটা থেকে যায়, সে হচ্ছে এই চিহ্ন,—এবং এর অস্তিত্ব আমরা অনুমান করতে পারি এই দিয়ে যে, অতীতকে আবার মনের সামনে আনতে পারি এবং তাকে পূর্ব

অভিজ্ঞতা বলে চিনে নিতেও পারি।"[৩] এটা প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই এরকম একটা দাগ রেখে যায় এটা আমরা ধরে নিতে পারি। তা না হলে, অভিজ্ঞতাটা অতীত হয়ে গেলে, আবার সেটাকে স্মরণ করতে পারতুম না।

মনে থাকার প্রমাণ কি? কতটা মনে রইলো তা মাপি কি ভাবে? অতীত অভিজ্ঞতার—দাগটা কি চিরকাল থাকে? কবি বলছেন "হারায় না তো কিছু।" যত কথা, যত গান, সবই আছে, সবই থাকে। "ভুলে থাকা, সে তো নয় ভোলা, বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।" এ কথাটা একেবারেই কবিত্ব নয়। বাল্যকালের বিস্মৃত ঘটনা, হঠাৎ যেন মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে ওঠে,—

......মাকে আমার পড়ে না মনে,
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে।
একটা কী সুর গুণগুণিয়ে কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে,
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে।"[৫]

এমন অভিজ্ঞতা সকলের জীবনেই ঘটে। জ্বরের বিকারের মধ্যে কখনো কখনো মানুষ তাদের অতীত জীবনের এমন ঘটনার কথা বলে, যেটা সত্যি ঘটেছিল, কিন্তু সুস্থ হয়ে তাকে সে কথা জিজ্ঞেস করলে সে কিছুতেই তা স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু এ সব দৃষ্টান্তের থেকে কিছুই মন থেকে হারায় না, এ রকম একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো বিপজ্জনক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পক্ষে এ সিদ্ধান্তই বরং সঙ্গত যে, অনেক অভিজ্ঞতা কেন, অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। মনের মধ্যে অতীতের সব অভিজ্ঞতা, সব কথাই যদি ভিড় করে থাকতো, তা হলে, সে দুঃসহ চাপে আমরা যে পাগল হয়ে যেতুম। এই ভুলে যাওয়া যে কত দরকার, ব্যালজ্যাক তাঁর এক বইয়ে তা লিখেছেন "শক্তিশালী ও শিল্পী মনের গোপন রহস্য হোল যে তাঁরা ভুলতে পারেন। প্রকৃতি যেমন করে অতীতকে ভুলে যায়, তাঁরাও তেমনি সহজে

৩ Woodworth Psychology, P325
৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছবি (বলাকা)
৫ " " " মনে পড়া (শিশু ভোলানাথ)

অতীতের স্মৃতিকে মুছে ফেলেন। তাঁদের সজীব মন প্রতি মুহূর্তে নব নব সৃষ্টির রহস্যময় ক্রিয়ার ব্রতী হয়। যাদের প্রকৃতি দুর্বল তারা দুঃখকে অভিজ্ঞতার স্বতঃসিদ্ধ প্রথম সূত্র হিসাবে গ্রহণ না করে, জীবনের মধ্যে সঞ্চয় করে, এবং বেদনার সাগরে মগ্ন হয়ে প্রত্যহ অতীত দুঃখের আঘাতে পুনঃ পুনঃ ক্ষতবিক্ষত হয়।"[৬]

পরীক্ষাগারে মনে রাখার ব্যাপারটি, পুরোনো বিষয় কিছুদিন বাদে আবার শিখতে কত সময় লাগে, আর কত সময় বাঁচে, তা (Relearning method or saving method) দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায়।[৭] কিছুদিন আগে একটি কবিতা শিখেছিলাম, আজ হয়ত পুরোপুরি কবিতাটি মনে পড়ল না; কিন্তু তখন আবার শিখতে সুরু করলে দেখা যায় যে, চট্ করে শেখা হয়ে গেল। প্রথমবার হয়ত দশ মিনিটে শেখা হয়েছিল, দ্বিতীয়বারে মাত্র আট মিনিটেই শেখা হোল। দু' মিনিট সময় কম লাগল; তার মানে এই যে কবিতার কিছুটা মনে ছিল। "পূর্ব্বে শেখাতে যে সময় লেগেছিল আবার তা নূতন করে শিখতে পরিশ্রম পূর্বের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কম লাগলো। পূর্বে শেখার প্রভাবটা থেকে গিয়েছে। আর কতটা পরিশ্রম বাঁচলো? এ পরীক্ষা দিয়ে বলা যেতে পারে যে, মনে থেকে যাওয়ায় (retention) পরিমাণ হোল, শতকরা কুড়ি ভাগ।"[৮] আর দুটি পরীক্ষারও উল্লেখ করা যাচ্ছে। এ্যালেন্ (Allen) অনেকগুলি এক বছর বয়সের শিশুর উপর এ পরীক্ষা করেন। শিশু মায়ের কোলে বসে আছে। তার হাতে একটি লোভনীয় রঙীন খেলনা দেওয়া হোল। সে কিছুক্ষণ খেলনাটি নিয়ে খেলা করার পর, তার হাত থেকে খেলনাটি নিয়ে সামনে একটা ছোট টেবিলের উপর রাখা তিনটি বাক্সের একটির ডালার উপরে তিনবার খেলনাটা ঠুকে সেই বাক্সের ভিতর খেলনাটা রাখা হোল। তারপর টেবিলটা (বাক্সগুলি সহ) সরিয়ে রাখা হোল। কিছুক্ষণ বাদে আবার টেবিলটা বাক্সসহ শিশুর কাছে ফিরিয়ে আনা হোল। দেখা যায়, যদি মাঝের সময়ের ফাঁকটা খুব বেশী না হয় তা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু ঠিক বাক্সটি খুলে খেলনাটি নেয়। শিশুর ক্রিয়ায় দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা দেখা যায় না। এতে নিশ্চিত বোঝা যায় অতীত অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে ধরে রাখবার ক্ষমতা শৈশবেই

৬ Balzac—Cesar Birotten

৭ Woodworth, Experimental Psychology, P 9.

৮ Woodworth, Psychology. P. 337, c.f. The curve of retention. Ebbinghaus and Boreas

জন্মায়। এ পরীক্ষাকে বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া (delayed reaction experiment) নাম দেওয়া হয়।[৯]

বার্ট (Burt) তাঁর ১৪ মাস বয়সের শিশুকে প্রত্যহ তিন মাস যাবৎ গ্রীক্ নাটকের তিনটি পদ পড়ে শোনালেন। এ বাচ্চার পক্ষে অর্থবোধ তো হতেই পারে না। তার পরের তিনমাস নতুন আরো তিনটি পদ একই ভাবে পড়ে শোনালেন। এরকম করে মোট ২১টি পদ পড়ানো হোলে, পড়া বন্ধ করা হোল। সাড়ে আট বছর যখন ছেলের বয়স হয়েছে, তখন মুখে মুখে এই পদগুলি আবার শেখান হোল, আর ঠিক একই ধরণের আরো কতগুলি নতুন পদও তাকে শেখান হোল। তুলনা করে দেখা গেল, আগের শেখা পদগুলি শিখতে ৩১৭ বার পড়ানো দরকার হোল, আর নতুন পদগুলি শিখতে লাগলো ৪৩৫ বার পড়ানো। কাজেই এখানেও দেখা গেল শিশুকালের অভিজ্ঞতাও মনের মধ্যে থেকে যায়।[১০]

বয়স যত কম, স্মৃতির স্থিতিকাল (latency period) তত কম।[১১]

ভুলি কেন? সময় যত গত হয়, তত আমরা ভুলে যাই। সময়ের গতি এর জন্যে দায়ী নয়—সময়ের মধ্যে যা ঘটে তাই এজন্যে দায়ী—It is not time, but what occurs in time that produces the effect."

(ক) একটা মত হচ্ছে, অ-ব্যবহারের দ্বারা (disuse) স্মৃতির দাগ (memory trace) মলিন হয়ে যায়। শরীরের যে কোন যন্ত্র বা তন্তু বা পেশী সম্বন্ধেই এটা সত্য, যে ব্যবহার না করলে রক্তস্রোত থেকে পুষ্টি আহরণ করতে পারে না এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। হাত ভেঙ্গে গেলে, হাত জোড়া লাগবার জন্যে হাতটা প্লাষ্টার করে দিলে, যে পেশীগুলি নড়াচড়া করতে পারলো না, সেগুলো দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কাজেই কোন পড়া বা কাজ যেটা শেখা গেছে, সেটা আর ব্যবহার না হলে, মস্তিষ্কের তন্তু ও শিরার মধ্য দিয়ে যে পথ তৈরী (Nerve-path) হয়েছিল, সেটার দাগ অস্পষ্ট হয়ে যায়।

(খ) আর একটা মত হচ্ছে, বাধা দ্বারা (interference) স্মৃতির দাগ

৯ C. N. Allen—Individual differences in delayed reaction in infants. Arch-Psych. N. Y. 1931, 19 No 127.

১০ H. E. Burt. An experimental Study of early childhood memory. Final report. J. genet. Psychol. 1941, 58, 287-295.

১১ Hurlock & Schwartz—Child Development P. 230-239.

অস্পষ্ট হয়। একটা কাজ বা পাঠ শেখার সময় মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্তুতে পথ (nerve path) তৈরী হোল, সেটা মস্তিষ্কের অন্য সমস্ত তন্তু ও শিরার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই অন্য কাজ বা পাঠ শেখার সময় সে স্নায়ু-পথ অন্য স্নায়ু-পথের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। শ্লেটে এক লেখার ওপর অন্য লেখা লিখে গেলে, আগের লেখাটা অস্পষ্ট হবেই। কাজেই একটা স্মৃতি পরবর্তী অন্য অভিজ্ঞতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে,—এটা বোঝা শক্ত নয়।

এ-মতের অনুকূলে কতগুলো তথ্য দেওয়া যায়। দিনের বেলায় আমরা বারে বারেই কাজের বদল করি। কিন্তু রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন হয় বিশ্রাম। দিনের বেলা এক অভিজ্ঞতা আর এক অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে কেবলই বাধা দেয়। রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে তা ঘটে না। তাই দেখতে পাই দিনের বেলায় বিস্মৃতির হার (rate) রাত্রে ঘুমের সময়ের তুলনায় অনেক দ্রুততর। একটা পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া গেল। কতগুলো অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি (nonsense syllables) একজন দিনের বেলায় মুখস্থ করে নানা কাজে ব্যস্ত রইলেন। দিনের শেষে দেখা গেল অনেকটাই ভুলে গেছেন। আবার অনুরূপ অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি সেই ব্যক্তি মুখস্থ করার অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষা করে দেখা গেল, ভুলে যাওয়ার পরিমাণ অনেকটা কম। একটা কাজ শেষ করেই আর একটা কাজ সুরু করলে স্মৃতিচিহ্ন (memory trace) নষ্ট হয় বেশী। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলে, সংরক্ষণ দীর্ঘতর হয়। (consolidation)* পাঁচটা দাবার ঘুটির অবস্থান ১৫ সেকেণ্ডের জন্যে লক্ষ্য করে একজন ব্যক্তি মনে রাখতে চেষ্টা করলেন। ঠিক তার পরের মিনিটেই তাঁকে দেওয়া গেল কতগুলি রাশি যোগ করতে। যোগ শেষ হওয়া মাত্রই তাঁকে দাবার ঘুটিগুলি আগের জায়গায় ঠিক ঠিক বসাতে বলা হোল। শতকরা পঞ্চাশটাই তাঁর ভুল হোল। তাঁকে ১৫ সেকেণ্ড আবার ঘুটিগুলি লক্ষ্য করতে দেওয়া হোল। তারপর এক মিনিট তাঁকে বিশ্রাম করতে দেওয়া হোল। তারপর ঘুটিগুলি জায়গা মত বসাতে বসাতে তার ভুল আগের বারের তুলনায় অর্দ্ধেক হোল। এ ধরণের বাধাকে বলা হয় পশ্চাৎ-ক্রিয়াশীল বাধা (retroactive inhibition)। এ সব ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে

* Van Ormer—E. B.—Retention after intervals of sleep and of waking Arch Psychol, 1932, No 137.

দেখা গেছে সংরক্ষণের শক্তি শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়।* এ-থেকে বোঝা যায় যে শেখা হয়ে গেলে পর, অধীত বিষয়কে মনে সংরক্ষিত হবার জন্য কিছু সময় দেওয়া দরকার। এই মতকে বলা হয় সংরক্ষণ মতবাদ (Consolidation)। অর্থাৎ শেখা হয়ে যাবার পরেও স্নায়ুপথে গঠনের কাজ চলতে থাকে। তখন বাধা পেলে, মনে সংরক্ষণের কাজ ভাল হতে পারে না। কখনও কখনও দেখা যায় শারীরিক (বিশেষতঃ মস্তিষ্কের) বা মানসিক আকস্মিক গুরুতর আঘাত পেলে, আঘাতের সময়ের এবং তার পূর্বেরও কিছুক্ষণ সময়ে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার স্মৃতিলোপ পায়। এটাতেও বাধাদ্বারা স্মৃতিহ্রাস এই মতের (Interference theory) সমর্থন পাওয়া যায়। একটা জার্মান প্রবাদ আছে আমরা গ্রীষ্মকালে বরফের উপর স্কেটিং খেলার কায়দাটা আয়ত্ত করি, আর শীতকালে শিখি সাঁতারের কায়দা (We learn to skate in summer and swim in winter)। জেমস্ এ মতকে সমর্থন করেছেন। এ মতের অর্থ হচ্ছে যখন কোন কাজ অভ্যাস করি না, তখনও পূর্ব অভ্যাসের জের চলতে থাকে। অসমাপ্ত ক্রিয়ার সমাধান মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ঘটতে থাকে, যখন ক্রিয়ার অভ্যাস চলছে না। বুক্ (Book) এ সম্পর্কে বলেছেন শিক্ষার সময় দেহ-মনের যে সব বাধা, মনের নানা বিক্ষিপ্ত অবস্থা কখনো কখনো বর্তমান থাকে, তা সময়ের সঙ্গে দূরীভূত হয়, কাজেই শিক্ষার ক্রিয়ার উপযুক্ত সংযোগগুলি অভ্যাস ব্যতিরেকেও কার্যকরী হয়। অনেক সময় অভ্যাসই কতগুলি ভুল সংযোগ স্থাপন করে, শিক্ষার পথে বাধা ঘটায়। থর্ণডাইক এ মতের ঘোরতর বিরোধী, কারণ এমত তাঁর পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্রের—Law of Exercise) বিপরীত। থর্ণডাইক্ বলেন অনভ্যাসের ফলে শিক্ষার কাজ অগ্রসর হোল, এটা হ'তেই পারে না। হয়তো পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সময়, দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, হয়তো কাজটা পুরোনো বলে মনে আগ্রহ আকর্ষণ করতে পারছিল না, অথবা মানসিক উদ্বেগ প্রয়োজনীয় সংযোগসূত্র স্থাপনে বাধা ঘটাচ্ছিল, ক্রিয়ার বিরতির ফলে সে সব বাধা দূর হওয়াতে শিক্ষা দ্রুততর হোল। আগে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলটা আকস্মিক বাধাগুলি দূর হওয়ায় প্রকট হোল। কাজেই এখানে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্রই কাজ কচ্ছে। স্যাণ্ডিফোর্ড থর্ণডাইকের সমর্থক। কিন্তু যাইগারনিকের পরীক্ষার ফল এ

* Woodworth—Psychology.

মতের পরিপোষক নয়। অসমাপ্ত ক্রিয়া বিরতির ফলে তার স্বাভাবিক পরিণতি খুঁজে পায়, এই হচ্ছে সমগ্রবাদীদের মত। উডওয়ার্থও এ মতটা মানেন।

(গ) ফ্রএড পন্থীরা এ ভোলা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে। তাঁরা বলেন আমাদের অহংবোধ বড় প্রবল,—যখন আমরা সচেতন নই তখনও এই অহং অবচেতন মনে অতন্দ্রভাবে জেগে থাকে। যা আমাদের এই অহংকে পীড়া দেয়, লজ্জা দেয়, তার উপর সে শোধ তোলে, তাকে বিস্মৃতির রাজ্যে নির্বাসন দিয়ে। এটাকে তাঁরা বলেন অবদমন (repression)। কাজেই দেখা যায়, আমরা এমন ঘটনাগুলো ভুলে যাই যেগুলি আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, অপ্রীতিকর, যা আমাদের অহংকারকে আঘাত করে। তাই দেনাগুলো ভুলে যাই, কিন্তু পাওনাটা স্মরণ রাখি। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, "অবদমন জৈব-প্রয়োজনেই ঘটে ; যা প্রাণীর পক্ষে বেদনা-দায়ক, বা অস্বস্তিকর তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এটা হচ্ছে আত্মরক্ষার উপায় (defense mechanism)। কাজেই বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা মনে রাখতে অস্বীকার করার মূল্য দিয়ে, মন শান্তি ক্রয় করে। আমাদের প্রাপ্য চেক্‌গুলির কথা মনে রাখি, কিন্তু যে বিল্‌গুলি শোধ করতে হবে তা আমরা ভুলে যাই—"We remember our cheques, but forget our bills।"* যে অভিজ্ঞতা প্রীতিপ্রদ মন তাকে ধরে রাখে (Law of effect)। অনুভূতির সঙ্গে মনে থাকার সম্বন্ধ নিয়ে র‍্যাপাপোর্ট (Rapaport) অনেক আলোচনা করেছেন। রাগ, ভয়, দুঃখ ইত্যাদি তীব্র অনুভূতি মনে রাখার পক্ষে বিঘ্ন।* কার্টারের (Carter) একটি পরীক্ষা ফ্রয়েড পন্থীদের এই সিদ্ধান্ত যে, যা অপ্রীতিকর তা মনে থাকে কম, তাকে সমর্থন করে। তিনি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ৫০টি ছেলে ও ৫০ টি মেয়েকে ৯ টি শব্দের তালিকা মুখস্থ করতে দেন। এর মধ্যে কয়েকটি তালিকায় ছিল অত্যন্ত প্রীতিকর ও লোভনীয় দ্রব্য ও ঘটনার নাম। কয়েকটি তালিকা ছিল যা মাঝারী রকম প্রীতিপ্রদ বা ভালও নয় মন্দও নয় এমন দ্রব্য ও ঘটনার নাম। কয়েকটি তালিকায় ছিল অল্প অল্প বিরক্তিকর দ্রব্য বা ঘটনার নাম। আবার কয়েকটি তালিকায় ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর দ্রব্য বা ঘটনার নাম। পরীক্ষায় দেখা গেল অত্যন্ত

* Sandiford—Educational Psychology, P. 248

‡ Rapaport—Emotions & Memory

প্রীতিপ্রদ তালিকাটি সব চেয়ে বেশী সংখ্যক ছেলেমেয়ের মনে থাকছে; সব চেয়ে অপ্রীতিকর তালিকাটি সব চেয়ে কম ছেলের মনে থাকছে।*

(ঘ) ভোলার কারণ সম্পর্কে ব্যবহারবাদী মনস্তাত্ত্বিক ওয়াট্‌সন্ এর আর একটা মত রয়েচে। তিনি বলতে চান যে, সেই ঘটনাই শুধু আমরা মনে রাখতে পারি যে গুলোর সঙ্গে আমরা কথায় সম্পর্ক (verbal association) স্থাপন করতে পেরেছি। একটা বাগানে বেড়াতে গেলাম,—দেখলাম দক্ষিণে আটটা সুপুরী গাছ রয়েছে, পশ্চিমে তিনটে আম গাছ ও কাঁঠাল গাছ, পুবে রয়েছে সন্ধ্যামালতীর ঝাড়। মাঝখানে বেলী, রজনীগন্ধা গোলাপ, হেনা, জবা আর মরসুমী বা সৌখিন ফুলের বেড্ রয়েছে দশটা। মনে মনে এটা লক্ষ্য করলুম। ওয়াটসন্ বলবেন, নিজের কানে কানেই নীরবে কথা বলা হোল,—Thinking is subvocal speech;—অথবা, এগুলো নিয়ে আর কারো সঙ্গে আলোচনা করলুম—তা হলে এবার চোখের স্মৃতির সঙ্গে বাচনিক স্মৃতির ডোর বাঁধা হোল,—এটা মনে রইল। এটা ভুলতে দেরী হবে। তিনি বলেন, শিশুকালের প্রথম চার বছরের কথা আমাদের মনে থাকে না তার কারণ তখন বাচনিক সংযোগ ঘটবার সুযোগ হয় না, "আমরা যে জীবনের প্রথম তিন চার বৎসরের কথা মনে রাখতে পারি না, তার কারণ হচ্ছে সে সময় ভাষা আয়ত্ত হয় না।"

(ঙ) সমগ্রবাদীরা বলেন, প্রত্যেক কাজই তার স্বাভাবিক পরিণতি বা সমাপ্তি খোঁজে। যে কাজটি বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেটি মনের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করে ও মনে থেকে যায়। একে বলা হয় অসমাপ্ত কাজের অধ্যাবসায়ী বৃত্তি (Persevartion)। কাজেই যে ক্রিয়া তার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে সমাপ্ত হোল, তা মনে কোন উদ্বেগ রেখে যায় না। তাই তা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, তাই সারাদিনের অধিকাংশ ছোটখাটো ঘটনা আমরা মনে রাখি না। ইতিপূর্বে (নবম অধ্যায়) যাইগ্যারনিক্ এর পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পরীক্ষার ফলেই এই সিদ্ধান্ত করা হয়।

এই মতগুলোর কোনটাকেই "একমেবাদ্বিতীয়ম" মনে করলে ভুল হবে। প্রত্যেকটা মতই কতগুলো ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারে। এ মতগুলো আপাত-বিরুদ্ধ মনে হলেও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

ভোলবার-হার এবং ভোলা সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত—যে পড়া বা

* Carter—Effects of emotional factors upon recall. J. Psychol. 1935

কাজ শেখা হয়েছে, অনভ্যাসে তা আমরা ভুলে যাই। কিন্তু সকলের ভোলার হার সমান নয়। কেউ তাড়াতাড়ি ভোলে, কেউ ভোলে দেরীতে। অনেকগুলো পেশীর একত্র ব্যবহার যেসব কাজে লাগে যেমন, সাঁতার কাটা, বাইসিকেল চালানো, টাইপ করতে শেখা,—এগুলো একবার শিখলে প্রায়ই একেবারে ভুলে য়াওয়া যায় না। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপার, যাতে ভাষার ব্যবহার দরকার, সেগুলি কিন্তু ঠিক অতদিন মনে থাকে না। যে কাজ বা পড়া আমরা খুব বারে বারে করে বা পড়ে শিখেছি (over-learned), সেগুলি আমরা খুব শীগ্‌গির ভুলি না। যেখানে মিল আছে, ছন্দ আছে বা যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ (logical relations) আছে, যা অর্থপূর্ণ,—তা আমরা ভুলি অনেক ধীরে ধীরে। আবার অনভ্যাসের দ্বারা কোন জিনিষ ভুলে গেলে, তা পুনরায়ত্ত করতে আগের মত অতো সময় লাগে না। ভোলার হারটা গোড়াতে খুব দ্রুত,—পরে সেটা মন্থর হয়ে আসে। একদল লোক আছে যারা দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে, এবং মনেও রাখতে পারে অনেকদিন। এটা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ আবার একদল লোকের পড়া বা কাজ আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগে এবং একবার আয়ত্ত হলে সহজে ভোলে না। আর একদলের আয়ত্ত করার ক্ষমতা অতি দ্রুত, ভুলেও যায় তারা দ্রুত। অপর দল আয়ত্ত করতে যেমন সময় ব্যয় করে, তেমনি তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। এরা বোকা। লিয়ন্‌ (Lyon) কতগুলো পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত কচ্ছেন, "এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত যে অর্থপূর্ণ বিষয়গুলি যারা শীঘ্র আয়ত্ত করতে পারে, তারা মনেও রাখতে পারে দীর্ঘ দিন। যারা যত বেশী বুদ্ধিমান, তাদের স্মরণশক্তিও বেশী।"

জেমস্‌-এর মতে স্মরণশক্তি জন্মগত, এবং একে খুব বেশী পরিবর্তন করা চলে না,—"কোন ব্যক্তির জন্মগত সাধারণ স্মরণশক্তি শত অভ্যাস ও চেষ্টা দ্বারাও পরিবর্তন সম্ভব নয়।" অবশ্য সকলে তাঁর মত সমর্থন করেন না।

এ সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষার উল্লেখ করা যাচ্ছে। রেজাল্‌ (Rejall) সাড়ে তিন বৎসর অনভ্যাসের ফলে টাইপরাইটিং কতটা ভুলেছেন, (বা কতটা মনে রেখেছেন) তা নিয়ে পরীক্ষা করলেন ; টাইপরাইটিং শেখার শেষ দু'সপ্তাহ তিনি মিনিটে ২৫টি শব্দ টাইপ করতে পারতেন এবং তার ভুলের পরিমাণ ছিল শতকরা ৪। সাড়ে তিন বছর পর আবার পরীক্ষা করে প্রথম পাঁচদিনে ক'টি শব্দ তিনি টাইপ করতে পেরেছিলেন, এবং কতটা ভুল হয়েছিল তা নীচে দেওয়া হোল। প্রথম দিন, প্রতি মিনিটে ১৮·৭৫ শব্দ টাইপ করলেন, ভুলের

পরিমাণ শতকরা আট। দ্বিতীয় দিন ১৮·৯ ও ভুল ৭⅓%; তৃতীয় দিন ২১, ভুলের পরিমাণ ৬·২%; চতুর্থ দিন ২২·১, ভুল ৫%; পঞ্চম দিন ২২·৫, ভুল ৮⅓%। পাঁচ ঘণ্টা অভ্যাস করে তিনি পূর্বে—৩০ ঘণ্টা অভ্যাসের ফলে যে

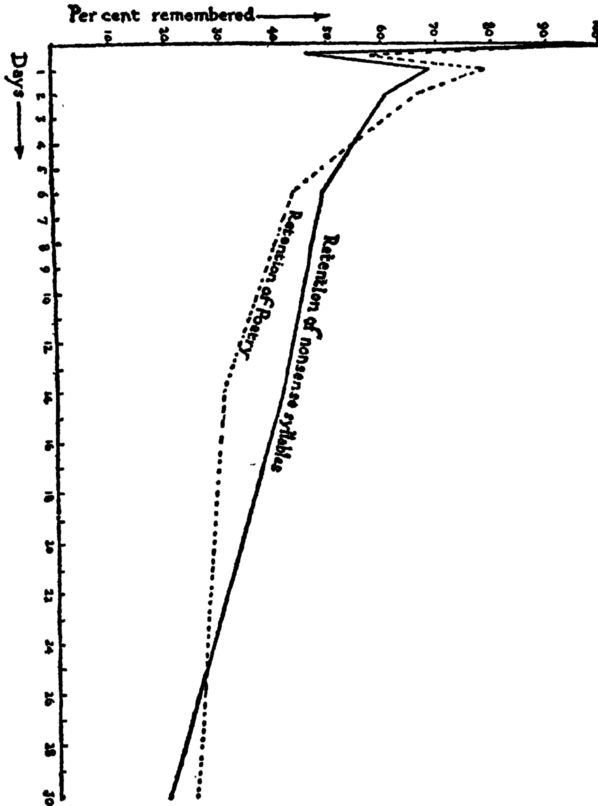


Fig. 27. Curves of forgetting nonsense Syllables & poetry.
(From Sandiford—Educational Psychology, P. 243, Fig. 51, Longmans Green & Co).

দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা প্রায় ফিরে পেলেন। স্যাণ্ডিফোর্ড ১৮৯৫ সালে স্কেটিং শিখেছিলেন, মাঝে ১৮ বছর এ অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর

পরে আবার স্কেটিং সুরু করে দেখলেন, পূর্বের দক্ষতা খুব কমই হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ১৯০৬ সাল থেকে ডেনমার্কে দু'বছর থাকতে তিনি ড্যানিস্ ভাষা শিখেছিলেন, কিন্তু ১৯১৩ সালে দেখলেন, সবটাই প্রায় ভুলে গেছেন। দু'তিন মিনিট বহু চেষ্টা করেও তিনি ড্যানিস ভাষায় ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণতে পারলেন না। এবিংহজ, বোরিয়াস্, এঁরা ভোলার হার নিয়ে পরীক্ষা করেছেন—অর্থহীন বর্ণসমষ্টি নিয়ে এবং কবিতা নিয়ে। নীচে তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল ছবি এঁকে দেখান হোল।

পূর্বেই বলা হয়েছে অতিরিক্ত শেখা (overlearned) বিষয় আমরা কম ভুলি। যত বেশী অতিরিক্ত শেখা হয়, ভুলে যাওয়া তত মন্থর। গেটস্ নীচের ছবি দিয়ে ফলটা প্রকাশ কচ্ছেন।

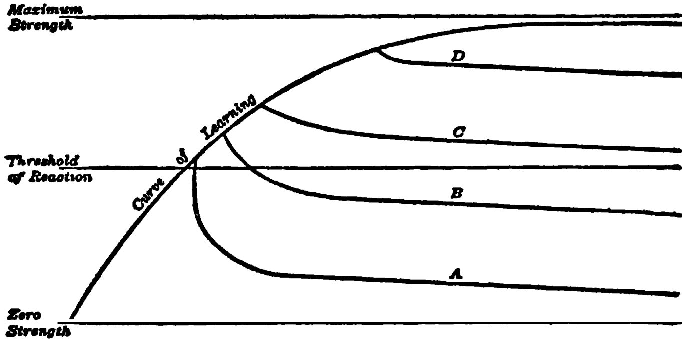


Fig. 27 A. "Curves showing the Probable influence of disuse in the case of functions over-learned in various degrees. A shows the loss of forgetting when the function is barely learned. The initial loss is rapid and great, followed by a much slower rate of detorioration. B. C. D show probable losses in functions which are over-learned slightly, considerably, and greatly respectively," (Gates, "Psychology for Students of Education." —Macmillan & Company. N, Y.

৩। **মনে করা (Recall)**—কোন বিষয় শেখা হলেই যে তা পূর্ণভাবে মনে সংরক্ষিত হবে এবং পরে তাকে যে স্মৃতিপটে ফিরিয়ে আনা যাবে, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন কি সম্পূর্ণভাবে মনে থাকলেও অনেক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা তাকে মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারি না। পরীক্ষার হলে বসে, জানা ও শেখা জিনিষ মনে আনতে পারলুম না—এ রকম দুঃখজনক

অভিজ্ঞতা বোধ হয় সকলেরই আছে। বাস্তবিকপক্ষে পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে এটা একটা অভিযোগ যে এতে বিদ্যা ও বুদ্ধির পরীক্ষার চেয়ে স্নায়ুর পরীক্ষাই বেশী।

এই বাধা সৃষ্টির পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। ভাবাবেগের ফলে যেমন, ভয়, উদ্বেগ, আত্মসচেতনতা ইত্যাদির জন্যে ভাল করে জানা ও শেখা জিনিষও আমরা ভুলে যাই। আবার একই বিষয় সম্বন্ধে একাধিক স্মৃতি মনে ভিড় করে এলে অনেক সময় বিষয়টি মনে করা ও প্রকাশ করা যায় না।

অনেক সময় পুরোপুরি ভাবে মনে করতে না পারলেও আংশিকভাবে মনে করা যায়। যে নামটি মনে করতে চাই হয়তো সে ধরণেরই একটা নাম মনে পড়ল, কিছু মিল আছে, কিন্তু সেই নামটি নয়। বাল্যকালের স্মৃতি পরবর্ত্তী কালে মনে আনা সম্পর্কে ডুদিচা ও ডুদিচা (Dudycha and Dudycha) অনেক পরীক্ষা করেন। এ সব পরীক্ষার ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন (১) তিন চার বছর বয়সের আগের কথা মনে আনা যায় না (২) মেয়েরা সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে বেশী বাল্যকালের কথা মনে আনতে পারে। (৩) বাল্যকালের স্মৃতির মধ্যে দৃষ্টিগত অভিজ্ঞতাই (visual experience) প্রধান। (৪) যতটা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যায়, প্রীতিকর অভিজ্ঞতার সংখ্যা তার প্রায় দ্বিগুণ। (৫) যারা যত বেশী বুদ্ধিমান—তারাই তত বেশী পূর্ব অভিজ্ঞতা মনে আনতে পারে। (৬) বাল্যকালের ঘটনার সঙ্গে ভয় বা আনন্দের স্মৃতি সব চেয়ে বেশী জড়িত থাকে। (৭) বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন প্রভেদ নেই।

বাল্যকালের বিস্মৃত ঘটনা আবার মনের মধ্যে ডেকে আনার জন্যে ইউরোপে অনেক সময় শূন্য স্ফটিকগোলকের দিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে দেখা, (crystal gazing) বিনা আয়াসে যা খুসী তাই লিখে যাওয়া (automatic writing) ইত্যাদি প্রক্রিয়ার প্রচলন আছে। এ দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার থেকেই ফ্রয়েডের মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী (free association method) এর উদ্ভব। সোজাসুজি যখন অতীতের ঘটনা মনে পড়ে না তখন আমরা সেই ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত অন্য দ্রব্য বা ঘটনার সাহায্যে ঘটনাটি মনে করতে চেষ্টা করি। এ চেষ্টা যুক্তি-সঙ্গত।

৪। **পরিচিতি—Recognition**—পুরানো স্মৃতি মনে ফিরে এলেই মনে করা সম্পূর্ণ হলো না। ঘটনার স্থান, কাল, পাত্র সবই যখন মনে পড়ে,

এবং আমারই জীবনে ঘটেছিল, সে কথাও যখন মনে হয়, সেই পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা থাকলেই মনে করা পূর্ণ হয়। ট্রামের মধ্যে একটি মুখ অস্পষ্টভাবে চেনা-চেনা মনে হলো। বারে বারে তাকিয়ে মনে পড়ল আরে, ও যে অবনী বরিশালে পাঠশালায় একসঙ্গে পড়েছি, চুরি করে ডগ্‌লাস্ সাহেবের বাড়ীর পেয়ারা খেতে গিয়ে ওকে কুকুরে কামড়েছিল। এর নাম পরিচিতি (recognition) বা চেনা। এ চেনায় ভুল হতে পারে। অনেক সময় চেষ্টা করে চিনতে হয়। প্রথম অভিজ্ঞতার সময় যদি সাবধানে দ্রব্য বা ব্যক্তির গুণগুলি লক্ষ্য না করা হয়, তাহলেই দীর্ঘদিন ব্যবধানে চেনা কঠিন হয়।

স্মৃতির প্রকারভেদ :—আমরা যে উপায়ে মনে রাখি ও যে প্রকার বিষয় ভাল মনে রাখতে পারি, সে অনুযায়ী স্মৃতি-শক্তির প্রকার ভেদ করা যায়।

পাখী-পড়া স্মৃতি—Rote memory—অর্থ ও সম্বন্ধহীন বস্তু কেবলমাত্র পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা মনে রাখার ক্ষমতাকে রোট্ মেমারী (Rote memory) বলা হয়। ক্র্যামিং (Craming) বা তোতা পাখীর মত মুখস্থ এই পর্য্যায়ে পড়ে। এ জাতীয় স্মৃতিশক্তির সামান্যই উন্নতি সাধন সম্ভব।

যুক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল স্মৃতি-Logical memory—যখন কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও অর্থ খুঁজে বার করে, তার সাহায্যে মনে রাখা যায়, তাকে লজিক্যাল মেমারী বলে। এই প্রকার স্মৃতিশক্তির উন্নতিই সব চেয়ে লাভজনক।

বিচ্ছিন্ন ঘটনার স্মৃতি—Desultory memory—অনেকে নাম, তারিখ ও বিভিন্ন ঘটনাবলী সহজেই মনে রাখেন, এ অনেকটা জন্মগত ক্ষমতা। একে উইলিয়াম্ জেমস্ ডেস্‌ল্টরী মেমারী desultory memory বলেছেন। "আবার এমন কোন কোন লোক আছে যারা অনায়াসে বিভিন্ন নাম, ঘটনা, ঠিকানা, গল্প, কেচ্ছা, কবিতা উদ্ধৃতি হরেক রকমের পাঁচমিশেলী খবর মনে করে রাখতে পারে। তাদের এই ক্ষমতা মস্তিষ্কের স্নায়ুবস্তুর ধৃতি শক্তির জন্যেই ঘটে, এতে কোন সন্দেহ নেই।"*

স্মৃতিশক্তি কি বাড়ানো যায় ? এমন কোন্ পরীক্ষার্থী আছে যে পরীক্ষা এগিয়ে এলে স্মৃতি শক্তি বাড়ানোর আকাঙ্খায় ব্রাহ্মীঘৃত, ক্যালিফস্, ফসফোলেসিথিন্, ব্রেনোলিয়া ইত্যাদি ঔষধ সেবন করেনি অথবা একই উদ্দেশ্যে জবাকুসুম, মহাভৃঙ্গরাজ বা অনুরূপ "বহুগুণ সম্পন্ন কেশতৈল," ব্যবহার

* William James.—Principles of Psychology. Vol. I. P. 659-660.

করেনি? স্মৃতি শক্তির সঙ্গে দেহের, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের সুস্থতা ও সতেজতার অবশ্যই সম্বন্ধ আছে। সেদিক থেকে এ চেষ্টা নিরর্থক নয়। জেমস্ এর মতে স্মৃতি শক্তি বাস্তবিক পক্ষে জন্মগত এবং মস্তিষ্কের স্নায়ুবস্তুর গুণ ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাই এর বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। এমত অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করেন না। স্মৃতি শক্তি একটি মাত্র অবিভাজ্য ক্ষমতা নয়, এবং এটা সম্পূর্ণ দেহগতও নয়। আমরা দেখেছি স্মৃতি ব্যাপারটি শেখা, মনে রাখা, মনে আনা, আর মনে চেনা এ কয়টি ক্রিয়ার সমন্বয়ে। মনে আনা, আর চেনা এ দুটি ক্রিয়া অনেকটা অস্পষ্ট, এদের জন্য নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ধারণ কঠিন। তথাপি যেখানে ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা হয়, যেখানে নানা সম্বন্ধ দিয়ে ঘটনাটি মনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, আর যেখানে ঘটনাটি ভালো লাগে, তা মনে আনা আর চেনার সাহায্য করে। শেখা ও মনে রাখার বেলায়ও এ কথাগুলি সত্য। তবে শেখা ও মনে রাখা এ দুটি ক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কি করে সহজে শেখা যায়, কি করলে অনেকদিন মনে থাকে এ নিয়ে আলোচনা করেছি।* এ সব আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে স্মৃতির বিভিন্ন ক্রিয়াকে চেষ্টা দ্বারা কতকটা উন্নত করা যায়।

"ভুলি কেমনে?"—জীবনে অনেক দুঃখময় অভিজ্ঞতা আমরা ভুলে যেতেই চাই। আমরা প্রিয়জনকে হারাই, তাকে স্মরণ করে বুক ভেঙ্গে যায়। যাকে বিশ্বাস করেছি, সে ভুল বুঝে, দুঃখ দেয়। অন্যায় করেছি, লজ্জা পেয়েছি, অপদস্থ হয়েছি,—এমন অপ্রীতিকর স্মৃতি আমরা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাই। ফ্রয়েড-পন্থীরা বলবেন, তা পারিও। কিন্তু সেটা অবচেতন মনের দুরূহ ব্যাপার। সেটাকে সচেতন ভাবে কাজে লাগানো যায় না। তাই সমস্যা হোল, চেষ্টা করে সচেতন ভাবে আমরা ভুলতে পারি কি না? ওপরের আলোচনা থেকে কিছুটা উত্তর আমরা পেতে পারি। যেটা ভুলতে হবে সেটা পুনরাবৃত্তি না করলে তার স্মৃতি দুর্বল হবে। সেই ঘটনার সঙ্গে যে সব বস্তু বা ঘটনার সংযোগ ঘনিষ্ঠ তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। খেলা-ধূলা, মাটি কোপানো শারীরিক পরিশ্রমের কাজ অল্প বিস্তর প্রতিষেধক। দেশ-ভ্রমণও ভাল। যা মনকে টেনে রাখতে পারে এমন গভীর মনোনিবেশের কাজ দুঃখময় স্মৃতি ভুলে থাকার সাহায্য করে। যা মনকে ধরে রাখতে পারে,

---

† 'মনোযোগ' এবং 'পড়া-শেখা কাজ-শেখা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

এমন কাজে ডুবে থাকতে পারলে সাংসারিক দুঃখময় স্মৃতির হাত থেকে, অন্ততঃ সাময়িক নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এমন একটি পরম সান্ত্বনার স্থল হচ্ছে ধর্ম ও সদালোচনা। তবুও হয়তো বেদনাপূর্ণ স্মৃতি বারে বারে মনের দুয়ারে এসে হানা দেবে। অনেক সময় জোর করে আমরা ভুলতে চেষ্টা করি, কখনো কতকটা সফলও হই তাতে। কিন্তু এর বিপদ আছে। কারণ এর একটা শারীরিক দিক আছে। ক্ষুধামান্দ্য, হৃৎস্পন্দন, মাথা ঘোরা ইত্যাদি ব্যাধিই শুধু নয়, এর ফলে কখনো কখনো দৃষ্টিহানি বা পক্ষাঘাতও ঘটতে দেখা গেছে। তা' ছাড়া এতে নানারকম মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি ঘটে (neurosis and complexes)। সুতরাং জোর করে ভোলার চেষ্টা বিপদজনক। ঘটনাটার সবটা স্থিরভাবে চিন্তা করে,—তার সবটা দুঃখ ও বেদনার মুখোমুখি হতে পারলে বরং তার চেয়ে সুফল লাভের আশা বেশী, যদিও প্রথম অবস্থায় মানসিক বেদনার পরিমাণ তাতে যথেষ্ট হতে পারে। উডওয়ার্থ বলছেন, "যে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা স্মৃতিপথে আনতে ঘৃণা বোধ করি, তেমন কোন অভিজ্ঞতায় জড়িত হয়ে পড়লে, শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সোজাসুজি ঘটনাটির সম্মুখীন হয়ে, শেষ পর্যন্ত সেটা ভেবে দেখা এবং যে পর্যন্ত এ সমস্যার সঙ্গে সন্তোজনক সমন্বয় না হয়, সে পর্য্যন্ত অবিরাম ভাবে যা এই অবস্থায় করা কর্ত্তব্য তা করে যাওয়া।"*

* Woodworth—Psychology.

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষায় সংক্রামণ

যখনই আমরা কিছু শিখি বা শেখাই তখন এই ভরসা আমাদের থাকে যে যা শেখা হোল, কিছু পরিবর্ত্তিত অবস্থায়ও সে শিক্ষা কাজে লাগবে। যে ছেলে যত্ন করে অঙ্ক শিখলো, সে সম্ভবতঃ বড় হয়ে যখন ব্যবসা চালাবে তখন সাবধানতা, নির্ভুলতা ইত্যাদি যে গুণগুলি আয়ত্ত করেছিল, সে গুণগুলি দ্বারা উপকৃত হবে। এটা সাধারণ ভাবে সত্য যে এক বিষয়ে শিক্ষা অন্য বিষয়ে শিক্ষাকেও প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু ব্যাপারটা আর একটু সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচনা করবার প্রয়োজন আছে। কতগুলি প্রশ্ন এ সম্বন্ধে জাগে যেমন, এক বিষয়ে শিক্ষার দ্বারা যে জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত হোল তা কি ভবিষ্যতে অনুরূপ বিষয়েই কার্যকরী হবে, না তা সাধারণ ভাবে সর্ব-ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে? হারমোনিয়াম বাজাতে শিখলে, সে শিক্ষাটা পিয়ানো বাজনা শেখায় যেমন কাজে লাগাবে, তেমনি কর্ণেট বাজানো শেখার বেলায়ও কাজে লাগবে? অথবা কাঠ র্যাঁদা করা শেখার বেলায়ও? মানসিক বৃত্তির কোন এক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অন্য বৃত্তির বেলায়ও কাজে লাগবে কি?- অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা এদের কোন একটির চর্চায় মনের অন্য বৃত্তির ও উৎকর্ষ ঘটে কি? যদি এটা সত্য হয়, তবে আরো এগিয়ে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে মৌলিকতা, উপস্থিতবুদ্ধি, ধৈর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, যুক্তিপরায়ণতা, নির্ভরযোগ্যতা, অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের উপযুক্ত প্রধান উপাদানগুলি কি কোন এক বিষয়ের শিক্ষা দ্বারাই আয়ত্ত হতে পারে? এবং যদি পারা যায় তবে সে বিষয়গুলি কি, কি সে বিশেষ শিক্ষার উপায়, এবং এ শিক্ষার উপযোগিতার ক্ষেত্র কতটা বিস্তৃত?

এক বিষয়ে শিক্ষার প্রভাব অন্য বিষয়েও যে বিস্তার, তাকেই আমরা বলেছি ফর্মাল ট্রেণিং বা শিক্ষায় সংক্রামণ। এ প্রভাব অনুকূল বা প্রতিকূল দুই-ই হতে পারে। যদি গান শিখলে নাচ শেখার বেলায় তা সহায়ক হয় তবে তাকে বলা হয় পজিটিভ ট্রান্সফার। আবার এক ধরণের কি-বোর্ডে (Key-board) টাইপ করতে শিখলে, ভিন্নভাবে সাজানো কি-বোর্ড-ওয়ালা টাইপ-রাইটারে কাজ করতে প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধাই হয়—শিক্ষার এই প্রতিকূল প্রভাবকে বলা হয় নেগেটিভ ট্রান্সফার।[১]

---

১ Boring Longfeld and Weld—Foundations of Psychology. P. 177.

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ রকম সংক্রামণ ঘটে। কতগুলি বিষয় আছে যাদের শিক্ষায় মনের অনেক সদবৃত্তিগুলির বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পেশী সঞ্চালন দ্বারা যেমন দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্য আয়ত্ত হয়, তেমনি মনের পেশীগুলি ও উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা দৃঢ় ও সবল হয়, এবং তার প্রত্যক্ষ ফল মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি মানসিক সদবৃত্তির পুষ্টি ও উন্নতি।[২] এ মতবাদকে ট্রান্সফার অব-ট্রেনিং, মেন্টাল ডিসিপ্লিন, ফর্মাল্ ডিসিপ্লিন্, ফর্মাল ট্রেনিং ইত্যাদি আরো নাম দেওয়া হয়েছে। থর্ণডাইক এই মতবাদের সূত্রটি এইভাবে প্রকাশ করেছেন, "সাধারণতঃ এ কথা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে মনের কতগুলি মৌলিক বৃত্তি আছে, যথা—নির্ভুলতা, দ্রুততা, প্রভেদবোধ, স্মৃতি, নিরীক্ষা, মনোযোগ, নিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি। এগুলি যে কোন বিষয় নিয়েই আমরা কাজ করি না কেন, আমাদের সহায়ক। এবং এ বৃত্তিগুলি কতগুলি বিষয় অবলম্বন করে অনেকটা পরিমাণে পরিবর্তন করা চলে, এবং এ পরিবর্তনগুলি অন্য বিষয় শিক্ষার বেলায়ও কার্যকরী থাকে। কাজেই কোন এক বিষয়ে কাজটি সুসম্পন্ন করবার শিক্ষাটি আয়ত্ত করলে অদৃশ্য ভাবে সেই শিক্ষার কৌশলটি অন্য যে বিষয়ে বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে দৃশ্যতঃ কোন সাদৃশ্য নাই সেখানেও কাজে লাগে।"[৩]

এক বুড়ো হেডমাষ্টার ছিলেন, তিনি আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্যে রোজ স্মাইল্‌সের 'সেলফ্-হেলপ্' থেকে পঞ্চাশ লাইন মুখস্থ করতে দিতেন। এই একই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিলেতে স্কুলগুলিতে ল্যাটিন, অংক ও ব্যাকরণ শেখার উপর জোর দেওয়া হত। তাঁরা বলতেন, ল্যাটিন ব্যাকরণের শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদি সূক্ষ্ম খুটিনাটি শিখতে অভ্যস্ত হলে অন্য সব বিষয়েও ছাত্রদের মনোযোগ ও খুটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেবার শক্তি বাড়বে। এ বিষয়গুলি জ্ঞানবৃদ্ধি তো করেই, তা ছাড়া মনের ক্ষমতাই এদের চর্চায় বেড়ে যায়। শিক্ষার কোন ক্ষেত্রে কি বিষয় শেখা হচ্ছে, সেটা প্রধান কথা নয়—আসল কাজ হচ্ছে মনের গড়নটাই (form) তৈরী করে তোলা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যাণ্ডের স্কুলগুলিতে অবশ্য পাঠ্য-বিষয় কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির ফলে

---

২ Garrett—Great Experiments in Psychology P.—52.

৩ Thorndike—Quoted by Hamley in "The cognitive aspects of transfer of training"—Report of the Consultative Committee on Secondary Education. H. M. S. O. 1938.

স্কুলে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষা দেওয়ার কথা ওঠে। ল্যাটিন, গ্রীক্ ইত্যাদি প্রাচীন ভাষা ও ব্যাকরণের পরিবর্তে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাব হয়। যাঁরা এ প্রস্তাব করেন, তাঁরা বলেন, এ সব পুরাণো ভাষা জীবনের কোন প্রয়োজনে আসে না। এ শিক্ষায় ছাত্ররা কোন রস পায় না, তাদের কোন উপকার হয় না। তারা শুধু পরীক্ষা পাশের তাগিদে এ বিষয়গুলি না বুঝেই মুখস্থ করে। এর উত্তরে মিঃ আর্থার সিজউইক এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, খুটিনাটি বিষয়ে নির্ভুলতা (accuracy), মনের সূক্ষ্মবৃত্তির বিকাশ (subtlety), তাৎপর্য্যজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির (Sense and Judgment) উদ্বোধন এই সব প্রাচীন ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা দ্বারা যতটা হতে পারে এমন আর কিছুতেই হতে পারে না। "অংক সম্পর্কে বলা হোল এতে মনোযোগের উপর প্রভুত্ব জন্মে, শুদ্ধ চিন্তাশক্তি ও যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়ে।" সেই সময় থেকেই শিক্ষার সংক্রামণ সমস্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুরু হয়েছিল।

শিক্ষায় সংক্রামণ মতবাদের পিছনে মনের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে একটি বহুল প্রচারিত অথচ ভুল ধারণা আছে। এ ধারণা হচ্ছে, মন একটা জটিল যন্ত্রের মত, তার অনেকগুলি অবস্থার বিন্যস্ত অংশ বা শক্তি (faculties) আছে—যথা মনোযোগ, স্মৃতি, বিচাবুদ্ধি ইত্যাদি। এদের যে কোন বৃত্তি অনুশীলনের দ্বারা বৃদ্ধি করা যায় এবং একবার আয়ত্ত হলে এর ফল জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় কার্যকরী হয়। তাই শিক্ষাবিদের একটি কাজ হবে এমন কতগুলি বিষয়, উপায় বা কৌশল বেছে নেওয়া, যার মধ্য দিয়ে মনের বৃত্তিগুলির সতেজতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। স্কুলের অবশ্য-পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোনটির এ গুণ বিশেষ পরিমাণে আছে বলেই শিক্ষকের চোখে এ বিষয়গুলির মূল্য সমধিক।

দ্বিতীয় আর একটি বিশ্বাসও এই ধারণার পেছনে আছে—সেটি হচ্ছে যে বিষয়টি যত শক্ত ও নীরস হবে তার মনের শক্তি গঠনের (mental dicipline) ক্ষমতা তত বেশী। মন হচ্ছে পাগলা ঘোড়া, তাকে কঠিন চাবুক দিয়েই শাসনে রাখতে হয়। শিক্ষা হচ্ছে তিক্ত, কিন্তু স্বাস্থ্যপ্রদ ঔষধের মত। তাই অঙ্ক ও ল্যাটিন ব্যাকরণের মত 'দাওয়াই' আর কোথায় মিলবে?

এ দুটি বিশ্বাসই কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান বহুল পরিমাণে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে।

বর্তমান মনোবিজ্ঞান বলে মন একটি বস্তু নয় কতগুলি বিচ্ছিন্ন বৃত্তির সমন্বয়ও

নয়—মন হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়াশীল ব্যবহার, আবেগ ও উদ্যমের ধারা। যে ব্যবহার ও ক্রিয়ার মধ্যে গভীর মিল ও সংযোগ আছে, সেগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করে। যেখানে ক্রিয়া বা ব্যবহারের গঠনে বিষয়বস্তুতে বা পদ্ধতির মধ্যে মিল বা ঐক্য আছে সেখানে এক বিষয়ে শিক্ষা অন্য বিষয়ে শিক্ষার সহায়ক হয়। যেমন ল্যাটিন ও স্প্যানিশ ভাষার গঠনে, উপাদানে, প্রয়োগরীতিতে অনেক মিল আছে—তাই ল্যাটিন ভাষা ভাল করে শিখলে স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষা সহজ হয়। ল্যাটিন ভাষার মধ্যেই কোন যাদু নেই। তেমনি অঙ্ক ভাল শিখলে পদার্থবিদ্যা (Physics) ও পূর্তবিদ্যা (Engineering) শিক্ষায় সাহায্য হয়, কিন্তু ব্যাকরণ শিখলে রসায়ন শাস্ত্র শেখা সহজ হয় না। কাজেই সংক্রামণ ঘটে বিশেষ ক্ষেত্রে, যেখানে দুটি বিষয়ে মিল বা ঐক্য আছে।

অবশ্য সাধারণ ভাবেও সংক্রামণ ঘটে। মনোযোগের অভ্যাস, গুছিয়ে কাজ করার অভ্যাস, সাবধানতা এ সব যে কোন কাজ নিয়েই আয়ত্ত হোক না কেন, তা মনের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং যে কোন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই তা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক অভ্যাসগঠনের মধ্যেই কিছু সাধারণ উপাদান থাকে এবং এরকম ব্যাপক অর্থে সমস্ত অভিজ্ঞতাই সংক্রামক।

কিন্তু যেখানে দুটি ক্রিয়ার মধ্যে মোটেই মিল নেই, বরং বৈপরীত্য বা বিরোধ আছে সেখানে বিশেষ একটি অভ্যাস বা কৌশল শিক্ষা অন্য একটি ক্রিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাই সৃষ্টি করবে। যাঁরা ডান ধারে ষ্টিয়ারিং দেওয়া মোটর গাড়ী চালিয়ে অভ্যস্ত তাঁদের হঠাৎ বাঁ হাতের ষ্টিয়ারিং দেওয়া মোটর গাড়ী চালাতে প্রথম প্রথম অসুবিধাই হবে। ওয়াইলি সাদা ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করেও দেখেছেন সেখানেও এই প্রতিকূল সংক্রামণ ঘটে। এবং তিনি এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অবস্থায় পূর্বের অভ্যাস সহায়ক, কিন্তু পূর্বঅভ্যস্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ নূতন প্রতিক্রিয়ার দাবী যেখানে আসে, সেখানে বাধা ও অসুবিধা সৃষ্টিই স্বাভাবিক।৪

আবার যেখানে দুটি ক্রিয়ার মধ্যে খুব মিলও নাই, বিরোধও নাই, সেখানে একটি শিক্ষার দ্বারা অন্যটি সামান্যই প্রভাবিত হয়।

এ সংক্রামণের ক্রিয়াটি যান্ত্রিক ভাবে ঘটে না। সংক্রামণের কৌশল বিষয়-বস্তুর মধ্যে নেই। জাড (Judd) বলছেন, "এসব কোন বিষয়ের মধ্যেই এমন কোন গ্যারান্টি নেই যে এতে সাধারণ ভাবে মনের ক্ষমতা বাড়বে। যদি

৪ Wylie—An Experimental Study of Transfer of Responses in White rats. Behav Monog. 1919. 3. p. 16.

এর ফলে কোন সংক্রামণ ঘটে, সেটা বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে না, বিষয়বস্তুর পরিবেশন পদ্ধতি এবং ছাত্রের সক্রিয়তা কতটা উদ্বুদ্ধ হবে, তার উপর নির্ভর করে। এটা মোটেই মিথ্যা নয়, যে কোন বিষয়েই ছাত্রের বিচার বুদ্ধি ও সমন্বয়ী ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা দিলে, তা সাধারণ ভাবে তার মানসিক উৎকর্ষবিধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। এবং একথাও সত্য, যে কোন বিষয়ই কেবলমাত্র কতগুলি বিচ্ছিন্ন জ্ঞান দানের উপর জোর দেয় তা শিক্ষায় যে প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সমন্বয় ক্ষমতা বৃদ্ধি (genaralisation of experience), তার উৎকর্ষ সাধনে সম্পূর্ণ নিষ্ফল।৫

পর্য্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সমন্বয়, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয় এ ক'টি অভ্যাস ছাত্রদের মনে তৈরী করে দেওয়াই হচ্ছে সুশিক্ষার উদ্দেশ্য। যে কোন বিষয়কে অবলম্বন করে এ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া মানে সে বিশেষ বিষয়ে কতগুলি তথ্য (information) ছাত্রদের মনের সামনে ধরে দেওয়াই নয়। বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে মূল সূত্রটি অনুসন্ধানের অভ্যাসকে জাগরিত করতে যে শিক্ষক সক্ষম, তিনিই সার্থক শিক্ষক।

সাধারণ ভাবে স্মৃতিশক্তি কোন একটি বিশেষ বিষয় আয়ত্ত করলে বেড়ে যায় না। তবে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি কতগুলি মানসিক অভ্যাস আয়ত্ত করা যায়, তা হলে পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হয় তখনই, যখন পরবর্তী শিক্ষার বিষয়ে অনুরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নূতন শিক্ষার বিষয়ে যদি বিপরীত উপাদান থাকে বা বিপরীত অভ্যাসের প্রয়োজন হয় তবে পূর্বের শিক্ষা বরং নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

যেখানে সংক্রামণ ঘটে, সেখানে তার মূলে আছে (১) বিষয়-বস্তুর উপাদানে মিল (২) ক্রিয়ার কৌশল, কায়দা বা দক্ষতার মিল (৩) মূল নীতিগত মিল বা অভ্যাসের মিল (৪) অথবা এদের কয়েকটি বা সব কটির মিল। এ বিষয়ে গেট্‌স, রবার্টস্‌, কেটোনা ও স্লেইটেরও একই মত।

শিক্ষায় সংক্রামণ সম্বন্ধে পরীক্ষা—পূর্বে বলেছি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ মতবাদ প্রচলিত ছিল, যে কোন এক বিষয়ে মুখস্থ করবার অভ্যাস করলে, সে অভ্যাস দ্বারা অন্য যে কোন বিষয় মুখস্থ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এ বিষয়ে প্রথম ১৮৯০ সালে উইলিয়ম্‌ জেমসের পরীক্ষাই বোধ হয় প্রথম।

৫ Judd—Psychology of Secondary Education Ch. XIX.

প্রথম তিনি ভিক্টর হুগোর 'স্যাটের' (Satire) বই থেকে ১৫৮ লাইন মুখস্থ করলেন। কতটা সময় লাগল সেটা তিনি লিখে রাখলেন। এর পর তিনি একমাসের উপর ধরে মিল্‌টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' কবিতাটি মুখস্থ করলেন। এবার তিনি আবার 'স্যাটের' এর আরো ১৫৮ লাইন মুখস্থ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন এবার প্রথম বারের চেয়ে তার সময় বেশী লাগল—অর্থাৎ বোঝা গেল 'প্যারাডাইস লষ্ট' মুখস্থ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়নি। অবশ্য জেমসের পরীক্ষা পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি ছিল, কিন্তু তাঁর পরীক্ষা প্রাচীন মতবাদকে প্রথম ধাক্কা দেয়।[৮]

জেমসের পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলি দূর করে, তারপর থেকে আরো বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়েছে। এগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করা যায় (১) প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ভিত্তিতে পরীক্ষা (২) স্মৃতি মনোযোগ যুক্তি, বিবেচনা ইত্যাদি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষা এবং (৩) শিক্ষার বিভিন্নপদ্ধতি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় নিয়ে পরীক্ষা।

প্রথম দলে থর্ণডাইক্ ও উডওয়ার্থের কতগুলি পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ পরীক্ষার ফলও প্রাচীন মতবাদের বিরোধী। প্রথমে এক দল ছেলেকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভেদ বোধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এর পর এদের অন্য কতগুলি প্রভেদ বোধ যথা (১) বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আয়তন নির্ধারণ, বিভিন্ন রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয়, বিভিন্ন ওজনের পার্থক্য ও (২) একটি ছাপার পৃষ্ঠার থেকে পূর্ব নির্দিষ্ট কতগুলি অক্ষর বা শব্দ বেছে বের করা ও কেটে দেওয়া নিয়ে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন যে যেখানে বাহ্য কিছু মিল আছে, সে ক্ষেত্রেও প্রথম শিক্ষা দ্বারা নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি সামান্যই হয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ব শিক্ষা বাধা স্বরূপই হয়েছে।

এ পরীক্ষার ভিত্তিতে থর্ণডাইক প্রাচীন মতবাদের বিরুদ্ধে এই মত প্রকাশ করলেন যে যেখানে পুরাতন শেখা বিষয়ের সঙ্গে নূতন বিষয়ের ঐক্য থাকবে সেখানেই কেবল অনুকূল সংক্রামণ ঘটে (Theory of Identical Elements) এবং সংক্রামণের পরিমাণ কতটা হবে তাও নির্ভর করবে দুই বিষয়ের মধ্যে উপাদানের ঐক্য কতটা, তার উপর।*

---

৮ Boring, Langfeto and Weld—Foundations of Psychology P. 178.

*থর্ণডাইকের মতে "a change in one mental function afters any other only in so far as the two functions have, as factors, identical elements. The change in the Second element is, in amount, that due to the change in the elements common to it and the first."

এর পর এ বিষয় নিয়ে বহু পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে অল্প কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক অঙ্গের শিক্ষা দ্বারা অন্য একটি অঙ্গের কার্য্যদক্ষতার উন্নতি নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। একে ক্রস্ এডুকেশন্ বা বাইল্যাটারাল ট্র্যান্সফার বলা হয়। স্ক্রীপচার বাঁ হাত দিয়ে শক্ত করে জিনিষ ধরার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেখলেন, তাতে ডান হাতের ক্ষমতাও (Grip Strength) কিছু বাড়ে। উড্ওয়ার্থ একটি বিন্দুকে বাঁ হাতে পেন্সিলের ডগা দিয়ে বিদ্ধ করা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, ডান হাত দিয়ে অনুরূপ পরীক্ষায়ও কিছুটা উন্নতি হয়। ভুলের পরিমাণ কমে। বাঁ হাতে যতটা নিপুনতা বাড়লো, সে তুলনায় ডান হাতের নিপুণতা বাড়ল ৫০%। ব্রাউনেল, স্লেইট, ইউয়ার্ট ইত্যাদি সকলের পরীক্ষায়ই এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এক অঙ্গ যে জাতীয় ক্রিয়ায় দক্ষতা লাভ করল সেই জাতীয় ক্রিয়াতেই অনুরূপ অন্য অঙ্গ অভ্যাস ব্যতিরেকেও কিঞ্চিৎ দক্ষতা অর্জন করে। আয়নায় ছায়া দেখে একটা ছয়কোণা তারার ছবির চারপাশে অনুরূপ একটা তারা ডান হাত দিয়ে নির্ভুল আঁকতে শিখলে, তারপর বাঁ হাত দিয়ে সে তারাটা আঁকা অনেকটা সহজ হয়। ইউয়ার্টের পরীক্ষায় দেখা যায়, যে এতে ৬০% সময়সংক্ষেপ হয়।[৯]

ধাঁধাঁর রাস্তা শেখা (maze-learning) নিয়ে ওয়েব পরীক্ষা করে দেখলেন, এক জাতীয় ধাঁধাঁর রাস্তা শেখাটা যাদের হয়ে গেল, তাদের অনুরূপ একটা ধাঁধাঁ দিলে, যারা কোনদিন এ জাতীয় শিক্ষালাভ করেনি তাদের তুলনায় পূর্ববর্তী দলের ৬৮% কম বার অভ্যাস করা দরকার হয়। তাদের ভুল ৮৯% কম হয়, এবং তাদের সময় ৮৭% কম লাগে।[১০]

স্মৃতিশক্তির সংক্রামণ নিয়েই বেশী পরীক্ষা হয়েছে। জেম্‌সের পরীক্ষার কথা বলেছি। উইন্‌চ্ কবিতা মুখস্থ করাটা ইতিহাস শিক্ষার পক্ষে কতটা সহায়ক হয় তা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সংক্রামণের পরিমাণ সামান্য মাত্র। এবার্ট ও ময়স্যান্ অর্থহীন অক্ষর সমষ্টি (non-sense syllables) নিয়ে পরীক্ষা করেও অনুরূপ ফল পেলেন।

৯ Ewart—Bilateral transfer in mirror drawing. Peg—Sem. 1926. 33. Pp. '255-'49.

১০. L. W. Welds—Transfer of training of retro-action. Psy. Monogr. 1917, 24, No 104, 18-

স্নেইট জটিলতর কতগুলি পরীক্ষা করলেন। তিনি চাইলেন কবিতা, অঙ্কের আর্য্যা, এবং গদ্য বাক্যার্থ মুখস্থ করে সাধারণ ভাবে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে। কিন্তু দেখা গেল, তা হয় না।

এ সমস্ত ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফল থর্ণডাইকের উপাদানের ঐক্যসূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। থর্ণডাইক বলেছিলেন, অনুকূল সংক্রামণ যেখানে ঘটে, সেখানে শিক্ষিত বিষয়ের উপাদানে ঐক্য থাকে—সংক্রামণটা সাধারণ নয়,—বিশেষ ((specific) ।

কিন্তু জাড অনেকগুলি পরীক্ষার পর থর্ণডাইক থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তাঁর মতে শিক্ষার অর্থ হচ্ছে নূতন অভিজ্ঞতার স্বাঙ্গীকরণ, পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নূতন অভিজ্ঞতার মিল ও অমিল নির্ণয়করণ, নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার। শিক্ষার বিষয় বা উপাদানের ঐক্যই সংক্রামণের কারণ নয়। সক্রিয় উৎসুক মন যখন শিক্ষার পদ্ধতি, চিন্তার প্রণালী, শিক্ষার অভ্যাসের মৌলিক ঐক্য আবিষ্কার করতে পারে তখনই পুরাতন শিক্ষা নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়। জাড বলেন, 'বিজ্ঞান শিক্ষা যেখানে কতগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য আয়ত্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেখানে তা নিষ্ফল। অঙ্ক শেখাও নিষ্ফল হয়, যদি কতগুলি যান্ত্রিক প্রণালীই মাত্র শেখা হয়, এবং যদি ছাত্র না বুঝতে পারে অঙ্কের সূত্রগুলি বা প্রণালীগুলি জীবনের কোন প্রয়োজনে লাগে।...ছাত্রকে এই ভাবেই শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে বুঝতে পারে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি কি করে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রাণবন্ত ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করে। ছাত্রকে এই শিক্ষাই দিতে হবে, যে মনঃসংযোগ, যুক্তিগত বিশ্লেষণ, ছিন্নাংশগুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার,—এরা হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানসিক অভ্যাস। এ অভ্যাস গঠিত হলে এক বিষয়ে যে লাভ বা সুবিধা হ'ল যা ভবিষ্যতে বিভিন্ন চিন্তা ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী হবে।"[১১]

এ বিষয়ে জাডের একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষার উল্লেখ করা হ'ল। দু' দল ছাত্রকে চৌবাচ্চার জলের নীচে রক্ষিত কোন দ্রব্যকে তীর দিয়ে বিঁধতে দেওয়া হল। একদল ছেলে জলের মধ্যে আলো যে বেঁকে যায় সে কথাটা জানত না। তারা

১১ Judd—Psychology of Sec. Education. Ch. X1X—Quoted by Gates in Educational Psychology. P. 500.

বারে বারে চেষ্টা করে লক্ষ্য ভেদ করতে শিখল। অপর দলকে প্রতিসরণের (Refraction) বৈজ্ঞানিক সূত্রটি পূর্বেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমবারে লক্ষ্য-বিদ্ধকরতে উভয় দলেরই প্রায় সমান সময় লাগল। দ্বিতীয় বার, জলের পরিমাণ বদলে দেওয়া হইল। প্রথম দল পূর্ব প্রথায়ই তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করার চেষ্টা করল, কিন্তু নূতন অবস্থায় তাদের পূর্ব অভ্যাস বিশেষ কাজে এল না, সম্পূর্ণ নূতন করেই আবার লক্ষ্য বিদ্ধ করা শিখতে হল। কিন্তু দ্বিতীয় দলকে জলের মধ্যে আলোর প্রতিসরণ ব্যাপারটি আগেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নূতন ও পরিবর্তিত অবস্থায় তারা হিসাব করে নূতন ভাবে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে অল্প সময়েই সমর্থ হলো। এখানে শিক্ষা সার্থক কারণ এখানে ঘটেছে অভিজ্ঞতার সমন্বয় (Genaralisation of Experience)।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মতেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বার্ট ইত্যাদি কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদ সংক্রামণ ব্যাপারে আগ্রহ, ইচ্ছা, মনোযোগ, সাফল্যজনিত উৎসাহ ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার উপর জোর দেন। ব্যক্তি-চরিত্র, তার বুদ্ধি ইত্যাদি এ ব্যাপারে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।[১২] অলপোর্ট এই দলে। তিনি থর্ণডাইকের 'উপাদানের ঐক্য' মতবাদকে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, মনকে কতগুলি টুকরো টুকরো ব্যবহার বা অভ্যাসে ভাগ করাটা ঠিক নয়, এবং নিতান্ত শিশু বা অপরিণতরাই কেবল নির্দিষ্ট অভ্যাস ব্যবহার দ্বারা শেখে, কারণ তাদের মন বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সাধারণ ঐক্যের সূত্রটি আবিষ্কারে অসমর্থ।

এই মতগুলি পরস্পর-বিরোধী নয়। অধ্যাপক হ্যামলির মতে সাধারণতঃ যে ভাবে থর্ণডাইকের 'উপাদানের ঐক্য' কথাটি ব্যবহার করা হয়, তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। এ কথাটির অর্থ ব্যাপকতর করলে থর্ণডাইকের মতের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার কারণ দূর করা যেতে পারে। তিনি বলছেন, উপাদানের ঐক্য হচ্ছে, মানসিক প্রক্রিয়ার ঐক্য। সে ঐক্য যে বিষয়গতই হবে এমন কোন কথা নেই। এ ঐক্য প্রণালী, অভ্যাস ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্যও হতে পারে—সেগুলি গেষ্টল্টের ভাষায় 'ক্রিয়ার বা ব্যবহারের সমতা' (functionally similar)[১৩] উডওয়ার্থ মন্তব্য করছেন "থর্ণডাইকের মতবাদের হচ্ছে এই যে,

১২ Garrett—Great Experiments in Psychology.

১৩ Hamley—'The Cognitive aspects of Transfer of Training.' 'Common elements are common mental elements ; they are not necessarily common elements in the objective situations. They are methods, procedures, and ideals that are in the Gestalt sense 'functionally similar.'

একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া কৌশলেরই সংক্রামণ ঘটে। ক্রিয়াটি সরলও হতে পারে, জটিলও হতে পারে। ঐক্যটি বিষয়ের উপাদানগত, এরকম সংকীর্ণ অর্থ করলেই গোলযোগ হয় এবং উপাদানগত ঐক্য (identical elements) কথাটির পরিবর্তে ভাবগত ঐক্য (identical Components) বললে বোধ হয় গোলযোগটা এড়ানো যেতে পারে,"[১৪] পীল বলছেন, 'এটা খুবই স্পষ্ট যে উপাদানগত বা ভাবগত ঐক্যটির যে বন্ধন তা আবেগ-চালিত মনই জোগান দিচ্ছে,— অবশ্য তা ছাড়া বিষয়-বস্তুর মধ্যেও মিল থাকতে পারে। ইচ্ছা, আগ্রহ, আবেগের মিল সংক্রামণের জন্যে দায়ী, তা' ছাড়া উন্নততর বুদ্ধি সম্বন্ধ আবিষ্কার, মিলের অনুসন্ধান, সাধারণ সূত্র বা বিষয় আয়ত্তকরণের কৌশল ইত্যাদি দিয়ে সংক্রামণের সহায়ক হয়। অর্থাৎ উপাদানের ঐক্য বা সূত্রটি—অবস্থা বা বিষয়ে যেমন থাকে তেমন থাকে শিক্ষার্থীর মনে। কাজেই সংক্রামণ বিষয়ের ঐক্যের উপর নির্ভরশীল, অথবা ব্যক্তির বুদ্ধি. ইচ্ছা, আগ্রহের উপর নির্ভরশীল, এই দুই মতের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই।'[১৫]

সংক্রামণ সম্বন্ধে উড্রোর একটি পরীক্ষার উল্লেখ করা উচিত। এ জাতীয় পরীক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেন, তার ফলে তাঁর পরীক্ষার ফল পূর্ববর্তীদের পরীক্ষার ফলের তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য। অন্যান্য পরীক্ষায় মাত্র দুটি দল নিয়ে পরীক্ষা করা হয়—একদল যারা পূর্বে কোন শিক্ষা পায়নি, এবং আর একদল যারা কোন বিশেষ শিক্ষালাভ করেছে। এই দুই দলের মধ্যে শিক্ষার সময়ের প্রভেদ অথবা ভুলের পরিমাণের প্রভেদ দিয়ে কতটা সংক্রামণ হোল তা বিচার করা হোত। উড্রো নিলেন তিনটি দল। উড্রোর একটি পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক্। পরীক্ষাটা হোল, কবিতা মুখস্থ ব্যাপারে কতটা সংক্রামণ হয় এবং কি অবস্থায় সংক্রামণ সবচেয়ে বেশী হয় তা নিয়ে। ১০৬ জন ছাত্রের এক দল (control group) নেওয়া হোল, তাদের প্রথমে একবার ও পরে সকলের সঙ্গে শেষে এক একবার পরীক্ষা নেওয়া হোল। কোন মুখস্থের অভ্যাস করাবার চেষ্টা করা হোল না। ৩৪ জন ছাত্রের আর এক দলকে (practice group) প্রথম ও শেষ পরীক্ষার মাঝে সাধারণ ভাবে পুরাতন প্রথায় (Rote) কবিতা মুখস্থ করার অভ্যাস করানো হোল। ৪২ জন ছাত্রের আর একটি দলকে (Training group) প্রথম ও শেষ পরীক্ষার মাঝে যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ নির্ণয়, অর্থের দিকে দৃষ্টি, সমগ্রটি এক সঙ্গে শেখা, ছন্দ ও

১৪ Woodworth—Experimental Psychology, P. 177.

১৫ Peel—The Psychological Basis of Education. P, 67.

মিলের ব্যবহার ইত্যাদি মুখস্থের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে শেখানো হয়েছিল। এবার প্রথম ও শেষ পরীক্ষার ফলের তুলনা করে দেখা গেল, প্রথম দলের তুলনায় দ্বিতীয় দলের উন্নতি খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তৃতীয় দলের উন্নতির হার বেশ অনেকটা (৩১·৬%)। এতে জাডের অভিমতই সমর্থিত হয় যে সংক্রামণ তখনই উল্লেখযোগ্য, যেখানে সচেতন ভাবে অভিজ্ঞতার পশ্চাতে মূল সাধারণ সূত্র আবিষ্কৃত ও অনুসৃত হয় (genaralisation of experience)।[১৬]

কোন কোন অবস্থা সর্বাধিক পরিমাণ সংক্রামণের অনুকূল ?

পূর্বোল্লিখিত পরীক্ষাগুলি থেকে আমরা কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি—

(১) বোধহীন যান্ত্রিক মুখস্থের দ্বারা স্মৃতিশক্তি বেড়ে-যায় না। যেখানে অর্থবোধ থাকে, সেখানে বিভিন্ন অংশের মধ্যে বা সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ পরিষ্কার করে উপলব্ধি হয় সেখানেই সংক্রামণ সর্বাধিক এবং সব চেয়ে বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে।

(২) বুদ্ধির উৎকর্ষের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। দুইটি বিষয়ের মধ্যে অনেকখানি ঐক্য থাকতে পারে—কিন্তু কেবল মাত্র তার উপর সংক্রামণ নির্ভর করে না। যাদের বুদ্ধি বেশী, যারা বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সক্ষম, যারা চট্ করে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে মিল ও প্রভেদ লক্ষ্য করতে পারে—তারাই ভাল মুখস্থ করতে পারবে এবং যা মুখস্থ হোল তা ভবিষ্যতে অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে।

গেষ্টল্ট-বাদীরাও এ কথাই বলেন। শিক্ষা মানেই হচ্ছে—সমগ্রবোধ—বিচ্ছিন্ন অংশকে সমগ্রের মধ্যে সংবদ্ধ করে দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি (insightful learning)। পীল বলছেন—শিক্ষার বোধের দিকটা যখন বিচার করা যায় তখন দেখা যায় শিক্ষায় সংক্রামণ তখনই ঘটে যখন সক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্নাংশগুলিকে সমগ্রতার মধ্যে সংবদ্ধ করা হয় এবং তখনই এক বিষয়ের শিক্ষা অন্য বিষয়ে শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে।"[১৭]

(৩) বুদ্ধি যে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একটি সমগ্রতায় সংহত করতে পারে তার পশ্চাতে থাকে ব্যক্তির আগ্রহ। সংক্রামণ ব্যাপারটাকে শুধু বুদ্ধির ক্রিয়া মনে করলে ভুল হবে, তার মধ্যে আবেগ ইচ্ছাও অবশ্যই থাকতে হবে। কখনো কখনো এই দিকটা উপেক্ষিত হয় বলেই থর্ণডাইকের 'উপাদানের ঐক্য' রূপ সূত্রের ব্যাখ্যাটি একপেশে হয়ে পড়ে।

---

১৬ Garrett—Great Experiments in Psychology.

১৭ Peel—The Psychological Basis of Education, P. 67

(৪) সংক্রামণ ক্রিয়াটা যান্ত্রিক নয়—এখানে নূতন অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে খাপ খাইয়ে নেবার কথাটা ভুললে চলবে না। সংক্রামণ যেখানে ঘটছে—সেখানে অতীত শিক্ষাকে হুবহু ব্যবহার করা হচ্ছে না তাকে নূতন করে কিছুটা ঢেলে সাজতে হয়। ওরাটা (Orata) দেখিয়েছেন, যে একটা পদ্ধতি শিখে তাকে নিতান্ত 'মাছি মারা কেরাণী'র মত ভবিষ্যতে ব্যবহার করলে অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা সামান্যই লাভবান হওয়া যায়। নূতন পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যে অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা সামান্যই লাভবান হওয়া যায়। নূতন পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যে অতীত শিক্ষাকে প্রয়োজন মত কিছু বদলে সাধারণ মূলসূত্রটি ব্যবহার করতে জানলেই সবচেয়ে বেশী লাভবান হওয়া যায়।

সংক্রামণ বিষয়ে বিভিন্ন স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলি তুলনামূলক মূল্য বিচার—

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য, মনের কতগুলি বাঞ্ছনীয় ক্ষমতার বিকাশ ও বৃদ্ধি। এরি নাম হচ্ছে ফর্মাল ট্রেনিং। পূর্বেই বলেছি অতীতে বিলেতের স্কুলগুলিতে ল্যাটিন শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হ'ত, প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার কতগুলি অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে। এ ভাষা শিক্ষার ফলে চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি, গঠিত ও উন্নীত হয়। ক্রমশঃ এ মত পরিবর্তিত হয়েছে। তথাপি এ মতের পেছনে যে কিছুটা সত্য আছে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে তা জানা যাচ্ছে। বর্তমান কালে আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ (Curricula) সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের যোগ্যতা নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। তার কিছু আলোচনা করা যাক।

১৯২৪ সালে থর্ণডাইক ক্লাশ নাইন, টেন ও ইলেভেন্‌-এর ৮,৫৬৪ জন ছাত্রকে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। বিশেষ করে ল্যাটিন সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা যে উচ্চাশা পোষণ করতেন তা কতটা সত্য এবং আদৌ সত্য কিনা, তাও এই জটিল বহু বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়ে নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছিল। পরীক্ষার ফল ল্যাটিন পন্থীদের অনুকূল হয়নি। সাড়ে আট হাজারের উপর ছাত্রকে পরীক্ষা করে যে ফল পাওয়া গিয়েছিল, তা আবার নূতন ৫০০০ হাজার ছাত্রের বেলায় ব্যবহার করে ফলটা মিলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—তাই এ পরীক্ষার ফল আমরা নির্ভর যোগ্য বলে' গ্রহণ করতে পারি। থর্ণডাইক পরীক্ষার জন্যে যে প্রণালী ব্যবহার করেছিলেন, সেটা হচ্ছে এই রকম। তিনি প্রত্যেক ক্লাশের ছেলেদেরই

দুটি দল করেছিলেন। দুটি দলের ছাত্রদের কতগুলি বিষয় ছিল সাধারণ, যেমন ইংরেজী, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। কিন্তু একদলের ছেলেরা নিয়েছিল ল্যাটিন, আর একদল নিয়েছিল পদার্থবিদ্যা। দু'দলের ছাত্ররাই মোটামুটি একই রকম বুদ্ধিমান্ ছিল। বৎসরের গোড়ায় আর বৎসরের শেষে দু'দলেরই একই রকম পরীক্ষা নিয়ে দেখা হোল ল্যাটিন বা পদার্থবিদ্যা শেখার ফলে তাদের অন্যান্য বিষয়ে কতটা উন্নতি হোল। এই পদ্ধতি অনুযায়ী নানা স্কুল-পাঠ্য বিষয় নিয়েই পরীক্ষা করে তাদের তুলনামূলক মূল্য নিরূপণ করা হোল। এ পরীক্ষার ফলে জানা যায়, অঙ্কশিক্ষা বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনুকূল, তার পরেই আসে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান যেমন পৌর-বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি। ল্যাটিনের মূল্য এদের নীচে। ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষার ফল ল্যাটিন শিক্ষার কাছাকাছি। সেলাই, ষ্টেনোগ্রাফী, হাতের কাজ, অভিনয় এদের মূল্য ল্যাটিনের নীচে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শেষোক্ত বিষয়গুলি অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পক্ষে বরং বাধা সৃষ্টি করে অর্থাৎ সংক্রামণ যেটা ঘটে, সেটা প্রতিকূল বা নেতিবাচক (negative transfer)।*

এসব পরীক্ষায় দেখা গেছে যে যদিও বিভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ বিষয়ে প্রভেদ আপেক্ষিকভাবে একই থাকছে সংক্রামণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয় (Statistically not significant)। এক বছরের শিক্ষার ফলে ছাত্রের যে মানসিক উন্নতি ঘটল তা বহুলাংশে নির্ভর করছে ছাত্রের জন্মগত শক্তি ও বুদ্ধির উপরে, এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির উপরে। বিশেষ কোন বিষয়ের কোন

*Relative value of a year's traning in various high school Subjects in increasing "Ability to think."

Subject groups	Weighted average differences (Relative influence)
1. Algebra, geometry, trigonometry, etc. ...	2·99
2. Civics, economics, Psychology, sociology, ...	2·89
3. Physics, chemistry, general Science. ...	2·71
4. Arithmetic and book-keeping	2·60
5. Physical training	-·83
6. Latin, French	-·79
7. Cooking, Sewing, Stenography	-·14
8. Biology, Zoology, Botany	-·15
9. Dramatic art	-·48

অতিরিক্ত মূল্য নেই। ল্যাটিন্ যাঁরা বিদ্যালয়ে যত্ন করে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বড় হয়েছিলেন, তাই বোঝা যায় ল্যাটিনের বিশেষ মূল্য আছে, —এর উত্তরে থর্ণডাইক দেখালেন যে ক্লাশের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান্ ছাত্র তাঁরাই ল্যাটিন্ ও অংক নেয়; কাজেই তাদের উন্নতির জন্যে দায়ী ল্যাটিন্ বা অংক নয় তার জন্যে দায়ী হচ্ছে তাঁদের নিজস্ব বুদ্ধি, উৎসাহ, মনোযোগ ইত্যাদি। স্যাণ্ডিফোর্ড এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "এঁরা ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ, এবং এঁরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন শুধু বি-এ অনার্স ও ল্যাটিন্ শেখায়ই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ল্যাটিন্ ভাষার মধ্য দিয়ে এঁরা অন্যের তুলনায় বুদ্ধিমান এটা শুধু জানা গিয়েছিল। প্রকৃতিই এঁদের সৃষ্টি করেছিল বুদ্ধিমান করে। যদি ল্যাটিনের পরিবর্তে বিজ্ঞানের কোন বিষয়ের চর্চা প্রচলিত থাকতো তবে একথাই মনে হত যে বিজ্ঞান চর্চাই এঁদের বুদ্ধির উৎকর্ষের জন্য দায়ী।[১৮]

এ জাতীয় বিভিন্ন পরীক্ষার উপর নির্ভর করে উডওয়ার্থ ও মারকিস্ সিদ্ধান্ত কচ্ছেন' "...এটা প্রমাণিত হয়েছে, এক বিষয়ে শিক্ষা দ্বারা অন্যবিষয়ে আপনিই পারদর্শিতা আসবে, এ সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ নয়। যে সংক্রামণটা সাফল্যের সঙ্গে ঘটে সেটা একটা সাধারণ শক্তি নয়,—সেটা একটা নির্দিষ্ট কিছু, যেটা নির্দিষ্ট করে দেখানো চলে, যেমন একটা নীতি (Principle) বা একটা সু-অভ্যাস বা দৃষ্টিভঙ্গী বা একটা সফল কৌশল (technique)।[১৯]

আমেরিকার নূতন শিক্ষানীতিতে তাই সাধারণভাবে মনের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা না করে' যে বিষয় বা কৌশল শেখাতে হবে তাই সোজাসুজি শেখানো বেশী ভালো মনে করা হয়। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু ফর্মাল ট্রেনিং-এর মোহটা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। আমেরিকায় ডিউই নূতন শিক্ষানীতিতে বিশ্বাসী—তিনি ফর্মাল ট্রেনিং মতবাদকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের যাদু-মন্ত্রের শক্তি আছে, এটা অবিশ্বাস্য কথা। এমন হতেই পারে না, যে কতগুলি এমন অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন বিষয় আছে যা ডোজ মেপে শিশুকে গিলিয়ে দিলেই সে ভবিষ্যতে দিগ্‌গজ হয়ে উঠবে। প্রত্যেক বিষয়ই শিশুর মনের গুণগুলি বিকশিত করতে সাহায্য করতে পারে। যে বিষয় তার আগ্রহকে জাগ্রত করে, তার চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে, তার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে, তাই তার মানসিক উৎকর্ষ বিধানে সহায়ক। শুধু বিষয় বস্তুটাই এখানে প্রধান নয়। শিশুর মন

১৮ Sandiford—Educational Psychology. P. 279.

১৯ Woodworth & Marquis—Psychology. P. 575-76.

কতটা গ্রহণ করবার উপযোগী, কোন্‌দিকে তার স্বাভাবিক ঝোঁক, এবিষয়ে শিক্ষক যদি মনোযোগী না হন, তা হলে বিষয়বস্তু মূল্যবান হলেও শিক্ষকের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। শিক্ষককে জানতে হবে শিশুর মনকে জানার আর বিষয়বস্তু সরস করে পরিবেশনের কৌশল।[২০]

আধুনিক শিক্ষানীতির উপর সংক্রামণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল—

পূর্বেই বলা হয়েছে, জেমস্‌, থর্ণডাইক, উডওয়ার্থ এদের পরীক্ষার ফলে বিদ্যালয়ের বিষয়-নির্বাচনে ল্যাটিন্‌ বা ব্যাকরণের প্রাধান্য লোপ পেয়েছে। বরং বর্তমান কালে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়-নির্বাচনের দাবী প্রবল হয়েছে। ল্যাটিন্‌ বা সংস্কৃত ব্যাকরণের সব খুটিনাটি তথ্য সব ছাত্রের জন্যই অবশ্য শিক্ষণীয় করতে হবে তার কোন মানে নেই। যে বিদ্যা বা নিপুণতা জীবনে সব চেয়ে বেশী লোকের সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে তা শেখালেই সময় ও পরিশ্রমের অপব্যয় নিবারিত হবে। যেমন বর্গমূল নির্ধারণ শেখানো। অধিকাংশ মানুষের বাস্তব জীবনে এর ব্যবহারের সুযোগ হয় না। তাই অংক শেখাতে গিয়ে সর্বসাধারণ ছাত্রের জন্যে এ শিক্ষা আবশ্যিক করবার কোন মানে নেই। তার চেয়ে অংকের যে পদ্ধতিগুলি জীবনে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে, সেগুলিই সাধারণ ছাত্রদের শেখানোর উপর জোর দেওয়া দরকার। এবং দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ-কর্মগুলি নিয়েই অংকের সমস্যাগুলি গড়ে ওঠা দরকার। এগুলি হচ্ছে স্যাণ্ডিফোর্ডের ভাষায় 'মিনিমাম এসেন্সিয়ালস্‌'—এগুলি না শিখলেই নয়। অবশ্য যাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ঝোঁক বা রুচি আছে তাদের সে বিষয়ের খুটিনাটি শিখতেই হবে। তা ছাড়া কতগুলি বাঞ্ছনীয় মানবিক বৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গী গঠন সমস্ত শিখারই গৌণ উদ্দেশ্য এবং তা যে কোন বিষয় অবলম্বন করেই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

থর্ণডাইকের 'উপাদানের ঐক্য' নীতি বর্তমানে শিক্ষাকে সমাজ প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত (Social utility) করতে হবে এই প্রবণতার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বলা যেতে পারে। যেখানে উপাদানের ঐক্য সর্বাধিক, সেখানেই শিক্ষার সার্থক সংক্রামণও সবচেয়ে বেশী, একথা যদি সত্য হয় তবে এটা শিক্ষাবিদদের দেখা উচিত যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়গুলির সঙ্গে বাস্তব জীবনের সমস্যার মিল থাকে। বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে ধৈর্য্য, নির্ভুলতা, সততা, নিষ্ঠা, উদ্যম,

---

২০ John Dewey—Experience & Education. Pp. 45-46.

ইত্যাদি যে সদ্‌গুণগুলির প্রয়োজন হয় এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সম্বন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি সমস্যা-সমাধানের সহায়ক, সেগুলি যাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই বাস্তবিক আয়ত্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করতে হবে এবং শিক্ষা প্রণালীও সে অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে।[২১]

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন পদ্ধতি শিক্ষার সমালোচনায় একথা ঠিকই বলা হোত যে সে শিক্ষা নিতান্তই বই-পুস্তক-ঘেঁষা ও অবাস্তব। স্যার রিচার্ড লিভিংষ্টোন্ 'দ্য ফিউচার ইন্ এডুকেশন' পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছিলেন—"আমাদের বর্তমান শিক্ষাটা হচ্ছে এইরকম; ডাক্তারেরা কতগুলি ধরাবাঁধা ঔষুধ দিয়েই চিকিৎসা চালিয়ে যান, ভবিষ্যতে রোগীর স্বাস্থ্যের উপর এর কি ফল হবে, এটা তাঁরা চিন্তাও করেন না। এতে করে অল্প কিছু সংখ্যক রোগীর রোগ সারে। তারা উপকৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশই এ চিকিৎসায় উপকৃত হয় না, এবং যখন তারা ডাক্তারখানা ত্যাগ করে তখন ভবিষ্যতে আর তারা এ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করতে বা ডাক্তারী ঔষুধ আর খেতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হয়, যদিও ডাক্তার অবশ্য মনে করেন, এ ওষুধগুলি রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকারী।...প্রধান প্রশ্ন এ নয় যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে কি বিষয় কতটা শিখালো বা শিখলো না—প্রধান প্রশ্ন হোল ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী কি রুচি শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গী তারা আয়ত্ত করল।[২২] আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে এ-সমালোচনা আজও সত্য।"

আমেরিকার ডিউই ও কিলপ্যাট্রিকের নূতন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার প্রণালী যাতে জীবন-কেন্দ্রিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই 'প্রোজেক্ট মেথড, আবিষ্কার করেছেন। এতে করে শিশুরা শিক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের জীবন সমস্যা সমাধানেই অভ্যস্ত হয়। যেমন তারা স্কুলেই পোষ্টাফিস, ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ষ্টোর চালাতে শেখে—সবজী বাগান, ফুলের বাগান করে, ছোটখাট পাখী বা জন্তু পালন করতে শেখে। সোভিয়েট রাশিয়াতেও অনুরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষায় সংক্রামণ সম্বন্ধে আধুনিক

২১ "The transfer of methods of attack, of knowledge and insights, technique of learning, and problem-solving, interest, poise, habits and ideals of caution, honesty, accuracy, thoroughness, initiative etc, to the situations of life will be large, supposedly to the degree that the subjectmatter and activities of the class-room are similar to those encountered in life outside the school."

২২ Sir. Richard Livingstone—The future in Education—Preface

পরীক্ষা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছে। ল্যাটিন্ মুখস্থ করলে ছাত্রদের মনের ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং তাতে তারা ভবিষ্যতে জীবনে দিগ্‌গজ হবে, এ বিশ্বাস বদলে গেছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্ বিশ্বাস করছেন 'যতই বিদ্যালয়ের সমস্যা, ক্রিয়া, উদ্দেশ্য, কৌশল, অভ্যাস, আদর্শ বাস্তব জীবনের সমস্যা, ক্রিয়া ইত্যাদির অনুরূপ হবে ততই ঘটবে শিক্ষার সার্থক সংক্রামণ এবং ততই বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের পক্ষে উপযোগী হবে।[২৩]

শিক্ষায় সংক্রামণ সম্বন্ধে ডিউইর মত—যাঁরা শিক্ষায় প্রাচীন-পন্থী তাঁরা একশিক্ষাদ্বারা অন্য বিষয়ে উৎকর্ষ বৃদ্ধির নীতিতে পক্ষপাতী। এঁরা বলেন কতগুলি বিষয় শিশুর মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক। যেমন অংক কষলে মানসিক একাগ্রতা বাড়ে, স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণতর হয়, বিচার-বুদ্ধি নির্ভুল হয়।

ডিউই শিক্ষায় নব্য পন্থায় বিশ্বাসী। তিনি প্রাচীন ফর্মাল ডিসিপ্লিন মতবাদে অনাস্থাশীল। তিনি বলেন কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের যাদুমন্ত্রের শক্তি আছে, এটা বিশ্বাস করা চলে না। যে শিক্ষক নিজের বিদ্যার বোঝা শিক্ষার্থীর ঘাড়ে নির্বিচারে চাপিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত রইলেন তিনি তো অন্ধ। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির গলদ এইখানে যে তা বাইরের বিষয়কেই বেশী মর্য্যাদা দেয়।[২৩] শিশুর সাধ্য, প্রয়োজন ও আগ্রহের প্রতি তা অনেকটা অন্ধ। প্রাচীন পদ্ধতি যেন এটা ধরেই নেয়, যে শিশু শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারে অনিচ্ছুক ও অনাগ্রহশীল। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে, শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা

২৩ Gates, Jersild etc, Educational Psychology. P. 496.

২৪ John Dewey—

Failure to take into account adaptation to the needs and capacities of individuals was the source of the idea that certain subjects and certain methods are intrinsically cultural or intrinsically good for mental discipline...The notion that some subjects and methods and the acquaintance with certain facts and truths possess educational value in and of themselves is the reason why traditional education reduced the materials of education so largely to a diet of predigested materials. According to this notion it was enough to regulate the quantity and difficulty of the material provided...If the pupil left it instead of taking it, if he engaged in physical truancy or in the mental truancy of mind-wandering he was held to be at fault. No question was raised as to whether the trouble might not lie in the subject-matter or in the way in which it was offered.—Experience and Education. Pp. 45-46.

করে কঠোর হয়ে বিত্তারূপ চিরতার নির্য্যাস জোর করেই গেলানো। বলাই বাহুল্য, ডিউই এ মতের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তাঁর মতে শিক্ষকের অধিকতর অভিজ্ঞতার মূল্য তো এইখানেই যে তিনি শিশুর অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ে সক্ষম, এবং তাঁর সংবেদনশীল মন নিয়ে তিনি বুঝবেন, কোথায় শিশুর আগ্রহ, কোথায় তার অসুবিধা, কি তার প্রয়োজন। বিষয়-বস্তু বড় কথা নয়,—বড় কথা শিশুর মনকে তা গ্রহণের উপযোগী করা এবং সে দায়িত্ব শিক্ষকের। তাই নব্য (progressive) শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী কঠিন।

দ্বাদশ অধ্যায়

কল্পনা

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্ মালবিকার জালে।
কোন বসন্ত-মহোৎসবে বেণুবীণায় কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে।
কোন ফাগুনের শুক্ল নিশায় যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।
ছল করে তার বাঁধত আঁচল সহকারের ডালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।"[১]

* * * * *

"গতকাল গৃহিণীর কাছে একটা বিশেষ রকমের খাবার প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব পেশ করিলে গৃহিণী বিরূপ ও বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, বেশ, যখন বলিতেছ খাবার তখন নিশ্চয় তৈয়ারী করিয়া দিব, কিন্তু এই সর্তে যে, তুমি আমাকে তাহা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারিবে না! এইরূপ অদ্ভুত সর্তের উল্লেখ বলিয়া তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলে গৃহিণী তাহার জবাবে আপনাদের কোয়ার্টারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওই যে ওখানে কয়েকটি ভদ্রসন্তান বাস করে উহারা কি খায় তাহার খোঁজ রাখ? এমন কোন অপরাধ যদি তাহারা করিয়াই থাকে—যাহার জন্য দণ্ড এই তাহাদের প্রাপ্য, তথাপি সে অপরাধ তাহারা নিজেদের লাভ ও লোভের জন্য করে নাই, করিয়াছে—তোমার আমার জন্য, দেশ ও দশের জন্য, অথচ সেই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাহারা জেল খাটিবে, কারাকষ্টভোগ করিবে, অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইয়া কোনক্রমে জীবন ধারণ করিবে, আর আমরা ঠায় তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া চর্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়া উদরপূর্তি ও রসনা-তৃপ্তি করিব, এত বড় অনাচার কখনও ধর্মে সহিবে না। তোমার প্রাণ চায় তুমি স্বচ্ছন্দে তাহা খাইতে পার; কিন্তু উহাদিগকে অভুক্ত রাখিয়া সুখাদ্য আমার মুখে কিছুতেই উঠিবে

১ রবীন্দ্রনাথ—ক্ষণিকা (সেকাল)

না ; আমি তাহাদিগকে খাওয়াইতে না পারি, আমার নিজের আহারের আয়োজন কমাইবার অধিকার তো আমার আপন হাতে।"[২]

মনের ছবি আঁকবার ও ছবি ধরে রাখবার দুটি উদাহরণ। প্রথমটিতে মন খেয়াল খুসী মত ছবির পর ছবি আঁকছে,—একে বলি ইম্যাজিনেশান। আর দ্বিতীয়টী অতীত ঘটনা যেমন যেমনটি ঘটেছিল, মনের মধ্যে ঠিক তেমনই ছবি ফুটিয়ে তোলা ; একে বলা হয় ইমেজারি (Imagery)। একটিতে কবি নিজেকে হারিয়েছেন এক মাধুর্য্যময় অবাস্তব কল্পলোকে, আর একটিতে বাংলার একজন পুরাতন বিপ্লবী বর্ণনা করেছেন অতীত রাজনৈতিক অন্তরীণের বাস্তব আত্মকাহিনী। দ্বিতীয়টির আর একটি সহজ পরিচিত নাম আছে, তা হল স্মৃতি বা Memory।

কিন্তু দুটি অভিজ্ঞতাই ছবিকে অবলম্বন করে। তাই ব্যাপক অর্থে দুটিই ইম্যাজিনেশান্। বাস্তবিকপক্ষে সংকীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেই ইম্যাজিনেশান্ কথাটা ব্যবহৃত হ'তে পারে, তবে সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থেই কথাটা প্রচলিত।[৩]

অবশ্য যদিও একথা বলি যে সংকীর্ণ অর্থে কল্পনার বেলায় মন ছবি আঁকে এবং নূতন কিছু সৃষ্টি করে, তথাপি সে ক্ষেত্রেও অতীত অভিজ্ঞতাকে মূলধন করেই নূতন অভিজ্ঞতা আসর জমিয়েছে। যার কোন অংশই কুত্রাপি আমাদের অভিজ্ঞতার বস্তু হয় নি, বা হতে পারে না, তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। পক্ষীরাজ ঘোড়ার কল্পনা যখন করা হয় তখন তার পেছনে আছে পক্ষী ও ঘোড়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা। কল্পনায় এই বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন গুণকে একত্র করা হয়েছে মাত্র। মন এখানে তার অতীত অভিজ্ঞার সঞ্চয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তাদের বিভিন্নভাবে সাজায় বা বিচ্ছিন্ন করে, বাড়ায়, কমায় ;

---

২ জগদানন্দ বাজপেয়ী—চলার পথে—৯০ পৃঃ

৩ "The Word 'imagination' is used technically, in two ways. There is a wider and a narrower connotation of the term. In its wider meaning imagination includes all imaging and thinking in images. It therefore is equivalent to imagination in its narrowest sense, plus imagery. Imagination in the narrower sense is restricted to those cases where images are recombined to form new wholes. We are said to imagine the things we have never actually experienced. Imagery [or memory] refers to those cases where pictures of specific parts of one's past experience are recalled ; we can image i.e. form mental images only of the things we have actually experienced." Sandiford—The Mental and Physical Life of School Children, P. 250.

নিজের প্রয়োজন মত অতীত অভিজ্ঞতার মাল-মশলাগুলিকে সাজায় গুছায়। উড্‌ওয়ার্থ তাই বলছেন, "কল্পনা হচ্ছে মনের সংগৃহীত উপাদানগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া। যখন কোন ব্যক্তি তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলিকে আবার মনের সামনে আনে আর তাদের নতুন করে সাজিয়ে নতুন ছবি তৈরী করে, তখন সে ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়াকে আমরা বলি কল্পনা। কল্পনার বস্তুর বিভিন্ন অংশ পূর্বে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল এখন তাদের আবার মনের সামনে এনে ভিন্নভাবে সাজানো হোল, যেমন সেণ্টার (centaur)-এর কল্পনা হোল ঘোড়া আর মানুষের ছবির মিশ্রণ, মৎস্যকন্যা হোল মীন ও মানবীর ছবির মিশ্রণ।"[৪]

আমাদের অভিজ্ঞতার দুইটি প্রধান পথ। একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের পথ। চোখে দেখছি গাছের ভেজা পাতাগুলি থেকে জল ঝরছে, বিপন্ন কাকগুলি কা কা করে ডাকছে, শুনছি। যে কলম দিয়ে লিখছি, তার স্পর্শ কঠিন লাগছে, এগুলি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (Perception)। যে ঘটনা সদ্য সদ্য বর্তমান কালে ঘটচে, যে বস্তুগুলি অত্যন্ত দূর দেশে নয়, তাদেরই প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু যা অতীত, যা ভবিষ্যৎ, যা দূরবর্তী তাতো আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সুতরাং তারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হতে পারে না। তা হলে যা দূর দেশে বা দূর কালে ঘটে, তাদের আমরা কি উপায়ে জানি ? তাদের জানতে হলে 'ছবি'র (images) সাহায্য চাই। বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি, কিন্তু অতীতের 'ছবি' মনে আবার ফোটাতে পারি, ভবিষ্যতের 'ছবি' কল্পনার রংএ আঁকতে পারি। এই 'ছবি' দিয়েই জানি দূর দেশকেও। পড়ি রাশিয়ার কথা, আমেরিকার কথা, বিলাতের কথা। তাদের 'ছবি' 'মনের চক্ষে'র সামনে ভেসে ওঠে। কাজেই মানুষ দেশ ও কালের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে, এই ছবি বা image-এর সাহায্যেই। মানুষের উচ্চতর বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তাও এই ছবিকে অবলম্বন করেই সম্ভব হয়। অধিকাংশ প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীর মতে ছবিহীন চিন্তা (**Imageless thought**) একটা অসম্ভব কথা। এই 'ছবির' সাহায্যে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, তাকেই বলি ইম্যাজিনেশ্যন্।

আমরা এতক্ষণ বারে বারে বলেছি 'ছবি দেখা', 'ছবি আঁকা'। তাহলে ইম্যাজিনেশ্যন্ কি সব সময়েই চিত্রধর্মী এবং দর্শনেন্দ্রিয়-নির্ভর (Pictorial

৪ **Woodworth—Psychology, P. 552,**

and visual)? তা নয়। শব্দ, স্পর্শ, স্বাদ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই প্রতিরূপ বা ইমেজ থাকতে পারে। অতীতে শোনা একটি গান যখন স্মরণ করি, তা 'ছবি' নয়; বলা যেতে পারে তা মনের মধ্যে অতীত সুরের প্রতিধ্বনি। যখন অতীত কোন সুখকর স্পর্শ স্মরণ করি তখন তাকেও 'ছবি' বলা যায় না। কি নাম দেব সেই ইমেজ-এর? প্রতিস্পর্শ? কল্পনা করতে পারি, একটি স্বপ্নপুরীর উদ্যান, তাতে ফুটে আছে বহু সুগন্ধ ফুল, ফলে আছে নানা বিচিত্র ফল। সেই ফুলগুলির গন্ধ, সেই ফলগুলির আস্বাদ কল্পনা করে, ক্ষণিকের জন্যে তৃপ্তিলাভ করতে পারি। কাজেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করে এক এক জাতীয় কল্প বা ইমেজ হতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেক মনোবিজ্ঞানী বলবেন আমাদের অনুভূতি ও আবেগের ইমেজ আছে। বহুদিন পূর্বের ভীতিপ্রদ ঘটনা স্মরণ করে সেই ভয়ের প্রতিধ্বনি মনে জাগতে পারে। কাজেই যে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ যখন বাইরের কোন উত্তেজক (stimulus) এর সাহায্য ব্যতিরেকে "মন হতে" সৃষ্ট হয় তখন তাকেই কল্প- (image) বলা যায়। "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে সব মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার হয়, যদি সেগুলিকে মন আবার নিজের ভিতর জাগিয়ে তুলতে পারে, বাহ্য কোন উত্তেজকের তাড়না ব্যতিরেকেই, তখন আমরা পাই কল্প বা ইমেজ্। এতে যেন আমরা মনে না করি যে কল্প হুবহু প্রত্যক্ষ বস্তুরই মতন। অনেক বিষয়ে বরং বলা যেতে পারে, যে কল্প হচ্ছে প্রত্যক্ষ বস্তুর অবাস্তব ছায়া।[৫] প্রত্যেক সংবেদন (sensation), প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আবেগ বা অনুভূতির প্রতিরূপ বা কল্প থাকতে পারে। বিভিন্ন মুখ বা ঘটনার যেমন কল্প আছে তেমনি অবসাদ, ভয়, একাকীত্ববোধ, সুড়সুড়ি লাগারও কল্প বা ইমেজ থাকতে পারে।"[৬] অবশ্য আমাদের জীবনে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রভাব সব চেয়ে বেশী, তাই কল্পের অধিকাংশই চিত্রধর্মী। তাই অনেক সময়ই 'কল্প বা ইমেজ' বলতে আমরা ছবিই বুঝি।

কল্পের শ্রেণী বিভাগ—Classification of image—ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী তাহলে কল্পগুলিকে শ্রেণী বিভাগ করা যায়,—যেমন চিত্রধর্মী (visual), ধ্বনিধর্মী (auditory), স্পর্শধর্মী (olfactory), তাপধর্মী (thermal), গতিধর্মী (motor), অনুভূতিমূলক (emotional)। কখনও কখনও একটি শব্দ (word) বা বাক্য (sentence) উচ্চারণ করলে মনের মধ্যে কোন দ্রব্য বা গুণের ছবি জাগে না, হয়তো শব্দটার উচ্চারণের, বা

৫ Sandiford. The Mental and Physical Life of School Children P. 250.

৬ Thorndike. Elements of Psychology P. 143.

আর একটি শব্দের কথা মনে আসে। এরকম কল্পকে বলে শাব্দিক কল্প (verbal image)। অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যাঁরা বলেন তাঁদের চিন্তার ধারার সঙ্গে মনে কোন "ছবি" জাগে না, তাঁদের মন কথা হতে কথাতেই বিচরণ করে, তাঁদের চিন্তার ধারা "দেহ-হীন,'। তাঁদের মন শাব্দিক কল্পকে (verbal image) অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। "এমন কোন কোন ব্যক্তি আছেন, বিশেষতঃ যাঁরা বস্তু নিরপেক্ষ চিন্তায় অভ্যস্ত, তাঁরা চিত্র, ধ্বনি বা অনুরূপ মানসিক কল্পের অস্তিত্বই অস্বীকার করবার পক্ষপাতী। তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কোন দ্রব্যের ছবি মনে আনতে অক্ষম। শব্দ বা স্পর্শের প্রতিরূপ মনে আনবার ক্ষমতাও তাঁদের খুবই সামান্য। তাদের চিন্তার গতির ধারা যে কল্পের উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলে, তা মূলতঃ বা সর্ব্বাংশেই শাব্দিক (verbal)…এটা ঠিক নয় যে এ সব ব্যক্তির চিন্তা সম্পূর্ণ কল্প-নিরপেক্ষ, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে চিত্র কল্প যেমন কল্প, শাব্দিক কল্পও তেমনি কল্প (image)।"

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিদেরও ভাগ করেছেন এই কল্প অনুসারে। সব ব্যক্তির ছবি মনে আনবার ক্ষমতা সমান নয়। কারও ছবিগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট, কারও আবছা, আবার কেউ বলে, কোন "ছবিই" তাদের মনে জাগে না। গ্যালটন্ এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার বিভিন্ন স্থানের অনেক বিজ্ঞানী ও স্কুলের ছাত্রের কাছে একটি প্রশ্ন-সম্বলিত পত্র (questionnaire) পাঠালেন। তাদের বলা হ'ল তারা গতদিনের যে "খানা" খেয়েছে তার কথা স্মরণ করলে কি ছবি তাদের মনে জাগে সে কথা জানাতে। সে ছবি কি স্পষ্ট না অস্পষ্ট? সে ছবি পূর্ণ না বিচ্ছিন্ন? সে ছবি আলোকিত না ম্লান? জিনিষের ছবিগুলি কোথায় দেখা যায়? ইত্যাদি। বিভিন্ন উত্তর তিনি পেলেন। কেউ লিখলে, ছবিগুলি "উজ্জ্বল, স্পষ্ট এবং অমলিন। ঘটনার সঙ্গে ছবিগুলির সব বিষয়ে হুবহু মিল আছে। আমার মনে হয় বাস্তব ঘটনা দেখা ছবির মতই পরিষ্কার।" অনেকে লিখলে ছবিগুলি, "মোটামুটি বেশ পরিষ্কার, তাদের উজ্জ্বলতা বাস্তব ঘটনার অর্দ্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ। দ্রব্যগুলির সীমারেখার তীক্ষ্ণতা এক একটার এক এক রকম; এদের মধ্যে একটি বা দুটি দ্রব্যের ছবি অন্য দ্রব্যের তুলনায় সুস্পষ্ট।" আবার কেউ জানালে,

৭ Stout—Manual of Psychology. P. 149.

"ছবিগুলি অস্পষ্ট, আসল দ্রব্যগুলির সঙ্গে উজ্জলতার দিক দিয়ে তাদের কোন তুলনাই চলে না। তাদের সীমারেখাগুলি কেমন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, এখানে ওখানে অসমান ও মলিন আলোর বিচ্ছিন্নতা। ছবিগুলি নিতান্তই অসম্পূর্ণ।"[৮] আবার দেখা যায় কারও চিন্তায় "ছবি" বা চিত্রের প্রাধান্য, কাহারও বা স্পর্শ কাহারও বা শ্রুতি। তাই মানুষদেরও ভাগ হ'ল চিত্রপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, স্পর্শপ্রধান, গতিপ্রধান (visile, audile, tactile, motile) এই ভাবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর মন চিত্রধর্মী ; তিনি 'ছবি' দেখছেন আর কথার পর কথার রং দিয়ে ছবি আঁকছেন। উদাহরণের জন্যে 'সঞ্চয়িতা' খুলতেই 'বনবাণীর' এই কবিতাটি পেলাম—

"তোমার কুটিরের সমুখ বাটে
পল্লীরমণীরা চলেছে হাটে।
উড়েছে রাঙাধূলি, উঠেছে হাসি—
উদাসি বিবাগির চলার বাঁশি
আঁধারে আলোকেতে সকালে সাঁঝে
পথের বাতাসের বুকেতে বাজে।"[৯]

আবার ফরাসী ঔপন্যাসিক কুখ্যাত জোলা (Zola)র সম্বন্ধে শুনি, তাঁর কাছে নাকি "প্রত্যেক দ্রব্যেরই একটি বিশেষ গন্ধ আছে ; একথা মার্সাই বা প্যারী ইত্যাদি প্রতেকে নগরীর সম্বন্ধে সত্য, এমন কি বিভিন্ন রাস্তা বা বিভিন্ন ঋতুর সম্বন্ধেও সত্য। যেমন শরতের বিশিষ্ট গন্ধ হচ্ছে ব্যাঙের ছাতা (mushrooms) ও পচন্ত পাতার ; জোলা তাঁর মনের মধ্যে এ রকম প্রত্যেকটি ঘ্রাণ স্পষ্টভাবে এবং আলাদা আলাদাভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারতেন। জোলা ছিলেন বিশেষভাবে প্রাণধর্মী।"[১০] অন্ধ ও বধির হেলেন কেলারের মন অভ্যস্ত ছিল স্পর্শের স্মৃতির দ্বারা দ্রব্যকে জানতে, কারণ তাঁর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রধান উপায়ই ছিল স্পর্শ।[১১]

বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা এরকম শ্রেণীবিভাগের বিপক্ষে। তাঁরা বলেন মানুষদের এরকম টাইপে ভাগ করা যায় না। যার মন চিত্রধর্মী, তার মনে ধ্বনির প্রতিধ্বনি স্পষ্ট হবে না, এমন বলা যায় না। এ গুণগুলি, এমন নয় যে

৮ Galton—Inquiries into Human Faculty P. 112.
৯ রবীন্দ্রনাথ—বনবাণী (কুটির বাণী)
১০ Stout—Groundwork of Psychology. P. 113.
১১ Helen Keller—The story of my life.

একজনের আছে, আরেকজনের একেবারেই নেই। এগুলির কোনটা কারও বেশী, কারও কম। রবীন্দ্রনাথকে বলেছি চিত্রধর্মী, কিন্তু তিনি কি ধ্বনি-ধর্মীও নন? তাঁর বর্ষার বহু কবিতায় বারিপাতের ঝর ঝর শব্দ, মেঘের গুরু গুরু গর্জন, দাদুরীর কলরবও কি আমরা শুনতে পাই না? সম্ভবতঃ এ-গুণগুলির মধ্যে ইতিবাচক মিল (positive correlation) আছে। এবং এই গুণগুলির বেশী, কম, মাঝারি অনুসারে মানুষগুলিকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় একটা বক্ররেখায় (curve of distribution)।* থর্নডাইক্ তাই বলেছেন "মানুষেরা কতগুলি নির্দ্দিষ্ট ও পরস্পর-বিরোধী দলে ভাগ হয়ে নেই, বরং তারা যে কোন গুণ অনুযায়ী অবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। অল্প কয়টি বিশুদ্ধ 'টাইপ' বা অনেকগুলি মিশ্র টাইপের পরিবর্ত্তে বরং একটি মাত্র 'টাইপ'ই আছে, সে হচ্ছে মাঝারি। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন কল্পের পরস্পর বিরোধিতার পরিবর্ত্তে বরং দেখা যায় এই বিভিন্ন কল্পগুলির পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।"[১২]

কল্প ও রূপ, কল্পের লক্ষণ—Image and percept the characteristice of an image—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মানসিক অবলম্বনকে বলি রূপ (percept); আর যে প্রতিচ্ছবি, বা প্রতিধ্বনিকে অবলম্বন করে স্মৃতি ও কল্পনা, তাকে বলা হয় কল্প (image)। রূপ প্রত্যক্ষের বিষয়, তা স্পষ্ট, তা আলোকিত, সম্পূর্ণ। কিন্তু কল্প তুলনায় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। চোখের সামনে কোন জিনিষ থাকলে, তার খুঁটিনাটি সমস্ত অংশই স্পষ্ট করে জানি। তার সম্বন্ধে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারি। কিন্তু প্রতিরূপ বা কল্প সম্পর্কে অধিকাংশ সময়েই তা পারা যায় না। আর কল্পনায় বা স্মৃতিতে দ্রব্যের একটা দিক বা একটা গুণ, আমাদের মনে আসে। হয়তো ফুলের রংটাই মনে পড়ল। কিন্তু প্রত্যক্ষে যেমন তার পরিবেশের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ করে জানি, কল্পে তেমনটি হয় না। এই জন্যই ষ্টাউট বলেছেন কল্প হ'ল বিচ্ছিন্ন, রূপ হ'ল তীক্ষ্ণ, প্রখর, আলোকিত, কিন্তু প্রতিরূপ আবছায়া, প্রায়ান্ধকার, ভাঙা-ভাঙা। তবে কি তাদের তফাৎটা শুধু পরিমাণগত? একটি বেশী স্পষ্ট, আর একটা কম স্পষ্ট? হিউম্ বলছেন্ যে "দুইএর তফাৎ হচ্ছে এদের মধ্যে কোনটা মনকে কতটা সজীব ও সতেজ ভাবে ধাক্কা

* 'ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য'

১২ Thorndike. Educational Psychology. P.p. 193-204.

দেয়, তাতে। রূপের বিশেষত্ব হচ্ছে, তা সবলে মনকে ধাক্কা দেয়। আমি ইচ্ছা করি আর নাই করি হঠাৎ বিদ্যুতের চমক আমার মনকে আকর্ষণ করবেই। একে উপেক্ষা করবার উপায় নেই। প্রতিরূপের মনকে ধাক্কা দেবার ঠিক এই জাতীয় ক্ষমতা নেই। "যা শুধু প্রতিরূপ, তা মনকে কখনও এমন ভাবে ধাক্কা দেয় না।"[১৩] কাজেই ষ্টাউট সিদ্ধান্ত কচ্ছেন, যে তফাৎটা শুধু পরিমাণগত নয়, জাতিগত। আমাদের নিজ অবস্থানের উপর প্রত্যক্ষের রূপ নির্ভর করে। যদি বসে একটি জিনিষকে প্রত্যক্ষ করি, তা হলে একরকম দেখি; যদি দাঁড়িয়ে দেখি তখন তা আবার কিছু অন্য রকম দেখি, যদি হাঁটতে হাঁটতে দেখি তা হ'লে হয়তো আরো অন্য রকম। কিন্তু আমার নড়ন, চড়ন, অবস্থানের দ্বারা আমার প্রতিরূপ পরিবর্তিত হয় না। আমার প্রত্যক্ষ ততই উজ্জ্বল হয় যতই আমি মনোনিবেশ করি, কিন্তু মনোনিবেশ করে বিশ্লেষণ করতে গেলে, প্রতিরূপ বরং হারিয়ে যেতে চায়। ওয়ার্ড বলেন যে "প্রতিরূপের উজ্জ্বলতা ও সম্পূর্ণতা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এতে আমাদের মনে উৎসবাদিতে বাহিত গ্যাস বাতির শাখা-প্রশাখা-যুক্ত ঝাড়লণ্ঠনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তার আলোগুলি বাতাসের ঝাপটা লেগে কখনও বা স্তিমিত হয়ে যায়, কখনও বা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।"[১৪]

ইমেজ্, আফটার ইমেজ, প্রাইমারী মেম্যারী ইমেজ ও আইডেটিক্ ইমেজ-এর প্রভেদ—কোন রঙীন জিনিষের দিকে এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছি। হঠাৎ জিনিষটি কেউ দৃষ্টির সমুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু তখনও হুবহু সেই রংয়ের জিনিষের ছায়া চোখের সামনে কিছুক্ষণের জন্যে ভেসে রইল, এ অভিজ্ঞতা খুব অসাধারণ নয়। একে পজিটিভ্ আফ্টার ইমেজ বলে। আবার কখনো এই রকম একটি রঙীন জিনিষের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে সামনের দেয়ালে চোখ তুলে তাকালে সেই জিনিষের একটি বিপরীত রং (complimentary colour—যেমন লালের বিপরীত সবুজ)-এর ছায়া সেই দেয়ালে ফুটে ওঠে। একে বলে নেগেটিভ্ আফটার-ইমেজ্। এগুলিকে বাস্তবিক পক্ষে ইমেজ না বলাই উচিত, কারণ এগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই

After-image positive and negative

১৩ Stout—Manual of Psychology. P. 139.

১৪ Ward—Article on Psychology, Encyclopedia Brittanica P. 51.

তৎক্ষণাৎ পরিণতি (after effect)। অক্ষিপটে (retina), দেখা জিনিষ কতগুলি যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে। জিনিষটি সরিয়ে নিলেও সে ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্যে চলতে থাকে। সেইজন্যেই আমরা সেই জিনিষটিরই ছায়া দেখি। অক্ষিপটের উপাদানের মধ্যে একটা বিপরীত রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে ছবিটির রং-এর পরিবর্তন ঘটে। তার জন্যেই নেগেটিভ্ আফটার ইমেজ হয়। একটা গান শুনে মুগ্ধ হলাম। তার সুরটি বারে বারে ঘুরে ঘুরে মনের মধ্যে গুঞ্জন করতে থাকল। একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখবার অব্যবহিত পরেই সেই দৃশ্যটি বারে বারে চোখের সামনে ভাসতে লাগল, এগুলিকে বলে, রেকারেন্ট ইমেজ।

Recurrent image

নিবিষ্ট হয়ে লিখছি, কে যেন দরজায় ঘা দিল। তখন তা খেয়াল করলাম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই সচেতন হলাম। সে শব্দের প্রতিধ্বনি যেন মনে সাড়া দিল। রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চলে যাচ্ছি, একটি পরিচিত ছেলে হাত তুলে অভিবাদন করল, আচ্ছন্ন চেতনায় যথেষ্ট জোরে ঘা দিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ চলেই খেয়াল হল। সে ছেলেটির মুখটি মনে পড়ল। জেমস্ এই ছবিগুলিকে নাম দিয়েছেন প্রাইমারী মেমারী ইমেজ।[১৫]

Primary memory image

অতীতের কোন ঘটনা চেষ্টা করে যদি স্মরণে আনি, তা হ'লে যে ছবি মনে জাগে, তাকে বলা হয় স্মৃতি-কল্প। সংকীর্ণ অর্থে ইম্যাজিনেশানের উপাদান স্মৃতি-কল্প। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েচে এই কল্পগুলিকে প্রয়োজন মত যেখানে বাড়িয়ে, কমিয়ে, যোগ বিয়োগ করে সাজিয়ে, নূতন রূপ দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় কল্পনা (imagination.)

Memory image

কখনো কখনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অব্যবহিত পরে মনের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট 'ছবি' জাগে, যে ছবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গুণসম্পন্ন, যা মোটেই ছায়া নয়, যা বাইরে বাস্তবিক আছে

Eidetic image

---

১৫ A knock at the door, the hour struck on the clock, the face of a friend whom we have passed unnoticed, can sometimes be recognised a few moments later by means of the persisting image. Such vivid memory of the immediate past is called, Primary Memory. James—Outlines of Psychology.

বলেই প্রায় বিশ্বাস হয়, যেখানে দ্রব্যগুলির রং রূপ এবং তিনটি তলই আছে, এই রকম মনে হয়—সেগুলিকে আইডেটিক ইমেজ বলে। জার্মাণ মনোবিজ্ঞানী জ্যেনস্ (Jaensch) এবং মারবুর্গ ইষ্টিটুট অফ সাইকোলজীর সহকর্মীরা এই প্রতিরূপের কথা প্রথমে আলোচনা করেন। শিশুদের মধ্যে এই ধরণের প্রতিরূপ খুব সাধারণ, তবে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও কখন কখন নাকি এই রকমের প্রতিরূপ বা কল্প দেখা যায়। এর সম্পর্কে থুলেস্ (Thouless) বলেছেন, "এ জাতীয় প্রতিরূপ কিছু পরিমাণ শিশুদের মধ্যে দেখা যায় এবং সাধারণতঃ (যদিও সর্ব্বদা নয়) পরবর্ত্তী জীবনে এটা থাকে না। সাধারণ চিত্ররূপ (visual image) থেকে এর প্রভেদ হচ্ছে যে এগুলি অধিকতর স্থায়ী, এগুলির, প্রত্যক্ষ দ্রব্যের মত, বাইরের জগতে যেন অবস্থিতি আছে এবং এ ছবিগুলি থেকে, শিশু এমন সব গুণ বা লক্ষণের কথা বলতে পারে বা বাস্তবিক পক্ষে প্রথম প্রত্যক্ষের মধ্যে ছিল না।"[১৬]

এ-সম্বন্ধে উডওয়ার্থ বলছেন, "এ রকম মনে হয় যে চৌদ্দ বছরের কম অনেক ছেলেমেয়ে, সম্ভবতঃ অর্দ্ধেক ছেলেমেয়ে যদি একটা কঠিন পদার্থ বা ছবি খুব মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে, এবং চোখ বোজে, অথবা তার চেয়েও ভাল হয়, যদি সেই দ্রব্য বা ছবির থেকে চোখ ফিরিয়ে একটা ধূসর পর্দ্দার দিকে তাকায়, তাহলে তাদের আগের দেখা দ্রব্যটি যেন তখনও তাদের সামনে আছে, এমন স্পষ্ট দেখতে পায় এবং বাস্তবিক যখন দ্রব্যটিকে প্রত্যক্ষ করছিল, তখন দ্রব্যগুলির সম্বন্ধে যে সব গুণ তারা লক্ষ্য করেনি বা দেখেনি সেগুলি সম্বন্ধেও তারা উত্তর দিতে পারে। তাদের মনে যে ছবি জাগে তা ফটো-গ্রাফের ছবির মত হুবহু প্রতিমূর্তি নয়, তারা কতটা পরিবর্ত্তনক্ষম এবং শিশুর কৌতূহল ও আগ্রহ অনুযায়ী তারা মূল দ্রব্যের ছবির থেকে বদলে থাকে…এ পরিবর্ত্তনগুলি ইচ্ছাকৃত হতে পারে, অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। এ ছবিগুলি যেন অনেকটাই শিশুর মনের উপরই নির্ভর করে কিন্তু সেগুলির মূল দ্রব্য বা ছবির সঙ্গে মোটামুটি মিল থাকে।"[১৭]

Image and idea

কল্প হল "ছবি" আর সে ছবি মনে যে ভাব জাগায় তা হ'ল আইডিয়া। অর্থাৎ কল্পের তাৎপর্য্য বা মানে হল ভাব। গান্ধীজীর কথা মনে হ'লে, মনে হয়তো জাগে একটি অস্পষ্ট মুখ ও ক্ষমাসুন্দর সরল দু'টি চক্ষু—এটি হল গান্ধীজীর প্রতিরূপ। কিন্তু এই ছবিকে অবলম্বন করে মনে

---

১৬ Thouless—General and Social Psychology, P. 259.

১৭ Woodworth—Psychology, p. 350.

যে ভাব জাগে, তা হল তাঁর সম্বন্ধে আইডিয়া। "কল্প বা প্রতিরূপ ব্যতীত ভাব থাকতে পারে না, যেমন প্রত্যক্ষ থাকতে পারে না সংবেদন ছাড়া। কিন্তু তাই বলে এ দুটি এক নয়। কল্প বা প্রতিরূপ একটা দ্রব্যের সম্পূর্ণ ভাবের একটা উপাদান মাত্র; কিন্তু তার অন্য উপাদান যা বেশী প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে এ প্রতিরূপ যে অর্থ বা তাৎপর্য্য প্রকাশ করে। আমি যদি ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটনের কথা চিন্তা করি তা হলে আমার মনের মধ্যে যে ছবি জাগে তা হয়ত একটি ঈগল-পাখীর মত তীক্ষ্ণ নাকের একটি আবছায়া, কিন্তু এটাই নিশ্চয়ই ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন সম্বন্ধে আমার ধারণা নয়। আমার মনের মধ্যে যে ধারণা সেটি নানা মানসিক প্রক্রিয়া যেমন নেপিয়ার রচিত পেনিনসুলার যুদ্ধের কাহিনী ইত্যাদি পাঠের ফল।" [১৮]

যখন একটা ইন্দ্রিয়কে কোন উত্তেজক (stimulus) সক্রিয় করে তোলে, দেহের বাইরের বা অভ্যন্তরের কোন ধাক্কা এসে যখন কোন ইন্দ্রিয়কে আঘাত করে, এবং সে আঘাত নির্দিষ্ট স্নায়ু-কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাকে বলা হয় সংবেদন (sensation)। কিন্তু এই ধাক্কা বা আঘাতকে যখন একটি গুণসম্পন্ন বস্তু বলে বোধ জন্মে, তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Perception)। কাজেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হচ্ছে সংবেদনের অর্থবোধ (interpretation)। ঠিক সেই অর্থেই ভাব হচ্ছে কল্পের তাৎপর্য্যবোধ।

কল্পনার শ্রেণী বিভাগ—Forms of Imagination—সংকীর্ণ অর্থে ইম্যাজিনেসন্‌কে বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

(ক) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় কল্পনা—Active and Passive Imagination—কল্পনা সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হতে পারে। যেখানে চেষ্টার দ্বারা কল্পগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নূতন রূপ দেওয়া হয়, তাকে সক্রিয় কল্পনা বলে। আমি কল্পনা করতে পারি আমাদের নিতান্ত নিরীহ হরিমতির একজোড়া কাইজারী মার্কা গোঁফ গজিয়েছে। এটা হ'ল সচেষ্ট কল্পনা। আবার যেখানে মন অলস ভাবে হাল ছেড়ে বসে আছে, আর ছবির পর ছবি এসে মিশছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে তাকে বলব নিষ্ক্রিয় কল্পনা। দিবাস্বপ্ন (day dreaming) এবং রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখি দুইই হ'ল নিশ্চেষ্ট কল্পনা। অবশ্য মন

[১৮] Stout—Manual of Psychology.

কথনও সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে কিনা সন্দেহ। কাজেই খুব বেশী ঠিক করে বললে কোন কল্পনাই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হতে পারে না।

(খ) রচনাত্মক ও গ্রহণাত্মক—Creative and Receptive Imagination—যেখানে মনের ছবিগুলিকে নিজেরাই সৃষ্টি কচ্ছি, সেই কল্পনাকে বলা হয় রচনাত্মক। কবির কল্পনা, শৈশবের কল্পনা, বৈজ্ঞানিক বা ইঞ্জিনীয়ারের পরিকল্পনা এই শ্রেণীর।

কিন্তু যেখানে অন্যের ইঙ্গিতে মনে ছবি ফুটেছে, সে ছবি আমি নিজে সৃষ্টি করছি না, তাকে বলা হয় গ্রহণাত্মক কল্পনা (receptive)। ইতিহাসের বই পড়ছি, আর অতীত কালের ঘটনাগুলির ছবি ফুটে উঠছে। এখানে ছবিগুলির স্রষ্টা আমি নই। ঐতিহাসিকের কল্পনা আমার মনে প্রতিফলিত হচ্ছে, এগুলি হল গ্রহণাত্মক কল্পনা।

(গ) বুদ্ধি-আশ্রিত, সৌন্দর্য্যবোধ-আশ্রিত ও কর্ম-আশ্রিত কল্পনা Intellectual, Aesthetic and Practical Imagination—উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে কল্পনাকে এই তিন দলে ভাগ করতে পারি। বুদ্ধি-আশ্রিত কল্পনা বা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে যে কল্পনা তাকে বলা হয় (Intellectual)। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ঐতিহাসিক যে কল্পনাকে আশ্রয় করে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করেন, অথবা জ্ঞানের বিষয় বোঝাতে চেষ্টা করেন তা এই জাতের। যে কল্পনা অনুভূতি জাগাবার কাজে, সৌন্দর্য্যবোধ ফোটাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যে কল্পনার সাহায্যে কবি ও শিল্পী তাঁদের মানস আবেগকে রূপ দেন, তাকে বলা হয় Aesthetic বা সৌন্দর্য্যবোধ-আশ্রিত কল্পনা। যে কল্পনা কোন বাস্তব সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে তা কার্য্যকরী (Practical)। পানামা খাল কাটতে হবে। সুয়েজ্ খাল নির্মাণকারী জগৎবিখ্যাত পূর্তকর্মবিদ্ ডি লেসেপ্স্ (De Lesseps) এর উপর এ ভার অর্পিত হয়েছে। তিনি ছবি আঁকছেন, নক্সা তৈরী কচ্ছেন, আনুমানিক হিসাবের আন্দাজ কচ্ছেন। যে 'কেজো' কল্পনার সাহায্যে তিনি এ ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, তা হোল-Practical। এ কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেন ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ্।

(ঘ) মুক্ত কল্পনা ও নিয়ন্ত্রিত কল্পনা—Free Imagination—(Autistic thinking) and Controlled imagination (Expectation. Historical and Scientific imagination)—কল্পনা আবার বেতুইনের

মত বল্গাহীন হতে পারে, অথবা তা সংযত ও বাস্তব ঘটনানুসারী হতে পারে। প্রথম দলের কল্পনাকে আমরা বলি কবি-কল্পনা (free imagination, fancy, fantasy)। এখানে বাস্তব জগতের কোন কঠোর নিষেধ নেই, কল্পনা এখানে নিজ পাখার উপর ভর করে যেখানে খুসী উড়ে চলেছে। এই জন্যে এই জাতীয় চিন্তাকে স্বয়ং-চালিত চিন্তাও বলা হয় (autistic)। এখানে অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না—এখানে মন স্বয়ংবরা হয়েই আছে। যাকে দিবাস্বপ্ন বলা হয়েছে, তা এই দলের। শিশুদের খেলায় এই মুক্ত কল্পনার প্রভাব যথেষ্ট। সেখানে "যেন-যেন",—"মনে কর, যেন বিদেশ ঘুরে,—মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।" একে ইংরাজীতে বলা হয় make-believe। যেখানে খেলা সেখানেই এই আত্মরতি। "স্বয়ং চালিত চিন্তা হচ্ছে এমন চিন্তা যা বাস্তব জগতের ধার ধারে না। এ চিন্তায় কোন একটা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটছে এই যথেষ্ট। এ চিন্তা অন্যের সমালোচনা এমন কি নিজের সমালোচনা দ্বারাও পরিচালিত বা পরিবর্তিত হয় না এবং এ চিন্তা নিজেকে বাস্তব সত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করে না। এ চিন্তার বৈশিষ্ট হচ্ছে ইচ্ছাপূরণ।"[১৯]

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ জাতীয় অবাস্তব কল্পনা স্বভাবতই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক উন্মাদের মধ্যেও এরকম কল্পনা অনেক সময় দেখা যায়। সে আলোচনা পরে করা যাবে।

যেখানে কল্পনা বাস্তবজগতের কঠিন আঘাতে সংযত, যা সম্ভাব্যের গণ্ডী উল্লংঘন করে লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত অজানা স্বপ্নরাজ্যে উড়ে চলে না, যা বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বাস্য এই রকম কল্পনাকে জ্ঞানবৃদ্ধির কাজে লাগান যায়। তাদের আবার তিন দলে ভাগ করা চলে।

(ক) প্রতীক্ষা—Expectation, Anticipation—ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটবে তার সম্বন্ধে কল্পনা। আকাশে ঘন মেঘ দেখে ধারণা করলাম, বৃষ্টি আসবে, দরজা জানালা বন্ধ করলাম, বাইরের শুকনো জামা-কাপড় তুললাম—এ হল **expectation.**

(খ) ঐতিহাসিক কল্পনা—Historical Imagination—কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে গেলাম বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন দ্রব্য দেখলাম।

১৯ **Woodworth—Psychology. P. 569.**

তাকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক বর্ণিত সেই অতীতকালটিকে জীবন্ত করে তুললাম মনের মধ্যে। এ হল ঐতিহাসিক কল্পনা।

(গ) **বৈজ্ঞানিক কল্পনা—Scientific Imagination**—এই কল্পনার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির মূলসূত্র অনুসন্ধান করেন। যেমন নিউটন্ বাগানে বসেছিলেন। মাথায় একটি আপেল ফল টুপ্ করে পড়ল। তাঁর বৈজ্ঞানিক মন প্রশ্ন করল, "কেন ফলটি নীচে পড়ল? কেন আকাশে উড়ে গেল না?" তিনি চিন্তা করলেন শুধু আপেলই নয়, ইট, বল যে কোন দ্রব্যই অবলম্বন-শূন্য হলে মাটিতে পড়ে। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পনা তাঁকে বলল, তা হলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর একটা আকর্ষণ আছে। মাধ্যাকর্ষণের সূত্রটি আবিষ্কৃত হল।

এই জাতীয় সমস্ত কল্পনাই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত।

অধ্যাস, মতিভ্রম, স্বপ্ন—Illusion, Hallucination, Dream—কল্পনার স্বস্বরূপ কয়েকটি আলোচনা করা গেল। এবার কল্পনার বিকারের (Abnormal) কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক, ও সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। অবশ্য যখন এগুলিকে কল্পনার বিকার বলছি, তখন এ কথা বুঝতে হবে না যে সুস্থ মানুষের মধ্যে এগুলি দেখা যায় না। সুস্থ মানুষের প্রত্যেকেরই কখনো না কখনো এই সব অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তথাপি এরা সাধারণ সুস্থ অভিজ্ঞতা হতে পৃথক, এবং এদের বাড়াবাড়ি মানসিক রোগ বলে বিবেচিত হয়।

কল্পনার অবাস্তব আকাশচর বৃত্তি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আঘাতে সংযত হয়। কিন্তু এ সব বিকারের ক্ষেত্রে দেখা যায় কল্পনাই বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং কখনো কখনো তাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করেছে।

অধ্যাস, মায়া—Illusion—সর্পতে রজ্জুভ্রম, বা শুক্তিতে মুক্তাভ্রম ন্যায়শাস্ত্রের অতি পরিচিত উদাহরণ। ক্লাশে নরেনের নাম ডাকলাম—ভুলে হরেন উঠে উত্তর দিল। এই উদাহরণগুলি হতে বোঝা যাবে ইলিউসন্ হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের ভ্রম। বাইরের একটা উত্তেজক কোন ইন্দ্রিয়কে আঘাত কচ্ছে, কিন্তু তার ঠিক ঠিক প্রতিক্রিয়া হল না, একটি ভুল প্রতিরূপ জাগল। একে বলব মায়া,—বিশেষ করে ভ্রমটি যখন উল্লেখযোগ্য বা বিস্ময়কর। অন্ধকারে শ্মশানের কাছ দিয়ে আসতে গাছের দুইটি ডালকে যখন 'ভূত' বলে কল্পনা

করে ভয় পাই, তখন আমার ইন্দ্রিয়বিভ্রম ঘটছে। "মায়া হচ্ছে প্রত্যক্ষের বিভ্রম। কাজেই প্রত্যক্ষের সব ভুলকেই এই দলে ফেলা যায়, কিন্তু ইল্যুস্যন্ কথাটা সাধারণতঃ সেখানেই ব্যবহার হয়, যেখানে ভুলটা সংঘাতিক ও বিস্ময়কর। বাইরের একটা উত্তেজকের (stimulus) আঘাতে যখন একটা ইন্দ্রিয় এমন একটা দ্রব্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, যা বাস্তবিক ইন্দ্রিয়টির সামনে নেই, তখন তাকে বলা হয় ইল্যুস্যন্। সত্যি যে জিনিষটি ইন্দ্রিয়ের সামনে আছে তাকে না জেনে ইল্যুস্যন্ অন্য একটি জিনিস আছে, বলে ভুল করে।"[২০] কেন এমন ভুল হয়? এখানে কল্পনা ইন্দ্রিয়কে বিপথগামী করে। কখনো কখনো আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠনের মধ্যেই এই ভ্রমের মূল থাকে, যেমন একটা খাড়া রেখা সমান মাপের লম্বা রেখার চেয়ে বড় বলে মনে হয়। তা ছাড়া পুরাতন অভ্যাস বা কোন একদিকে মনের প্রস্তুতির জন্যেও একরকম হ'তে পারে। প্রত্যক্ষের চেয়ে ভুল কল্পনার অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করবার কোন না কোন কারণ থাকে বলেই, প্রত্যক্ষের উপর ভুল কল্পনা আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এবং এই প্রাধান্যের কারণ অনুযায়ী ইল্যুস্যান্‌কে কয়েকটি দলে ভাগ করা যায়। "সত্য দ্রব্যের চেয়ে মিথ্যাদ্রব্য কোন না কোন কারণে, নিয়শ্চই আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়, সেজন্যই বিভ্রম ঘটে। যে কারণে এ আধিপত্য ঘটে, ও বিভ্রম সৃষ্টি হয়, সে অনুযায়ী বিভ্রম বা মায়ায় শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে।"[২১]

১। **মিথ্যা দ্রব্যটি সত্য দ্রব্যের তুলনায় অধিকতর পরিচিত বলে বিভ্রম ঘটে**—ভুল দ্রব্যটি যদি অধিকতর পরিচিত হয়, তবে প্রত্যক্ষের কাছাকাছি কোন জিনিষকে সেই ভুল দ্রব্যটি বলেই মনে হবে। ধর, বইয়ের এক জায়গায় ভুল ছাপা আছে "খরতপ"। কিন্তু যেহেতু আমরা "খরতাপ" কথাটির সঙ্গে পরিচিত, কাজেই আমরা লেখাটিকে "খরতাপ" বলেই পড়ে যাই, ভুলটা আমাদের চোখে পড়ে না। একে বলে প্রুফ্ রিডারের ভুল (Proof-reader's illusion)। ছাপাখানায় যাঁরা প্রুফ্ দেখেন, এই বিভ্রমের জন্যেই অনেক সময় ভুল ছাপা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। "ছাপার সঙ্গে ঠিক শব্দটির যদি যথেষ্ট মিল থাকে তাহলে ভুল ছাপা পাঠকের মনে ঠিক শব্দটির মত একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এবং পাঠক

২০ Woodworth—Psychology P. 457.

২১ Woodworth—Psychology, P. 457.

(ভুল ছাপা সত্ত্বেও) একই তাৎপর্য্য বোধ করে সন্তুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলে।” আর একটি উদাহরণ,—এক হাতের পাশাপাশি দুটি আঙ্গুল একটির উপর একটি কোণাকোণি করে রেখে দুই আঙ্গুলের ফাঁকের মাথায় একটি গুলি রাখলে দুটি গুলি বলে ভ্রম হয়। একে অ্যারিষ্টটলের ভ্রম (Aristotle's illusion) বলা হয়।

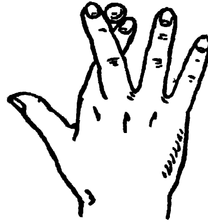


Fig. 29. Aristotle's illusion. Woodworth, Psychology P. 58. (Methuen)

২। **আমরা যে দ্রব্যটি প্রতীক্ষা কচ্ছি, মিথ্যা দ্রব্যটি সে দ্রব্যের অনুরূপ বলে বিভ্রম সৃষ্টি হয়**—একটি ঝর্ণা কলম হারিয়েছে, তা খুঁজছি, হঠাৎ প্রায় একই মাপের ও একই রং এর পেন্সিল চোখে পড়ায়, চীৎকার করে চেঁচিয়ে বললাম, 'পেয়েছি' 'পেয়েছি'। এখানে ভুলটি হ'ল এই জন্যে, যে কলমটিকে প্রতীক্ষা কচ্ছি, তার কল্পনাতেই মন আছন্ন, তাই কতকটা সেই রকম দেখতে পেন্সিলটিকেই কলম বলে ভুল করলাম। “আমাদের প্রতীক্ষার আগ্রহ ভুল দ্রব্যটিকে ঠিক দ্রব্য বলেই পাচার করে দিল তাদের মধ্যে মিলের জন্যে।”

৩। **মিথ্যা দ্রব্যটি অন্য দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে এমন একটি সমগ্র সম্পূর্ণ ধারণা জন্মায় যে বিভ্রম জাগে**—কোন একটা ছবির খুঁটিনাটি অংশগুলি মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করে না দেখলে, তার মধ্যে ভুল ধরা পড়ে না। মন সাধারণতঃ সে পরিশ্রম করতে চায় না। তাই প্রথম দেখার সময় যে ধারণা বা কল্পনা, তাই প্রভাব বিস্তার করে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্—

প্রথম দুটি পাশাপাশি রেখার মধ্যে বাঁ-দিকের রেখাটি ডান দিকের রেখা হতে বড় মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। সেই রকম প্রথম

বৃত্ত ও দ্বিতীয় বৃত্তের বহিঃসীমার দূরত্ব এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃত্তের অন্তঃসীমার দূরত্ব সমান কিন্তু প্রথমটির দূরত্ব বেশী মনে হয়। তৃতীয় ছবিতে মধ্যবর্ত্তী

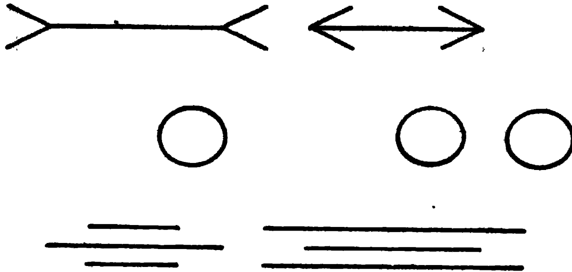


Fig. 30—Muller-Lyer illusion

রেখাটি পাশাপাশি দুইটি ছবিতেই সমান কিন্তু তাদের অসমান মনে হয়। এইগুলির নাম ম্যুলার-লয়ের ইল্যুশন্ (Muller Lyer illusion)। অনুরূপ আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল।

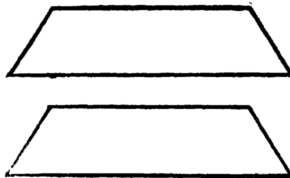


Fig. 31—The pan illusion

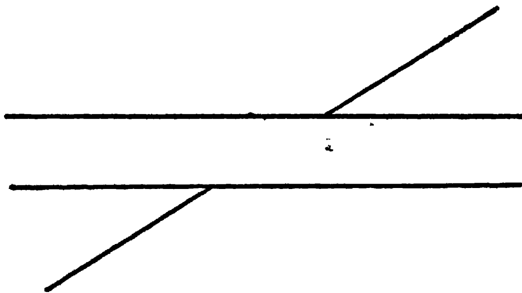
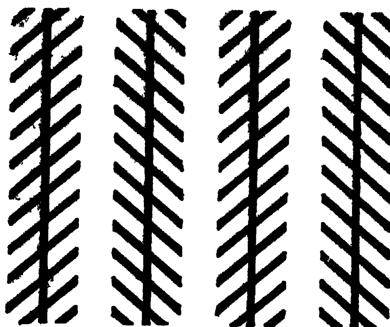


Fig. 32—The Poggendorf illusion


Fig. 33—The Zoellner illusion

প্রথম ছবিটিতে মনে হয় নীচের ছোট ডালাটি উপরের বড় ডালার ভেতরে ঢুকছে। বাস্তবিক পক্ষে ডালা দুটি সমান।

দ্বিতীয় ছবিতে মনে হয় দুইটি সমান্তরাল রেখাকে আর একটি সরল রেখা ভেদ করে যাচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে ভেদকটি একটি একটানা সরল রেখা নয়।

তৃতীয় ছবিটিতে চারটি সমান্তরাল রেখাকে বাঁকানো বলে ভ্রম হয়।

বিভ্রম মনের ক্ষণস্থায়ী অবস্থা। কিঞ্চিৎ মনোযোগ করলেই ভুল ধরা পড়ে। আমাদের পুরাতন অভ্যাস, অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল মনের প্রস্তুতি, সবটা মোটামুটি দেখে নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত করা, এইগুলি ভ্রমের কারণ। কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটি সত্য ও নির্ভুল, সেখানেও কিন্তু এই কারণগুলিকে আমরা ব্যবহার করি। অতীত অভিজ্ঞতার নিকষেই নূতন প্রত্যক্ষ-লব্ধ বস্তুকে চিনতে পারি। যা একেবারেই নূতন যার সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার কোনই মিল নেই তা তো আমরা জানতেই পারি না। মনের একটা প্রস্তুতি (preparatory set) থাকে বলেই কোন একটা জিনিষের অংশমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামনে আসা মাত্রই সমগ্র জিনিষটাকে সহজে বুঝতে পারি। সমগ্রকে মোটামুটি বুঝে নেবার ক্ষমতা আছে বলেই আমাদের বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি হতে সহজে একটি দ্রব্যের ধারণা করতে পারি। এগুলি মনের গুণ বটে, কিন্তু দোষ মিশ্রিত গুণ। এই দোষ বর্জন করতে পারলেই নির্ভুল অভিজ্ঞতা হয়। উডওয়ার্থ তাই বড় সুন্দর করে বলেছেন, "তিনিই ভাল পর্যবেক্ষক যিনি তার (পর্যবেক্ষণের) দোষের যে গুণ তা গ্রহণ করতে পারেন, আর তাঁর গুণের দোষগুলি বর্জন করতে পারেন।"

অমূলপ্রত্যক্ষ বা মতিবিভ্রম—Hallucination—নিশি-ভূতের কথা শুনেছ কি? সন্ধ্যাবেলা কে নাকি এসে নাম ধরে ডেকে যায়—দরজা খুললে দেখা যায়, কেউ নেই। ধর্মগ্রন্থে দেখা যায় হঠাৎ দৈববাণী হল। ঘরে বসে

আছি, হঠাৎ বহুদিন পূর্বে মৃতা আত্মীয়ার ছবি সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠল—একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মত জীবন্ত। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে গেলাম—ছবি মিলিয়ে গেল। এ রকম অভিজ্ঞতা বিরল নয়। এ রকম ভ্রমকে বলে অমূলপ্রত্যক্ষ। এখানে 'ছবি'র পেছনে কোন বাস্তব কারণ নেই। অধ্যাসের বেলায় রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, কিন্তু অমূলপ্রত্যক্ষে সাপ দেখেছি দিনের বেলায়, খোলা জায়গায়—যেখানে সাপ দূরে থাকুক দড়ির মতনও কিছু পড়ে নাই। এখানে অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষের মতই বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম, কিন্তু তার কোন বস্তুগত (objective) কারণ নেই। এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, যদিও যার এ ভ্রম হচ্ছে, সে জানে না যে এটা ভ্রমাত্মক। সে একে সম্পূর্ণ সত্য বলেই বিশ্বাস করে। সুস্থ মানুষদের কখনও কখনও এ রকম ভ্রম হ'তে পারে, কিন্তু যেখানে দেখা যায় এ ভ্রম স্থায়ী, সেখানে দৈহিক বা মানসিক বিকার রয়েছে বুঝতে হবে। টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে রোগী প্রলাপ বকে—তখন সে অকারণ হঠাৎ ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে—এটা অমূলপ্রত্যক্ষ। "অধ্যাসের বেলায় ইন্দ্রিয়গুলি সুস্থ অবস্থায়ই আছে এবং স্বাভাবিক ভাবে বাস্তব কোন দ্রব্য দ্বারাই প্রভাবান্বিত; কিন্তু পূর্বের কোন স্থায়ী অভ্যাস বা সংযোগ হেতু অথবা অন্য কোন কারণে মনে বিপরীত কোন দ্রব্যের ধারণা জন্মে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মোমের তৈরী একটি মূর্তিকে আমরা জীবন্ত মানুষ বলে ভুল করি। একটি বইয়ের ডামিকে (নকল) আসল বই বলে ভুল করি ।…কিন্তু অমন প্রত্যক্ষের বেলায় যে ভুল ধারণাটি জন্মে সেটা অংশতঃ বা পূর্ণতঃ ইন্দ্রিয়াদি ও তার স্নায়ু সম্বন্ধগুলির বিকৃতির ফল। যেমন জ্বরবিকারের প্রলাপের মধ্যে রোগী ইঁদুর বা সাপ দেখে, তার কারণ সত্যি ইঁদুর বা সাপ দেখলে তার স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়গুলিতে যে পরিবর্তন ঘটতো, বিকারের ফলে ভিতর থেকেই সেই পরিবর্তন ঘটে।"[২২]

স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের কোন উত্তেজক দ্বারা তাড়িত হলে তবেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু অমূলপ্রত্যক্ষের বেলায় বাইরের কোন উত্তেজক উপস্থিত না থাকলেও আভ্যন্তরীণ কোন কারণে ভিতর হতেই ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক স্নায়ুকেন্দ্রগুলি সক্রিয় হয়, ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মতই স্পষ্ট অনুভূতি জন্মে। সাধারণতঃ অসুস্থ অবস্থাতেই এরকম হয়ে থাকে। ঘুমের মধ্যেও দৈহিক, বিশেষতঃ স্নায়বিক উপাদানগুলিতে বিকার ঘটে, সেই জন্যে আমরা

২২ Stout—Manual of Psychology P. 447

স্বপ্ন দেখে থাকি। অনেক সময় অধ্যাস এবং অমূলপ্রত্যক্ষের মিশ্রণ ঘটে। স্বপ্নের বেলায় এ রকম প্রায়ই হয়। বাইরের একটা উত্তেজক কারণ প্রথম থাকে বটে, কিন্তু যে ছবি ক্রমে ফুটে উঠতে থাকে তা শেষটায় সেই উত্তেজকের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য; যেমন জানালা খুলে শুয়েছি, বৃষ্টির ছাট পায়ে লাগছে। স্বপ্ন দেখলাম সমুদ্রে ভেসে চলেছি, একটা কাঠকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছি (হয়তো কোল বালিশ বুকে জড়িয়েছি)। হঠাৎ কাঠটা বাঘ হয়ে আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল এবং আমার নাকের উপর থাবা মারল—আমি বল্লাম "আমার খিদে নেই, তখন বাঘটা একটা জাহাজ হ'য়ে গেল" ইত্যাদি। এখানে বৃষ্টির ছাটটা সমুদ্রে ভাসবার স্বপ্নের একটা বাস্তব কারণ সন্দেহ নেই কিন্তু স্বপ্নের পরবর্তী ছবিগুলির কোন বাস্তবিক কারণ নেই। "অমূলপ্রত্যক্ষের একটি কারণ হচ্ছে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের প্রকৃতি ও পরিমাণের পরিবর্তন, এবং তার ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের বিকার। রক্তের মধ্যে এ্যালকোহল্, আফিং, ইথার, ক্লোরোফর্ম অথবা এ জাতীয় বিষ পদার্থ সঞ্চিত হলে, সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাসক্রিয়া মন্দীভূত হওয়াতে রক্তে কার্বোলিক এ্যাসিড্ সঞ্চয় হয়, এবং তার ফলে মস্তিষ্কের ইন্দ্রিয়বোধের কেন্দ্রগুলি অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত হয়। অনেক অমূলপ্রত্যক্ষের মূলে আছে স্নায়ুবিকারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির উপর বাইরের উত্তেজকের স্বাভাবিক ক্রিয়ার মিশ্রণ। যখন এ রকম হয়, তখন অমূলপ্রত্যক্ষ কতকটা অধ্যাসের প্রকৃতি ধারণ করে। অধিকাংশ দিবাস্বপ্নের বেলায় একথাটি সত্য।"[২৩]

ষ্টাউট অমূলপ্রত্যক্ষের দৈহিক বা স্নায়বিক কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু ফ্রএড্পন্থীরা এর মধ্যে অবচেতন মনের ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। এটা স্নায়বিক বিকার সত্য কিন্তু এর মূলে রয়েছে অবচেতন মনের জটিল সংঘাত। বাস্তবিক পক্ষে বহু উন্মাদ রোগগ্রস্ত রোগীদের মধ্যে অমূলপ্রত্যক্ষ অত্যন্ত প্রবল।

ভ্রান্তি-Delusions—"এই যে একটা লোক সারাদিন খেটেখুটে বাড়ী এলো, কারু তাতে ভ্রূক্ষেপ আছে? সবাই আছে নিজ নিজ আরাম, আয়াস, স্ফূর্তি নিয়ে!" এ রকম অভিযোগ করে নাই বা শুনে নাই এ রকম লোক পৃথিবীতে বিরল। এ রকম ভুল ক্ষণিক বিশ্বাস সাধারণ সুস্থ মানুষে অহরহই দেখা যায়। আবার যখন কোন লোকের মনে এ ভুল বিশ্বাস স্থায়ী হয়ে সত্য প্রত্যক্ষের সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করে, একটা নিজস্ব কাল্পনিক জগৎ গড়ে

২৩ Stout—Manual of Psychology P. 448.

তোলে তখন আমরা তাকে বলি উন্মাদ বা মানসিক বিকারগ্রস্ত। এই দুই ক্ষেত্রেই ভুল বিশ্বাসকে বলা হয় ভ্রান্তি বা ডিলিউসন্।

মানুষের অহং বুদ্ধি বড় প্রবল। প্রত্যেকেই নিজেকে বড় ভালবাসে। মানুষের দেহের পক্ষে যেমন বাতাস অপরিহার্য, তেমনি তার মনের পক্ষেও অপরিহার্য, তার অহমিকার তৃপ্তি। কিন্তু নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আমরা যা চাই, তা পাই না,—যা করতে চাই, তা করতে পারি না। পদে পদে বাধা পাই, পদে পদে পাই আঘাত। এতে আমাদের অহংবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। বাইরের জগতে এই ক্ষোভ মিটাবার উপায় নেই। তাই আমরা আশ্রয় নেই কল্পনার। অফিসে মনিব অকর্মণ্য বলে গালাগালি দিয়েছেন—মনে বড় লাগল। সন্ধ্যেবেলা বিষণ্ণ মুখে তামাক টানতে টানতে কল্পনা করতে লাগলাম মনিব ব্যবসায় সংক্রান্ত বিপদে পড়ে, পথ দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ আমাকে তার ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, "অবিনাশ একটা বুদ্ধি বাৎলাও তো, ইন্‌কাম ট্যাক্স এর মামলাটার বেড়াজাল থেকে উদ্ধার পাই কি করে?" আমি যেন সুযোগ বুঝে বললাম, "তা স্যার, আমার মত অকর্মণ্য সামান্য মানুষকে ডেকেছেন কেন? ('অকর্মণ্য' কথাটার ওপর একটা বিশেষ জোর দিলাম—বুঝুক) আপনার বড় বড় অফিসার আছেন—ললিতবাবু আছেন, মিত্র সাহেব আছেন, তাঁদের ডাকুন, তাঁরা বুদ্ধিমান্ (আবার কথাটার উপর জোর) তাঁরা একটা ভালো পরামর্শ দেবেন।" মনিব এবার চেয়ার হতে উঠে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "সেদিনের কথাটা ধরে বসে আছো বুঝি? তুমিও পাগল। অফিসের মধ্যে সত্যি সাফ্-মাথা যদি কেউ থাকে সে তুমি! যাও কাগজপত্রগুলি নিয়ে যাও—ভাল করে পড়ে আধ ঘণ্টা বাদে এসে আমাকে বলে যেও। আর বুঝলে, ও বেলা তোমাকে আর অফিসে আটকে থাকতে হবে না। আর নাও।" এই এই বলে নামজাদা সিনেমা হাউসের একটা ফ্যামিলি পাস্ দিয়ে বললেন "আজ সবাইকে নিয়ে একবার 'বইটা' দেখো এসো—সারা জীবনই তো কাজ করলে মাঝে মাঝে একটু ছুটিও তো চাই।" কল্পনার জাল কেটে গেল। গৃহিণী এসে জানালেন, "ভাত প্রস্তুত।" অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য হলেও মনের ক্ষোভ দূর হয়েছিল কল্পনার সাহায্যে। এই রকম কত বিচিত্র ভাবে কল্পনা আমাদের দুঃখ বেদনায় ক্ষণিকের শান্তিপ্রলেপের কাজ করে। এ প্রভাব দেখি আমরা রাত্রির স্বপ্নে, দিবা স্বপ্নে। কখনো বা ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করে ক্ষুণ্ণ অহংকে তুপ্ত করি। তখন কল্পনা করি আমার মূল্য কেউ বুঝল না, আমার ভালবাসা,

আমার বিশ্বাস, আমার স্বার্থত্যাগের কোন মর্য্যাদা দিল না। সাধারণতঃ সুস্থ মানুষের পক্ষে অবশ্য এমন আত্মপ্রবঞ্চনা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। যারা বেশী অভিমানী যারা বাইরের সংগ্রাম ও কর্মের মধ্যে নিজের মনের ক্ষোভ মেটাতে পারে না, (সম্ভবতঃ নিজ অক্ষমতা বশতঃই) তারা দুঃখ পায় এবং কখনো এ হতেই মানসিক বিকারের সূত্রপাত হয়। এবং তেমন ব্যক্তি তার ভ্রান্তির জগতেই নিমগ্ন হয়ে বাইরের জগৎ এবং তার সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একে বলা হয় বিচ্ছিন্নতা (dissociation)। এমনও হতে পারে যে এ রকম লোক অন্যান্য বিষয়ে স্বাভাবিক কিন্তু একটা জায়গায় তাহার মনে এমনই জট পাকিয়েছে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিপরীত সাক্ষ্যও তার কাছে মূল্যহীন—সেখানে সে সম্পূর্ণ বিকৃতমস্তিষ্ক বা পাগল।

উন্মাদের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস—Paranoia—যেখানে ভ্রমাত্মক বিশ্বাস স্থায়ী হ'য়ে এ রকম জট পাকায় তাহাকে প্যারানোয়িয়া নাম দেওয়া হয়েছে। এ প্রকার ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ডিমেন্‌সিয়া প্রেকক্স (Dementia Proecox) বা সিজোফ্রেণিয়া (Schizophrenia) রূপ উন্মত্ততার একটি বিশেষ লক্ষণ। অহমিকা আহত হয় এরকম কোন বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের মূল। ঐ ঘটনাকে মন হতে মুছে ফেলবার জন্যে মিথ্যার জাল বুনে আমরা নিজেদের আত্মরক্ষা করতে চাই। সম্ভবত ব্যক্তি যখন অতীতের কোন লজ্জাজনক দুর্বলতা বা নিজের কোন পাপ কার্য সম্পর্কে সচেতন এবং এই জ্ঞান ও বুদ্ধির বেদনাদায়ক বা লজ্জাকর অনুভূতিকে অবদমন করতে যায়, তখনই এ জাতীয় ভ্রান্তি স্থায়িত্ব লাভ করে, —ত: স্পষ্টই অস্বাভাবিক মনোবিকারে পরিণত হয়। এই অবদমনের ফলে এদের সম্পর্কে খোলাখুলি আত্মসমালোচনার পথ নিরুদ্ধ হয়ে যায়। সাধারণতঃ প্যারানোয়িয়ার রোগীদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে তার আশে পাশের আরো ঘটনাগুলিকে সেই বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে নিজের মন মত সঙ্গতি করিয়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়। অন্য নানা ঘটনার বা বিশ্বাসের সেই মূল ভ্রান্ত বিশ্বাসের পোষকতা হিসাবেই অর্থ করা হয়। অন্য সব বিষয়ে কিন্তু রোগীর জীবন ও কার্য্যাদি বেশ স্বাভাবিকই মনে হয়। কিন্তু যখনই কোন ঘটনা সেই মূল ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরোধী হয় তখনই তার বিকার ধরা পড়ে। সেই শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত ভ্রান্ত বিশ্বাসই সত্য ঘটনার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। রোগীর মনে সর্ব্বদাই অবদমিত ইচ্ছা গোপনে

ক্রিয়া করতে থাকে কাজেই সে নূতন ঘটনা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে তার ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিপোষক উপাদান আবিষ্কার করে বা সৃষ্টি করে।" ২৪

এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসকে মোটামুটি দুটি দলে ভাগ করা যায়—উৎপীড়নাত্মক ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusions of persecution) ও ঐশ্বর্য্যবোধ সম্পর্কিত ভ্রান্ত-বিশ্বাস (delusions of grandeur)। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তি কল্পনা করে সকলে তার প্রতি অবিচার কচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কচ্ছে, তার দুর্ণাম রটাচ্ছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি কল্পনা করে সে মহা শক্তিশালী রাজা, সম্রাট, এমন কি ভগবান্। যে কোন উন্মাদাগারে গেলে দেখা যাবে কতগুলি রোগী, তারা বেশ বুদ্ধিমানের মত সহজে কথা বলছে, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে বাইরে যে চাকরটি ভাত নিয়ে যাচ্ছে তাকে দেখিয়ে বললে, "দেখলেন, দেখলেন, ঐ লোকটা আমার ভাতে বিষ মিশিয়ে দিয়ে গেল। জানেন, এখানে সকলেরই দৃষ্টি কি ক'রে আমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে, তাই আমাকে বিষ দেবার চেষ্টা।" আবার আর একদল রোগী দেখবে তারা কেবলই বড়াই করে বেড়াচ্ছে। ডাক্তারকে দেখে বললে, "ডাক্তার আজ সেই গোল্ড ইনজেকসন্‌টা দিয়ে দাও। টাকার জন্যে ভাবনা কি? আমি কাল গোমস্তাকে টেলিগ্রাম করেছি—চার হাজার টাকা আজ সদর থেকে এসে যাবে। তোমাকে ফিস দেবো বই কি।" ঠিক তার পর মুহূর্তেই তুমি হয়তো সিগারেটটি ধরিয়েছ, তোমার দিকে ফিরে বলবে "দাও না ভাই একটা সিগারেট, কতদিন ভাল সিগারেট খাওয়া হয়নি, কাল তোমায় দামটা দিয়ে দেব।" ভাল করে খোঁজ নিলে জানা যাবে যে এ ব্যক্তি হয়তো তার কাছে যে নাবালক বা বিধবার সম্পত্তি বিশ্বাস ক'রে দেওয়া হয়েছিল, তা আত্মসাৎ করেছে, তারপর মোকদ্দমায় দোষী প্রমাণিত হয়ে জেল খাটছে। তারপর থেকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ক্রেপেলিন্ (Kraepelin) প্রথম এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে একটা বিশেষ ব্যধি বলে আবিষ্কার করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মনঃসমীক্ষণে (Psychoanalysis)-এ বিশ্বাসী ফ্রএড্ পন্থীরা বহু অনুসন্ধানের পর এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেন যে এটা অবচেতন মনের জটিল সংঘর্ষ হতে উদ্ভূত। এ সব ক্ষেত্রে লজ্জাকর অভিজ্ঞতাটি অবদমনের চেষ্টায় মনের এই লজ্জাকর অংশটি অন্য সমস্ত অভিজ্ঞতা হতে বিচ্ছিন্ন (dissociated) হয়ে একটা আলাদা কাল্পনিক জগতের আবরণের পেছনে আত্মগোপন করে। তাই তাঁদের মতে এই দুই জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূল

২৪ McDougall—Outline of Abnormal Psychology P. 334-35.

একই এবং এরা দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাধি নয়। ব্লিউলার (Bleuler) লিখছেন, "সম্ভবতঃ উৎপীড়নাত্মক ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া ঐশ্বর্য্যবোধাত্মক ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকে না। এবং এ দুইএর মধ্যে প্রভেদ আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন ধরণের বিকৃত ভ্রান্ত বিশ্বাসের রোগীদের মধ্যে নিজ ঐশ্বর্য্য বা গৌরব বোধ যা দেখা যায়, তা বোধহয় এই জাতীয় ব্যাধির মূল, বা একটি আবশ্যিক কারণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি যতটুকু জেনেছি তা থেকে এটুকুও যোগ করা প্রয়োজন যে এ বিশ্বাসের বিপরীত নিজের অকর্মণ্যতা বা হীনতা সম্বন্ধেও একটি (সম্ভবতঃ অবদমিত) বিশ্বাস না থাকলে ঐ ভ্রান্ত ঐশ্বর্য্যবোধও জাগ্রত হতে পারে না।"[২৫]

কল্পনার সাহায্যে আত্মপ্রতারণা এবং আত্মাভিমানের তৃপ্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বদা দেখা যায়। উন্মাদ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে তফাৎ শুধু মাত্রার।

দিবাস্বপ্ন (Day dreams)—এই আত্মাভিমান তৃপ্তির আর একটি উপায় হচ্ছে দিবাস্বপ্ন। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখি। জানি এ স্বপ্ন মিথ্যা, তবু এ কল্পনার খেলা ক্ষণেকের জন্যে মনকে মুগ্ধ করে। সে হিসাবে এর মূল্য আছে। যদি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের হাত হ'তে কিছুক্ষণের জন্যেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, হোক না তা মিথ্যা, তবুও মন্দ কি ?

"স্বপন যদি মধুর এমন
হোক সে মিছে কল্পনা।"

কিন্তু এটা বাস্তব জগতের কঠোর সত্যকে মুছে দিতে পারে না। তাই দিবাস্বপ্ন যখন দেখি, তখন মনের মধ্যে এ বোধ একেবারে লুপ্ত হয় না যে এটা স্বপ্ন। কিন্তু কখনও কখনও এ মায়া-মৃগ আমাদের মিথ্যা আশার পিছনে ঘুরিয়ে দুঃখ আরও বাড়িয়ে তোলে। একটি বিলাতী গল্প ছোটকালে পড়েছিলুম। গরীব গোয়ালিনীর মেয়ে মাথায় কলসী বয়ে দুধ বেচতে বের হয়েছে। বেলা হ'য়ে যাওয়ায় সে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসল। ছায়ায় বসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেচারীর অলস কল্পনা বল্গাহীনভাবে উড়ে চলল। সে কল্পনা করতে লাগল কি করে দুধ বেচে যে লাভ হবে তা সুবুদ্ধির সঙ্গে খাটিয়ে, সে খুব ধনী হবে, সুন্দরী হবে। তখন কতজন আসবে সেধে প্রেম করতে। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হবে না। শেষে দেশের রাজপুত্র আসবে পাণিপ্রার্থী হয়ে। কিন্তু একেবারেই

২৫ Bleuler—Textbook of Psychiatry.

কি আর সে রাজী হবে? কিছুতেই না। রাজপুত্র পায়ে ধরে সাধবে। তখন গরবিনী এই এমন ক'রে তাকে পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান……সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের সবেগ সঞ্চালনে মাথার দুগ্ধপাত্রটি পড়ে চুরমার হয়ে গেল। শিশুকালেই গল্পের 'ম্যরাল' শিখেছিলাম—অলস কল্পনার দাস হয়ো না। এটা মূল্যবান উপদেশ।

দিবাস্বপ্নের ব্যবহার ও অপব্যবহার—Use and abuse of day-dream—এ সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছি। যখন সত্যিকারের কোন কাজ করবার নেই, তখনই দিবাস্বপ্নের স্বাভাবিক সময়। যে লোক শক্তিমান্, তার পক্ষে দিবাস্বপ্ন অলস মুহূর্তের একটুখানি বিলাস, এবং সে পর মুহূর্তেই এটা ভুলে যায়। কিন্তু যে মানুষ দুর্ব্বল বিশেষ করে যে মানুষের অন্যকে চালাবার মত জোর নেই, সে সত্যিকার কর্ম্মের বিকল্প হিসাবে দিবা স্বপ্নের আশ্রয় নেয়। সে বাস্তব জীবনের কঠিন ঘটনার সম্মুখীন না হয়ে কল্পনায় নানা ঘটনা বা অবস্থা সৃষ্টি করে, আর কাল্পনিক বীরত্বের মনোহর কাহিনী তৈরী ক'রে প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে। সে মনে মনে কাল্পনিক বিপদ সৃষ্টি করে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে। এ সমস্তই সুস্থ কল্পনার অপব্যবহার।"[২৬]

স্বপ্ন—Dreams—রাত্রে ঘুমের অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় যে অসংলগ্ন অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং মনোহারী ছবির স্রোত মনের মধ্যে বয়ে চলে, তাদের বলি স্বপ্ন। অতি প্রাচীন কাল হতেই স্বপ্ন কেন হয়, তা জানবার জন্যে মানুষের আগ্রহ রয়েছে। স্বপ্নে বহুদিন পূর্বে মৃত আত্মীয় বা পূর্বপুরুষ দেখা দেন। এমন সব স্থান দেখি যা পূর্বে কখনও দেখা হয় নি। কাজেই আদিম মানুষ স্বপ্নকে ভৌতিক ব্যাপার বলেই মনে করত। এর মধ্য দিয়ে মৃত আত্মারা আমাদের কাছে নানা ইঙ্গিত পাঠান। সুতরাং স্বপ্ন অর্থহীন নয়, তাতে ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়াপাত হয়। এবং এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার ইঙ্গিতগুলির রহস্য উদঘাটনের জন্যে তন্ত্র, মন্ত্র, বুজ্‌রুকীর সাহায্য নিয়ে একদল লোক পণ্ডিত ও ভবিষ্যদ্বক্তা বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল। আজও কিন্তু এটা চলেছে।

কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, স্বপ্নও একটা স্বাভাবিক (**natural**) ঘটনা, রহস্যময় অতিপ্রাকৃত (**mysterious**) কিছু নয়, এই কথা মানুষ বুঝতে শিখল। এবং এর প্রাকৃতিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চলল। যাঁরা দেহতত্ত্ববিদ্, তাঁরা এর দৈহিক কারণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করলেন। যাঁরা মনস্তাত্ত্বিক তাঁরা খুঁজতে লাগলেন এর মানসিক (**Psychological**) ব্যাখ্যা।

---

২৬ **Woodworth—Psychology, P. 564.**

আজও অবশ্য স্বপ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কি, তা আমরা জানি না। তথাপি এবিষয়ে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দিয়ে এটা বুঝা গিয়েছে যে, যে সব কারণে আমাদের দেহের ও মনের নানা পরিবর্তন ঘটে, সে সমস্ত কারণ স্বপ্নের পেছনেও বিদ্যমান্। তা জটিল ও বিস্ময়কর হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ঘুমের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি ও অন্যান্য যন্ত্রের ক্রিয়া স্তিমিত হয়, রক্তে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, পরিপাক যন্ত্রের মধ্যে নানা জৈবক্রিয়া চলতে থাকে এবং স্নায়ুতন্ত্রে তার প্রতিক্রিয়া হয়, এটা স্বাভাবিক। অমূল-প্রত্যক্ষের বেলায় দেখেছি ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের কোন উত্তেজক দ্বারা ক্রিয়মাণ না হয়ে, স্নায়ুকেন্দ্রগুলি হতে আভ্যন্তরিক কোন শক্তি দ্বারা উত্তেজিত হয়। স্বপ্নের বেলায়ও অনুরূপ ব্যাপারই ঘটে। ঘুমের গভীরতম অবস্থায় ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের উত্তেজনা দ্বারা মৃদুভাবে সক্রিয় হবার ক্ষমতা হারায় না। তাই ঘুমের মধ্যে তীব্র আলো চোখে পড়লে স্বপ্ন দেখি, ঘরে আগুন লেগেছে। একজন ঐতিহাসিক রাত্রে ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন মশারীর একটি দণ্ড ভেঙ্গে তাঁর ঘাড়ে পড়ল। তিনি স্বপ্ন দেখলেন তিনি ফরাসী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং গিলোটিন যন্ত্রে তাঁর গলা কাটা যাচ্ছে। কাজেই অনেক দেহবিজ্ঞানী বলবেন স্বপ্ন বাস্তবিক পক্ষে অধ্যাস ও অমূল-প্রত্যক্ষের মিশ্রণ। মনস্তাত্ত্বিক অনেকে বললেন, আমরা ঘুমের আগে যে বিষয়ে চিন্তা করি সে বিষয়েই স্বপ্ন দেখি—কারণ চিন্তা প্রবাহটি ঘুমের মধ্যেও চলতে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, যে কাজ আমরা দিনের বেলা সুরু করেছি, কিন্তু শেষ করতে পারি নি, যে সংকল্প রূপায়িত করতে পারি নি, তা স্বপ্নের মধ্যে আপন আপন সমাপ্তি খোঁজে। ফ্রয়েড পন্থীরা বলবেন, স্বপ্ন হচ্ছে ইচ্ছাপূরণ। যে পেটরোগা গরীব ছেলেকে মা ইলিশমাছ খেতে দিলেন না, সে স্বপ্ন দেখবে যে গোয়ালন্দ ষ্টীমারের ফার্ষ্টক্লাশ ডাইনিং রুমএ বসে সে প্লেট ভর্তি ইলিস মাছ ভাজা আর পোলাও ইচ্ছামত খাচ্ছে। কাজেই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আমরা ইচ্ছাপূরণ (wishfulfilment) করে থাকি। স্বপ্ন বাস্তবিক পক্ষে কল্পনাবিলাসের আর একটি রূপ। আমরা ফ্রয়েডের স্বপ্ন-তত্ত্ব আলোচনা করে দেখব, তাঁরও মূল কথা, স্বপ্ন ইচ্ছাপূরণের উপায়। তবে তাঁর মনে সে ইচ্ছা বয়স্ক মনের সচেতন ইচ্ছা নয়।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা লক্ষ্য করেছেন যে স্বপ্নের ছবিগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং তারা বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ। অর্থাৎ, যতক্ষণ স্বপ্ন দেখছি, ততক্ষণ তা সত্য বলেই

বিশ্বাস করি। কিন্তু স্বপ্নের ছবিগুলি অসংলগ্ন, অনেক সময় অসম্ভব ও পরস্পর-বিরোধী, এ কেন হয়? তাঁদের মতে ঘুমের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হওয়াতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না। কাজেই স্বপ্ন বাস্তব জগতের সম্পর্কশূন্য। কল্পনা সেখানে উদ্দাম গতিতে নিজ বিচিত্র-শক্তিতে বয়ে চলে, বিভিন্ন ভাবে নানা ছবি মিশ্রিত হয় (যেমন হয় দিবাস্বপ্নে)। বিচার-বুদ্ধি যে সব স্নায়ুকেন্দ্রের কাজ, তারা তখন বিশ্রাম করে; কাজেই জাগ্রত জীবনে কল্পনাকে পদে পদে বাস্তব অভিজ্ঞতা বা বিচার বুদ্ধির যে বাধা সহ্য করতে হয় সে বাধা স্বপ্নে অপসারিত হয়। সংলগ্নতা ও যুক্তিযুক্ততা বিচার-বুদ্ধির ফল কিন্তু স্বপ্নের যে কল্পনা, তাতে সে বালাই নেই।

অনেক স্বপ্ন স্থূল দৈহিক বা মানসিক কারণ দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন রাত্রে পেট গরম হ'লে "বোবায় ধরে।" এ বিভীষিকাময় স্বপ্ন মস্তিষ্ক উত্তেজিত হবার ফল, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কখনো কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে এমন স্বপ্ন দেখি, যে বিষয়ে কোনদিন কোন চিন্তা করি নি। অথবা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে এমন স্বপ্ন দেখলাম, যা সত্য বলে প্রমাণিত হল। এ কেন হয়, বোঝা সহজ নয়।

যাই হোক এর কোন একটি থিয়োরী (theory) দিয়েই সব স্বপ্নের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু বর্তমান কালে ফ্রয়েডের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা (Interpretation of dreams) সেই অসম সাহসিক চেষ্টা করে' মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করেছেন। তিনি বহু সহস্র স্বপ্ন পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন, স্বপ্ন অবচেতন মনের প্রকাশ। মনের চেতন ক্রিয়াগুলি দিয়ে স্বপ্নের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কাজেই যে সব দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করা গেল, সেগুলি ফ্রয়েডের মতে একান্তই বাহ্য (superficial)। স্বপ্ন অর্থপূর্ণ (significant), এ তাঁরও মত। স্বপ্নের মধ্যে যে ছবি ভাসে, তারা বাস্তবিক পক্ষে প্রতীক্ (symbols) মাত্র। তাদের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে হলে ব্যক্তির অবচেতন মনে খোঁজ করতে হবে। তাঁর মতে কেন এক ব্যক্তি এই বিশেষ স্বপ্নটি দেখল, অন্য স্বপ্ন দেখল না, তার উত্তর প্রচলিত মতগুলি থেকে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া তিনি বলেন সমস্ত স্বপ্নের একই মূল,—এতে রয়েছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গূঢ়তম রহস্যের চাবিকাঠি, এই কথাটি ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

তাঁর মতে জীবনের মূল প্রবৃত্তি হল কাম (sex)। এ হতেই সমস্ত দৈহিক

ও মানসিক শক্তির উদ্ভব—সমগ্র দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকাশ। এই সেক্স্ বা লিবিডোর (sex or libido) আকাঙ্ক্ষা পূরণের কতগুলি স্বাভাবিক পথ আছে। কিন্তু সমাজ ও ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতার জন্যে, শিশুর পক্ষে এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পথ নানা বাধা নিষেধ ও শাসনের দ্বারা কণ্টকাকীর্ণ। এতে এই স্বাভাবিক কামনাগুলির বহিঃপ্রকাশ রুদ্ধ হয়। কিন্তু সমাজের শাসন এই অমিতবিক্রমশালী মৌলিক জীবনাবেগগুলিকে ধ্বংস করতে সক্ষম নয়। তারা শিশুর সচেতন চিত্তমানস হতে নির্বাসিত হ'য়ে, অবচেতন মনের গভীর অন্ধকার গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নির্বাসিত বিক্ষুব্ধ কামনাগুলি স্বাভাবিক প্রকাশের কোন সহজ পথ না পাওয়াতে অবচেতন মনে নানা জটিল গ্রন্থির (complexes) সৃষ্টি করে, এবং তারা সর্বদাই আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজতে থাকে। ব্যক্তির সামাজিক সংস্কার (censor) সে প্রকাশের পথে শ্রেষ্ঠ বাধা। শিশুর মনেও এই সংস্কার তার অজানাতেই সংক্রামিত হয়। সেই সংস্কার 'অসামাজিক' কামনাগুলিকে চোখ রাঙিয়ে, কেবলই বলে "ছিঃ।" তাই সচেতন মনে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু তারা মরে নাই, প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজছে মাত্র। যখন আমরা ঘুমাই, তখনও আমাদের সামাজিক বুদ্ধির (censor) খবরদারীর অবসান হয় না। তবে জাগ্রত অবস্থায় তার দৃষ্টি যতটা প্রখর থাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ততটা থাকে না। সেই অসতর্ক অবস্থায় সেই কামনাগুলি ছদ্মবেশ পরে' ধীরে ধীরে বের হয়ে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যেই কামেচ্ছা স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তারা বিকল্প উপায়ে ছদ্মবেশে নিজেদের তৃপ্তিসাধন করে নেয়। স্বপ্নের ছবিগুলি যে প্রতীক্, তার প্রমাণ কি? ফ্রয়েড বহু সহস্র স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কতগুলি জিনিষের ছবি প্রায় প্রত্যেক স্বপ্নের উপাদান. এবং মুক্ত অনুবন্ধ প্রণালী (free association method) দিয়ে বহু রোগীর মনঃসমীক্ষণ করে, তিনি দেখেছেন যে এঁদের অচেতন মনে কোন না কোন অতৃপ্ত কামনা অবরুদ্ধ হয়ে আছে। স্বপ্ন সেই কামনা পরিতৃপ্তির একটি উপায় মাত্র। ফ্রয়েডের মতে সমস্ত মানসিক বিকার এই একই সাধারণ সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর মত যে বহুল পরিমাণে সত্য, শুধু একটি কাল্পনিক ব্যাখ্যা-মাত্র নয়, তা তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের প্রবর্ত্তিত মানসিক চিকিৎসার সুফল দিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রুগ্ন ব্যক্তির মনের বিরুদ্ধ অপরিতৃপ্ত কামনাগুলিকে সচেতন মনে ধীরে ধীরে টেনে বের করে জাগ্রত

বুদ্ধি দিয়ে তাঁদের সম্মুখীন হ'তে রোগীকে অভ্যস্ত করলে, তার অবচেতন মনের গ্রন্থিমোচন হয়ে সে সুস্থ হয়, এটা বহুপরীক্ষিত সত্য।

স্বপ্ন এবং মানসিক বিকারের পেছনে অবচেতন মন কাজ কচ্ছে, এবং স্বপ্ন প্রতীক সাহায্যে ইচ্ছাপূরণের একটি প্রধান উপায় একথা অস্বীকার করবার পথ নেই। কিন্তু তাঁর অনুগামীদের মধ্যেও সকলে তাঁর সঙ্গে একমত নন, যে জীবনের মৌলিক আবেগ সেক্স্-কেন্দ্রীভূত। এ বিষয়েও তাঁরা একমত নন যে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছাই স্বপ্নের কারণ। স্বপ্নের উপাদান প্রতীকগুলির তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও সকলে তাঁর সঙ্গে একমত নন। এ্যাডলার বলেন স্বপ্নের মধ্যে শৈশবের অতীত ইচ্ছা পরিপূরিত হয়, একথা সত্য নয়, বরং ভবিষ্যতে ব্যক্তির সচেতন জীবনে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তার সমাধান সে কি ভাবে করতে চায়, তার ইঙ্গিত থাকে স্বপ্নে। য়্যুঙ (Jung) বলেন ব্যক্তির বর্তমান সচেতন জীবনের ইচ্ছাপূরণের সঙ্গেই স্বপ্নের যোগ। উড্ওয়ার্থ স্বপ্নকে ইচ্ছাপূরণের উপায় মনে করেন বটে, কিন্তু এটা ব্যক্তির আত্মাভিমান পরিতৃপ্তির একটা উপায়, অর্ধচেতন ও অলস কল্পনা বিলাস বলেই মনে করেন। অন্যান্য স্বয়ং-চালিত চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা (mastery impulse) যেমন পরিতৃপ্ত হয়, স্বপ্নেও তাই হয়।

শিশুর কল্পনার জীবন, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ব্যবহার—Child's imaginative life, and how to deal with it in his education—বয়স্ক মানুষের তুলনায় শিশু অনেক বেশী কল্পনাপ্রবণ। এ দোষই হোক, গুণই হোক, এই তার স্বভাব। আড়াই বছর, তিন বছরের আগে সম্ভবতঃ শিশুর স্বাধীন কল্পনার (creative or productive imagination) ক্ষমতা জন্মায় না। পাঁচ ছয় বৎসরের সময় তার কল্পনা অত্যন্ত সজীব হয়ে ওঠে। তার এই নূতন ক্ষমতার নেশায় সে মত্ত হয়। বড়দের অনাদরে শিশুর আত্মাভিমান আহত হয়, এবং তাই সে কল্পনার সাহায্যে 'বড়' হতে চেষ্টা করে—বাহাদুরী নিতে চেষ্টা করে। বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় তাহার সামান্য, সঙ্গতি অসঙ্গতি বোধ তখনও পরিষ্কার করে তার মনে জাগেনি। সত্য ও মিথ্যার যে প্রভেদ সংসারের মানুষ করে, সেই মাপকাঠি তার আয়ত্ত হয় না, তাই স্বচ্ছন্দে সে বলে—

তুমি বললে "বাসনে খোকা ওরে।"
আমি বলি "দেখো না চুপ করে।"

ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।
এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে,
ভাবছ, খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে,
বলছি এসে, "লড়াই গেছে থেমে"।
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।

শিশুর অহং বুদ্ধি, তার ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, তার 'বড়' হবার আগ্রহ, উদ্ভট কল্পনার মধ্য দিয়েই সে চরিতার্থ করে। রেবা তার ছোট পুতুলকে চুকচুক দুধ খাওয়ায়, তাকে সাজায়, শাসন করে, সবই কল্পনা, কিন্তু এ তার কাছে সম্পূর্ণ সত্য। খুকুর অসুখ করেছে, তার জন্যে সে সত্যই চিন্তিত। ঘাস ছেঁচে রস ক'রে ছোট শিশিতে ভ'রে সে তার 'মেয়ে'কে ওষুধ খাওয়াতে ব্যস্ত। এই যেন—যেন (make believe) খেলার মধ্যে তার অহমিকা তৃপ্তি পায়। আবার নিজেই হয়তো সে ইঞ্জিন সেজেছে, হুস্ করে ছুটে যাচ্ছে, কত তার তেজ, কত তার শক্তি। উড্‌ওয়ার্থ বলবেন, সে যে ঘুড়ি উড়ায়, বল খেলে, তার পেছনেও এই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি। সে বাজি ছাড়ে. তাতেও সেই একই কথা। বাজির বিকট শব্দ, দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে' দ্রুত ঊর্ধ্বগমন, সবই শিশুর কাছে "আমি"র শক্তির প্রতিবিম্ব; একে উড্‌ওয়ার্থ বলেছেন এম্‌প্যাথী (empathy)। যে ঘুড়িটা এমন অনায়াসে এত উঁচু আকাশে উড়তে লাগল, তার সুতা তো আমার হাতে,—তার শক্তি তো আমারই শক্তি।

শিশুর ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে তার কল্পনার প্রসার ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা নিত্য নূতন কল্পনার খেলায় তাকে উত্তেজিত করে। ৭।৮ বছর বয়সে সে রূপকথায় আপন কল্পনার খোরাক পায়। আর একটু বড় হলে,—সত্য মিথ্যার জ্ঞান একটু বিকশিত হলে, সে ভ্রমণ কাহিনী, শিকারের

গল্প, দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ শুনতে আগ্রহান্বিত হয়। তার পর চলে দিবাস্বপ্ন—তার নায়ক সে নিজে। কখনও সে জয়ী নায়ক—conquering hero—[বাঘটার গলার মধ্যে দিলাম ছুরি শুদ্ধ হাত চালিয়ে—গাঁক গাঁক করে চীৎকার করে বেটা ছুটে পালালো—আর আমি বসলাম তার পিঠে চেপে]। কখনও বা সে উৎপীড়িত নায়ক—Suffering hero—[আমাকে কেউ ভালবাসে না, একদিন পুলের উপর থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরে যাবো, তখন সবাই মিলে কত কাঁদবে]। এর পরের স্তর বীরপূজা (hero worship)। পুরাণ ও ইতিহাসের বীরদের গল্প তখন তার ভাল লাগে। এর পর হতে বাস্তব জীবনের কঠোর আঘাত কিশোর বালককে সচকিত করে তোলে। তার কল্পনা এখন আর অতটা বল্গাহীন ভাবে ছুটে চলে না। তখন তার বর্তমান বা ভবিষ্যতের বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য তার কল্পনাকে সে কাজে লাগায়। যাদের চরিত্র যত দৃঢ়, যাদের কুশলতা যত বেশী তাদের কল্পনা তত সত্যাশ্রয়ী ও কর্মাভিমুখী হয়। আর যাদের চরিত্র দুর্বল, যাদের নিজস্বগুণ সামান্য, তারা পরের মিথ্যা নিন্দা ও নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে নানা অজুহাত সৃষ্টির জন্যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রাচীন শিক্ষকদের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর কল্পনা মস্ত অন্তরায়। সত্য ও কল্পনার বিরোধ সনাতন, তাই শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে, গোড়াতেই তার কল্পনাকে রাশ টানতে হবে। তাকে শিক্ষা দিতে হবে বাস্তব পৃথিবীকে জানতে, কল্পনার রাজ্যে পলায়নের ভীরু মনোবৃত্তি হতে তাকে রক্ষা করতে হবে। তাই মন্তেসরীর (Montessori) মতো শিশু দরদীও দেখতে পাই শিশুর কল্পনাকে উৎসাহ দিবার বিরোধী। শিক্ষার প্রথম স্তর হওয়া উচিত তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়গুলির যথোচিত ব্যবহার (training of the senses)। তার জন্যে অবশ্য খেলাধুলাই শ্রেষ্ঠ ও স্বাভাবিক উপায়। তাই তিনি খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার (Playway in education) একজন প্রধান সমর্থক হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনার স্থানটি সংকোচেরই তিনি পক্ষপাতী। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এখানে কল্পনা বলতে তিনি নিতান্ত অবাস্তব অসার কল্পনার কথাই বুঝেছেন। নিউটন্ যেমন বলেছিলেন বিজ্ঞান সাধনায় অনুমান (hypothesis) বা কল্পনার কোন স্থান নেই, তিনিও তেমনি বলেছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনার কোন স্থান নেই। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী বস্তুনিষ্ঠ কল্পনাই কি বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূল নয় নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যখন আবিষ্কার করেছিলেন তখন কি সেই শক্তিকে

তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা অস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন (অর্থাৎ কল্পনা করেছিলেন) যে পৃথিবীর একটা টান আছে, যার জন্যে সমস্ত বস্তু মাটিতে এসে পড়ে ? তা ছাড়া শিশুর জীবনে যে কল্পনা এতখানি স্থান জুড়ে আছে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিতান্তই বাধা, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। এই প্রবল শক্তিকে কাজে লাগায় বলেই খেলা শিশুর কাছে এত প্রিয়, তাই খেলাকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা পদ্ধতি তা কল্পনাকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না।

বাস্তবিক বৃহৎ কল্পনা না থাকলে বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। একথা শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্য নয়, এটা জীবনের প্রত্যেক কর্মের ক্ষেত্রেও সত্য। তাই ওয়েলটন্ (Welton) সত্যই বলেছেন, "মানুষের সমস্ত অগ্রগতির মূলে আছে 'আরো ভালো কল্পনা করবার শক্তি, এবং সেই কল্পনাকে সত্য করে তুলবার জন্যে প্রচেষ্টা।"

তবে শিক্ষককে সাবধান হতে হবে যেন শিশু কল্পনার দাস না হয়, অলস কল্পনাবিলাসী না হয়। কল্পনার সম্বন্ধে বলা যায়, এ আগুনের মত ভাল ভৃত্য, কিন্তু বড় পাজী প্রভু "a good servant but a bad master"। কল্পনা যেন শিশুর কাছে কর্মের বিকল্প না হয়। কল্পনার বিপদ সম্বন্ধে মিসেস্ মাম্‌ফোর্ড বলেছেন "খেলা ও অভিনয় ও স্বপ্ন বাস্তব কর্মের স্থান অধিকার করে, এবং শিশু কাজ-আরম্ভ-করা-কিন্তু শেষ-না-করা রূপ অভ্যাস আয়ত্ত করে।"[২৭] কল্পনা যেন গঠনাত্মক হয়, আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরনিন্দার পথে গিয়ে যেন তা নিস্ফলা না হয়। এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহেরুর একটি উপদেশ বড় ভাল লেগেছে। নয়া দিল্লীতে জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের পাথরের দেয়ালে এ ফলকটি উৎকীর্ণ আছে, "এখনই কর। দেরী কেন হোল তার অজুহাত শুনতে আমার কোন উৎসাহ নেই—আমার উৎসাহ, কর্মের সফল সমাপ্তিতে।" **Do it now ! I am not interested is excuses for delays. I am interested only in things done—Jawaharlal Nehru**[২৮]

শিশুর কল্পনা যাতে গড়ে তুলবার কাজে লাগতে পারে—আত্মদোষ স্খলনের মিথ্যা অজুহাতের পথ না খোঁজে, শিক্ষকের তা দেখতে হবে।

২৭ Mumford—Dawn of Character, Ch. II

২৮ Donald Robinson—The 100 most important people, P. 22.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অবসাদ ও বিরক্তি

অবসাদ—Fatigue—কোন কাজ দীর্ঘ সময় ধরে করলে, কতক্ষণ পর দেখা যাবে সে কাজে দক্ষতা বা ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। একে আমরা বলি ক্লান্তি বা অবসাদ। পাঁচ মাইল একটানা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় হাঁটবার পর, মনে হয় পা দুটো আর চলতে চাইছে না। একঘণ্টা কঠিন অংকের ক্লাস চলার পর দেখা গেল, ছাত্রছাত্রীরা অংক কষতে আগের চেয়ে অনেক বেশী ভুল কচ্ছে। ক্রমাগত তিনঘণ্টা চোখের কাজ করতে করতে শেষে মনে হয়, চোখে ঝাপসা দেখচি। এ সবই হচ্ছে অবসাদের উদাহরণ। এগুলো থেকেই বোঝা যাবে, অবসন্নতা পেশী সম্পর্কে (Muscular), ইন্দ্রিয় সম্পর্কে (Sensory), অথবা মন সম্পর্কে (Mental) হতে পারে। অবসাদ সাধারণভাবেও হতে পারে, অথবা বিশেষ একটা ইন্দ্রিয় বা পেশী সম্পর্কেও হতে পারে। সমস্ত দেহই যেন শ্রান্ত বোধ হচ্ছে, এমন মনে হতে পারে, আবার শুধু চোখ দুটোই পরিশ্রান্ত, এমন হতে পারে। অবশ্য এ দুটোই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চোখ দুটো যখন অবসন্ন, সমস্ত দেহেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। অবসাদ সম্পূর্ণ বা আংশিক হতে পারে। একেবারে কোন পরিশ্রম করতেই দেহ-মন আর চাইছে না, এ রকমটা হ'তে পারে—(অবশ্য, এ রকম দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায়)। আর বিশেষ কোন একটা কাজ করতে যেন আর পাচ্ছি না, এমনও মনে হ'তে পারে। যেমন ধর, সারাদিন খেটেখুটে এসে রান্নাটা করতে আর যেন ইচ্ছে করে না। স্যাণ্ডিফোর্ড অবসাদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, "কর্মে দক্ষতার হ্রাস"। মাইকেল ওয়েষ্টের সংজ্ঞা হচ্ছে, "পূর্বে কোন কাজ (অনেকক্ষণ বা অনেকবার) করবার ফলে সাময়িক, সাধারণভাবে, অথবা বিশেষ কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীর সম্পূর্ণ, বা অংশতঃ কর্মক্ষমতা হ্রাস।" ম্যাকডুগ্যাল্ তাঁর 'আউট্‌লাইন্ অব্ এ্যাব্‌নরম্যাল সাইকোলজী' গ্রন্থে লিখছেন, "অবসাদ হচ্ছে এমন একটি কথা যা দিয়ে আমরা বোঝাই দেহযন্ত্রের ক্ষমতা বা নৈপুণ্যের হ্রাস যা তীব্র বহুক্ষণব্যাপী কর্মের ফলে দেখা দেয়, এবং যা কিছুক্ষণের বিশ্রাম, বিশেষ করে নিদ্রার পরে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়, এবং দেহযন্ত্র তার পূর্ব কর্মদক্ষতা সম্পূর্ণ ফিরে পায়।"

বিরক্তি—Boredom—বিরক্তির সঙ্গে অবসাদের মিল রয়েছে, সম্বন্ধও আছে, কিন্তু দুটি এক জিনিষ নয়। মাইকেল ওয়েষ্ট একে বলেছেন "দুষ্ট অবসাদ—'false fatigue'। বিরক্তি (Boredom) হচ্ছে কোন একটা কাজ করবার অনিচ্ছা, সে কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা। স্ট্যাণ্ডিফোর্ড সংজ্ঞা দিচ্ছেন, 'কোন কাজ সম্পর্কে ইচ্ছার অভাব, বা সে কাজ সম্বন্ধে বিমুখতা।' একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। ধর, অধ্যাপক ভাষাতত্ত্ব পড়াচ্ছেন, যেমন ভদ্রলোকের চেহারা, তেমনি প্রকাশভঙ্গীর অক্ষমতা, বিষয়টা নীরস। দশ মিনিট শোনার পর ক্লাস চঞ্চল হয়ে উঠেছে; মনোযোগ দিচ্ছে না। কতক্ষণ পর সুরু হ'ল হাই তোলা, তারপর সম্পূর্ণ অমনোযোগ; হয়তো বা কয়েকজন ঘুমিয়েই পড়ল। দশ মিনিটে বাস্তবিক অবসন্ন হওয়ার কারণ নেই, হয়ও না। তবু বিতৃষ্ণার জন্যে যে মিথ্যা অবসাদবোধ, একে বলি, বিরক্তি বা বোরডম্। অবসন্ন হ'লে, কাজে অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণা আসে এবং যে কাজে বিতৃষ্ণা, তাতে অবসাদ বোধ হয়, এ কথা সত্যি। তবু দুটি এক জিনিষ নয়। কোন একটা কাজে বিতৃষ্ণা থাকা সত্বেও, সে কাজ দক্ষ ও নিপুণভাবে করা যায়। যেমন ধর, কলেজ থেকে ফিরে এসে চুল বাঁধা। এখানে বিতৃষ্ণা আছে, কিন্তু অবসাদ বা কার্যক্ষমতা বা নিপুণতা লোপ পায়নি। আবার যে কাজ ভাল লাগে, যেখানে প্রাণের দরদ আছে, সেখানে অবসন্নতা এলেও বিতৃষ্ণা আসে না। তাই দেখি, মা মাসাধিক যাবৎ রুগ্ন সন্তানের দিবারাত্রি সেবা, ক্লান্ত দেহ সত্বেও প্রসন্ন মনে করেন। যখন একটা ক্লাস পরিশ্রম ক'রে অবসাদগ্রস্ত, তখন আর কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে, সে ক্লাস সমর্থ নয়। বিষয় পরিবর্তন করে সেখানে কোন সুফল লাভের আশা নেই। কিন্তু অংকের ক্লাসে ছেলেরা বিতৃষ্ণ হয়েছে। এখানে ঘণ্টা পড়ার পর, নতুন বিষয়ের ক্লাস তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে অবসাদ ও বিরক্তি এক জিনিষ নয়।

এক হিসাবে বিতৃষ্ণা এবং অবসাদের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত। বিতৃষ্ণা অবসাদের অনেক আগে দেখা দেয়, এবং অনেক দ্রুততর বেগে বর্ধিত হয়। বিতৃষ্ণার প্রথম লক্ষণ চঞ্চলতা (মনসংযোগের অভাবে), তারপর বিরক্তি (irritability), তারপর আসে আলস্য (lethargy) এবং বোধহীনতা (stupidity)। কিন্তু অবসাদের প্রথম অবস্থায়ই আসে বোধহীনতা ও আলস্য (dullness and heaviness)। বারে বারে চেষ্টা ক'রে বরং কিছুটা সতেজ ক'রে তোলা যায় ইন্দ্রিয়কে বা পেশীকে বা মনকে।

বিতৃষ্ণার কারণ অনেক সময়ই একঘেয়েমী। (যেখানে কাজ বৈচিত্র্যহীন, যেখানে প্রাণশক্তি সহজভাবে স্ফূর্ত হ'তে পারে না, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাহত হয় বা রুদ্ধ হয়, সেখানে কাজে বিতৃষ্ণা।) জীবনের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে ছড়িয়ে যাওয়া, এগিয়ে যাওয়া। তাই একঘেয়ে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, চুপ করে বসে শুনে, তোমাদের মতো যারা অল্প বয়স্ক, তারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এখানে দেহের ও মনের স্বাভাবিক গতি ও স্ফূর্তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এসেচে বিতৃষ্ণা। বিতৃষ্ণা হচ্ছে প্রাণশক্তির বিদ্রোহ (protest), জড়ত্বের বিরুদ্ধে।

অবসাদের মূল কারণ—Causes of fatigue—অবসাদের তিনটি মূল কারণ স্যাণ্ডিফোর্ড নির্দেশ করেছেন।

১। দেহের শক্তি উৎপাদনকারী উপাদানগুলির ক্ষয়—এ ক্ষয় বিশেষ করে দেখা যায়, পেশীগুলি যে তন্তু (fibres) দিয়ে তৈরী সেগুলিতে, এবং স্নায়ুগুলি (nerves) যে কোষ (cells) দিয়ে তৈরী হয়, তাদের মধ্যে। কোন পেশী দীর্ঘকাল ধরে কাজ করলে, যে তন্তু নিয়ে পেশীটি তৈরী হয়, তার যে ক্ষয় হয়, তা পূরণ হয় না। সে রকম, স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous system) যে স্নায়ু-কোষ দিয়ে তৈরী হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাদের কোষগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য দেহযন্ত্রের মধ্যেই আশ্চর্য ব্যবস্থা আছে ক্ষয়পূরণের। কিন্তু অতিরিক্ত বা অতি দ্রুত পরিশ্রমের ফলে, ক্ষয় অতিমাত্রায় হয়ে গেলে, তা পূরণ হবার সময় হয় না। ফলে দৈহিক বা মানসিক অবসাদ আসে।

২। দেহাভ্যন্তরে পেশী বা স্নায়ুগুলিতে অপচয়জনিত বিষ সঞ্চয়—দেহাভ্যন্তরে দেহের উপাদানগুলিতে, কাজের ফলে বিষ সঞ্চয় হয়। এ বিষ দূরীকরণ সুস্থ দেহে স্বভাবতঃই ঘটে থাকে। কিন্তু অবসাদ বোধ হয়, বিষ-সঞ্চয়ের ফলে। অবসাদকে বলা যেতে পারে প্রকৃতির সাবধান-বাণী। (nature's warning)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্নায়ুসংযোগগুলিই অবসাদের মূল শারীরিক ভিত্তি। শেরিংটন (Sherrington) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে বিষ-সঞ্চয়ের ক্রিয়া স্নায়ু-সংযোগেই (synapse) সব চেয়ে বেশী।

৩। অক্সিজেনের অভাব—অক্সিজেনের অভাব ঘটলে, শক্তি-সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি বিশ্লেষিত (decomposed) হতে পারে না। রক্তের লোহিত কণিকাগুলি অক্সিজেন বহন করে, এবং তারা এই বিশ্লেষণের কাজ করে', দেহের উপাদানগুলি থেকে শক্তি উৎপন্ন করে। শিরাগুলির পরিবহন কার্যও

অক্সিজেন ছাড়া চলে না। অক্সিজেনের অভাব ঘটলে শক্তি বা উত্তাপ সৃষ্টি হতে বাধা হয়। কাজেই দেহে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে শক্তির মুক্তিলাভ (release) হয় না; বিষ-সঞ্চয় দূরীভূত হয় না, ক্ষয়-পূরণ হয় না; সুতরাং অবসাদ আসে।

অবসাদের রাসায়নিক কারণ—এ সম্বন্ধে মাইকেল ওয়েষ্ট বলেছেন, "অবসাদে বলদায়ী জটিল পদার্থগুলির অতিরিক্ত ব্যয় ঘটে, এবং দেহে কতগুলি সহজ অপরিচিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে যায়; যেগুলি বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে।" উড্‌ওয়ার্থ ও মারকিস্ পেশীর অবসাদ সম্বন্ধে লিখছেন "পেশী-অবসাদের কিছুটা কারণ হচ্ছে, পেশীতে সঞ্চিত দাহিকা শক্তি-উৎপাদক পদার্থগুলির ব্যবহার দ্বারা ক্ষয়, আর কিছুটা কারণ হচ্ছে পেশীক্রিয়ার ফলে অপচয়জনিত বিষ-পদার্থ সঞ্চয়, তার মধ্যে একটি প্রধান রাসায়নিক পদার্থ হচ্ছে ল্যাক্‌টিক্ এ্যাসিড্। অবসাদ উৎপন্ন হলে পেশী ও অস্থিসংযোগ স্থানগুলিতে কিছুটা প্রদাহ (soreness) সৃষ্টি হয়; তার ফলে আর পেশীক্রিয়া বেদনাদায়ক হয়, এবং কাজ বন্ধ করে' বিশ্রামের জন্যেই দেহের আগ্রহ দেখা যায়, যদিও অবশ্য তখনও পেশীগুলিতে আরো ক্রিয়ার শক্তি থাকে।" স্যাণ্ডিফোর্ড ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীরা অবসাদের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে দৈহিক ও স্নায়ুবিকহেতুগুলিই যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন। ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতে এটা যথেষ্ট নয়। পুরস্কার (incentive) ও আগ্রহসৃষ্টির (motivation) সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। যেখানে পুরস্কারের আশা আছে, যেখানে আগ্রহ সৃষ্টি সহজ হয়, সেখানে অধিক পরিশ্রমেও ক্লান্তি বা অবসাদ আসে না। অনুভূতির দিক দিয়ে যা অশান্তিকর, তা ক্লান্তিকর। যেখানে জৈবশক্তির ক্রিয়া কোন গভীর অনুভূতির দ্বারা বাধাগ্রস্ত, সেখানেই ক্লান্তির মানসিক কারণটি সৃষ্টি হয়। যেখানে বাধা যত প্রবল সেখানে ক্লান্তির পরিমাণও বেশী। এই কথাটি তিনি প্রকাশ করেছেন একটি ফর্মুলা দিয়ে।

$$\text{অবসাদের পরিমাণ} = \frac{\text{বাধার পরিমাণ}}{\text{মুক্ত শক্তির পরিমাণ}}$$

(Macdougall-Outline of Abnormal Psychology, P. 59-77)। বর্তমান কালে সমস্ত ক্রিয়ার পেছনে আগ্রহ বা মোটিভেস্যন্ এর প্রশ্নটি খুব গুরুত্ব লাভ করেছে, এবং হালে যত পরীক্ষা হয়েছে তাতে ম্যাক্‌ডুগ্যালের কথারই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। ক্রলির (S. L. Crawley) একটি পরীক্ষা উল্লেখ করা যাচ্ছে। একটা দড়ির

একমাথায় একটা ভারী ওজন বাঁধা। দড়িটি একটি কপিকলের উপর দিয়ে নেওয়া হয়েছে। যাকে নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে সে দু' সেকেণ্ড অন্তর অন্তর দড়িটাকে টেনে ভারী ওজনটাকে তুলছে। এ ওজনটা বাড়ানো যায়। সে লোকটিকে বলা হয়েছে "তুমি যথাসাধ্য টেনে কতটা ওজন তুলতে পার, আর তাতে কতটা ক্লান্ত হও তা দেখতে চাই।" একবার পরীক্ষাটা নেওয়া হোল, যখন লোকটি কতটা ওজন তুলছে তা দেখছে না; ওজন প্রত্যেকবার টানের পরে কতটা বাড়ছে বা কমছে তাও সে দেখছে না। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল ক্রমে ওজন কমে আসছে, অবসাদ বাড়ছে। এরপর পরীক্ষায় এমন ব্যবস্থা করা হল, যে ওজনটা সে দেখতে পায়, কতটা ওজন তুলছে তাও তৎক্ষণাৎ তাকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং বেশী তুললেই প্রশংসা করা হচ্ছে। এবার দেখা গেল, ওজন আগের চেয়ে বেশী তুলতে পাচ্ছে; শারীরিক পরিশ্রম অবশ্যই কিছু হচ্ছে, কিন্তু অবসন্নতা আগের তুলনায় কম। আরো কয়েকটি পরীক্ষার কথা আলোচনা করেছেন উড্‌ওয়ার্থ ও মারকিস্‌ তাঁদের সাইকোলজীতে (পৃঃ ৩২৮–৩২৯)।

অবসাদ দূরীকরণের উপায়—Remedy for fatigue—প্রকৃতি দেহের মধ্যেই ব্যবস্থা করেছে ক্ষয়পূরণের। ক্ষয়পূরণ ও অবসাদ দূর করবার জন্যে প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নিদ্রা। এই বিশ্রামের মধ্য দিয়ে শক্তি-সঞ্চারী উপাদানগুলি নূতন করে গড়ে উঠবার সুযোগ পায় (replenishing the supply of energy-producing compounds), আর সুযোগ পায় দেহ অক্সিজেন গ্রহণ দ্বারা সঞ্চিত বিষ বিদূরণের (elimination of waste products by oxidation)। খাদ্য গ্রহণও ক্ষয়পূরণের একটা প্রধান উপায়, বিশেষ করে শর্করা (sugars) জাতীয় খাদ্য। অবসাদ দূর করতে মৃদু উত্তেজক পানীয় চা, কফি এবং স্বল্প ধূমপানও সাহায্য করে থাকে। সঙ্গীত অবসাদ দূরীকরণের সহায়ক। খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেও শ্রান্তি দূর হয়। মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা শান্ত করতে পারলে দেহ সহজে বিশ্রান্ত হয়। সাময়িক মানসিক অবসাদ, যদি সেটা গুরুতর না হয়, তা হ'লে বিষয় পরিবর্তনে তা অনেক সময় প্রশমিত হয়। অনেক সময় অবসাদের সঙ্গে দেখা দেয় অমনোযোগিতা, সেটার প্রয়োজন আছে। সেটা হচ্ছে অবসাদের কুফল থেকে দেহের আত্মরক্ষার একটা কৌশল।

আগেই বলা হয়েছে অবসাদ দূর করবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ঘুম। কিন্তু

ঠিক কতটা ঘুম কার দরকার, সেটা নির্দিষ্ট করা শক্ত। কোন কোন ছেলেমেয়ের অনেক বেশী ঘুম দরকার, অন্যদের চেয়ে। হয়তো এর কারণ তারা অন্যদের তুলনায় সহজে অবসন্ন হয়, হয়তো বা তাদের দেহের ক্ষয় পূরণ হ'তে বেশী সময় লাগে অথবা সম্ভবতঃ ঘুমের মধ্য দিয়ে কি করে সব চেয়ে বেশী বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে সে অভ্যাস তারা করে নি। কাজেই ঘুমের পরিমাণ দিয়ে শক্তি লাভ কতটা হোল তা মাপা যায় না।

অবসাদের কুফল—Dangers of Fatigue—অবসাদ ক্ষয়ের ইঙ্গিত এবং ক্ষয়পূরণের জন্য দেহ ও মনের আবেদন। কাজ করলেই দেহের ক্ষয় অনিবার্য, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই সে ক্ষয়পূরণ হ'য়ে থাকে। কিন্তু ক্ষয় যদি এত দ্রুত হয় যে পূরণের অবকাশ থাকে না—অথবা ক্ষয় যদি এত অধিকদূর অগ্রসর হয়ে থাকে যে পূরণের আর উপায়ই নেই, তা হ'লে তাতে বিপদ ঘটবেই।

এটা অত্যন্ত সহজ কথা, অবসন্ন দেহ বা মনের কাজ, সুস্থ দেহ ও মনের তুলনায় নিকৃষ্ট হবেই। পরিমাণও কম হবে। ভাল কাজ পেতে হলে চাই সুস্থ উৎসাহপূর্ণ দেহ, ও সতেজ প্রফুল্ল মন। ক্লান্ত দেহ ও মনে যে কাজ করা হবে তাতে ভুল-ভ্রান্তি বেশী থাকবে। অবসাদের ফল, মনঃসংযোগের হ্রাস। এ অবস্থায় স্মরণ রাখবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই অতিরিক্ত অবসাদ যাতে না আসে এবং অবসন্ন দেহ ও মন যাতে আবার সতেজ হয়ে উঠতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ অবসন্ন দেহ বা মনে যে কাজ, তাতে কার্য-শক্তির অযথা অপব্যয় ঘটে। সেটা নিতান্তই লোকসান।

দেহের নিজের মধ্যেই অবসাদ যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে বিপজ্জনক না হয়ে উঠে, তার ব্যবস্থা রয়েছে। পেশীগুলো অতিমাত্রায় অবসন্ন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেই যে স্নায়ু-শিরা (nerves) গুলো পেশীকে চালায়, তারা তাদের কাজ বন্ধ করে। শিরাগুলি যাতে বিপন্ন না হয় সে জন্যে স্নায়ুসংযোগগুলোর প্রতিরোধ ক্ষমতা (resistance) বেড়ে যায়, যাতে বিপদগ্রস্ত শিরাতে আর শক্তি সঞ্চালিত না হ'তে পারে। আর তা ছাড়া শিরা বা পেশী সম্পূর্ণ অবসন্ন হওয়ার আগেই অবসাদবোধ প্রবল হয়ে দেহকে কাজ থেকে বিরত হ'তে তাগিদ দেয়। প্রকৃতিতেই রয়েছে এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

অবসাদের প্রয়োজনীয়তা—The value of fatigue—জীবনই

কর্ম, কর্মেই দেহ ও মনের ক্ষয়। কিন্তু ক্ষয় না হ'লে বৃদ্ধি বা বিকাশও তো সম্ভব নয়। ভাঙার মধ্য দিয়েই চলে গড়া। দেহের কোষগুলো যখন ভেঙে যাচ্ছে, তাকে বলে ক্যাটাবোলিজম্ (Katabolism) আর যখন গড়ে উঠ্‌ছে তখন তাকে বলে, মেটাবোলিজম্ (Metabolism)। এই ক্যাটাবোলিজম্ ও মেটাবোলিজম্ হাত ধরাধরি করে চলে। যখন ব্যায়াম করি তখন পেশীর শক্তিসঞ্চারী তন্তু ও কোষগুলি ভেঙে যাচ্ছে, ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু তার ফলেই পেশীটি পূর্বের চেয়ে সতেজ ও সবল হয়ে উঠছে। যতক্ষণ ক্ষয়পূরণ হতে থাকে,—অর্থাৎ ভাঙার চেয়ে গড়াই বেশী হয়, ততক্ষণই দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধি। বাল্য ও কৈশোরে তাই ক্যাটাবোলিজম্ ও মেটাবোলিজম্ দুইই দ্রুততর। বৃদ্ধ বয়সে ক্ষয় হচ্ছে, ক্ষয়টা সবটা পূরণ হচ্ছে না। কাজেই আসছে জরা, আসছে দুর্বলতা, শীর্ণতা, শক্তিহীনতা।

মাইকেল ওয়েষ্ট এর ভাষায় বলা যায় সুস্থ সবল দেহের মধ্যে অবসাদের ক্ষুধা (the hunger for fatigue) রয়েছে। অবসাদের ক্ষুধা মানেই জীবনের বিস্তৃতি ও বিকাশের আকাঙ্খা। এটা হচ্ছে জীবনের মূল ধর্ম—"The hunger for fatigue is the hunger for growth and the hunger for growth is the impulse of life itself."

বোরডম বা বিরক্তিরও হয়তো প্রয়োজন আছে। প্রাচীনেরা বলেন চুপ করে বসে ধর্মবক্তৃতা শোনাও ছোটদের পক্ষে একটা সুশিক্ষা। এতে আত্মসংযম ও আত্মশাসনের অভ্যাস তৈরী হয়। হয়তো কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। তবে সত্য যেটুকু আছে, তার চেয়ে মিথ্যা বোধ হয় ঢের বেশী। যেখানে বিরক্তি, সেখানে বোঝা যাচ্ছে কর্মের সহজ স্ফূর্তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অবসাদকে যেমন বলা যায়, বৃদ্ধির জন্যে আকাঙ্খা, তেমনি বিরক্তিকে বলা যেতে পারে কর্মের জন্য আকাঙ্খা। স্কুলে পড়াশুনার যে ব্যবস্থা তাতে অবসাদ নিবারণের দিকে অনেক সময় দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু বিরক্তি বা বোরডম্ যাতে না আসে সে দিকে আমরা খুব কমই নজর দিই। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণশক্তির যে অপচয় ঘটে সেটা অধিকাংশ সময়ই ঘটে অবসাদের ফলে নয়, বিরক্তির ফলে। শিশুর যাতে অবসাদ না আসে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া নিশ্চয়ই কর্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ে অতিমাত্রায় সাবধানতাও ভাল নয়। জীবনে বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে, মানিয়ে নিয়ে চলার (adaptation to adverse circumstances) শিক্ষাও একটা মস্ত শিক্ষা। তাই ছেলেমেয়েদের নিতান্ত

পুতুপুতু করে গড়ে তুললেও ফল ভাল হয় না। দেখা দরকার, প্রকৃত দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি যাতে না হয়। কিন্তু সমস্ত অবসাদ ও বিরক্তির সম্ভাবনা দূর করে আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলাটা কিছু নয়। রুশো তাঁর 'এমিল্' এ শিশুকে 'শক্ত' করে গড়ে তুলবার কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন। অনেক সময় দেখা যায় অত্যন্ত সহজে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী বিরক্ত হয়ে ওঠে। এ অভ্যাসটা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বিরক্ত হ'লেই অর্থাৎ "ভাল না লাগলে"ই কাজটা ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ, সু-পরামর্শ নয়। বিরক্ত হলেই কার্য্যক্ষমতা বাস্তবিক খুব হ্রাস নাও পেতে পারে। তাই একে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিশ্রম করবার, কঠিনকে আয়ত্ত করার সাহস অর্জ্জন করবারই বয়স, তাতে উৎসাহিত করা, সুশিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু যদি দেখা যায় একটা বিষয় রোজই অধিকাংশ ছাত্রেরই বিরক্তি উৎপাদন কচ্ছে তবে শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে এটা বুঝতে হবে এবং তার প্রতিকারও করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত অবসাদ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য—

Some facts regarding fatigue, which have been discovered or established through experiments on fatigue.

পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার ফলে অবসাদ সম্বন্ধে কতগুলি তথ্য নিশ্চতভাবে প্রমাণিত হয়েচে। এ গুলোর অধিকাংশই পেশীর অবসাদ সম্পর্কে মস্যোর এরগোগ্রাফ (Ergograph) যন্ত্র ব্যবহার করে জানা গেছে।

১। কোন পেশী অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে কার্য্যক্ষমতা প্রথম দিকে দ্রুত কমতে থাকে। তারপর এই শক্তিহ্রাস মন্থর হয়ে আসে—কিন্তু অবসাদ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আবার তখন শক্তি দ্রুত হ্রাস পায়।

২। যথোপযুক্ত বিশ্রাম (অনেক সময় ১০ সেকেণ্ড মাত্র) পেলেই পেশী তার পূর্ব ক্ষমতা ফিরে পায়।

৩। গভীর অবসাদের পরেও যদি পেশী জোর করে কাজ করতে চেষ্টা করে তাহ'লে তার শক্তি ফিরে পেতে অনেক দেরী হয়।

৪। পেশী যত দ্রুতবেগে এবং যত বারে বারে সঙ্কুচিত হবে—অবসাদও তত দ্রুত আসবে এবং কাজের পরিমাণও তাতে কমতে থাকবে।

৫। পরিশ্রমের ফলে পেশী, শিরা বা স্নায়ুসংযোগক্ষেত্রে যে বিষসঞ্চার হয় তা বিদূরণে যদি বাধা হয়, অথবা ক্ষয়পূরক খাদ্যগ্রহণে যেখানে ত্রুটি হয় সেখানে পেশীর ক্ষমতা কমে যায় এবং অবসাদ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ দিন ধরে এটি ঘটলে পেশী স্থায়ীভাবে শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে।

৬। কতগুলো পেশী কাজ করে অবসন্ন হয়ে পড়লে, অন্য যে সব পেশী কাজ করেনি তারাও শ্রান্ত হয় এবং তাহাদেরও কার্য্যক্ষমতা কমে যায়।

৭। মানসিক অবসাদ পেশীগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৮। চা, কফি, তামাক জাতীয় মৃদু উত্তেজক পদার্থগুলি অবসাদ দূরীকরণে সাময়িকভাবে সাহায্য করে সত্য, কিন্তু এদের কুফল কতটা হয় এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে শর্করা (Sugar বা Glucose) অবসাদের পর খেলে, বা ইনজেকসন্ করলে অল্পক্ষণের মধ্যে পেশীর কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়। কৃত্রিম উপায়ে দেহের শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিলে (যেমন Insulin দিয়ে) অবসাদ বৃদ্ধি পায়।

৯। মেয়েদের সহের মাত্রা পুরুষের চেয়ে বেশী। যে অবস্থায় ছেলেরা অধৈর্য হয়ে ওঠে, মেয়েরা সেখানে অনেকটা শান্ত থাকে। অবশ্য, এটা কতকটা সামাজিক শাসনেরও ফল। ছেলেদের শক্তিক্ষয়ের মাত্রা দ্রুততর, মেয়েদের শক্তিক্ষয়ের সময় দীর্ঘতর। তাই সমান সময় কাজ করে তারা কম অবসাদগ্রস্ত হয়। ছেলেদের প্রকৃতি হচ্ছে ক্যাটাবোলিক্। বেপরোয়া শক্তিক্ষয়, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদিতে ছেলেদের আনন্দ। মেয়েদের প্রকৃতি হচ্ছে মেটাবোলিক্। তারা শক্তিসংগ্রহ ও শক্তিসঞ্চয়ে অধিক যত্নবতী। তারা সঞ্চয়ী, হিসাবী। এর কারণ সম্ভবতঃ প্রাণধর্মমূলক (biological)। প্রকৃতি মেয়েদের শক্তিক্ষয়ের ব্যাপারে সঞ্চয়ী করেছে, কারণ তাকে মাতৃত্বের বৃহৎ ক্ষয়ের দাবী ভবিষ্যতে মেটাতে হবে। পুরুষ জুয়ারীর মত শক্তিক্ষয় করে, প্রকৃতির বাধা ভেঙে যে ছুটে চলে, বৃহত্তর লাভের আশায়—**the man tends to gamble and gain by the greater return**; তাই সে স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল। মেয়েকে ঘর বাঁধতে হয়, ঘর সামলাতে হয়, তাই সে সাবধানী, তাই সে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে প্রয়াসী।

—সংযোজনা—

অবসাদের শ্রেণীবিভাগ—

সাধারণতঃ অবসাদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) পেশীর অবসাদ (২) ইন্দ্রিয়ের অবসাদ (৩) মানসিক বা স্নায়ুকেন্দ্রের অবসাদ। অবসাদের দৈহিক কেন্দ্রটি কোথায় তা বিচার করেই এই ভাগ। কিন্তু এটা নিতান্তই কৃত্রিম বিভাগ। তার কারণ ইন্দ্রিয়গুলি স্নায়ুকেন্দ্রের সংযোগের সূত্র দিয়েই পেশীগুলির সঙ্গে যুক্ত। এবং এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, কাজেই অবসাদের মূল কেন্দ্রটি কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে ঠিক কোথায় অবস্থিত, তা বলা খুব শক্ত। পরীক্ষা করে জানা যায় যে স্নায়ুকেন্দ্রে অবসাদের প্রধান মূল হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংযোজনী (synapse), ইন্দ্রিয়াদির বেলায় উত্তেজক গ্রহণের শেষ স্নায়ুতন্তুগুলি (end organs) এবং পেশীর বেলায় পেশীমূলগুলি (muscle plates)। যদি কোন গন্ধ বা স্বাদ কিছুক্ষণ ধরে আমরা গ্রহণ করি তাহ'লে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা স্বাদেন্দ্রিয় গ্রাহক তন্তুগুলি (olfactory or taste buds) অবশ হয়ে পড়ে তার ফলে এ গন্ধ বা স্বাদ আমরা আর অনুভব করি না। চোখের অক্ষিপটের মধ্যে গ্রাহক স্নায়ুতন্তু রডস্ ও কোন্‌স্ (rods and cones) ও অনুরূপ ভাবে অবসন্ন হয় এবং এর ফলে দৃষ্টির বেলায় কতগুলি বিকার ঘটে।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী অবসাদকে পৈশিক ও মানসিক বা স্নায়বিক এ দুভাগেই ভাগ করেছেন। অনেকক্ষণ ধরে দৌড়ঝাঁপ করা, মাটি কোপান, এর ফলে যে দৈহিক অবসাদ, তা মূলতঃ পেশীর অবসাদ; আবার অনেকক্ষণ ধরে গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে কোন দর্শনের বা বিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে মগ্ন থাকার ফলে যে ক্লান্তি, সেটা প্রধানতঃ মানসিক। তেমনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লম্বা লম্বা যোগ বিয়োগ করণ, অনেকগুলো ছাপানো বা লেখা পৃষ্ঠা থেকে "র"এর বিন্দু বা "ই"র লেজ খুঁজে খুঁজে চিহ্নিত করার কাজ, অনেকক্ষণ ধরে করলে, মানসিক অবসাদ আসে। প্রথমতঃ, কাজটা বেশ মনোযোগ দিয়েই করতে থাকি, মনোযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, তার গুণেরও উৎকর্ষ ঘটে। কিন্তু ধীরে ধীরে অবসাদ আসে। কাজের গতি শিথিল হয়, ভুল ক্রমে বাড়তে থাকে, মন বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠতে থাকে, বিরক্তি বোধ হ'তে থাকে—শেষে আর কাজ করতে ইচ্ছাই করে না। এ মানসিক অবসাদের লক্ষণ। কিন্তু এমন দৈহিক অবসাদ খুব কম পাওয়া যাবে, যার সঙ্গে মানসিক অবসাদ মিশ্রিত হ'য়ে

নেই। আবার শুধুই মানসিক অবসাদ যেখানে দেহ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, এমন উদাহরণও পাওয়া যাবে না। তবুও এ দুইয়ের মধ্যে তফাৎ যে আছে, সেটা সহজ বুদ্ধিতেই স্বীকার করতে হয়। দেহতত্ত্বের দিক থেকে মানসিক অবসাদ কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের ব্যাপার আর পৈশিক অবসাদ পেশীর ব্যাপার, এ রকম বলা হয়। কিন্তু আগেই বলা হয়েচে এরকম বিভাগটা বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব নয়। এরা বিভিন্ন হলেও পরস্পরের সঙ্গে এমনি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে যে তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা বা পরিমাপ করা খুবই কঠিন—হয়তো বা অসম্ভব। পেশীর অবসাদ মনকে শেষ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করেই আর মানসিক অবসাদও পেশীকে দুর্বল করে। তবে এটা দেখা যায় মানসিক পরিশ্রমের ফলে পেশীর অবসাদ আসতে যতটা সময় দরকার পেশীর অবসাদের ফলে মানসিক বা স্নায়বিক অবসাদ তার চেয়ে অনেক দ্রুততর ঘটে।

†পেশী ও মনের অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্র ও উপায়—Different ways of the measurement of muscular and mental fatigue—পেশীর বা স্নায়ুর অবসাদ মাপবার জন্যে বিভিন্ন যন্ত্র বা উপায় ব্যবহার করা হয়।

১। **এস্থিসিওমিটার (Aesthesiometer)**—এ যন্ত্র দিয়ে ত্বকের স্পর্শানুভূতি মাপা যায়। অবসাদ যত বাড়ে অনুভূতি তত কমে যায়।

২। **ডাইনামোমিটার (Dynamometer)**—এ যন্ত্র দিয়ে grip বা হাত মুঠ করে কত জোরে ধরা যায় তা কিলোগ্রামে মাপা যায়। অবসাদের সঙ্গে হাতের জোরও কমে।

৩। **এরগোগ্রাফ (Ergograph)**—এ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন মস্সো (Mosso)। এ যন্ত্রে মনিবন্ধ পর্য্যন্ত হাত একটি টেবিলের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়। তারপর আঙ্গুলের সঙ্গে একটি শক্ত সুতো দিয়ে একটা ওজন একটা কপিকলের (pulley) উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এবার আঙ্গুলটা বারে বারে সংকুচিত আর প্রসারিত করে ওজনটাকে ওঠাতে নাবাতে হয়। অবসন্ন আঙ্গুল আগের মত দ্রুত আর ওজনটাকে নামাতে ওঠাতে পারে না। এটা দিয়ে আঙ্গুলের সঙ্গে সংযুক্ত পেশীর অবসাদ পরিমাপ করা যায়।

৪। **টোকা দেওয়া পদ্ধতি—The tapping method**—একটা আঙ্গুল বা পেন্সিল দিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দ্রুত টোকা দিতে হয়। প্রথমে

যতটা দ্রুত টোকা দেওয়া যায়—ক্রমে আর ততটা পারা যায় না। এদিয়ে অবসাদের পরিমাপ করা যায়।

আগেই বলা হয়েচে যে পেশীর ও স্নায়ুর অবসাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু পেশীর অবসাদের পরিমাণ দিয়ে মানসিক অবসাদ মাপবার চেষ্টা বহু-

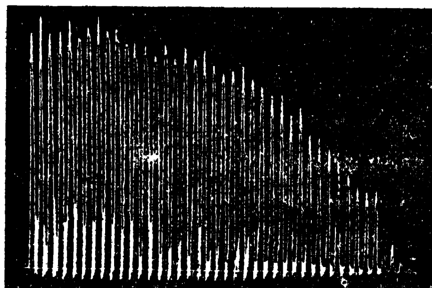


FIG. 34—Fatigue Curve. C. S. Myers, Exp. Psychology,—Cambridge University Press.

করা হয়েছে কিন্তু দেখা যায় যে ফলটা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। তাই মস্সো দেহ বা পেশীর অবসাদের মাধ্যমে স্নায়বিক বা মানসিক অবসাদ পরিমাপের যে চেষ্টা করেছেন ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ ও থর্নডাইক তার সমালোচনা করেছেন। মানসিক অবসাদ মাপবার জন্যে অন্য কতগুলি উপায় চেষ্টা করে দেখা হয়েচে।

অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করা পরীক্ষা—The Completion test—যাকে নিয়ে পরীক্ষা করা হবে তাকে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প পড়তে দেওয়া হ'ল। কিন্তু লেখার মধ্যে কতগুলি কথা বা কথার অংশ বাদ দেওয়া আছে। বলা রইল যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি পূরণ করে যেতে হবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় তার পড়ার গতি আগের চেয়ে শিথিল হয়ে এসেছে, শব্দ পূরণ করবার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েচে, তার ভুল হচ্ছে অথবা ফাঁকগুলি দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এর থেকে তার মানসিক অবসাদের মাপ করা যেতে পারে।

অক্ষর কেটে দেওয়া বা মুছে দেওয়া পরীক্ষা—Cancellation test or letter erasing test—এ পরীক্ষায় বলা হয় একটি বইয়ের লেখা পড়তে পড়তে বিশেষ একটা অক্ষর দাগ দিয়ে কেটে কেটে যেতে হবে। এখানেও

তার পড়ার গতির শৈথিল্য, ভুলের পরিমাণ, দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি তার মানসিক অবসাদের পরিমাপের উপায়।

শেখা বা মুখস্থ করা নিয়ে পরীক্ষা—The learning test or Memorisation test—কোন একটা নির্দিষ্ট পড়া মুখস্থ করতে কতবার পড়তে হয় এবং কতটা সময় লাগে তা দিয়ে মানসিক অবসাদ মাপা যেতে পারে।

হিসাব দিয়ে পরীক্ষা—The Calculation Test—এ পরীক্ষায় কতগুলি যোগ, বিয়োগ, গুণন ইত্যাদি অংক কষতে দেওয়া হয়। যখন মন অবসন্ন তখন অংকগুলি কষতে অনেক বেশী সময় লাগে, অনেক বেশী ভুল হয়। এ দিয়ে অবসাদের পরিমাণ মাপা যায়।

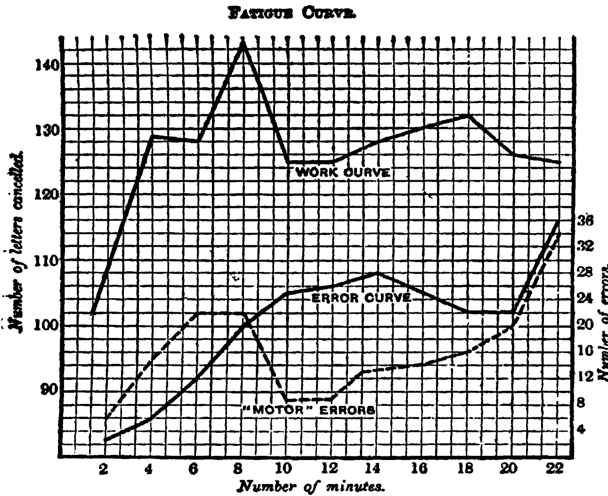


Fig. 35—Work Curve.—Valentine Introduction to Experimental Psychology—University tutorial Press.

মানসাঙ্ক ব্যবহার করে মানসিক অবসাদ পরিমাপের পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেন থর্ণডাইক। তারপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজের জাপানী ছাত্রী মিস্ আরাই (Miss Arai) মানসিক অবসাদ নির্ধারণ কি করে করা যায় তা নিয়ে উপরোক্ত নানা পরীক্ষা করেন। তাঁর পরীক্ষাতে দেখা যায় যে তাঁর কাজের উৎকর্ষের যথেষ্ট হানি না হলেও (১) অবসাদের ফলে কাজের গড়

সময় আগের চেয়ে বেশী লাগছে (২) গড় ভুলের পরিমাণ আগের তুলনায় বেশী হচ্ছে। এ দু'টিকে তাই তিনি মানসিক অবসাদের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ষ্টার্চ ও এ্যাস্ (Starch and Ash) এর পরীক্ষার ফলও অনুরূপ। এতে দেখা যায় অনেকক্ষণ ধরে মানসিক পরিশ্রমের ফলে কাজের উৎকর্ষ কিছুটা হানি হয়। কিন্তু মানসিক পরিশ্রমের ফলে সম্পূর্ণ মানসিক অবসাদ, অর্থাৎ যেখানে মনের কাজ করবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়েছে বা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

মানসিক ক্রিয়া বা অবসাদ প্রকাশক বক্র রেখার (Mental work curve or Fatigue curve) রীতি সম্বন্ধে বলা যায়, যে প্রথমে একটা প্রস্তুতির স্তর থাকে, যখন কাজে অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগে। অবশ্য এই স্তর সবার বক্ররেখায় না দেখা দিতে পারে। তার পরে আসে সর্বাধিক কাজের অবস্থা (the stage of warming up)। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কাজের গতি মন্থর হয়ে আসে, অবসাদের চিহ্ন দেখা দেয়, ভুলের আধিক্য হয়। তবে এর মাঝে মাঝে চেষ্টার দরুণ হঠাৎ উদ্যম (spurt) বা কাজের উন্নতি দেখা দেয়, তবে সে বেশীক্ষণের জন্য নয়। অনেক সময় ক্ষণিক বিশ্রামে বা মানসিক আনন্দের ফলে কাজের উন্নতি দেখা যায়। তবে থর্ণডাইকের মতে এই নিয়মগুলির ক্রিয়া সর্বদা অবসাদের বক্র রেখায় দেখা যায় না। X

বিদ্যালয়ের কাজে শিশুদের অবসাদের পরিমাপ—Fatigue in School—স্কুলের যে কাজ তাতে ছেলেমেয়েরা কি বাস্তবিকই অবসন্ন হয়? এ অভিযোগ অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রায়ই শোনা যায়—স্কুলগুলি "শিশুপাল-বধে'র কারখানা। কচি কচি ছেলেমেয়েরা বইএর চাপে, পড়ার চাপে, কাজের চাপে হাঁফিয়ে ওঠে, ইত্যাদি। এ নিয়ে নির্ভরযোগ্য কোন পরীক্ষা আমাদের দেশে হয়নি। তবে দুই একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সম্ভবতঃ এ অভিযোগের পেছনে যতটা অন্ধ স্নেহ আছে ততটা বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। সম্ভবতঃ স্কুলের পড়া বা কাজ ছেলেমেয়েদের যতটা অবসন্ন করে তার চেয়ে অনেক বেশী বিরক্ত করে। ক্ষুধার্ত ছাত্রছাত্রী, বদ্ধগৃহ, খেলাধূলা ও আনন্দের আয়োজনের অভাব, দরিদ্র ও সংসার যাতনাক্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহহীন শিক্ষা ইত্যাদি বহু কারণেই স্কুলের পড়া ছেলেমেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে না। তারা বিরক্ত (bored) বোধ করবে ক্লান্ত বোধ করবে এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। কিন্তু সম্ভবতঃ

বাস্তবিক অবসন্ন বোধ করবার যথেষ্ট কারণ আমাদের স্কুলগুলিতেও বিদ্যমান নেই। থর্ণডাইক এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তও করেছেন যে স্কুলের সব কাজই ছাত্রছাত্রীদের অবসাদ সৃষ্টি না করেও করা যায়। এটা যে হয় না, তার কারণ অবসাদ নয়, বিরক্তি।

School-work and Fatigue—স্কুলের কোন কোন বিষয় বেশী অবসাদ আনে এ কথা কি সত্যি? ভাগ্‌নার (**Wagner**) এ নিয়ে যে পরীক্ষা করেছেন তাতে মনে হয় এ কথাটা মিথ্যে নয়। অবসাদ জন্মাবার ক্ষমতা অনুসারে তিনি স্কুলের বিভিন্ন বিষয়কে নিম্নলিখিতভাবে সাজিয়েছেন—

অংক	...	১০০
ল্যাটিন্	...	৯১
গ্রীক্	...	৯০
ইতিহাস ও ভূগোল	...	৮৫
ফরাসী ও জার্মান	...	৮২
প্রাণী ও প্রকৃতিবিজ্ঞান	...	৮০
অংকন ও ধর্মালোচনা	...	৭৭

দেখা যাচ্ছে ভাগনারের দেশে ধর্মালোচনা চিত্রাঙ্কনের মতোই মনোরম। তার কারণ নিশ্চয়ই ধর্মালোচনাটা চলে গল্প ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে, উপদেশটা থাকে অন্তে এবং সেটা গৌণ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবসাদের কুফল ও তার প্রতিকার—ছাত্রদের অবসাদ নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা হোল এবার শিক্ষকের দিকেও একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক্। অবসন্ন শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষম বাধা, প্রকাণ্ড অপচয়। অবসন্ন অবস্থায় শিক্ষাদান প্রাণহীন কর্ত্তব্যপালনে পর্য্যবসতি হয়। শিক্ষকের মনোযোগের শৈথিল্য ঘটে তাতে ক্লাশের ছাত্রদেরও শৃংখলার হানি হয়। শিক্ষক খিট্‌খিটে হয়ে বৃথা ছাত্রদের শাসন পীড়ন করেন তাতে ছাত্র শিক্ষকের সম্বন্ধের মর্য্যাদা ও মাধুর্য্য নষ্ট হয়। যে শিক্ষকের মন ক্লান্ত, নতুন জ্ঞান আহরণের উৎসাহ তার আসবে কোথা থেকে? আর একই পড়া বারে বারে পড়ানোর বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তিতে শিক্ষকের মনে বিরক্তি আসাও একটুও অন্যায় বা অস্বাভাবিক নয়। সমাজের পক্ষে এ সমস্যা মোটেও উপেক্ষণীয় নয় অথচ এ বিষয়ে এখনও রাষ্ট্র বা সমাজের দৃষ্টি যথেষ্ট জাগ্রত নয়। সমস্যা সমাধান করতে হলে শিক্ষককে নিত্য অভাব ও অনিরাপত্তাবোধের সর্বনাশা চিন্তা থেকে মুক্তি

দিতে হবে। তাকে বিদ্যা আহরণের ও আত্মোন্নতির জন্য যথেষ্ট সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হবে। তাঁর কাজের মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতে হবে যেমন করা দরকার ছাত্রদের বেলায়ও। তাঁর কাজ বা পড়ার বিষয়-বস্তুতে বৈচিত্র্য কিছুটা আনতে হবে। এ সবই ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু সমাজকে নিজের স্বার্থেই এ সার্থক ব্যয়ে অগ্রণী হতে হবে। আমেরিকা আমাদের তুলনায় কত বেশী অগ্রসর এ বিষয়ে। কিন্তু তথাপি তাঁরা এখনও শিক্ষকের অবসাদের বিপদ সম্বন্ধে কত বেশী সচেতন—কত আলোচনা, পরীক্ষা এখনও এ বিষয়ে হচ্ছে। (Millard-Child Development P. 436) রাশিয়ায়ও এ সুস্থ সচেতনতা অত্যন্ত স্পষ্ট। (Deanna Levin-Education in Soviet Russia)।

চতুর্দশ অধ্যায়

অনুভূতি ও আবেগ—Emotions

"খুকু, দেখে যা, বাবা আমাদের জন্যে কি সুন্দর ছবির বই এনেছে।" হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে, ছুটে গেল অশোক, খুকুকে ডেকে আনতে। **খুসীতে**, আনন্দে উচ্ছল শিশুর রূপ।

"মাগো, বাবা গো, খেয়ে ফেল্লে গো"—হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এলো দেবযানী মার কাছে। মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো। মা গায়ে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করলেন মেয়েকে। খেলার মাঠে ষাঁড়ে তাড়া করেছে, তাই বিষম **ভয়** পেয়েছে মেয়ে।

"বাবা, শিগগির ওঠো, দ্যাখো আকাশে কেমন এক তারা উঠেছে, তার পেছনে যেন বাঁকানো মস্ত এক ঝাঁটা বাঁধা।" মিত্রার চোখ দুটি **বিস্ময়ে** বিস্ফারিত।

"মা, আজ দাদাকে আমি খুন করব। আমার নতুন স্যাণ্ডাল জোড়া পরে' বেরিয়ে গেছে, ওটাকে শেষ করে আনবে। আমার কোন ভালো জিনিষ কেন্‌বার জো নেই, এই আসুরে, বুড়ো ছেলের যন্ত্রণায়।" **রাগে** গর্জন করে উঠলো সুনন্দা। তারপর আলনা থেকে দাদার আমেরিকান্-কাফ্ সার্টটা টেনে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিলে।

"কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে কুঞ্জ-কাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবন-সুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি-'পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বন-ভরা সরস বিম্বাধরে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে মধুর আবেশভরে।
তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি,
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে তোমার কমল কোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন, মুখে নাহি ছিল বাণী।

আমি শিথিল করিয়া পাশ,
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সখী, হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে নবীন মিলন সুখে।"[১]

বলাই বাহুল্য, এ প্রেমের মুগ্ধ লীলা-বিলাস। কয়টি প্রধান অনুভূতির সাধারণ ও অতি পরিচিত উদাহরণ।

মানুষের জীবনে অনুভূতির মূল্য সামান্য নয়। হতে পারে, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি—মানুষের মনের এই ভালো লাগা মন্দ লাগাকে উপেক্ষাই করে। কিন্তু ব্যক্তির জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এবং এতে কোন সন্দেহ নেই শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সমাজ জীবনে একে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। "বস্তুগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হ'তে, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি ঠিক ঠিক কাজগুলো করে যাচ্ছে, ততক্ষণ সে কি অনুভব করে তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীতে তার অনুভূতি ও আবেগকে বাদ দিয়ে দিলে ঘটনার সবচেয়ে মূল্যবান দিকটাই বাদ দেওয়া হোল। মনোবিজ্ঞান থেকে অনুভূতি ও আবেগ বাদ দিলে যেন হয় নীরব সিনেমা, বহু বাদ্যযন্ত্র-সম্বলিত সঙ্গীতের ছবি দেখা যেখানে কোন সুর শোনা যায় না।" মানুষ যত কাজ করে তার অতি সামান্য অংশই বিশুদ্ধ বুদ্ধি-চালিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের কাজের পেছনে থাকে তার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা। পুরোনো মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এরা হোল 'Springs of action'—কর্মের উৎস। সহজাত সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই আমরা দেখেছি—মানুষের মূল প্রবৃত্তির সঙ্গে কতগুলি অনুভূতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজেই সাধারণ মনোবিজ্ঞানী বা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী সকলের পক্ষেই অনুভূতি সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য্য। "বর্তমান শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে...আবেগ ও অনুভূতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।...আমাদের সমস্ত ক্রিয়ার পেছনের শক্তি-উৎস হচ্ছে আবেগ; কাজেই শিক্ষাব্রতীকে এদের সম্পর্কে জানতে হবে... এমন কি যে সব বিষয় বিশেষ করেই বুদ্ধিগ্রাহ্য সেখানেও অনুভূতিকে একেবারে

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাত্রে ও প্রভাতে (চিত্রা)

অগ্রাহ্য করা চলে না। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্ অংক শেখানো। একাজে সফল হতে গেলে শিশুর বিস্ময় বোধ ও গঠনাত্মক আত্মবোধ জাগ্রত করা চাই। তা ছাড়া বর্তমান শিক্ষাবিধিতে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতির মধ্য দিয়ে কি করে সৌন্দর্যপ্রীতি, এবং শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে রুচিবোধ বিকশিত করা যায় তাও শিক্ষাদানের বিশেষ বিষয় বলে স্বীকৃত।"[২]

আবেগের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Emotions—এই অনুভূতিগুলি এত বিচিত্র আর এদের মধ্যে এত সূক্ষ্ম প্রভেদ বর্তমান যে এক নাম দিয়ে যে অনুভূতিগুলিকে চিহ্নিত করি তারাও ঠিক এক নয়। এ জন্যে এদের শ্রেণী বিভাগ এক দুরূহ ব্যাপার। একটা খুব মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন উডওয়ার্থ, সেটা নীচে দেওয়া যাচ্ছে—

Pleasure, happiness, joy, delight, elation, rapture.

Displeasure, discontent, grief, sadness, sorrow, dejection.

Mirth, amusement, hilarity.

Excitement, agitation.

Calm, contentment, numbness, apathy, weariness, ennui.

Expectancy, eagerness, hope, assurance, courage.

Doubt, shyness, embarrassment, anxiety, worry, dread, fear, fright, terror, horror.

Surprise, amazement, wonder, relief, disappointment.

Desire, appetite, longing, yearning, love.

Aversion, disgust, loathing, hate.

Anger, resentment, indignation, sullenness, rage, fury.[৩]

এ তালিকা সম্পূর্ণ নয় এবং নিশ্চয়ই আরো নানা ভাবে অনুভূতিগুলির শ্রেণী বিভাগ করা চলে। আমরা ইতিপূর্বে অনুভূতির দুটি মূল লক্ষণ, অথবা একই গুণের দুই বিপরীত সীমা, উল্লেখ করেছি, ভাল-লাগা—মন্দ-

২ Ross—Educational Psychology. P. 72.

৩ Woodworth—Psychology. P. 408.

লাগা।) প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা অনুভূতির এই একটি গুণের কথাই উল্লেখ ক'রে, সমস্ত অনুভূতিকে ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার ক্রম বা পরিমাণ অনুসারে ভাগ করেছেন। কিন্তু এ ভাগ যে যথেষ্ট নয় সেটা সহজেই বোঝা যায়। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ড (Wundt) অনুভূতির তিনটি গুণ বা dimension উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকটি গুণেরই পরিমাণগত বিভেদ স্বীকার করেছেন। প্রথম গুণ হচ্ছে, ভাল-লাগা ও মন্দ-লাগা, pleasant—unpleasant, দ্বিতীয় হচ্ছে উত্তেজনা ও প্রশান্তি excitement—calm, তৃতীয় হচ্ছে, প্রতীক্ষা ও প্রতীক্ষার অবসান—expectancy—release।[8] বিভিন্ন অনুভূতি এই তিনগুণের বিভিন্ন সমন্বয় ও সংমিশ্রণের ফল। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের শ্রেণী বিভাগের চেয়ে ভুণ্ড এর শ্রেণীবিভাগ অধিকতর সন্তোষজনক হ'লেও তাকে সম্পূর্ণ বলা চলে না। যেমন আর একটা গুণ সহজেই উল্লেখ করা চলে, পরিচিত—অপরিচিত বোধ—familiarity-strangeness। তা ছাড়া ফ্যাকাল্টি সাইকোলজীর মানসিক রসায়নতত্ত্ব (Mental chemistry) রূপ ভূতের ছায়া পড়েছে এই শ্রেণী বিভাগে। এই অতিরিক্ত পরিচ্ছন্ন বিভাগকে টিচনারও তাই গ্রহণ করেন নি, কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর এ বিভাগ স্থাপিত নয়।[৫] ম্যাকডুগ্যাল অবশ্য অনুভূতিগুলিকে অল্প কয়েকটি মূল উপাদানে বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। তিনি বলেন রংএর বেলায় আমরা দেখি হাজারো রং আছে—তাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানেই লক্ষণীয় বিভিন্নতা অনুভব হয়। তবুও তাদের প্রত্যেকটিকে পৃথক করে বিবেচনা না করে আমরা তাদের অল্প কয়েকটি মূল রংএর সংযোগ-সমন্বয়ে কি করে পাওয়া যেতে পারে তাই বুঝতে চেষ্টা করি। আবেগগুলির বেলায়ও ঠিক সেই পথ অবলম্বন করলে দোষ কি? "বর্ণ বোধের বেলায় যেমন আবেগের বেলায়ও তেমনি দেখি নানা গুণগত প্রভেদ। এক রং অল্প অল্প করে বদলে গিয়ে অজান্তে অন্য রং এ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তা বলে এই অসংখ্য সামান্য সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলিকে বিশ্লেষণ দ্বারা অল্প কয়টি মূল গুণে বিভাগ করে নিতে বাধা নেই। এই মূল কয়টি গুণ থেকে বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রণের দ্বারা অন্য সব গুণগুলি পাওয়া যেতে পারে।" একথাগুলি আবেগের বেলায়ও প্রযোজ্য।

৪ Woodworth—Psychology, P. 404,

৫ Titchener—A Text-book of Psychology, P. 255.

৬ McDougall—Social Psychology, P. 87.

পূর্বেই বলা হয়েছে ম্যাকডুগ্যালের মতে চোদ্দটি প্রধান সহজাত সংস্কার বা Instinct আছে, এবং তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযুক্ত এক একটি বিশেষ অনুভূতি থাকে। এদের ম্যাকডুগ্যাল বলেন, মৌলিক আবেগ। "প্রত্যেকটি প্রধান সংস্কারই কিছু আবেগের উত্তেজনা সৃষ্টি করে যা বিশেষ একটি গুণসম্পন্ন এবং প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত তার বিশেষ গুণ-সম্পন্ন আবেগের প্রকাশকে একটি মৌলিক আবেগ বলা যেতে পারে।"[৭]

যুগপৎ একাধিক প্রধান সংস্কারের সঞ্চারের ফলে যে সব মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাদের ম্যাকডুগ্যাল্ জটিল আবেগ বা অর্জিত আবেগ (complex emotions or derived emotions) বলেন। "আমাদের অনেক আবেগময় অনুভূতি যুগপৎ একাধিক সংস্কারের সঞ্চারের ফল; এবং আমাদের অধিকাংশ আবেগের যে নাম সাধারণতঃ প্রচলিত আছে তা এক প্রকার মিশ্র, জটিল বা মাধ্যমিক আবেগেরই পরিচয়। আমাদের আবেগময় অনুভূতিগুলির অধিকাংশকেই অল্প কয়েকটি মাত্র সরল ও মৌলিক আবেগের মিশ্রণের ফল মাত্র একথা বলা যায়।"[৮] যেমন ধরা যাক, সবিস্ময় প্রশংসা (Admiration)। এটি একটি যৌগিক আবেগ,—আশ্চর্যবোধ ও নেতিবাচক আত্মবোধ এই দুইএর মিশ্রণ; যেমন, বেগুনী রং হচ্ছে মৌলিক দুটি রং, লাল ও নীলের মিশ্রণ।"[৯]

এই রকম সমস্ত শ্রেণী বিভাগেরই বিপদ হচ্ছে এতে মানসিক অবস্থাগুলিকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন "শক্তি" হিসাবে আমরা ভাবতে আরম্ভ করি। "এখানে আমাদের বিশেষ করে সতর্ক হতে হবে, বিদেহ মনোবৃত্তিকে 'দ্রব্য' হিসাবে গ্রহণ করবার স্বাভাবিক অভ্যাস থেকে। রাগ, ভয় এরা সচেতন মনের কয়েকটি নির্দিষ্ট অবস্থার নাম। এরা কতগুলি দ্রব্য বা বস্তু নয় যা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে মনকে গ্রাস করে নেয়।"[১০]

আবেগের লক্ষণ—Characteristics of emotions—আবেগ, অনুভবের অবস্থা বা ব্যক্তির অন্তরের অবস্থা (subjective states)। জানার বেলায় জ্ঞানের বস্তু বা দ্রব্য (object) প্রধান ও সক্রিয়। ইচ্ছার বেলায় ব্যক্তি সক্রিয় ও প্রধান। কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তরের পরিবর্তনগুলি

৭ McDougall—Social Psychology, P. 40-41,
৮ McDougall—Social Psychology, P. 104.
৯ Thouless—General and Social Psychology, P. 76.
১০ Ross—Educational Psychology, P. 55.

তার নিজস্ব সক্রিয়তার ফল নয়। সেই হিসাবে আবেগকে বলা হয় মনের আন্তরিক ও নিষ্ক্রিয় অবস্থা (subjective and passive states of the mind)।

কিন্তু আবেগ মনের একটা স্থাণু অবস্থা নয়। আবেগ হচ্ছে অনুভূতির অত্যন্ত প্রকাশমান অবস্থা। যেখানে অনুভূতির মেঘ জমেছে—কিন্তু তখনও কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে উপলক্ষ করে স্পষ্ট প্রকাশ পায় নি—তাকে বলা হবে আবেগ-পূর্ব-অবস্থা (emotional mood)। তাকে আবেগ (emotion) বলব না। যখন সুনন্দা তার দাদার উপর রাগে "ফেটে পড়ল" তাকে বলব আবেগ। "আবেগ কথাটা দিয়ে রাগ, ভয়, আনন্দ, কৌতূহল, দুঃখ, বিরক্তি ইত্যাদি অনুভূতির বস্তুগুলি নির্দিষ্ট ও প্রকাশমান অবস্থা বোঝায় যেখানে—ব্যক্তি, 'বিচলিত' বা 'উত্তেজিত হয়েছে।'"[১]

আবেগগুলির মধ্যে একটা অন্ধতা আছে—তারা শান্ত যুক্তিবিরোধী। যখন কেউ ভীষণ রেগে যায়—তখন বিচার বিবেচনা থাকে না, বিচার বিবেচনা যখন থাকে তখন ভীষণ রাগ হয় না। ফরাসী প্রবাদ তাই বলে "সব কথা জানা মানেই সবাইকে ক্ষমা করা।" 'রাগ করে কাজ করবার আগে ২০ পর্যন্ত গোণ', একটা আদর্শ সদুপদেশ, যদিও অধিকাংশ সদুপদেশের মত এ পালিত হয় বড় কম।

প্রত্যেক আবেগের নির্দিষ্ট কারণ থাকবে, কিন্তু কারণটা সব সময়ই এক হবে তার কোন কথা নেই। বিভিন্ন এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীত কারণেও রাগ হতে পারে। কোন কাজে বাধা দিলেও রাগ হয়, সময় মত খাবার না পেলে রাগ হয়, প্রিয় জনের নিন্দে করলে রাগ হয়, মতলব ধরা পড়ে গেলে রাগ হয়, এমন কি কখনো নিতান্ত সদুদ্দেশ্যে ভালো করতে চাইলেও রাগ হয়। কাজেই কোন আবেগকে বুঝতে গেলে ব্যক্তি ও তার সম্পূর্ণ পরিবেশ ভালো করে জানা দরকার। আবেগগুলি বিশেষভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

ষ্টাউট, আবেগের মানসিক লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে আর একটি গুণের কথা বলেছেন। আবেগগুলি পরভূতিকাবৎ কতগুলি প্রবল প্রবৃত্তি বা কর্মপ্রেরণার উপর নির্ভর করে। যেমন, মাদী কুকুরের ছানা কেড়ে নিলে ক্ষেপে কামড়ে দেয়। এখানে কুকুরের রাগ এই অনুভূতির পশ্চাতে রয়েছে অত্যন্ত প্রবল প্রবৃত্তি, মাতৃস্নেহ—"আবেগের প্রকৃতি হচ্ছে যে তার পর নির্ভর। আবেগের

[১] Gates and Jersild—Educational Psychology. P. 82.

পশ্চাতে তার ভিত্তি হিসাবে প্রবল কোন কর্মপ্রবৃত্তি থাকতে হবে।"[১২] আবেগ এবং সহজাত-সংস্কারের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সম্পর্কে ম্যাকডুগ্যালের মত স্মরণ রাখলে এ কথাটা আমরা সহজেই বুঝতে পারব। এ সঙ্গেই বলা যেতে পারে অনুভূতির সঙ্গে কর্মের বা কর্মপ্রবৃত্তির একটা নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। রাগ করলে আমরা আঘাত করতে চাই, ভয় করলে ভয়ের বস্তু থেকে পালিয়ে যাই। "এটাও আবেগের একটা লক্ষণ যে এটা মনের একটা সমগ্র অবস্থা যার অন্তর্গত হচ্ছে কোন কর্ম বা বিশেষ কোন কর্মপ্রকৃতি।"[১৩]

আবেগ ও তার দৈহিক প্রকাশ—Emotion and its expression—পূর্বেই বলা হয়েছে—আবেগগুলি অনুভূতির স্পষ্ট প্রকাশমান অবস্থা। প্রত্যেক আবেগেরই কতগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গী আছে। কতগুলি নির্দ্দিষ্ট দৈহিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে রাগ, ভয়, আনন্দ, বিস্ময়, ভালবাসা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অবশ্য সকলের রাগ বা সব রাগই হুবহু একই ভাবে দেখা দেবে, তা নয়। তবে ভয়ের প্রকাশ, আর রাগের প্রকাশ, লক্ষণীয়ভাবে বিভিন্ন। অনুভূতির এই দৈহিক লক্ষণগুলি এত সুস্পষ্ট, যে কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে, এরাই অনুভূতির প্রাণ। এমন কি, এদের বাদ দিয়ে অনুভূতিগুলিকে যখন বোঝাই যায় না, তখন এরা অনুভূতি থেকে অভিন্ন। দেহের কি কি পরিবর্ত্তন অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত?

(১) চোখ মুখের পরিবর্ত্তন (২) পেশী গ্রন্থি ইত্যাদির পরিবর্ত্তন (৩) শোণিতপ্রবাহ, রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন, পরিপাকক্রিয়া, এবং দেহাভ্যন্তরস্থ অন্ত্রাদির পরিবর্ত্তন।

রাগ, চোখে মুখে প্রকাশ পায়। রাগ হলে, পেশীগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে—ভাঙতে চাই, আঘাত করতে চাই, চীৎকার করি। রসগ্রন্থি থেকে প্রচুর পরিমাণে এ্যাড্রিনিন্ রক্তে ক্ষরিত হতে থাকে, হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয় ইত্যাদি।

আবেগের প্রতিক্রিয়ায় তিন রকম দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে; সেগুলি হচ্ছে (১) আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যবহার (যথা—রাগ হলে মারা, ভয়ে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি) (২) পেশী মণ্ডলীতে অন্য কতগুলি ক্রিয়া, যেগুলি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় মুখের পেশীগুলিতে (যথা—কম্পন, ভ্যাংচানো, ভ্রূকুটি

১২ Stout—Manual of Psychology.

১৩ Thouless—General and Social Psychology, P. 74.

ইত্যাদি) (৩) রক্তচলাচল ক্রিয়ায় এবং অন্ত্রাদির ক্রিয়ায় পরিবর্তন (যথা, ভয়ে রক্তশূন্যতা এবং মল মূত্রাদি ত্যাগ)।[১৪]

প্রধান আবেগগুলি সহজাত হলেও, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া (Reflex) এবং সহজাত সংস্কার (Instinct) থেকে তাদের তফাৎ আছে। "যে সব আভ্যন্তরিক পেশী, গ্রন্থি বা অন্ত্রাদির পরিবর্তনগুলির কথা বলা হোল, সেগুলি আবেগের (emotion) বেলায় যতটা লক্ষণীয়, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া বা সহজাত সংস্কারের বেলায় ততটা নয়। তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া বা সহজাত সংস্কারের বেলায় যেমন সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রধান, তেমনি আবেগের বেলায় স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীয় (autonomous nervous system) ক্রিয়া প্রধান এবং এ ক্রিয়ার প্রভাব হচ্ছে মসৃণ পেশী ও গ্রন্থির উপর······আবেগের প্রকাশের সঙ্গে রসগ্রন্থির ক্ষরণের নিবিড় যোগ আছে।"[১৫]

তা ছাড়া আবেগের প্রকাশগুলি অনেকটা বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো। কিন্তু আমরা দেখেছি, সহজাত সংস্কারের ক্রিয়াগুলি সুসম্বদ্ধ। আবেগ হঠাৎ দেখা দেয়, সহজাত সংস্কার তা নয়। তবে সহজাত সংস্কার এবং আবেগ এই দুই এর পেছনে দেহযন্ত্রের ব্যবস্থা জন্মগত, এবং দুইই ব্যক্তি বা জাতির রক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করে। তাই স্যাণ্ডিফোর্ড আবেগের সংজ্ঞা দিচ্ছেন—"আবেগগুলি হচ্ছে আন্তর প্রতিক্রিয়া (জন্মগত নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া), সেগুলি মূলতঃ অসংবদ্ধ বা বিশৃঙ্খল এবং সমস্ত দেহের মধ্য দিয়েই, বিশেষ করে গ্রন্থি ও আভ্যন্তরীণ অন্ত্রমণ্ডলী এবং তাদের সমস্ত স্নায়বিক সংযোগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এ সব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ব্যক্তি ও জাতির রক্ষার নিকট সম্বন্ধ আছে।"[১৬]

প্রাণীর ক্রমবিবর্তন এবং আবেগের দৈহিক প্রকাশ—Evolution and the organic expression of emotions—অনুভূতির প্রকাশভঙ্গীগুলি জৈব-প্রয়োজন সাধনের উপযোগী এবং ক্রমবিকাশের ধারায় বংশানুক্রমে চলে এসেছে, এ কথাটা প্রথম স্পষ্ট করে বলেন ডারুইন্। রাগের প্রকাশ—দাঁতখিচুনী, গর্জন, আক্রমণ, জীবের আত্মরক্ষার সহায়ক। শত্রুকে ভয় দেখাতে বা ধ্বংস করতে হলে, এগুলি কাজে লাগে। তেমনি ভয়ে

১৪ Thouless. General and Social Psychology, P. 83.

১৫ Sandiford. Educational Psychology. 4. 139.

১৬ Sandiford—Educational Psychology, P. 129.

লুকিয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া প্রবলতর শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষার উপায়। সভ্য মানুষের কাছে আদিম প্রয়োজনগুলি আজ আর নেই, কিন্তু সেই দাঁত-খিচুনীটা রয়েই গেছে, তার আদিম বংশ-পরিচয়টা দেবার জন্য। "ডারুইনের মতে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশে যে আমরা দাঁত ভেংচাই তার উৎপত্তি প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রাক্-মানবযুগে। এ ক্রিয়াটি প্রাণীর জীবনরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। প্রাণীর মধ্যে দাঁতখিঁচুনী হচ্ছে, কামড়ানোর পূর্বের অবস্থা; এতেই অনেক সময় শত্রুকে যথেষ্ট ভয় পাইয়ে দেওয়া হত, বাস্তবিক আক্রমণ আর প্রয়োজন হত না। ডারুইনের মতে যদিও দাঁত দিয়ে যুদ্ধ করার যুগ প্রায় গত হয়েছে, তথাপি দাঁতখিঁচুনীর ক্রিয়াটা আজও রয়ে গেছে।"[১৭]

আবেগের সঙ্গে রসক্ষরা গ্রন্থির সম্বন্ধ—ক্যাননের আবিষ্কার—Emotion, its relation to gland secretions—Cannon's discovery—ক্যানন্ রাগ ও ভয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে মূল্যবান্ কতগুলি পরীক্ষা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রাগ ও ভয়ে গ্রন্থি থেকে প্রচুর পরিমাণে এ্যাড্রেনিন্ ক্ষরিত হয়। এতে পেশীগুলির শক্তি ও কার্যকারিতা ও সহনশীলতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। রক্তে শর্করার অংশ বৃদ্ধি পায়, তাতে পেশীগুলি হঠাৎ পরিশ্রমসাধ্য কাজ করবার উপযোগী খোরাক পায় এবং রক্তে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবার ফলে তার শীঘ্র ঘন হবার ক্ষমতা বাড়ে, শ্বেতকণিকা বাড়ে। এতে আক্রমণের ফলে রক্তপাত হ'লেও তা শীঘ্র থেমে যায় এবং বীজাণু দ্বারা দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এর থেকে ক্যানন্ এই সিদ্ধান্ত করেছেন, যে আবেগ এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত দৈহিক বা দেহাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তনগুলি, দেহের পক্ষে জরুরী বিপদজনক অবস্থার সফলভাবে সম্মুখীন হবার জন্যে প্রকৃতির নিজস্ব ব্যবস্থা (Emergency theory of emotion)। এড্রীনালিন্ পরিপাক-ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থি ও পেশীর ক্রিয়া মন্থর করে, হৃৎযন্ত্র ও ফুসফুসকে উত্তেজিত করে, স্কেলেটাস্ পেশীগুলির উপর এর প্রত্যক্ষ ক্রিয়া আছে; তার ফলে শক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এড্রীনালিনের ফলে যকৃতে সঞ্চিত রক্ত-শর্করা অধিক পরিমাণে রক্তস্রোতে যুক্ত হয়। যে সমস্ত জরুরী অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ও প্রবল পেশীক্রিয়া প্রয়োজন, সেগুলি আবেগের কালে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে সিম্প্যাথিটিক সিস্টেম্‌কে একটি সামনে ধাকা মারা ও পিছনে টেনে রাখা জটিল যন্ত্র হিসাবে কল্পনা করেছেন। এ যন্ত্র পূর্বোল্লিখিত আপৎ-

---

১৭ Woodworth—Psychology, P. 418.

কালীন অবস্থার হাতিয়ার। জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় উচ্চ বা হঠাৎ বিকট শব্দ, হিংস্র প্রাণীর সাক্ষাৎ, অপরিচিত মানুষ, কঠিন প্রতিরোধ ইত্যাদি আপৎকালীন অবস্থা সূচনা করে; এবং তখন প্রাণীকে বাঁচতে হ'লে পলায়ন বা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে হয় এবং এ অবস্থায় ভয় বা রাগ দেখা দেয়। এই জরুরী অবস্থায় প্রাণরক্ষা-রূপ পরম প্রয়োজনের তুলনায় পরিপাকক্রিয়া যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, হৃদযন্ত্র বা ফুস্ফুস্ যদি অতিরিক্ত ক্রিয়া করে, তা হলেও তেমন ক্ষতি হয় না।[১৮]

প্রধান আবেগগুলি সহজাত হলেও বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি, ভাব (ideas) ও কল্পনা (images)র বিকাশ ও বৃদ্ধির সাথে এদের প্রকৃতি এবং প্রকাশভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন ঘটে। জেসেল্ (Gessel) এক মাসের শিশুর মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গীর অনেকগুলি সিনেমাটোগ্রাফিক্ ছবি তুলে, তাদের মধ্য দিয়ে কি অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে, সে সম্বন্ধে অনেকের উত্তর চেয়েছেন। তাতে যে উত্তর পেয়েছেন নিতান্ত জান্তব তুষ্টি বা বিরক্তির চেয়ে বেশী কিছু শিশুর মুখে চোখে প্রকাশ পায় না, বলেই মনে হয়। কিন্তু এক বছরের শিশুর মধ্যে রাগ, বিরক্তি, ভয়, আনন্দের প্রকাশ অনেকখানি স্পষ্টতর। এ বিষয়ে গুডেনাফ-এর 'দি এক্স্প্রেসন্স্ অব্ দি ইমোশনস্ ইন্ ইন্‌ফ্যান্সি', 'চাইল্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট' (১৯৩১) ও 'এ্যাঙ্গার ইন্ ইয়ং চিল্‌ড্রেন' (১৯১৩), বুহলার্ এর 'দি ফার্স্ট ইয়ার অব লাইফ্' (১৯৩০) এবং ব্রিজেসের 'ইমোশন্যাল্ ডেভেলপ্‌মেন্ট ইন্ আর্লি ইন্‌ফ্যান্সি' (১৯৩২) দ্রষ্টব্য। বয়স্কদের অনুভূতির প্রকাশের অনুরূপ ছবি তুলে গেইটস্ দেখেছেন যে তাদের রূপ এত স্পষ্ট যে তাদের সম্বন্ধে ভুলের সম্ভাবনা খুব কম। শুধু যে প্রকাশভঙ্গীই স্পষ্ট ও বিভিন্ন (differentiated) হয় তা নয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়, বিস্তার ও বৃদ্ধি পায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির প্রকাশ গোপন করার অভ্যাসও বাড়ে। এটা আমাদের জটিল সমাজ-ব্যবস্থার ফলে না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু সোজাসুজি অনুভূতিগুলির প্রকাশ না হলেও, নানা সূক্ষ্ম ও "ভদ্র"-ভাবে ব্যক্তি সেগুলি প্রকাশের উপায় খোঁজে। "আবেগের সুস্পষ্ট প্রকাশ কমে আসার অনেক কারণ আছে। ভাষা এবং চিন্তার অন্যান্য প্রতীক্ ব্যবহারের দ্বারা শিশু তার অনুভূতি আরো সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করতে শেখে। তা ছাড়া শিশুর উপর সমাজেরও যথেষ্ট চাপ থাকে, বয়স্ক ছেলে-মেয়ের মত ব্যবহার করার আর

১৮ Gates—Psychology for Students of Education, P. 152

নিতান্ত 'কচি খুকী'র মত ব্যবহার না করায়। সমাজের চাপের ফলেই সূক্ষ্ম ও অপ্রত্যক্ষভাবে মনের আবেগ প্রকাশ করার অভ্যাসও সৃষ্টি হয়। এর জন্যে যখন শিশুর স্কুলে যাবার মত বয়স হয়, তখন তাঁর আবেগগুলি অনেক সময়ই অপ্রকাশিত বা গোপন থাকে। কিন্তু বাইরে আবেগের প্রকাশ না থাকলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আবেগের অনুভূতিও সেই অনুপাতে কমে যায়, তা নয়।"১৯

আবেগগুলি নির্দিষ্ট দৈহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষ করে চোখ মুখের ভঙ্গী, নিশ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, রক্তের চাপ, পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া হ্রাস ইত্যাদি দ্বারা। কোন্ কোন্ অবস্থা ঠিক কোন আবেগের প্রকাশক, এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা হয়েছে।* এ সব তথ্যের উপর নির্ভর করে দৈহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে কোন ব্যক্তি সত্য বা মিথ্যা বলছে কিনা তা নির্দ্ধারণ করবার জন্যে এক প্রকার যন্ত্র তৈরী হয়েছে, তার নাম 'দি লাই ডিটেক্টর'। অপরাধীদের বিচারের জন্যে এ যন্ত্রের ব্যবহার আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে কিছু কিছু হচ্ছে। †

আবেগ ও ভাব-প্রকাশের সম্পর্ক সম্বন্ধে জেমস্-ল্যাং এর সূত্র—James-Lange Theory of Emotions—অনুভূতির সঙ্গে তাদের প্রকাশ-ভঙ্গীর সম্বন্ধ কি? প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা অনুভূতির দৈহিক প্রকাশের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নি; তার 'মানসিক' বা ভাবের দিকটাই তাঁরা বিবেচনা করেছেন। ভয় কি, কি ভাব (বা ideas) বা কল্পনা (images) থেকে উদ্ভব হয়, এ কথাই তাঁরা আলোচনা করেছেন। বড় জোর এটা তারা বলেছেন ভয়রূপ অনুভূতির ফলে, চোখ মুখ শুকিয়ে যায়, গা কাঁপে, কান্না পায়, পালাতে প্রবৃত্তি হয়। অর্থাৎ, এই প্রকাশভঙ্গী অনুভূতির একটা বাহ্য ও অপ্রধান অঙ্গ বলে তাঁরা গণ্য করতেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। তাঁরা

১৯ Gates—Psychology for Students of education, P. 151.

* Munn—The effect of a knowledge of the Situation upon Judgment of emotion from facial Expressions; Dunlap—The role of Eye-muscles and mouth-muscles in the expression of the emotions; Frois—Wittmann—The judgment of Facial Expressions; Feleky—Feelings and Emotion ইত্যাদি পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† Inborn—Detection and Criminal Interrogation.

অনুভূতির দৈহিক প্রকাশকে গৌণ বা অপ্রধান বলে মনে করেন না। এ সম্বন্ধে আমেরিকার উইলিয়ম জেমস্-এর মতবাদ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক চমক সৃষ্টি করে। প্রায় কাছাকাছি সময়েই সুইডিস্ আর একজন দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ল্যাং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অনুরূপ সিদ্ধান্তেই পৌছেন। তাঁদের মতবাদের মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে এবং তাই অনুভূতি এবং তার দৈহিক প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে নূতন মতবাদ তাঁদের যুক্ত নাম বহন করে', 'জেমস্-ল্যাং থিয়োরী অব ইমোশনস্' নামে পরিচিত হয়ে আছে।

আমরা বলি, সুনন্দা রাগ করেছে মানে তার সখ-করে-কেনা শ্যাণ্ডাল জোড়ার দুর্দশা দেখেছে বা কল্পনা করেছে, ক্ষতিটার পরিমাণ অনুমান করে তার আবেগ জেগেছে, এবং আবেগটা প্রকাশ পেয়েছে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারে, আর তার দাদার সার্টটা পায়ের নীচে মাড়িয়ে দিয়ে। জেমস্ বললেন—অনুভূতির এ বিশ্লেষণটা একেবারে ভুল। অনুভূতিগুলি হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ে, তারা অভিভূত করে ফেলে। তখন বিচার বিবেচনার অবসর নেই। উত্তেজক অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ দৈহিক পরিবর্তনগুলি দেখা দেয়. এবং এই দৈহিক পরিবর্তনগুলির বোধই হচ্ছে অনুভূতি। এই আকস্মিক দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে বাদ দিলে অনুভূতির কিছুই বাকি থাকে না। অনুভূতিগুলি হচ্ছে অন্ধ আবেগের তড়িৎস্ফুরণ, তার "মানে না মানা," তারা অনিবার্য-উত্তেজক অবস্থায় দেহযন্ত্রের যান্ত্রিকও চিন্তাহীন তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া। কাজেই, রাগ করি বলে, চীৎকার করি, এ কথাটা সত্য নয়, বরং বলা উচিত চীৎকার করি বলে রেগে যাই। দৈহিক পরিবর্তনটা অনুভূতির পরিণাম নয়—অনুভূতির পূর্বাবস্থা এবং তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। উইলিয়ম্ জেমস্ বলছেন "এই স্থূল আবেগগুলি সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক ধারণা হচ্ছে যে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার ফলে মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যাকে আমরা বলি আবেগ এবং এই মানসিক আবেগ কতগুলি দৈহিক প্রকাশের কারণ। **আমার মত হচ্ছে এর বিপরীত; তা হচ্ছে যে উত্তেজক ঘটনার প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই শারীরিক পরিবর্তনগুলি সাধিত হয় এবং এই দৈহিক পরিবর্তনগুলি সংঘটনের সঙ্গে যে অনুভূতি তাকে বলা হয় আবেগ।**

সাধারণ বুদ্ধি বলে' বিত্তনাশ হলে আমরা দুঃখিত হই ও অশ্রু বিসর্জন করি; হঠাৎ একটি ভল্লুক দেখে ভয় পাই ও পলায়ন করি; প্রতিদ্বন্দ্বী আমাকে অপমান করে, তাতে ক্রোধ জন্মে ও তাকে আঘাত করি। কিন্তু যে মত আমি প্রতিষ্ঠা

কর্তে যাচ্ছি, তাতে বলে', ঘটনার এ পারম্পর্য ভুল। বরং যুক্তি-সংগত ভাবে এ কথা বলা উচিত যে একটি মানসিক ক্রিয়া আর একটির পর তৎক্ষণাৎ দেখা দেয় না, এ দুয়ের মাঝখানে থাকে দৈহিক পরিবর্তনগুলি, এবং অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত উক্তি হচ্ছে, আমরা অশ্রুবিসর্জন করি বলেই দুঃখবোধ করি, কাঁপি বলেই ভয় পাই ; দুঃখিত হই বলেই কাঁদি, রাগ করি বলে আঘাত করি, ভয় পাই বলে কাঁপি এ কথাগুলি ঠিক নয়।

শরীরের প্রত্যেকটি পরিবর্তন, তা সে যাই হোক, যে মুহূর্তে ঘটে তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আমরা বোধ করি। যদি কোন তীব্র আবেগের কথা কল্পনা করি এবং আমাদের এ কল্পনা থেকে দৈহিক লক্ষণগুলির সমস্ত অনুভূতিগুলি যদি বিচ্ছিন্ন করে নি, তা হ'লে দেখি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; থাকে না এমন কোন মানসিক পদার্থ বা উপাদান যা থেকে আবেগগুলি তৈরী হতে পারে। আবেগ থেকে দৈহিক পরিবর্তনের বোধ বাদ দিয়ে যা থাকে, তা নিতান্ত উত্তাপহীন বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষজ্ঞান মাত্র।......দৈহিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যাই তা হলে তীক্ষ্ণ বা সূক্ষ্ম সমস্ত অনুভূতির জগৎ থেকেই আমার চির-নির্বাসন ঘটবে এবং শুদ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানের নীরস অস্তিত্বই শুধু বহন করে চলব।"[২০]

ল্যাং বলছেন "আমাদের সমগ্র আবেগের অনুভূতি, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনার মুহূর্তগুলির জন্য দায়ী দেহের নাড়ি ও সক্রিয় পেশীমণ্ডলী (vaso-motor system)। যদি দেহের এ যন্ত্রমণ্ডলীকে আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তুগুলি ক্রিয়মান না করে তুলতে পারতো, তা হ'লে সমস্ত জীবনটাই আমাদের কেটে যেতো সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও নিরালম্ব অবস্থায় ; বাহ্য জগতের বস্তুরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ছায়া ফেলে অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট করে, জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করতো—এই

২০ Our natural way of thinking about these coarser emotions is that the mental perception of some fact excites the mental affection called the emotion, and that this latter state of mind gives rise to the bodily expression. *My theory on the contrary, is that the bodily changes follow directly the perception of the exciting fact, and that our feeling of the same changes as they occur in the emotion.* Commonsense says, we lose our fortune, are sorry and weep ; we meet a bear, are frightened and run ; we are insulted by a rival, are angry and strike. The hypothesis here to be defended says that this order of sequence is incorrect, that the more rational statement is that, the one mental state is not immediately induced by the

পর্যন্তই ; কিন্তু আমরা আনন্দে চঞ্চল বা ক্রোধে বিচলিত হ'তুম না, দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়তুম না, বা ভয়ে দিশাহারাও হতুম না।[২১]

জেমস্-এর এ নূতন মত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু দিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সে সব সাময়িক সমালোচনায় যতটা উত্তাপ ছিলো ততটা আলো ছিল না। আজ এতদিন পর এবং নানা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের নিরিখে জেমস্-এর মতবাদের সুবিচার করা সম্ভব হবে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় জেমস্ এর মতবাদ প্রকাশের মধ্যে কিছুটা অতিভাষণ রয়েছে। আবেগের পেছনে কোন ভাব থাকে না এবং আবেগ ও তার দৈহিক প্রকাশ (organic and visceral sensations) অভিন্ন, তার মতবাদের এই দুটি মূল কথাই অ-প্রমাণিত রয়ে গেছে। তবে অনুভূতির সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনগুলির সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ এ কথাটা না মেনে উপায় নেই। আবেগের মধ্যে একটা আকস্মিকতা এবং অ-যৌক্তিকতা রয়েছে, এটাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েচে। যাক্, জেমস্এর মতের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি বিবেচনা করে দেখা যাক্।

১। জেমস্এর একটা প্রধান যুক্তি এই যে, আবেগগুলিকে তাদের দৈহিক প্রকাশের থেকে আলাদা করে চিন্তা করতে পারা যায় না, কাজেই তারা অভিন্ন। এটা খুব সুযুক্তি নয়। একটা আমকে তার ওজন বাদ দিয়ে কল্পনা করতে পারি না, তাই ব'লে প্রমাণ হোল না যে আম আর তার ওজন একই জিনিষ। ষ্টাউট্ ঠিকই বলছেন, "একটা পাথরের টুকরো ঢেউ সৃষ্টি না করে জলে পড়তে পারে না, তাই বলে ঢেউ আর পাথর এক নয়।"[২২]

other, *that bodily manifestation must first be interposed between and that the more rational statement is that we feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble*, and not that we cry, strike or tremble, because we are sorry, angry, or fearful, as the case may be............... *Every one of the bodily changes, whatsoever it be, is felt, acutely, or obscurely the moment it occurs...If we fancy some strong emotion, and then try to abstract from our consciousness of it all the feelings of the bodily symptoms, we find we have nothing left behind*, no 'mind-stuff' out of which the emotion can be constituted, and that a cold and neutral state of intellectual perception is all that remains...If I were to become corporeally anaesthetic. I should be excluded from the life of the affections, harsh and tender alike, and drag out an existence of merely cognitive or intellectual form. Wm. James—Principle of Psychology, Vol. II, P. 440.

২১ Titchener—A Text book of Psychology P. 475.

২২ Stout—Manual of Psychology, P. 366.

২। জেমস্ এর মতে আবেগের পেছনে কোন ভাব বা কল্পনা (ideas or images) থাকে না। একটা বিশেষ অবস্থায় দেহের তৎক্ষণাৎ কতগুলি পরিবর্তন ঘটে। দেহ-যন্ত্র যেন একটা সুরে-বাঁধা অনেকগুলি তারওয়ালা বীণ, (জেমস্ বলছেন sounding board), অন্য যন্ত্রে বিশেষ একটা সুর উঠলে তাতে আপনিই অনুরূপ একটা সুর বেজে ওঠে। ছম্‌ছমে অন্ধকারে শ্মশানের কাছ দিয়ে যেতে হঠাৎ গা শিউরে ওঠে, জিব শুকিয়ে আসে, সেই হোল ভয়। ভয়ের (চিন্তা) থেকে ভয় হয় না। ভাবটা যদি আসে, সেটা আসে অনুভূতির পরে। তিনি বলেন, জ্বরের বিকার অবস্থায় কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও রোগী ভয় পায়; এটা হয় এজন্যে যে, ভয়ের সঙ্গে যুক্ত দৈহিক পরিবর্তনগুলি ঘটে গেছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় কথাটা ঠিক নয়। নির্জন অন্ধকারে শ্মশানের কাছ দিয়ে আসতে গেলে কতগুলি ভাব বা কল্পনা মনে আসে বলেই ভয় হয়। যদি না জানা থাকে যে জায়গাটা শ্মশান, তবে তো অমন ভয় হয় না। গলায় শেকল বাঁধা ভালুক দেখলে আমোদ লাগে, কিন্তু খোলা অবস্থায় সেই ভালুকই মনে জাগায় ভয়। তা হ'লে দৈহিক পরিবর্তনগুলি কি ভাব-নিরপেক্ষ, এবং যান্ত্রিকভাবে হচ্ছে? তা নয়। ওয়ার্ড তাই ঠাট্টা করে বলেছেন, জেমস্‌কে একবার দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাক্ খাঁচায় বদ্ধ ভালুকের সামনে, আবার তিনি সামনে পড়ুন এক মুক্ত বন্য ভালুকের: প্রথমবার তিনি হয়তো জন্তুটাকে খেতে দেবেন মিষ্টি একটি পিঠে আর পরের বার লাগাবেন চোঁ চাঁ দৌড়।"[২৩]

৩। জেমস্ বলেন, কৃত্রিম উপায়ে দৈহিক পরিবর্তনগুলি ঘটাতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি দেখা দেয়। অভিনেতারা কখনো কখনও সত্যি সত্যি আবেগের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েন। তা ছাড়া মদ খেলে, লোক দুঃখ ভুলে যায়, খুব খোস্-মেজাজ হয়, ভাং খেলেও কেবল হাসি পায় এবং মনটা হাল্কা লাগে। এ সব ক্ষেত্রে ভাবের উপরে আবেগ নিভর করে না। মদখোর, পুত্রশোক ভুলে হৈ-হল্লা করে। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা অনেক সময় সত্য মনে হয়। কিন্তু এটা দেখা যায়, মদখোর বা ভাংখোর যখন আনন্দ প্রকাশ করে, তখন সেই অনুভূতির অনুকূল কতগুলি ভাবও তার মনে আসে। অভিনেতা দুঃখের অভিনয়ে যখন কেঁদে আকুল হন, তখন শোক ও দুঃখের উপযোগী ভাবও তার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। তা ছাড়া অভিনেতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুভূতির দৈহিক প্রকাশকে যখন রূপ দিচ্ছেন তখন নিজে সেই অনুভূতির দ্বারা

২৩ Ward—Psychological Principles.

আচ্ছন্ন হন না; তিনি সচেতন থাকেন যে তিনি 'অভিনয়ই' কচ্ছেন। স্নায়ু দেহে স্ট্রিকনিন্ বা এ্যাড্রেনালিন্ ইন্‌জেক্‌সন্ করার পরে অনেক সময় অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে যাদের ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হোল তারা বলে "কেমন যেন ভয় ভয় কচ্ছে।" এটাকে বলি ইমোশ্যন্যাল মুড্, (emotional mood), এটা ঠিক ইমোশ্যান (emotion) নয়। এই ঔষধ বা নেশাগুলি অনুভূতি সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই। যাদের স্ট্রিকনিন্ ইন্‌জেক্‌সন্ করা হোল, তাদের "মনটা কেমন যেন ভারী লাগে, কান্না পায়"। যদি ইন্‌জেক্‌সন্ করার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের কাছে দুঃখ ও শোকের গল্প বলা যায়, তখন তারা অনেক সময়ই আকুল শোকে ভেঙে পড়ে। মানুষের উপর এ্যাড্রেনিন্ প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে কতকগুলি নির্দিষ্ট দৈহিক লক্ষণ যথা, নাড়ীর দ্রুতগতি, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, হাত পা গলার স্বরের কম্পন ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। এরকম ব্যক্তিরা সাধারণত বলে, তারা 'নার্ভাস' বোধ কচ্ছে, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ কচ্ছে, চাপা উত্তেজনা বোধ কচ্ছে, কিছু একটা ঘটবে বোধ কচ্ছে।......আবার কেউ কেউ আর একটু অগ্রসর হয়ে বলে, তারা যেন বোধ কচ্ছে খুব একটা বড় আনন্দ আসবে, অথবা যেন তাদের কান্না পাচ্ছে, কিন্তু কেন তা তারা জানে না। তারা স্বীকার করে তাদের একটা 'যেন-যেন' অনুভূতি হচ্ছে, যেটা সত্যিকারের আবেগ নয়, কিন্তু যতক্ষণ এই এ্যাড্রেনিনের প্রভাব থাকছে ততক্ষণ সাধারণ অবস্থার চেয়ে সহজে তারা ভয় পায়।" [২৪]

৪। যদি অনুভূতির প্রকাশক দৈহিক পরিবর্তনগুলি কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ করা যায় তা হলে অনুভূতিও লোপ পায়। যে রেগে-মেগে চীৎকার কচ্ছে, তাকে অজান্তে পেছন থেকে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও, তার রাগও 'জল' হয়ে যাবে। ভয়ে কাঁপছে দেবযানী। মা তাকে জড়িয়ে ধরে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তার কাঁপুনী থামিয়ে দিলেন, তার ভয়ও গেলো উবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে শুধু দৈহিক প্রকাশটাই বন্ধ করা হচ্ছে না, ভাবটাও সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে বলেই অনুভূতিও বদলাচ্ছে? মা'র কোলে বসে দেবযানী ভাবছে সে নিরাপদ তাই না তার ভয় ভেঙেছে?

জেমস্ তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন তার প্রধান কয়টি আমরা আলোচনা করেছি। তা ছাড়াও জেমস্-এর মতের বিরুদ্ধে আরো নানা যুক্তি ও পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

২৪ Woodworth—Psychology P. 422.

জেমস্-এর আবেগ সম্বন্ধে নূতন মতবাদের মূল কথাটি যে আবেগের সঙ্গে কতগুলি দৈহিক সামগ্রিক পরিবর্তন (mass of organisations) অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, এটা সমর্থন করলেও ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ তিনটি বিষয়ে জেমস্-এর মতের সমালোচনা করেছেন। (১) জেমস্ বলেছেন, কোন উত্তেজক ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ কতগুলি দৈহিক (বিশেষতঃ আন্ত্রিক) পরিবর্তন ঘটে এবং সেই পরিবর্তনের অনুভূতিই হচ্ছে আবেগ। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ বলেন, ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করতে হবে, এমন কথা নেই, তার স্মৃতি ও কল্পনাও আবেগ সৃষ্টি করতে পারে। দৈহিক পরিবর্তন ব্যতীত এবং তার পূর্বেও কোন স্মৃতি বা কল্পনা মনে আসতে পারে, এবং তা আবেগ জাগাতে পারে (২) ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করা মাত্রই যান্ত্রিকভাবে দৈহিক পরিবর্তন সুরু হবে, এটা ঠিক নয়। সে ঘটনা বা বস্তু মনে কোন ভাব (ideas) না জাগালে আবেগ আপনি আসতে পারে না। ঘটনার তাৎপর্য্যবোধ হওয়া চাই, তবেই আবেগ সৃষ্টি হ'তে পারে। (৩) জেমস্-এর মতের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে যে আবেগের মূল যে সহজাত কর্মমুখীনতা (strong conative tendency), এ কথাটা জেমস্ বলতে পারেন নি। বাঘ দেখে ভয় পাই, তার কারণ বাঘ দেখাটা পলায়নের প্রবৃত্তিকে (instinct of escape) জাগ্রত করে, তাই তার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত যে আবেগ, ভয়, তা দেখা দেয়।

ষ্টাউটও অনুরূপ অভিযোগ কচ্ছেন, "জেমস্-এর মতবাদ যে অবস্থায় আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে, তার সঙ্গে আবেগের পেছনে যে সুস্পষ্ট সহজাত কর্মমুখীনতা আছে, তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটির কথা উপেক্ষা করে। এ মতবাদ অনুযায়ী মা-বেড়ালের কাছ থেকে বাচ্চা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এটা দেখাটাই মা-বিড়ালের ক্রোধ উদ্রেকের কারণ, মাতৃস্নেহের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু স্পষ্টতই এখানে এই আবেগের অবস্থার মূল কারণ হচ্ছে যে মাতৃ-স্নেহরূপ সহজাত সংস্কার এখানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।"[২৫]

জেমস্ আবেগ এবং ছড়ানো সামগ্রিক দৈহিক পরিবর্তনকে অভিন্ন মনে করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। ক্ষুধা, পেটব্যথা ইত্যাদিও ছড়ানো সামগ্রিক পরিবর্তন বটে, কিন্তু তারা আবেগ নয়। আবার জেমস্-এর মত অনুযায়ী প্রত্যেক আবেগের মূল কতগুলি নির্দিষ্ট ও বিভিন্ন সামগ্রিক দৈহিক এবং আভ্যন্তরিক অন্ত্রাদির আলোড়ন (organic and visceral disturbances), কিন্তু দেখা যায় ভয়েও কান্না পায়, রাগেও কখনো চোখে জল আসে, দুঃখে তো

২৫ Stout—A Manual of Psychology, P, 308.

আসেই। রাগ ও ভয়ের দৈহিক ও আন্ত্রিক আলোড়ন (**organic & visceral disturbances**) অনেকটা একই রকম, কিন্তু অনুভূতিগুলি মোটেই এক নয়। ক্যাননূ দেখিয়েছেন লম্বা দৌড়ের প্রতিযোগীর দেহাভ্যন্তরস্থ গ্রন্থি ও অন্ত্রের পরিবর্তন আর ভীত মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তন একই রকমের।

জেমস্ এর মতের বিরুদ্ধে সব চেয়ে মারাত্মক যুক্তি এসেছে শেরিংটনের (**Sherrington**) কতগুলি পরীক্ষা থেকে। শেরিংটন্ একটা কুকুরের মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচার করে সিম্প্যাথেটিক্ সিস্টেম এর স্নায়ু ইত্যাদির (যা দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ রক্ত চলাচল, পরিপাকক্রিয়া, অন্ত্রাদির পরিবর্তন ইত্যাদি চালিত হয়) সঙ্গে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের (যা দ্বারা বুদ্ধি ইত্যাদির ক্রিয়া সম্পন্ন হয়) সংযোগ ছিন্ন করে দিলেন। জেমস্ এর মত সত্য হ'লে এই জীবটির অনুভূতিগুলি লুপ্ত হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, এই কুকুরটি আগের মতই রাগ, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশে সক্ষম। এর থেকে শেরিংটন্ সিদ্ধান্ত করছেন "জেমস্ এর সঙ্গে এ মত গ্রহণ করতে পারি যে দেহের সামগ্রিক সংবেদন (**organic sensations**) ও দেহাভ্যন্তরস্থ আন্ত্রিক পরিবর্তন এবং সেগুলির স্মৃতি ও সংযোগগুলি মৌলিক আবেগ সৃষ্টির সহায়ক এবং আবেগগুলিতে শক্তি সঞ্চার করে (**re-inforcing**) কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এগুলি আবেগ সৃষ্টি করে না।"[২৬] অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তনগুলি অনুভূতিগুলির আনুষঙ্গিক লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু তারা অনুভূতির মূল কারণও নয়, অনুভূতির সঙ্গে অভিন্নও নয়। আবেগ হচ্ছে 'অনুভূতি'র প্রকাশ, তাকে দেহের সামগ্রিক সংবেদন (organic sensation) মনে করলে ভুল করা হবে। "জেমস্ এর মতের মারাত্মক দুর্ব্বলতা হচ্ছে যে এতে আবেগগুলিকে জটিল দৈহিক পরিবর্ত্তন মাত্র বলে মনে করা হয়। আবেগ হচ্ছে, তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রকাশ। আবেগ কেবল বাইরের থেকে বিভিন্ন প্রভাব গ্রহণমাত্র নয়, আবেগ হচ্ছে বাইরের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া।[২৭] জেমস্ ও ল্যাং যখন মনে করেছেন আভ্যন্তরীন অন্ত্রাদি ও পেশী ইত্যাদি থেকে বহির্গামী নাড়ী (**afferent nerves**) বাহিত আলোড়ন আবেগ সৃষ্টির প্রধান উপাদান, তখন তারা ভুল করেন নি। কিন্তু যখন তাঁরা বললেন এগুলিই আবেগের যথেষ্ট এবং একমাত্র কারণ, তখন

২৬ Shorrington—The Integrativo Action of the Nervous System. P. 259-61.

২৭ Sandiford—Educational Psychology, P. 132.

প্রকৃতঃই তাঁরা ভুল করলেন। আবেগ হচ্ছে একজাতীয় প্রতিক্রিয়া এবং তাতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল ও দেহের উপান্তবর্তী অন্যান্য অংশও সমান অংশ গ্রহণ করে থাকে।"[২৮]

ক্যানন, শেরিংটন ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের সমালোচনা বিবেচনা করে এবং নিজেও নানা পরীক্ষা করে জেমস্ এর মতের পরিবর্তে আর একটি মত প্রবর্তন করলেন। তাঁর মতে অন্ত্র ও ভ্যাসোমোটর মণ্ডলীর পরিবর্তনকে জেমস্ আবেগের কারণ বলেছেন, তা ঠিক নয়। মধ্য মস্তিষ্কের মধ্যে হাইপার-থ্যালামাস্ এর প্রভাবেই আবেগের প্রকৃত কারণ। এ মতবাদ জেমস্ এর মতবাদের কতগুলি ত্রুটি নিবারণে সক্ষম হলেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। হাইপার-থ্যালামাস্ এবং সংশ্লিষ্ট নার্ভগুলির ক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর অথচ আবেগ সৃষ্টি হয় তড়িৎগতিতে। তা ছাড়া আবেগ সৃষ্টিতে উর্দ্ধ-মস্তিষ্কের দায়িত্ব আছে। একথা স্বীকার করতেই হবে আবেগ একটা অন্ধ জৈবক্রিয়া নয়।

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি, আবেগ আবেগপূর্ব অনুভূতি, বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রস, ইমোশ্যনাল্ ডিস্পোজিস্যান, টেম্পারামেণ্ট-Sense-feelings, Emotions, Emotional moods, Sentiments, Emotional dispositions, Temperaments.

অনুভূতি বোঝাতে নানা রকম নাম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সে নামগুলির অর্থ অনেক সময় সুনির্দিষ্ট নয়। সাধারণতঃ অনুভূতির নানা স্তর বোঝাতে যে নামগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি-Sense feeling—টক্‌টকে লাল রং দেখে শিশু খুসী হয়,—তেতো কুইনিন খেলে বিরক্ত হয়। এ রকম প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত যে অনুভূতি, তাদের বলা হয় ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি। এরা হচ্ছে সব চেয়ে নীচু জাতের অনুভূতি। এরা ভাব বা কল্পনা দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়।

আবেগ-Emotion—ভাব বা কল্পনা দ্বারা প্রভাবান্বিত, উত্তেজক অবস্থার সম্মুখীন, কোন দ্রব্য বা ঘটনাকে উপলক্ষ করে অনুভূতির অত্যন্ত প্রকাশমান অবস্থা, যাকে বলেছি আবেগ, যেমন রাগ, ভয় ইত্যাদি। এ অবস্থাগুলি সাধারণতঃ ক্ষণস্থায়ী।

আবেগপূর্ব অনুভূতি—Emotional mood—অনুভূতির অস্পষ্ট অবস্থা; যেখানে তখনও কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনুভূতি দানা

২৮ Thouless—General and Social Psychology. P. 88.

বেঁধে উঠেনি, তাকে বলা হয় 'ইমোশনাল্ মুড্' (emotional mood)। বিরক্তির মেঘ জমছে, এখনও কোন উপলক্ষ করে তা ফেটে পড়েনি, এ অবস্থা, অথবা রাগটা নিঃশেষে প্রকাশ হয়ে যেখানে মনটা সম্পূর্ণ পাৎলা হয়ে যায়নি, সে অবস্থা, তাকে বলা হয় মুড্; এ অবস্থা সাধারণতঃ আবেগের চেয়ে দীর্ঘতরই কাল স্থায়ী।

বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রস-Sentiment—কথাটা মনোবিজ্ঞানীরা সবাই একই অর্থে ব্যবহার করেন না। এ কথাটার মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। রিবো (Ribot), সেন্টিমেণ্ট কথাটা সমস্ত অনুভূতির সাধারণ নাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রাচীনেরা মানসিক জীবনের উচ্চস্তরের ভাব (highly developed abstract ideas) সংযুক্ত অনুভূতিকে বলতেন সেন্টিমেণ্ট। কাজেই উচ্চ চিন্তায় (conceptual thinking) অসমর্থ শিশুর জীবনে বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রসের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতেন না। সেন্টিমেণ্ট্‌গুলি ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্কশূন্য।

আবেগগুলি তা নয়। রাগ, ভয় এগুলি আবেগ। এদের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। আবেগের দৈহিক প্রকাশ অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভূতিতে তা নয়। (আবেগ হচ্ছে অনুভূতির উত্তপ্ত উত্তাল অবস্থা। কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভূতি হচ্ছে শান্ত।) মনের তিনটি প্রধান মৌলিক ভাগ অনুসারে বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলিকে তাঁরা বুদ্ধিগত বিশুদ্ধ অনুভূতি (Intellectual sentiments), সৌন্দর্য্যানুভূতি (Aesthetic sentiment), ও নৈতিক অনুভূতি (Moral sentiments) এই তিন দলে ভাগ করতেন। বুদ্ধিগত বিশুদ্ধ অনুভূতিতে যেমন,—বিদ্যানুরাগ। যেখানে মানুষের বিচার বুদ্ধির (logical thinking) নির্বাধ ব্যবহার, সেখানে শিক্ষিত মানুষ গভীর আনন্দ পায়। সৌন্দর্য্যানুভূতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্জিত রুচি বা সৌন্দর্য বুদ্ধির তৃপ্তি। যেমন, সেন্টিমেণ্ট অব দি সাবলাইম্ (sentiment of the sublime) এবং সেন্টিমেণ্ট অব দি লুডিক্রাস্ (sentiment of the ludicrous)। বিরাট বা মহানের সম্মুখে মানুষের যে ভয়মিশ্রিত গভীর প্রশান্ত আনন্দ,—তাকে বলা হয় সেন্টিমেণ্ট অব দি সাব্‌লাইম, আর এর বিপরীত হচ্ছে সেন্টিমেণ্ট অব দি লুডিক্রাস কিম্ভুত-কিমাকার, হাস্যকর দ্রব্য বা অবস্থার সম্মুখে আমাদের যে অনুভূতি,—যাতে আছে কিছু কৌতুক, কিছু কিছু অশ্রদ্ধা। নৈতিক অনুভূতি হচ্ছে নীতি বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ-নিষ্ঠা, মহতের প্রতি আকর্ষণ এবং

নীচতার প্রতি বিরূপতা। আবার আছে রেলিজিয়স্ সেন্টিমেন্ট (**Religious sentiment**) বা ঈশ্বরানুভূতি। যা হচ্ছে ধর্মজীবনের ভিত্তি। বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলি অনেক সময়ই একাধিক ভাব ও অনুভূতির মিশ্রণ।

বর্তমানে সেন্টিমেন্ট কথাটা কিছুটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুকেন্দ্র ভাব-পুষ্ট উন্নত অনুভূতির স্থায়ী অবস্থাকে বলা হয় সেন্টিমেন্ট। সেন্টিমেন্টে এর প্রকাশ হয় কতগুলি ক্ষণস্থায়ী আবেগ। কতগুলি ভাবসম্পদ পুষ্ট বস্তু বা অবস্থা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আবেগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন মায়ের মনে শিশুকে ঘিরে বিচিত্র ভাব-সংশ্লিষ্ট স্থায়ী অনুভূতির কেন্দ্র বর্তমান। এটা হচ্ছে শিশুর সম্বন্ধে মার বিশুদ্ধ অনুভূতি। এ অনুভূতি অবস্থা বিশেষে ভয়, রাগ আনন্দ নানা আবেগের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। স্যাণ্ড (**Shand**) তাই বলছেন, "আবেগ হচ্ছে বিশুদ্ধ ভাব জীবনের চমকপ্রদ ঘটনা।"[২৯] ম্যাকডুগ্যাল প্রত্যেক আবেগকে যুক্ত করেছেন একটি সহজাত সংস্কারের সঙ্গে। তাই বিশুদ্ধ অনুভূতি তাঁর মতে একাধিক সহজাত সংস্কারের মিশ্রণে এক একটি যৌগিক অবস্থা। "সহজাত অন্ধ কর্মপ্রেরণাগুলি কেন্দ্রীভূত হয় বিশুদ্ধ অনুভূতিতে।"[৩০]

বিশুদ্ধ অনুভূতি উন্নত মানসিক অবস্থার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বস্তু-বিবর্জিত নয়; সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বার্থ-সম্পর্ক-শূন্যও নয়, ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতে। তিনি বলছেন, "কতগুলি বিশিষ্ট দ্রব্য সম্পর্কে ব্যক্তির কতগুলি আবেগ বা ইচ্ছা অনুভব করবার প্রবণতাকে বলা যায় সেন্টিমেন্ট। এগুলি হচ্ছে স্থায়ী অনুভূতি-প্রবণতা, যা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।"[৩১] বেণ্টলীও প্রায় এক কথাই বলেছেন, "কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে আবেগ সমষ্টি আবর্তিত হয়। এই আবেগ-সমষ্টির স্থায়ী মানসিক মূলকে বলা যায় বিশুদ্ধ অনুভূতি।" আবেগ বা বিশুদ্ধ অনুভূতির কার্য্যকারিতার দিকে ঝোঁক (**conative tendency**) আছে। এ বিষয়ে মর্টন্ প্রিন্সও ম্যাক্‌ডুগ্যালের সমর্থক। কিন্তু তিনি এর ভাবমূল (ideal origin)-এর দিকে জোর দেন। তিনি বলছেন, "বিশুদ্ধ অনুভূতি হচ্ছে সহজাত সংস্কারের সঙ্গে শৃংখলিত ভাব।"[৩২] জেমস্ কিন্তু ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতের সমর্থক নন। তিনি আবেগ ও সেন্টিমেন্টের

---

২৯ **Shand—The Foundation of Character.**

৩০ **McDougall—Outline of Psychology, P. 48.**

৩১ **McDougall—Outline of Psychology, P. 419.**

৩২ **Morton Prince Quoted by J. S. Ross—Ground work of Edu. Psychology. P. 122**

অনুভূতির দিক (feeling element)-এর ওপর জোর দেন। তা সহজাত সংস্কার হতে উদ্ভূত এবং সহজাত সংস্কারের সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত, এ কথা তিনি স্বীকার করেন না। সেন্টিমেণ্ট কথাটা ম্যাকডুগ্যাল ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীরা যে অর্থে ব্যবহার কচ্ছেন তা প্রায় ষ্টাউটএর 'মেণ্টাল ডিস্‌পোজিশ্যন্' কথার সমার্থক। কিন্তু ষ্টাউট সেন্টিমেণ্ট কথাটা অনুভূতির উন্নততর ভাবপুষ্ট অবস্থা অর্থেই ব্যবহার করেছেন এবং তার মূল সহজাত সংস্কারে, এ কথাটা তিনিও জেমস্‌এর মত স্বীকার করেন নি।[৩৩]

রস্ প্রায় ম্যাক্‌ডুগ্যালের প্রতিধ্বনিই করেছেন। তাঁর মতটা নীচে দেওয়া হোল।[৩৪]

বিশুদ্ধ অনুভূতি ও চরিত্র (Sentiment and character)—শিশুর জীবনে বিশুদ্ধ অনুভূতির বিকাশ ধীরে ধীরে হয়,—কারণ এটা বুদ্ধি, বিচার ও তুলনা সাপেক্ষ। আবার বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলি সমান বস্তুনিরপেক্ষ বা সমান সর্বগ্রাহী নয়। মা শিশুর কাছে বহু আবেগের কেন্দ্র, সুতরাং বলা যায় মার সম্বন্ধে তার মনে শিশুকালেই বিশুদ্ধ অনুভূতি জন্মে। প্রথম অবস্থায় এ অনুভূতি একটি বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, তাই এটা বস্তুগত (concrete) ও বিশিষ্ট (particular)। তার পরে শিশু মাতৃ-সমাদের শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভয়, আশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ আবেগের কেন্দ্র বলে ভাবতে শেখে, সুতরাং এও একটা বিশুদ্ধ অনুভূতি। কিন্তু এ অনুভূতি, বিশেষকে নিয়ে নয়, এক জাতীয় বহুকে নিয়ে; কিন্তু এখানে সেই বহুরাও জীবন্ত ব্যক্তি—কাজেই বাস্তব, concrete। তাই বলা যেতে পারে এ অনুভূতি হচ্ছে বাস্তব—অথচ বহুকে নিয়ে (concrete-universal)। কিন্তু শিশুর চিন্তার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিও বস্তুকে

৩৩ Stout—Manual of psychology, P. 375-379.

৪৩ "What then is a sentiment? Liko a complex, it is an acquited organisation of despositions in the mental structure, the only distinction being one of degree. Sentiment is the name we give to a complex at a certain level of development. When a complex acquires a certain degree of stability, when it becomes an important part of the mind, we call it a sentiment. We speak for example of a sentiment of hatred but of a feeling or emotion of anger, the difference being that the sentiment is a permenant part of ourselves, while the emotion or the feeling is merely a passing experience.

J. S. Ross—Groundwork of Edn. Psychology. P. 121.

(concrete objects) অতিক্রম করে, বস্তুহীন ভাবে পৌছে। তখন বিশুদ্ধ অনুভূতি মাকে নিয়ে নয়, মাতৃ-সমাদের নিয়েও নয়—মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে। নিতান্ত শিশুর জীবনে এ পরিণতি সম্ভব নয়—এ অবস্থা অত্যন্ত উচ্চ চিন্তার পরিচায়ক। চরিত্র সৃষ্টির মানেই হচ্ছে এ রকম কয়েকটি ধ্রুব উচ্চ আদর্শকে কেন্দ্র করে জীবনের নিয়ন্ত্রণ।

স্থায়ীভাব ও ধাত—Emotional disposition, Temperament—কোন লোককে বলি রাগী, কাউকে বলি প্রেমিক, তার মানে কি তারা সব সময় রেগেই আছে বা শুধুই প্রেম করে বেড়াচ্ছে? তা নয়। রাগী হচ্ছে তেমন প্রকৃতি বা ধাতের মানুষ যারা অল্প কারণে রেগে যায়, প্রেমিক হচ্ছে, যার প্রকৃতি হচ্ছে, সহজে মানুষকে ভালবাসা। এগুলিকে বলতে পারি তাদের স্থায়ী ভাব (disposition) বা ধাত (temperament)। এদিয়ে স্থায়ী প্রকৃতি বোঝায়। ডিস্‌পোজিসান কথাটা কেউ কেউ স্যাণ্ড (Shand) যে অর্থে সেন্টিমেণ্ট কথাটা ব্যবহার করেছেন, সে অর্থেও ব্যবহার করে থাকেন। ষ্টাউট ইম্যোস্যান্, ইম্যোস্যনাল মূড্, ইম্যোস্যনাল্ ডিস্-পোজিস্যন ও সেন্টিমেণ্টের প্রভেদ এ ভাবে কচ্ছেন।

"আবেগ (emotion) হচ্ছে একটি বাস্তব সচেতন অবস্থা। ডিস্‌পোজিস্যন্ হচ্ছে কোন বস্তু সম্বন্ধে কতগুলি আবেগ অনুভব করবার স্থায়ী প্রবণতা। মূড্ ও ডিস্-পোজিস্যন্ এক জিনিষ নয়। মূড্ হচ্ছে একটা অস্পষ্ট অথচ সচেতন অনুভূতির অবস্থা কিন্তু ডিস্‌পোজিস্যন্ হচ্ছে একটা স্থায়ী ভাব, যেটা থাকছে যখন ইম্যোসন্ বা মূড্ অনুভূতি হচ্ছে না, তখনও। বিশুদ্ধ অনুভূতি বা সেন্টিমেণ্টের সংজ্ঞা কখনো এভাবে দেওয়া হয়—একটি ভাবকে কেন্দ্র করে ইম্যোস্যনাল ডিস্-পোজিস্যন্‌গুলির সংস্থিতি।"[৩৫]

আবেগের বিশ্লেষণ—Analysis of Emotions—জাতবিজ্ঞানী ডারুইন রাগ ও ভয়ের যে চমৎকার বিশ্লেষণ বহু বৎসর পূর্বে দিয়ে গেছেন, তা মনোবিজ্ঞানীদের কাছে আজও আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। নীচে রাগের বিশ্লেষণ থেকে কতকটা অংশ উদ্ধৃত করা হোলো।

"রাগের প্রকাশ নানা ভাবে হয়ে থাকে। হৃদযন্ত্র ও রক্তচলাচলের ক্রিয়া সর্ব্বদাই আক্রান্ত হয়; মুখ লাল হয়ে ওঠে, কখনও বা বেগুনী রং হয়, কপাল ও ঘাড়ের শিরাগুলি ফুলে ওঠে···তেমনি নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াও আক্রান্ত হয়, বুকটা ঘন

৩৫ Stout—Groundwork of Psychology. P. 375-76.

ঘন ফুলে ওঠে এবং বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র কম্পিত হতে থাকে···উত্তেজিত মস্তিষ্ক পেশীগুলিতে বলসঞ্চার করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে প্রদীপ্ত করে তোলে...মুখ সাধারণতঃ দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়···দাঁতগুলিও শক্তভাবে লেগে যায় কখনও কখনও দাঁতে দাঁত ঘষা হয়। ক্রোধের কারণকে আঘাত করবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলা বা এই জাতীয় ভঙ্গী খুবই সাধারণ।···বাস্তবিক পক্ষে আঘাত করবার আকাঙ্ক্ষা কখনও এমন অদম্য ভাবে প্রবল হয় যে জিনিষ-পত্রে মুষ্ট্যাঘাত করা হয়, অথবা সবেগে ভূমিতে আছড়ে ফেলা হয়।···বিষম ক্রোধের ফলে কম্পন প্রায়ই দেখা যায়—গলার স্বর যেন কণ্ঠে রুদ্ধ হয়; অথবা স্বর অত্যন্ত উচ্চ, কর্কশ ও অসঙ্গত হয়...অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কপাল স্পষ্ট ভ্রূকুটিতে আকুঞ্চিত হয়··· চোখগুলি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে। অথবা হোমর যেমন বলেছেন, যেন তারা আগুণের মত জ্বলতে থাকে। কখনও তা রক্তবর্ণ ধারণ করে...কখনও ঠোঁটগুলি বাইরে প্রসারিত হয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠোঁটগুলি বরং আকুঞ্চিত হয় এবং তার ফাঁক দিয়ে বিকট হাস্যে বিস্ফারিত বা দৃঢ়সংবদ্ধ দাঁতগুলি দেখা যায়।"[৩৬]

রাগের প্রকাশ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কি ভাবে পরিবর্তিত হয় বর্তমান দুজন মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় তা দেওয়া হোল। "বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে রাগের প্রকাশ নানা প্রকার বাক্-নির্ভর আক্রমণের সাহায্যে ঘটে থাকে, যথা অবজ্ঞা, উপহাস, ইঙ্গিত, পশ্চাতে নিন্দা, কুৎসা, বিষাক্ত রসিকতা, ব্যঙ্গ ইত্যাদি। অনুরূপ-ভাবে একটু বড় হ'লে, শিশু তার রাগের ঝালটা প্রকাশ করে বিভিন্ন ধরণের বিরুদ্ধতা ও অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে,—যেমন, শিক্ষক যখন বিশেষ করে সবাইকে চুপ করতে বলছেন তখন ক্লাসে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা, গোলমাল করা ইত্যাদি থেকে, স্কুল পালানো, অপরাধ প্রবণতা, অপরাধ করণ ইত্যাদি নানা ব্যবহারে। কল্পনার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাগ প্রকাশের নানা বিকল্প উপায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের নানা ফন্দীও মাথায় আসে।"[৩৭]

শিক্ষার ক্ষেত্রে আবেগের প্রভাব এবং তাদের কাজে লাগাবার বা পরিবর্তন করবার উপায়—Effects of emotions on education and how best to utilise or modify them—শিশুদের দেহ ও মনের উপর রাগ, ভয় ইত্যাদি অনুভূতির প্রভূত প্রভাব আছে। ইতিপূর্বে শিশুদের

৩৬ Darwin—The expression of the emotions in Man and Animals, P. 111 & 374.

৩৭ Gates & Jersild—Educational Psychology, P. 93.

মনের এই দিকটাতে খুব বেশী দৃষ্টি আমরা দেই নি। কিন্তু অগ্রসর দেশের শিশু-শিক্ষায় ব্রতী শিক্ষকেরা এ কথা বলেন, যে এবিষয়ে অমনোযোগের ফলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন চিরকালের জন্য বিকারগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। ইংলণ্ডের শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সুজান্ আইজ্যাকস্, আগাথা বাওলী, এবং ই, এম, গার্ডনার শিশুর অনুভূতির প্রতি সতর্ক দৃটি রেখে, কি ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা উচিত, এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। বার্টরাণ্ড রাসেল ভয়ের কুফল সম্বন্ধে অত্যন্ত দৃঢ় মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ দুঃখ, নৃশংসতা, অমানুষিকতার মূলে রয়েছে অকারণ ভয়, এবং তজ্জনিত অবিশ্বাস, ঘৃণা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা। তাই তাঁর মতে শিশুর মন থেকে অকারণ ভয় দূর করা শিক্ষার একটা মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।[৩৮]

পূর্বেই আমরা বলেছি জীবনের আদিম প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় হিসাবে রাগ ভয় ইত্যাদি অনুভূতির প্রয়োজন আছে। প্রকৃতির নির্মম পরিবেশের মধ্যে যে বন্য জন্তুরা বাস করে, তাদের বাঁচতে গেলে এই প্রবল প্রবৃত্তিগুলির ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। এরা যে জীবনের মৌলিক উপাদান, একথা ম্যাকডুগ্যাল থেকে সুরু করে অন্যান্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই প্রায় স্বীকার করেন। ক্যাননের মতানুযায়ী, এরা হচ্ছে জীবনের জরুরী বিপজ্জনক অবস্থার (emergency) উপযোগী। কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষ সে বন্য বিপজ্জনক অবস্থা পার হয়ে এসেছে। তার জীবন আজ বুদ্ধিচালিত ও উদ্দেশ্য-কেন্দ্রিক। তার সমাজের গঠন রীতি, প্রবল অনুভূতি প্রকাশের বিরোধী। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের অগ্রগতি তাকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর প্রভুত্ব এনে দিয়েছে, আত্মবিশ্বাস এনেছে, ভয় ও ক্রোধের পরিধি ছোট করে দিয়েছে। আবার বর্তমান অর্থনীতির ভিত্তিতে গড়া সমাজে, লোভ, প্রতিযোগীর প্রতি ঈর্ষা ইত্যাদি অনুভূতিকে প্রবল ভাবে উদ্রেক কচ্ছে।

প্রবল প্রবৃত্তিগুলি জীবনের পক্ষে হানিকর, একথা সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন এবং তাই উপদেশ দিয়েছেন প্রবৃত্তিকে জয় করবার। গীতায় তাই দেখি, শ্রীকৃষ্ণের বাণী—

"যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

৩৮ **Russell—On education.**

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।
ধ্যায়তো বিষয়াণ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূ পজায়তে ।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাৎভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ।"

তাই প্রাজ্ঞ যিনি, স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি, তিনি হবেন প্রবৃত্তি ও অনুভূতির অতীত। তিনি হবেন দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহবীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ, ও স্থিতধী।[৩৯] দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে যদি রুচি না থাকে, বিদেশের আধুনিক পণ্ডিতদের মতও উল্লেখ করা যেতে পারে। রাগে, ভয়ে পরিপাক ক্রিয়া বিকল হয়, ঘুম বাধাপ্রাপ্ত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়—দেহকে এরা জীর্ণ করে। ক্রাইল্ এমন প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন যে জৈব প্রয়োজনের দিক থেকে সমস্ত প্রবল আবেগ ও অনুভূতিই বিষম শক্তিক্ষয়ের কারণ; তিনি দেখিয়েছেন যে আবেগের দৈহিক ফলাফল পেশী ক্রিয়ার দ্বারা শক্তিক্ষয়ের সমান।"[৪০] হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস্ প্রেসিডেন্ট, চার্লস্, ডব্লিউ, এলিয়ট আমেরিকার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। দীর্ঘজীবন লাভ ও কর্মশক্তি অব্যাহত কি করে রাখা যায়, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে নাকি বলেছিলেন "উননব্বুই বছর বয়স পর্যন্ত পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্ম ক্ষমতা কি করে অক্ষুণ্ন রাখা যায় তার কোন সহজ ও নির্দিষ্ট পন্থার নির্দেশ আমার অভিজ্ঞতা থেকে দিতে পারবো না তবে, এটুকু শুধু বলবো—একটা জিনিব খুবই দরকারী সে হচ্ছে, সর্ব্ব অবস্থায় যতটা সম্ভব শান্ত ও অবিচলিত থাকা।"[৪১]

কিন্তু অনুভূতির প্রকাশও মাঝে মাঝে হওয়া চাই। স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে রেগে গেলে সেটার প্রকাশ হয়ে যাওয়া ভালো। যোগাভ্যাসের উচ্চতম স্তরে পৌঁছলে তখন নাকি "নিরুদ্ধ" অবস্থায় পৌঁছা যায়। তবে আমাদের মতো নিম্নস্তরের মানুষদের পক্ষে মাঝে মাঝে ফেটে পড়াটা দরকার। ফ্রয়েড্ বিশেষ করেই দেখিয়েছেন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির স্বাভাবিক প্রকাশ না পেলে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং গুরুতর মানসিক বিকৃতি কি করে ঘটে। আমাদের জটিল সভ্য

৩৯ শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা—কর্মযোগ, ২য় অধ্যায়
৪০ Crile—Man, an adaptive Animal
৪১ Gates—Psychology for Students of Education, P. 164.

জীবন এ রকম বহু বিকৃতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। কারণ সেখানে অনুভূতি ও প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। "রাগের কারণ ঘটে অথচ ঝগড়া করতে পারি না, ভয়ের কারণ ঘটে অথচ পলায়ন করতে পারি না," এতে যে আত্ম-বিরোধিতা সৃষ্টি হয় তা নিশ্চিতই হানিকর। সভ্যতার বিকাশের ফলে ভয়ের যে দৈহিক প্রকাশ, যথা যুদ্ধ বা পলায়ন ইত্যাদি, তা বহুল পরিমাণে বিদূরিত হয়েছে। কিন্তু আবেগটি লুপ্ত হয়ে যায় নি। তা ছাড়া রাগের হেতু উপস্থিত হলে মস্তিষ্ক, থাইরয়ড্ এ্যাড্রিন্যাল, যকৃত ইত্যাদি গ্রন্থি উত্তেজক পদার্থের সান্নিধ্যে এসে সক্রিয় হয়ে উঠে কিন্তু তাদের মুক্তির পথ নাই। কতকটা নিষ্ক্রিয় দেহের মধ্যে এপ্রকার আলোড়নের ফলে ক্ষরণ ইত্যাদি অস্বাভাবিক ভাবে সঞ্চিত হয়ে যায়—যার ফল প্রাণীর পক্ষে নিশ্চয়ই হানিকর।[৪২]

এ সব আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে তার অনুভূতির জগৎকে আমাদের বুঝতে হবে, শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, রক্ষা করতে হবে, স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়ে তার মানসিক বৃত্তির বিকাশের সাহায্য করতে হবে।

ছোট শিশুদের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন স্নেহ ও বিশ্বাস। শিক্ষক যেখানে প্রকৃত স্নেহশীল, যেখানে তিনি শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন, সেখানে শিক্ষার কাজ সহজ হয়। শিশু যাতে অযথা ভয় না পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ভয় মনকে ছোট করে, আত্মবিকাশে বাধা দেয়, জীবন সংগ্রামের জন্যে শিশুকে অনুপযোগী করে তোলে। শিক্ষক যেখানে ভয়ের বস্তু, বিদ্যালয় যেখানে বিভীষিকা, অংক বা ভূগোল যেখানে শিশুর মনে ত্রাস সঞ্চার করে, সেখানে শিক্ষা বিফল হচ্ছে। কিন্তু ভয়েরও স্থান আছে। শিক্ষককে যাতে ছাত্রেরা লংঘন না করে, যাতে বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃংখলা অক্ষুণ্ণ থাকে, যাতে বহুর কল্যাণে ব্যক্তি নিজেকে সংযত করে, সে জন্যে শাসনের দণ্ড শিক্ষকের হাতে থাকা চাই। কিন্তু শুধু ভয় দিয়ে যে শাসন, সে তো "পুলিশী জুলুম"—তাতে মানুষ তৈরী হয় না—গোলাম তৈরী হয়। তাই ভয় দিয়ে শিশুকে যেমন পঙ্গু করা পাপ, তেমনি যেখানে বাস্তবিক ছাত্রদের এককভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি হতে পারে, তাকে ভয় করতে শিক্ষা দেওয়াও শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। শিশু যেন ভয় করতে শেখে রোগকে ও অস্বাস্থ্যকে, নিষ্ঠুরতাকে, অমানুষতাকে।

[৪২] Raup—Complacency—The Foundation of Human Behaviour, P. 85-86.

তেমনি রাগ। যথাসাধ্য রোগের কারণ অপসারণ করতে না পারলে শিক্ষার জন্য শিক্ষকের পরিশ্রমের বিরাট অপচয় ঘটবে। রাগ করে ভাত বেশী খাওয়া যেতেও বা পারে, কিন্তু রাগ করে বেশী লেখাপড়া শেখা যায় না। শিক্ষকের ব্যবহার সংযত হতে হবে। শিশুর শক্তির অতিরিক্ত কাজ দিয়ে, অযথা লজ্জা বা শাস্তি দিয়ে, তার মনকে তিক্ত করে তাকে ভালো শেখানো যেতে পারে না। থর্ণডাইকের ফললাভের সূত্র আমাদের এ কথাটি শিখিয়েছে যে ন্যায্য প্রশংসা দিয়ে শেখার উৎসাহ বাড়ানো যায়। তবে রাগেরও স্থান আছে। করুক না শিশুরা কিছু রাগারাগি, মারামারি, একটু শক্ত হোক, আঘাত নিতে ও আঘাত দিতে কিছুটা শিখুক। জীবন সংগ্রামে এটা তো চাই। তবে মাত্রা যেন না ছাড়ায়। তা ছাড়া রাগেরও মোড় ফেরানো যেতে পারে। শিশু রাগ করতে শিখুক নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে, অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে, নিজের শৈথিল্যের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

এই অনুভূতির ঠিক ঠিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই তো গড়ে ওঠে রুচি ও চরিত্র। সুন্দরকে ভালবাসা, মহৎকে শ্রদ্ধা করা মানুষের জন্য দরদ, এতো সুশাসিত অনুভূতির পথেই আসবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষ গড়া, তবে অনুভূতিকে সেই মহৎ কাজে কি করে লাগাতে হবে তা অবশ্যই শিক্ষাব্রতীকে জানতে হবে। প্লেটো তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, একেবারে বাল্যকাল থেকে উপযুক্ত বিষয়ে আনন্দ পেতে ও বেদনা বোধ করতে শিখতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার অর্থ ই তো এই।

আবেগ ও অনুভূতির ক্রমপরিণতি। 'জীবন পরিক্রমা' অধ্যায়ে শিশুর জীবনে কয়েকটি অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে এ নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা গেছে। এখানে শুধুমাত্র আবেগের বিকাশ সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলা হচ্ছে। মানুষের দেহমনের সমস্ত অবস্থা ও প্রক্রিয়ার মত অনুভূতি ও আবেগের প্রকাশেরও ক্রমবিকাশ আছে। একেবারে সদ্যোজাত শিশুর আবেগ ও অনুভূতি নিঃসন্দেহেই স্পষ্টতা লাভ করে নি এবং তার বিশিষ্ট প্রকাশও নেই। পরিণত মানুষের সুখ, দুঃখ, রাগ, ভয়, অভিমান, বিদ্বেষ ইত্যাদি অনুভূতির কত বিভিন্নতা। তাদের প্রকাশের মধ্যেও কত সূক্ষ্ম প্রভেদ। সদ্যোজাত শিশুর জীবনে স্বস্তি ও অস্বস্তি এই দুটিই মোটা প্রভেদ এবং তাদের প্রকাশও সামান্য দুটি মাত্র পথে, হাসি ও কান্নায়। ৩।৪ সপ্তাহের পর থেকেই কিন্তু তার আবেগ ও অনুভূতির ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর প্রকাশের লক্ষণ দেখা যায়। তার বস্তু

বিভেদ জ্ঞানও যেমন ক্রমে পুষ্টিলাভ করে—অনুভূতির বস্তুগুলিও তেমনি বিভিন্ন ও স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। এটা সমস্ত জৈব ও মানস ক্রমবিকাশেরই সাধারণ নিয়ম ;—অভিন্ন অস্পষ্টতা থেকে ভিন্নতায় অগ্রগমন—স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, বিশেষ থেকে সাধারণে অগ্রসরণ।

চার সপ্তাহের শিশু সম্ভবতঃ মায়ের আদর কিছু বোঝে, কিন্তু মাকে অন্য সমস্ত বস্তু থেকে পৃথক করে দেখতে সে তখনও শেখে না। অসহায় সশব্দ কান্না তার সমস্ত মন্দ-লাগার একমাত্র প্রকাশ আর নিঃশব্দ একটু হাসিই তার ভাল-লাগার সাধারণ প্রকাশ। তবে জেসেল বলেন, প্রত্যেক শিশুর মা-ই চার সপ্তাহ বয়স থেকে তাঁর আপন শিশুর হাসি ও কান্নার মধ্যেও অনুভূতির সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতে পারেন। ক্রমে দশমাস থেকে এক বৎসর হ'লে অন্য কতকগুলি প্রধান অনুভূতি ও আবেগ শিশু প্রকাশ করতে শেখে। মোটামুটিভাবে আনান্দ, তৃপ্তি, কৌতুকবোধ ও হাসি এবং ক্ষুধা, গরম লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, ব্যথা ও ভয়ের কান্নার মধ্যে প্রভেদ বোঝা যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির সংখ্যাও বাড়ে, একই অনুভূতির মধ্যে সূক্ষ্মতর প্রভেদও দেখা দেয়। যে সব বস্তু বা ঘটনা অনুভূতি জাগায় তাদের সংখ্যাও ক্রমে বাড়ে।[৪৩]

বয়সের সঙ্গে আবেগগুলিকে শুধু বিভিন্ন করেই যে দেখা যায় তা নয়, তার বাহ্য প্রকাশও অনেক সময় সংযত হয়ে আসে। যে শিশু সাত মাস বয়সে মুখ থেকে দুধের বোতল সরিয়ে নিলে চীৎকার করে কেঁদে, শক্ত হয়ে, লাল হয়ে উঠত, সেই শিশুই সাত বছর বয়সে প্রিয় জিনিষটি না পেলে অত চীৎকার করে হয়ত কাঁদবে না। অবশ্য এ বয়সেও অনেকের মেজাজ মর্জ্জির (Temper tantrum) বালাই যে না দেখা যায় তা নয়, তবু সাধারণভাবে দেখতে গেলে চীৎকার করে কান্নাটা কমে আসে। দৈহিক প্রকাশ-ভঙ্গী সংযত হওয়ার পেছনে অনেক কারণই আছে। ভাষার মাধ্যমে শিশু মনের ভাব অনেকটাই প্রকাশ করতে পারে, যেটা সে আগে কান্নার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করত। তা ছাড়া সমাজের চাপেও ব্যবহার তার বদলায়। দাদা বা দিদির মতো বড় হয়ে উঠতেই তার ভাল লাগে, বেবী হয়ে থাকতে সে চায় না (অবশ্য যদি তার বুদ্ধি স্বাভাবিক হয়)। শিশু যখন বিদ্যালয়ে যায়,—তখন ভাবাবেগের প্রকাশকে সে বিশেষ করে সংযত করে। কিন্তু তা বলে তার আবেগগুলি অন্তর্হিত হয় না। নিজের

৪৩ Bridges K. M. B.—"Emotional Development in Early Infancy" —Child Development, 1932, vol. 3, P. 340.

বাড়ীতে বা ক্লিনিকে দরদী শিক্ষক, ডাক্তার বা বন্ধুর কাছে তার ভয়, দুঃখ, রাগ সবই সে প্রকাশ করে।

ক্রমে বয়সের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা ও জগতের সীমা বড় হতে থাকে। শৈশবে সে যখন আত্মকেন্দ্রিক থাকে, তখন তার দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য, তার খেলাধুলো ইত্যাদি নিয়েই সে ব্যাপৃত থাকে, এবং এরই চারদিকে রচিত হয় তার ভাব-জীবন। কিন্তু তার আবেগ সৃষ্টিকারক বস্তু ঘটনার বহু পরিবর্তন হয়ে যায় তার ক্ষমতা, আগ্রহ ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে। আগে যে ঘটনাকে সে ভয় করত, তা এখন হয়তো সে উপেক্ষা করে, যা সে আগে খুব ভালবাসত এখন হয়তো তাকে সে তুচ্ছ করে, আবার আগে যার সম্বন্ধে কোন আগ্রহই তার ছিল না, তা হয়তো এখন সে পরম প্রিয় বস্তু বলে জ্ঞান করে। দু-একটি প্রধান আবেগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাচ্ছে।

স্নেহ বা ভালবাসা—শিশু ভূমিষ্ঠ হবার কয়েক সপ্তাহ পরেই তার মধ্যে স্নেহ প্রীতির প্রকাশ পায়, বিশেষ করে শিশু ও তার মার সম্বন্ধ লক্ষ্য করলেই এটা বোঝা যায়। ডাঃ সাটি (D. Sutti) তাঁর "ওরিজিন্‌স অব লাভ এ্যাণ্ড হেট্" নামক বইতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ফ্রয়েডের মতে স্নেহ ভালবাসার পেছনে রয়েছে দৈহিক কামনা। সাটির মতে এর মধ্যে রয়েছে মানুষের সমাজ-গত জীবনের প্রকাশ। মানুষ অতি শৈশব হতেই সামাজিক; সে সঙ্গী চায়, মাতাকে ভালবাসার মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষারই পূরণ হয়। মানুষ ভালবাসতে ও ভালবাসা পেতে চায়। না পেলেই আসে রাগ, দুঃখ, ঘৃণা ও ভয়। ভালবাসার বস্তুরও পরিবর্তন হয় বয়স, শক্তি ও আগ্রহের পরিবর্তনের সঙ্গে। নেড়ী-কুকুর, মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু, স্কুল, কলেজ থেকে সুরু করে নিজের দেশ ও জাতি পর্য্যন্ত ভালবাসার ক্ষেত্র ক্রমে বিস্তার লাভ করে।

শিশু পিতামাতার কাছে যে স্নেহ পেয়ে আসে তার খানিকটা আশা করে স্কুলে শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছে, ক্লাবের নায়ক বা মধ্যমণির কাছে। স্নেহ-ভালবাসার অভাবে জীবন বিকৃত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সুপ্রচুর, ক্লিনিকে যে সব কেস্ পৌঁছায়, তার অধিকাংশের পেছনেই থাকে অতীত প্রীতিহীন জীবনের প্রতি প্রতিহিংসার কাহিনী। পরবর্ত্তী জীবনে স্বাভাবিক ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে গেলে শিশুর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন শৈশবে আদরের, ভালবাসার, নিজ নিরাপত্তার জ্ঞানের। কিন্তু স্নেহ-ভালবাসার বশে শিশুকে অতি প্রশ্রয় দিলেও তার যথেষ্ট ক্ষতি করা হয়।

আদুরে ছেলেরা বড় বেশী পরনির্ভর হয়, অনেক সময় অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল, স্বার্থপর ও উৎপীড়ন-পরায়ণ হয়।

ভয়—ভয় নানাপ্রকার হতে পারে। বর্তমান বিষয়ে দিশেহারা হয়ে যাওয়া আবার ভবিষ্যতে নানাপ্রকার বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে ওঠাও ভয়েরই প্রকার ভেদ। সাধারণতঃ যে বস্তু বা অবস্থা হতে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে (সত্যিকার বা কাল্পনিক) তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিই হচ্ছে ভয়ের লক্ষণ। কি কারণে যে ভয় হতে পারে, তা ব্যক্তির প্রকৃতি, বয়স, পরিবেশের উপর নির্ভর করে। শিশু একা থাকলে ট্রেণের হুইসেলের তীব্র শব্দে বা হঠাৎ তীব্র আলোতে, বা অকস্মাৎ অবলম্বন হারালে (loss of support) ভয় পায় কিন্তু মা-বাবার কোলে থাকলে, সে শিশু ভয় নাও পেতে পারে। একটু বড় হলে (Pre-school stage) শিশু যখন নানাপ্রকার কল্পনা করতে সুরু করে, তখন রাক্ষস, ভূত, চোর ইত্যাদির ভয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আবার তার সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বস্তুও বদলায়। ছোট ছেলেমেয়ের কাছে যে কর্মনৈপুণ্য আশা করা যায়, বিদ্যালয়ে ততখানি দক্ষতা বা ক্ষমতার পরিচয় দিতে না পারলে অনেক সময় আসে পরাভবের চিন্তা ও ভয়, পরীক্ষা দিতে সাহস হয় না, বা পাঁচজনের সামনে যেতে ও কথা বলায় আসে ভীতি ও এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা।

বড় হবার সঙ্গে শৈশব বা বাল্যের ভীতির বস্তুগুলি আর তত ভীতিপ্রদ বলে মনে হয় না। কিন্তু অনেক শিশু বাল্যের ভয়ের কারণগুলিকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে না, এবং অন্ধকারে একা থাকা, জন্তুজানোয়ার, চোর, গুণ্ডা, ভূত, ইত্যাদির ভয় থেকে যায় যথেষ্ট প্রবীণ বয়স অবধি।

ভয়ের সৃষ্টি নানা কারণেই হতে পারে। অন্ধকারে একা থাকতে শিশুর পূর্বে কোন ভয় ছিল না। কিন্তু তার বড় ভাই এসে হয়ত জুজুবুড়ী সেজে তাকে ভয় দেখাল। জুজুবুড়ীর সঙ্গে অন্ধকারের একটা নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল, এবং এখন অন্ধকারে একা থাকতে শিশুর ভয় করে। আবার ধীরে ধীরে অন্য কারো সঙ্গে অন্ধকারে থেকে সে আবিষ্কার করল যে অন্ধকার মানেই জুজুবুড়ী নয়। ধীরে ধীরে সাহস ফিরে এল, ভয় কেটে গেল। ভয়ের মূল কারণটি খুঁজে বার করতে পারলে নানাবিধ অস্বাভাবিক ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। প্রতিদিনের ভুলচুক, দোষ-ত্রুটি, অক্ষমতা একত্র হয়ে অনেক সময় ব্যক্তির নিরাপত্তার ভাব, স্বকীয় ক্ষমতার উপর বিশ্বাস কমে যায় ও ভয়ের

সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মনে ভয় না থাকলেও শিশুর পিতামাতা যদি ভয় পান, সেই ভয় শিশু-মনেও সংক্রামিত হতে পারে। ভয় গভীরতর হয়—যখন শিশুকে বকুনী বা মারধোরের ভয় দেখিয়ে শান্ত করান হয়, বা কাজ আদায় করা হয়।

এ সমস্ত প্রভাব থেকে শিশুকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয় এবং উচিতও নয়। অতিরিক্ত সাবধানতার উল্টো ফল হওয়া আশ্চর্য্য নয়, তবে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করা উচিত যেখানে শিশু আপনাকে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রকাশ করতে পারে, যেখানে নিরাপত্তাবোধের অভাব নেই। ঐ প্রকার পরিবেশে নানাপ্রকার দক্ষতা ও নৈপুণ্য আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাট ভয়গুলি চলে যায়।

রাগ—রাগের কারণ ঘটে, সাধারণতঃ, যখন ব্যক্তি বিশেষের কোন কাজের ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং নির্লিপ্তভাবে সেই বাধাকে সে মেনে নিতে পারে না।

শৈশবে দেখা যায়, শিশুর অঙ্গচালনা বাধাপ্রাপ্ত বা যথাসময়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি না হলে সে রাগ করে। ক্রমে শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে তখন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা দিলে, বা তার বন্ধু বা অপর কেউ যার থেকে সে নিজেকে পৃথক বলে চিন্তা করে না, এমন বন্ধুর কর্ম-পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে সে রাগ করে।

সাধারণতঃ রাগের পেছনে থাকে একটা না-পাওয়ার জন্যে দুর্বলতার ভীতি। যে ব্যক্তি আপন ক্ষমতার তুলনায় বেশী নৈপুণ্য প্রকাশের বা সাফল্য লাভের আশা করে—তার রাগের কারণ ঘটবার অবকাশ তত বেশী। রাগকে শাস্ত্রে বলেছে 'চণ্ডাল,' তা মানুষকে অন্ধ করে, তার বিচার বুদ্ধি বিকৃত করে। এমন পাপ নেই যা মানুষ রাগের মাথায় না করতে পারে। কিন্তু এ রাগের মূল্যও বড় কম নয়,—অনেক সময় রাগ করে আলস্য ঝেড়ে ফেলে পড়াশুনা করে সাফল্য কাহিনীও বিদ্যালয়ে কম দেখা যায় না। অনেক বড় কাজের পেছনে থাকে প্রচণ্ড রাগ—আর তার থেকে উদ্ভূত বিষম জেদ। রাসেল্ বলেছেন এ প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগানো যায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারের জন্যে অনলস উদ্যমে ও শিল্প প্রচেষ্টার ক্লান্তিহীন সাধনায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দেখা উচিত—যে শিশুদের অভিপ্রায় যেন সর্বদাই বাধাপ্রাপ্ত না হয়, বা ক্ষমতার অতিরিক্ত রাশীকৃত কাজ বা একঘেয়ে কাজের বোঝা যেন তাদের উপর চাপান না হয়। না পারলে শাস্তি প্রদানের বিধি শিশুদের আরো মরিয়া ও খিটখিটে রাগী করে তুলতে পারে এ

কথাটি শিক্ষক যেন স্মরণ রাখেন। অক্ষমতার থেকে যখন রাগের উৎপত্তি হয়, সে সব ক্ষেত্রে সেই অক্ষমতার আঘাতের হাত থেকে শিশুকে কেমন করে বাঁচাতে হবে, সে চিন্তা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। ভয়ের মত রাগও সংক্রামক, তাই শিক্ষক ধৈর্য্য হারালে, অসহিষ্ণু হ'লে শিশুর মনের উত্তেজনাকে তিনি প্রশমন করতে সমর্থ হবেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মনোযোগ (Attention)

খোকনের হাতটা মুঠোর মধ্যে ধ'রে হিঁচড়ে নিয়ে এলেন মাষ্টার মশাই,—মুখের ভাবটা বিপন্ন, কিছুটা বা হতাশ। খোকনের বাবার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন দুরন্ত অমনোযোগী ছেলেটাকে, তারপর খুব দুঃখের সঙ্গে জানালেন, "দেখুন, একে পড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব। একটু পড়ায় মন দেবে না। দিনরাত খেলা আর খেলা। কিছুতেই তো পড়াশোনাতে মনোযোগ হয় না। কি করি বলুন তো?"

বিপর্য্যস্ত খোকনের মাষ্টার মশাইয়ের মত শিক্ষা-মনস্তত্ত্বও এই 'মনোযোগ' কথাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছে। মনোযোগ কাকে বলি? মনোযোগের সংজ্ঞা কি?

যখন কোন বিষয়ে বা বস্তুতে আমরা মনকে নিয়োগ করি, তাকে মন দিয়ে লক্ষ্য করি, তাকে একাগ্রভাবে চিন্তা করি, তাকে বলি মনোযোগ। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে 'মনোযোগ' কথাটা আসলে বিশেষ্যই নয়। তাকে অবিচ্ছিন্নভাবে একটা ক্রিয়াপদ অনুসরণ করেছে, সেইটা মনোযোগ কথাটার সত্যিকার অর্থ। মনোযোগের মধ্যে সর্বদাই রয়েছে একটা সক্রিয়তা এবং মনোযোগ-এর উপযুক্ত ক্রিয়াটি হচ্ছে মন যুক্ত করা"[১] "এটি একটি শক্তি বা বস্তু নয় কাজেই 'মনোযোগ আছে' না বলে যদি বলা হয় 'মন দেওয়া হচ্ছে' তাহলেই কথাটা বেশী সত্য হবে, যদিও মনে হবে কথাটা ঘুরিয়ে বলা হোল।[২] মনোযোগের এই সক্রিয় চরিত্রটা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, এবং 'মনোযোগ' কথাটা হ'চ্ছে 'আমি মন দিচ্ছি' একথাটার সংক্ষিপ্ত রূপান্তর। মনোযোগের সংজ্ঞাও ব্যক্তির দিক দিয়েই ধরা হ'য়েছে। মনোযোগ ব্যক্তির চেতনার একটি ভঙ্গী। 'মনোযোগ' যে ব্যক্তি মন দিচ্ছে, তাই একটি ক্রিয়া ; একটা বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতাকে, এ নামটি আমরা দিয়ে থাকি।[৩] ড্রেভার (Drever) বলেন, এটা একটা বিশেষ ধরণের মানসিক অবস্থা যার নির্বাচনী শক্তি (selection) উল্লেখযোগ্য। মনোযোগ

১ Ward—Principles of Psychology, P. 61.

২ Munn—Psychology P. 305.

৩ Ross—Groundwork of Educational Psychology, P. 169.

যেমন একটা সক্রিয় অবস্থা (active), তেমনি এ বাছাই করতেও চায়। সমস্ত বস্তুতেই মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না। যাকে মন চিন্তায় পেতে চায়, তাকে বস্তুজগৎ থেকে বা চিন্তার ক্ষেত্র হ'তে নির্বাচন করে নেয়। প্রাচীন কালের স্বয়ংবর সভার রাজকন্যার মত মন বস্তুতে বস্তুতে ঘুরে বলে "তোমায় আমি বরণ করলুম।" "এই স্বেচ্ছায় বরণের দ্বারা আমরা একটি দ্রব্য ও ভাবকে প্রাধান্য ও স্থায়িত্ব দিচ্ছি এবং সে মুহূর্তে অন্য বস্তু বা ভাবকে মন থেকে বেশী নির্বাসিত কচ্ছি।[৪]

কয়েকজন চিন্তাবাদী মনোযোগকে মস্তিষ্কের একটা বিশেষ ক্রিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে মনোযোগ একটি চিন্তার ধারা। তাঁরা মনোযোগের জ্ঞান-ধর্ম বা জানবার দিকটায় ঝোঁক দিয়ে বল্লেন, চিন্তায় যখন স্পষ্টতা এলো, তখনই তা হ'ল মনোযোগ। মনোযোগে বস্তুর প্রয়োজন তাঁরা স্বীকার করলেন, এবং বল্লেন, মনোযোগ হ'ল বস্তুকে নিয়ে ধারণা বা চিন্তা। (তাঁদের মতে যখন পদার্থের দিকে আমরা মনকে কেন্দ্রীভূত করি, তখন তার সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা পরিষ্কার ধারণা হ'ল। তাকে আমরা তার পট-ভূমিকা থেকে অনেক স্পষ্টতররূপে পেলাম। এই স্পষ্ট দেখার জন্য যে মানসিক পরিবর্তন তাকেই তাঁরা বলেন মনোযোগ। অর্থাৎ, চিন্তার বস্তুকে স্পষ্টভাবে মনের সামনে আনবার যে প্রক্রিয়া তাকে বলে মনোযোগ।[৫] কেউ কেউ উপমা দিয়ে বলেছেন, মনঃসংযোগ যেন একটি ক্যামেরা। যে বস্তু অস্ফুট ছিল, ক্যামেরার ফোকাশে এসে তার পূর্ণতার স্পষ্টতর রূপ খুল্লো, তেমনি ক'রে মনোযোগও কেন্দ্রায়িত হ'য়ে অস্পষ্টতার ধূলা সরিয়ে দেখতে পেল পদার্থকে। সুতরাং এঁদের মতে মনোযোগ মননশীল চিন্তার একটা ধারা মাত্র ; কিন্তু এ মত মনোযোগের সম্পূর্ণ চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারে না। কেন না মনযোগের আরও দুটী দরকারী দিক্ আছে। সে হ'ল অনুভূতি আর ইচ্ছার দিক। শুধুমাত্র বস্তুর স্পষ্টতর 'ধারণা' (cognition)ই মনোযোগের সব নয়। প্রত্যেক মনোযোগের মধ্যেই মন ক্রিয়াশীল হয় এবং কিছু করতে চায়। এই করতে চাওয়া অংশটা এর কর্ম্মমুখীনতার দিক। মনোযোগ ব্যক্তির ইচ্ছার একটী বিশেষ রূপ। এবং ইচ্ছার সঙ্গে কাজের অংশও মনোযোগে আছে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে

৪ McDougall—Social Psychology. P. 209.

৫ Ross ,, ,, P. 170,

যখন মনোনিবেশ করছি তখন যেমন ইচ্ছাকে সেখানে প্রয়োগ করছি—ইচ্ছাটাকে সফল করবার জন্য শারীরিক প্রস্তুতিও তেমনি আছে। ম্যাকডুগ্যাল মনোযোগের ক্রিয়াশীলতার দিকে নজর রেখে বল্লেন, মনোযোগ হচ্ছে জানার জন্য ব্যাকুল আয়াস এবং এই আকাঙ্ক্ষার আকুলতার দিকটাই মনোযোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "কোন ফলপ্রাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মনোযোগ হচ্ছে একটা উত্তম বা প্রয়াস।"[৬] এটা মানসিক একটা ক্ষমতামাত্র নয়। মনোযোগ এক ধরণের ইচ্ছার উদ্বেগ, এবং যত প্রখর আমাদের আকাঙ্ক্ষা, তত প্রচণ্ড আমাদের মনোযোগ—এই হ'ল ম্যাকৃডুগ্যালের মত। মান্ (Munn) মনোযোগকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বা ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়, পেশী দেহবিন্যাস (Postural adjustment) ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর প্রস্তুতি হিসাবে (preparatory set) আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ মনোযোগের জ্ঞান ও কর্ম এ দুটি দিকই তিনি স্বীকার করেছেন।[৭]

মনোযোগের আরেকটি চরিত্রের কথা আমরা উল্লেখ করেছি—এর অনুভূতির দিক। প্রত্যেক মনোযোগের মধ্যে একটা অনুভূতির রং (feeling tone) আছে। সে অনুভবটা প্রয়োজনের চেতনা—ড্রেভার (Drever) যাকে বলেছেন feeling of worth-whileness.[৮] অনেক জিনিষে আমরা মনোযোগ দিই তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার হওয়ার পরে নয়,—তার আগেই, যখন জিনিষটার দরকার সম্বন্ধে আমাদের ক্ষীণ অনুভূতির চেতনা হয়। কুকুর তাড়া করলে সদ্যোজাত মুরগীর বাচ্চা যে পলায়নে মনোসংযোগ করে তা নেহাৎই অনুভূতির ফলে। তার পালানোর মূল্য সম্বন্ধে বুদ্ধিশীল চিন্তা ততটা নেই, যতটা আছে অস্পষ্ট অনুভবের তাগিদ যে পালানোটা তার স্বার্থের পক্ষে অনুকূল।[৯]

রস্ (Ross), ম্যাকৃডুগ্যাল ও ড্রেভারের মতের সমন্বয় করে বল্লেন, মনোযোগে যেমন ইচ্ছার প্রাবল্য আছে তেমনি একটা অনুভূতির লাবণ্যও আছে—অর্থাৎ মনোযোগটা অনুভূতি ও ক্রিয়াশীলতাজাত (affective-conative)।

কিন্তু মনোযোগের বিষয়বস্তুটা কেমন? কাকে স্পষ্টভাবে জানার জন্য

৬ McDougall—An Outline of Psychology, P. 271-72.

৭ Munn—Psychology P. 316.

৮ Drever—Introduction to the Psychology of education.

৯ Ross—Groundwork of Educational Psychology, P.41,

আমাদের আগ্রহ? এই হ'ল আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন। যে জিনিষ বা চিন্তাতে আমাদের মন সন্নিবিষ্ট হ'ল তাকে বলব মনোযোগের বিষয়। মনোনিবেশের ফলে সেই জিনিষ আমাদের কাছে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হ'ল। কিন্তু স্পষ্টতা গুণ আগে থেকেই বিষয়বস্তুর থাকলে চলবে না। অর্থাৎ যে জিনিষে মনোযোগ করবো তাহার চেহারাটা মনোযোগের সময় খুব পরিষ্কার থাকবে না, অল্প জানা বলেই তাতে মনোযোগ করতে আমাদের আগ্রহ হ'বে। যখন সে পূর্ণ জানা হ'বে তখন তার থেকে আপনা হ'তেই মনোযোগ খ'সে পড়বে। যতক্ষণ দিগন্তরেখায় একটী অস্পষ্ট চলন্ত বিন্দু দেখছি ততক্ষণই তার দিকে নজর করবো। যে মুহূর্তে দেখবো সেটা একটা মহিষ তখন আর তার দিকে মন দেওয়ার কথা আসবে না। কাজেই মনোযোগের বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতা এবং অনির্দেয়তা এ দুটী গুণ থাকবে। ষ্টাউট বলেন যেটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট, মনোযোগ তা নিয়ে নয়; যা তুলনায় অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট তা নিয়েই মনোযোগের কারবার'। যেটা খুব স্পষ্ট করে জানা হয়েছে তা মনোযোগের বিষয় নয়; বরঞ্চ তার বিপরীত।[১০]

মনোযোগের বস্তু
Object of attention

মনোযোগের সঙ্গে আরেকটা কথা খুব উল্লেখযোগ্যভাবে বিজড়িত তা হ'চ্ছে অমনোযোগ। যখনই কোন দ্রব্যে মন দিচ্ছি তার পারিপার্শ্বিক গেছে ম্লান হ'য়ে। এই যে মালিন্য এ এসেছে, তা অমনোযোগ থেকে। যেখানেই মনোযোগ আছে, তার পাশেই অমনোযোগের কালো পট। যে বস্তু চেতনার আলোতে এলো, সে রইল আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে (Focus of attention)। তার পাশে তত তীব্রমন-না-দেওয়া একটা আবেষ্টনী—তাকে বলা যায় মনোযোগের ভূমি (Field of attention)। কিন্তু একেবারেই মন-না-দেওয়া যে আরও ছড়ানো একটা ক্ষেত্র র'য়ে গেল তাকে কি বলবো? তাকে ষ্টাউট বল্লেন অমনোযোগের ভূমি (Field of inattention)। যখনই কিছুতে মন দিচ্ছি তখন পৃথিবীর অন্য সমস্ত বিষয় হ'তে আমাদের মন চ'লে গেছে। তাই এই অমনোযোগের ক্ষেত্র ছোট তো নয়ই বরং এর প্রসার মনোযোগের ভূমি থেকে অনেকটা বেশী। এই অমনোযোগের ভূমি কি আমাদের চেতনার সম্পূর্ণ বাইরে? ষ্টাউট বল্লেন, নয়। অমনোযোগের

মনোযোগ ও অমনোযোগ
Attention and inattention

১০ Stout—Manual of Psychology. P. 160.

ভূমিও আমাদের অবচেতনায় প্রচ্ছন্নভাবে আছে। তবে আমরা তার সম্বন্ধে খুব প্রকটভাবে সচেতন নই, তফাৎ এইটুকু মাত্র। যেমন, যদি মোমবাতির মৃদু আলোতে আমরা কোন বই পড়ি তখন বাতির দিকে মন না দিলেও প্রচ্ছন্নভাবে বাতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকে। আবার মোমের মৃদু আলোর সঙ্গে সূর্য্যের প্রখর আলো বা বিদ্যুৎ-বাতির মসৃণ দীপ্তির সঙ্গে একটা তুলনাও অজান্তেই আমাদের মনে থেকে যায়। যদিও সূর্য্য বা ইলেকট্রিক বাতি একেবারেই আমাদের মনোযোগের ভূমির বাইরে।

ওয়ার্ড অমনোযোগকেও মনোযোগের একটা স্তর মনে করেন। তিনি মনোযোগ কথাটাকে 'চেতনার' (consciousness) বিকল্পে ব্যবহার করার পক্ষপাতী, কেন না তাঁর মতে মনোযোগ মন বা চেতনার (consciousness) সক্রিয় চরিত্রটার উপর ঝোঁক দিচ্ছে। তা ছাড়া চেতনা (consciousness) কথাটা মনোযোগ কথাটার মত পরিষ্কারও নয় বলে তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু একটা আপত্তি এখানে উঠতে পারে, মনোযোগ কি খুব সীমায়িত একটা কথা নয়? চেতনা কি শুধুই মনোযোগে? চেতনায় কি এমন অনেক কিছু নেই যা অমনোযোগের ঔদাসীন্যে অবলুপ্ত? ওয়ার্ড বলেন, অমনোযোগ আর মনোযোগের মধ্যে গুণগত (qualitative) তফাৎ নেই। তাদের তারতম্যটা স্তরভেদের, পরিমাণের। কাজেই যা মনোযোগ—তারই মৃদুতম প্রকার হচ্ছে অমনোযোগ। তাদের প্রকৃতি ভিন্ন নয়। সুতরাং এ্যাটেন্‌সন্, মনোযোগ ও অমনোযোগ, মনের দুটো অবস্থাকেই আবৃত করতে পারে। অতএব মন বা চেতনাকে নিরঙ্কুশচিত্তে মনোযোগ বলা যেতে পারে। স-মনোযোগ চেতনা ও অ-মনোযোগ চেতনার মধ্যে প্রভেদটা শুধু পরিমাণের।[১১] মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করা এবং মনোযোগকে ছড়িয়ে দেওয়া এ দুটোই একই ক্রিয়ার বিপরীত দিক্।[১২]

মনোযোগ ও চেতনা
Attention & consciousness

অন্য মনস্তাত্ত্বিকরাও বলেন মনোযোগের উল্টোপিঠ ঠিক অমনোযোগ নয়,—সেটা হ'ল অন্য জিনিষের প্রতি মনোযোগ। মাষ্টার মশাইয়ের ছাত্রের বইয়ের দিকে মন নেই বটে, কিন্তু পাশের বাড়ীর ছাদে তার বন্ধু যে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে,

১১ Ward—Principles of Psychology P. 65.

১২ Do Do P. 68.

তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ আছে। পরিপূর্ণ অমনোযোগ খুব সচরাচর সাধারণ মানুষের হয় না। কোন বিষয়েই মনোযোগ নেই, এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় শুধু বিকারগ্রস্ত পাগলদের মধ্যে,—তাও সব সময় নয়।

এ তো গেল অমনোযোগ। কিন্তু মনোযোগের ভূমিতে আমরা কতখানি বস্তুকে পেতে পারি। কতগুলি জিনিষে একবারে মনোযোগ করা যায় বা মনোযোগের বিস্তার (span) কতটা? এ প্রশ্নটার একটা সাধারণভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে স্পীয়ারম্যান্ (Spearman) কতগুলি পরীক্ষার পর মনোযোগের বিস্তারের একটা রীতি আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন প্রত্যেক মানুষের মানসিক শক্তির (mental energy) একটা সীমা আছে। যতটুকু শক্তি তার বেশী মনোযোগ সে দিতে পারে না। এজন্য যদি মানসিক শক্তি কোন একদিকে মনোযোগে খরচ হয়, অন্য একটা মনোযোগের জন্য যে মানসিক ক্ষমতা থাকবে, তা ব্যয়িত শক্তিটাকে বাদ দিয়েই। অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মনোযোগ হলেও মানসিক শক্তির পরিমাণ মোট সমানই থাকবে। প্রত্যেক মনের একই মুহূর্তে কতটা জানতে পারে তার শক্তির পরিমাণটা পরিমিত ও নির্দ্দিষ্ট, যদিও তার মধ্যে গুণগত প্রভেদ থাকতে পারে।[১৩]

মনোযোগের বিস্তার
Span of attention

দৃষ্টির ক্ষেত্রে মনোযোগের বিস্তার লক্ষ্য করা গেছে কতগুলি পরীক্ষা করে। যেমন মেঝের ওপর একমুঠো মার্বেল ছড়িয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল একবার তাকিয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক লোক এক সঙ্গে ছ'টাকে দেখতে পান। কিন্তু গুলিগুলোকে একটা প্যাটার্ন করে তা ভাগ ভাগ করে (এক একভাগে তিনটি করে গুলি নিয়ে) যদি সাজানো হয় তবে তেমনি এক পলকপাতে ধারণা করা যাবে অনেক বেশী গুলির। কারণ মনের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে সম্পূর্ণতাকে প্রথমে আয়ত্তে আনার এবং তার পরে তাকে বিশ্লেষণ করার। সাজানো মার্বেলের বেলাও তাই—তিনটী মার্বেল এই একটী পরিপূর্ণ জিনিষের অংশ বলে ধরায় মন সহজে তাদের ধারণায় আনতে পারলো, বিচ্ছিন্ন মার্বেলগুলিকে এমন করে মনোযোগ এক সঙ্গে ধরতে পারে না। মনোযোগের

১৩ Spearman—The Nature of Intelligence and The Principles of Cognition. P. 131.

এ ক্ষমতাকে বলা হয় মনোযোগের ঐক্য বা সামঞ্জস্য বিধান (unity of attention)। এই সূত্রে এ কথা স্মরণযোগ্য যে এটি গেষ্টল্ট সাইকোলজীর মূল কথা,—ঐক্য আনয়ন ও একতাকে বুদ্ধিতে গ্রহণ।

এ ছাড়া স্মরণশক্তি যাঁর প্রখর এবং স্মৃতিতে যিনি জিনিষগুলোর ছবি তুলে নিতে পারেন তাঁর মনোযোগের বিস্তার অনেক বেশী। কেননা তিনি যা দেখলেন আবার স্মরণের সাহায্যে তিনি তাকে গণনা বা বিশ্লেষণ করতে পারেন।

শব্দের ক্ষেত্রে মনোযোগের বিস্তার লক্ষ্য করে মায়ার্স (Myers) দেখেছেন যদি কতগুলি বিশ্লিষ্ট টুক্‌রো টুক্‌রো শব্দ খুব তাড়াতাড়ি পর পর শব্দিত হয়, তবে পূর্ণবয়স্ক একজনের পক্ষে আটটি শব্দ শোনা সম্ভব।[১৪] চোখের বেলায় যেমন, তেমনি কানের বেলায়ও, সাজানো সুসংবদ্ধ সুরে শুনলে, অনেক বেশী শব্দের উপর আমাদের মনোযোগ হ'তে পারবে।

এর পরের প্রশ্ন, মনোযোগের স্থায়িত্ব কতখানি? কতক্ষণ এক বিষয়ে আমাদের মনোযোগ থাকে? পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে মনোযোগ অত্যন্ত অস্থির আর চঞ্চল। সমস্তক্ষণই এ একটা নতুন জিনিষের ওপর নিবদ্ধ হ'তে চায়। একটা জিনিষের ওপর অনেকক্ষণ মন দিয়ে তাকালেই দেখা যাবে, জিনিষটার থেকে মন সরে, নীচের টেবিলটার ওপরে পড়েছে। নিদেন অন্ততঃ জিনিষটার আকৃতি থেকে তার রংয়ের দিকে মন চলে গেছে। কোন একটা চিন্তায় জোর করে মনোযোগ দিয়ে রাখলেও, কিছুক্ষণ করে দেখা যায়, অজান্তেই মনোযোগ অধিকার করে আছে অন্য একটা চিন্তা। তাই খোকনকে যখন তাঁর মাষ্টার-মশায় বইয়ে মন না দেওয়ার জন্য মারেন, তখন তাঁর ভেবে দেখা উচিত অন্যদিকে মন দেওয়াটা শুধুমাত্র খোকনেরই দুষ্টামী নয়, মনোযোগ ব্যাপারটারও নষ্টামী আছে এর মধ্যে। মনোযোগের স্থায়িত্বের ওপরেও নানারকম পরীক্ষা হয়েছে যাতে প্রমাণিত হয়েছে মনোযোগ প্রত্যেক ৫।৬ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর কমে যায়।[১৫] তাই কোন জিনিষে আমরা একই সঙ্গে অনেকক্ষণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে মনোযোগ দিতে পারি না।

মনোযোগের অস্থিরতা
Oscillation of attention

কিন্তু কখনও কি কোন জিনিষে মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না? তাও

---

১৪ Myers—Text-book of Experimental Psychology. P. 322.

১৫ Collins and Drever—Experimental Psychology. P. 142.

হয়। যেমন দেখা গেছে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে দর্শক জগৎ সংসার ভুলে অপরিসীম মন দিয়ে দু ঘণ্টা ধরে খেলা দেখেছেন। কিন্তু সত্যিই কি নির্দিষ্ট বিন্দুতে তাঁর মনোযোগ স্থির ছিল? তা তো নয়। খেলা যত এগিয়েছে, মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে গেছে বল,—সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগও নড়েছে। কখনও বল থেকে খেলোয়াড়দের ওপর নিবিষ্ট হয়েছে, কখনও বা খেলোয়াড় থেকে বলে। কাজেই মনোযোগ বেশীক্ষণ কোন স্থির বস্তুতে থাকতে পারে না, একথাই সত্য। তবে কোন ঘটনা বা সমস্যার ওপর মনটা কিছু বেশীক্ষণ থাকতে পারে। সেখানেও ধাপে ধাপে মনোযোগ এগোবে এবং নড়বে এই হ'ল মনোযোগের বৈশিষ্ট্য। এ জাতীয় মনোযোগের আটকে থাকাকে বলা হয় আবদ্ধ মনোযোগ বা sustained attention। এই আবদ্ধ মনোযোগের ভঙ্গীতে দেহের স্থির কাঠিন্য সাধারণতঃ হয় না, বরং যে ঘটনা বা সমস্যার ওপর মনোযোগ, তাকে ভাল ভাবে একাগ্র করে দেখবার জন্য অস্থৈর্য্যের চাপল্যই শরীরে দেখা যায়।

দীর্ঘকাল স্থায়ী মনোযোগ Sustained Attention

এখানে মনোযোগের একটা কৌতুককর স্বভাবের ইঙ্গিত করা যেতে পারে। সেটা মনোযোগের সময় শরীরের অবস্থা। মনোযোগের সঙ্গে দেহের ভঙ্গীর সম্বন্ধ প্রায় অঙ্গাঙ্গী। মনোযোগের জন্য দেহের একটা তীব্র প্রস্তুতি থাকে। তাকে এ্যাটেন্‌সন্ সেট্ (attention set) বলা যেতে পারে। ভঙ্গীটা সব সময়েই একধরণের দেখা যায় তা নয়। যেমন মিলিটারী অফিসার যখন হাঁকবেন 'টেন্‌শন্'! সৈন্যরা হিল্ ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। একটা দৌড় প্রতিযোগিতার বেলায় কিন্তু প্রতিযোগীদের দৈহিক প্রস্তুতি হ'বে ভিন্ন রকমের। 'রেডি' বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝুঁকে হাত মুঠো করে, পা বাড়িয়ে, দৌড়ানর উপযোগী ভঙ্গী করেন। আবার বক্তৃতা শুনছেন একজন মনোযোগী শ্রোতা, তাঁরও দেহে মনোযোগের ছন্দ থাকবে। এটা আবার অন্য ভঙ্গী আগের দুটোর থেকে ভিন্ন। তিনি ঝুঁকে পড়ে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে বক্তৃতা শুনছেন, যেন বক্তার কথার একটুও অংশ ফাঁক পড়ে না যায়। কখনও কখনও দেখা গেছে, বক্তৃতাটা খুব সরস বা সুন্দর হ'লে শ্রোতা নিজের অজান্তেই নিজের আসন ছেড়ে, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছেন বক্তার টেবিলের সামনে। তবে সমস্ত মনোযোগের ভঙ্গীগুলো লক্ষ্য ক'রে মনোযোগের কতগুলি সাধারণ ভঙ্গী আছে বলা যায়,—যেমন, শরীর প্রতীক্ষায় ঋজু ও

মনোযোগের দৈহিক লক্ষণ Attention Set

কঠিন (tense), নিঃশ্বাস কখনও বা আগ্রহে স্তব্ধ,—শারীরিক সমস্ত ছোট-খাটো অস্থিরতা প্রয়োজনের দাবীতে প্রশমিত। একটু আগে আমরা উল্লেখ করেছি যে কোন উত্তেজনামূলক খেলা দেখতে গিয়ে, দর্শকদের অঙ্গসঞ্চালনও খেলোয়াড়-দের অনুরূপ হতে থাকে। এ ধরণের তীব্র মনোযোগ বা অন্যের সঙ্গে নিজেদের একীভূত হয়ে যাওয়াকে এম্প্যাথী (empathy) বলা হয়।

এ সমস্ত বাহ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরেও কতগুলি পরিবর্তন ঘটে। মনোযোগ হচ্ছে একাগ্র চিন্তা। এটা একটা সাধারণ তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া (reflex action) নয়। তাই মনোযোগের ফলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী (central nervous system) সব চেয়েই বেশী উত্তেজিত হয়। গভীর ভাবে মনোসংযোগ করবার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের স্নায়ুশিরাগুলি সক্রিয় হয়, মস্তিষ্কের কোষগুলি উত্তেজিত হয়। চোখ একাগ্র ও একনিবদ্ধ করার জন্য চোখেরও পেশী স্নায়ুগুলি কাজ করে। তেমনি কান এবং কখনও বা নাসিকার স্নায়ুজালে, এবং শরীরের পেশীগুলির মধ্যেও, কাজের সাড়া জাগে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ু-মণ্ডলে পরিবর্তন
Physiological changes

মনোবিজ্ঞানীরা আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে খুব মাথা ঘামিয়েছেন, একসঙ্গে দুই বা বেশী জিনিষে মনোসংযোগ করা যায় কি? কথাটা শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের পক্ষে একটি দরকারী আলোচনা। শিক্ষক যদি পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের ব্যবহারের দিকেও মন দিয়ে তাদের সংযত করতে পারেন তবে তার শিক্ষকতা হ'বে সার্থক ও সহজসাধ্য। কিন্তু এমনভাবে একই সঙ্গে দুটি প্রায় পরস্পরবিরোধী ব্যাপারে মন দেওয়া যায় কি? শোনা যায়, মাইকেল মধুসূদন এমন অসম্ভব সম্ভব করতে পেরেছিলেন। তিনি একসঙ্গে বসতেন তিনিটী পণ্ডিতকে নিয়ে। এবং একই সঙ্গে মুখে বলে তাঁদের দিয়ে লিখিয়েছিলেন, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা কাব্য এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মত তিনটি শ্রেষ্ঠ কাব্য। , আপাতদৃষ্টিতে এ ক্ষমতাকে অমানুষিক মনে হলেও, মনস্তাত্ত্বিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন—এ জাতীয় ক্ষমতা একেবারে অসম্ভব নয়। সাধারণ মানুষও একসঙ্গে দুটী জিনিষে মনোনিবেশ করতে পারে, যেমন অঙ্ক কষতে কষতে গান করা. বা রান্না করতে করতে সংখ্যা গণনা করা, এগুলি এরকম দু' জিনিষে মনোনিয়োগের দৃষ্টান্ত। মধুসূদনের মত তিনটী কাব্য-সৃষ্টিতে একসঙ্গে

একাধিক বিষয়ে মনোযোগ
Attending to two things at once

মনোনিবেশ করা অবশ্যই গভীর বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতার পরিচয়। তবে অভ্যাসের ফলে, সে-রকম মনোযোগও সাধারণ মানুষের একেবারে অসাধ্য নয়।

উড্‌ওয়ার্থ কিন্তু বলেন, সত্যি কথা বলতে গেলে, একই সঙ্গে দুই বিষয়ে মন আমরা দিতে পারি না। যাকে বলা হয় একসঙ্গে মনোযোগ, তার অর্থ, আসলে, খুব দ্রুত পর পর দুটো জিনিষের ওপর মনোযোগ। এক মুহূর্তের জন্য মাত্র একটা বিষয়েই আমাদের মনোযোগ থাকতে পারে। এবং খুব তাড়াতাড়ি মন সরানোর ফলে মনে হয় একই সঙ্গে আমরা দুটোকে চিন্তা করেছি। এরকম ক্রমিকভাবে (successively) দু জিনিষে মনোযোগ করা ছাড়া, তিনি আরেক রকম পদ্ধতির কথা উল্লেখ করলেন। দুটো জিনিষে আমরা একসঙ্গে মন দিতে পারি, যদি আমরা সেই দুটোকে একটা সম্পূর্ণ বস্তুর অংশ বলে ধ'রে নিই। যেমন প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, আমরা তার সমস্ত মুখের ওপরে মনোযোগ দেবো এবং একই সঙ্গে তার কপাল, ভ্রূ, চোখ, নাক আমাদের মনোযোগের আলোকে উদ্ভাসিত হ'বে। এদের একসঙ্গেই দেখবো, কেন না এরা একটা পূর্ণ বিষয়ের অঙ্গ হিসাবে রয়েছে।

সুতরাং "দুটি বিভিন্ন জিনিষে মন দিতে চেষ্টা করলে, মন একটা দ্রব্য থেকে অন্যটায়, আবার পূর্বেরটায়, এভাবে একবার এটা, একবার ওটায় চলাচল করতে থাকে, অথবা দুটি জিনিষকে কোন একটা মনোহর সূত্র দিয়ে একত্র বেঁধে নেয়। একঝাঁক পায়রার দিকে একই মুহূর্তে মনোযোগ সম্ভব এবং জিনিষগুলিকে নানা প্রকারের একতার সূত্র দিয়ে বহুভাবে আমরা বাঁধতে পারি, কিন্তু মনের মধ্যে দুটি জিনিষকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখে, একই সঙ্গে দুটিতে মনোযোগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক মনে হয়, যেমন মনে হয় একই মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি দিকে তাকানো।"[১৬]

এরকম দুই বিষয়ে মনোযোগের ফল কিন্তু খুব ভাল হয় না, কারণ এখানে স্পীয়ারম্যান্-এর মনেযোগ বিস্তারের রীতি অনুসারে মানসিক শক্তিটা দুদিক দিয়ে খরচ হ'চ্ছে। ফলে, দুটো বিষয়ের কোনটাই পরিপূর্ণ মনোযোগে পাবে

১৬ Woodworth—Psychology P. 44.

না। তবে যদি একটা বিষয়ে মনোযোগ অনেকটা যান্ত্রিক এবং স্বয়ংচালিত হয়ে পড়ে,—সেদিকে অবশ্য মনোযোগের খরচ হবে সামান্য। যেমন একটা পরিচিত গানের প্রথম অংশটায় মনোযোগ দিলেই, পরের দিকটা আপন হ'তে বিনা চেষ্টায়ই মন এসে যায়।[১৭] সেলাই করার সময় সে গানটা গাইলেও সেলাইয়ে মন দেওয়া বেশী অসুবিধার হয় না। এ সম্বন্ধে 'অভ্যাস' প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

এবার একটা মূল প্রশ্ন ওঠে, আমরা কেন মনোযোগ দিই। মনোযোগ আকর্ষণ করার কৌশল কি? মনস্তাত্ত্বিকরা এই মনোযোগের হেতুগুলি (conditions of attention) পরীক্ষা করে বের করেছেন।

মনোযোগের হেতু
Conditions of Attention

মনোযোগের একটা বিশেষ গুণ আমরা লক্ষ্য করেছি, তা হচ্ছে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। মন সেই বস্তুকে বেছে নেয়, যা স্বভাবতঃই অন্যদের থেকে পৃথক এবং নজরে পড়ার মত। কাজেই অন্যদের থেকে বিশ্লিষ্ট হওয়ার গুণটা (contrast) বস্তুর থাকা চাই। বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যে যে ব্যবস্থা দরকার, স্বভাবতঃ মনোযোগ হওয়ার জন্যও সেই ব্যবস্থাগুলিরই প্রয়োজন হয়। মনোযোগ ব্যাপারটার জন্য তাই বিষয়ের দিক থেকেও যেমন প্রস্তুতি থাকবে, তেমনি যিনি মনোযোগ দেবেন সেই ব্যক্তির দিক দিয়েও মানসিক সাড়া থাকা চাই। ষ্টাউট্ একটিকে বল্লেন, প্রভেদ বোধের বস্তুগত কারণ (objective condition of discrimination), আর একটিকে বল্লেন, ব্যক্তির কর্ম ও ইচ্ছার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত কারণ (subjective factors arising from the conative life of the experient)।[১৮]

প্রথমে বস্তুর দিক দিয়ে কি গুণ থাকা দরকার, তা লক্ষ্য করা যাক্। (১) উত্তেজক বস্তুটা (stimulus) এমন প্রচণ্ড (intense) হওয়া চাই যাতে অসংখ্য

বস্তুগত কারণ
The objective conditions

দুর্বলতর বস্তুর (weaker stimuli) থেকে মনোযোগ ছিনিয়ে নিজের ওপর নিতে পারে; বিষয়ের সবলতা (strength) আর প্রচণ্ডতা (intensity) তাই মনোযোগ আকর্ষণ করবে। যেমন, রেগে গিয়ে জোরে চীৎকার করে

১৭ Ross. Groundwork of Educational Psychology P. 179.
১৮ Stout. Manual of Psychology P. 167.

ভৃত্য হরিকে যখন ডাকবে, তখন সে নিশ্চিত ভাবে ডাকটা শুনবে, কিন্তু খুব মৃদু মোলায়েম কণ্ঠে ডাকলে সে ডাক হয়তো তার কানে পৌঁছাবে না। কেন না জোরালো উত্তেজক যেমন তাড়াতাড়ি মনোযোগ আকর্ষণ করে, ক্ষীণ উত্তেজক তেমন করতে পারে না।

উত্তেজকের তীব্রতা Intensity

(২) তেমনি বস্তুটা যদি আকারেও জায়গা জোড়ে বেশী, তবে তার দিকে তাড়াতাড়ি চোখ ও মন পড়বে। এটাকে বলব বিস্তৃতির (extensiveness) গুণ। ছোট ছোট হাজারো কীট-পতঙ্গকে আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করবো, কিন্তু একটা হাতী রাস্তা দিয়ে গেলে, না তাকিয়েই পারবো না।

বিস্তীর্ণতা Extensity

(৩) কিন্তু সব সময়ে যে জোরে শব্দ বা বড় জিনিষেই আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, তা নয়। একটা জিনিষ পুনরাবৃত্তির (repetition) ফলে আমাদের মনে গভীর ছাপ ফেলতে পারে। তাই যে পড়াটা পরীক্ষার জন্যে দরকারী সেটা বারে বারে পড়ে মুখস্থ করি। ভাল না লাগলেও বারে বারে পড়ার ফলে বিষয়টায় মন বসে।

পুনরাবৃত্তি Repetition

(৪) কিন্তু পুনরাবৃত্তি বেশীক্ষণ মনোযোগ টানতে পারে না। পুনরাবৃত্তির বাহুল্যেও মনোযোগ নষ্ট হয়। যেমন অনেকক্ষণ ধরে রেলগাড়ীতে চড়ে, রেল-গাড়ীর শব্দ শুনতে শুনতে, আমাদের শব্দের বোধ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। একঘেয়েমীর ফলে মনোযোগও সেটার থেকে স'রে যায়। তখন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, বিষয় পরিবর্তন। এদিক থেকে মনোযোগ ও অভ্যাস সম্পূর্ণ বিপরীত। যা পুরোণো যা অভ্যস্ত, তা মনকে টানে না। শিক্ষায় এই পরিবর্তনটার ওপর মনস্তাত্ত্বিকরা খুব বেশী ঝোঁক দেন। দেখা গেছে ঝিমন্ত নিতান্ত অমনোযোগী ক্লাসকে উৎসাহে আবার চঞ্চল করতে পারেন অধ্যাপক, যদি তিনি একঘেয়ে বক্তৃতার বিষয় পরিবর্তন করে একটী হাসির গল্প বলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরে যাওয়া সমস্ত মনোযোগ একঝাঁক ভোমরার মত আবার তাঁর গল্পে এসে বসে। ঘড়িটা যতক্ষণ চলছিল তাকে খেয়াল করিনি—যখন থামলো অমনি নজর করলাম, এটা হ'ল শব্দে পরিবর্তনের ফলে।

পরিবর্তন-শীলতা charge

(৫) সাদা টেবিল ক্লথটায় অনেকটা কালি পড়ে গেছে, ঘরে ঢোকা মাত্র

সেটা নজরে পড়বে, কেন না জিনিষটা মনোযোগের ওপর ঘা দেয় (striking)।

আকর্ষণীয়তা
Striking
quality

কালির দাগটা সাদার সঙ্গে তীব্র বিরোধিতায় শুয়ে আছে, তাই সেটা নজর টানে। এ জন্য বিরোধ (contrast) মনোযোগ আকর্ষণের একটি মস্তবড় উপায়। ষ্টাউটের ভাষায় এটা হল বস্তুর ষ্ট্রাইকিং কোয়ালিটি অথবা আকর্ষণীয় গুণ, যা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

(৬) খাঁচার মধ্যে গিনিপিগ্‌টা সবচেয়ে আগে খোকনের মন টানলো,

নূতনত্ব
Novelty

কেন না জীবটা তার কাছে একদম নতুন। এখানে বিষয়বস্তুর নতুনত্ব (novelty) মনোযোগ টানতে সাহায্য করলো। নতুন কিছু দেখলে আমাদের ঔৎসুক্য স্বভাবতঃ সে দিকে যায়, এই হ'ল নতুনত্বের গুণ।

(৭) মনোযোগ টানবার আর একটা উপায় উত্তেজক বস্তুর আকস্মিকতা

আকস্মিক
Suddenness

(suddenness)। হঠাৎ যে বিদ্যুৎ ঝলসে গেল, তার চমকটা অকস্মাৎ বলেই চোখে পড়বে।

(৮) ষ্টাউট বলেন দৃষ্টিক্ষেত্রের মাঝখানে যা থাকবে তাই মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এইজন্য ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতে হলে, তাঁর সবচেয়ে আকর্ষণের

Central
Position
কেন্দ্রবর্ত্তিতা

বস্তুটি রাখেন, ঠিক ছবির মধ্যখানে, যাতে করে, ছবি দেখতে গেলে ঠিক সেখানেই নজর পড়ে। এটা অবশ্য একেবারে ঠিক করে বলা যায় না, যে মধ্যখানে থাকলেই নজর পড়বে। এমন দেখা গেছে, ছবির প্রত্যন্তদেশের গাছটার দিকে মনোযোগ গিয়ে পড়েছে—মাঝখানের রাস্তাটাকে একেবারে বাদ দিয়ে।

(৯) অনেকে আবার বলেন—নড়ন্ত জিনিষ যত সহজে চোখে পড়ে, স্থির বস্তুতে তেমন নজর হয় না। পিলস্‌বেরী উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, যদিও একখণ্ড

গতিশীলতা
Motion

কাগজ রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে উড়ে যায়, তা হ'লে ঘোড়া চমকে যায়, কিন্তু সে কাগজ এমনি পথের মধ্যে পড়ে থাকলে ঘোড়া শান্ত থাকে।[১৯]

ব্যক্তিগত কারণ
Subjective
condition

এতো গেল বস্তুর গুণাবলীর ফর্দ। কিন্তু ব্যক্তির দিক থেকে যে সাড়া প্রয়োজন, মনোযোগের ক্ষেত্রে তার মূল্য অসামান্য।

১৯ Pillsbury—Attention. P. 48.

দৈহিক অবস্থা Physiological state

(১) প্রথম তো ব্যক্তির মনটী সুস্থ আর সবল হ'তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরও সুস্থ থাকা প্রয়োজন। সুস্থ দেহমন ম নঃসংযোগের সহায়ক।

পূর্ব পরিচিতি acquaintance

(২) তা ছাড়া কোন জিনিষের সঙ্গে আমাদের আগে পরিচয় থাকলে, সে বস্তুতে মনোযোগ পড়বে সহজে। যেমন, তোমার নিজের নামটা যদি কোন বইয়ে ছাপা থাকে, অন্য সমস্ত লেখা বাদ দিয়ে, সেখানে তোমার চোখ আটকাবে যেখানে তোমার নাম একান্ত পরিচিত চোখে চেয়ে আছে।

সহজাত প্রবৃত্তি Instinctive disposition and conation

(৩) সবচেয়ে দরকারী কারণের কথা বর্ণনা করেছেন ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ ও ষ্টাউট্‌। এঁরা বলেন মনোযোগ হওয়ার প্রধান কারণ, আমাদের চরিত্রের প্রবৃত্তিগত গঠন। মনোনিবেশের মধ্যে প্রবৃত্তি (instinct) এবং ইচ্ছার (conation) রয়েছে, প্রায় সব-জোড়া জায়গা। মনোযোগ করবো, কেন না তার পেছনে ইচ্ছার তীব্র উত্তেজনা আছে এবং সেই ইচ্ছাকে পরিচালিত করেছে আমাদের চরিত্রগত অমোঘ প্রবৃত্তি (instinct)। ইচ্ছার আবেগ আর প্রবৃত্তির বেগই হ'ল মনোযোগ হওয়ার চরম কথা। এরা না থাকলে কোন বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য (interest) থাকতে পারে না। আর ঔৎসুক না থাকলে, কেনই বা মনোযোগ হবে?

ঔৎসুক্য Interest

মনস্তাত্বিকদের মতে মনোযোগ আর ঔৎসুক্য (interest) একটা অচ্ছেদ্য মিলনের গ্রন্থিতে বাঁধা। এক ভিন্ন অপরের অস্তিত্ব অর্থহীন। আমরা তাতেই মন দেই যার সঙ্গে আমাদের স্বার্থের সম্বন্ধ আছে, যা আমাদের আগ্রহান্বিত করে। সে দ্রব্যে আমাদের আগ্রহ, যা আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।[২০] এই আগ্রহ সব চেয়ে বেশী হবে, যখন এর পেছনে আমাদের প্রবৃত্তির (instinct) তাগিদে আছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে গেল, বা জোরে শব্দ হল তখন যে আমরা মনোযোগ দিই, তা কি কেবল এইজন্যই, যে বিদ্যুৎটা হঠাৎ বা শব্দটা জোর? আমাদের মনের মধ্যেও তাদের ওপর মন দেবার কারণ আছে বই কি। আমরা মন দিই, কেন না এ রকম শব্দ বা বিদ্যুৎ আমাদের বিচলিত করবে। আমাদের স্বার্থের সঙ্গে এদের যোগ আছে। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ বলবেন এ সমস্ত বিষয়ে

সহজাত প্রবৃত্তি ও ঔৎসুক্য Instinct & Interest

২০ Ross—Groundwork of Educational Psychology. P. 171.

আমরা মনোযোগ দিই, কেন না তারা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির তারে ঘা দেয়, অমনি সে প্রবৃত্তি চমকে ওঠে, ঔৎসুক্য জাগে বস্তুটার প্রতি, যার ফলে আমরা তাতে মনোযোগী হই। শব্দের জোর আর বিদ্যুতের চমকানি আমাদের মনে ভয় আর বিস্ময়ের তরঙ্গ তুললো বলে, তাতে মনোযোগ হ'ল। এখানে ভয় আর বিস্ময়ের সংস্কার বা প্রবৃত্তিই মনোযোগ দেওয়ার মূল কারণ। ম্যাক্‌ডুগ্যাল উপমা দিয়ে বলেছেন, এই বাইরের উত্তেজকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির তালা খুলবার চাবিকাঠি।[২১]

সহজাত প্রবৃত্তির অবচেতন প্রেরণায় আমরা বস্তুতে উৎসুক হই, কেন না সে বস্তু গভীরভাবে আমাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট। মনোযোগের মধ্যে যে বাছাই করার শক্তি আছে, তার জন্য আসলে এই সহজাত প্রবৃত্তিই দায়ী "আমরা এ জাতীয় দ্রব্যে মন দি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের স্বার্থের সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। যে হেতু, আমরা দ্রব্যটিতে আগ্রহান্বিত। সেই দ্রব্যে আমরা আগ্রহান্বিত যা আমাদের স্বার্থের সঙ্গে সব চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।[২২]

কিন্তু এই ঔৎসুক্যটা কিসে? এটা কি বস্তুর গুণ? জিনিষটা আমার প্রয়োজন, তাই তাতে ঔৎসুক্য? অথবা ঔৎসুক্য হ'ল ব্যক্তির মনের একটা অবস্থা, যা তাকে আগ্রহ-ব্যাকুল করে রাখে। প্রথম সম্ভাবনাটা আমরা ছেড়ে দিয়ে বলবো, বস্তুতে ঔৎসুক্যের উপাদান থাকতে পারে, তবু বস্তুটা নিজে কখনও ঔৎসুক্য নয়। তবে কি যিনি উৎসুক, তারই মনের একটা ক্ষণিক চাঞ্চল্য, এই ঔৎসুক্য?

ঔৎসুক্য কি
What is interest?

তা যদি হয়, তবে কেন শয়নে, স্বপনে, চেতনে, অচেতনে সেই ঔৎসুক্য তার মনে সর্ব্বদা থাকবে। মার খোকাটী সম্বন্ধে যে মনোযোগ আর ঔৎসুক্য (interest) তাকি শুধু চপল মুহূর্ত্তের অনুভূতি মাত্র? মনস্তাত্ত্বিক বলবেন, ঔৎসুক্য হচ্ছে এমন একটি স্বভাব, যা মানুষের চরিত্রের গঠনের মধ্যেই স্থায়ীভাবে থাকে। মার মাতৃত্বের যে সংস্কার বা প্রবৃত্তি (instinct) তা যেমন তাঁর সহজাত,—তা হ'তে উদ্ভূত এই ঔৎসুক্য (interest) ও তেমনি তাঁর চরিত্রের গঠনগত একটা স্বভাব যা ঝেড়ে ফেলা যায় না, ইচ্ছা অনুসারে। ঔৎসুক্য একটা ভাবকে (idea) কেন্দ্র করে একটা মানসিক গঠন সৃষ্টি করেছে যা মনোযোগের মধ্য দিয়ে

২১ Ross—Groundwork of Educational psychology, P. 172.

২২ Ibid—P. 171.

কাজ করে। ঔৎসুক্যের স্থায়ী অবস্থার পশ্চাতে থাকে একটি ভাবকে কেন্দ্র করে মানসিক গঠন (Sentiment)। ঔৎসুক্য হচ্ছে এই স্থায়ী সহজাত প্রবৃত্তির সক্রিয় দিক।[২৩]

ড্রাউট্‌ ঔৎসুক্যের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তা এখানে বলে নিই। সব সময়ই যে সুখকর জিনিষে আমাদের ঔৎসুক্য জাগবে এমন নয়। খড়ের ঘরে থেকে, যখন পাশের বাড়ীতে আগুন লাগল, সে সম্বন্ধে উৎসুক আর মনোযোগী হব, তা আরামজনক বলে নয়। তা প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায়। কাজেই ওটার পেছনে প্রবৃত্তির (instinct) উদ্বেগ আছে,—সুখের চেতনা কিছু নেই।

ঔৎসুক্য এবং অপ্রীতিকর দ্রব্যে মনোযোগ Interest & attention to displeasing object

একটু আগেই বলেছি ঔৎসুক্য অনুভব করা হচ্ছে মনোযোগ দেবার প্রথম স্তর। আরও দেখেছি যে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে বেশী আগ্রহ আর ঔৎসুক্য তা এসেছে আমাদের চরিত্রগত প্রবৃত্তির (instinct) থেকে। এই প্রবৃত্তি (instinct) জন্মগতভাবে আমাদের স্বভাবে আছে। কিন্তু আরেকটা উঁচুধরণের স্বভাবের কথা মনোবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন, সেটাও এই ঔৎসুক্য জাগাতে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় সেন্টিমেণ্ট বা শুদ্ধ অনুভূতি। এটা জন্মগত সংস্কার নয়,—চেষ্টাকৃত মনের একটা অবস্থা কোন ভাবকে কেন্দ্র ক'রে এই অবস্থা ধীরে ধীরে নিজের জটিল চরিত্র গড়ে তুলেছে, এবং যে ভাবটি এর কেন্দ্র তাকে চেষ্টাকৃত ঔৎসুক্যের বিষয়বস্তু (object of acquired interest) বলা হয়। যেমন ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে একজনের জন্ম থেকে কিছু ঔৎসুক্য ছিল না। কিন্তু চেষ্টা ও বুদ্ধির ফলে ধীরে ফটোগ্রাফীতে তার উৎসাহ ও লিপ্সা এসেছে। অবশেষে ফটোগ্রাফীতে তার সংস্কার (instinct) গুলির মত স্বভাবের অঙ্গ হ'য়ে গেছে। ফটোগ্রাফীতে তার ঔৎসুক্য চেষ্টাব ফলেই এসেছে, কিন্তু তা হ'লেও এখন সেই ঔৎসুক্যের জন্যে কষ্ট কর চেষ্টা নেই। আপনা হ'তেই তার মনোযোগ নেমে এসেছে এতে। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে ফটোগ্রাফীর শুধুমাত্র জ্ঞান এমন ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারতো না, যদি না এর সঙ্গে সৃষ্টির আনন্দের একটা অনুভূতি থাকত। অর্থাৎ সেন্টিমেণ্ট গড়ার জন্য অনুভূতির প্রাধান্যই হ'বে সবচেয়ে বেশী।

শুদ্ধ অনুভূতি Sentiment

২৩ Ross—Groundwork of Educational Psychology. P. 171

সহজাত প্রবৃত্তি আর শুদ্ধ অনুভূতির আলোচনা থেকে একটা কথা আমরা খুব পরিষ্কারভাবে পাই, ঔৎসুক্য (interest) যেমন এদের থেকে জাগবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগকেও সে কাজে লাগাবে। সুতরাং মনোযোগ (attention) আর ঔৎসুক্য (interest) একটা জিনিষেরই তুপিঠ। ঔৎসুক্য যদি হয় একটা গঠিত স্বভাব, মনোযোগ হবে সেই স্বভাবের অভিব্যক্তি। মনোযোগে ঔৎসুক্যের বাহন হিসাবে কাজ করবে। "কোন ব্যাপারে ঔৎসুক্য থাকা অর্থই সে বিষয়ে মন দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি, এবং মনোযোগের পেছনে একটা মানসিক গঠনের সক্রিয়তা আছে সেটা ধরে নেওয়া যায়···কাজেই ঔৎসুক্য হচ্ছে সুপ্ত মনোযোগ, আর মনোযোগ হচ্ছে ক্রিয়াতে ঔৎসুক্য"—interest is latent attention, and attention is interest in action।[২৪]

মনোযোগ ও ঔৎসুক্য
Attention & Interest

কিন্তু মনোযোগ কি সহজাত প্রবৃত্তি আর বিশুদ্ধ অনুভূতি থেকে এসেছে অনায়াসে? কখনও কি জোর করে বি-রস বস্তুতে মন বসাই নি? যেখানে ঔৎসুক্য ছিল না, তেমন কঠিন অঙ্কের পেছনে কি অনেক পরিশ্রম, অনেক মনোযোগ খরচ হয় নি? প্রবৃত্তি (instinct) আর সেন্টিমেণ্ট থেকে বিনা আয়াসে যে মনোযোগ এসেছিল, না হয় তাদের ক্ষেত্রে ঔৎসুক্যের সঙ্গে মনোযোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পেলাম। কিন্তু যেখানে জোর করে ইচ্ছার চাবুক মেরে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, সেখানেত ঔৎসুক্যের (interest) সঙ্গে মনোযোগ (attention) এর গভীর বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে?

রস্ আমাদের আশ্বস্ত ক'রে বল্লেন, চিন্তা করে দেখলে দেখবো নীরস (uninteresting) বস্তুও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের উৎসুক করে,—কেন না তা আমাদের স্বার্থের সঙ্গে বিজড়িত। অঙ্ক কষাটা আনন্দের না হ'তে পারে, কিন্তু অঙ্ক কষে পরীক্ষা পাশ করলে, আমার কিছু লাভ হ'তে পারে এই চেতনাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তার ওপরে অঙ্কের কাছে হেরে যাবো, এমন পরাজয়ের লজ্জাও কি আমাদের আত্মাভিমানকে উৎসুক করে না? কাজেই এখানেও একটা বিশুদ্ধ অনুভূতি র'য়ে গেছে, যা মনকে টানবে। হারবো না এমন পণ করে, আমরা আমাদের সমস্ত চেতনাকে এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করি। ইচ্ছার কষায় সমগ্র ব্যক্তিত্ব উদ্বোধিত হয়। এখানে

২৪ Mcdougall—Outline of Psychology. P. 272

ঔৎসুক্য একটা মাত্র প্রবৃত্তি বা অনুভূতিতে ঘা দেয় না, সমস্ত ব্যক্তিত্বকে উদ্দীপ্ত করে। কাজেই ইচ্ছাকৃত মনোযোগ এ নীতির ব্যতিক্রম নয়, যে মনোযোগ হচ্ছে ক্রিয়ার প্রতি ঔৎসুক্য ; বরঞ্চ তা এ নীতির পরিপোষক। এখানে ক্রিয়ার প্রতি যে ঔৎসুক্য সেটা হচ্ছে আত্মসম্মান বোধ,—অহং-এর প্রতি স্বাভাবিক গভীর অনুরাগের অনুভূতি সঞ্জাত।[২৫] ('আবেগ ও অনুভূতি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ইচ্ছায় দেওয়া, আর বিনা ইচ্ছার আসা, মনোযোগের এই বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে মনোযোগ সবই এক ধরণের নয়। তাদের মধ্যে জাতিভেদ আছে। প্রথমেই তাই মনোযোগের খুব মোটা একটা ভাগ করা যায়—(ক) ইচ্ছাকৃত (volitional) এবং (খ) বিনা ইচ্ছাকৃত মনোযোগ (non-volitional attention).

বিভিন্ন শ্রেণীর মনোযোগ Kinds of Attention

(ক) কোন কোন বস্তুতে আমরা জোর করে মন বসাই। যেমন, পড়াশোনায় ছোট ছেলের মন বসানোটা চেষ্টা ও ইচ্ছাসাপেক্ষ। এই মনোযোগের আবার দুটো প্রকার আছে। (১) একবার ইচ্ছায় বসানো মনোযোগ (Implicit volitional attention by one single act of will)—যেমন ধরা যাক্ সঙ্গীত। একবার চেষ্টা করে মন বসালে, মনোযোগ বেশ কিছুক্ষণের জন্য সেখানে নিবিষ্ট হ'ল।

ইচ্ছাকৃত ও বিনা ইচ্ছাকৃত মনোযোগ

(২) আরেকটা প্রকার হ'ল বারবার চেষ্টা ও ইচ্ছায় বসানো মনোযোগ (explicit volitional attention by repeated acts of will)। যেখানে বারে বারে চেষ্টা করে মন দিতে হ'চ্ছে, সেখানে মনোযোগের পেছনে ইচ্ছার চেহারাটা প্রকট। যেমন, কোন নীরস ক্লাসের বক্তৃতার প্রতি মনোযোগ, যেখানে বার বার মনকে জোর-জবরদস্তি করে বসাতে হ'চ্ছে।

(খ) বিনা আয়াসকৃত (non-volitional) মনোযোগকেও দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) প্রথম শ্রেণীটা হল প্রবৃত্তির তাড়নায় যে অনায়াস মনোযোগ (non-volitional enforced attention by an instinct) যেমন, মুরগীর বাচ্চাটা ঘুরতে ঘুরতে ঠিক শস্যের দানাটিতেই মনোনিবেশ

২৫ Ross—Groundwork of Educational Psychology. P. 172.

করবে, অন্ত ঘাস মাটি অগ্রাহ্য করে'। এখানে ওর অনায়াস মনোযোগের পেছনে প্রাণ বাঁচানো প্রবৃত্তির তাগিদাটা জোরালো।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীটা হ'ল শুদ্ধ অনুভূতি (sentiment) দ্বারা উদ্রিক্ত মনোযোগ (non-volitional spontaneous attention sustained by a sentiment), যা একই সঙ্গে অনায়াস এবং স্বতঃস্ফূর্ত। চিত্রকরকে নদীর বাঁকটা স্বতঃই আকর্ষণ করবে তার জন্ত ইচ্ছা বা চেষ্টার অপচয়ের প্রয়োজন নেই।

এছাড়া বিভিন্ন লোকের মনোযোগ বিভিন্ন প্রকারের হ'য়ে থাকে। সে অনুসারেও মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ করা চলতে পারে। এ জাতীয় একটা ভাগ হ'ল (গ) গভীর মনোযোগ (intensive attention) এবং (ঘ) বিস্তৃত মনোযোগ (distributive attention)।

এক বিষয়ে গভীর মনোযোগ ও বহু বিষয়ে ছড়ানো মনোযোগ Intensive and distributive attention

দেখা গেছে, কয়েকজন এক ব্যাপারেই মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং সে মনোযোগটা তাঁরা গভীর ও তীব্রভাবে (intensely) করেন। সাধারণতঃ জ্ঞানী মনীষীদের মধ্যে এই ধারণাটা দেখা যায়, যে একটা চিন্তা নিয়ে তাঁরা কোন বিষয়ে ডুবে যেতে পারেন। তখন জগৎ তাঁদের কাছে বিলুপ্ত হয়।

বিস্তৃত মনোযোগে অন্য ধরণের গুণ দেখা যায়। এক একজন একই সঙ্গে বিভিন্ন জিনিষে মনোযোগ করে থাকেন, কিন্তু কোনটাতেই তাঁদের মন তত গভীরভাবে নিবিষ্ট হয় না। যেমন, একজন ব্যবসায়ী একই সঙ্গে অনেক জিনিষের বাজার দর জানছেন, তবে কোনটার ওপরই তীব্র মনোনিবেশের তাঁর প্রয়োজন নেই। তবে এঁরাও ইচ্ছা করলে গভীরভাবে এক বিষয়ে মন দিতে পারেন। এই বিভাগের কাছাকাছি আরেকটা বিভাগ করা হ'য়েছে (ঙ) স্থির মনোযোগ (fixating attention) এবং (চ) অস্থির মনোযোগ (Fluctuating attention)।

যাঁরা স্থির মনোযোগী, তাঁদের মনোযোগ অচঞ্চলভাবে কোন দ্রব্যের ওপর থাকে। ব্যাখ্যার সময় তাঁরা সে জিনিষটার যথাযথ ও সূক্ষ্ম বর্ণনা দিতে পারে।

স্থির মনোযোগ ও অস্থির মনোযোগ

যাঁর মনোযোগ অস্থির, তিনি কোন জিনিষে যত না মনোযোগ করেন, কল্পনার যোগ করেন অনেক বেশী। কাজেই জিনিষটার

স্বভাব ব্যাখ্যায় প্রায়ই তাঁর কল্পনার রংয়ের মিশ্রণ থাকে, ফলে বর্ণনাটা সত্যকে এড়িয়ে যায়।

চলন্ত ও স্থবির মনোযোগ
Dynamic & static

আরও একজাতীয় বিভাগ করা যায় (ছ) চলন্ত মনোযোগ (dynamic attention) ও (জ) স্থবির মনোযোগ (Static attention)। যাঁদের মনোযোগ নড়ন্ত তাদের মনোযোগের প্রতিমুহূর্তে মনের ওপর ইচ্ছার চাপ দিতে হয়। তেমনি স্থবির মনোযোগী একবার চেষ্টা করে মন দিলেই, তার মনোযোগ সেখানে থমকে থাকে। খুব বেশী নড়চড় হয় না।

(ঝ) শিশুদের মনোযোগ আর (ঞ) বয়স্কদের মনোযোগের ধরণের মধ্যে তফাৎটা সামান্য নয়। শিশুরা রংচংয়ে বস্তুতে যত মনোযোগ দিয়ে থাকে, কথার কচকচিতে তাদের তেমন মনোযোগ হয় না।

বড়রা শিশুদের চেয়ে মনের দিক দিয়ে পরিণত বলে, শুধু বস্তুতে তাঁদের মন ভোলে না, তারা নির্বস্তুক চিন্তায় বা কথা বলায় মন দেন ঢের বেশী।

এ ছাড়া শিশুদের ঔৎসুক্য (interest), প্রবৃত্তির (instinct) প্রেরণায় বেশী আসে, গভীরতর অনুভূতি বা সেন্টিমেণ্ট তাদের তেমন নাড়া দেয় না।

বড়রা প্রবৃত্তির চেয়ে সেন্টিমেণ্ট বা গভীর অনুভূতিতে বেশী বিচলিত হন। প্রধানতঃ, আত্মাভিমানের অনুভূতি তাঁদের বিশেষ করে প্রভাবিত করে। শিশুদের এই অনুভূতিটা অত বেশী প্রখর হয় না।

স্ঠাণ্ডিফোর্ড কতগুলো পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন (ত) মেয়েদের মনোযোগ আর (থ) ছেলেদের মনোযোগের মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। দেখা গেছে, মেয়েরা কবিতাতে যেমন মন দেয়,—ছেলেরা দেয় তার চেয়ে ঢের কম। আবার অঙ্কে বা মেকানিক্‌সে ছেলেরা যত রস পায়,—মেয়েদের তাতে উৎসাহ তার এক চতুর্থাংশও নয়।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যদ্রব্য মনোযোগ ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য বিষয়ে মনোযোগ

এ ছাড়াও মনোযোগের আরও বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে,—যেমন (দ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষে মনোনিবেশ (sensorial attention), এবং (ধ) বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ে মনোনিবেশ (intellectual attention)। ইন্দ্রধনু প্রত্যক্ষ ক'রে আমরা যখন মনোযোগী হই, তখন তা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্যে মনোযোগ, আবার যখন দর্শনের আলোচনায় মন দিই, তা বুদ্ধি গ্রাহ্য বিষয়ে মনোযোগ। আরেক জাতীয়

Sensorial and Intellectual Analytic and synthetic

বিভাগের কথা উল্লেখ করা যায়,—(ট) বিশ্লেষণ-ধর্মী মনোযোগ (analytical attention) এবং (ঠ) সমন্বয়ধর্মী মনোযোগ (synthetic attention)। কখনও কোন জিনিষে মনোযোগ করে, আমরা তার বিশ্লেষণে মন দিই,—কখনও বা আমাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন বস্তুসমষ্টিকে এক করে তুলতে সাহায্য করে। এ ধরণের অনেক ছোটখাটো মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। বাহুল্যবোধে আমরা তা থেকে বিরত হচ্ছি।

সর্বশেষে মনোযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন, মনোযোগের ফলে কি হয়, এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানে মনোযোগকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায়?

মনোযোগ যে আমাদের চিন্তাধারাকে সুগম ও সুসাধ্য করে, একথা অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা মনোযোগ দিয়াছিলাম, কেন না, তা নিয়ে আমরা চিন্তা করতে চেয়েছি। তাই জ্ঞান বা চিন্তার ওপর মনোযোগের প্রভাব যথেষ্ট। কাজেই

মনোযোগের ফল ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার

শিক্ষা-বিজ্ঞান, চিন্তা নিয়ে যার কাজ-কারবার, সেও মনোযোগের ফলে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি মনোযোগের ফলে বস্তুকে আমরা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। এই স্পষ্টতা আনবার জন্য মনকে যথেষ্ট শক্তি খরচ করতে হয়। কিন্তু পটভূমিকা থেকে জিনিষটা বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াই মনোযোগের একমাত্র কাজ নয়। বস্তুটিকে জানার সময়ও সে সংক্ষেপ করে। অর্থাৎ মনোযোগ দেওয়ার ফলে জিনিষটা আমাদের তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আসে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, এই সময় আর পরিশ্রম বাঁচানোটা, কম কথা নয়। মন দিয়ে যা পড়া হ'য়েছে, তা শেখা হ'য়েছে তাড়াতাড়ি,—মন দিয়ে যা শোনা হ'য়েছে সেই পড়ানোটা মনে গেঁথেছে সহজে। শিক্ষার ভূমিতে এই পরিশ্রমের অপচয় নিরোধের জন্যই মনোযোগের মূল্য অপরিসীম। এ ছাড়া শেখানো পড়াকে মনে ধ'রে রাখবার সময়ও, মনোযোগ অনেক বাড়িয়ে দেয়। স্মরণের মণিকোঠায় আমাদের যা সঞ্চয়, তা আসতে পারে একমাত্র মনোযোগ থেকেই। তাই স্মৃতি বা মনে রাখার ওপর মনোযোগের প্রভাব আছে যথেষ্ট। শিক্ষকও মনোযোগ বাড়িয়ে স্মরণশক্তিকে দৃঢ় ক'রে তুলতে, ঝোঁক দেন খুব বেশী।

মনোযোগের আরেকটা ক্ষমতা আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। মনোযোগ যে বস্তুতে ন্যস্ত হয়, তাকে সে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখতে চায়।

ফুলটাকে মন দিয়ে দেখতে গেলেই, আমরা তার প্রত্যেকটী পাপড়ির গড়ন, তার মধ্যে বর্ণের বৈচিত্র্য, আলাদা আলাদা ভাবে লক্ষ্য করি,—এই হল মনোযোগের বিশ্লেষণী ক্ষমতা।

ঠিক বিপরীত একটা শক্তিও মনোযোগের আছে। সে জিনিসের মধ্যে সামগ্রিকতা খুঁজতে যায়। যে বস্তুতে মন নিবিষ্ট হ'য়েছে, সে বস্তু সম্পূর্ণভাবে কেমন, তার পটভূমির সঙ্গেই বা তার কি সম্বন্ধ,—তার নিজের মধ্যের খণ্ডাংশগুলিই বা তার মধ্যে কেমন ছন্দোবদ্ধ ভাবে আছে, এ প্রশ্নের জবাব মনোযোগ নিজেই খুঁজে নেয়। প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে একটী ঐক্য আছে সেটা মনোযোগের ফলে আবিষ্কৃত হয়। যেমন আকাশের বিচ্ছিন্ন অগণ্য অনাত্মীয় তারা আর গ্রহের মধ্য দিয়ে মনোযোগী সন্ধানী কেপলার খুঁজে বের করেছিলেন, তাদের একতার বিন্দু,—সূর্যের সঙ্গে সৌরজগতের নিবিড় আত্মীয়তা। শিক্ষা ও শিক্ষণের একটা মস্ত কাজ হচ্ছে যুক্তগত সম্বন্ধ আবিষ্কার ও তার অনুসরণ। মনোযোগ ছাড়া এ কাজটি হতেই পারে না। কাজেই উন্নততম জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনোযোগ অত্যাবশ্যক।

মনোবিজ্ঞানী শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের এই গুণগুলির সাহায্য নিলেন। শিক্ষায় মনোযোগ যদি আকর্ষণ করতে হয় তবে যা সম্পূর্ণ, যা একটী ছন্দে গাঁথা এমন বস্তু নিলে মনোযোগ সহজ হ'বে। তেমনি শিশুশিক্ষার জন্য তাঁরা আকর্ষণীয় নতুন জিনিষ দিয়ে পড়াশুনাকে সহজসাধ্য আর মনোরম করতে চেষ্টা করলেন। পড়াশোনায় এই মাধুর্য্য আনবার প্রয়াসের পেছনে যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় আছে, কেন না ধীরে ধীরে মনস্তাত্ত্বিকরা মনোযোগের সঙ্গে ঔৎসুক্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা বুঝতে পারলেন এবং আরও বুঝলেন মনোযোগ কার্যকরী করতে হ'লে, ব্যক্তির মনে বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার করতেই হ'বে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত মনোযোগের এই প্রধান সহায়টীর দিকে তাঁরা তেমন নজর করেন নি।

"এতদিন পর্য্যন্ত একথা কেউ অবিশ্বাস করেনি যে ছাত্রদের মনোযোগী করতে হবে, কিন্তু সম্প্রতিই মাত্র এ কথাটি ঘোষিত হয়েছে যে ছাত্রদের উৎসুক করেও তুলতে হবে [২৬]।"

কোন কোন মাষ্টার মশাই এতে নাক কুঁচকে আপত্তি জানালেন, এতে

২৬ Ross—Groundwork of Educational Psychology.

তো ছেলেগুলি একেবারে বখে যাবে। সব পড়াশোনার ব্যাপারেই যদি ভাল লাগানোর রাংতা পরাতে হয়, তবে মানুষের মত হ'য়ে শিশুরা কঠিন পড়াশোনার মুখোমুখি হ'বে কখন? পড়াশোনা, পড়াশোনাই; তাতে ঔৎসুক্য বা আনন্দ সৃষ্টির কোন প্রশ্ন ওঠে না। এ কথার উত্তরে মনস্তাত্ত্বিকরা সবিনয়ে জানালেন আগ্রহ সব সময়েই তো ভাল-লাগা নয়, দাঁত-তুলবার-ঘরের চেয়ারটা নতুন ধরণের ব'লে ঔৎসুক্য জাগায় বটে, তা বলে সে তো কিছু সুখকর জায়গা নয়। ঔৎসুক্য জাগানোই মনোযোগের দরকার, সেখানে আনন্দের প্রশ্নটা গৌণ, কিন্তু গৌণ বলেই তা নগণ্য নয়। স্কুলের পড়া আমার নীরস লাগছে তবু তাতে আমার আগ্রহ আছে, কেন না তা আমার স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কিন্তু তারই পাশে পাশে যখন পড়াটা ভাল ক'রে তৈরী করতে পারছি সেখানে কি সাফল্যের আনন্দটার দাম নেই? এই জয়ের উল্লাসই আমাদের পডাশোনায় মন দিতে সাহায্য করবে,—সাহায্য করবে বড় হ'তে।

আনন্দ দানের রীতি, শিক্ষায় আজকাল খুব বড় একটা জায়গা অধিকার করেছে। দেখা গেছে আনন্দিত শিক্ষা, অবসাদকে (fatigue) ঠেকিয়ে রাখে। মনোযোগ দিতে গিয়ে ছাত্রদের মনে যাতে ক্লান্তির ম্লান স্পর্শ না লাগে, তার জন্য আনন্দের উপকরণ রাখতে হ'য়েছে আধুনিক শিক্ষকের। খোকনের নতুন মাষ্টারমশাই খেলায় মন দেওয়ার জন্য এখন আর খোকনকে মারধোর করেন না, তিনি পডাশোনাকেই তার নতুন খেলা করে তুলবার ব্রত নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল 'ইস্কুল পালানো ছেলে' ছিলেন, কারণ ইস্কুল তাঁর ঔৎসুক্য আকর্ষণ করতে বা পূরণ করতে পারেনি। তাই যেদিন শান্তিনিকেতন আশ্রম গডলেন সেদিন চাইলেন এমন একটি মনোহর পরিবেশ সৃষ্টি করিতে, যা ছেড়ে ছাত্র পালিয়ে যেতে চাইবে না। এই হল বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের আদর্শ।

বুদ্ধিমান্ শিক্ষক জানেন পড়াশোনায় শিশুকে মনোযোগী করতে হ'লে আনন্দ দিয়ে তাকে আগ্রহী আর উৎসুক করে তুললে কাজ সহজ হ'বে। কৌতূহল মিটাতে গিয়ে আরও ভাল ক'রে এরা পড়তে শিখবে। শিশুরা গভীরতর অনুভূতির (sentiment) ক্ষেত্রে যদি বা খাটো, সহজপ্রবৃত্তির

দিক দিয়ে তো শক্তিধর। তাই শিক্ষক এদের প্রবৃত্তিগুলোকে নাড়া দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন লেখাপড়ায়। সেখানেই তাঁর কাজ থেমে থাকে নি। তাঁর প্রস্তুতি চলেছে মানব শিশুকে গড়ে তুলবার কাজে। ধীরে ধীরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, এদের হবি (hobby) বা খেয়ালকে কেন্দ্র করে, নানা রকম ঔৎসুক্য সৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন শিক্ষক। আরও বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের আত্মাভিমানকে জাগ্রত করে, পড়াশোনায় মন বসানোর কাজে লাগিয়েছেন। মানুষের এটাই সব চেয়ে বড় অনুভূতি,—আমি হার মানবো না। সেই অজেয় মনোবৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে অদ্ভুত কার্যকরী হয়েছে। এর সাথে শিক্ষক পড়াশোনাকে ভালবাসার শিক্ষাও দিয়ে চলেছেন, আস্তে আস্তে। অঙ্ক আজ তাঁর ছাত্রদের কাছে ভীতির বস্তু নয়,—শুধু পরীক্ষা পাশের উপায় নয়, আনন্দ আহরণের পথ। সে অঙ্ককেই ভালবেসেছে। এমনি করে ভালবাসার সেন্টিমেণ্ট তার মনোযোগকে অনিবার্য্যভাবে আকর্ষণ করেছে। শুধু পড়াশোনা ছাড়া, চরিত্র গঠনের কাজও মনোযোগ আর ঔৎসুক্যের সঙ্গমে যথেষ্ট সুফল ফলতে দেখা গেছে। যা আমাদের শুভ, যা আমাদের শ্রেয়ঃ, তাকে আমরা নিজের জীবনে রূপায়িত করতে চেয়েছি, কেন না, এতে আমাদের ঔৎসুক্য (interest) আছে। ফলে আমরা তাতে মনোযোগী হ'য়েছি। এ মনোযোগ ঔৎসুক্যের সঙ্গে মিলনে শুধু কার্যকরী হয় নি, তা আনন্দের হ'য়েছে।

এমনি করে মনোযোগকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক করে তুলছেন শিক্ষাবিদরা, ঔৎসুক্যের অপরিহার্য্য সাহায্যে। সমাজের চরিত্র গঠনের যে গুরুদায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন, তা পালন করতে গিয়ে তাঁদের মত পরিবর্তিত হ'য়েছে অনেকবার, —পথও বদলেছে বারে বারে, তবু একদিন তাঁদের প্রয়াস সার্থক হ'বে, সাফল্যমণ্ডিত হবে, এ ভরসা আমরা রাখি, কেন না এতদিনে তাঁরা মানুষের মূল স্বভাবটী খুঁজে পেয়েছেন, এবং তাঁদের শিক্ষার ধারাও সেই মূলের ওপরেই আজ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

ষোড়শ অধ্যায়

অভ্যাস—Habit

দুটি গল্প বলা যাক্। বিশ্বাস করো, আর নাই করো, গল্প দুটি সত্য কারণ, এ দুটিকেই আমরা বানিয়েছি আমাদের কাজে লাগাবার জন্যে।

দুটি ছোট ছেলেতে ঝগড়া বেধেছে। দুজনেই প্রাণপণে প্রমাণ কর্তে চাচ্ছে, ওরা বেশী "বড়লোক"। একটি ছেলে বলছে, ওর দাদার গাড়ী আছে, বাবার বড় বাড়ী আছে, আর দিদির আছে অ-গুণতি সিল্কের শাড়ী। আর একটি ছেলে, সে ও-পথ দিয়েই গেল না। তার মনে পড়ে গেল, সে কাল ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছে। সে বল্লে, "জানিস্ আমরা রোজ পাতে ঘি খাই।" অন্য ছেলেটি অবিশ্বাসের স্বরে জিজ্ঞেস কল্লে, "রোজ খাস?" দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর হোল, "হাঁ, রোজ" অন্য ছেলেটি কিছুক্ষণ ভেবে, চতুর হেসে ভালমানুষের মত প্রশ্ন করলে, "যেদিন না থাকে?" একটুও না থেমে, উত্তর হোল, "সেদিনও খাই।" ঘাবড়ে গেল অন্য ছেলেটি,—বিষম বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "কি করে?" সগর্ব্বে উত্তর হোল, "অভ্যেস।"

সৈন্য বিভাগে কাজ করতো একটা লোক। কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে সে পালিয়ে গেল এবং নাম বদ্‌লে দূরে এক হোটেলে ওয়েটারের কাজ নিলে। একদিন সেই সৈন্যদলের কাপ্তান সেই হোটেলে দৈবাৎ খেতে গেছেন। ওয়েটারটিকে তিনি চিনতে পারলেন। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার জন্যে তিনি একটা "কৌশল" করলেন। ওয়েটারটি কাছে আসতেই, তিনি হঠাৎ ফৌজী কায়দায় হাঁকলেন, "টেন্‌শ্যান্!" তৎক্ষণাৎ ওয়েটারটি হাতের প্লেট ইত্যাদি ফেলে দিয়ে, এ্যাটেন্‌শ্যান্‌এর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গেল। কাপ্তান তার হাতে হাতকড়া লাগালেন।

একটি অসম্ভব ও হাসির গল্প, আর একটি গল্প সম্ভব ও দুঃখের। দুটির "ময়্যাল'ই কিন্তু এক,—মানুষ অভ্যাসের দাস।

যা জীবন্ত ও বাড়ন্ত তার দুটো ধর্ম আছে। একটা স্থিতি আর একটা গতি। যা বাঁচে ও যা বাড়ে, তার মধ্যে ব্যবস্থা আছে অতীতকে সংরক্ষণের, আর ঝোঁক

আছে নতুনের দিকে পদক্ষেপের। পার্সি নান্ (Percy Nun) একটিকে বলছেন, 'নিমি' (Mneme) আর একটিকে বলেছেন 'হর্মি' (Horme)। এই দুটো ধর্ম এক অর্থে বিপরীত, আবার অন্য অর্থে সংযোগী ও পরস্পর পরিপূরক।[১] অতীতের সঞ্চয়কে যদি ধরে রাখতে না পারা যায়, তবে গড়াটা হবে কোন ভিত্তির ওপর? আর যে পাষাণস্তূপ অতীতের সাক্ষ্য বহন করে পড়ে আছে, যার গতি গেছে হারিয়ে, সে তো মৃত ইতিহাসের কঙ্কাল। মানুষের মন তেমন মড়া জিনিষ তো নয়। সে অতীতকে সংরক্ষণ ক'রে স্মৃতিতে, অভ্যাসে, শিক্ষায়, আর নূতনের পথে এগিয়ে যায়—চিন্তায়, কর্মে, চরিত্রগঠনে। এ দুটো দিককে আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা বিচ্ছিন্ন করে থাকি, কিন্তু বাস্তবিক এরা বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়।

সুমিত্রা ন্যাশন্যাল ক্যাডেট্ কোর'এ ভর্তি হয়েছে। মায়াদি হুকুম দিয়েছেন, সাইকেল শিখতে হবে। লেগে গেল সুমিত্রা সাইকেল শিখতে। সাঁইত্রিশ বার আছাড় খেলো, তিনখানা শাড়ী সালওয়ার ছিঁড়লো, আর ছড়ে যাওয়া যায়গাগুলিতে আয়োডিনের দাগ লেগেছে কত, কে জানে? সাতদিন অনবরত চেষ্টার পর সুমিত্রা এখন বাসা থেকে দিদিমার বাড়ী পর্যন্ত সাইকেল চেপে যেতে পারে, একবারও না আছাড় খেয়ে, একবারও না থেমে। বলে, গর্ব করে, "এবার সাইকেল চড়া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।"

ঘোণা পূরণের নামতা নিয়ে পড়েছে। দু'খানা ধারাপাত ক্ষয়ে গেছে, আর চড়চাপড় মাষ্টারের কাছে পেয়েছে, বিস্তর। যাক্, এখন সে গড় গড় ক'রে সাতের ঘরের নামতা বলতে পারে। সে 'অভ্যস্ত' হয়েচে।

অভ্যাস তা হ'লে কাকে বলি? কোন কাজ বারে বারে অনুশীলন করলে তাতে পারদর্শিতা জন্মে, তা সহজে করা যায়, চিন্তা, ভাবনা, দ্বিধা না করে। তাকে বলি অভ্যাস।

মাহের্ সংজ্ঞা দিচ্ছেন, "কোন একটি ক্রিয়া নির্দিষ্ট যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করবার জন্যে আয়ত্ত কৌশলকে বলা হয় অভ্যাস।"[২] থর্ণডাইক্ বলছেন, "অভ্যাস হোল কতগুলি প্রতিক্রিয়ার ভঙ্গী, যা অভিজ্ঞতা, অনুশীলন বা শিক্ষার ফলে

১ Nunn—Education, Its data and its principles.

২ Maher—Psychology, P. 388.

অংশতঃ বা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়।"[৩] সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে অভ্যাসের দুটি মূল লক্ষণ পাই।

১। অভ্যস্ত কর্ম যান্ত্রিকভাবে (automatically) সাধিত হয়। যে কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তা অনায়াসে করি। তার পেছনে বুদ্ধি, বিবেচনা, মনঃসংযোগ খুব সামান্যই প্রয়োজন হয়। তাই, যে কাজ অভ্যাসবশে করি, তাতে ক্লান্তি হয় অনেক কম। আমরা হাঁটি, খাই, কথা বলি, জীবনের অধিকাংশ কাজই করি অভ্যাস-চালিত হয়ে। এ সব কাজে প্রতিমুহূর্তে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর ডাক পড়ে না। কাজেই এ সব অভ্যস্ত কাজ, অন্য বুদ্ধি-চালিত কাজের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। সাইকেল চড়ে' পথ চলতে চলতে, মনে মনে বাজার খরচের হিসাবটা তৈরী করে ফেলি। মনটা খুসী থাকলে, গুণ্ গুণ্ করে গান করতে করতে, ঘরটা গুছিয়ে ফেলি। গান্ধীজী চরকা কাটতে কাটতে, 'হরিজন'-এর অনেক লেখা মুখে মুখে বলে গেছেন।

একটা অভ্যস্ত কর্মের সবগুলি অংশই সম্পূর্ণ স্বয়ং-ক্রিয় ও যান্ত্রিক না হতে পারে। বিশেষ করে কাজটা যদি জটিল হয়, তা হ'লে মনঃসংযোগ কিছুটা প্রয়োজন হয়ই। অভ্যাসবশতঃ নগরীর যানবাহন-বহুল রাস্তা পার হতে হতে গভীর চিন্তায় মগ্ন হতে পারি,—কিন্তু তখনও রাস্তা পার হওয়াটার পেছনে একটুও মন থাকে না, তা নয়। তা ছাড়া দ্রুত চলমান ও বিপজ্জনক যন্ত্রচালনা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে অনেকটা সহজ হয়ে এলেও, মনঃসংযোগ সম্পূর্ণ শিথিল হতে পারে না। সে যন্ত্র চালনার কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশ যান্ত্রিক পদ্ধতি হলেও সমগ্র প্রক্রিয়াটি জাগ্রত মনঃসংযোগ সাপেক্ষ। ষ্টাউট বলছেন, "মনোযোগ ব্যতিরেকে অভ্যস্তক্রিয়া যে চলতে পারে, তার সব চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এমন সব ক্রিয়া, যেখানে মন অন্যত্র নিযুক্ত, যেমন কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে একজন উল্ বুনছে বা একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে, অথবা মন যখন অন্যচিন্তায় নিমগ্ন তখন লোকজন গাড়ীঘোড়া পূর্ণ রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এটা লক্ষণীয় যে এ সব ক্ষেত্রে মনোযোগটা সম্পূর্ণই অন্য কাজে রয়েছে এমন নয়।…অন্যমনস্কভাবে যিনি রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছেন তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত নন যে তিনি লোকজনপূর্ণ রাস্তায় আছেন ও পথ চলছেন। তবে

৩ Thorndike—Elements of Psychology, P. 16.

এটা জোর করেই বলা চলে যে তাঁর নিজস্ব ও চতুষ্পার্শ্বের ক্রিয়া ও ঘটনার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে নিবিড় মনোযোগ নেই। এই যে তফাৎটা, এটা দিয়ে আমরা আর কতগুলি অভ্যাসকে বুঝতে পারবো যেগুলি বহু অনুশীলনের ফলেও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি। সব চেয়ে ওস্তাদ তলোয়ারবাজও, ডুয়েল্ লড়বার সময়, অন্য অবান্তর বিষয়ে মন দিতে পারে না। বরং তখন তার সদাজাগ্রত মনোযোগ থাকা চাই। এর কারণ হচ্ছে এখানে তলোয়ার চালনা ক্রিয়ার অল্প কয়েকটি খণ্ড অংশই মাত্র সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়েছে।"

২। কিন্তু অভ্যাসটির গোড়াতে রয়েছে—আয়াস, চেষ্টা, সচেতন মনঃসংযোগ। হাঁটাটা শিশুকে অনেক আছাড় খেয়ে শিখতে হয়। গানটা আয়ত্ত করতে কতটা কসরৎ, কতটা আত্ম-ধিক্কার, আর প্রতিবেশীর কতটা অভিসম্পাত সহ্য করতে হয়, সেটা যে কোন গুণী গাইয়েই বলতে পারবেন। সদভ্যাসগুলি তো আয়াসলব্ধ বটেই, কদভ্যাসগুলিও আয়ত্ত করতে পরিশ্রম চাই। ছেলেরা যারা ঝানু সিগারেটখোর, আর মেয়েরা যাদের চা-টা চাই-ই, তারা সবাই জানে গোড়াতে ব্যাপারটা সুখকর ছিল না,—চেষ্টা করেই শিখতে হয়েছে। অভ্যাসটা তাই প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়।

সহজাত সংস্কার ও অভ্যাসের তুলনা—সহজাত সংস্কার (Instinct) এবং অভ্যাসে (Habit), তাই মিল ও অমিল দুই-ই রয়েছে। এ দুই-এর ক্রিয়াই অনায়াস যান্ত্রিক ভাবে সম্পন্ন। দুই-এর কাজই মোটামুটি নিপুণ। দুই ই মোটামুটি বুদ্ধি-বিবেচনা বিবর্জিত। কিন্তু সংস্কার সহজাত বংশানুক্রমিক আয়াসলব্ধ নয়। অভ্যাস প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ চেষ্টা দ্বারা অর্জিত (acquired)।

অভ্যাস শুধু দেহগত কর্মের নয়, চিন্তারও অভ্যাস আছে। আমাদের অধিকাংশ কাজই অভ্যাসগত। হাঁটা, জামা-কাপড় পড়া, খাওয়া, অভ্যাসবসেই করি। চল্‌তি ট্রামে লাফিয়ে উঠি, কনডাক্‌টারকে পয়সা দেই, অফিসে ব'সে ফ্যান্‌টা ছেড়ে দি, একটা চুরুট ধরাই, সবের পেছনেই রয়েছে অভ্যাস। 'কিউ' দিয়ে র‍্যাশনের দোকানে দাঁড়াই, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লে হাত তুলে অভিবাদন করি, অতিথি এলে বসতে দিই। আমাদের ভদ্র শান্ত জীবন, অভ্যাসের শৃংখলে বাধা। কথা বলা, ধর্মানুচরণ এও অভ্যাস। সামাজিকতা মানেই তো সমষ্টিগত অভ্যাস-শৃংখলতা। চিন্তার ক্ষেত্রেও কি তাই নয়? লেখাপড়া শেখা;—এই

শেখা-ব্যাপারটার অনেকখানিই তো অভ্যাস, তাই তো থর্ণডাইকের শিক্ষার সূত্রের একটি প্রধান সূত্র হচ্ছে—পুনঃ-পুনঃ ক্রিয়া (The Law of Exercise)।[৪] ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ অভ্যাস দাসত্বের কথাই বলছেন, "প্রত্যেক প্রক্রিয়ারই রীতি হচ্ছে পূর্বে ঘটে থাকলে আবার আরো সহজে সেটি সম্পন্ন হওয়া, অথবা যে অনুপাতে এটা পূর্বে বারে বারে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে অনুপাতে সেটা আবার বারে বারে অনুষ্ঠিত হওয়া।"[৫] আমাদের রাজনৈতিক মতামত, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের চিন্তার ধারা এর অনেকখানিই কি আমাদের অভ্যস্ত পরিবেশের প্রতিফলন নয়? তাই বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁর দি ইন্‌ডিভিজুয়াল ভার্সাস্‌ দি সিটিজেন্‌ (The Individual us. the citizen)' প্রবন্ধে বলছেন, যে ব্যক্তি যত বেশী 'সামাজিক' ও আইনানুগ, সে ব্যক্তি সেই অনুপাতে অভ্যাসের দাস, ব্যক্তিত্বহীন। সমাজ গঠন মানেই চিন্তায় ও কর্মে অভ্যাসের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নেওয়া। রাসেলের কথায় কিছুটা অতিভাষণ থাকলেও; তা একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয়।[৬]

অভ্যাসের দৈহিক ভিত্তি—The Physical basis of Habit— অভ্যাসের মূলে কতগুলি দেহগত কারণ আছে, তা সমস্ত মনস্তাত্ত্বিকই স্বীকার করেন। বিশেষ করে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী এবং পেশীর গঠন ও কাজ, এজন্যে দায়ী। উইলিয়াম্‌ জেমস্‌ বলেছেন, স্নায়ুমণ্ডলীর এটা একটা প্রধান লক্ষণ যে তা নমনীয় বা plastic। তার মানে তাঁর উপাদানগুলি বাইরের প্রভাবকে কিছুটা বাধা দেয়, কিন্তু একেবারে অনড় অচল তারা নয়। দেহের স্নায়ু, তন্তু, পেশী সবের মধ্যেই এ রকম কিছুটা নমনীয়তা আছে। যখন কোন কাজ অভ্যস্ত হয় তখন এই স্নায়ুর তন্তুগুলি, বিশেষ করে সংযোগস্থল (synapse) গুলি প্রথমে কিছুটা বাধা দেয়; কিন্তু সে বাধা উত্তীর্ণ হয়ে স্নায়ু বা পেশীর একটা পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যেটা আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী।[৭]

যখন একটা অঙ্গ দিয়ে কোন কাজ করি, তখন মগজের মধ্যে কি হয়? কোন স্নায়ুকেন্দ্র থেকে একটি শক্তি বিভিন্ন কোষ, তন্তু ও সংযোজনীর মধ্য দিয়ে

Stout—Analytic Psychology. P. 260-261,

৫ McDougall—An introduction to Social Psychology. P. 115-116.

৬ Bertrand Russell—The Individual us the citizen.

৭ W. James. Psychology. Vol. 1. P. 105.

প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত পেশীতে এসে পৌছে, যার ফলে পেশী সঞ্চালিত হয়। এই পথ করে নিতে কিছুটা বাধা উত্তীর্ণ হতে হয়। এই বাধা সংযোজনী (synapse) থেকে আসে। একবার বাধা উত্তীর্ণ হলে, সেই পথে স্নায়বিক শক্তির সঞ্চালন সহজ হয়। বারে বারে একই পথে স্নায়বিক শক্তির সঞ্চালনের ফলে পথটা (nerve path) পাকা হয়। এরই নাম অভ্যাস। আবার সেই পথ ব্যবহৃত না হলে, পথের রেখাটা অস্পষ্ট হয়, সংযোজনীর বাধা আবার প্রবল হয়ে ওঠে। "প্রত্যেক স্নায়ুসংযোগ-স্থলে স্নায়বিক শক্তির গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। একটির পর একটি স্নায়বিক শক্তির ধাক্কায় সে বাধা ভেঙে ফেলার নামই হোল, অভ্যাস গঠন। স্নায়বিক শক্তি যত প্রচণ্ড হবে, আর যত বারে বারে ধাক্কা মারবে, তত শীগগীর বাধাটা ভেঙে যাবে অর্থাৎ অভ্যাস গঠিত হবে।[৮]"

বাল্য ও কৈশোরে শরীর যখন বাড়তে থাকে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে দেহের কোষ ও তন্তুর সংখ্যাও ক্রমেই বাড়তে থাকে। কিন্তু যৌবনে পৌছবার আগেই সেই সংখ্যা বৃদ্ধি শেষ হ'য়ে যায়। একজন পূর্ণ-বিকশিত ব্যক্তির দেহে স্নায়বিক কোষের (neurons) সংখ্যা সম্ভবতঃ ১১ শত কোটি![৯] কাজেই সম্পূর্ণ স্নায়ুমণ্ডলীর (the entire nervous system) বিভিন্ন সংযোগ ইত্যাদি মিলে ব্যাপারটা কি অসম্ভব রকমের জটিল তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। যাক্, একটা বয়সের পর স্নায়ু ও অন্যান্য কোষগুলির সংখ্যা না বাড়লেও, তাদের আয়তন বাড়ে, ঠিক যেই পরিমাণে সেগুলিকে কাজে লাগানো হয়। আয়তন বাড়লে স্নায়বিক শক্তিও বাড়ে। কাজেই কোন কোষ পূর্বে ব্যবহৃত না হলে, তা স্নায়বিক শক্তির সঞ্চালনের পথে বাধা দেয়। ফ্রানজ্ (Franz) এর পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে মগজের সর্বোচ্চ অংশের সম্মুখ ভাগই (the frontal lobe) বিশেষভাবে সক্রিয়, অভ্যাস গঠনের বেলায়। এই অংশ ধ্বংস হ'য়ে গেলে, অথবা কেটে ফেললে নূতন অভ্যাস গঠিত হয় না, এবং পুরাতন অভ্যাসও লুপ্ত হয়ে যায়।[১০]

সংস্কার ও অভ্যাসের সম্বন্ধ—সংস্কারের উপর অভ্যাসের প্রভাব—Relation between instinct and habit—how habit

৮ P. Sandiford—Mental and Physical Life of School Children P. 145

৯ Verworn—British Association Meeting Dundee, 1912

১০ Franz—The Frontal Lobes: Archives of Psychology 1907, No. 2.

influences instincts—আমরা পূর্বে বলেছি সংস্কার হচ্ছে সহজাত, আর অভ্যাস হচ্ছে চেষ্টার্জিত। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, অন্ততঃ মানুষের বেলায়। তার প্রায় প্রত্যেক কাজের কতকটা হচ্ছে 'জন্মগত দৈহিক গঠনের ফল, আবার কতকটা অংশ হচ্ছে অর্জিত। তাই দুই-এর মধ্যে পাকাপাকি সীমারেখা না থাকাতে একটা ঝগড়ার সম্ভাবনা সর্বদাই থেকে যায়। খাওয়াটাকে আমরা বলি অভ্যাস, কিন্তু এটা তো খাদ্য-আহরণরূপ জন্মগত সংস্কারজাত, কাজেই একে সংস্কারও বলতে পারি। সাইকেল-চালনা অভ্যাস, কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গের যে গতিগুলি মিলিয়ে সাইকেল-চালনা কাজটি, তা তো নির্ভর কচ্ছে কতগুলি স্নায়ু, পেশী ইত্যাদির গঠন ও শক্তির উপর, যা হচ্ছে জন্মগত ও বংশগত; ঝগড়াটা বাস্তবিক পক্ষে ঘটনার স্বরূপ নিয়ে নয়, তার নাম ও বিবরণ নিয়ে। যদি কাজের অশিক্ষিত ও শিক্ষিত অংশের মধ্যে প্রভেদটা স্মরণ রাখি, এবং অভ্যাসের পেছনে একটা অশিক্ষিত দেহ-যন্ত্রের গঠন থাকবেই, এটা স্মরণ রাখি, এবং সমগ্র কাজটাকে অভ্যাস বা সংস্কার বললেও, তাদের দুটি অংশ আছে এবং প্রধান অংশ অনুসারেই একটা কাজকে সংস্কার বা অভ্যাস বলা হচ্ছে, এটুকু মনে রাখি, তা হলে গোলযোগ মিটতে পারে।[১১]

অভ্যাসের দ্বারা সংস্কার অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। অভ্যাস একটা সংস্কারের গণ্ডী সীমাবদ্ধ করে দেয়, কখনও বা তাকে রুদ্ধ করে দেয়। জেমস্ তাই সংস্কারের দুটি নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) অভ্যাসের দ্বারা সংস্কারের নিরোধ। (২) সংস্কারের অনিত্যতা।

(১) প্রথম নিয়ম অনুযায়ী একটা সংস্কারকে অভ্যাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা তার প্রকাশ রুদ্ধ করা যেতে পারে। পাখীর সংস্কার হোল, মানুষ দেখলে

১১ "If we use the word 'instinct', in speaking of human activities we immediately become involved in controversies which are mainly disputes over words. We probably contrast instinct with habit, using the former for an unlearned activity, and the latter for a learned activity. But then, since every activity is partly unlearned and partly learned, we can draw no sharp line between instinct and habit and are always quarrelling over, the appropriate name for a given activity, though there is no question as to the facts. If we call eating an instinct, some one objects that we are over-looking all the learning that occurs in ways of preparing food and

ভয় পাওয়া, পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু একটি পাখীকে রোজ যদি নিয়মিত সময়ে খাদ্য দেওয়া হয়, তা হ'লে সে পাখী খাদ্য-দাতাকে আর ভয় পায় না। এমন কি তার হাত থেকে নির্ভয়ে খাদ্য খুঁটে খেতে পাখীকে অভ্যস্ত করানো যায়।

'কন্‌ডিসন্‌ড লারনিং'-এর মূলমন্ত্র তো এই,—অভ্যাস দিয়ে একটি সংস্কারের গতি পরিবর্তন বা সীমাবদ্ধ করা। পাখীও অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যে নানা রকম খেলা শেখানো যায়,—তা এজন্যেই সম্ভব হয়। অবশ্য উচ্চতর প্রাণীর বুদ্ধির বিকাশ কতকটা দূর অগ্রসর হয়েচে,—কাজেই বলা যেতে পারে বুদ্ধির পথেই এদের শিক্ষাটা হচ্ছে। কোয়হ্‌লার-এর উপাদেয় গ্রন্থ 'দি মেণ্টালিটি অব এপ্‌স্‌'-এ এবং থর্নডাইক-এর 'এ্যানিমাল ইনটেলিজেন্স' গ্রন্থে এ রকম শিক্ষার বহু উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যেও এ রকম বিকল্প শিক্ষার উদাহরণ মিলবে। একটা পোকাকে Yএর আকারের একটা নলের নীচের দিকে পুরে দিলে, সেটা উপরের দিকে বেয়ে উঠতে থাকে। যেখানে নলটা দুই দিকে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে কোন বাধা না দিলে সে কখনও বাঁয়ের কখনো ডানের পথটা ধরে। কিন্তু পোকাটা বাঁয়ের পথ ধরলেই সেটাকে একটা মৃদু বৈদ্যুতিক 'শক্‌' দেওয়া হ'তে থাকলো। বারে বারে এ রকম করার ফলে দেখা গেল, সেটা আর বাঁয়ের পথে যাচ্ছে না—ডানের পথেই যাচ্ছে।[১২] 'পড়াশেখা—কাজশেখা' যেখানে আলোচনা করেছি সেখানে আরো উদাহরণ আমরা দিয়েচি, এবং সেখানে বলেচি যে এসব ক্ষেত্রে থর্নডাইক্‌-এর কলপ্রাপ্তির সূত্র কাজ করে। "প্রাণীদের বেলায় জটিল অভ্যাস কি করে' গঠিত হয়? অভ্যাসের ভিত্তি সম্ভবতঃ জন্মগত যান্ত্রিক অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া (random movements)। এর মধ্য থেকেই কিছু ক্রিয়া, তার ফলে যে আনন্দ পাওয়া যায় সে জন্যে, বেছে নেওয়া হয় এবং সেগুলি পুনঃ পুনঃ করার ফলে অভ্যাসে পরিণত হয়।"[১৩]

(b) দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী, কোন কোন সংস্কার একটা বয়স হলে, আপনি লুপ্ত হয়ে যায়, যদি না অভ্যাস দ্বারা তাদের আয়ু বৃদ্ধি করা হয়। যেমন শিশুদের স্তন্য পান; এই জন্মগত সংস্কারটি কতকটা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই

---

putting to into the mouth and all the social customs that have grown up around eating. But, if we call eating a habit, we are accused of taking the absurd position that man eats only by force of habit, and not because

চলে যাওয়ার উচিত, যদি মা কিছুটা শক্ত হন। এটা একটি প্রচলিত রীতি যে স্তনের বোটায় কুইনিন বা লঙ্কাবাটা মেখে ধাড়ি ছেলের এ অভ্যাসটি মা দূর করেন। এখানেও থর্নডাইকের ফললাভের সূত্র কাজ কচ্ছে। অভ্যাস এখানে নেতিবাচক ভাবে সংস্কারের উপর প্রভাব বিস্তার কচ্ছে।

অভ্যাসের সুফল—Uses of habit—অভ্যাস পরিশ্রম বাঁচায়। যা অভ্যস্ত, তা অনায়াসে করি। জীবনের ছোটখাটো প্রাত্যহিক কাজগুলি প্রত্যেকটিই যদি চিন্তা ভাবনা, মন-সংযোগের অপেক্ষা রাখতো, তা হ'লে জীবন দুর্বহ হয়ে যেতো। স্নায়বিক শক্তি,—প্রকৃতির রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। তার অপচয় নিবারণের জন্যে প্রকৃতিরই এ ব্যবস্থা যে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ কাজগুলি যান্ত্রিকভাবে, মানসিক শক্তির অকারণ ক্ষয় ব্যতীতই সম্পন্ন হতে পারে, আর জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলি সমাধানের জন্যে বুদ্ধি, বিচার, মনঃসংযোগের শক্তি সংরক্ষিত ও নিয়োজিত হ'তে পারে। এ একটা মস্ত লাভ।

যা ভাল করে অভ্যাস করা গেছে, তা নিপুণভাবে সম্পন্ন করা যায়। যে কাজ প্রথম শেখা হচ্ছে, তা অনেক সময়েই এলোমেলো (clumsy), অনেক সময় তা নিষ্ফল। শিশুর প্রথম ভাত খেতে শেখা, লিখতে শেখা, হাঁটতে শেখা সবই এলোমেলো, হিজিবিজি, ছড়ানো, ছিটানো, অসংবদ্ধ। যখন অভ্যাসটা পাকা হোল, তখন কাজগুলি সুবিন্যস্ত, সুষ্ঠু, সফল।

শিখতে গেলেই তাই অভ্যাস চাই, পুনঃ পুনঃ অনুশীলন চাই। শিক্ষকের কাছে এটা ক্লান্তিকর, ছাত্রের কাছে এটা অর্থহীন উৎপীড়ন মনে হতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই। কিছুটা মুখস্থের অভ্যাস, কিছুটা ড্রিলিং দিয়ে গোড়া পত্তন করতেই হবে। যেটা শেখা হোল, তার জন্যে অনুশীলন চাই। যেটা অনুশীলিত হ'ল সেটাকেও পোক্ত করতে হয় অতিরিক্ত শিখে (over-learn), ভবিষ্যতে সেটা হারিয়ে না যায়। "যাকে রাখো সেই রাখে"—অভ্যাসের সম্পর্কেও এ কথাটি খাটে।

পৌনঃপুনিকতা, যা অভ্যাসের মূল কথা, তার প্রতি শিশু-মনের একটা গভীর টান আছে। তাই ঘুমপাড়ানী গানের সুর একঘেয়ে, শিশু কবিতার প্রতি দু'টি চরণের শেষে চাই ধ্বনির মিল, তাই তার রূপকথা শেষ হওয়া চাই-ই—

আমার কথাটি ফুরোলো,
ন'টে গাছটি মুড়োলো

এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে। এ শুধু আমাদের দেশের কথা নয়। বিলাতী নার্সারী রাইমস্‌এর বেলায়ও মানে তার নাই থাক, চরণ-যুগলে মিল চাই-ই। কিপলিং-এর শিশুদের জন্যে লেখা 'জাষ্ট সো ষ্টোরিজ্‌' এ দেখি বারে বারে একই নামের একই বিশেষণ, এক এক'স্থানের একই বিবরণ।

শিক্ষক এ কথা জানেন, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাস তাঁর এক মস্ত হাতিয়ার। উইলিয়ম্‌ জেমস্‌ এ মতের দৃঢ় সমর্থক, যে সদভ্যাস গঠনই শিক্ষার প্রধান কাজ। বারে বারে অনুশীলন দ্বারা সদভ্যাসগুলি গঠন ক'রে দিলে জীবনের গোড়া পত্তন হোল। সদভ্যাস গঠন ও কদভ্যাস পরিহার এ দিকেই থাকবে শিক্ষকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি; অন্য সব জিনিষ পরে আসবে। বুদ্ধিমত্তা, কুশলতা, ক্ষিপ্রতা, নির্ভুলতা সবের গোড়াতেই চাই অভ্যাস। সেটা শেখানো চাই, সেটা আপনি থেকে আসবে না। তাই সংস্কারগুলিকে কাজে লাগাতে হবে, প্রয়োজন হলে তাদের প্রকাশ রুদ্ধ করতে হবে। এর জন্যই প্রয়োজন শিক্ষকের। সচ্চরিত্র গঠন মানেই সু-অভ্যাস গঠন এবং সেটা করতে হবে অনুকূল সংস্কারের সহায়তায়—'লোহাকে পেটো যতক্ষণ গরম থাকে'—এই রীতি অনুযায়ী।[১৪]

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ কিন্তু জেমস্‌ এর মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না। সংস্কারকে অভ্যাস দ্বারা যেমন খুসি ভেঙে গড়া যায়, এ কথা তিনি সত্য মনে করেন না। তাঁর মতে সংস্কার জীবনের মূল ভিত্তি এবং তাদের ক্ষমতা অসামান্য। অভ্যাসের প্রভাব তাদের উপর গভীরও নয়, স্থায়ীও নয়। অভ্যাস যেখানে সংস্কারের অনুকূল সেখানে অবশ্য সুফল আশা করা যেতে পারে, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা সংস্কারের মৌলিক পরিবর্তন বা তাদের মূলোচ্ছেদ সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলছেন, বুনো হাঁসের বাচ্চাকে ডানা কেটে ঘরে-পোষা হাঁসের সঙ্গে গৃহ আঙ্গিনায় বড় করা হোল, কিন্তু যেই তাদের পাখা গজালো আর ছাড়া পেলো অমনি তারা উড়ে পালিয়ে গেল বনে।"[১৫]—তিনি আরও বলেছেন,

[১৪] The formation of good character is only the formation of right habits, while the favourable instincts last, following the principle "strike the iron, while it is hot."

W. James—Principles of Psychology, Vol. II, P. 394,

[১৫] Wild ducks hatched and brought up in the poultry-yard with clipped wings, will take to wing and disappear into the wild, as soon as feathers grow and they are allowed freedom.

McDougall—Outline of Psychology, P. 112.

সংস্কারের, বিশেষতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা বা যৌন প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ সম্পূর্ণ রোধ করবার চেষ্টা করলে প্রাণী মনমরা হয়ে শুকিয়ে যায় এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সম্ভবতঃ জেমস্ সরকারের উপর অভ্যাসের প্রভাব যা মনে করেন সেটা কতকটা অতিরিক্ত, এবং পরীক্ষার ফল ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতের অধিকতর অনুকূল।

অভ্যাস গঠনের মূলসূত্র ও কয়েকটি বিধি ও নিষেধ—Laws and Maxims of Habit Formation—যে কাজের ফল সুখকর তা পুনরাবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, এবং সে কাজ অভ্যস্ত হয়ও তাই তাড়াতাড়ি। এটাই হচ্ছে থর্ণডাইকের ফল-লাভের নীতির মূলকথা। "কোন মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থা কোন বিশেষ পরিবেশে যদি অস্বস্তি সৃষ্টি না করে, তা হলে সেই ক্রিয়া বা অবস্থা সেই পরিবেশের সঙ্গে মনের মধ্যে সংযুক্ত হ'য়ে যায়। কাজেই ভবিষ্যতে সেই পরিবেশ বা ঘটনাটি সৃষ্টি হ'লে, মানসিক অবস্থাটিরও পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আগের চেয়ে বেড়ে যায়; এ ক্রিয়ার ফলে আনন্দ যত বেশী হয় ততই মনের মধ্যে সংযোগ সূত্রটি দৃঢ়তর হয়।"

অথবা আরো সংক্ষেপে, "যে বিশেষ অবস্থায় একটি মানসিক ক্রিয়া ইতপূর্বে সব চেয়ে বেশী বার ঘটেছে এবং সব চেয়ে বেশী আনন্দ উৎপাদন করেছে, সেই অবস্থা আবার ঘটলে মানসিক ক্রিয়াটিও ঘটবে।"

এর থেকে কয়েকটি বিধি ও নিষেধ সহজেই আসে। (১) "যে দুটি জিনিষকে সংযুক্ত করতে হবে, তাদের বারে বারে মনের মধ্যে কাছাকাছি রাখো। (২) যে অভ্যাসটা গঠন করতে চাও, সেটা শিশু আচরণ করতে যেন উৎসাহ পায়,—তাকে উপযুক্ত পুরস্কৃত করো। শিশুকে সত্য কথা অভ্যাস করাতে চাইলে—সত্য কথা বলা যাতে তার পক্ষে সহজতর হয় সেটাই প্রথম করো,—সত্য কথা বললে তাকে প্রশংসা করো, তাকে উৎসাহিত করো। (৩) প্রলোভন দিয়ে, মিথ্যা কথা সে বলে কিনা, সে পরীক্ষা করতে যেও না, প্রথম অবস্থায়! (৪) নিজে সত্য কথা বল, তার চারিদিকে সত্য কথা বলবার আবহাওয়াটি সৃষ্টি কর। (৫) যে অভ্যাসটি দূর করতে চাও তা শিশুর মন থেকে দূরে রাখ,—মিথ্যা কথা বলাকে তিরস্কৃত কর, লজ্জিত কর। তার প্রশংসার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগাও।"[1]

[1] Thorndike—Principles of Teaching. P. 110.

এ নিয়মগুলি অনেক সময় শিক্ষক স্মরণ না রাখার জন্যে বিষম ভুল করেন। যেমন, শাস্তি হিসাবে দশটা অংক কষতে দেওয়া হয়, দুপাতা হাতের লেখা লিখতে দেওয়া হয়। ফল কি হয়? শিশুর মনে শাস্তির অসন্তোষ আর অংক কষা, বা হাতে লেখা, সংযুক্ত হয়ে রইল। এতে করে অংকই শিশুর কাছে তিক্ত মনে হবে। এ নিতান্ত ভুল পথ।

ভুল বানান, ভুল বাক্য, ভুল উচ্চারণ শিশুর সামনে ধরে দিয়ে তা শুদ্ধ করতে দেওয়া হয়। এটা পদ্ধতি হিসাবে ভালো নয়। শুদ্ধ বানান, শুদ্ধ উচ্চারণ, শুদ্ধ বাক্য গঠনই শিশুর মনের সামনে বারে বারে ধরে দিয়ে, তাতে তাকে অভ্যস্ত করানোই ঠিক অভ্যাসটি গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। মিথ্যা আচরণ করে, শিশুকে যদি বলা হয়—"এমনটি কোর না"—তা হলে তার ফল হবে সামান্য। যে পরিবারে বড়রা সত্য ও সভ্য আচরণ করে, সে পরিবারে শিশুও সত্য ও সভ্য আচরণে অভ্যস্ত হয়। নেতিবাচক উপদেশটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহুল্য ও নিষ্ফল।

ক, খ, গ, ঘ করে শিশুকে বর্ণ শিক্ষা দেওয়ায় বহু সময় অপচয় হয়—ভুল সংযোগ (Wrong associations) মনের মধ্যে তৈরী হয়। জীবন্ত ভাষার মধ্যে যে শব্দগুলির সঙ্গে শিশু পরিচিত, অথবা যে দ্রব্যগুলি স্বভাবতঃ তার মন আকর্ষণ করে, তাদের নামের সঙ্গে যুক্ত করে বর্ণ শিক্ষা শিশুর পক্ষে সহজ। ভাষায় যে শব্দগুলি সর্বদা সে ব্যবহার করে, বা শোনে, তাতে সর্বদা কএর পর খ আসে না কিন্তু সে শিখছে বারে বারে ক তারপর খ। - ফল হয় এই, যে একটি বর্ণকে মনে আনতে হলে তার আগের বর্ণগুলি অযথাই তার মনে আনতে হয়। কারণ এ রকম করেই সে অভ্যস্ত। নিজের অভিজ্ঞতার থেকেই উদাহরণ দিচ্ছি। M দিয়ে আরম্ভ একটি শব্দ অভিধানে খুঁজে বার করতে হলে আমাকে মনে মনে আবৃত্তি করতে হয় I, J, K, L, M—তবে খুঁজে পাই Mকে। M অভ্যাসের দড়িতে I, J, K, Lএর সঙ্গে শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। ঠিক এ ভুলটি আমরা করি, প্রচলিত নামতা শেখানোর বেলায়। আমরা শিশুদের আর্যা শেখাই গুণনের। সে মুখস্থ করে, অভ্যাস করে, বারে বারে প'ড়ে। এবার শিশুকে জিজ্ঞেস করো "সাতে সাতে কত?" সে যেন অবাক হয়ে যায়, ভাবখানা তার,—এভাবে তো আমি শিখিনি,—এর উত্তর আমি কি করে দেব? তখন তুমি বল্লে "বাঃ রে সাতের ঘরের নামতা শিখিস্ নি?" এবার দম দেওয়া ঘড়ির মত, সে গড়গড়িয়ে বলে গেল—"সাত

একে সাত, সাত দুগুণে চৌদ্দ..ছয় সাতে বিয়াল্লিশ—সাতে সাতে উনপঞ্চাশ!" এটা কি সময় ও শক্তির অন্যায় অপচয় নয়? এ রকম ভুল পদ্ধতির আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।[১৬] জেমস্ সদভ্যাস, বিশেষ করে নৈতিক সদভ্যাস গঠনের উপর খুব জোর দেন। এ সম্বন্ধে তার উপদেশগুলি দেওয়া হচ্ছে। বদ অভ্যাস দুর করতে হ'লে বা সদভ্যাস গঠন করতে হ'লে গোড়াতে শক্ত হতে হবে—সংকল্প দৃঢ় হওয়া চাই। যেখানে মনের সর্বান্তঃকরণের সায় নেই, সেখানে অভ্যাস গঠিত হওয়া শক্ত। এ, এ, মিল্নের 'দি বয় কামস্ হোম', এই ক্ষুদ্র একাঙ্ক নাটিকা থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। গল্পের নায়ক, বাড়ীর ছেলে ফিলিপ চার বছর যুদ্ধের পর খুড়োর বাড়ী ফিরে এসেছে। সে বাড়ীর নিয়ম হোল, সকালের চা কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। বাড়ীর কর্তা, খুড়ো মশাইয়ের কাছে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার জো নেই। কিন্তু ফিলিপ ঘুম থেকে উঠেছে অনেক দেরীতে। সে সকাল দশটায় ঝিকে বলেছে ব্রেকফাষ্ট দিতে। খুড়িমা এসে বলছেন—"দুষ্টু ছেলে, দেরী করেছ!" তারপর বললেন—"সৈন্যবিভাগে না শুনেছি খুব ভোরে উঠতে হয়। এ চার বছরের অভ্যাস এত শিগগীর ভুলে গেলি কি করে?" ফিলিপ হেসে উত্তর দিলে, "খুড়িমা, এটা বুঝলে না? এ চার বছর রোজ ভোরে লাফিয়ে উঠেছি, আর রোজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি—"আচ্ছা, দিন আসুক্।" এতে কি আর অভ্যাস গড়ে উঠবার অবসর পায়?"[১৭]

(২) অভ্যাসের গঠনের সময় কখনও ব্যতিক্রম হ'তে দিতে নেই। যেটা নিয়ম সেটা করতেই হবে। কোন ওজর আপত্তি তুলে নিয়ম ভাঙার চেষ্টা করা চলবে না। সকালে রোজ খোকাবাবুর পড়তে বসার কথা, মাষ্টার মশাইয়ের কাছে। কিন্তু সোমবার তার মাথাব্যথা, মা বললেন, "আজ থাক"। বুধবার আবার পেট খারাপ,—মা বললেন "আজ খোকা পড়বে না।" শনিবার দিদির জন্মদিন। মা বললেন "আজ খোকাকে ছুটি দিন"। এ খোকার সকালে পড়তে বসার অভ্যাস কি করে হবে?

আর একটা গল্প বলা যাক্। এক মাতাল প্রতিজ্ঞা করল সে মদ ছেড়ে দেবে। একদিন, দুদিন করে ছ'দিন সে মদের দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, প্রলোভন জয় কর'ল, ভেতরে ঢুকলো না। সপ্তম দিন দোকানের সামনে

16 P, Sandiford—Mental & Physical life of School children P. 149.

17 A. A, Milne—"The Boy Comes Home" from First Plays,

দাঁড়িয়ে বলল "মন কি অপূর্ব আত্ম-সংযম তুই দেখিয়েছিস, আজ তার পুরস্কার তোর পাওনা। আজ তোকে খুসী করে দেব"। বলেই সে ঢুকে পড়লো দোকানে আর পুরো এক বোতল দিয়ে মনকে পুরস্কৃত করলে। একথা বলবার কি দরকার আছে, যে এ মাতাল মদ ছাড়তে পারে নি ?

(৩) অভ্যাস যেটি করতে হবে—সেটি সুযোগ পেলেই অনুশীলন করতে হবে—বরং প্রয়োজন না থাকলেও "বাড়তি" কিছুটা করতে হবে। তাই বয়স্কাউটদের নিয়ম হচ্ছে—দিনে অন্ততঃ একটিবার কাউকে না কাউকে সাহায্য করতে হবে।

(৪) আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে (সমগ্র দেহযন্ত্র ও তার সহজাত সংস্কারগুলিও) অভ্যাসের সহায়ক করে নিতে হবে—অন্ততঃ তা যেন অভ্যাসের বিরোধিতা না করে তা দেখতে হবে।

(৫) স্খলন হ'লে, অতিরিক্ত চেষ্টা করে, অভ্যাসটির পুনরুদ্ধার করতে হবে।

অভ্যাসের কুফল—Habit as an evil—অভ্যাস সবটাই ভাল ? এর কুফল কিছু নেই ? আছে। অভ্যাস মানেই চেষ্টায় ঢিলে দেওয়া। অভ্যাসের মধ্যে আরামের আমেজ আছে,—তা আমাদের উদ্যমকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অভ্যাস মানেই গতানুগতিকতা। সে বলে "যা আছে, বেশ আছে,"—"এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক না ?"

এখানেই অভ্যাসের বিপদ। সে নূতনকে ভয় পায়। অভ্যাস তাই বার্ধক্যের সম্বল। "যে বৃদ্ধ, তাহার দেহের অভ্যাস, মনের অভ্যাস তাকে নূতন পরীক্ষার পথে যেতে বাধা দেয়। সব মানসিক প্রক্রিয়ার ধর্মই হচ্ছে, পুনরাবৃত্তির দ্বারা তারা সহজতর হয়। মনের গতিই হচ্ছে চিন্তা ও কর্মের অভ্যাস গঠনে ; যতই মানুষের বয়স বাড়ে ততই অভ্যাসগুলি ব্যক্তিতে শক্ত হয়ে শিকড় গাড়ে। যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই যা পরিচিত, তা আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরতে ভাল লাগে এবং ততই ক্রমশঃ যা নূতন তার প্রতি বিরাগ বাড়তে থাকে।[18] বের্গসোঁর মতে প্রকৃতি যখনই অভ্যাসের মোহে তার গতি হারিয়ে পৌনঃপুনিক অভ্যাসের শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে তখনই সে আপন সমাধি রচনা করেছে।"[19]

শিক্ষার দুটি আদর্শ—মনের যেমন দুটি বিপরীত ধর্ম—স্থিতি ও গতি,

18 Mc Dougall—Social Psychology P. 389.
19 Bergson—Creative Evolution.

তেমনি শিক্ষার আদর্শও দুটি বিপরীত পথ নিয়েছে। মানুষের মধ্যে একদল আছে, তারা শান্ত, তারা মেনে নেয়, তারা মেনে চলে, তারা বলে—শিক্ষার আদর্শ ব্যক্তিকে সদাচরণে অভ্যস্ত করিয়ে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করে নেওয়া, সৎ নাগরিক সৃষ্টি করা। সবাই যদি সব বিষয়ে প্রশ্ন করে, তর্ক করে, পরীক্ষা করবার স্বাধীনতা দাবী করে, তবে শিক্ষা চলতে পারে না, সমাজ টিকতে পারে না, ধর্মাচরণ অসম্ভব হয়। তাই যোগ-দর্শনের সরণী হচ্ছে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। গোড়াতে চাই মানবার অভ্যাস, সদাচরণের অভ্যাস। গুরুগৃহে তাই শিষ্যকে মানতে হবে গুরুর সমস্ত আদেশ.—বিনা প্রশ্নে বিনা বিচারে। এই প্রাচীন আদর্শে ইয়োরোপও বিশ্বাস করে, এর উপরই গড়েছে তাদের কঠিন রুটিনে বাঁধা পাব্লিক্ স্কুল সিস্টেম্ (Public School System)। বর্তমান কালেও এই মূল আদর্শের সমর্থক জেমস্ (James), নান্ (Nunn), রস্ (Ross), ওয়েষ্ট (West) ইত্যাদি বহু বহু কৃতবিদ্য শিক্ষাবিদ্।

আবার আর একদল লোক আছে যারা চঞ্চল, যারা বিদ্রোহী—যারা পুরাণোকে সহ্য করে না, যারা নূতন পথে চলতে চায়। তারা বলে, জীবন মানেই তো গতি,—নূতনের পথে নিত্য পদক্ষেপ। ঐতরেয় উপনিষদে ইন্দ্র রাজা রোহিতকে তাই বলেছেন,—চলো চলো, এগিয়ে চলো। যে বসে রইলো তার ভাগ্যও বসে রইলো, যে শুয়ে রইলো তার ভাগ্যও শুয়ে রইলো, যে লাফিয়ে উঠলো তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ালো, যে চললো তার ভাগ্যও সামনে এগিয়ে গেলো। ক্লান্তি ও আলস্য, অভ্যাসের আরাম, সে তো মৃত্যু। কাঁটা দলে চলো, তোমার চঞ্চল পদাঘাতে ফুল ফুটে উঠবে, কঠিন মাটিতে। চলো চলো এগিয়ে চলো—চরৈবেতি, চরৈবেতি।[২০] প্রাচীন ঋষির অমৃতময়ী বাণীর প্রতিধ্বনি করেছেন আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান তাঁর 'পায়োনীয়ার্স ও পায়োনীয়ার্স !' আর 'দি সং অব্ দি ওপ্ন্ রোড' কবিতাতে। তারও আগে বেকন (Bacon) বলেছিলেন, মিথ্যা বিশ্বাস (idola) এবং অচল ভাবের (inert idea) দাসত্ব হতে মুক্তি দিতে হবে মানুষকে—তাই তো হোল দার্শনিকের কাজ। রুশো, ভোল্টেয়ার থেকে সুরু করে তাই দেখি ইয়োরোপে প্রাচীন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর। তাই দেখি শিক্ষার ক্ষেত্রে

২০ ঐতরেয় উপনিষদ।

রুটীন্‌এর নিগড় থেকে শিক্ষাকে মুক্তি দেওয়ার দুঃসাহসিক অভিযান, নূতন পরীক্ষার অ্যাডভেঞ্চার শিক্ষার পদ্ধতিতে,—ফ্রোএবেল, মন্তেসরী, ড্যাল্‌টন-এ। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রাসেল্‌ আর হোয়াইট্‌হেড্‌ তাই বলেন—শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বর বিকাশ। ব্যক্তিত্ব মানেই পার্থক্য, বিশেষত্ব। শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ হয়ে, পৃথক হয়ে গ'ড়ে উঠতে সাহায্য করা। সে শিক্ষা অভ্যাসের বাঁধা সড়কে হয় না—তা আসে নূতন পরীক্ষা, নূতন আঘাত, নূতন বাধা উল্লংঘনের সাহসের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার আদর্শ অভ্যাসের আরামে নয়—জীবন-ধারার বলিষ্ঠ বিস্তারে; মানায় নয়—নূতন সৃষ্টিতে।

আপাতবিরোধী দুটি আদর্শ। কিন্তু দুটিই সত্য। স্থিতি ও গতি একই জীবন-স্রোতের দুটি দিক। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি অর্থহীন। তাই যদি বলি শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসই সব, সেও যেমন মিথ্যা; তেমনি যদি বলি, অভ্যাস বর্জনই সব, তাও তেমনি মিথ্যা। যেখানে সবাই মেনে চলবে,—সে অচলায়তন যেমন ভয়ংকর; যেখানে কেউই কিছুই মানতে চায় না,—সেও তেমনি অসহ্য বিশৃংখলা। সমাজও সত্য, ব্যক্তিও সত্য। নিছক বিশেষত্ব বলে কিছু নেই, বিশেষত্বহীন একত্ব বলেও কিছু নেই, থাকতে পারে না। এই দুই আদর্শের সুসম সমন্বয়েই নিহিত আছে শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ।

ডিউইর মতে অভ্যাসের স্বরূপ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের মূল নিরূপণ—ডিউইর মতে অভ্যাস একটা স্থিতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার নয়। অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তো তার যোগ রয়েছেই, ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার সঙ্গেও। কারণ, কোন অভিজ্ঞতা পুনঃ পুনঃ হতে থাকলে, তবেই সেটা অভ্যাসে পরিণত হবে। অভ্যাসের দ্বারা একটা কৌশল বা নিপুণতা অর্জিত হয়। আমরা অনেক সময় মনে করি, সেখানেই অভ্যাসের শেষ। কিন্তু ডিউই এই কথাটাই জোর দিতে চান যে, অভ্যাসের প্রভাব রয়েছে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার উপরও। এটাকে তিনি বলেছেন, ধারাবাহিকতার নীতি (the principle of continuity)। যে অভ্যাস অর্জন করে, তার মনের ও দেহের গঠনের বা ধারার পরিবর্তন হয়, এবং প্রত্যেক অভ্যাসই ব্যক্তির ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে প্রভাবান্বিত করে।

অভ্যাসের মূল চরিত্রই এই যে অনুশীলিত প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিকে

পরিবর্তিত করে, এবং সে ইচ্ছা করুক আর নাই করুক তার পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা এর ফলে পরিবর্তিত হয়।

সাধারণভাবে অভ্যাসকে কতগুলি নির্দিষ্টভাবে কৃত ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ দৃষ্টিতে দেখলে অভ্যাস অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার তা বোঝা যাবে।...অভ্যাসের মধ্যেই অন্তর্গত অনুভূতি ও বুদ্ধির নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গঠন।[21]

শিক্ষার কাজ হচ্ছে এ রকম এ্যাটিট্যুড্‌স দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রবণতা সৃষ্টি করা। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সদভ্যাস গঠনের উপর জোর দেওয়াটা স্বাভাবিক। সব শিক্ষাব্রতীই এ বিষয়ে একমত। কিন্তু সদভ্যাসের নিজস্ব কোন মূল্য নেই—এটা একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। সে উদ্দেশ্যটি কি? সে উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে নিজ ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে যুক্ত করা। সমস্ত শিক্ষা বা সদভ্যাস এই উদ্দেশ্যমূলক বা instrumental। ডিউইর জীবন-দর্শনকে তাই উদ্দেশ্যবাদী বলা হয়।

শিক্ষকের দৃষ্টিতে সে অভ্যাসই সদভ্যাস, যা ভবিষ্যতে ব্যক্তির সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণতর ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে বা উৎসাহিত করে। ডিউই শিক্ষায় প্রগতিবাদীদের (progressive) দলে। তাঁর মতে সমস্ত শিক্ষার মূল—অভিজ্ঞতা, শিক্ষালাভের মাধ্যম—অভিজ্ঞতা, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যও—অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ।

এ্যব্রাহাম্ লিন্‌কল্‌ন্—গণতন্ত্রবাদ বা democracyর সংজ্ঞা দিয়েছিলেন জনগণের কল্যাণে ও জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। ডিউই তেমনি শিক্ষার আদর্শকে সংজ্ঞা দিয়েছেন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণ ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ।[22]

কিন্তু শিক্ষকের কাছে সব অভিজ্ঞতাই কি সমান দামী? বেন্‌থামের ভাষায় হাঙ্কা কাঠির খেলা, আর কাব্যচর্চ্চার একই মূল্য? এবং কেবল মাত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা অভ্যাস সৃষ্টি ও নৈপুণ্য লাভই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য? স্পষ্টতঃই তা হ'তে পারে না। "কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত" হওয়াও ত অভিজ্ঞতা অর্জন ও অভ্যাস গঠন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে

21 John Dewey—Expericnce Education, P. 25-26.

22 John Dewey—Experience and Education. P. 19

অভ্যাসের ফলে কোন ব্যক্তি সিঁদেল চুরীতে বা ডাকাতিতে অথবা রাজনৈতিক বজ্জাতিতে আরো 'ঝানু' হতে পারে।[২৩]

তা হ'লে এ প্রশ্নের মীমাংসা দরকার, সদভ্যাস কাকে বলা যাবে? অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণ হবে কি করে? এ প্রশ্নের জবাব ডিউই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সে অভিজ্ঞতা বা অভ্যাসই শিক্ষার অনুকূল বা educative, যা ব্যক্তির দেহ বা মনের গঠনকে পরিবর্তন করে এমন ভাবে, যাতে ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ, পূর্ণতর অভিজ্ঞতার পথ সুগম হয়। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা আপাতরম্য কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনকে বিকারগ্রস্ত, পঙ্গু বা সংকীর্ণতর করে তা শিক্ষার প্রতিকূল, বা Mis-educative। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর মানসিক একাগ্রতা ও সমন্বয়ের সহায়ক তাকে শিক্ষক বেশী দাম দেবেন। যা তার মনকে বিচ্ছিন্ন করে, বিভক্ত করে,—নিজ বা সমাজ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিহীন করে, তা শিক্ষক পরিহার করবেন। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর মনকে, ভবিষ্যৎ ও নূতনকে জানতে উৎসাহিত করে, যে অভিজ্ঞতা "সবার রংএ রং মেশাতে" শিশুকে অগ্রসর করে, যে অভিজ্ঞতা তার জীবনকে বিস্তার লাভ করতে সাহায্য করে তা সুশিক্ষার অঙ্গ। আর যে অভিজ্ঞতা শিশুর মনকে বিহ্বল করে, আত্মকেন্দ্রিক করে, পরের জীবন ও অভিজ্ঞতার প্রতি নির্মম করে তোলে—তা কুশিক্ষা।[২৪] যে অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সাহস, বুদ্ধি এ স্থৈর্য্যদান করতে পারে, তা সুশিক্ষা; যা শিশুর মনকে অজানা ও ভবিষ্যতের সম্পর্কে ভীরু বা উদাসীন করে তোলে, তা কুশিক্ষা।

23 John Dewey—Experience and Education, P. 20

24 "Any experience is mis-educative that has the effect of arresting or distorting the growth of further experience. An experience may be such as to engender callousness; it may produce lack of sensitivity and of responsiveness. Then the possibilities of having richer experience in the future are restricted. Again, a given experience may increase a person's automatic skill in a particular direction and yet tend to land him in groove or rut; the effect again, is to narrow the field of further experience. An experience may be immediately enjoyable and yet promote the formation of a slack and careless attitude; this attitude then operates to modify the quality of subsequent experiences so as to prevent a person from getting out of them what they have to give. Again, experiences

may be so disconnected from one another that, while each is agreeable or even exciting in itself, they are not linked cumulatively to one another. Energy is then dissipated, and a person becomes scatter-brained. Each experience may be lively, vivid, and "interesting," and yet their disconnectedness may artificially generate dispersive, disintegrated, centrifugal habits. The consequence of the formation of such habits is, inability to control future experience,'—John Dewey. Experience and Education, P, 13-14,

সপ্তদশ অধ্যায়

অনুকরণ (Imitation)

যখন ছোট ছিলাম তখন একটি গল্প পড়েছিলাম যে একজন পথিক দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করবার সময় পথশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে একটি নারিকেলকুঞ্জে প্রবেশ করলেন। গাছে প্রচুর নারিকেল ফলে আছে কিন্তু তিনি গাছে চড়তে জানেন না, তাই পিপাসা নিবারণের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি দেখলেন একদল বানর একটি নারিকেল গাছের মাথায় বসে আছে। তিনি তাদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁর দেখাদেখি বানরেরা গাছ থেকে নারিকেল ছুঁড়ে নীচে ফেলতে লাগলো। পথিক তখন তাঁর ইচ্ছামত নারিকেল জলে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে তৃপ্ত হ'লেন। লেখক নিশ্চয় বানরের অনুকরণ-প্রিয়তা আর নরের বুদ্ধির কথাই এ গল্পের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু বানরই অনুকরণপ্রিয় নয়। নরও যথেষ্ট অনুকরণ-পটু। সম্ভবত; মানবশিশু তার শিক্ষার অধিক অংশই আয়ত্ব করে, অনুকরণের দ্বারা। হাসি, কান্না, খেলা, কথা বলা, খেতে শেখা এ সবই অনুকরণের ফল। এ অনুকরণ অনেক সময়ই হয়, অচেতনভাবে। কিন্তু মানুষ বড় হয়েও অনুকরণ করে,—তা করে স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে।

অনুকরণ কাকে বলে? অনুকরণ মানে, দেখে শেখা। একজনকে কোন একটা কাজ করতে দেখে সে রকম কাজ করবার চেষ্টা। ড্রেভার সংজ্ঞা দিচ্ছেন একটা কাজ অন্যকে করতে দেখে, করা; একাজে আগ্রহ হয় এবং একাজ পরিচালিত হয় অন্য কাউকে কাজটি করতে দেখে।"[1]

কাজেই এটা একটা সামাজিক ক্রিয়া। দশজনের প্রভাবে ব্যক্তি যে প্রভাবান্বিত হচ্ছে—তারই প্রমাণ। এর থেকেই তো ফ্যাসান সৃষ্টি। ওর ক্লাসের অনেক ছেলে হাওয়াই সার্ট পরে, তাই অশোকও পরে হাওয়াই সার্ট। অনুকরণটা অন্যের চোখে সামাজিক ক্রিয়া, কিন্তু যে অনুকরণ করে সে সব সময় এটাকে সে দৃষ্টিতে দেখে না। সে ভাবে এটা তার নিজস্ব কর্ম। শিশুর

1 James Drever—A Dictionary of Psychology, P. 128

কাছে এটার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, সে হচ্ছে, সে কর্মে তার নিজের আগ্রহ ও আনন্দ। শিশুর দিক থেকে এই অনুকরণ ক্রিয়া তীব্রভাবে ব্যক্তিগত। সে অনুকরণ করে, তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে অনুরূপ ভাবে সম্প্রসারণ করবে এই ইচ্ছায়।[২]

একটি শিশু ক্ষুধার্ত, তার খাবার সময়ও হয়েছে—তখন সে দেখলে অন্যেরা খাচ্ছে এবং সেও খেতে সুরু করে দিলে। এটা কি অনুকরণ বলব? এটা ঠিক অনুকরণ নয়। কারণ এখানে তার খাওয়ার মূল তাগদটা এসেছে তার নিজের ভেতর থেকেই—ক্ষুধা-বোধ তার জেগেছে, সে জানে খাওয়া কাকে বলে, সে জানে, কি করে খেতে হয়। যদি সে অন্য শিশুদের এখানে খেতে নাও দেখতো তবু সে সম্ভবত তখন খেতে বসতো। অন্যকে খেতে দেখে তার খাওয়াটা ত্বরান্বিত হয়েছে—এই পর্যন্ত। এটাকে ইঙ্গিত (suggestion) বলতে পারি। অন্যের খাওয়াটা তার নিজের খাওয়ার ইঙ্গিত করেছে মাত্র। কিন্তু যদি সে খেতে বসে লক্ষ্য করে থাকে, মাসীমা কেমন সুন্দর আলুত্তোভাবে খাচ্ছে,—আর তা দেখে তার সখ হয়, তেমনি পরিচ্ছন্নভাবে খেতে, তা হ'লে সেটা হবে বাস্তবিক অনুকরণ। আরো বেশী অনুকরণ হবে, যদি সে এমন একটা কাজ করতে চেষ্টা করতো, অন্যের কাজ দেখে, যেটা সে আগে করেনি। যেমন অশোক লেকে দেখলো শিক্ষিত সাঁতারুরা কেমন করে জলে পড়ে (dive), সে আগে কোনদিন ডাইভ দেয়নি,—সে তা শিখতে চেষ্টা করলো। এটা অনুকরণ।

অনুকরণের মূল তা হ'লে সহজাত সংস্কারে। তাই পশুদের মধ্যেও অনুকরণের প্রবৃত্তি দেখা যায়। ছোট মুরগীর ছানা মার পেছনে পেছনে ঘুর্ ঘুর্ করে ঘোরে, মাটি থেকে খাদ্য খুঁটে খায়, মার দেখাদেখি। প্রবৃত্তিটা এবং প্রবৃত্তির প্রকাশের দৈহিক ব্যবস্থাটা জন্মগত—তবে বারে বারে অনুকরণের দ্বারা ক্রিয়াটা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেটা সুসম্পন্ন হয়। পশুদের সমাজ-জীবন বহুলাংশে অনুকরণ সাপেক্ষ। পশুর অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous), বুদ্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত নয়। মানুষ হচ্ছে একমাত্র জীব, যার মধ্যে আমরা সচেতনভাবে ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ অনুকরণের ব্যবহার দেখতে পাই। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত পরম উপভোগ্য শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ 'চিত্রগ্রীব' (Gay-neck) একটি পোষা পারাবতের কাহিনী। তাতে চিত্রগ্রীব

২ Sandiford—The Mental and Physical Life of School Children, P. 211.

কি করে তার মাকে দেখে দেখে ক্রমে ক্রমে উড়তে শিখলো, বাজপাখীর ছোঁ থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখলো তার সুন্দর বর্ণনা আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ এই পাখীর বিবরণটিতে মানুষের মনের প্রতিফলন (anthropomorphism) দেখা যায়। থর্ণডাইক ও স্মল পশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন সম্ভবতঃ ওরা সচেতনভাবে দেখে শেখে না। "থর্ণডাইক ও স্মল দেখেছেন যে প্রাণীরা তাদের অন্য সঙ্গীদের কোন নূতন কাজ, যেমন খাঁচার দরজা খোলা ইত্যাদি করতে দেখে শেখে না। যেসব প্রাণী এ রকম দেখবার সুযোগ পায়নি তাদের চেয়ে তারা তাড়াতাড়ি সে কাজ করতে শেখে না।"[৩] কাজেই পশুরা অনুকরণের দ্বারা নূতন কিছু শিখতে পারে না,—যে প্রবৃত্তিটা তাদের সহজাত, যেটা ক্রিয়ায় প্রকাশিত হওয়ার আবেগ তার ভেতরেই আছে, অনুকরণ তাকে ত্বরান্বিত করতে পারে, হয়তো কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে ক্রিয়ার ধরণটা। কিন্তু মানুষের বেলায় অনুকরণ নূতন কর্মের পথ দেখাতে পারে এবং তা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জসীকরণের কাজে সাহায্য করে। "অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে অনুকরণ পূর্বে যে ক্ষমতা সুপ্ত ছিল তাকে বিকশিত করে এমন ভাবে, যাতে তার জগতে টিকে থাকার সহায়তা হয়; কিন্তু মানব শিশুর ক্ষেত্রে অনুকরণ অসংখ্য বিভিন্ন ধরণের নূতন ক্রিয়া অথবা বিভিন্ন ধরণের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জসীকরণের সহায়ক হয়।"[৪]

অনুকরণের স্তরভেদ ও এর বিভিন্ন রূপ (Development of Imitation and its different forms)—অনুকরণ অচেতন বা সচেতন দুই-ই হ'তে পারে এবং মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণের রূপও পরিবর্তিত হয়। এই বিকাশের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি স্তর কার্কপ্যাট্রিক লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য এই স্তরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।

১। **যান্ত্রিক অনুকরণ (Reflex Imitation)**—শিশু অন্য শিশুকে হাসতে দেখলে হাসে, কাঁদতে দেখলে কাঁদে, পাখীর ঝাঁকের একটি উড়তে সুরু করলে সবশুদ্ধ উড়ে চলে,—এতে কোন তাৎপর্য্যবোধ বা বিশ্লেষণ নেই, মনন বা বিচার তো নেই-ই। শিশু এক বছর পর্যন্ত এ ধরণের অনুকরণই করে থাকে। নিম্নস্তরের পশুরা এ স্তরের বেশী উপরে উঠতে পারে না। পরিণত বয়সেও আমরা এ শ্রেণীর অনুকরণ দেখি। শিক্ষক বেশ প্রসন্ন মনে হাসিমুখে

3 & 4—Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, P. 130-131.

ক্লাসে এলে ছাত্রদের মুখেও হাসি ফুটে। আবার কেউ চটে কথা বললে, আমরা চটেই তার জবাব দিই।

২। **স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুকরণ** (**Spontaneous Imitation**)—শিশু স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই তার চার পাশের সব জিনিষ অনুকরণ করে। এতে সচেতন বিশ্লেষণ নেই—ঠিক যেমনটি দেখেছে, যেমনটি শুনেছে, তেমনি তেমনি সবটাই সে করছে। "মোরগের ডাক থেকে সুরু করে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ হুইসিল্, সাপের এঁকে বেঁকে চলা থেকে ধর্মোপদেশ বিতরণের ভঙ্গী সব কিছুই শিশু অনুকরণ করে।"[৫] এ অনুকরণ কিন্তু আকস্মিক নয়, এখানে মনোনিবেশ আছে। যা মনকে আকর্ষণ করে না, তা এ স্তরে শিশু অনুকরণ করে না। কাজেই শিশুর মানসিক বিকাশ অনুযায়ী তার অনুকরণের দ্রব্য বিভিন্ন। খুব ছোট যারা, তারা পশু বা অন্য শিশুদের অনুকরণ করে, আর যে সব শিশুরা একটু বড় হয়েছে তারা অনুকরণ করে বয়স্কদের চালচলন ভঙ্গী। পাঁচ বছর পর্যন্ত এ ধরণের অনুকরণের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ দেখা যায়। "সাধারণতঃ যে উত্তেজক অনুকরণের কারণ, তা কোন প্রত্যক্ষ বস্তু।.......ছোট শিশুর ভৌগোলিক বা সামাজিক পরিবেশে যে সব ঘটনা ঘটে, তার কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। এ সমস্তই অনুকরণের দ্বারা সে আপনার করে নেয়, এবং তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে.......স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুকরণ ক্রমশঃ অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং ক্রমেই অধিকতর জটিল ক্রিয়াতে পরিণত হয়। এবং তা ছাড়া এ অনুকরণ শুধু প্রত্যক্ষ বস্তুকে অনুসরণ করে না, প্রতিরূপের (images) প্রতিক্রিয়া হিসাবেও আসে।"[৬]

৩। **নাটকীয় বা গঠনাত্মক অনুকরণ** (**Dramatic or Constructive Imitation**)—শিশু আর একটু বড় হ'লে অতীত অনুকরণের বস্তু বা ঘটনাকে কল্পনায় নানা নূতনভাবে সাজিয়ে তা অনুকরণ করে। এ স্তরে 'মনে করো যেন'র ('make believe') প্রভাব খুব বেশী। মীনু তার পুতুলকে বিছানায় শুইয়ে কাঁথা ঢাকা দেয়, বাতাস করে, মুখ কালো করে বলে, "খুকুর আমার বড্ড জ্বর এসেচে, খুব মাথা ধরেচে, আজ আর খুকুকে রাত্তিরে ভাত দেব না।" আবার খুব চিন্তিত হয়ে বলে, "ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দিতে হবে, আমার কি ছাই এতটুকু শান্তি আছে!"

5 Kirpatrick—Fundamentals of Child Study, P. 131,

6 Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, P. 136.

বলাই বাহুল্য, তার নিজ সংসার বা প্রতিবেশীদের পরিবার থেকে সে তার কল্পনা অনুকরণের মাল-মশলা সংগ্রহ করেছে। শ্রীযুত বিভূতি মুখোপাধ্যায় বহু গল্পে এ রকম শিশুর উপভোগ্য ছবি এঁকেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণের মত এ অনুকরণ আক্ষরিক নয়; এখানে কল্পনা এসে ক্রিয়াগুলিকে নূতন ও অশ্রুতপূর্ব নানা আকারে ভেঙেচুরে গড়ে।[7] সাধারণতঃ তিন বছরের পর এ জাতীয় অনুকরণের প্রবৃত্তি দেখা যায় এবং ছয় সাত বছরে এর পরিপূর্ণ পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রবৃত্তি পরিণত বয়সেও লোপ পায় না। বুড়োদেরও তাই অনেক সময় 'কচি' সাজতে সাধ দেখা যায়।

এই স্তরের শিশু এক বা একাধিক কাল্পনিক সঙ্গী (imaginary companions) সৃষ্টি করে। তার সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা তর্ক কলহও চলে। অনেক সময় সে নিজেকেই এক কাল্পনিক সঙ্গীর কথাবার্তায় ফুটিয়ে তোলে।

৪। **সচেষ্ট অনুকরণ (Voluntary Imitation)**—এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, সচেষ্ট অনুকরণ। এখানে ভবিষ্যৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অনুকরণ করা হয়। এখানে ভবিষ্যতের ছবিটি মনে ফোটানোর ক্ষমতা নিশ্চয়ই বিকশিত হওয়া চাই। সচেষ্ট অনুকরণের উপরেই বিদ্যালয়ে শিশুর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর করে। ছবিটি শুদ্ধ করে আঁকলে, শিক্ষকের প্রশংসা অর্জন করা যায়, তাই ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষকের আঁকবার পদ্ধতিটি অনুকরণ করতে সে সচেষ্ট প্রয়াস করে। বিশুদ্ধ বাক্যরচনা করতে এইভাবেই শিশুরা শেখে। সাধারণতঃ ছয় সাত বৎসরের পর থেকে এ স্তর সুরু হয়। এখানে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের ক্ষমতা কতকটা অগ্রসর হয়েছে।

৫। **ভাবচালিত সচেষ্ট অনুকরণ (Idealistic Imitation)**—এটি অনুকরণের সর্ব্বোচ্চ স্তর। এখানে একটি আদর্শকে অনুসরণ করতে শিশু সচেতনভাবে চেষ্টা করে। একে ষ্টাউট্ (Stout) বলেছেন চিন্তা ও বিচারজাত অনুকরণ (deliberative imitation)। এ স্তরে বিশ্লেষণ, সমন্বয়, বস্তুবিবর্জিত মনন ইত্যাদি ক্ষমতা বিকশিত হওয়া চাই। এখানে বিচার আছে, গ্রহণ বর্জন আছে। ইহা ধারণা (concept) বাহিত এবং বিচার বিবেচনা সঙ্গত। যেমন ক্রিকেট্ বা অন্যান্য খেলার ধরণ (style) বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক বিচার সাপেক্ষ এবং পরবর্ত্তী অনুকরণের সময় যে

7 Sandiford—Mental and Physical Life of School Children, P. 212.

পদ্ধতিটি নির্ভুল বা আদর্শ বিবেচিত হয় তাই অনুসৃত হয়ে থাকে। বয়স্ক মানুষের জীবনে এ ধরণের অনুকরণ স্বাভাবিক ও সহজ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের উপযোগিতা। (Educational use of Imitation)—শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণ একটি মূল্যবান উপাদান। শিশু অনুকরণ-প্রিয় তাই শিক্ষার কাজটা সহজ হয়। অনুকরণ সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তি—তাই অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তির মত একেও কাজে লাগানো যেতে পারে। সুশিক্ষক এ কথা জানেন কাজেই শিশুর সামনে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তাকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু অনেক সময়, আমরা বড়রা, এ কথাটা ভুলে যাই যে শিশু অত্যন্ত কৌতূহলী ও অনুকরণ-পটু। তাদের চলা ফেরা, হাব ভাব এমন কি চিন্তাও বহুল পরিমাণে আমাদের বয়স্কদের আচরণ দ্বারা প্রভাবান্বিত। এটা অনেক সময় দেখেছি—মায়েরা তাঁদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সামনে অত্যন্ত অশোভন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—বা অভিভাবকরা তাদের সামনে অসঙ্গত আচরণ করছেন। তাঁরা নিজেদের চোখ ঠারেন "ওরা কিছু বোঝে না।" ওরা স্পষ্ট বুঝতে না পারে, কিন্তু ওরা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে, অনুকরণ করে, আন্দাজ করে, এবং কু-অভ্যাস আয়ত্ব করে। ঠাকুরদাদা আদর করে নাতিকে তামাক খাওয়ার অনুকরণ করতে উৎসাহিত করছেন, পিতা পুত্রীকে আদর করে, "লারে লাপ্পা" গান অনুকরণ করিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন, এ রকম দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। এ যে কত বড় নির্বুদ্ধিতা তা না আলোচনা করলেও চলে। শিশুর চারপাশের পরিবেশটি যদি পরিচ্ছন্ন হয় তবে সেখানে শিশু সহজেই সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে, সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে। যেখানে শিশুর চারপাশে রয়েছে কদর্যতা, কলহ, মিথ্যাচার, নীচতা ও নৃশংসতা সেখানে কচি শিশুর মনটি বিকৃত হবেই। তাই শিক্ষককে সর্বপ্রযত্নে শিশুর সামনে অনুকরণযোগ্য সুন্দর দ্রব্য, সুন্দর ঘটনা ধরে দিতে হবে। প্রথম কয়টি বছরে শিশু যা অনুকরণ করতে শেখে তা দিয়ে তার পরবর্তী চরিত্র গঠিত হয়, বহুলাংশে। প্রথম কয়টি বছরের ভুল, পরে বহু চেষ্টায়ও আরোগ্য করা সম্ভব হয় না। তৎক্ষণাৎ অনুকরণ (Reflex) বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণ (spontaneous imitation)—খুব অল্পই পরিচালনা করা যায়। এ স্তরে এটাই দেখা দরকার, ভুল, অসুন্দর ও অন্যায় দৃষ্টান্ত শিশুর সামনে যেন বেশী না আসে। নাটকীয় অনুকরণের স্তরেও শিশুকে বেশী বাধা দেওয়া ঠিক নয়, তবে দেখতে হবে

বলাই বাহুল্য, তার নিজ সংসার বা প্রতিবেশীদের পরিবার থেকে সে তার কল্পনা অনুকরণের মাল-মশলা সংগ্রহ করেছে। শ্রীযুত বিভূতি মুখোপাধ্যায় বহু গল্পে এ রকম শিশুর উপভোগ্য ছবি এঁকেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণের মত এ অনুকরণ আকস্মিক নয়; এখানে কল্পনা এসে ক্রিয়াগুলিকে নূতন ও অশ্রুতপূর্ব নানা আকারে ভেঙেচুরে গড়ে।[7] সাধারণতঃ তিন বছরের পর এ জাতীয় অনুকরণের প্রবৃত্তি দেখা যায় এবং ছয় সাত বছরে এর পরিপূর্ণ পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রবৃত্তি পরিণত বয়সেও লোপ পায় না। বুড়োদেরও তাই অনেক সময় 'কচি' সাজতে সাধ দেখা যায়।

এই স্তরের শিশু এক বা একাধিক কাল্পনিক সঙ্গী (imaginary companions) সৃষ্টি করে। তার সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা তর্ক কলহও চলে। অনেক সময় সে নিজেকেই এক কাল্পনিক সঙ্গীর কথাবার্তায় ফুটিয়ে তোলে।

৪। **সচেষ্ট অনুকরণ (Voluntary Imitation)**—এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, সচেষ্ট অনুকরণ। এখানে ভবিষ্যৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অনুকরণ করা হয়। এখানে ভবিষ্যতের ছবিটি মনে ফোটানোর ক্ষমতা নিশ্চয়ই বিকশিত হওয়া চাই। সচেষ্ট অনুকরণের উপরেই বিদ্যালয়ে শিশুর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর করে। ছবিটি শুদ্ধ করে আঁকলে, শিক্ষকের প্রশংসা অর্জন করা যায়, তাই ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষকের আঁকবার পদ্ধতিটি অনুকরণ করতে সে সচেষ্ট প্রয়াস করে। বিশুদ্ধ বাক্যরচনা করতে এইভাবেই শিশুরা শেখে। সাধারণতঃ ছয় সাত বৎসরের পর থেকে এ স্তর সুরু হয়। এখানে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের ক্ষমতা কতকটা অগ্রসর হয়েছে।

৫। **ভাবচালিত সচেষ্ট অনুকরণ (Idealistic Imitation)**—এটি অনুকরণের সর্ব্বোচ্চ স্তর। এখানে একটি আদর্শকে অনুসরণ করতে শিশু সচেতনভাবে চেষ্টা করে। একে ষ্টাউট্ (Stout) বলেছেন চিন্তা ও বিচারজাত অনুকরণ (deliberative imitation)। এ স্তরে বিশ্লেষণ, সমন্বয়, বস্তুবিবর্জিত মনন ইত্যাদি ক্ষমতা বিকশিত হওয়া চাই। এখানে বিচার আছে, গ্রহণ বর্জন আছে। ইহা ধারণা (concept) বাহিত এবং বিচার বিবেচনা সঙ্গত। যেমন ক্রিকেট্ বা অন্যান্য খেলার ধরণ (style) বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক বিচার সাপেক্ষ এবং পরবর্ত্তী অনুকরণের সময় যে

7 Sandiford—Mental and Physical Life of School Children, P. 212.

পদ্ধতিটি নিভুর্ল বা আদর্শ বিবেচিত হয় তাই অনুসৃত হয়ে থাকে। বয়স্ক মানুষের জীবনে এ ধরণের অনুকরণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের উপযোগিতা। (Educational use of Imitation)—শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণ একটি মূল্যবান উপাদান। শিশু অনুকরণ-প্রিয় তাই শিক্ষার কাজটা সহজ হয়। অনুকরণ সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তি—তাই অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তির মত একেও কাজে লাগানো যেতে পারে। সুশিক্ষক এ কথা জানেন কাজেই শিশুর সামনে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তাকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু অনেক সময়, আমরা বড়রা, এ কথাটা ভুলে যাই যে শিশু অত্যন্ত কৌতূহলী ও অনুকরণ-পটু। তাদের চলা ফেরা, হাব ভাব এমন কি চিন্তাও বহুল পরিমাণে আমাদের বয়স্কদের আচরণ দ্বারা প্রভাবান্বিত। এটা অনেক সময় দেখেছি—মায়েরা তাঁদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সামনে অত্যন্ত অশোভন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—বা অভিভাবকরা তাদের সামনে অসঙ্গত আচরণ করছেন। তাঁরা নিজেদের চোখ ঠারেন "ওরা কিছু বোঝে না।" ওরা স্পষ্ট বুঝতে না পারে, কিন্তু ওরা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে, অনুকরণ করে, আন্দাজ করে, এবং কু-অভ্যাস আয়ত্ব করে। ঠাকুরদাদা আদর করে নাতিকে তামাক খাওয়ার অনুকরণ করতে উৎসাহিত করছেন, পিতা পুত্রীকে আদর করে, "লারে লাপ্পা" গান অনুকরণ করিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন, এ রকম দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। এ যে কত বড় নির্বুদ্ধিতা তা না আলোচনা করলেও চলে। শিশুর চারপাশের পরিবেশটি যদি পরিচ্ছন্ন হয় তবে সেখানে শিশু সহজেই সদ্‌দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে, সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে। যেখানে শিশুর চারপাশে রয়েছে কদর্যতা, কলহ, মিথ্যাচার, নীচতা ও নৃশংসতা সেখানে কচি শিশুর মনটি বিকৃত হবেই। তাই শিক্ষককে সর্বপ্রযত্নে শিশুর সামনে অনুকরণযোগ্য সুন্দর দ্রব্য, সুন্দর ঘটনা ধরে দিতে হবে। প্রথম কয়টি বছরে শিশু যা অনুকরণ করতে শেখে তা দিয়ে তার পরবর্তী চরিত্র গঠিত হয়, বহুলাংশে। প্রথম কয়টি বছরের ভুল, পরে বহু চেষ্টায়ও আরোগ্য করা সম্ভব হয় না। তৎক্ষণাৎ অনুকরণ (Reflex) বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণ (spontaneous imitation)—খুব অল্পই পরিচালনা করা যায়। এ স্তরে এটাই দেখা দরকার, ভুল, অসুন্দর ও অন্যায় দৃষ্টান্ত শিশুর সামনে যেন বেশী না আসে। নাটকীয় অনুকরণের স্তরেও শিশুকে বেশী বাধা দেওয়া ঠিক নয়, তবে দেখতে হবে

যেন সে কল্পনা ও বাস্তবের সীমারেখাটা একেবারে ভুলে না যায়। ফ্রোএবল শিশুর মনের এ স্তরটির গুরুত্ব স্বীকার করলেও তাঁর অনুগামীরা শিশুর জীবনে কল্পনা-রঞ্জিত অনুকরণের প্রবৃত্তিকে নিরুৎসাহ করবার পক্ষপাতী। বর্তমানে অনেক শিশু-মনোবিজ্ঞানী কিন্তু এ প্রবৃত্তিকে মূল্যবান শিক্ষার সহায় ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের অনুকূল এমন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিশু কি শুধুই অনুকরণ করবে—অন্ধভাবে শুধুই অনুসরণ করবে? তা হ'লে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে কি করে? শিশুর জীবনের প্রথম স্তরে অনুকরণ ছাড়া শেখাবার কোন পথ নেই। গোড়াপত্তন হবে দাগা বুলিয়েই, তার পরে আসবে ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব (Individuality) বিকাশের প্রশ্ন। শিশু শিক্ষার গতিকে অন্ধ অনুকরণের গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে সচেতন উদ্দেশ্যমুখী বা আদর্শমুখী করতে হবে—এটাই হবে শিক্ষকের শিক্ষার উদ্দেশ্য। যা ছিল অচেতন অভ্যাস, তাকে পরিণত করতে হবে—সচেষ্ট আদর্শ অনুসরণের উৎসাহে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

খেলা—Play

'জগৎ পারাবারের তীরে, শিশুরা করে খেলা'—জগৎ জুড়েই এই লীলা। শিশুরা খেলা করে,—তাতে আনন্দ পায়, তাতে মেতে ওঠে। সব দেশে, সব কালে মানব-শিশু খেলা করে আসছে। গায়ে ধূলো লাগছে, তাতে ভোলানাথের লজ্জা নেই, রঙীন পোষাক ছিঁড়ে ছুঁড়ে যাচ্ছে তাতে দুঃখ নেই। দামী স্প্রিং এর বিলিতী খেলনা আর সস্তা, মেলায়-কেনা মাটির পুতুল, দুই-ই তার কাছে সমান, দুয়েই তার সমান আনন্দ! হয় তো বরং দেখা যাবে ওই চকচকে দামী মোটরের চেয়ে তার আকর্ষণ বেশী, ওই ছেঁড়া খোঁড়া নোংরা ন্যাকড়ার পুতুলটার ওপরই। মানুষের জীবনে অবিমিশ্র সুখ যদি কখনো থেকে থাকে, তা শিশুর নিশ্চিত-নির্ভর স্বতঃ উৎসারিত খেলার আনন্দের মধ্যে। শিশু যখন খেলায় মত্ত, তখনই বুঝি সে "স্বভাবে" আছে। "খেলাই হচ্ছে শিশুর সবচেয়ে স্বাভাবিক ক্রিয়া। খেলাতে কোন উদ্দেশ্য সাধনের বালাই নেই, খেলাতেই খেলার আনন্দ। এখানে শক্তি স্বেচ্ছায় ব্যয়িত হচ্ছে, কিন্তু শিশুর মনে অন্ততঃ, তার লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখবার দুশ্চিন্তা নেই। হাসির মত খেলা তো শক্তিব্যয়ের একটা পথ। তা অবশ্যই উদ্দেশ্য-হীন নয়—যদিও জীবনের প্রয়োজনে যে উদ্দেশ্যগুলিকে আমরা আবশ্যক মনে করি তাদের কোনটাই প্রত্যক্ষভাবে এ দ্বারা সাধিত হয় না। এই আবশ্যক উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছে খাদ্য ও বাসস্থান আহরণ, শত্রুর কবল থেকে পলায়ন, অথবা অন্য কোন বহিরঙ্গ প্রয়োজন। খেলাতে ক্রিয়াটি যেন নিজেই নিজের উদ্দেশ্য।"[1]

বড়রাও খেলা করে। কিন্তু তাতে যেন তার লজ্জা আছে, সে সম্পূর্ণ প্রাণ তাতে ঢেলে দিতে পারে না, যেমন পারে শিশুরা। কারণ, তার মনের মধ্যে একটা সংস্কার গভীর ভাবে শেকড় গেড়েছে, খেলা হচ্ছে কাজের উল্টো; তাই কাজের মানুষের পক্ষে খেলাটা হচ্ছে সময়ের অপব্যয়,—এটা ছেলেমানুষী। তাই খেলার স্বপক্ষে তাকে যুক্তি খাড়া করতে হয়, তার জন্যে ওকালতী করে, পরকে আর নিজেকেও বোঝাতে হয়। বলতে হয়, খেলাটা দরকার স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যে,

---

1 Thouless—General and Socia Psychology, P. 211.

শরীর তৈরী করার জন্যে, কাজের সর্বনাশা চাপ থেকে মাঝে মাঝে মনটাকে হাঁফ ছাড়বার অবসর দেবার জন্যে! যুক্তিগুলি মিথ্যে নয়, কিন্তু যুক্তি যে ঘটা করে দিতে হয়, তাতেই বোঝা যাচ্ছে মনের মধ্যে খেলা সম্বন্ধে বড়দের একটা খচ্‌খচি থেকে যাচ্ছে।

এতো গেলো তথ্য। মনোবিজ্ঞানীরা সবাই এ সব কথা জানেন। কিন্তু তাঁদের মন এতেই সন্তুষ্ট নয়। তত্ত্বসন্ধানী, বিজ্ঞানী মন প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা করে, কেন এমনটি হয়? কেন শিশু খেলা করে? কেন খেলাতে সে এত আনন্দ পায়? কেন খেলা এত স্বতঃস্ফূর্ত? কেন এতে কোন শিক্ষার দরকার নেই? খেলা কি নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন, না প্রকৃতির কোন গূঢ় উদ্দেশ্য এই আপাত-উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধিত হচ্ছে? এ নিয়ে পুরোনো ও নতুন কয়েকটি মত আছে।

সব চেয়ে পুরোনো মত হচ্ছে জার্মান কবি শিলারের (Schiller) যেটা পরবর্তীকালে হারবার্ট স্পেন্‌সারও (Herbert Spencer) প্রচার করেছিলেন। এ মতটা হচ্ছে যে খেলা শিশুর বাড়তি শক্তির প্রকাশ। শিশুকে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে, বা বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে শক্তি ব্যয় করতে হয় না। খাদ্য, গৃহের আশ্রয়, সেবা ও পুষ্টি সে অনায়াসে পাচ্ছে, পিতামাতা পরিবারের কাছ থেকে। তা থেকে তার শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে,—অথচ, সে শক্তি ব্যয়ের কোন প্রয়োজন নেই। তাই শক্তি বাড়্‌তি থাকছে,—তার তো প্রকাশ চাই। সেই প্রকাশ হচ্ছে খেলা।[২]

এ মতের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। কিন্তু এটা দিয়ে খেলা সম্বন্ধে সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। বাড়তি শক্তির ব্যয়ই যদি খেলার উদ্দেশ্য হয় তবে তো যে কোন ভাবে এলোমেলো কতগুলি ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তা হ'তে পারে। কিন্তু খেলা তো একেবারেই এলোমেলো ক্রিয়া নয়। খেলার যে কতকগুলি সাধারণ রূপ আছে তা কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না। আবার দেখি খেলাতে শিশুর ক্লান্তি নেই। শরীর যখন ঘামিয়ে গেছে,—দেহযন্ত্র যখন সম্পূর্ণ

২ According to this view, play is always the expression of a surplus nervous egergy. The young creature, being tended and fed by its parents, does not expend its energy upon the quest of food, in earning its daily bread and therefore, has a surplus store of energy which overflows along the most open nervous channels producing purposeless movements of the kind that are most frequent in real life. Mc Dougall—Social Psychology. P. 92.

ক্লান্ত, তখনও তো খেলায় তার মন থাকে। অবশ্যি এ কথাটা সত্য, যখন দেহ সজীব ও সতেজ, তখন খেলাটা জমে ভাল। নান্ আর একটা যুক্তি দিয়েছেন, এ মতের বিরুদ্ধে। একটা এঞ্জিন যন্ত্রের বাড়তি বাষ্পটা নানা কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু এঞ্জিন তার বাড়তি বাষ্পের শক্তিটা ব্যয় করছে নিজেকে আরও শক্তিশালী এঞ্জিন তৈরী করতে, এ রকমটা আমরা কখনও ভাবতে পারি না। কিন্তু খেলাতে তো এই হচ্ছে।[৩] খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে দেহে মনে বলশালী করে তোলে।

আর একটা মত, যেটা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে,—সে হচ্ছে কার্ল গ্রুস্ (Karl Groos) এর। এর মত প্রথম মলব্রান্স্ (Malebranche) ইঙ্গিত করেছিলেন। বর্তমান কালে গ্রুস্ 'দি প্লে অব এ্যানিম্যালস' এবং 'দি প্লে অব ম্যান' এই দুই গ্রন্থে, এ মত খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছেন। গ্রুস-এর মতে শিশুর খেলাটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি। ভবিষ্যৎ জীবনে সংগ্রামের জন্যে যে ক্রিয়াগুলি দরকার হবে, তার রিহার্সেল দিয়ে নেয় শিশু, খেলার মধ্য দিয়ে। তাই শিশুরা রান্নাবাড়া খেলে, ঘর বানানো খেলে, পুতুলের বিয়ে দেয়, কানাই মাষ্টার সেজে বেড়াল-ছানা পড়ুয়াদের তাড়না করে। পশুর মধ্যেও তাই। বেড়াল-ছানা উলের বলকে তাড়া করে, থাবা দিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করে, কুকুর-ছানা একটি আর একটির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গলা আদর করে কামড়ে ধরে, কিন্তু এ সবই করে খেলায় ছলে; বেড়াল ছানা ঠিক আঁচড়ে দেয় না, কুকুর-ছানাও ঠিক কামড়ায় না। যে প্রবৃত্তিগুলি ও ক্রিয়াগুলি পরবর্তী জীবনে প্রয়োজন হবে, খেলার মধ্য দিয়ে তাদের শান দিয়ে রাখা হচ্ছে। উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে খেলার রূপগুলি ভবিষ্যৎ জীবনের গুরু তর ক্রিয়ার পূর্বাভাস যেমন, বিড়াল ছানা যে কোন নড়ন্ত দ্রব্যকে খেলার মধ্যে তাড়া করে যায়; এতে করে সে ভবিষ্যৎ জীবনে ইঁদুর শিকারে নিপুণতা লাভ করে। তেমনি কুকুর ছানা খেলায় খেলায় লড়াই করে; ভবিষ্যতে এটা তার খুব কাজে লাগবে। খেলার মূল কথাই হোল জৈব প্রয়োজনসাধন।[৪] গ্রুস বলেন, নিম্ন ইতর প্রাণীরা জন্মের থেকেই সম্পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন, পরিপূর্ণ বিকশিত ইন্দ্রিয়াদি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতি তাদের চালাবার সম্পূর্ণ ভার নিয়েছে। তাদের কোন প্রস্তুতির দরকার নেই। অন্ধ ও অব্যর্থ সংস্কার তাদের জীবনের পথে

---

3 Nnn—Education ; Its data and First Principles, P. 70

4 Ross—Educational Psycholgy.

পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী উচ্চ স্তরের জীবের বাচ্চারা বিশেষ করে মানব শিশু, জন্মকালে অসহায়। তাদের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অপরিণত। তাদের যত্নের সঙ্গে লালন করতে হয়, শিক্ষা দিতে হয়, ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে হয়। সে প্রস্তুতি হয় অচেতনভাবে এবং অনায়াসে খেলার মধ্য দিয়ে। তাই খেলায় রুচি দেখা যায় মানব শিশুর মধ্যে ও অন্যান্য উচ্চতর জীবদের মধ্যেই। কাজেই স্পেন্সারের মত, যে বাড়তি শক্তির প্রকাশ হয়, খেলার মধ্য দিয়ে, এ কথাটি উল্টে গ্রুস বললেন, শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেই ছোটরা খেলায় মেতে ওঠে। গ্রুস কাজেই শিলার, স্পেন্সরের মত উল্টে দিয়ে বললেন, একথা ঠিক নয় যে জন্তু শাবকেরা খেলা করে যেহেতু তাদের বাড়তি স্নায়বিক শক্তি আছে; বরং আমরা একথাই বিশ্বাস করব যে উচ্চতর প্রাণীদের শৈশবের অপরিণতির জন্যই তারা খেলা করে।"[5]

অনেক দিক দিয়ে গ্রুস-এর মত সত্য বলে মনে হয়। ছেলে-মেয়েদের অনেক খেলাই যে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাষ (anticipation) তাতে সন্দেহ নেই। আর মানব শিশুর জন্মকালে অসহায়তা তার মৌলিক প্রবৃত্তি-গুলির নমনীয়তার লক্ষণ এ কথাও সত্য বলে মনে হয় এবং এই নমনীয় বৃত্তিগুলি বুদ্ধিদ্বারা যাতে উপযুক্ত ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে সে জন্যে তার দীর্ঘ বাল্যকাল আর ক্রীড়াপরায়ণতা সহায়ক, এ সিদ্ধান্ত খুব অন্যায় মনে হয় না। কিন্তু শিশুদের সব খেলা গ্রুস-এর এ মত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ষ্ট্যানলি হল্ তাই এই মতকে কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন এ মত অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, অগভীর ও বিকৃত।[৬] ম্যাক্‌ডুগ্যাল এ মতকে আর এক দিক দিয়ে সমালোচনা করেছেন। গ্রুস-এর মতে খেলাটা শিশুর একটা জন্মগত সংস্কার (instinct), কিন্তু প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে একটি বিশেষ অনুভূতি জড়িত থাকে। খেলার সাথে এমন কোন নির্দিষ্ট অনুভূতি জড়িত থাকে না। ছেলেরা বা কুকুরের বাচ্চারা যখন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলচে তখন উৎসাহ বা শারীরিক বল কিছুরই অভাব থাকে না— শুধু ঝগড়ার (pugnacity) সঙ্গে স্বাভাবিক যে অনুভূতি রাগ (Anger) তার সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্যে এ প্রস্তুতি, এ মত তো নিতান্ত 'জোলো' বা অবাস্তব। ব্রাডলে একটি প্রবন্ধে এই অসঙ্গতির যে ব্যাখ্যা

5 McDougall—Social Psychology, P. 93

7 Stanley Hall—Adolescence, P. 202.

দিয়েছেন, তা আমাদের কাছে (এবং ম্যাক্‌ডুগ্যালের কাছেও) নিতান্ত গোঁজামিল ও টেনেবুনে (farfetched) ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। ব্র্যাডলে বলেন খেলার মধ্যে শিশুদের একটা সংযম বোধ থাকে। এ সংযমই পরবর্তী কালে খেলার নিয়মের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে।"৭ অপরিণত কুকুর শাবক ও মানব শিশুর খেলার মধ্যে এতটা দার্শনিকতা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। বরং উল্টোটাই সত্যি। খেলার মস্ত আনন্দ যে তাতে পদে পদে বাধা নেই, নিষেধ নেই। শিশুরা জানে যেখানে পদে পদে বাধা, পদে পদে শাসন তাকে বড়রা বলে 'কাজ'। বড়দের খেলাও কি অনেক সময়ে কাজপালানো (escapism) মনোবৃত্তি থেকে উদ্বুদ্ধ নয়? ম্যাক্‌ডুগ্যাল খেলাকে একটা জন্মগত সংস্কার বা Instinct না বললেও এর মধ্যে দিয়ে কতকগুলি সংস্কার—যেমন, দল বাঁধার প্রবৃত্তি (Gregarious instinct), প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা, গঠন প্রবৃত্তি ইত্যাদি প্রকাশ পায় এটা স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে খেলার উপযোগিতার কথাও অস্বীকার করেন না। "খেলার যে নানা রূপ আছে তা কোন একটিমাত্র সংস্কারসম্ভূত একথা বলা যায় না। তথাপি খেলা অতি উচ্চ সামাজিক-মূল্য-সম্পন্ন জন্মগত কতগুলি প্রবণতা একথা মানতেই হবে।"৮

এবার আর একটা মত আলোচনা করা যাক। এ মত প্রবর্তন করেছেন ষ্ট্যান্‌লি হল (Stanley Hall) তাঁর মতে খেলার মূল কারণ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে নয়; মনুষ্যের ক্রমবিকাশের অতীত পর্যায়ে তার মূল খুঁজে পেতে হবে। মানব দেহ যেমন তার উদ্ভিদ, কীট, এবং ইতর প্রাণী জীবনের দীর্ঘ অতীত ইতিহাসের চিহ্ন বহন করে তেমনি তার মানসপ্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মধ্যেও রয়েছে তার অতীত মনুষ্যেতর জীবনের ছাপ। খেলার মধ্যে সেই অতীত চিন্তাভাবনা-রহিত সুখ স্বর্গের আনন্দকেই সে আবার স্বল্পকালের জন্য ভোগ করে।

'যৌবনের আনন্দিত হৃদয় যেমন করে খেলার মধ্যে নিজেকে উৎসারিত করে দেয়, এমন আর কিছুতে নয়, যেন মানুষ এতে তার হারানো স্বর্গ ফিরে পায়।"৯ শিশু খেলার মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসের বিভিন্ন সংস্কৃতির ক্রম যেন পুনরভিক্রম করে। জন্মগত সংস্কারগুলির ক্রমপরিণতির ফলে বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী নানা ক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে। খেলা হচ্ছে কতগুলি ক্রিয়ার অভ্যাস

7 F. H, Bradley—Mind, N. S. Vol. XV, P, 468.
8 Mc Dougall—Psychology, P. 91.
9 Stanley Hall—Adolescence, P, 203.

যা জাতির অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে এবং বর্তমানেও অপরিণত ইন্দ্রিয়ের মত চলে আসে।১০ ম্যাকডুগ্যাল এ মতের পক্ষে যুক্তি সামান্যই দেখতে পেয়েছেন এবং একে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। রস্ কিন্তু এ মতকে এত অশ্রদ্ধার সঙ্গে নস্যাৎ করে দেননি। প্রাচীন গুহামানবের অনেক অভ্যাস ও ক্রিয়া আমাদের বহু ব্যবহারের মধ্যে এখনও তার চিহ্ন রেখে গেছে। এটা খুব কষ্ট-কল্পনা নয়। তবে এই মত দিয়ে সমস্ত খেলাকে ব্যাখ্যা করা শক্ত।

খেলা সম্বন্ধে আর একটি মত হচ্ছে যে খেলা একটা রেচক বা জোলাপের কাজ (catharsis) করে। ভেতরের কতগুলি নিরুদ্ধ ইচ্ছা বা আবেগ, যেগুলির স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ নেই, সেগুলি খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে ভেতরের বাষ্পের চাপকে কমিয়ে দেয়। ফ্রএডপন্থীরা বলবেন এ হচ্ছে libidoর ইচ্ছাপূরণ (wish fulfilment)-এর একটা 'নির্দোষ' পথ যেটা সদাজাগ্রত সেন্সর-এর দৃষ্টি এড়িয়ে পথ খুঁজে নেয়। অনেক খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার চেতন বা অচেতন ইচ্ছা পূরণ করে, সে খেলাগুলিকে আমরা বলি 'মনে-করো মনে-করো (asif) কাজ। যেমন, যে শিশু তার বাস্তব জীবনে তার ইচ্ছানুযায়ী যথেষ্ট কেক্ পেলো না সে তার খেলার মধ্য দিয়ে অজস্র 'মনগড়া' কেক্ বিতরণ করতে ইচ্ছা করে।১১ সেই জন্যেই যখন অভিনয়ে বা ছবিতে আমরা দেখি যে একজন হাসিয়ে অভিনেতা (comedian) কাচের বাসন ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করছে, পুলিসকে ঘুষি মেরে উল্টে দিচ্ছে, মদ খেয়ে সুবেশা ও উন্নাসিকা মহিলার গায়ে চলে পড়ে তার পোষাক কর্দমাক্ত করে দিচ্ছে, আমাদের মাঝের আদিম বর্বর যে লুকিয়ে আছে, সে খুশী হয়। খেলার ছলে সেই গুহামানব প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির একটা বিকল্প পথ খুঁজে পাচ্ছে। এ মতটা তাই ষ্ট্যানলি হল এর মতের পরিপোষক। মদ-খাওয়ার সম্পর্কে অনুরূপ একটা মত প্রকাশ করেছেন ফ্রএড্, "মদের প্রভাবে বয়স্ক ব্যক্তিরা আবার বালকের মত যুক্তির চাপমুক্ত মানসিক উত্তেজনার সম্পূর্ণ অবাধ প্রকাশে আনন্দলাভ করে থাকেন।"১২ খেলার মধ্য দিয়ে শিশু-মনের অনেক বিরোধ (tension) হাল্কা হয়ে যায়,—বহু শিশুর মনঃসমীক্ষণের দ্বারা এ তথ্যটি জানা গেছে।

এ মতের মধ্যেও কিছুটা সত্য আছে তা স্বীকার করতে বাধা নেই। কিন্তু ফ্রয়েড-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা একমত নই যে শিশুর সমস্ত খেলার মধ্যেই

10 Mc Dougall—Social Psychology, P. 92

11 Gates and Jersild—Educational Psychology. P. 206

12 Quoted by W, Fielding—Self-Mastery through Psycho analysis,

রয়েছে কাম এর আবেদনজনিত মানসিক অশান্তির মুক্তি। হয়তো কোন কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত শিশুদের বেলায়, এ কথাটা সত্য হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ সুস্থ শিশুর খেলা তাদের মানসিক যন্ত্রণা বা উদ্বেগ থেকে মুক্তির পথ এ কথাটা মেনে নেওয়া শক্ত। মেলানী ক্লীন (Melanie Klein) বরং উল্টো কথা বলেন যে, যে সব ছেলেমেয়েরা মানসিক অসুস্থ (neurotic) তাদের একটা লক্ষণ যে তারা খেলা করতে পারে না বা ভালবাসে না।১৩ খেলাটা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত জীবন ধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ বলেই আমরা মনে করি।

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর কল্পনা নানাদিকে বিস্তারের পথ পায়,—এবং তার অহং বুদ্ধির পরিতৃপ্তি ঘটে, তার দেহ মন সুস্থ ও সবল হয়। যেমন কাজ, তেমনি খেলাও সম্ভবতঃ একটা জটিল প্রক্রিয়া এবং তাই একটা সহজ সূত্র দিয়ে সব খেলার একটা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। খেলার মূলে থাকে নানা প্রবৃত্তিও— যেমন থাকে কাজের বেলায়, তাই কাজ ও খেলার মধ্যে বিভেদটা খুব পাকা নয়। খেলার পেছনে যে আগ্রহ তা বিচিত্র এবং অনেক সময় তা জটিল, তাই সহজ একটিমাত্র সূত্র দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না ; এবং কাজও খেলার মধ্যে খুব পাকা বিভেদরেখা টানা চলে না।১৪

এ সম্বন্ধে উডওয়ার্থের মতটাও উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :— খেলার সংস্কার বলে' আলাদা কোন সংস্কার এ আগ্রহের ভিত্তি নয়। খেলায় আনন্দলাভের অনেকগুলি উৎসই ক্রিয়া করে। কোন কোন খেলাতে যুদ্ধের অনুকরণ আছে, তাতে যুদ্ধের কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায় যদিও তাতে সত্যিকার বিপদ থাকে না। আবার যে সব খেলায় শিকার ও পলায়নের অনুকরণ আছে তাতে প্রকৃত শিকার ও প্রকৃত বিপন্মুক্তির আনন্দের কিছু স্বাদ পাওয়া যায়। পূর্বে ছোট মেয়েদের একসঙ্গে নাচাটা খুব সুনজরে দেখা হত না; তখন 'চুমু-খাওয়া চুমু-খাওয়া খেলা'র খুব প্রচলন ছিল, সেই খেলাতে ও নাচের মধ্য দিয়ে যৌন প্রবৃত্তির কিছু পরিতৃপ্তি ঘটে। তা ছাড়া নাচের মধ্য দিয়ে পেশী সঞ্চালনের আনন্দের তৃপ্তি হয়, যেটা খুব পরিশ্রমসাধ্য খেলা ধূলায় আরো বেশী করেই হয়। বাস্তবিক পক্ষে সাধারণভাবে খেলার যে আনন্দ তার অনেকটাই হচ্ছে পেশী সঞ্চালনের আনন্দ থেকে উদ্ভূত। তা ছাড়া আনন্দের আর একটি সাধারণ সূত্র হচ্ছে সামাজিক সংযোগ, যেটা নাচ এবং অন্য প্রায় সমস্ত খেলা ধূলার মধ্যেই আমরা দেখি।

13 Melanie Klein—The Psychology of Children

14 Mc Dougall—Social Psychology. P. 96.

কিন্তু জন্মগত সমস্ত আগ্রহের মধ্যে যেটি সব চেয়ে বেশী সব খেলার মধ্যে দেখা যায়; সে হচ্ছে প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা। অধিকাংশ খেলাধূলার মধ্যেই প্রতিযোগিতার আগ্রহকে কাজে লাগান হয়। এ কথা কে অস্বীকার করে যে জয়ের আনন্দই খেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ?১৫

একেবারে শৈশবের খেলা, অনেকটা এলোমেলো এবং শিশু তখন আপন মনে আপন খুসীতেই লাফায়, ঝাঁপায়, দৌড়ায়, চীৎকার করে। তখন শিশু, দল বেঁধে খেলে না,—তখন সে অত্যন্ত স্বার্থপর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর একটু বড় হ'লে তার খেলার মধ্য দিয়ে তার নানা কল্পনা, (কতক তার উদ্ভট, কতক আদিম অতীতের স্মারক, কতক তার পরিবার প্রতিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত) রূপ পায়। অনেক সময় তার মধ্য দিয়ে তার অপূর্ণ ইচ্ছা সে পূর্ণ করে। এ সবের মধ্যে তার দেহ ও মনের শক্তির গঠনাত্মক প্রকাশ পাচ্ছে, আবার এর মধ্য দিয়েই নিজের অজ্ঞাতেই সে ভবিষ্যৎ জীবনের সংগ্রামের জন্যে তৈরী হচ্ছে। হয়তো, কখনো তার মনের জটিল সংঘাত এর মধ্য দিয়েই হাল্কা হ'য়ে যাচ্ছে। যত সে বড়ো হচ্ছে, ততো দল বেঁধে খেলায় আনন্দ তার বাড়ে। কারণ, তার বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশ, অপরের সংস্পর্শের অপেক্ষা রাখে। আর সচেতন বা অচেতনভাবে, তখন থেকে প্রতিযোগিতার ইচ্ছা, হারিয়ে দেবার ইচ্ছা, বড় হবার ইচ্ছা তাকে তাগিদ দিতে থাকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও বিপজ্জনক ক্রিয়ার দিকে। কাজেই তার খেলার রূপও ক্রমেই বদলাতে থাকে। তা ছাড়া, একেবারে শৈশবের খেলা ছাড়া, বড় শিশুদের, কিশোর ও বয়স্কদের খেলা— বড়দের দ্বারা সচেতন উদ্দেশ্য চালিত এবং বিধি নিষেধ নিয়মের দ্বারা শাসিত হ'তে থাকে। কাজেই খেলা সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত আমরা আলোচনা করেছি তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে কিন্তু কোনটিই সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ নয়। আপাত-দৃষ্টিতে এ মতগুলি পরস্পর-বিরোধী হ'লেও, হয়ত তারা বাস্তবিক পক্ষে পরস্পর পরিপূরক। রস্ বলছেন এই বিভিন্ন মতগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ নয়, সম্পূরক। "আমরা দেখিয়েছি কি উপায়ে 'খেলা অতিরিক্ত শক্তির বহির্নির্গমন' এ মতের সঙ্গে 'খেলা বিকৃত মানসিক কামনা'র রেচক এই মতের সামঞ্জস্য করা যায়। আবার এই পরবর্তী মতকে খেলা পূর্বজীবনের স্মৃতির রোমন্থন এই মতের সম্প্রসারণ এও বলা যায়, কারণ যে অসুস্থ আকাঙ্ক্ষাগুলি খেলার মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে,

15 Woodworth—Psychology, P. 555-56.

প্রাণীকে নিরাময় করে, সেগুলি হচ্ছে অচ্ছেদ্যভাবে মৌলিক সংস্কারগুলির সঙ্গে সংযুক্ত। এই মৌলিকপ্রবণতাগুলি পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। পূর্বস্মৃতির রোমন্থনমূলক খেলাগুলি এ গভীর সংস্কারের শক্তিকে নিরাপদভাবে শুধু নয় লাভজনক ভাবে ব্যবহার করে। কারণ যে আবেগগুলি নিরুদ্ধ হয়ে অসুস্থ মন সৃষ্টি করতে পারত সেগুলির বহিঃপ্রকাশ জৈব প্রয়োজন সাধনের সহায় এবং বয়স্কজীবনের জন্যে আমাদের প্রস্তুত করে এবং যখন আমরা বয়স্ক হই তখন আমাদের সুস্থ ও সভ্য রাখে।"[১৬]

শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেলা—খেলা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, খুব বেশীদিন হোল হয় নি। খেলা সম্বন্ধে প্রাচীন মনোবৃত্তি হোল খেলাটা সময় ও শক্তির অপব্যবহার,—এটা শিশুদের অবুঝ খামখেয়ালী। খেলা আর পড়া এ দুটো হচ্ছে পরস্পর বিপরীত ক্রিয়া, এ দুটোর একটার সঙ্গে আরেকটার অহি-নকুল সম্বন্ধ। যে ছেলের খেলায় মন, তার আর পড়াশুনা হ'ল না,—সে গোল্লায় গেলো। তবু ভালকথা বোকা শিশুরা তো শুনবে না,—ওরা খেলবেই। তাই শিক্ষক আর পিতামাতা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যেন এটা মেনে নেন্‌,—যে শিশু খেলবেই। তবে তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকতো যাতে খেলার সময়টা বেশী দীর্ঘ না হয়, আর পড়ার মধ্যে যাতে খেলার স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ না অনধিকার প্রবেশ করে। ফলে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের বেত্রাঘাত, গর্জন, শাসন আর শিশুর অশ্রুজল অবশ্যম্ভাবী ছিল।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল শুধু পড়া আর পড়ায় ছেলে ভোঁতা হয়ে যায়, —শুধুই পড়া আর মোটেই খেলা নয়, এতে ছেলে ভোঁতা হয় "All work and no play make Jack a dull boy"—কাজেই পরবর্তী কালে লেখাপড়ার শ্রান্তি অপনোদক হিসাবে খেলার স্থান থাকল। ইস্কুলের সাতঘণ্টা পড়ার রুটিনের মাঝে, আধ ঘণ্টার লিজার পিরিয়ড এর নিতান্ত সংকুচিত স্থান হোল। আর শিলার-স্পেন্‌সর এর মত প্রাচীন শিক্ষক ও পিতামাতারা মেনে নিলেন যে শিশুদের বাড়তি শক্তির (steam) বাষ্প ফুঁকে দেবার জন্যে, একটা দরজা খোলা রাখা মাঝে মাঝে দরকার।

ক্রমে আরও পরিবর্তন হোল দৃষ্টিভঙ্গীর। শিশু মনোবিজ্ঞানীরা দেখলেন শিশুর কাছে খেলা, খেলা নয়—এটাই তার কাছে সব চেয়ে বড় 'কাজ'। তাই ইংল্যাণ্ডে রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) প্রথম অসমসাহসিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত

16 Ross—Educational Psychology, P. 105.

হলেন। তিনি বল্লেন খেলার মধ্য দিয়েই, প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলের মধ্যেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা। বদ্ধ ঘরে, কড়া আইন করে আটকে রেখে, বই পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে, কঠিন শাসন দিয়ে শিক্ষা বহুলাংশে নিষ্ফল। সেদিন তাঁর কথায় শিক্ষকেরা চমকে উঠেছিলেন অভিভাবকেরা আঁৎকে উঠেছিলেন! ভাগ্যিস গরীব মানুষের ছেলেদের দিয়ে পরীক্ষাটা তিনি করেছিলেন! যাক্, তাঁর পরীক্ষায় ফলটা কিন্তু হোল বিস্ময়কর। 'ভালো' ডিসিপ্লিন-ওয়ালা স্কুলগুলির ছাত্রদের চেয়ে তাঁর ছেলেরা দেখা গেল, শুধু খেলা-ধূলায়ই ভাল নয়; স্বাস্থ্যে, কাজে, কুশলতায় এমন কি বুদ্ধিতেও তারা শ্রেষ্ঠ। তাঁর পরীক্ষার ফল আর তাঁর বৈপ্লবিক মতটা কিন্তু সহজে গৃহীত হয় নি—আজও না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা ক্রমেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে লাগলেন, যে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, এবং তাতে শিক্ষাটা অনেক সহজে হয়। বর্ত্তমান কালে রুশোর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ফ্রোএবল্-এর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এবং আরো স্পষ্টভাবে মন্তেসরী পদ্ধতি, শিক্ষাকে শিশুর স্বাভাবিক "ভাল-লাগা"কে কেন্দ্র করে গঠিত। মন্তেসরী বললেন, খেলাটাই শিক্ষার সব চেয়ে সহজ—সব চেয়ে কার্য্যকরী পথ। আজ এই ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি ক্রমশঃই শিক্ষাজগতে অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সুসম এবং সবল অঙ্গসঞ্চালনে দেহ সুগঠিত হয়, এটা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া চলে আর দেহ-বলে বিশ্বাসী পাশ্চাত্য জগত তাই খেলাটাকে দেহগঠনের উপায় হিসাবে সহজেই মেনে নিয়েছে। অনুভূতি, রুচি, বুদ্ধি, সমাজবোধ এ সব শিক্ষার জন্যেও খেলা বিশেষভাবে উপযোগী এ স্বীকৃতিও ক্রমেই এসেছে। তাই ইয়োরোপ আর আমেরিকায় খেলাটা আজ বিজ্ঞানীদের বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়েচে। তাই নিত্যি নূতন খেলার উদ্ভাবন হচ্ছে, পুরানো খেলার পরিবর্তন হচ্ছে,—এবং খেলাগুলিকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যমুখীন করবার চেষ্টা চলেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলা আজ একটা অবসর বিনোদনের গৌণ উপায় মাত্র নয়। আজ ক্রমশঃই চেষ্টা চলেছে খেলাকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করে,—শিশুর স্বতঃ উৎসারিত আনন্দ ও গতি চঞ্চলতাকে তার সমগ্র বিকাশের কাজে লাগাবার।

—সংযোজনা—

খেলা সম্বন্ধে বার্টরাণ্ড রাসেল্ (Bertrand Russel) এর মত—খেলা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলা ও কল্পনার স্থান নিয়ে রাসেল্ বিস্তারিত আলোচনা

করেছেন। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে তৈরী হচ্ছে, গ্রুস্‌-এর এ মত, তিনি মোটামুটি সমর্থন করেন। তবে খেলার মনস্তাত্ত্বিক কারণ হিসাবে এ মত যথেষ্ট নয়। খেলা সম্বন্ধে ফ্রএড্‌পন্থীরা একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং খেলার স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে যথারীতি যৌন-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির ইঙ্গিতই তাঁরা দেখেছেন। ফ্রএড্‌পন্থীদের এ মতকে রাসেল একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে খেলার মনস্তাত্ত্বিক মূল কাম (sex) নয়—ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। কোন কোন মনঃসমীক্ষণবাদীরা শিশুদের খেলায় যৌন প্রতীকের সন্ধান পেয়েছেন। "আমার এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ মত সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কাল্পনিক। বাল্যকালে খেলার পেছনের প্রধান আগ্রহ কাম নয় বয়স্ক হবার আকাঙ্ক্ষা অথবা আরো ঠিক করে বললে, ক্ষমতা আহরণের আকাঙ্ক্ষা।"[17] ছোট শিশু সর্বদা চায় বড় হ'তে। সে স্বপ্ন দেখে "বাবার মত বড়" হবার। বড়দের স্বাধীনতা আছে যা ইচ্ছে তাই করবার। তাই সে বড়দের অনুকরণ করে। আর যেখানে তা সে পারে না, সেখানে সে স্বপ্ন দেখে, প্রকাণ্ড বড় হবার—রাক্ষস হবার, রেলগাড়ীর ইঞ্জিন হবার, বাঘ, সিংহ এ রকম দুর্দান্ত বলশালী প্রাণী হবার। রাসেল-এর দৃঢ় মত যে কল্পনা যেখানে শিশুর আত্ম-প্রকাশের সহায়ক, তার আত্মবিশ্বাসের পোষাক সেখানে তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনার স্থানকে মন্তেসরী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছেন, রাসেলের মতে, এটা জবরদস্তি ও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে হানিকর। কল্পনাকে সচেতনভাবে গণ্ডী বেঁধে দিয়ে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে, কাজেই খেলাও সর্বদা সচেষ্ট উদ্দেশ্যমুখী হবে, এটা রাসেল-এর মত নয়। খেলার মধ্যে যে কল্পনার মুক্তি আছে—ভাণ (pretence) আছে, তাতেই খেলার অনেকখানি আনন্দ ও উত্তেজনা। শিশু যখনই বুঝবে খেলাটা বাস্তবিক পক্ষে তাকে শিক্ষা দেবার একটা কৌশল, তখনই খেলার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তা অন্তর্হিত হবে এবং তখন সে তার শক্তিও হারাবে।

স্বপ্ন ও কল্পনামাত্রই অলস সময়ক্ষেপ, এ মত ঠিক নয়। শুধু তথ্য আহরণই শিক্ষা,—শুধু মাত্র বাস্তব ঘটনাই (facts) সত্যের মর্যাদালাভের অধিকারী, শিশুর মনকে তাই সযত্নে কল্পনাবিমুখ করে তুলতে হবে, কোন কোন আধুনিক বাস্তব-পন্থীদের এ উগ্র মত রাসেল অশ্রদ্ধেয় বলে বিবেচনা করেছেন। প্রত্যক্ষ বাস্তব

17 Bertrand Russell— On Education, P, 98,

ঘটনা আর সত্য এক জিনিষ একথা মনে করা বিপজ্জনক ভ্রম। আমাদের জীবন শাসিত হয় শুধু বাস্তব ঘটনা দ্বারা নয়, আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। যে সত্যনিষ্ঠা বাস্তব ঘটনা ভিন্ন অন্য কোথায়ও সত্যকে দেখে না সে তো মানবাত্মার পক্ষে কারাবাস। স্বপ্ন তখনই দোষনীয় যখন তা বাস্তবকে পরিবর্ত্তনের চেষ্টার বিকল্প মাত্র; কিন্তু যখন স্বপ্ন বাস্তবকে পরিবর্ত্তন করবার আগ্রহেয় সহায়ক তখন তা মানুষের আদর্শকে রূপায়ণের অত্যন্ত জীবন্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করছে। শিশুকালে কল্পনাকে হত্যা করা মানে শিশুকে বাস্তবের ক্রীতদাস করা, স্বর্গ-সৃষ্টির শক্তি বিহীন, পৃথিবীর মাটিতে আবদ্ধ হীন প্রাণীতে পরিণত করা।[১৮]

18 Bertrand Russel—On Education, P. 101-102,

উনবিংশ অধ্যায়

শৃংখলা ও শাসন—Discipline

রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পূর্বে আমাদের দেশের ইস্কুলগুলিকেই লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন, "ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কলের একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে।"

এত বছর পরেও এ শিক্ষা-পদ্ধতির, শিক্ষা সম্বন্ধে এ দৃষ্টিভঙ্গীর খুব বেশী পরিবর্তন আমাদের দেশে ঘটেনি। আজও আমাদের দেশে পাঠশালা বা ইস্কুলে মাষ্টারমশায়ই প্রধান অংশ। শিশুদের কলকাকলী ছাপিয়ে, শোনা যায় তাঁর সগর্জন বিদ্যা বিতরণ, আর উদ্যত বেত্র শাসনের ভীতিপ্রদ আস্ফালন। শিক্ষাগৃহের তিনিই কেন্দ্র,—কাদার তাল শিশুদের নিজ আদর্শ আর সাধ্যমত গড়ে পিটে তোলাই হচ্ছে তাঁর কাজ। ছাত্ররা এখানে গৌণ,—তারা যন্ত্রমাত্র। স্বভাবতঃ তারা অসভ্য, ফাঁকিবাজ, শয়তান, তাদের ধরে বেঁধে শায়েস্তা করে, বিদ্যার অমৃত-রস এই শূন্যগর্ভ পাত্রগুলোতে কিছুটা ঢেলে দিয়ে তাদের "মানুষ" করে তোলার মস্ত ভার রয়েছে মাষ্টার মশাইর ওপরে।

আমাদের দেশে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা আজও অনড় হয়ে আছে,—কিন্তু পৃথিবী এগিয়ে গেছে বহুদূরে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সভ্য ও অগ্রসর দেশে এসেছে নবযুগ—শিশুর শৃংখল-মুক্তির যুগ। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুই কেন্দ্র। তার ব্যক্তিত্ব আছে, মর্যাদা আছে, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আছে, গতি-চঞ্চল প্রাণধর্মে সে উচ্ছল; তার স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকেই স্বীকার করে, শিক্ষার সমস্ত আয়োজন করতে হবে,—এই হোল নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল কথা। যেদিন মনস্তত্ত্বে, বিশেষ শিশু-মনস্তত্ত্বে, মানুষের জ্ঞান ছিল সামান্য, সেদিন শিক্ষকের গর্ব ছিল "গাধা পিটিয়ে মানুষ তৈরী" করার দায়িত্ব তাঁর। আজ বিজ্ঞানের শিক্ষা তাঁকে বিনয়ী করেছে। তিনি জেনেছেন শিক্ষকের কর্তব্য আজ শিশুকে "মানুষ" হয়ে উঠতে সাহায্য করা, অন্ততঃ তাতে বাধা না দেওয়া।

যা শিশুকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে বাধা দেয়, তা শৃংখল। কিন্তু, যা স্বাভাবিকভাবে শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তিগুলোকে সদভ্যাসে পরিণত করে, তাকে সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন সুসমঞ্জস মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে, সে বিধি-নিয়ম পদ্ধতিকে বলি শৃংখলা।

শিক্ষার নূতন আদর্শ যাই হোক্, শৃংখল চাই না ; কিন্তু শৃংখলা চাই। যে শক্তি অনিয়ন্ত্রিত তা অকার্যকরী, তা হানিকর,—তাতে আছে অপচয়, তা আনে বিষম ক্ষতি। কিন্তু যে শক্তি শুভবুদ্ধি এবং সৎপ্রচেষ্টা দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, তা কল্যাণ-ফলপ্রসূ। আগুন যতক্ষণ উনুনের সীমা মানে ততক্ষণ সে কল্যাণীয়া বধূর গৃহকর্মের পরম সহায়। কিন্তু সে আগুন যদি ছাড়া পায়, তবে সে ঘর পোড়ায়, গ্রাম ছারখার করে, নিয়ে আসে সে অসংখ্য মানুষের দুঃখ, দৈন্য, সর্বনাশ।

শিশু দেবকুমার নয়। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা এ কথা বলে না যে শিশুদের বাধাবন্ধহীন 'স্বাধীনতা'র মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। তার সুনিয়ন্ত্রণ চাই। তাই তো আছেন শিক্ষক, তাঁর সদাজাগ্রত মমতাপূর্ণ দৃষ্টি মেলে। শিশু অসংখ্য অনিয়ন্ত্রিত সৎ, অসৎ শক্তি ও প্রবৃত্তির সমষ্টি। সে শক্তিগুলির বিকাশ যেমন চাই, সমন্বয়ও চাই, অহং-বোধের সঙ্গে যুক্ত করে, শিশুকে প্রকৃত স্বভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে। এরই নাম শৃংখলা ও শাসন। এর স্থান না থাকলে বিদ্যালয় হোত উন্মাদাগার। পিতামাতার হাতে ও শিক্ষকের হাতে থাকবে এ সুনিয়ন্ত্রণের শক্তি। হিউজেস এ্যাণ্ড হিউজেস "লারনিং এ্যাণ্ড টিচিং" বইতে লিখেছেন, "শিশু নীতিপরায়ণও নয় দুর্নীতিপরায়ণও নয় ; সে হচ্ছে কতগুলি অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির দাস।" কাজেই দায়িত্ব অভিভাবকের ও শিক্ষকের, শিশুর প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিমার্জনা করবার। পেণ্টন বলছেন, "এতে স্পষ্টতঃই পিতামাতা এবং শিক্ষকের উপর অনেকখানি দায়িত্ব এনে দেয় শিশুর অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষাগুলি শাসন করবার কাজে।" এরই নাম চরিত্র গঠন। শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তি এমনি করেই সুনিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন করতে হবে যাতে সে অভ্যস্ত হবে নিজ কল্যাণ ও সামাজিক মঙ্গলকে এক করে দেখতে, যাতে শুভবুদ্ধি দ্বারা চালিত কর্ম, তার কাছে হবে স্বাভাবিক। স্যার টি. পি নান্ লিখছেন, ভবিষ্যতে আত্মশাসনের যে দাবী সে স্বভাবত করবে এবং যে দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে সেটা জন্মকালেই শিশুকে দেওয়া চলে না। পরিবার, বিদ্যালয় ইত্যাদি সংস্থার অস্তিত্বে এটাই সুচিত হয় যে পিতামাতা

ও শিক্ষকের যৌথ দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্বের অংশ শিশুর বাল্যকালে প্রায় সবটাই পিতামাতা ও শিক্ষকের উপর, কিন্তু শিশুর ব্যক্তিত্বের রূপটা যতই সুগঠিত হয় ততই ক্রমে ক্রমে এ দায়িত্ব কমতে থাকে।

কোন কিছু সংগঠন করতে গেলে,—দশজনকে নিয়ে কোন কাজ গড়ে তুলতে গেলে, যার কাছে থাকবে দায়িত্ব তার কাছে উপযুক্ত ক্ষমতাও থাকা চাই। সে ক্ষমতার ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুশৃংখলা। বিদ্যালয়ের মধ্যে সে ক্ষমতা দেওয়া আছে শিক্ষকের হাতে। তার নিয়ন্ত্রণ সফল হতে গেলে চাই তাঁর অধীন ছাত্রদের বাধ্যতা। সে বাধ্যতা কখনো কখনো প্রীতিপ্রদ না হ'তে পারে তবু ছাত্রের এ বোধ ও শিক্ষা জাগ্রত করা চাই,—তার নিজের ও বিদ্যালয়ের কল্যাণের জন্যে শিক্ষকের আদেশ বা বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্যে যে বিধি ও নিষেধ রয়েচে তা মানতে হবে। এ শিক্ষা ও শাসনের নাম ডিসিপ্লিন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যা disciple বা ছাত্রের অবশ্য করণীয়, যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রের চরিত্র গঠিত ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব এডুকেশন' ডিসিপ্লিন কথার বিবরণ দিয়েছে এই ভাবে: 'ব্যাপক অর্থে ডিসিপ্লিন মানে সমগ্র উপদেশ ও শিক্ষার সমষ্টি যা ছাত্রদের গ্রহণ করতে হয় কাজেই এ অর্থে ডিসিপ্লিন কথা 'ট্রেনিং' এবং 'এডুকেশন' কথার সমার্থবাচক। সংকীর্ণ-অর্থে ডিসিপ্লিন কথার সঙ্গে শাসনের মর্য্যাদা রক্ষার কথা জড়িত। নির্দিষ্ট বিধি নিয়ম, শাস্তি ও পুরস্কার সমন্বিত বিদ্যালয় পরিচালন পদ্ধতি সুশৃংখল শিক্ষার অঙ্গ, কাজেই ইহা বুদ্ধির বিকাশ ও পরিমার্জনার উদ্দেশ্য সাধক। আবার ইহাও স্পষ্ট যে আজ্ঞা, শাসন ইত্যাদি শিশুর ইচ্ছার মধ্য দিয়াই কাজ করে। কাজেই ডিসিপ্লিন কথার সঙ্গে ছাত্রের ইচ্ছা ও চরিত্র পরিচালন ও গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একেই অবশ্য আমরা নীতি শিক্ষা বলে থাকি।'

ডিসিপ্লিন কথার সংজ্ঞা স্যর টি পি নান্ দিয়েছেন আরো সংক্ষেপে। অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃংখল শক্তি ও আকাঙ্ক্ষাকে শাসন ও পরিচালনাধীনে আনা ডিসিপ্লিনের কাজ, এতে যে শক্তি অনির্দিষ্ট ও শৃংখলাহীন তা সুনির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্য-মুখী হয়। যেখানে শক্তির অপব্যয় ও অকার্য্যকারিতা ছিল সেখানে আসে মিতব্যয়িতা ও দক্ষতা। আমাদের স্বভাবের কিছু অংশ শাসনের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করতে উদ্যত হতে পারে কিন্তু মোটের উপর এই শাসন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার মনোবৃত্তি আসা প্রয়োজন। কারণ আমাদের স্বভাবের মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দগতি আছে নিজকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলবার দিকে।

ডিসিপ্লিনের সংজ্ঞা থেকেই এটা বোঝা যায় যে তার দুটো দিক আছে—একটা নেতিবাচক আর একটা ইতিবাচক, একটা বহিরঙ্গ আর একটা তার অন্তরঙ্গ রূপ। যম ও নিয়ম এই হচ্ছে ধর্মপথের গোড়া,—"এটা কোরনা,—এটা কর।" এই শাসন, শিশুর প্রথম বাড়তির অবস্থায় আসে বাইরের থেকে। শিশুর বুদ্ধি অপরিণত—সে অপরিণামদর্শী। নিজের কল্যাণ বুঝবার, শুভের পথে চলবার মত জাগ্রত বুদ্ধি তার তো থাকে না। সে বিনা দ্বিধায় আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে,—সে জানে না আগুনে হাত পোড়ে। তাই এই নির্বোধকে রক্ষা করতে হলে পিতামাতা শিক্ষককে আপাতকঠোর হ'য়ে বলতে হয়—"এটা কোরনা।" শিশুর প্রবৃত্তি বলে "চাই," সে আপন-পর বোঝে না—বরং আরো সত্য করে বলা চলে, সে 'আপন' টাই বোঝে—তাই পরেরটা কাড়তে তার লজ্জা নেই। কিন্তু বাঁচতে হবে তাকে এ পৃথিবীতে, যেখানে আপন পরের সীমাটা তীক্ষ্ণভাবে কাটা আছে, সমাজের গায়ে। তাকে এ ভেদ রেখাটা শেখাতে হবে শাসন করেই, প্রথম অবস্থায়; তাকে ভবিষ্যতে নানা দুঃখ দুর্গতি থেকে বাঁচাতে হলে,—আর সমাজের শৃংখলা রাখতে হ'লেও। এখানে শাসনের পশ্চাতে আছে ভয়ের উদ্রেক। এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কিন্তু মৌলিক প্রবৃত্তি। মন যখন পর্যন্ত অপরিণত, ততক্ষণ এই বহিরঙ্গ শাসনের প্রয়োজন আছে। এ শিক্ষা কঠিন শিক্ষা, কিন্তু কার্যকরী,—যে শিশুর হাত পুড়েছে সে আগুনকে ডরায়, কিন্তু শাসনের একটা উচ্চতর স্তর আছে। সে শাসন আত্ম-শাসন,—তা আসবে শিশু যদি সুশিক্ষা পায়, যদি তার চরিত্র গঠিত হয় তার থেকে। তার পরিণত বুদ্ধি তাকে পরিণাম চিন্তা করতে বাধ্য করবে, তার ছাত্র-জীবনের বহু-আচরিত, কষ্টার্জিত সু-অভ্যাস তাকে রক্ষা করবে—অসামাজিক অন্যায় ও বিধিবহির্ভূত কর্ম থেকে। এখানে শাসনের মূল প্রেরণা ভয় নয়, জাগ্রত শুভবুদ্ধি, অত্যন্ত আত্মশাসন। কাণ্ট (Kant) একে বলেছেন ইচ্ছার স্বায়ত্তশাসন (Autonomy of the will)। সেই সুশিক্ষিত, যার কাছে শাসন পীড়াদায়ক নয়,—যার কাছে এই সুশংখল, সংযত কর্মচেষ্টা—সহজ, স্বভাবজ। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে ছাত্রকে এমনি ভাবে বিকশিত করে তোলা যাতে শুভকর্মের পথেই সে আনন্দ পায়,—সে পথ তার কাছে অভ্যস্ত স্বভাবের পথ হয়। এ নৈতিক প্রেরণা যদি তার কাছে সহজ হয় তখন সমাজের বিধি-নিষেধ তার কাছে পীড়ন মনে হবে না। সমাজের জীবনের, সমাজের উদ্যমের, সমাজের শৃংখলার মধ্যে সে আপনার জীবন ও উদ্যমও যুক্ত করবে, কারণ সে

বিশ্বাস করবে,—ব্যক্তির স্বার্থ ও কল্যাণ সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের বিরোধী হ'তে পারে না। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে এমনই শিক্ষা দেওয়া। রাইবার্ণ (Ryburn) এই দ্বিতীয় রকমের ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে লিখেছেন এ হচ্ছে তেমন ডিসিপ্লিন বা আত্মসংযম ও সহযোগিতার সদভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে তুলবার ফল; ছাত্র এ শাসন স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয় ও আজ্ঞা পালন করে, এটা তার উপর বাইরের থেকে চাপানো হয়েছে বলে নয়, এটা প্রয়োজন ও মূল্যবান্ এ বোধ থেকে। বলাই বাহুল্য এ জাতীয় ডিসিপ্লিনই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সংযম—শিক্ষা চরিত্র গঠনের প্রথম সোপান। শিশুর প্রবৃত্তি অন্ধ ও প্রবল,—তার মূলোচ্ছেদ করাই দরকার,—এটা সুপরামর্শ নয়। প্রবৃত্তি স্বভাবের অঙ্গ, তাকে অস্বীকার করলে চলবে না। তারও স্থান আছে জীবনে। কিন্তু তার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে,—তাকে কল্যাণাভিমুখী করতে হবে,—কোন কোন ক্ষেত্রে তার দমনও চাই। এ শিক্ষা শিশুকে দিতে হবে বন্ধুভাবে। যেখানে ছাত্রের সাথে শিক্ষকের প্রাণের সম্বন্ধ আছে, সেখানে এ শিক্ষা দেওয়া কঠিন নয়। শিক্ষক পথ দেখাবেন। প্রবৃত্তি যাতে ঠিক গতি নেয়, সে দিকে সস্নেহ কিন্তু দৃঢ় শাসন রাখবেন। ছাত্রকে জীবনের সংকটকাল উত্তীর্ণ হতে হবে নিজ চরিত্রের বলে.—তার নিজকর্মের ফল বহন করবার সাহস ও ধৈর্য্য অর্জন করতে হবে। শিক্ষক তার সামনে হবেন জ্বলন্ত আদর্শ, বিপদের দিনে বন্ধু, অন্ধকারে পথ প্রদর্শক। তার স্খলন, পতন, প্রলোভন জয় করতেই তাকে শিক্ষা দিতে হবে। তাকে সমস্ত আঘাত, সমস্ত পরীক্ষার থেকে আবরণ করে সমস্ত দুঃখ থেকে বাঁচাতে যে পিতামাতা বা শিক্ষক চেষ্টা করেন—তাঁরা স্নেহান্ধ—তাঁদের এ দয়া বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। শিক্ষার উদ্দেশ্য সোক্রেটিস বলেছেন "স্কন্ধে বহন নয়, পরিচালন।" দুঃখ, বেদনা, আঘাতের মধ্য দিয়েই তো মানুষ হবার সাধনা। তাই শিশুর প্রার্থনা হবে,

"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

মিস হপকিন্‌সন লিখছেন, "আমরা যেন আমাদের সন্তানদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস অর্জন করতে পারি—আমরা যেন হই তাদের বন্ধু যার কাছে যখনই প্রয়োজন তখনই যেন তারা আবেদন জানাতে পারে। তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা শান্ত ও সহানুভূতিপূর্ণ মন নিয়ে উপদেশ ও সাহায্যের জন্য যেন সদাপ্রস্তুত থাকি। তাদের বাল্যকালে, বিশেষভাবে আমরা যেন তাদের যথেষ্ট দরদ অথচ

দৃঢ়ভাবে পরিচালনা করতে পারি এবং সেই শাসনের সঙ্গে যেন থাকে স্নেহ বিশ্বাস ও আনন্দের কোমল পরশ।”

মিলার্ড বিদ্যালয়ে শাসন সম্বন্ধে প্রাচীন নির্মম ও কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী এবং অতি আধুনিক শিক্ষকের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বত্যাগ এই দুই আদর্শকেই আলোচনা করে সুসাশনের কয়েকটি মূলনীতির উল্লেখ করেছেন। (১) দল বা শ্রেণীর নৈতিক সমর্থন লাভ করতে হবে (২) ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হবে এবং তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৈহিকপীড়ন নিষ্প্রয়োজন (৪) স্কুলের কাজ শাস্তি হিসাবে চাপিয়ে দিলে শৃংখলা রক্ষার সহায়তা হয় না (৫) প্রত্যেক শিশুর পরিবেশ ও ইতিহাস যত্নের সঙ্গে জেনে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে (৬) যেখানেই শিক্ষকের জ্ঞানের অভাব আছে তা অসঙ্কোচ স্বীকার করতে হবে (৭) গঠনাত্মক পদ্ধতি অধিকতর কার্যকরী (৮) কোন সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা অনুচিত (৯) ছাত্র ও সহকর্মী বা বিশেষজ্ঞের সাহায্য যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মানুষের ধর্মবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি অন্যান্য ধারণার মত শাসন ও শৃংখলা বোধের ধারণারও একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বলাই বাহুল্য, যে প্রাচীন শৃংখলা ও শাসনের ধারণাটা ছিল স্থূল এবং শিক্ষার সঙ্গে বেত্রাঘাতের একটা অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধই প্রাচীনেরা কল্পনা করতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বেত ছাড়লেই ছেলের মাথা খাওয়া হয় এটাই বোধ হয় প্রাচীনতম রীতি। প্রাচীনেরা ভাবতেন মানুষের রোগ হয়, কোন দুষ্ট শক্তির ক্রিয়ার ফলে, রক্ত দূষিত হয় বলে। তাই রোগের চিকিৎসা ছিল রক্তমোক্ষণ। গায়ে জোঁক লাগিয়ে খারাপ রক্ত (bad blood) নিষ্কাশন করা বৈদ্যের কর্তব্য। তেমনি “দুষ্ট সরস্বতী” শিশুর কাঁধে ভর করে বলে, তারা অবাধ্য হয়, অমনযোগী হয়, বিদ্যালয়ের শৃংখলা নষ্ট করে। কাজেই এ রোগেরও রক্তমোক্ষণকারী চিকিৎসা হচ্ছে, প্রচুর বেত্রাঘাত। এতেই শিশুর কল্যাণ। ল্যাটিন ভাষা অনুযায়ী এই চিকিৎসার মনোবৃত্তিকে নাম দেওয়া হয়েচে—ক্লেবোটিজম্! এ মনোবৃত্তি আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি, আমাদের দেশে তো নয়ই,—বিলেতে পাব্লিক স্কুলে আজও সালেম হাউসের মিঃ ক্রীকৃলএর প্রেতাত্মা শিশুমনে বিভীষিকা জাগায়।

কিন্তু এ ধারণার পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটেচে। বেত্রাঘাত বা কঠিন

পীড়নের চেয়েও, শিক্ষকের চরিত্রের নৈতিক প্রভাব শিশুর মনের উপর অনেক বেশী ; বহু আদর্শ-চরিত্র শিক্ষকের জীবন, এ সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। শোনা যায়, বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্রেরা মিথ্যা কথা বলত না, কারণ তাদের সামনে জলন্ত আদর্শ ছিল, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের জীবন। এ রকম বহু পূতচরিত্র শিক্ষক ও শিক্ষিকার নাম করা যেতে পারে। বিগত শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এ রকম একজন দেব-চরিত্র মনীষীর নাম খ্যাত হয়ে আছে। তাঁর নাম ডাঃ টমাস আরণল্ড্। প্রসিদ্ধ পাব্লিক স্কুল রাগবির তিনি প্রধান শিক্ষক পদে বৃত হ'ন ১৮২৮ সালে। তিনি ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি এ কথা জেনেছিলেন, ধর্মকে জীবনে রূপায়িত করতে হবে, যদি শিক্ষক সত্যই গুরুর আসন গ্রহণ করতে চান। "আপনি আচরি ধর্ম, শিখাও অপরে" এ কথা তিনি মানতেন, এবং তাঁর চরিত্রগুণ, দৃঢ় শৃংখলাবোধ, অবিচলিত কর্তব্যনিষ্ঠা, সেকালে রাগবি স্কুলের ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি সত্যাশ্রয়ী ছিলেন এবং ছাত্রদের সহায়তায়ও তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর নিজ মহত্ব ও অকুণ্ঠ বিশ্বাস দিয়ে তিনি ছাত্রদের সততার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে 'এন্‌সাইক্লোপিডীয়া অব এডুকেশন' লিখছে, "তিনি খৃষ্টান ধর্মের মূলনীতিতে সত্যই আস্থাবান ছিলেন এবং এই ঘটনাটিই তাঁর অধীন ছাত্রদের উপর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। ছাত্ররা তাঁকে যেমন ভালবাসতো তেমনি ভয়ও করতো এবং তার কারণ ছিল তাঁর অন্তরের প্রীতিপূর্ণতা, ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্ব ও তাঁর নিজস্ব চরিত্রগত সরলতা ও নির্মলতা। তিনি ছাত্রদের কি ভাবে সত্যবাদিতা শিক্ষা দিতেন, তা থেকেই তাঁর পদ্ধতিটি বোঝা যাবে। কোন ছাত্রকে তার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, সে সম্বন্ধে উত্তর দেওয়ার সঙ্গে যদি সে তার নিজ ব্যবহারের সপক্ষে আরো কিছু বলতে চাইতো, তা হলে আর্ণল্ড তাকে তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিয়ে বলতেন 'তুমি যখন বলছ তখন তাই যথেষ্ট। অবশ্যই আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। এর থেকে সেই স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে এ অনুভূতিটি গড়ে উঠল যে প্রধান শিক্ষকের কাছে মিথ্যা বলা নিতান্ত ইতর অপরাধ এবং এ থেকে ছাত্রদের সত্যবাদিতা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।" কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গ যারা করেছে তাদের তিনি ক্ষমা করতেন না, কঠোর হয়ে শাস্তিবিধান করতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। একবার মিথ্যাচার ও শৃংখলাভঙ্গের গুরুতর অপরাধে কয়েকটি

ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেন। এ নিয়ে আন্দোলন হয় তখন তিনি বলেছিলেন, "এটা প্রয়োজন নয় যে এই বিদ্যালয়ে তিনশত, বা একশত, এমনকি পঞ্চাশটি মাত্র ছাত্র থাকবে। কিন্তু এটা প্রয়োজন যে এটা হবে খৃষ্টান ভদ্রব্যক্তিদের বিদ্যালয়।"

শিক্ষকের চরিত্র ও নৈতিক প্রভাবই বিদ্যালয়ে শৃংখলা ও শাসনের প্রকৃত ভিত্তি এ সত্য অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে বৃহৎ আদর্শ সঞ্চারিত করতে গেলে সেটা কেবলমাত্র অনুকরণের দ্বারা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছাত্রের নিজের মনের মধ্যে মর্য্যাদাবোধ ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রস্ফুটিত না হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শৃংখলা ও শাসন বাইরের ব্যাপার হয়ে থাকবে। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রভাবে ছাত্রেরা গোলমাল করে না, সে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শৃংখলাবোধ সার্থক, এ কথা সব সময় ঠিক নয়। প্রধান কথা, ছাত্রদের জীবনে এ শৃংখলাবোধ স্বভাবজ হয়ে উঠেছে কিনা। তাই আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাব্রতীরা বলেন, শিশুর দেহের ও মনের শৃংখল মোচন না করলে শৃংখলাবোধ তার নিজস্ব স্বভাব হ'য়ে উঠতে পারে না। এটা ভেতর থেকে গড়ে তুলতে হবে প্রকৃতির মুক্ত আলো বাতাসের মধ্যে, শিশুর দেহ-মনকে সহজভাবে গড়ে উঠবার অবকাশ দিতে হবে। শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন, শিশুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধ,বিশ্বাস-পরায়ণতা শৃংখলায় আনন্দ, সহযোগিতা ও উৎসাহপূর্ণ আনন্দময় কর্ম ও জ্ঞানস্পৃহা যেন বিকৃত না হয়। সে যেন প্রকৃতভাবেই স্বকীয় সত্তায় বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। শিশুদের চাপল্যকে স্তব্ধ করার মানেই হচ্ছে, প্রাণশক্তির মর্মমূলে আঘাত করা। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা-সংস্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন, "ছেলেদের মধ্যে ছেলে-মানুষীর চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর, তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে। তাহারা জানে, এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া, যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায়, তবে ইহাই একদিন চরিত্র ও বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতা সৃষ্টির প্রধান উপায়।" আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে, শৃংখলা ও শাসন এই নূতন ধারণা নিয়েই সার্থক পরীক্ষা চলছে। শিক্ষক এখানে শিশুর সঙ্গী, বন্ধু,—তিনি শিশুকে বাধা দিয়ে রুদ্ধ করবেন না। বুদ্ধি ও মমতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করবেন। শৃংখলা রক্ষার কাজ, ছাত্রেরাই শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে, নিজের থেকে করবে। শিশুকে স্বাধীনতার মর্য্যাদা দিয়ে সুশৃংখল হবার অবকাশ দেওয়া হবে। তবে শিক্ষকের হাতে রইল, শেষ মীমাংসার ক্ষমতা। নিষ্প্রয়োজনে তা তিনি ব্যবহার করবেন না, এই হোল

কিণ্ডারগার্টেন্ মণ্টেসরী আর বর্তমান নার্সারী স্কুলগুলোর শৃংখলা ও শাসন সম্বন্ধে মূল নীতি।

বিধিনিষেধ—বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গেলে বিধিনিষেধ চাই-ই। সুশৃংখল কাজ করতে গেলে কতগুলো নিয়ম থাকবেই,—এবং সেটা সকলকে মানতে হবে। যেখানে বিধি নিষেধ নেই—যেখানে আছে শুধু কর্তৃপক্ষের খেয়াল-খুসী, সেখানে শৃংখলা রক্ষিতই হ'তে পারে না। বিদ্যালয় একটা প্রতিষ্ঠান,—একটা সংস্থা (organisation) যেখানে প্রত্যেকের থাকবে একটা নির্দ্দিষ্ট কর্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকার,—সকলেই সে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। যেখানে প্রধান শিক্ষক মশাই, সাড়ে দশটায় হাজিরাটার নিয়ম নিজের বেলায় ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করবেন,—তিনি স্বভাবতঃই আশা করতে পারেন না, যে অন্যান্য শিক্ষকেরা বা ছাত্রেরা সময় মত কাজে হাজির হবে। বিধি-নিষেধ-গুলো নিতান্তই পীড়নের উদ্দেশ্যে নয়, সর্বজনহিতায়। 'প্রতিষ্ঠানের কাজ সুশৃংখলভাবে চলার জন্যে এগুলো অবশ্য পালনীয়'—এ বোধ ও দৃঢ় বিশ্বাস ছাত্র ও শিক্ষক সবার মনে যদি থাকে তাহলেই শৃংখলা রক্ষা সহজ হয়। বিধিনিষেধ সেখানে পীড়া দেয় না,—শৃংখল হয়ে বাজে না,—মনকে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী ক'রে তোলে না। তাই বিধি-নিষেধ স্থির করতে স্বচ্ছ বিচার-বুদ্ধি চাই। সকলের সহযোগিতা পেতে গেলে,—এ ভাবটি থাকা চাই, যে এগুলি উপর-থেকে-চাপানো হুকুম নয়। তাই যথাসম্ভব শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা ও পরামর্শ করে নিয়মকানুন রচনা করলে সফলতার আশা থাকে বেশী। একে এ্যাণ্ডারসন্ বলেছেন সহযোগিতা ও রচনাত্মক শাসন (integrative dicipl-ine)। বিধি-নিষেধগুলো যেন স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়। নিয়মের অস্পষ্টতা ভুল ধারণা (confusion) সৃষ্টির সহায়ক,—এবং একই নিয়ম স্পষ্টতার অভাবে, বিভিন্নজনে যদি বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে' সে ভাবে চলতে চায়, তা হ'লে বিশৃংখলা ঘটা স্বাভাবিক। নিয়মের মর্যাদা যেন রক্ষিত হয়,—যেন সেটা "পোষাকী" আইন না হয়,—শুধু কাগজ কলমেই আছে এমন না হয়। তা হ'লে তা ব্যর্থ। বিধি-নিষেধ কাজে লাগাবার জন্যেই, আলমারীতে সাজিয়ে রাখবার জন্যে নয়। যে আইন সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় না, যার ব্যতিক্রম কর্তৃপক্ষ নীরবে সহ্য করেন, হঠাৎ সজাগ হ'য়ে সে আইন খাটাতে গেলে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ অনিবার্য। এই বিধি-নিষেধ যেন বাহুল্য-দোষ মুক্ত হয়। যতটুকু না হলেই চলে না—তেমন কম হওয়াই ভাল। মেলাই আইন-কানুন শৃংখলা

রক্ষার সহায়ক নয়,—সেখানে ভুল ধারণার সম্ভাবনা থাকে ;—এরকম ধারণা জন্মাতে সাহায্য করে, যে গুলি বাড়াবাড়ি, নিষ্প্রয়োজন। তাতে শাসনের মর্যাদা থাকে না। নিয়মগুলো খুঁটি-নাটি না হয়ে সাধারণ ও মূল উদ্দেশ্যের উপযোগী হওয়া চাই। সেগুলি নেতিবাচক না হ'য়ে,—ইতিবাচক হওয়াই বিধেয়। নিষেধের মধ্যেই যেন একটা বিদ্রোহের আহ্বান (challenge) রয়েছে। "কোরনা" বল্লেই শিশুর মন ঘাড় বাঁকিয়ে বলে "কোরবো তো—' একশোবার 'কোরবো।' জীবনের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে,—অবারিত প্রবহমান হওয়া, অতিরিক্ত নিষেধ দিয়ে তাকে বাধাগ্রস্ত করলে বাড়ন্ত মন অনেক সময় পঙ্গু হয় বা বিকৃত হয়।

রেমেণ্ট 'তাঁর দি প্রিন্সপিল্‌স্‌ অব এডুকেশন' গ্রন্থে বলেছেন, আজ্ঞা-জ্ঞাপক বাক্য হিসাবে, কোরনা'র চেয়ে 'করো' অনেক ভালো, বিশেষ করে নিষেধ যদি হয় এমন কোন ক্রিয়া সম্বন্ধে. যেটা ছাত্রেরা হয়তো করবার কথা ভাবছেই না। বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানী এক লোকের সামনে পিছনে বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে গোড়াতেই বলে "আমার পেছন দিকে তাকিও না"। এরা মানবপ্রকৃতি ঠিক বোঝে। এমন বিজ্ঞাপন মানুষ পড়বেই। এখানে যেমন, সর্ব্বত্রই কাজ পাওয়ার গোপন কথাটি হচ্ছে ইঙ্গিতের সদ্ব্যবহার। শিশুর মনে তাই শুভ আচরণটির প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে,—অশুভ আচরণটি সম্বন্ধে নেতিবাচক ইঙ্গিত করতে হবে না।

শিশু মনের পাগলটিকে সাঁকো নাড়তে নিষেধ করলে বিপদ ঘটতে পারে।

দণ্ডদান—শিশুর বুদ্ধি অপরিণত এবং প্রবৃত্তি অন্ধ ও অপরিণামদর্শী, সে স্বভাবতঃ আত্মকেন্দ্রিক, কাজেই যে কোন বিদ্যালয়েই নিয়ম লংঘন কখনো কখনো ঘটবেই। সহৃদয় ব্যবহার ও যুক্তিপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করবার মতো মনের পরিণতি বা ইচ্ছা ছাত্রদের কখনো কখনো থাকে না। তখন তার কল্যাণের জন্যই মুখ্যত, এবং প্রতিষ্ঠানের কাজে শৃংখলা রক্ষার জন্যেও, শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। একেবারে বাল্যাবস্থায় শিশু যখন বুঝতে শেখেনি, কারণ, তখনও বুদ্ধি তার অপরিণত, অথবা যখন পরহিত সাধনের সংস্কার তার জন্মেনি, তখন শাস্তি দ্বারা শাসনের প্রয়োজন হয় (Michael West—Education and Psychology)। শিক্ষক শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক হ'লেও দৃঢ়তা অবলম্বন অপরিহার্য হতে পারে। বিশেষ করে, যেখানে সহৃদয় ব্যবহার ও যুক্তিপূর্ণ উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে, এবং একাধিকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও, কোন

ছাত্র নিয়ম লংঘন করে,—সেখানে ক্ষমা করা দুর্বলতা—সেটা অন্যায়, শাস্তি দিতেই হবে। অপরাধের মাত্রা বিচার করে, সুবিবেচনার সঙ্গে, শাস্তি-বিধান করতে হবে। এ বোধ যেন না হয়, যে শাস্তি অযথা পীড়ন। শিক্ষকের ব্যক্তিগত আক্রোশের বিন্দুমাত্র আভাসও যেন শাস্তির মধ্যে না থাকে। শিক্ষক কোন অন্যায়কারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিলে, অন্যান্য ছাত্রেরা বিক্ষুব্ধ হয় না,—যদি তারা এটা নিশ্চিত বুঝতে পারে, যে অন্যায়কারীর পক্ষে উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের পেছনে থাকে, সমস্ত শ্রেণীর শুভবুদ্ধির সমর্থন। যে শাস্তির দ্বারা শিশুর মর্যাদা-বোধ অযথা ক্ষুণ্ণ হয়, সে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য ছাত্রের মনের মধ্যে বিকৃত ও স্ফীত আত্ম-মর্যাদা বোধকে শাস্তি দিয়ে পরিমিত করাই উচিত, কিন্তু তাতে শিক্ষকের যেন আনন্দ না থাকে। যে শাস্তির পেছনে নেই নির্মল বিচার-বুদ্ধি, যেখানে নেই অপরাধীর প্রতি মমত্ববোধ—সে শাস্তি তো ধর্ষকামী মনের (sadist) বিকৃত কাম কণ্ডুয়ন।

"যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ডদান,
প্রবলের অত্যাচার।"

জোসেফ ল্যাণ্ডন্ তাঁর 'দি প্রিন্সিপলস্ এ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস্ অব্ টিচিং এ্যাণ্ড ক্লাশ ম্যানেজমেণ্ট' পুস্তকে লিখেছেন, কোন অন্যায় ঘটলে শিক্ষক তৎক্ষণাৎ গলদটি কোথায়, এবং তিনি অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং এ শাসনের কাজটি করেন শান্ত সহজ ও নিতান্ত অনাটকীয় ভাবে। তিনি যখন শাস্তি দেন বা কথা বলেন তখন তাঁর যথেষ্ট অধিকার আছে এ প্রত্যয়টিই স্পষ্ট হয়—তিনি ক্ষমতা পাওয়ার বা প্রকাশ করবার জন্য লালায়িত, এ ভাব তাতে একেবারেই থাকে না।

দণ্ড যেন অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী হয়। লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিলে নিয়ম ও শৃংখলার প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা থাকে না। রামের দোষে শ্যামকে শাস্তিদান তো অ-বিচার। একের দোষে দশজনকে নির্বিচারে শাস্তি দেওয়াই ভাল নয়—তাতে যে অসন্তোষ ও শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়, তাতে শেষ পর্য্যন্ত শৃংখলা রক্ষা হয় না। গোলমাল কচ্ছে এমন একটি ক্লাশে শিক্ষক হঠাৎ ছোঁ মেরে এসে যত্র তত্র আন্দাজে কয়েকজনকে শাস্তি দিয়ে গেলেন, এটা কোন কাজের কথা নয়। যদিও এর ফলে সে মুহূর্তের জন্য ক্লাশে শান্তি ফিরে এলো, শিক্ষক পিঠ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশী গোলমাল সুরু হয়ে যাবে। শিক্ষক দণ্ডদান ব্যাপারে

সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হবেন।—যে বিদ্যালয়ে বেলা বলে, "লতিকাদি আমাকে তো শাস্তি দেবেনই,—আমি তো আর বড় লোকের মেয়ে নই" সে বিদ্যালয়ে বা সে শিক্ষিকার ক্লাশে শৃংখলা রক্ষা হওয়া কঠিন হয়।

দণ্ডদানের নানা পদ্ধতি আছে—(১) কায়িক শাস্তিদান, (২) মর্যাদার হানি (disgrace), (৩) আটক রাখা, (৪) বিদ্যালয়ের খেলা-ধূলা বা অন্যান্য আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে না দেওয়া, (৫) শাস্তি-মূলক অতিরিক্ত কাজ (task) দেওয়া, (৬) জরিমানা এবং (৭) বহিস্কার ইত্যাদি। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী, কোন দণ্ড উপযুক্ত তা স্থির করতে হবে। এর মধ্যে কায়িক শাস্তি নিকৃষ্ট, এবং এ শাস্তি সহজে দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন তীক্ষ্ণ অভিমানী শিশুদের উপর এ শাস্তি অত্যন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ শাস্তি নির্বিচারে দিলে তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ব্যাহত হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে শিশু নৃশংস ও হৃদয়হীন হয়ে ওঠে। বার্টরাণ্ড রাসেল্ এ শাস্তিকে গুহামানবের বর্বর মনের পরিচায়ক বলেছেন এবং বহু সভ্যদেশের শিশু-বিদ্যালয়ে এ শাস্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্য সমস্ত শাস্তিও বিশেষ বিবেচনা না করে, দেওয়া উচিত নয়। খেলা-ধূলা হ'তে বঞ্চিত রাখা, আটক রাখা ইত্যাদি শাস্তি পরিমিত ভাবে ব্যবস্থা করলে সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে শিশুর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয়। অযথা শিশুর মর্যাদাহানিও অপরাধ,—কিন্তু কোন ছাত্র যদি বিকৃত মর্য্যাদাবোধের ফলে অন্য ছাত্রের অসম্মান করে বা তার উপর অত্যাচার করে, তখন তার প্রতিবিধান উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে অবশ্যই করতে হবে। "আমি বড় লোকের ছেলে কাজেই রাধু নাপিতের ছেলেকে কানমলা দেবার আমার অধিকার আছে,"—এ মিথ্যা অহমিকাকে আঘাত দিয়ে ভেঙে দিতেই হবে। জরিমানা ভাল শাস্তি নয় কারণ এ শাস্তিটা পড়ে গিয়ে অভিভাবকের উপরে। অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে শাস্তি দেওয়াটা অপ্রীতিকর,—তাই অনেক সময় ফলপ্রসূ, কিন্তু এর বিপদ হচ্ছে এই যে শাস্তি হিসাবে অংক কষতে দিলে, শেষে অংক কষাটাই ছাত্রের কাছে অপ্রীতিকর হ'য়ে উঠতে পারে। রাইবার্ণ বলেছেন, এ ধরণের শাস্তি দেওয়ার সময় এটা স্মরণ রাখা দরকার যে এর বিপদ হচ্ছে যে যে কাজটা শাস্তি হিসাবে দেওয়া হেলে সেটাই মনের মধ্যে মিথ্যা বিরাগ সৃষ্টি করতে পারে।

একাধিকবার বলা হয়েছে,—অপরাধ অনুযায়ী বিচার বিবেচনা করে, শাস্তি দেওয়া সঙ্গত। এর মধ্যে যেন খামখেয়ালীপনা, বা অতিরিক্ত ধরা-বাঁধা রুটিন্

এর ভাব, না থাকে। যে ছেলে তাড়াতাড়ি করে অপরিচ্ছন্ন ক্লাশের কাজ করে এনেছে তাকে টাস্ক দিয়ে সংশোধন করতে হবে। আবার যে ছেলে ভণ্ডামী করে অন্যদের খেলা নষ্ট করেছে, তাকে খেলা-ধূলা থেকে বঞ্চিত করাই ঠিক।

কিন্তু ভয় দিয়ে শাসন ব্যাপারটাই, মূলতঃ ভাল নয়। এতে অনেক সময় সহজে তখন তখন ফল পাওয়া যায়,—তাই অলস শিক্ষক, এর পক্ষপাতী। লক্ বলেন "এ হচ্ছে শাসনপরিচালনার সহজ অলস পন্থা।' কিন্তু সমস্ত সস্তা ও সহজ পন্থার মত এ পন্থাও বাস্তবিক পক্ষে শিশুর চরিত্র গঠনের পক্ষে মূল্যহীন। এতে বড় জোর কু-অভ্যাস গঠনে বাধা দিতে পারে, কিন্তু এতে শিশুর সদভ্যাস গঠনে সাহায্য করতে পারে না। এ বিষয়ে সাফল্যের মূল রহস্য হচ্ছে, এ কথা স্মরণ রাখা যে শিশু যখন নিষ্কলুষ আছে তখনই তার চরিত্রগঠন ও ইচ্ছাশক্তি শুভ উদ্দেশ্যমুখী করবার উপযুক্ত সময় (Mumford—The Art of Bringing up Children)।

শাস্তির উদ্দেশ্য হবে সংশোধন। বাইরের তাড়না থেকে যে সংশোধন, তা স্থায়ী হয় না। অপরাধী যখন বোধ করবে, তার কাজের দ্বারা সে সমাজ শৃংখলা ভঙ্গ করে অন্যের ক্ষতি করেছে, এবং শাস্তিকে যখন সে স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণের ন্যায্য উপায় বলে গ্রহণ করবে, তখনই বাস্তবিক সংশোধন হয়। একেই বলা যায় প্রায়শ্চিত্ত। "অপরাধ করলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করবে। শাস্তি পরের নিকট হ'তে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ড স্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করলে, যে গ্লানিমোচন হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হ'তে হওয়া চাই—পরের নিকট নিজেকে দণ্ডনীয় করবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।"

(শিক্ষা-সমস্যা—রবীন্দ্রনাথ।)

পুরস্কার—তিরস্কার ও শাস্তির উল্টোদিক হচ্ছে, প্রশংসা ও পুরস্কার। ছাত্রদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি উৎসাহিত করবার উপায় হিসাবে এদের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আগ্রহ সৃষ্টি করা, কাজ ভাল করে করবার জন্যে এবং ভাল ব্যবহারের জন্যে উৎসাহ দান (Ryburn—Suggestions for the Organization of Schools)।

প্রশংসা বা পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা যায়, সেটা অনেক সময় উচিতও ; কিন্তু এখানেও বিচার বিবেচনার প্রয়োজন আছে। বাইরের পুরস্কার মনকে লুব্ধ

করে, অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা উদ্বুদ্ধ করে হিংসা ও ঈর্ষার সৃষ্টি করে। যেমন শাস্তির বেলায়, তেমনি প্রশংসার বেলাও মনে রাখতে হবে এর উদ্দেশ্য, চরিত্র গঠন। নিতান্ত অস্থায়ী ফল লাভই এর উদ্দেশ্য নয়,—পুরস্কার দানের মূলনীতি এই যে এতে কোন একটি বিশেষ উপলক্ষে ছাত্রদের কাছ থেকে সাময়িক ভাবে সুষ্ঠু ব্যবহার প্রাপ্তি মাত্র নয়। এর উদ্দেশ্য হবে ছাত্রদের চরিত্রের উপর এর স্থায়ী প্রভাব কতটা হবে তা বিবেচনা করে ব্যবস্থা করা (Raymont —The Principles of Education)। রাসেলও (Russell) শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার কুফল সম্পর্কে দৃঢ় মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহের এও একটি মূল মনস্তাত্ত্বিক কারণ। রাইবার্ণ এবং আধুনিক অনেক লেখক ব্যক্তিগত পুরস্কারের পরিবর্তে দলগত পুরস্কার দেয়ার পক্ষপাতী। পুরস্কারবিধি কাজে লাগাতে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ভাবটা যতটা দূরে রাখা যায় ততই ভাল। ব্যক্তিকে পুরস্কার না দিয়ে দলকে পুরস্কার দেওয়া ভাল। এতে ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা উৎসাহিত হয়।

শিক্ষকের নৈতিক প্রভাব—পূর্বেই বলা হয়েছে, শিশুদের উপর শিক্ষকের নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট কার্যকরী। শিশু শিক্ষককে অনুকরণ করে, বিশ্বাস করে। এই নির্ভরশীলতা ও অনুকরণ-প্রিয়তা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক ; তাই শিক্ষকের কর্তব্য এই বিশ্বাসভঙ্গ না করা। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন, "আমাদের দেশে ছাত্রেরা শিক্ষককে হৃদয় দিবার জন্য উন্মুখ হইয়াই আছে, তাই বাধ্যতা তাহাদের কাছে সহজ। তাই শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব গুরুতর। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, অপক্ষপাতিত্ব এবং পরিপক্ক বিবেচনার উপর ছাত্রদের আস্থা যতদিন অবিচলিত থাকিবে, ততদিন শিশুর পক্ষেও মঙ্গল।" সহস্র উপদেশেও যা সম্ভব হয় না, একটি জীবন্ত দৃষ্টান্তে তা সম্ভব হয়। ছাত্র যেন শিক্ষককে বিশ্বাস করতে পারে, তাঁর চরিত্রের মহত্ব যেন তাকে মহৎ জীবন ও বৃহৎ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে। যেখানে শিশু দেখে শিক্ষক মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, পদলেহী, অলস, ও কর্তব্যে অনবহিত, সেখানে চরিত্র গঠনের সহস্র উপদেশ মিথ্যা হ'তে বাধ্য। যে শিক্ষক অপ্রস্তুত হয়ে ক্লাসে আসেন, যিনি কাজে ফাঁকি দেন, তিনি নিজে শ্রদ্ধা হারান—শিক্ষাকেও অশ্রদ্ধেয় করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছিলেন, "বাংলা দেশের বিদ্যালয়গুলির 'পরে রোজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র (স্বদেশী যুগে) কত প্রবীণ ও নবীন শিক্ষক জীবিকালুব্ধ শিক্ষকবৃত্তির কলঙ্ক-কালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা

কাহারও অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন, তবে পদ-গৌরবের খাতিরে, এবং হৃদয়ের অভ্যাসবশতঃই, ছোটো ছোটো ছেলেদের উপর কনষ্টেবলি করিয়া, নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না।"

শৃংখলা-ভঙ্গের কারণ—শিশুদের জীবন্ত ও বাড়ন্ত দেহ-মনের অফুরন্ত কর্মচাঞ্চল্য যদি প্রকাশ ও স্ফূরণের অবকাশ না পায় তা হ'লে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে শৃংখলাকে ক্ষুণ্ণ করবে। শিক্ষক শিশুকে বেড়ে উঠতে অবসর দেবেন, বুদ্ধি ও বিবেচনার সঙ্গে তাদের বাড়তি কর্মশক্তিকে (surplus energy) সৃজনাভিমুখী করবেন, কল্যাণাভিমুখী করবেন। অলস দেহ মন, শয়তানের লীলাক্ষেত্র। যেখানে শিশুর প্রাণশক্তি পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়, যেখানে সে শক্তির সানন্দ ও সুপ্রচুর ব্যবহার করতে পারে না, সেখানে হয় সে খর্ব ও পঙ্গু হয়, নয় বিদ্রোহী হয়ে শৃংখলা ভঙ্গ করে। তাই শিশুদের মনকে পূর্ণ করে রাখতে হবে, তাদের চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলিকে সৃজনমূলক কর্মে সতত নিয়োজিত করতে হবে। বিশেষ করে, এ কথা অল্পবুদ্ধি (feeble-minded) শিশুদের সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার। তাদের অসামাজিক, বিকৃত মনের গতির জন্যে দায়ী, তাদের পরিবেশ,—তার সঙ্গে তাদের মিল হচ্ছে না, নিয়তই ঘটছে বিরোধ। তাদের সম্পর্কে শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষকের একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ ক্লাশে গোলমাল সুরু করে সেই সব ছাত্রেরা, যারা ক্লাশে যে কাজ হচ্ছে তাতে রস পাচ্ছে না। অথবা সে সব ছাত্রেরা যাদের এ পড়ার মধ্য দিয়ে ক্রিয়া শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হতে পাচ্ছে না (Panton—Modern Teaching Practice and Technique)। উড্‌ওয়ার্থ এ সম্পর্কে লিখছেন 'অসদ্‌ব্যবহার, ব্যক্তির ক্ষমতা ও তাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অসমতার জন্যে হতে পারে। যদি তার বুদ্ধির পরিণতি অনুযায়ী কাজটি অত্যন্ত সোজা হয়, তা হলে সে অসাবধানী হতে পারে এবং দুষ্টুমীর দিকে তার মন যেতে পারে। একজন বুদ্ধিমান্ লোককে যদি এমন নীরস কাজ দেওয়া হয় যেটা নিতান্তই যান্ত্রিক যেখানে তাঁর বুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবহার হচ্ছে না, তাহলে সে লোক কাজে অবহেলা করতে পারে বা ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারে। আবার যার বুদ্ধি তার কাজের তুলনায় অনুপযুক্ত সে বারংবার অসাফল্যের জন্যে সর্বদা আত্মগ্লানি বোধ করতে পারে এবং তার ফলে অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে, সংক্ষেপে তার মনে অসামাজিক বৃত্তি গড়ে উঠতে পারে। যদি নীচু ক্লাশে কোন বোকা বয়স্ক ছেলে

পড়ে যার বুদ্ধি তার ক্লাশের কাজের অনুপযুক্ত তা'হলে সে ছেলের পক্ষে ক্লাশের বাইরের পরিবেশই অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হবে আর তাই স্কুলে পালানোর অভ্যাসটিই হয়তো গড়ে উঠবে এবং তাতেই হয়তো সূত্রপাত হবে সমাজে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আকর্ষণ, এক কথায় এসব ছেলে অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠবে (Woodworth—Psychology)। টমসন্, মিলার্ড এবং অন্যান্য অনেক আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক পরিণতি (Maturity) অনুযায়ী তাদের কাজ দেওয়া এবং কার্যে উপযুক্ত আগ্রহ সৃষ্টি (Good motivation) শাসন-শৃংখলা রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য মনে করেন। ছাত্রদের শক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব ও কাজের ভার দিলেই তারা আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্বশীল কাজের লোক হয়ে উঠতে শিক্ষা পায়। তাই বিদ্যালয়ে ক্লাসে, পড়াশুনার বাইরেও নানা কর্মপ্রচেষ্টার (extra-curricular activities) ব্যবস্থা সু-শিক্ষক করে থাকেন। শাসন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব, ছাত্রদের উপর বিশ্বাস করে, অনেকটা ছেড়ে দিলে, ফল ভালই হয়। ইংল্যাণ্ডে জুনিয়ার স্কুল বা সেকেণ্ডারী স্কুলে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বিদ্যালয়গুলিতে এ পরীক্ষাতে অভূতপূর্ব সুফল পাওয়া গেছে। প্রাচীন শিক্ষকেরা এতে কিছুটা ভয় পান, কিন্তু সাহস করে এ পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? রাইবার্ণ এ পরীক্ষা খুব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেন। এই ব্যবস্থায় স্বশাসন ও শৃংখলারক্ষা এ দুই মিলে দাঁড়ায় গোষ্ঠিশাসন। ছাত্ররা এখানে উদ্যোগী, ছাত্ররাই নিজেরা বিচার ও শাসনের মালিক। এ শাস্তি ও শাসন বাইরে থেকে বা উপর থেকে চাপানো নয়। কাজেই এ পদ্ধতিতে যে শৃংখলা ও বাধ্যতা পাওয়া যায় তা সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে ঢের ভালো ধরণের।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ যেখানে অপরিচ্ছন্ন, অপ্রীতিকর,—সেখানে শিশুর মন স্বস্তি পায় না। তাই বিদ্যালয়ের পরিবেশ চাই নির্মল, স্নিগ্ধ, প্রীতিপ্রদ এবং মনের সৌন্দর্যবুদ্ধিবিকাশের অনুকূল। সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা এমন পরিবেশে সহজ হয়। শিশু নিয়ম ভাঙতেই চায় এ কথা মনে করা ভুল। বরং বলা যেতে পারে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া, বাধ্য হওয়াই শিশু-মনের প্রাথমিক বৃত্তি। চারিদিকের কৃত্রিম পরিবেশ যদি তার প্রবৃত্তি ও রুচিকে অকালপক্ব না ক'রে তোলে তা'হলে শৃংখলার মধ্যেই তার মন শান্তি পায়। পেণ্টন্ বলছেন "সর্বশেষে শিক্ষকদের ক্লাশ ও বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টি ও রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আবার স্মরণ করানো যাচ্ছে। অনেক সময় উপযুক্ত বায়ুচলাচলের অভাবশূন্য, অতি উত্তপ্ত বদ্ধ গৃহে আটক থাকাই ছাত্রদের

উৎসাহহীনতা ও অমনোযোগের কারণ (Panton—Modern Teaching Practice and Technique)।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন "শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল,—সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি, সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি।" (শিক্ষা সমস্যা)

বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা সাধারণতঃ কি ধরণের শৃংখলাভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়? গোলমাল, হৈ হুল্লোড় করা, মারামারি করা, ইস্কুলের আসবাব পত্র ভাঙা, আলস্য, অমনোযোগ, অনিয়মিত স্কুলে আসা, ক্লাশ পালানো, অবাধ্যতা, বদ্‌মেজাজ, মিথ্যে কথা বলা, গোপনে নালিশ করা, নোংরা কথা বলা, চুরি, অন্য ভাল ছেলেকে অযথা পীড়ন ইত্যাদি। সহজেই বোঝা যায় এ অপরাধ-গুলির গুরুত্ব সমান নয়। কতগুলো অপরাধ এ বয়সে প্রাণ-প্রাচুর্যের ফলেই স্বাভাবিকভাবে ঘটে, এর জন্যে অতিরিক্ত চিন্তা করার প্রয়োজন নেই,—এ অপরাধগুলোকে অযথা গুরুত্ব দিলেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছাত্র শাসনতন্ত্র" প্রবন্ধে লিখেছেন "এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্রেরা মাঝে মাঝে এক একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এ সকল উৎপাৎকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়,—কেন না, তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া ওঠে।" যে শিক্ষক, শাসন ও শৃংখলা বলতে, ছাত্রদের "ঠাণ্ডা" হয়ে চুপ করে থাকাই বোঝেন, তিনি ছাত্রদেরও ক্ষতি করেন,—শৃংখলাও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেন না। শিক্ষককে সর্বদা বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রত্যেকটি অসঙ্গত আচরণ বিশ্লেষণ করে জানতে হবে,—কেন এই অপরাধটি ঘটলো। যে ছেলে ইস্কুল পালায়—বুঝতেই হবে ইস্কুল তার মনকে আকর্ষণ করতে পারছে না, তার প্রাণশক্তি এখানে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে না। যথাসম্ভব সে ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। যে ছেলে ইস্কুলের টুল ডেক্‌সো, ছুরি দিয়ে কাটছে, তার চঞ্চল আঙ্গুলগুলোকে কাজে লাগানো দরকার। তাকে এবং আরও কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রকে নিয়ে, মাষ্টারমশাই লেগে যান না বাগানের বেড়া দিতে—পায়রা কবুতর, হাঁসের জন্যে কাঠের তক্তা দিয়ে ঘর বানাতে! শিশুর চঞ্চল প্রাণশক্তি এখানে একটা সৃজনমূলক আনন্দ ও মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। গৃহের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ অধিকাংশ ছেলেকে মিথ্যুক,

নিন্দুক, ঈর্ষাপরায়ণ বা অপরিচ্ছন্ন ক'রে তোলে। এখানে শিশুর সংশোধনের জন্যে গৃহের অভিভাবকদেরও সাহায্য চাই—যত এই সহযোগিতা শিক্ষক আকর্ষণ করতে পারেন, ততই বিশৃংখলার মূল কারণ দূরীভূত করতে সাহায্য হবে। কথনো কথনো শিশুর বিশৃংখল ব্যবহারের কারণ অত্যধিক তাড়না বা ভয়। অপরাধ করে সত্যি কথা বললেও যদি পিটুনী খেতে হয় তবে শিশু আদর্শ-অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যি কথা বলবে, এটা আশা করা মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা। কিন্তু অনেক সময় বিশৃংখলার মূল কারণ আরো অনেক গভীর,—হয়তো শিশুর মনের বিকৃতি বা অসামাজিক প্রবৃত্তি তার অচেতন মনে কোন বিষম জটিলতার ফল,—সে শিশু বাস্তবিক অসুস্থ। দৈহিক অসুখের চেয়ে এ অসুস্থতা অনেক বেশী গুরুতর। তাকে শাসনে ফল হবে না, তার চিকিৎসা চাই। শিক্ষকের এ ক্ষেত্রে উচিত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া। রাইবার্ণ বলছেন অনেক সময় গুরুতর শৃংখলা ভঙ্গের কারণ মানসিক বিকারজনিত এবং এসব ক্ষেত্রে সযত্ন চিকিৎসা প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষক এসব ক্ষেত্রে নিজে ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হলে তার সহকর্মী শিক্ষক বা বাইরের আর কারু কাছ থেকে যে পরামর্শ তাঁকে সাহায্য করবে তা গ্রহণ করতে লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। যদি সম্ভব হয় শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

শৃংখলা ও শাসনের সমস্যা সেখানেই সহজ হতে পারে, যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ সহজ ও স্বাভাবিক। যেখানে বুদ্ধির সঙ্গে প্রীতি, দক্ষতার সঙ্গে শুভকামনা সংযুক্ত থাকে, সেখানে বিশৃংখলার সম্ভাবনাই কম। ছাত্র যদি শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, তাহ'লে সে শিক্ষা যেমন ব্যর্থ, তেমনি শিক্ষক যদি ছাত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হন, তাহ'লেও সে শিক্ষা প্রাণহীন ও অফলপ্রসূ। ছাত্রকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্য্যাদায় স্থাপিত করাই শিক্ষকের মূল উদ্দেশ্য,—শাসন ও শৃংখলা তার উপায় মাত্র। উপায়ই যেন উদ্দেশ্য না হয়ে ওঠে,—বিদ্যালয় যেন জেলখানা না হয়। মরিসন্ বলছেন, "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদের বাধ্যতা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণে অভ্যস্ত করা। এ গুণগুলি শিক্ষার সাফল্যের কতকগুলি সাধারণ অবস্থা।...এটা (শাস্তি ও শাসন) উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র (Morrison—Manual of School Management)। শিক্ষার ক্ষেত্র গুরু ও শিষ্যের মিলিত সাধনার ক্ষেত্র—পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতিই এর ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন, "শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই, শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদান প্রদানের সম্বন্ধ

কলুষিত হইয়া উঠে।" তাই তো আমাদের প্রাচীন তপোবনে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠাভ্যাসের প্রারম্ভে গুরু শিষ্যের সম্মিলিত প্রার্থনা ছিল—

ওঁ সহ নাববতু।
সহ নৌ ভুনক্তু।
সহ বীর্য্যং করাবাবহৈ।
তেজস্বিনা বধীতমস্তু
মা বিদ্বিষাবহৈ।
ভদ্রন্নো অপি বাতরমনঃ।

বিংশ অধ্যায়

গরজ-আগ্রহ-প্রেরণা—Motivation

কথায় বলে 'গরজ বড় বালাই।' একথা সত্য যে মানুষের সব কাজের পেছনেই কোন না কোন 'গরজ' বা প্রেরণা (Motivation) থাকে। তুমি কলেজে ভর্তি হ'য়েছ, খেটে খুটে পড়ছ, কারণ তোমার 'গরজ' আছে পরীক্ষাটা ভাল করে পাশ করবার। পরীক্ষা ভাল পাশ করলে ভাল চাকরী পাওয়া যেতে পারে। তোমার ছোট ভাই বাট্টুর পড়ায় মন নেই—তুমি তাকে আগ্রহান্বিত করে তুলতে চাও, তাই কবিতা শোনালে 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই'। বাট্টুর গাড়ী ঘোড়া চড়বার সখটা যদি প্রবল করে তুলতে পার তা হ'লে লেখাপড়ায় মন সে দেবে। এ ঔষধে যদি না ধরে তা হ'লে তাকে হয়তো লোভ দেখিয়ে বল "লক্ষ্মী তো, এই পড়াটুকু শেষ করে ফেল, তা হলে এই 'লজেঞ্জুস' এইখানে তুলে রাখলুম,—তোকে দু'হাতে দু'টো দেব।" এতেও যদি ফল না হয় তা হলে রাগ করে বল, "পড়া যদি আজ না পারিস্—পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব।" অর্থাৎ কথাটা হচ্ছে, কাজ আদায় করতে হলে 'গরজ' সৃষ্টি করা দরকার।

শিশুদের পক্ষে এটা বিষম দরকার। লেখা পড়ায় ছেলেমেয়েরা কেন মন দেয় না—কি করেই বা তাদের মন পাওয়া যেতে পারে। হালে লেখা, জর্জ জি, টম্পসন তাঁর 'চাইল্ড্ সাইকোলজী'তে লিখছেন, "সেকেলে মাষ্টার মশাই বা পিতামাতা যাকে বলেন 'অলস ছেলে' তার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং যে সব ছেলে মস্তিষ্ক বা পেশীর ব্যবহারে কম আগ্রহ দেখাচ্ছে তার নিম্নলিখিত কোন না কোন অসুবিধা ঘটছে যার সংশোধন হওয়া প্রয়োজন (১) দৈহিক শক্তির ক্ষীণতা যার কারণ হয়তো খাদ্যে পুষ্টির অভাব বা রসগ্রন্থির ক্ষরণের অপ্রাচুর্য (২) মানসিক দ্বন্দ্ব—যার ফলে তার কোন বিষয়ে স্ফূর্তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে (৩) আগ্রহ বা উৎসাহের অভাব।

যে ছেলের সামনে এমন কাজ এসেছে যার জন্যে তার মানসিক পরিণতি অযথেষ্ট, কাজেই কি করে কাজটা সুসম্পন্ন করতে হবে তা সে বুঝে উঠতে পাচ্ছে না—সে ছেলে কাজে স্বভাবতঃই উৎসাহ পাবে না আর তা সম্পন্ন করবার

জন্যে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে না—তাতে তার গরজ থাকবে না—এটা বোঝা কঠিন নয়। 'গরজ'—আগ্রহ যেখানে থাকে না শেখাটা নিতান্তই দায় সারা গোছের হয়। কাজেই আধুনিক শিক্ষক বা পিতা মাতা নানা ভাবে মাথা খাটিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন শিশুর বর্তমান আগ্রহ কিসে এবং তারপর চেষ্টা করেন শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে চালনা করতে।"[১]

ম্যাক্‌গিয়োক্ শিক্ষা ব্যাপারটাকেই এই আগ্রহে বা গরজের ভিত্তিতে স্থাপিত করতে চেয়েছেন, তাই তিনি 'শেখা'র সংজ্ঞা দিচ্ছেন "অভ্যাসের ফল হিসাবে কোন ক্রিয়ার পরিবর্তন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, হয়তো বা সব ক্ষেত্রেই এ পরিবর্তনের গতি হচ্ছে ব্যক্তির বর্তমান কোন আগ্রহের পরিতৃপ্তি।"[২]

গরজ বা আগ্রহ (Motivation) একটা মানসিক ব্যাপার। এই আগ্রহ যে দ্রব্যকে অবলম্বন করে—অর্থাৎ যা পাওয়ার জন্যে এ আগ্রহ, সেটা বাইরের জিনিষ হতে পারে। সেটা 'আগ্রহ' নয়—সেটা আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক। আগ্রহকে ইংরেজীতে বলে Motive আর আগ্রহের বস্তুকে বলি incentive. উড্‌ওয়ার্থ বলেছেন "আগ্রহটা হচ্ছে ব্যক্তির ভিতরে আর দ্রব্যটা হ'চ্ছে তার বাইরে। আগ্রহের বস্তু (incentive) হচ্ছে যা আগ্রহকে (Motive) আকর্ষণ করে।"[৩]

আগ্রহ ও উত্তেজক (stimulus)-ও এক কথা নয়। উত্তেজক ও অনেক সময় বাইরের কিন্তু আগ্রহ হচ্ছে মনের। তা ছাড়া উত্তেজক যা বর্তমান মুহূর্তে কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীকে নাড়া দিচ্ছে। যেমন আলো এসে চোখে লাগল। কিন্তু আগ্রহটা বর্তমান মুহূর্তের ব্যাপার নয়। মনের মধ্যে অনেক অতীত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে ও সংশ্লিষ্ট হয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বর্তমান মুহূর্তে কোন দ্রব্য বা অবস্থাকে অবলম্বন করে আগ্রহ প্রকাশ লাভ করতে পারে—যেমন নতুন ডিজাইনের পাড় শাড়ীখানা দেখে তোমার কিনতে আগ্রহ হোল। কিন্তু এই মুহূর্তের উত্তেজকই আগ্রহকে জন্ম দেয়নি। উত্তেজক উপস্থিত হওয়ার আগেই আগ্রহের বীজ মনের মধ্যে ছিল। নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে প্রশংসা লাভের প্রচ্ছন্ন বাসনাটি মনের মধ্যে ছিল। বর্তমান উত্তেজক তাকে প্রকাশ করেছে এই মাত্র।

১ G. G. Thompson—Child Psychology—P. 13-14
২ McGeoch—The Psychology of Human Learning.
৩ Woodworth—Psychology—P. 363

আগ্রহ বা গরজ (Motive) শারীরিক অর্থে একটা শক্তি (energy) নয়। 'ক্ষুধা' হচ্ছে খাদ্যের জন্য আগ্রহ কিন্তু এটা বাস্তবিক পক্ষে কোন শক্তি নয়—বরঞ্চ, এ হচ্ছে শক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে, তার পাগলা ঘণ্টা। ক্ষুধা এ তাড়া লাগায় যে দেহদেবতার যজ্ঞাগ্নিতে সমিধ-সঞ্চারের প্রয়োজন হয়েছে। আগ্রহ (Motive) হ'চ্ছে শক্তির দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। এ শক্তির নিয়ামক।[৪]

আগ্রহ বা গরজ (Motive) সব সময়েই সচেতন ইচ্ছাসম্ভূত নয়। বরং জীবজগতের মস্ত অংশ অচেতন এবং প্রকৃতিদত্ত আগ্রহ (Motive) দ্বারা চালিত। এই আগ্রহগুলিকে সাধারণতঃ ইন্‌স্‌টিংট (Instinct) বলা হয়। আমরা এদের বলেছি সহজাত সংস্কার। বর্তমান কালে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী ইনস্‌টিংট এ নামের পরিবর্তে "আন্‌লার্ণড মোটিভস্‌" "অশিক্ষিত আগ্রহ" বা "ইন্নেট মোটিভস্‌" বা "প্রকৃতিগত আগ্রহ" নাম ব্যবহারের পক্ষপাতী। প্রকৃতি নিজেই জীবের মধ্যে এ অচেতন আগ্রহ সৃষ্টি করেছে সৃষ্টি রক্ষা ও সৃষ্টি বিস্তারের প্রয়োজনে। প্রাণী জগতের এই আদিম আগ্রহকে বর্তমানে অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন "এ্যানিমাল ড্রাইভস্‌" (Animal drives) বা জৈব তাড়না।[৫]

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এ তাড়নাগুলি বিদ্যমান, তাই এদের জন্মগত ও আদিম বলে মনে করা হয়।

এ তাড়নাগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যেতে পারে। 'সহজাত সংস্কার' আলোচনা কালে এ আমরা দেখেছি। উড্‌ওয়ার্থ এদের তিনটি প্রধান দলে ভাগ করবার পক্ষপাতী—নিরাপত্তা, আনন্দ ও কর্তৃত্ব (Security, pleasure and achievement.)

প্রাণী জীবনের পরিবেশের মধ্যে এমন অনেক শক্তি ও দ্রব্য আছে যা তার পক্ষে হানিকর, বিরক্তিকর, বিপজ্জনক। প্রাণীর সহজ আদিম প্রবৃত্তি হচ্ছে এসব দ্রব্য বা অবস্থাকে এড়িয়ে চলা। ছোট কুকুর ছানা বা মানুষের বাচ্চা হঠাৎ তীব্র শব্দ শুনলে চকিতে মায়ের বুকে মুখ লুকায়—সে নিরাপত্তা খোঁজে।

কিন্তু বেঁচে থাকা একটা নেতিবাচক প্রক্রিয়া নয়। তাই প্রাণী যা বিরক্তিকর তাকে শুধু এড়ায় না, যা সুখকর তাকে সে খোঁজে। গরম মায়ের কোল শিশু খোঁজে—বেড়াল গরম উনুনের গা ঘেঁষে শোয়। এ হচ্ছে সুখ বা

৪ Woodworth—Psychology—P. 362
৫ J. S. Ross—Basic Psychology—P. 30

আনন্দের স্বাভাবিক তাড়না। শিশু মিষ্টি খাবার জন্য বায়না ধরে—লাল রং এর ছবি চায়।

আবার এমন দ্রব্য বা অবস্থা আছে যা হানিকরও নয়, সুখকরও নয়। তাদের সম্পর্কে প্রাণীর ঔৎসুক্য আছে নেড়ে চেড়ে দেখবার (exploration), তাদের জানবার (acquaintance), বাধা দূর করে তাদের আয়ত্ত করবার (mastery)। একেই বলা যেতে পারে কর্তৃত্ব (achievement)[৬]

রস্ (J. S. Ross) আবার এ তাড়নাগুলিকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে। (১) আত্মরক্ষা মূলক (Self motives) (২) বংশ বা জাতি রক্ষা মূলক (Race motives) ও (৩) দলরক্ষা মূলক (herd motives)। এ তাড়নাগুলি অবশ্যই পরস্পরবিরোধী বা বিচ্ছিন্ন নয়।

ম্যাকডুগাল ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা, যে ভাবে এই আদিম তাড়নাগুলিকে ভাগ করেছেন তা আমরা দেখেছি।

আদিম প্রবৃত্তিগুলি জীবনের মূল উৎস তাই তাদের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা মনের এই তিনটি মৌলিক উপাদানই উপস্থিত থাকে। এ তাড়নার ফলে (১) তার পরিবেশের কতক দ্রব্য বা অবস্থার দিকে প্রাণী দৃষ্টি দেয়,—কতক দ্রব্যকে সে উপেক্ষা করে (২) যে দ্রব্যের বা অবস্থার প্রতি প্রাণী আকৃষ্ট, তা পেলে সে সুখ অনুভব করে— এবং তা না পেলে সে ক্ষুণ্ন হয় (৩) যে দ্রব্যের প্রতি সে আকৃষ্ট তা আয়ত্ত করতে সে চেষ্টিত হয়।[৭]

সব তাড়না সব প্রাণীর সমান প্রবল নয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জাতিতে জাতিতে প্রভেদ আছে। এবং একই প্রাণীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন তাড়না অধিক প্রবল নয়। তথাপি তাড়নাগুলির মধ্যেও আবার কোনটি বেশী মৌলিক প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং কিছু পরীক্ষাও হয়েছে। সাদা ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে। দুরকম খাঁচা বাক্স দিয়ে এ পরীক্ষা করা হয়। এ হচ্ছে একটা ঘুরন্ত খাঁচা (Activity cage)—ইঁদুর যত অস্থির হয় ততই খাঁচাটা ঘোরে বেশী। কতবার ঘুরলো তা বুঝবার জন্যে একটি ঘড়ির কাঁটা আছে। স্বাভাবিক সন্তুষ্ট অবস্থায় (যখন সে কোন তাড়নার বশবর্তী নয়) ইঁদুর কতটা নড়াচড়া করে তার গড়টা (Average) আগে দেখা হয়। তারপর বিভিন্ন তাড়নার বশবর্তী হয়ে ইঁদুরটা কতবার নড়াচড়া করে

৬ Woodworth—Psychology—P 332—83
৭ Mcdougall—Outline of Psychology

তা দেখা হয়। এ কয়টি তাড়না নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে (১) বাৎসল্য (২) তৃষ্ণা, (৩) ক্ষুধা, (৪) সঙ্গমেচ্ছা, (৫) খুঁটে খুঁটে দেখা, বা নড়েচড়ে বেড়ানো (exploratory drive)। যে ইঁদুরের সগু বাচ্চা হয়েছে তাকে বাচ্চার থেকে বারে বারে সরিয়ে দেখা হয়, কতবার সে বাচ্চার কাছে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়। তেমনি তৃষ্ণার্ত্ত ইঁদুরকে অল্প একটু জল খেতে দিয়ে, সরিয়ে এনে দেখা হয় কতবার সে জলের নিকটবর্তী হবার জন্যে অস্থির হয়। ক্ষুধা ও সঙ্গমেচ্ছায় ইঁদুরের চাঞ্চল্য ঠিক তেমনি করেই মাপা হয়। যে তাড়নায় ইঁদুরের চাঞ্চল্য যত বেশী সে তাড়না তার পক্ষে তত প্রবল এ কথা মনে করা হয়।

আবার অন্য রকম পরীক্ষা হচ্ছে, একটা তিন কোঠাওয়ালা বাক্স দিয়ে (obstruction box)। প্রথম কোঠায় তাড়নাপীড়িত ইঁদুরকে রাখা হয়, দ্বিতীয় কোঠাটি খালি কিন্তু তার নীচে সূক্ষ্ম খোলা বৈদ্যুতিক তার আছে যাতে এ কোঠা পার হতে ইঁদুরকে মৃদু বৈদ্যুতিক 'শক্' খেতে হয়; তৃতীয় কোঠাতে আছে ইঁদুরের ঈপ্সিত দ্রব্য (তার ছানা, বা খাদ্য, জল বা সঙ্গমেচ্ছু অন্য ইঁদুর, বা কাঠ ন্যাকড়া, করাতের গুঁড়া ইত্যাদি)। ঈপ্সিত দ্রব্যকে পেতে গেলে তার 'শক্' খেতে হয়। তাড়না কতটা প্রবল তা মাপা যায় এ 'শক্' সত্ত্বেও ইঁদুর কতবার ঈপ্সিত দ্রব্যের সম্মুখীন হয়। সি, জে, ওয়ার্ডেন এ পরীক্ষাগুলি থেকে এ ফল পেয়েছেন (সময় কুড়ি মিনিট)ঃ[৮]

তাড়না	ইঁদুর কতবার দ্বিতীয় কোঠা পার হল
বাৎসল্য	২২·৪
তৃষ্ণা	২০·৪
ক্ষুধা	১৮·২
সঙ্গমেচ্ছা	১৩·৮
নড়াচড়া করা	৬·০
কোন তাড়না না থাকলে	৩·৫

এ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইঁদুরের পক্ষে বাৎসল্য সর্বাপেক্ষা প্রবল তাড়না। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার ফল কিন্তু এক নয়। ফ্রয়েড্ পন্থীদের মতে জীবনের মৌলিক তাড়না হচ্ছে 'কাম' বা Sex। ওয়ার্ডেন-এর পরীক্ষার ফল ফ্রয়েডের মতের প্রতিকূল।

আদিম তাড়নাগুলির সাহায্যে প্রকৃতি প্রাণীদের মধ্য দিয়ে তার অভিপ্রায়

৮ C. J. Warden—Animal Motivation

পূর্ণ করে নিচ্ছে। এ তাড়না না থাকলে সৃষ্টি অচল হোত। কিন্তু প্রকৃতির শক্তি অন্ধ ও অচেতন, মানুষ এ শক্তিগুলোকে সচেতন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে। এখানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

"পাখীরে দিয়েছে গান,
গায় সেই গান,
তার বেশী করে না সে দান" ৯

কিন্তু মানুষ স্বভাবদত্ত ক্ষমতাকে সচেতনভাবে ব্যবহার ক'রে গান সৃষ্টি করে। মানুষের শিক্ষার এ একটা মস্ত দিক। আদিম তাড়নাগুলিকে মানুষ সংহত, শোভন, সুন্দর ও উদ্দেশ্যমুখী করেছে। শিক্ষকের পক্ষে এই আদিম তাড়নাগুলি পরম সহায়ক হতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি বিভিন্ন সহজাত সংস্কার বা প্রবৃত্তিকে কি করে বুদ্ধিমান শিক্ষক শিক্ষার কাজে ব্যবহার করেন।

অর্জিত আগ্রহ—Acquired Motivation—মানুষের মধ্যে আদিম তাড়নাগুলি রয়েছে তাদের থেকে পরিণত ও জটিল মানবিক বৃত্তি সবগুলিই ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রানুসারে পাওয়া যাবে এ আশা করা ভুল। ম্যাক্‌ডুগ্যাল অবশ্য সে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধে উডওয়ার্থ যে মত প্রকাশ করেছেন সেটাই সঙ্গত। তিনি বলেছেন "আমাদের এটা ধরে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং এটা ধরে নেওয়া উচিতও হবে না যে পরিণত মানুষের সমস্ত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ কয়েকটি মাত্র আদিম তাড়না থেকেই বিভিন্ন পরিবর্তন বা মিশ্রণ দ্বারা পাওয়া যেতে পারে। পরিবেশের প্রভাবে অথবা আরো ঠিক করে বললে, মানুষ তার পরিবেশকে যে ভাবে ব্যবহার করে, তার থেকে—সম্পূর্ণ নূতন আগ্রহের সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য মৌলিক তাড়নাগুলি তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকবেই কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা দ্বারা তারা নানাভাবে পরিবর্তিত হবে। আদিম প্রবৃত্তিটা একই থাকছে কিন্তু শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যবহারের প্রভূত পরিবর্তন ঘটছে।"১০

আদিম তাড়নাকে মানুষ তার সচেতন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে কাজে লাগায় তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্, ৺সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'

৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বলাকা
১০ Woodworth—Psychology—P. 383

থেকে। খাদ্যান্বেষণ মানুষের একটা আদিম জৈব তাড়না। আমাদের চণ্ডীদাসের খুড়ো এ তাড়নাকে কাজে লাগালেন—কষে' দৌড় পাড়াবার উদ্দেশ্যে—

"সেই খুড়ো আজ কল ক'রেছেন আপন বুদ্ধি বলে,
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘণ্টায় চ'লে।
দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘণ্টা পাঁচেক ঘাঁটলে পরে আপনি যাবে বোঝা,
বলব কি আর কলের ফিকির, বলতে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে একেবারে খাসা।
সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যে রকম রুচি—
মণ্ডা মিঠাই চপ্ কাট্‌লেট খাজা কিংবা লুচি।
মন বলে তার 'খাব, খাব,' মুখ চলে তার খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে।
এমনি ক'রে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে
উৎসাহেতে হুঁস্ রবে না চলবে কেবল খেয়ে।
হেসে খেলে দু দশ যোজন চলবে বিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হ'য়ে জিভের জলে ভেসে।
সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো,
অতুল কীর্তি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।" ১১

এ অতুল কীর্তি শুধু চণ্ডীদাসের খুড়োর নয়, সমগ্র মানব জাতের।

মানুষের মধ্যে শুধু আদিম জৈব তাড়না নয়, তার মধ্যে থাকে উন্নততর, অভিজ্ঞতাপুষ্ট, অর্জিত আগ্রহ (Acquired motives)। আদিম জৈব আগ্রহ প্রাণীর সাধারণ ধর্ম, কিন্তু অর্জিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন। এরা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। রুস্ তাই বলেছেন "সাধারণ সুস্থ মানুষের ব্যবহারের ধারা কেবলমাত্র জৈব তাড়না (যথা সংগ্রাম, নিরাপত্তা, আকাঙ্খা, ঘৃণা, ঔৎসুক্য ইত্যাদি) দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। তার ব্যবহারের পিছনে জৈব তাড়নার ভিত্তিতে গঠিত জটিলতর আগ্রহ থাকে যা তার পরিবেশের প্রভাব দ্বারা নিয়মিত। আদিম তাড়নাগুলি সমস্ত মনুষ্যত্বের সাধারণ ধর্ম, কিন্তু অর্জিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব এবং তারা প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার জটিল

১১ সুকুমার রায়—আবোল তাবোল পৃঃ ৮

ঐক্যের দ্বারা সংবদ্ধ।[১২] এই অর্জিত আগ্রহ (earned motives) গুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।]

এই অর্জিত আগ্রহগুলি সচেতন ও ক্ষণস্থায়ী নয়। এরা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের স্থায়ী অচেতন মূল যার দ্বারা তার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম নিয়মিত হয়। এগুলিকে বলতে পারি ব্যক্তির স্থায়ী কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গী (attitudes), ঔৎসুক্য (interests) ও আদর্শ (purposes)।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সুনন্দার সখ (hobby) হচ্ছে বাগানের। এ সখের জন্তে সে জমানো পয়সা চা বা সিনেমায় খরচ করে না। সে রথের মেলায় কেওড়াতলার মোড়ে, শেয়ালদার মোড়ে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন ফুলের গাছ সংগ্রহ করে। যাদের এ সখ আছে তাদের সঙ্গে নানা ফুলের গাছ সম্বন্ধে আলোচনা করে। তাদের সঙ্গে তার বিষম প্রতিযোগিতা। একবেলা খাওয়া না হলে তার তেমন দুঃখ নেই, কিন্তু তার একটি গাছ যদি কেউ নষ্ট করে তা হ'লে তাকে সে আস্ত রাখে না। অর্থাৎ এ সখ তার জীবনের অনেকগুলি, কর্ম, সুখ, দুঃখের কেন্দ্র। এ সখ আদিম জৈব প্রেরণা নয়। এটা অর্জিত অভিজ্ঞতা লব্ধ। এটা ক্ষণিক একটা উত্তেজনা নয়। এটা তার বহু অভিজ্ঞতা অনুভূতির ফল। এটা তার জীবনের একটা স্থায়ী শক্তি ও অনুভূতির উৎস। প্রতি মুহূর্তেই সে কিন্তু বাগান ও ফুলগাছের কথা ভাবছে না। কিন্তু তার ফুলগাছের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু তার প্রতি গভীর আকর্ষণ আছে! এতে তার জীবন দর্শন বা রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। এ পুষ্পময় জগৎটি তার নিজস্ব সৃষ্টি।

এই যে অনুভূতির অবচেতন স্থায়ী উৎস এদের আমরা বলেছি ভাব (Sentiments)। এই ভাবের উদ্দেশ্যে বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির আদিম সুখ দুঃখের অনুভূতি জড়িত। রস বলছেন—"ভাব (Sentiment) যেন সৌরজগৎ—সেই ভাবের উদ্দেশ্য বস্তু—(end—object) হচ্ছে কেন্দ্রস্থ সূর্য, তার চতুর্দিকে বেষ্টন ক'রে আদিম জৈব আগ্রহগুলি আবর্তিত হচ্ছে।[১৩] এই ভাবের উৎপত্তি নিম্ন প্রাণীজগতে সম্ভব নয়। পরিণত মানবিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বলেই শুধু এর উৎপত্তি সম্ভব। কাজেই রস ঠিকই বলছেন, "পরিণত ভাব কেবলমাত্র মানুষের

12 J. S. Ross—Basic Psychology
13 J. S. Ross—Basic Psychology—P. 49

মধ্যেই সম্ভব।"[১৪] আমরা যাকে বলি মানুষের অনুরাগ, বিরাগ, (loves and hates) তার স্থায়ী ঔৎসুক্য (interests), অভ্যাস ও রুচির সবই হচ্ছে অর্জিত কর্মপ্রেরণা (Acquired Motives)। যা আমাদের এই স্থায়ী প্রেরণার উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তা আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করে না। আগ্রহ হচ্ছে মনোজগতের হেতু—তা প্রসুপ্ত মনোযোগকে আকর্ষণ করে—আর যেখানে মনোযোগ ঘটেছে সেখানে আগ্রহ কর্মের দিকে ধাবিত হোল। তাই ম্যাকডুগ্যাল বললেন, "Interest is latent attention and attention is interest in action."

কবি গাইলেন, 'আনমনা গো, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনবো না।

কিন্তু শিক্ষককে তো একথা বললে চলবে না। তাকে তো জানাতে হবে আনমনারও মন পাওয়ার মন্ত্র। তাকে পেতে হবে ঘুমন্ত মন-রাজকন্যার ঘুম ভাঙাবার সোনার কাঠি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রথম সোপান হচ্ছে মনোযোগ আকর্ষণ করা। আর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হ'লে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। আর আগ্রহ সৃষ্টি করতে গেলে আদিম জৈব তাড়না ব্যক্তির প্রবলতম ভাব বা অহংকারকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে (মনোযোগ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটি জেনেছিলেন তাই 'ছেলেটা' কবিতায় লিখলেন,

"অম্বিকে মাষ্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল,
শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি ক'রে কেটে-রেখে দেয়,—
বলে 'ইঁদুরে কেটেছে'
এতোবড়ো বাঁদর।"
আমি বললুম, "সে ত্রুটি আমারই।
থাকত ওর নিজের জগতের কবি,
তাহ'লে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হ'ত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।

14 J. S. Ross—Basic Psychology—P. 149

কোনদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে—
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডী ?"[১৫]

মানুষের মূল আগ্রহগুলি কি ? সেগুলি জানলে তবে তো তোমার মন পাওয়া যাবে, তবে তো তোমার কাছে কাজ পাওয়া যাবে ? এ প্রশ্ন আলোচনা করেছেন অনেক সাহিত্যিক, অনেক বিজ্ঞানী। ডেল্ কার্ণেগী একজন জনপ্রিয় লেখক। তাঁর একখানা বই আছে—বইখানার যথেষ্ট কাট্‌তি। তাতে তিনি এ প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন। "তুমি কি চাও ? হয়তো বেশী অনেক কিছু নয়, কিন্তু সামান্য যা কিছু তুমি চাও তা তুমি চাওই আর তা না হলে তোমার চলে না। প্রায় প্রত্যেক সুস্থ বয়স্ক মানুষই চায়,

(১) স্বাস্থ্য ও জীবনের পরিপোষণ
(২) খাদ্য
(৩) নিদ্রা
(৪) অর্থ এবং অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যাদি।
(৫) পরলোকে শান্তি
(৬) কামাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি
(৭) সন্তানদের কল্যাণ
(৮) নিজের মূল্যের স্বীকৃতি [১৬]

এ তালিকাটি সকলের মনঃপুত না হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই কয়েকটি প্রধান আগ্রহ বা দাবী থাকে সন্দেহ নেই। সকলের কাছে সব আগ্রহ সমান দামী নয়। এখানেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। এ দাবিগুলি অধিকাংশ মানুষের জীবনেই বিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া করে, এবং দাবিগুলির পরস্পরের মধ্যে খুব একটা গভীর ঐক্যের বন্ধন নাও থাকতে পারে। যে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন আগ্রহগুলি একটি বৃহৎ কেন্দ্র ও আদর্শের দ্বারা সংহত ও সজীব সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তত প্রকট। তাঁদের আমরা বলি মহাপুরুষ। তাঁরা তাঁদের বিচ্ছিন্ন ও ক্ষণিক প্রবৃত্তি দ্বারা বাত্যাতাড়িত হাল-মাস্তুলহীন নৌকার মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে চালিত হন না। অল্প কয়টি বৃহৎ ও দৃঢ় আদর্শ তাদের জীবনকে ঐক্য ও সুষমা মণ্ডিত করে তোলে। যেমন গান্ধীজীর সমগ্র জীবন সত্য ও অহিংসার আদর্শ দ্বারা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই তাঁকে বোঝা সহজ। এ জীবন সাধারণ মানুষের জীবনের মত বহুবিভক্ত ও স্বতঃবিরোধ দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়।

15 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ক্যামেলিয়া

16 Dale Carnegie—How to Win Friends and Influence People

আমরা সবাই জীবনকে এমনভাবে একটি বৃহৎ কেন্দ্রে সংহত করি না। তথাপি প্রত্যেক মানুষেরই সমস্ত আগ্রহের একটি কেন্দ্র আছে। সে হচ্ছে আত্মতৃপ্তি। সাংখ্য দর্শনের ভাষায় বলতে পারি অহংকার। আমাদের আগ্রহগুলোর নিজস্ব কোন দাম নেই, কোন শক্তি নেই, যদি না তারা 'অহং' এর সমর্থন না পায়। পুরানো অভিজ্ঞতাবাদীরা ভাবতেন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাগুলো স্বাধীন শক্তি, তারা ব্যক্তিকে চালায়। যেখানে বিপরীত দুটো আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়, সেখানে প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা জয়ী হয়ে ব্যক্তিকে চালনা করে, এটা নিতান্ত ভুল কথা। 'অহং, কোন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে বলেই তার জোর। আপাতদৃষ্টিতে যেটা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা সেটা দ্বারাই ব্যক্তি চালিত হয় না। অনেক সময় দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে যেটা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তি তার বিরুদ্ধেই বরং কাজ করছে। তার কারণ 'অহং' নিজেকে সংযুক্ত করেছে দুর্বল আকাঙ্ক্ষার সংগে। তাতেই দুর্বল আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে জয়ী হোল। বাস্তবিক পক্ষে আকাঙ্ক্ষা প্রবল বা দুর্বল হয় অহংএর সমর্থনে বা অসমর্থনের ফলে। তাই দেখা যায় জৈব আদিম তাড়নার থেকে সভ্য মানুষের কাছে উচ্চতর সামাজিক অবস্থার মূল্য বেশী।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তোমার "প্রাণের বন্ধু" অমিতার বিয়েতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। ভালো খাওয়াদাওয়া হবে, তাই তুমি না খেয়েই গেছ; বেশ ক্ষুধার্ত। চমৎকার রান্নার সুঘ্রাণ আসছে। কিন্তু অপরিচিত আত্মীয় স্বজনে বাড়ি ভর্তি। অমিতার মা বোন তাঁরা সব বড়লোক আত্মীয় বা বান্ধবীদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। তোমাকে কেউ বসতে বললো না। অমিতাকে যেখানে সাজাচ্ছে সেখানে গিয়ে তুমি অমিতার চুলটা বেঁধে দিচ্ছ হঠাৎ আর একজন স্নোরোটার বন্ধু এসে বল্লো—"একি হচ্ছে বিশ্রী চুল বাঁধা। সরুন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।" অমিতাও বাধা দিলো না। নতুন বিলাতী ছাঁদে চুল বাঁধা হোল। তুমি বিষম রেগে না খেয়েই চলে এলে। বাড়ীতে এসেও লজ্জায় বল্লেনা, না খেয়ে এসেছো। সে রাত উপবাসেই কাটলো। এখানে জৈব তাড়না ক্ষুধার চেয়ে অনেক বেশী বড় তোমার অভিমান। অমিতার বাড়ী খেলে না, সেখানেও কারণ হোল তোমার অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। নিজ বাড়ী এসে নিজের অপমানের কথা বললে না। কারণ সেখানেও রয়েছে প্রচণ্ড অহমিকা।

এ কথাটা শিক্ষকের খুব ভালো করে জানা চাই। ছাত্রকে উৎসাহী করে

তুলতে গেলে, তার অহংবোধকে কাজে লাগাতে হবে। এর একটা মস্ত উপায় প্রশংসা। তার উদ্যমের এটা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তার অহংবুদ্ধি এতে তৃপ্তি পায়। শাস্তি দিয়ে, লজ্জা দিয়েও হয়তো তার আহত পৌরুষকে উন্নত করে তোলা যেতে পারে; কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। তাই বর্তমান শিক্ষানীতিতে শাসনের চেয়ে প্রশংসার দাম বেশী। উইলিয়াম জেমস্ ঠিকই বলেছেন "মানুষের প্রকৃতিতে সকলের থেকে বড় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অন্যে আমার গুণের আদর করুক—The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated—এই কথাটা ডিউইও প্রায় এক ভাবেই বলেছেন, "মনুষ্য প্রবৃত্তির গভীরতম দাবী হচ্ছে এই ইচ্ছা যে আমি বড় হবো—the deepest urge in human nature is the desire to be important—। এটা খুব সাধারণ কথা, কিন্তু খুব মূল্যবান কথা। একথাটি যদি আমরা অন্যের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় স্মরণ রাখতাম, তা হলে সংসারে অনেকখানি সুখ বাড়তো অনেকখানি বেশী কাজ পাওয়া যেতো। সংসারে স্বামী স্ত্রীর কাছে চায় একটু-খানি স্বীকৃতি, যে তার দাম আছে। বুদ্ধিমতী স্ত্রী স্বামীর এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে অনেকখানি সুবিধা আদায় করে নিয়ে থাকেন। তেমনি বুদ্ধিমান্ স্বামী স্ত্রীকে সময়ে একটুখানি প্রশংসা করলে (তার চেহারা, তার রুচি, তার বুদ্ধির) তাকে অনেক বেশী খাটিয়ে নিতে পারেন। এটা ব্যবসাদারীর মতো শোনাতে পারে, কিন্তু এটা গভীরভাবে সত্য। ভালবাসা মানেই তো পরস্পরের মূল্যের স্বীকৃতি। যখন বলি, তোমায় আমি ভালবাসি, তখন এ কথাটি জানাতে চাই, তুমি আমার কাছে দামী। এতে আমার অন্তরেরও গভীরতম তৃপ্তি কারণ তখন এ প্রত্যয় রইলো, তুমি আমারই। তাই যেখানে ভালবাসা, সেখানেই আছে শ্রেষ্ঠ উদ্যম। যেখানে নিজের মূল্য পাই, সেখানেই নিজেকে দিতে পারি সব চেয়ে বেশী। যেখানে প্রেম সেখানে জীবনের প্রসার। আর যেখানে ঘৃণা যেখানে সঙ্কোচন, সেখানে বন্ধ্যাত্ব। নীতিশিক্ষার শেষ কথা তাই, ভালবাসো, হিংসা করো না। স্যার পার্সি নান্ চমৎকার করে কথাটি বলেছেন, প্রেম হচ্ছে বিকাশ ও বিস্তারের মূলনীতি, কারণ ভালবাসার বস্তুর সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার ঐশ্বর্যকে আমরা আবিষ্কার করি, বিকশিত করি, কিন্তু ঘৃণা হচ্ছে মৃত্যু ও বন্ধ্যাত্বের নীতি কারণ এতে করে ঘৃণার বস্তুকে আমরা দূরে রাখি, তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করি।[১৭]

17 Percy Nunn—Education : its data and principles.

আত্ম-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা অর্জিত আগ্রহের মূল উৎস কিন্তু অহং তো বিচ্ছিন্ন বিন্দু নয়, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যক্তি সত্য, সেই পরিপ্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন করে তার আগ্রহের কোন মূল্য নেই। যখন ব্যক্তি আপন মূল্যের স্বীকৃতি খোঁজে সে স্বীকৃতি কার কাছে খোঁজে? সে স্বীকৃতি তার সমাজের কাছে, তার দলের কাছে, গোষ্ঠির কাছে। তাই সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের আগ্রহের আলোচনার এই সামাজিক স্বীকৃতির কথা ভুললে চলবে না। আদিম তাড়নাগুলি হচ্ছে জৈব-প্রয়োজন-সঞ্জাত (biogenetic) ও দৈহিক (physical) কিন্তু পরিণত সুস্থ মানুষের কামনা, বাসনা, আগ্রহ, সমাজের মতামত প্রশংসা অপ্রশংসা দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাই এই অর্জিত আগ্রহগুলি সমাজ-প্রয়োজন-সঞ্জাত (Sociogenetic) এবং মানসিক (Psychological)। সামাজিক জীব হিসাবে আগ্রহের উদ্দেশ্য, নিজ সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আহরণ। তার বহু কর্মের প্রেরণা এইখানে খুঁজতে হবে। সে তাই প্রতিযোগিতায় রত হয়, দশজনের আগে সে যেতে চায়। মুজাফর সেরিফ তাই বলেছেন 'আমরা দেখি মানুষ চেষ্টিত হয় নিজ গোষ্ঠির মধ্যে উঁচুস্থান অধিকার করতে, সে গোষ্ঠি যাই হোক না কেন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ সত্বেও আমরা দেখি সে চেষ্টা করে দলের মধ্যে প্রধান হতে।''[১৮]

সুস্থ পরিণতির জন্যে শিশুর জীবনে প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে নিরাপত্তা বোধ, স্নেহ, প্রীতি, প্রশংসা এবং নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্যে উৎসাহ। শিশুর এটা সামাজিক অধিকার। গোষ্ঠির দ্বারা গৃহীত হওয়ার, প্রশংসিত হওয়ার আগ্রহ কর্মোদ্যমের একটি শ্রেষ্ঠ উৎস। সি, এম, ফ্লেমিং বলছেন "মানুষের জীবনের প্রধান প্রয়োজন কি? সম্ভবতঃ প্রথম হচ্ছে নিরাপত্তা। এর জন্য প্রয়োজন শুধু আর্থিক অভাব থেকে মুক্তি নয়, গোষ্ঠি দ্বারা গৃহীত হওয়া (acceptance by the group), তার সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশের জন্যে দরকার সমাজের স্নেহ, স্বীকৃতি ও প্রশংসা। নিরাপত্তার পরে আসে; নূতনের ক্ষেত্রে জীবনের অগ্রসরণ; নূতন কর্মের জন্য উদ্যম, নূতন আগ্রহ সৃষ্টি, নূতন জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা। জীবনের পরিণতি ও বিকাশের বিভিন্ন স্তরেই এই বিস্তারের জন্য সুযোগদানের প্রয়োজন অনুভূত হয়।[১৯]

শিশুকালে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও অভিজ্ঞতা বিস্তারের সুযোগের

18 Muzaffar Sherif—An Outline of Social Psychology.
19 C. M. Fleming—The Social Psychology of Education

অভাব অনেক সময় ভবিষ্যৎ জীবনের বহু বিকৃতির জন্য দায়ী। কিশোরদের অপরাধপরায়ণতার প্রধান কারণগুলির মধ্যে এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান কালে রাশিয়াতে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তির আগ্রহকে শুধুমাত্র তার নিজস্ব উন্নতির কাজে লাগানো নয়, একটা সামাজিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ লাভের কাজে লাগানো হচ্ছে। গোড়ার থেকেই শিশু এ শিক্ষা পাবে যে বিচ্ছিন্নভাবে সে সত্য নয়; গোষ্ঠির মধ্যেই সে সত্য।

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

অধ্যাপক কায়রভ্ ১৯৪০ সালে কম্যুনিষ্ট শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে লিখেছেন "কম্যুনিষ্ট শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সর্বাত্মক বিকাশ। এই সর্বাত্মক বিকাশের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, দৈহিক পরিশ্রম, নীতি, সৌন্দর্যবোধ ও দেহচর্চা সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা।" ২০ ব্যক্তির এই আগ্রহকে সক্রিয় ও সার্থক করে তুলবার জন্যে রাশিয়া জোর দিচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর। বিয়েত্রিস্ কিং লিখেছেন "কাজেই এটাই আশা করা যায়, যে সেখানে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে সফল করে তুলবার জন্যে, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই আন্তরিক চেষ্টা হবে। এটা করা হচ্ছে সমস্ত শিশুর জন্যে শিক্ষার সমান সুযোগ দিয়ে,—এতে জাতি, ধর্ম, পিতামাতার সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা বা ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি কিছুই বিচার করা হচ্ছে না।" ২১

আমেরিকাতে ডিউই শিক্ষাকে সমাজ জীবনের অঙ্গ বলেই মনে করেছেন। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের আগ্রহকে বাস্তব সমাজ-প্রয়োজন অভিমুখী করার কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেন। পুরনো ধরণের প্রচলিত শিক্ষায় বাস্তব আগ্রহের দিক কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। এগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয় পুঁথি মাফিক ছাত্রদের মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়।

এভাবে শিক্ষায় ছাত্রদের উৎসাহ সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব, এবং তাদের শিক্ষা প্রাণহীন হ'তে বাধ্য। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে নূতন ব্যবস্থার প্রভেদ আলোচনা করে তিনি বলেছেন "উপর থেকে চাপানো শাসনের পরিবর্ত্তে এখানে

২০ Kairov—Soviet System of Education
২১ Beatrice —Russia gose to sehool

আছে ব্যক্তিত্বের চর্চা ও প্রকাশে উৎসাহ দান। স্বাভাবিক গতিচঞ্চলতা রুদ্ধ করার পরিবর্ত্তে, এখানে আছে স্বাধীন কর্মোদ্যম ; পুস্তক ও শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার পরিবর্তে এখানে আছে ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা ; প্রাণহীন অভ্যাসের দ্বারা বিচ্ছিন্ন কতকগুলি তথ্য বা কৌশল আয়ত্ত করার পরিবর্তে আছে, এমন সংহত ও জীবন্ত উদ্দেশ্য সাধন যাতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক আগ্রহ কাজে লাগবে ; একটা দূর ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুতির পরিবর্তে, বর্তমান অবস্থার সুষ্ঠু সুযোগ গ্রহণ ; কতগুলি অনড়, অচল, অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিবর্ত্তে আছে সদা-পরিবর্ত্তনশীল জগত ও অবস্থার সঙ্গে প্রাণপূর্ণ পরিচিতি। ২২

আমাদের দেশের শিক্ষার বিফলতার একটি মূল কারণ হচ্ছে, এ শিক্ষা সামাজিক জীবন ও ব্যক্তির স্বাভাবিক আগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এ শিক্ষা নিতান্তই পুঁথিগত-অ্যাবস্ট্রাক্ট্। একথা রবীন্দ্রনাথও খুব ভাল করে বুঝে ছিলেন। তাই তাঁর শান্তিনিকেতনে তিনি নূতন ধরণের শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ছাত্রদের আগ্রহ, রুচি, ও স্বাধীনতা ব্যবহারের বৃহৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে শিক্ষাকে সফল ও আনন্দময় করতে তিনি চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন "দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল সেটি হচ্ছে, এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে, এক সুরে, সেটা ক্লাস নাম-ধারী খাঁচার জিনিষ হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃত প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষা-বিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ, আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার।" ২৩ শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হবে সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি কৌতুহল ও শ্রদ্ধা এবং সমাজও দেশের উন্নয়নে আগ্রহ-সৃষ্টি, এটাও তিনি বুঝেছিলেন।

ব্যক্তির আগ্রহকে সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে কার্য্যকরী করে তুলতে গেলে, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দুইই প্রয়োজন আছে। প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পৌরুষ জাগ্রত হয়, আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে আর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কর্ত্তব্য ও সেবা-বুদ্ধি জাগ্রত হয়, সংগঠন উৎসাহ বাড়ে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুইটিরই প্রয়োজন আছে। আমেরিকাই শিক্ষা-ব্যবস্থায়

২২ John Dewey—Experience and Education

প্রতিযোগিতার দ্বারা ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধনের উপর বেশী জোর, আর রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। সুশিক্ষক জানেন, ছাত্রের আগ্রহকে এই দুই পথেই চালনা করে এক সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান কর্তে হবে।

যেখানে আগ্রহ তার বিষয় লাভে সমর্থ হয় সেখানে আসে তৃপ্তি। এটা মানসিক সুস্থতার পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু কঠিন প্রতিযোগিতা-পূর্ণ বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের বহু আগ্রহ পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয় না। সুস্থ সাধারণ মানুষ জানে, যে আমাদের "সাধ ছিল যত, সাধ্য ছিল না"—এই পৃথিবীর নিয়ম। তাই এ ক্ষোভ যথাসম্ভব সহজভাবেই সে নিতে চেষ্টা করে। কখনো বা আগ্রহকে সে স্তিমিত করে দুধের সাধ ঘোলে মেটায় (substitution)। মানুষের অভিমান যেখানে আহত হয়, সেখানে সে উপায় খোঁজে, সে আঘাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে। এর সুফল কুফল দুইই আছে। যে ছেলে লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পেলো না, সে হয় তো ভাল খেলোয়াড় হিসাবেই নাম কিনলো; তার আগ্রহকে সে স্থানান্তরিত করলো। এ একধরণের ক্ষতি-পূরণ (compensation)। তার মন বললো "নাকের বদলে নরুন পেলুম, টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্।" কিন্তু এমনও হতে পারে যে পত্রিকার সম্পাদক তার লেখা ফেরত পাঠিয়েছেন। সে তার শোধ তুলল, ছোট ভাইর অঙ্কের খাতা ছিঁড়ে ফেলে—যেহেতু সে অঙ্ক ভুল করেছে; অথবা সম্পাদকরা নিতান্তই পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট, এ রকম কুৎসা রটনা করে। যেখানে কোন ছেলে বা মেয়ের স্বাভাবিক বহু আগ্রহ পরিতৃপ্তি হওয়ার পথে বাধা আছে তার নিজ অক্ষমতার মধ্যে অথবা সমাজের অসাম্যকর ব্যবস্থার জন্যে, সেখানে তার মনে হতাশার (frustration) সৃষ্টি হয়। পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের গ্লানি তাকে তিক্ত করে তোলে, এবং তা গঠনাত্মক পথে চালিত না হয়ে সমাজ-বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজে নিরুদ্ধ শক্তির মুক্তি খোঁজে। কলকাতায় ট্রাম-বাস পোড়ানো আর পাকিস্তানে নানা হাঙ্গামায় ছেলের দল বারে বারে লিপ্ত হচ্ছে এটা সমাজের পক্ষে বিষম কুলক্ষণ। যেখানে দেখা যায় শিক্ষকেরা পর্যন্ত পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন হয়েছে এই অজুহাতে, জবরদস্তি করে, পরীক্ষা বন্ধ করতে উদ্যত, সেখানে বুঝতে হবে দেশের যুব সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক আগ্রহ সুস্থ স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ পাচ্ছে না। এবং এ রোগ বিস্তার লাভ করছে যুবকদের যাঁরা গড়ে তুলবেন তাঁদের মধ্যে। শুধু শাস্তি দিয়ে, নিন্দা করে, এ রোগের চিকিৎসা হবে না। দেশের শিক্ষাবিদ্ ও সরকারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে

দেশের যুবকদের স্বাভাবিক আগ্রহের সুষ্ঠু পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে যাতে তাদের উচ্ছৃঙ্খল আগ্রহ কল্যাণ উদ্দেশে কেন্দ্রীভূত হতে পারে।

আমাদের অভিমান প্রচণ্ড। তাই হার মানতে আর পরাজয় স্বীকার করতে নিজের কাছেই লজ্জা পাই। তাই যেখানে আমাদের আগ্রহের সফল পরিণতি ঘটল না, সেখানে নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যে উপায় খুঁজি। একে ইংরেজীতে বলে (defense mechanism)। এর দ্বারা বাস্তব জীবনের পরাজয়ের দুঃখ ভুলি। কল্পনার রাজ্যে (daydream) এই পলায়নীবৃত্তি (escapism) বাস্তব পরাজয়কে অস্বীকার করবার একটা পথ। কখনো বা নিজের পরাজয়ের নানা ছলছুতা আবিষ্কার করে পরকে দোষী করি (Projection)। কখনো বলি, আঙুর ফল টক্ (Sour-grape mechanism)। আগ্রহ ছিল, আই, এ, এস্, ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, বিয়ে হোল ডাক্তারের সঙ্গে, এই সাফাই গাইলে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটি এরা তো চাকর। এ সব দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন লোককে তুমি আন্তরিকভাবে অশ্রদ্ধা কর; ডাক্তার স্বাধীন ব্যবসায়ী, দেশহিতে ব্রতী, এমন বিয়েই তুমি চেয়েছিলে (Sweetpear mechanism)। অথবা চোরের উপর রাগ করে, মাটিতে ভাত খেলে; এতে করে চোর যে ক্ষতিটা করেছে, সেটাকে তুমি যেন অস্বীকার করলে। গভীর কোন আগ্রহ যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়, অথবা যখন তাকে অবদমন করতে বাধ্য হও, তখন নানা মানসিক বিকারের সৃষ্টি হতে পারে, সে কথা 'অবচেতন মন ও মনঃসমীক্ষন' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এ বিকারের একটা ফল হতে পারে, আগ্রহের যে বস্তু তোমার আয়ত্ত হোল না, তার প্রতি একটা অহেতুক ভয় বা তীব্র ঘৃণার সঞ্চার। বি-সম বিকাশের ক্ষেত্রে হয়তো সে ঘটনার স্মৃতি লোপ ঘটবে।

শিক্ষকের পক্ষে তাই সমস্যা, শুধু ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি নয় আগ্রহের স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি, এবং বিচ্ছিন্ন আগ্রহকে কল্যাণকর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রী-করণ। জৈব আদিম আগ্রহকে সংযত করার প্রয়োজন আছে। তার জন্যে দরকার বিচার বুদ্ধির বিকাশ সেই জন্যেই উপদেশ, হঠকারী হয়ে প্রবল ইন্দ্রিয় গ্রামের ক্ষণিক আগ্রহের বশবর্তী না হয়ে, কিছুকালের জন্য কর্ম স্থগিত রাখা (Postponement of action)। শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে সুষ্ঠু, সংহত, শান্ত, অথচ উৎসাহশীল ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ সুখ ও বৃহত্তম কর্মক্ষমতা তখনই আসতে পারে যখন ব্যক্তি আত্মদ্বন্দ্বে দুর্বল নয়, যখন তার অসংযমী ইচ্ছা আকাঙ্খার দ্বারা সে বহুধাবিভক্ত নয়। ফ্রয়েডও তাই বলেছেন মানসিক বিকারের চিকিৎসা তখনই সফল হবে, যখন ব্যক্তি তার

বিচ্ছিন্ন কামনাগুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাদের মীমাংসা ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারবে। ভারতীয় দর্শনে এই আত্ম-সংহতিকে বলা হয় যোগ। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা বলেছে না, এই যোগ হচ্ছে 'কর্মসু কৌশলম্'। এই কৌশলটি জানতে হবে। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে কঠিন আর সকলের চেয়ে দরকারী কাজ সুস্থ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি। সে কঠিন কাজটির ভার আছে শিক্ষকের উপর।

একবিংশ অধ্যায়

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য

Individual Differences and Tests for measuring them

একটা শুভঙ্করের ফাঁকি। একই সময় দুটো বিপরীত গুণ, একই বিষয় সম্বন্ধে সত্য হ'তে পারে কি? সাধারণ বুদ্ধি এবং যুক্তিগত বিচার বলবে, এটা অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে,

মানুষে মানুষে গভীর মিল আছে

আর

মানুষে মানুষে বিষম অমিল আছে

এ দুটো কথাই সমান সত্য। মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী, মানুষে মানুষে মিলের সূত্রগুলি (uniformities) আবিষ্কারে ব্যস্ত। আবার তাঁরাই একথাটাও মানেন, যে মানুষ কলে ঢালাই করা পুতুল নয়,—প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের থেকে আলাদা। নূতন শিক্ষাবিদ্ মানুষে মানুষে প্রভেদটাকে উপেক্ষা করেন না। তিনি একথা জানেন, যে প্রত্যেক ছাত্রের বুদ্ধি, ক্ষমতা, রুচির মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে, এবং শিক্ষায় সুফল পেতে হলে, এই ব্যক্তিগত পার্থক্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে, এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। মনীষা অংকে কাঁচা, কিন্তু চিত্রাংকনে পটু; শেফালী আবার ছবি আঁকতে দিলে কাঁদতে বসে, কিন্তু অংক কষতে ওর উৎসাহ অপরিসীম। এ রকম, যে কোন গুণ সম্বন্ধেই দেখি, ভাল, মন্দ, মাঝারী। আবার দেখি, বয়সে বয়সে তফাৎ, যথা—

"জোয়ানে জোয়ানে কথা
কথায় কথায় হাস,
আর বুড়ায় বুড়ায় কথা
কথায় কথায় কাশ।"

বয়সের সঙ্গে শক্তি বাড়ে, কমে, রুচির প্রভেদ হয়। স্ত্রী পুরুষে ভেদ, দেশে দেশে ভেদ, সামাজিক নানা স্তরে ভেদ। একখানে যেটা মানায়, অন্যত্র সেটা নিন্দনীয়, যেমন—

"লেড়কাকা ভালা বোল্না চাল্না,
বহুড়ীকা ভালা চুপ্।

ভেক্‌কা ভালা বর্ষা বাদল
অজ্‌কা ভালা ধূপ ॥”

মানে ‘বোলচালটা’ মানায় ছেলে-ছোক্‌রাদের, কিন্তু বৌ-ঝিদের পক্ষে শোভন ব্যবহার হচ্ছে মৌনতা; ভেকের পক্ষে বর্ষার জলই ভাল, কিন্তু ছাগলের পক্ষে দরকার, প্রখর রৌদ্র। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে মানুষের সমষ্টিগত ভেদ-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল ও গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-পাকিস্তান বিচ্ছেদের মূলে আছে, হিন্দু আর মুসলমানের বিভিন্নতা সম্বন্ধে অতি-সচেতনতা। আর বর্তমানে সর্বগ্রাসী সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে, শ্রেণীসংগ্রাম। কাজেই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে মানুষে মানুষে প্রভেদের প্রশ্নটার সঙ্গে বহু গুরুতর সমস্যা জড়িত।

কিন্তু ভাসা ভাসা ভাবে মানুষের প্রভেদের কথাটা জানা এবং মানা যথেষ্ট নয়। মানুষের এই প্রভেদের প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা দরকার।

মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে, তা প্রাচীনকাল থেকেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্লেটো, আরিষ্টটল, রুশো—এ প্রভেদ স্বীকার করেছেন। প্লেটো মানুষকে তাদের মৌলিক বিভিন্নতা অনুযায়ী কয়েকটি দলে (type) ভাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে, গ্যালটন্‌। পূর্বেই বলা হয়েছে গ্যালটন্‌ বংশানুক্রমের প্রভাবে গভীর ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় ছিল বংশানুক্রম অনুযায়ী মানুষে মানুষে, পরিবারে পরিবারে, এবং জাতিতে জাতিতে যে প্রভেদ, তা নির্ধারণ। এ ক্ষেত্রে আর একজন প্রধান বিজ্ঞানী হচ্ছেন ক্যাটেল্‌। তিনি স্মৃতিশক্তি, ইন্দ্রিয়ের বোধের তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের প্রভেদ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। আলফ্রেড্‌ বিনের বুদ্ধির মাপের কথা আমরা আগেই বলেছি। এখানেও দেখি বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষে মানুষে কতটা প্রভেদ তা নিয়েই অনুসন্ধান।

প্রাচীনেরা মানুষের মধ্যে পার্থক্য তিনটি ভাগে সাধারণতঃ ভাগ করেছেন,—(ক) **দৈহিক** (খ) **মানসিক** ও (গ) **নৈতিক**। গেটস্‌ আরো বিস্তৃততর ভাবে বিভেদগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন।

(১) **দৈহিক গঠন** (Physical traits)—যেমন উচ্চতা, ওজন, বাঁধুনী, চেহারা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

(২) **মানসিক গঠন** (Mental traits) যথা—বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা, কল্পনার ক্ষমতা ইত্যাদি।

(৩) **বিশেষ বিষয়ে সামর্থ্য** (Special abilities) যথা,—সঙ্গীত, সাহিত্য, কলকব্জা চালানো ইত্যাদি।

(৪) **অনুশীলন দ্বারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কুশলতা** (Acquired interest, knowledge and technical skill).

(৫) **ভাবাবেগ বিষয়ে পার্থক্য** (Temperament) যথা—"কেউ বা শান্ত, কেউ বা চপল।"

(৬) **ইচ্ছাশক্তির পার্থক্য** (Volition) যথা—ধৈর্য, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি।

(৭) **নৈতিক চরিত্র** (Character) যথা—দয়া, ঔদার্য, স্বার্থপরতা ইত্যাদি। ১

টাইপ অনুযায়ী মানুষের ভাগ (The notion of types)—সাধারণ মানুষের ধারণা,—কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ অনুযায়ী মানুষকে কতগুলি বিভিন্ন টাইপ্-এ ভাগ করা যায়,—যেমন আমরা বলি, রাগী মানুষ, শান্ত মানুষ। টাইপ্ হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে কোন একটা, বা কতগুলি নির্দিষ্ট গুণ অত্যন্ত প্রকট। সাহিত্যে এমন টাইপ্ চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত,—যেমন ডন্ কুইক্‌সোট্, মিসেস্ গ্রাণ্ডি, সার্লক্ হোমস্, রবীন্দ্রনাট্যে 'ঠাকুরদা,' ইত্যাদি। অনেক বিজ্ঞানীও মানুষকে এ সকম বিপরীত টাইপ্এ ভাগ করেছেন,—যেমন সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। য়ুঙ্গ মানুষকে ভাগ করেছেন, ইন্‌ট্রোভার্ট (Introvert) আর একস্‌ট্রোভার্ট)Extrovert) এই দুই দলে। ইনট্রোভার্ট-রা হচ্ছেন অন্তর্মুখী, চিন্তা ও অনুভূতিপ্রবণ, অভিমানী, আত্মকেন্দ্রিক, স্বপ্নালু, কর্মবিমুখ; আর একস্‌ট্রোভার্ট-রা হচ্ছেন বহির্মুখী, কর্মিষ্ঠ, মিশুক, কাজের লোক। নীট্‌সে (Nietzsche) মানুষদের ভাগ করেছেন, প্রভুজাতীয়, আর দাসজাতীয়, এ দুই শ্রেণীতে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কেউ মানুষকে ভাগ করেছেন সাব্‌জেক্‌টিভ্ আর অব্‌জেক্‌টিভ্ টাইপে, থিয়োরেটিক্যাল, আর প্র্যাকটিক্যাল টাইপে; আর কেউ পিকনিক্‌স, এস্‌থেনিক্‌স, এ্যাথলেটিক্ ও ডিস্‌প্ল্যাসষ্টিক্ টাইপে। এভাবে মানুষকে ভাগ করলে মনে হয়, এই টাইপ-গুলোকে কেন্দ্র করে মানুষেরা ছড়িয়ে আছে,—আর দুই টাইপ এর মাঝে মাঝে থেকে যাচ্ছে ফাঁক। তাহ'লে একটা ছড়িয়ে থাকার ছক্ (distribution curve) আঁকলে দেখা যাবে, যে বক্র রেখার দুটো শীর্ষ (modes) রয়েছে দুই টাইপের জায়গায়, আর মাঝখানটায় বক্ররেখাটা নাচু হ'য়ে যাচ্ছে।

১ Gates—Psychology for Students of Education.

তা হ'লে হোল, দ্বিশীর্ষ বক্ররেখা (bimodal cruve), আর যদি দুই এর বেশী টাইপ স্বীকার করা হয় তবে শীর্ষও হবে দুই-এর বেশী, তা হ'লে পাব বহুশীর্ষ বক্ররেখা (multimodal curve)। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যায়, এ ভাবে মানুষেরা কোন গুণ (বা দোষ) সম্বন্ধেই ছড়িয়ে নেই। যে কোন গুণ ধরলেই দেখা যায় সেইগুণের বেশী কম অনুসারে মানুষেরা ছড়িয়ে আছে, সর্বত্র। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় আছে, যারা মাঝারী, আর ক্রমে ক্রমে কমে, ভালর দলও যেমন কম, তেমনি ক্রমে ক্রমে কমে, মন্দের দলও কম। মাঝে কোথাও কোন ফাঁক নেই, অর্থাৎ ছড়িয়ে থাকার বক্র-রেখাটা ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে মাঝারীর (Average) কাছে, আবার ধীরে ধীরে একটানা ভাবেই প্রায় নেমে গেছে। কাজেই যদি টাইপ স্বীকার করতে হয় তবে একটি মাত্র টাইপ আছে, সে হচ্ছে মাঝারী, বা Average।[২] অবশ্য কয়েকজন ব্যক্তি থাকতে পারে, যাদের মধ্যে কোন একটা গুণ অত্যন্ত প্রকট, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে দুই বা দুই এর অধিক বিপরীত গুণের মিশ্রণ, একথাটা বুদ্ধির বেলায় আমরা দেখেছি।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের কারণ কি (Causes of individual differences)—এ নিয়ে অনুসন্ধান চলেছে। থর্ণডাইক কতকগুলি সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করেছেন—

(১) সুদূর বংশগত (অথবা জাতিগত) পার্থক্য—Racial differences.

(২) নিকট বংশগত (অথবা পরিবারগত) পার্থক্য—Family differences.

(৩) লিঙ্গগত প্রভেদ—Sex differences.

(৪) পরিবেশগত প্রভেদ ও ব্যক্তির পারণতি বা maturity বিষয়ে প্রভেদ—Environmental difference.

✓ (১) **জাতিগত প্রভেদ**—জাতি বা race এর সংজ্ঞা নিয়ে বহু মতভেদ আছে,—তথাপি নৃতত্ত্ববিদ্‌রা মানুষদের মাথায় খুলির গড়ন, কঙ্কালের গড়ন, চোখের রং, গায়ের রং, চুলের বিভিন্নতা অনুযায়ী ইয়োরোপীয়ান্, নর্ডিক, আলপাইন্, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী জাতি, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ানস্ (Europern, Nordic, Alpine, Mediterranean groups, Negro, Mongolians)-এ রকম সব নানা দলে ভাগ করেছেন। ফ্রীম্যান গায়ের রং দিয়ে সোজা ভাগ করেছেন—সাদা, হলদে, কালো, বাদামী ও লাল এই কয় দলে। বলাই বাহুল্য, এই প্রত্যেক দলের অন্তর্গত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এখন

২ Freeman—Individual Differences.

এই জাতি হিসাবে মানুষে মানুষে পার্থক্য অনুসারে বুদ্ধি বা অন্ত কোনো মূল্যবান গুণেও কি পার্থক্য দেখা যায় ? এ নিয়ে আমেরিকাতে কিছু কিছু অনুসন্ধান চলেছে—কারণ সেখানে বহু জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, আর কালো নিগ্রো আর লাল নর্থ আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ান্ ওদের জাতীয় জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমস্ত পরীক্ষার ফলে মোটামুটি একথা বলা যায় যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধি বা অন্ত কোন গুণে পার্থক্য খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

এ রকম একটা ধারণা প্রচলিত যে অসভ্য জাতিদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রখরতর কারণ বন-জঙ্গলে সর্বদা বিপদ-পরিবৃত তাদের জীবন,--তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, তীক্ষ্ণতর হতে বাধ্য,—আত্মরক্ষার তাগিদে। কিপলিং-এর 'জাঙ্গলবুক,' 'কিম্' জাতীয় গ্রন্থে এ ধারণার পোষকতা ও প্রচার আছে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উডওয়ার্থ ৩০০ উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্ নিগ্রো ও মালয় দেশীয় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পান, যে তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি অন্যান্য জাতের তুলনায় তীক্ষ্ণতর, এমন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। সভ্য মানুষদের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যতখানি প্রভেদ, এ বিষয়ে দেখা যায়,—সভ্য মানুষ আর অসভ্য মানুষে ভেদ তার চেয়ে বেশী নয়।৩

বুদ্ধির ব্যাপারে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য নিয়েও কিছু পরীক্ষা হয়েছে। এ পরীক্ষাও আমেরিকাতে হয়েছে। দেখা গেছে প্রচলিত সবগুলি মৌখিক পরীক্ষায়ই (verbal test) নিগ্রো বা ইণ্ডিয়ান্ ছেলে-মেয়েরা সাদা সাহেবদের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় কিছুটা হীন। তাদের গড় বুদ্ধির হার (Average I.Q.) কিছু কম। কিন্তু এখানে সন্দেহ করা যেতে পারে যে পরীক্ষাগুলি সাহেবদের মাতৃভাষায় হয়েছিল,—কাজেই তা তাদের অনুকূল হয়েছিল। কারণ, দেখা যায় মৌখিক পরীক্ষায় কালো ও লালের দল হেরে গেলেও, কাজের পরীক্ষায় (Performance test) সাদাদের তুলনায় তারা নিকৃষ্ট নয়। মেয়ো (Mayo) ১৯০২ সাল থেকে নিউ ইয়র্ক হাইস্কুলগুলিতে ভর্তি হয়েছে এমন ১৫০ জন নিগ্রোর পরবর্ত্তী কালে লেখাপড়ায় উন্নতির সংবাদ (academic rccords) সংগ্রহ করেন। সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে সেই স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং অনুরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন, ১৫০ জন সাদা সাহেব ছেলের সংবাদও তিনি সংগ্রহ করেন। তাদের তুলনা করে দেখা গেল দু দলেরই উন্নতি (achievements) প্রায় সমান, যদিই কোন প্রভেদ সাদায় কালায় থাকে তা জন্মগত, এমন না হতেও পারে।

৩ Quoted by—Thorndike—Educational Psychology (Briefer course).

তাদের শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি হ'লে তাদের বুদ্ধির মানেরও উন্নতি ঘটে, এটা, দেখা গেছে। তাই ফ্রীম্যানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা ও কর্মশীলতার পরিমাণগত প্রভেদ আছে সত্য তবে সে প্রভেদ জাতিতে জাতিতে যতটা প্রভেদ প্রায় ততটাই।

এসব পরীক্ষার ফলে দেখা যায় জাতি বা উপজাতিত্বের ভিত্তিতে বেশী তফাৎ করা যায় না ; কারণ উপজাতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। এবং একই দল ও উপজাতির মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যতটা প্রভেদ আছে বর্তমানে উপদল বা জাতিগুলির মধ্যে তফাৎ তার চেয়ে বেশী নয়। প্রত্যেক দলেই মধ্যেই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া যায় এবং পাওয়া যাবেও। আরো এটা দেখা গেছে, শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধির মানের উন্নতি করা যায়, তার জন্মগত বুদ্ধির পরিমাণ যাই হোক্, আর সে যে জাতিরই হোক্ না কেন।[৪]

নারী ও পুরুষের প্রভেদ (Differences due to sex)—পুরুষ বহুকাল থেকেই নারীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে এসেচে। নারীরাও নিজেদের মধ্যে একত্র হয়ে, যখন আলোচনা করেন, তখন এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ একমত, যে পুরুষের মত বোকা জাত আর নেই। এ নিয়ে দু'পক্ষেই কত সরস আর কঠোর আলোচনা হয় সেটা সবাই আমরা জানি। কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য যে নারী ক্রমেই পুরুষের সমান অধিকার পেতে সুরু করেছে, আর এ দাবী ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠেছে যে বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্মকুশলতা, এর কোনটাতেই নারী পুরুষের থেকে হীন নয়,—সুযোগ সুবিধে পেলে, তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে, প্রতিযোগিতা করতে পারে।

পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন, সামাজিক পরিবেশ, জীবন যাত্রার প্রণালীতে বিস্তর প্রভেদ। তাই তারা বুদ্ধি বা অন্য গুণে মানুষের সমকক্ষ কিনা সে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান, একেবারেই সোজা নয়। গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের কাজে পুরুষ নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কারণ, তার পেশীর গঠন দৃঢ়তর—কিন্তু ধৈর্য্য ও সহনশীলতা, সম্ভবতঃ নারীদের বেশী। কতগুলি বিশেষ গুণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায় :—

(১) ভাষাগত যে সব পরীক্ষা (linguistic ability) তাতে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় যোগ্যতর (—তরা ?)

৪ **Freeman—Individual Differences, P. 150.**

(২) কিন্তু সংখ্যা ও গণনা বা হিসাবের ব্যাপারে পুরুষেরা, নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

(৩) স্মৃতিশক্তি মেয়েদের প্রখরতর।

(৪) কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষেরা অগ্রগামী।

(৫) ইন্দ্রিয়বোধের সূক্ষ্মতা, (sensory discrimination) সম্ভবত পুরুষের বেশী।

(৬) খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি, সম্ভবতঃ মেয়েদের বেশী।

বুদ্ধি নিয়েও পরীক্ষা হয়েছে। সে পরীক্ষা সাধারণ বুদ্ধি (general ntelligence) আর বিশেষ বিশেষ দিকে যোগ্যতা (special abilities) এ দুদিক থেকেই করা হয়েছে। বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের ও মেয়েদের গড় বুদ্ধির হার তুলনা করে দেখা গেছে মেয়েরাই বরং সামান্য কিছু বেশী নম্বর পাচ্ছে। নীচে পরীক্ষার ফলটা দেওয়া হোল।

বয়স	গড় বুদ্ধির হার	
	ছেলে	মেয়ে
৫	১০০	১০৪
৬	৯৯	১০৫
৭	১০১	১০৩
৮	১০০	১০২
৯	৯৮	১০২
১০	১০৩	১০৩
১১	৯৬	১০১
১২	৯৭	৯৯
১৩	৯৬	৯৭
১৪	১০০	৯৬

মনে হয়, মেয়েদের বুদ্ধি দ্রুততর পরিণতি লাভ করে, কিন্তু ছেলের বুদ্ধির পরিণতি হয় বেশী দিন ধরে। নীচের ক্লাশে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দেয়, কিন্তু কলেজ ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, মোটের উপর. ছেলেরা বেশী ভাল করে। পুরুষদের মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিও বেশী ; শয়তান, বদমাসও বেশী অর্থাৎ মাঝারী থেকে খুব বেশী তফাৎ (variation) পুরুষদের মধ্যে যতটা, মেয়েদের মধ্যে ততটা নয়।

এসব পার্থক্যের, কতটা জন্মগত, কতটা পরিবেশগত, তা নিশ্চিত করে বলার মত তথ্য, এখনও আমাদের হাতে নেই। আরো বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল সংগ্রহ করে, শেষ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। মোটের উপর বলা যায়,—নারী ও পুরুষের ভেদ বুদ্ধির ক্ষেত্রে খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ফ্রীম্যান সিদ্ধান্ত কচ্ছেন সাধারণভাবে মানুষদের বিবেচনা করে দেখা যায় যে, স্ত্রী-পুরুষের ভিন্নতার জন্যে তাদের শক্তি বুদ্ধি ইত্যাদিতে খুব উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের কোন গুণ অনুযায়ী ছড়িয়ে থাকার হার প্রায় একই, আর পুরুষে পুরুষে ও মেয়েতে মেয়েতে তফাৎও যথেষ্ট।৫

পরিবার বা বংশের প্রভাবজনিত পার্থক্য (The influence of family or inheritance)—এ নিয়ে কিছু আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি, 'বংশানুক্রম ও পরিবেশ' অধ্যায়ে। বংশানুক্রমের ক্ষেত্রে, দেহের মূল উপাদান, জীন্‌স্ নির্ধারণ করে, কেন একই পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে মিল থাকে, আর কেনই বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্যটাই শুধু জন্মগত নয়, আবার শুধুই পরিবেশগত নয়, তা আমরা দেখেছি।

শারীরিক পরিণতির বা বয়সের সঙ্গে মানসিক বিকাশের পার্থক্য (The influence of maturity or age on mental growth)—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, দেহের বিভিন্ন অংশের যেমন পরিণতি ঘটে,—মস্তিষ্কেরও তেমনি পরিপুষ্টি ঘটতে থাকে। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে, বুদ্ধি বাড়ারও সম্বন্ধ আছে, এটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু দৈহিক পরিণতির হার সকলের সমান নয়, মানসিক পরিণতির হারও বিভিন্ন। পরিণতির ফলে, প্রভেদটা শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতও বটে। পরিণতির একটা ফল, দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিকতর সুসংবদ্ধ হয়, মানসিক শক্তিগুলিও সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর সুসমঞ্জস হয়। তাই বয়সের তারতম্য যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের একটা প্রধান কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিণতির কতটা যে জন্মগত আর কতটা যে শিক্ষার ফল তা নির্ধারণ করা অত্যন্তই কঠিন, হয়তো বা আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায়, অসম্ভব। ব্যক্তির স্বভাব (nature), পরিবেশ ও শিক্ষার ইচ্ছা,—এ তিন বিভিন্ন প্রভাবই নির্ধারণ করে পরিণতির দ্রুততা বা মন্থরতা। বহু বৎসরব্যাপী কিছু কিছু ব্যক্তির

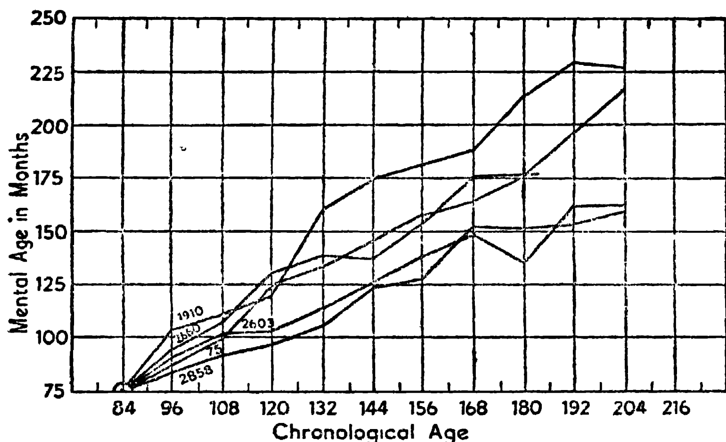
৫ Freeman—Individual Differences.

ক্রমপরিণতির ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়েচে আমেরিকায়। এসব পরীক্ষা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা যায়—

(১) নিতান্ত শিশুকাল থেকেই দেখা যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ,—তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিণতি একজাতের নয়,—এক হারেও হয় না।

(২) প্রথম পাঁচ বছরে দৈহিক ও মানসিক পরিণতি অত্যন্ত দ্রুত। তারপরে ২০—২৫ বৎসর পর্যন্ত পরিণতি চলতে থাকে, কিন্তু তার হারটা অত দ্রুত নয়। তারপর ৩৫—৪৫ বৎসর পর্যন্ত প্রায় একটা স্থিতাবস্থা চলে থাকে, ৪৫ এর পর থেকে ধীরে ধীরে অবনতি ঘটতে থাকে। দৈহিক দিক থেকে এ অবনতি বেশী চোখে পড়ে।

(৩) শিশুর মানসিক পরিণতির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর শৃংখলা (orderliness) এবং নিয়মিত (regularity) লক্ষ্য করা যায়। তার থেকে, কোন কোন উৎসাহী বিজ্ঞানী আশা করেছিলেন যে শিশুর মানসিক পরিণতির প্রকৃতি ও



Variability in mental growth of five boys whose mental test scores and intelligence quotients were equivalent at age seven (from Dearborn and Rothney)

Fig. 36.

গতি (nature and rate of maturity) জানা গেলে, তার উপর নির্ভর করে, তার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলবে। সে আশা কিন্তু এখনও ফলবতী হয় নি। আমরা দেখেছি বিভিন্ন ব্যক্তির I. Q. প্রায়

অপরিবর্তিতই থাকে,—কিন্তু তাই বলে, ছেলে বুদ্ধিমান্ বলে শিশুকালে বাহবা পেয়ে এসেছে, পরবর্তী জীবনে সে অনেক সময় বুদ্ধিমান মানুষ ব'লে খ্যাতিলাভ করে নি। বিশেষ করে দেখা যায় যাদের I. Q. বেশী,—তাদের ভবিষ্যতে পরিণতিতে পার্থক্য বরং বেশী—পরিণতির প্রকৃতি ও নিয়মিততা সম্বন্ধে মোটামুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হলেও, কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যতিক্রমটা এবং তার তাৎপর্য স্মরণ রাখতে হবে। একটা মাঝারী দলের মধ্যে সামান্য কয়েকজনের মধ্যে হঠাৎ বেশ তফাৎ চোখে পড়ে, আর যাদের বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে অনেকটা বেশী তাদের মধ্যে দলের চেয়ে অনেকটা তফাৎ বরং আরো বেশী।৬ পাঁচটি শিশুর মানসিক পরিণতির হার ও পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে, যদিও তারা সমান-মানসিক গুণ (Mental Age) নিয়ে যাত্রা সুরু করেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভেদের তাৎপর্য (Educational significance of Individual difference)—শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের তাৎপর্য কি ? শিক্ষা একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। জীবন্ত মানুষ নিয়ে তার কারবার। তাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রভেদ, যে কোন সহৃদয় এবং বুদ্ধিমান্ শিক্ষা ব্যবস্থায় সে সম্বন্ধে বিবেচনা প্রয়োজন। যে কোন একটা গুণ নিয়েই, শিশুতে শিশুতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আর বহু গুণের সমষ্টি দিয়ে তৈরী, একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব। তাই একটি শিশু ও আরেকটি শিশুতে প্রভেদ অনেকখানি। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যদি সকলের জন্যে একই হয়,—যদি ব্যক্তিগত বুদ্ধি, যোগ্যতা ও রুচিতে প্রভেদের দিকে কোন দৃষ্টি রাখা না হয়, তাহ'লে শিক্ষকের পরিশ্রম অনেকখানিই ব্যর্থ হতে পারে,—এবং যারা শিখছে, সেই ছাত্রদের শক্তিরও বহু অপচয় ঘটতে পারে। যে ছেলে অংকে কাঁচা, কিন্তু চিত্রাংকনে যার বাস্তবিক রুচি আছে,—তাকে যদি অংকে-রুচিওয়ালা দশটি ছেলের সাথে, একই সমান কাজ দিয়ে, তার অক্ষমতার জন্যে তাকে কেবল লাঞ্ছনাই দেওয়া হয়, আর তার চিত্রাংকনের ক্ষমতা বিকাশের যদি কোন সুযোগই না দেওয়া হয়, তা হ'লে সে ছেলের মানসিক বিকাশ কি সম্পূর্ণ হতে পারে ? কাজেই বুদ্ধিমান্ শিক্ষাবিদেরা এ সমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা ও পরীক্ষা করেছেন। প্রত্যেক ছেলের জন্য আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয় আবার ছাত্রদের বুদ্ধি, রুচি, প্রয়োজনের দিকে দৃক্‌পাত না করে, একই ধরণের শিক্ষার

৬ **Freemen—Individual Differences, P. 251.**

ব্যবস্থা হানিকর এবং অপচয়কর। তাই এই দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়ের একটা সামঞ্জস্যকরণ প্রয়োজন। সে চেষ্টাই নানা ভাবে চলছে সে কথা এবার বলছি।

(১) **ছাত্রের শক্তি ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষার আদর্শ নির্ধারণ** ("Adaptation of aims of education to the individual")—ছাত্রের শক্তি, প্রয়োজন, রুচি অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ প্রয়োজন। যে যে কাজের উপযোগী তাকে সে রকম শিক্ষা দিলে, ব্যক্তিও লাভবান্ হয়, সমাজও লাভবান্ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ দেওয়াই হচ্ছে, গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন, এবং তাকে তার নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করেন।

(২) **লেখাপড়া ছাড়া অন্যগুণকেও মর্যাদা দান** ("Need to recognise value in the less abstract studies and capacities")—প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে পুঁথিগত বিদ্যাকেই মর্যাদা দেওয়া হ'ত। বস্তুবিবর্জিত (abstract) চিন্তার বিকাশকেই প্রাচীনপন্থীরা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করতেন। কাজেই অংক, ইতিহাস, সাহিত্য এই সব ভাষাগত কয়েকটি বিষয়ে পারদর্শিতা দিয়েই, ছাত্রদের মূল্য বিচার হ'ত। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে এর পরিবর্তন ঘটেছে। এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে অনেক ছেলে আছে, যারা এই বস্তুবিবর্জিত চিন্তা ও ভাষাগত বিষয়ে হয়তো খুব যোগ্যতার পরিচয় দেয় না, কিন্তু তাই বলে, তারা ছাত্রহিসাবে মূল্যহীন হয়ে গেল না। হয়তো দেখা যাবে তারা কোন হাতের কাজে বেশ ওস্তাদ—না হয়তো ভাল গাইয়ে বা বাজিয়ে। কাজেই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সব অ-বিদ্যা (?) কেও মর্য্যাদা দান করা হচ্ছে। আর যারা এ সব বিশেষ দিকে পারদর্শিতা বা আগ্রহের পরিচয় দেয়, তাদের অন্য দশজন পড়ুয়া ছেলের সঙ্গে, ইতিহাস, সাহিত্য, অংকের বোঝা (এদের কাছে এগুলি বোঝাই বটে) সমানভাবে চাপিয়ে না দিয়ে, তাদের যেদিকে রুচি ও পারদর্শিতা, সে রকম কাজই বেশী দেওয়া হয়। এবং তাদের মনে এই বোধই জন্মে দেওয়া হয়, যে তাদের গুণগুলিও অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের মত সমান মূল্যবান।

(৩) **যোগ্যতার ও শক্তি অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার হারের বিভেদ** (Need for provision for different rates for progress)—একই বিষয়ে যাদের রুচি আছে, তাদেরও সবার বুদ্ধি বা যোগ্যতা সমান নয়। তাই

ছাত্রের শক্তি অনুযায়ী তাকে অগ্রসর হবার সুযোগ দিতে হবে। যারা বেশী বুদ্ধিমান, তাদের উন্নতির হার যতটা দ্রুত হবে,—সাধারণ ছেলেদের অথবা কিছুটা বোকা ছেলেদের, উন্নতির হার ততটা দ্রুত হবে না, সেটা জানা কথা। তাই মাঝারী ও মন্দদের, অতিরিক্ত তাড়া দিয়ে, বুদ্ধিমানদের সঙ্গে সমান তালে, এগিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করলে লাভ হবে না। আবার যারা বেশী বুদ্ধিমান তাদের যদি অকাট মূর্খদের সঙ্গে একই মন্থর তালে চলতে হয়, তবে তারা অলস হবে, আর তাদের বুদ্ধির ধার যাবে মরে। তাই থর্ণডাইক ও গেট্‌স্‌ লিখছেন, বিভিন্ন শক্তি অনুযায়ী ছাত্রদের সম্যক্‌ বিকাশ কর্তে হলে তাদের শিক্ষনীয় বিষয় যেমন বিভিন্ন করতে হবে, তেমনি তাদের অগ্রগতির হারও তেমনি বিভিন্ন করতে হবে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে পরিণত জীবনে তারা নানারকম জীবিকা, নানা খেলা ধুলা, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বিভিন্ন কর্ত্তব্যে যাতে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে জন্যও এটা প্রয়োজন।৭

(৪) **আগ্রহ ও চেষ্টা বিবেচনা করে পুরস্কার দানের পদ্ধতি** (Equalizing rewards by means of the Accomplishment Quotient Technique.)—লেখাপড়ায় উৎসাহ জন্মাবার জন্যে, পুরস্কার দেবার বিধি সর্বত্র আছে। যারা ক্লাসের মধ্যে সব বিষয়ে মিলিয়ে সবচেয়ে বেশী নম্বর পায়, অথবা কোন একটা বিষয়ে সব চেয়ে বেশী ভাল নম্বর পায়, তারা পুরস্কার পেয়ে থাকে। এতে করে, উৎকৃষ্টরা তাদের উৎকর্ষ বজায় রাখতে চেষ্টা করে, এটা ভালোই। কিন্তু অত্যন্ত সম্প্রতি শিক্ষা-মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা একটা নতুন ধরণের পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন। এ পদ্ধতি অনুসারে, পুরস্কার দেওয়া হবে তাদের, যারা তাদের ক্ষমতা বা সামর্থ্য অনুযায়ী, সব চেয়ে বেশী ফল দেখাতে পারে। সে ক্লাসের সব চেয়ে বেশী নম্বর নাও পেতে পারে, কিন্তু তার শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য সে করেছে, তাই পুরস্কার তার প্রাপ্য। অর্থাৎ ধরা যাক্‌, এক মাঝারী ছেলের সামর্থ্য হচ্ছে ১০, কিন্তু সে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে নিজের উন্নতি করলে, আর তার ফল হল সে ১৫ সামর্থ্যযুক্ত ছেলের মত ফল দেখাতে পারলে। আর একজন খুব ভাল ছেলে, তার সামর্থ্য হচ্ছে ২০, কিন্তু সে খুব খাটলো না, তবু সে ১৬ সামর্থ্যযুক্ত ছেলের সমান ফল দেখাতে পারলো। যদিও দ্বিতীয় ছেলেটি, এখানে প্রথম ছেলেটির তুলনায় বেশী নম্বর পেয়েছে (১৬), কিন্তু তথাপি, প্রথম ছেলেটি তার

৭ Thorndike & Gates—Elementary Principles of Education, P. 225.

শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য করেছে, তাই দ্বিতীয়ের তুলনায় সে কম পেলেও (১৫), পুরস্কার তারই প্রাপ্য। এ পদ্ধতির গুণ হচ্ছে এই যে, এতে প্রত্যেকটি ছেলেরই পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা থাকে, আর সব চেয়ে বড় কথা যেটা,—প্রত্যেককেই নিজ শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য করবার উৎসাহ দেওয়া হয়।

(৫) **যারা অ-সাধারণ তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা** (Need for better instruction of the most gifted)—যারা সব চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্ বা কোন বিশেষ গুণান্বিত, তাদের জন্যে, বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, সব চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। বুদ্ধির বেলায় দেখেছি, খুব বুদ্ধিমান যারা, তাদের মাঝারী ও মন্দদের সঙ্গে একই সমান পড়া বা কাজের ব্যবস্থা করলে বুদ্ধিমানদেরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

(৬) **আবেগ প্রবণতা ও অন্যগুণের প্রতি দৃষ্টিদান** (Need of attention to differences in emotionality and other traits)—মানুষে মানুষে তফাৎ, শুধু শিক্ষার ক্ষমতায় নয়,—মৌলিক প্রয়োজন ও রুচিতেও বটে। অনুভূতির ক্ষেত্রে, সহজাত সংস্কারের তীক্ষ্ণতা বিষয়ে ও মানসিক গঠনেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ প্রচুর। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু বুদ্ধির তফাৎটার কথাই ভাবলে চলবে না, জীবনের অন্যান্য মৌলিক প্রভেদের কথাও শিক্ষককে স্মরণ রাখতে হবে, আর সে অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থায় সকলের বিকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে। যারা অতিরিক্ত অভিমানী, অথবা যারা একেবারে উদাসীন ও নির্মম, তাদের মনের গড়ন, রুচি ও প্রয়োজন অনেকখানি ভিন্ন হবেই এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ভিন্নতার স্বীকৃতি না থাকলে বহু মনোদুঃখ ও অপচয় অবশ্যম্ভাবী। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুভূতির জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে নূতন শিক্ষাবিদেরা সচেতন।

(৭) **সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়েও সামর্থ্য অনুযায়ী-শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার পদ্ধতির ভিন্নতা**—(Need of adapting materials and methods of instruction in common subjects to individual differences)—প্রত্যেক ছাত্রের জন্যে তার শক্তি, প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এটাই আদর্শ। রুশো 'এমিল' গ্রন্থে এ ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট বলেছেন। কিন্তু যেখানে শিক্ষা সর্বসাধারণের অধিকার, সেখানে এটা কখনোই সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। ছাত্রদের পার্থক্য যেমন আছে, মিলটাও উপেক্ষণীয় নয়। সমষ্টির থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি, উপযুক্ত প্রাণরস পেতে পারে

না। শিক্ষা একটা সামাজিক ক্রিয়া। এখানে দশের একত্র হওয়া চাই,—এখানে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দুই-ই প্রয়োজন। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও "দশে মিলি করি কাজ"। কাজেই শিক্ষায় কতগুলি সাধারণ বিধয় থাকবেই, আর একসঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। কিন্তু এর মধ্যেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ অনুযায়ী, বিষয়-বস্তুর তারতম্য করতে পারা যায়, শিক্ষার পদ্ধতিরও কিছু পরিবর্তন সম্ভব। সব চেয়ে ভাল ফল পেতে গেলে, তা করতেও হবে, এবং অগ্রসর সমস্ত বিদ্যালয়ে সে চেষ্টা হয়েও থাকে। যেহেতু ছাত্রদের শক্তি-সামর্থ্য বিভিন্ন, কাজেই কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্তু বা পাঠক্রম থাকবে না, এটাও আবার একটা ভুল ধারণা, এ নিয়ে ডিউই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।৮

ব্যক্তির বিভিন্ন শক্তিতে প্রভেদ—Variations within the individual—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই শুধু প্রভেদ নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন শক্তির মধ্যেও প্রচুর পার্থক্য। একই ব্যক্তি সর্বগুণান্বিত,—এ প্রায় দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মত রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কাব্যে, দর্শনে, এমন কি ছবি আঁকা ও হোমিওপ্যাথিতেও বিশারদ, এমন ব্যক্তি 'কোটিতে না মিলে এক'। আবার "কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন" এটাও দাম্পত্য-কলহের অত্যুক্তি। এক একটি ব্যক্তি অসংখ্য গুণ, দোষ, ক্ষমতা, সামর্থ্য ও দুর্বলতার অপূর্ব মিশ্রণ। কোন একটা গুণে সে উৎকৃষ্ট, কোনটায় সে নিকৃষ্ট, কোনটায় মধ্যম এবং এই মিশ্রণে প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিশিষ্ট, সত্যি তার আর জোড়া নেই। এই-ই তার ব্যক্তিত্ব। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীর ব্যক্তিত্বটি জানতে চান। এর সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্ভব নয়, তবু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হার মানতে রাজী নয়। বিজ্ঞান তাই বলছে কতগুলি প্রয়োজনীয় গুণ ধরে, প্রত্যেকটিতে অল্প দশজনের

৮ তিনি লিখেছেন, 'Progressive schools set store by individuality, and sometimes it seems to be thought, that orderly organisation of subject-matter is hostile to the needs of students in their individual character...... A child's individuality cannot be found in what he does or in what he consciously likes, at a given moment ; it can be found only in the connected course of his actions...Consequently, some organisation of subject-matter reached through a serial or consecutive course of doings, held together within the unity of progressively growing occupation or project, is the only means which corresponds to real individuality. So far is organisation from being hostile to the principle of individuality, that much of the energy, that sometimes goes to thinking about individual children, might better be devoted to discovering some worthwhile activity and arranging the conditions under which it can be carried forward."

তুলনায় ব্যক্তির স্থান কোথায় তা তো নির্দেশ করা যায়,—যেমন বুদ্ধির বেলায় আমরা বলি অমুক ব্যক্তির I. Q. এত। তেমনি বিভিন্ন বিদ্যা, শক্তি, গুণে ব্যক্তিটি ভালো, মন্দ বা মাঝারী, কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে, এটা নির্ধারণ করা যায়। এবার সবগুলি গুণ, শক্তি, বিদ্যা মিলিয়ে ব্যক্তির একটা সমগ্র ধারণা আমরা করতে পারি, সেটা নিশ্চিতই খুব অসম্পূর্ণ, তবু তাতে ব্যক্তিটি কেমন, তার একটা মোটামুটি ধারণা তো হতে পারে। নীচে একটি ছেলের ব্যক্তিত্বের একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে—বুদ্ধিতে সে মাঝারী, কিন্তু সঙ্গীতে ও চিত্রাংকনে সে সাধারণের চেয়ে ভালো। এটা হোল ছেলেটির ব্যক্তিত্বের ছবি (Psychograph)

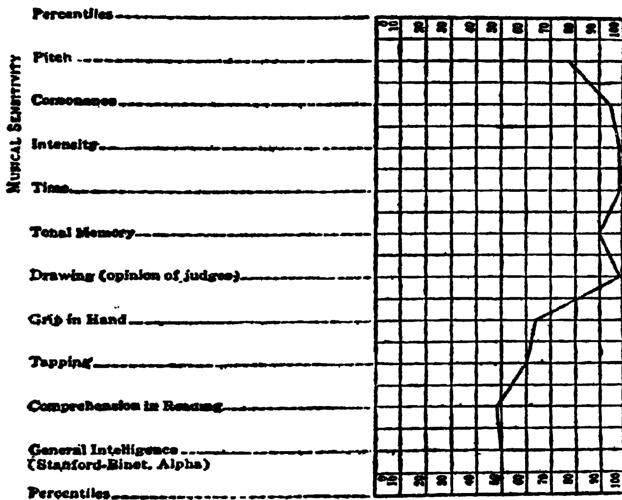


Fig. 37. Psychograph of an Average child (Freeman : individual Differences, P. 59, G. Harrap Co. Ltd.)*

আমরা দেখেছি সব গুণেই উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট এ রকমটি কচিৎ কখনো দেখা যায়। এর থেকে কোন কোন বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেন, প্রকৃতির মধ্যেই একটা হরণ-পূরণের ব্যবস্থা আছে। একজনকে সব ভাল, আর একজনকে সব মন্দ

*Reproduced by Freeman—from L. S. Hollingworth—Special Talents and Abilities.

দিয়ে গড়লে, প্রকৃতির ভারসাম্য থাকে না, তাই এ ব্যবস্থা। প্রকৃতির মধ্যে যেন ঝোঁক, সবাইকে মোটামুটি সমান বা Average করে গড়বার। কোন একগুণে তাকে জিতিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই আর একদিকে তাকে হারিয়ে দিয়ে, ওজনটা মোটামুটি সমান রাখা হোল। এটাকে বলা হয় ক্ষতিপূরণ মতবাদ (Theory of compensation)। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল কিন্তু এ মতের বিপরীত। বরং কতকগুলি গুণের মধ্যে যেন মিতালী বা সম্বন্ধ রয়েছে।[৯] শিক্ষাবিদের এটা জানা দরকার, কোন গুণের সঙ্গে কোন গুণের নিকট সম্বন্ধ আছে, আর কোথায় এ সম্বন্ধ নেই; কোথায় গুণ দুটি আকস্মিকভাবে একত্র হয়ে আছে। আর এক ব্যক্তির মধ্যে কোন গুণটি কোন গুণটির সাথে, কি ভাবে সংযুক্ত আছে, তাও জানা দরকার। কি ক'রে এর কো-রেলেশ্যন্ (correlation) নির্ধারণ করতে হয়, তা আমরা আলোচনা করছি।

ব্যক্তিগত পার্থক্য পরিমাপের পদ্ধতি (Methods of measuring individual differences.)—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য আছে, আবার একই ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য আছে। বুদ্ধি, বিদ্যায়, ধৈর্যে, সম্ভাবনায়, চরিত্রে—নানাদিকেই পার্থক্য। এসব পার্থক্যের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পরিমাপ কি সম্ভব?

পার্থক্যের বিবেচনা করতে হ'লে নানাভাবেই করা যায়। প্রথমতঃ এক দলের সঙ্গে, অপর দলের পার্থক্য বার করা চলে, যেমন, জাতি বা লিঙ্গের প্রভাব ব্যক্তিগত পার্থক্যের উপর কতখানি, তা বিচার করতে হ'লে একই বয়সের, ভিন্ন জাতি বা লিঙ্গবিশিষ্ট দলের উপর, একই পরীক্ষার প্রয়োজন। তারপর উভয় দলের এ্যাভারেজ স্কোর, বা মীন্ বা মেডিয়ান্ বার করে, মাঝারী থেকে পরিবর্তন কতটা (variability range) বার করে তুলনামূলক বিচার করা যায়। মাঝারী, পরিবর্তনের নির্দিষ্ট মান ও পরিবর্তনের পরিমাণ (Average, standard deviation, range) এগুলো কিভাবে বার করতে হয়, তা অবশ্য পরিসংখ্যাণতত্ত্বেরই বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

তারপর এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির পার্থক্য নিরূপণ ও নানাবিধ পরীক্ষা এর সাহায্যে হতে পারে। বুদ্ধির পার্থক্যের বিচারই এ পর্যন্ত অন্যান্য সকল

৯ "Instead, it has been found that there is a marked, positive correlation or coherence in the amounts of all mental traits possessed by an indvidual." Freeman—Individual Differences, P. 61.

গুণের পার্থক্য অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হয়েছে। বিনে সিমোন, ট্যারম্যান-মেরিল্ (Binet-Simon, Terman-Merrill) ইত্যাদি বহু প্রকার পরীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধির বিচার কি করে করা হয়, তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। বিশেষ যোগ্যতা নিরূপক পরীক্ষা (Special Ability tests) অনেক উদ্ভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা বা বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা পরিমাপেরও নানা পরীক্ষা আছে। কোন বিষয়ে যোগ্যতা ও রুচি (Capacity or Aptitude) কার কেমন আছে তা নির্ণয়েরও নানা পরীক্ষা আছে, যার দ্বারা কোন মানুষের ভবিষ্যতে কোন যোগ্যতার বিকাশ হতে পারে, বর্তমানে তার ইঙ্গিত পাওয়া চলে।

মানুষের ভাবাবেগ মাপবার উপায়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-সম্মত বলা যায় না। তবুও নানাপ্রকার সামাজিক গুণ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরীক্ষার (Sociometric scale & Attitude test) সাহায্যে মানুষের বিশিষ্ট বস্তু বা আদর্শের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মাপা যাচ্ছে। আমেরিকায় এ চেষ্টা সবচেয়ে বেশী হচ্ছে।

এক কথায়, মানুষের ব্যক্তিত্ব নিরূপক যত প্রকার উপায় আছে, সকল উপায়ের সাহায্যেই এক ব্যক্তি হতে অপর ব্যক্তির পার্থক্য ধরা পড়ে।

একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ থাকে। সে সমাবেশের প্রকৃতি আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ হয়। এই সমাবেশকে পরিসংখ্যানতত্ত্বের ভাষায় চিত্রিত করতে হলে প্রয়োজন হয় co-efficient of correlation এর অর্থাৎ এক-গুণের সঙ্গে অপর গুণের সম্বন্ধ বোঝার। পার্সোনালিটি প্রোফাইল্ বা সাইকোগ্রাফের সাহায্যে আমরা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গুণ-দোষের সমাবেশের পার্থক্যটা সহজে বুঝতে পারি।*

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ আছে। কি কি বিষয়ে এ প্রভেদ এবং তার কারণ কি এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করতে গেলে এ প্রভেদটা মাপবার ও প্রকাশ করবার নির্দিষ্ট উপায় থাকা চাই। এটা পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা যাক।

মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে সত্য,—কিন্তু এই প্রভেদ একেবারে খামখেয়ালী ব্যাপার নয়। তারও "নিয়ম" আছে। বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে, এ নিয়মগুলি আবিষ্কার করা ও প্রকাশ করা। উড্ওয়ার্থ বলেছেন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের যদিও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আজও বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, তবুও এ প্রভেদ

* Woodworth—Psychology (18th edn.)—P. 158

ব্যাপারটা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই পার্থক্যগুলির মধ্যেও একটা নিয়মিততা বা নিয়মানুবর্তিতা আছে এবং এগুলি সাবধানে পরীক্ষা করলে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা যায়।১০

যোগ্যতা ও সামর্থ্য (Ability and Capacity)—গোড়াতেই একটা পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার। মানুষে মানুষে প্রভেদ যোগ্যতায় ability) ও সামর্থ্যে (capacity)। দুটো এক জিনিষ নয়। যোগ্যতা হচ্ছে যা ব্যক্তি আরও শিক্ষা বা অনুশীলন ছাড়াই বর্তমানে করতে পারছে, যেমন সে মিনিটে ৭২ টা অক্ষর টাইপ করতে পারছে, বা ২ মন ২৭ সের একটা বোঝা, দুহাত দিয়ে ধরে, জমি থেকে, এক ফুট উপরে, তুলতে পাচ্ছে। অনুশীলন করলে, এ ক্ষমতা তার হয়তো আরো বাড়বে। সেই যে বাড়বার সম্ভাবনা, যেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার, সেটা হচ্ছে সামর্থ্য। যোগ্যতা বা ability হচ্ছে প্রত্যক্ষ,—সামর্থ্য বা capacity হচ্ছে অনুমান সাপেক্ষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামর্থ্য বা সম্ভাবনা যোগ্যতার চেয়ে বেশী। কিন্তু সামর্থ্যেরও সীমা আছে, তা যথেচ্ছ বাড়ান যায় না। শিক্ষকের দুটোই জানা দরকার। কতটুকু যোগ্যতা প্রকাশ কচ্ছে তা দিয়ে ছাত্রের পরীক্ষা, তার বর্তমানের বিচার। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুযায়ী তাকে বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করার দায়িত্ব ও গৌরব, শিক্ষকের। সহজেই বোঝা যায় যোগ্যতার বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ প্রত্যক্ষ ফল দিয়ে তার বিচার। কিন্তু সামর্থ্য তো প্রত্যক্ষ নয়, সেটা অনুমান করতে হয়,—তাতে ভুলের সম্ভাবনা আছে।

যোগ্যতার পরিমাপ—(Tests for measuring ability.)—যোগ্যতা বিচার করতে গেলে বিজ্ঞানসম্মত নির্দিষ্ট মান, নির্দিষ্ট অবস্থায়, ব্যবহার করতে হবে। বুদ্ধি একটা যোগ্যতা। কি করে তার মাপ করতে হয় তা আমরা দেখেছি। অন্য যে কোন যোগ্যতার বেলায়ও মূল পদ্ধতি একই।

যোগ্যতার বেলায়, আমরা বিশেষ একটা গুণ নিয়ে দেখতে পারি, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ কতটা। সেই গুণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা কে কোথায়, কেমন ভাবে ছড়িয়ে আছে। এটাকে বলা হবে ডিস্‌ট্রিবিউস্যন্‌ বা স্ক্যাটার্‌ (distribution or scatter)। আমরা দেখব এ ছড়িয়ে থাকাটা এবং দলের তুলনায় একটি বিশেষ ব্যক্তি কোথায় আছে এ তথ্যগুলি বিজ্ঞান-সম্মতভাবে কিভাবে প্রকাশ করা যায়।

আবার এক ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের মধ্যে অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির একই গুণের

১০ Woodworth—Psychology, P. 55.

মধ্যে সম্বন্ধটা কেমন। এটাকে বলা হবে কোরেলেশন্ (correlation)। কি করে, এ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হয়, কি করে তা প্রকাশ করতে হয়, তাও আমরা আলোচনা করব।

দ্রুততার পরীক্ষা, নির্ভুলতার পরীক্ষা, কঠিনতার পরীক্ষা (Speed tests, Accuracy tests, difficulty tests)—যোগ্যতা মাপবার একটা উপায় হচ্ছে, একটা কাজ কোন ব্যক্তি কত তাড়াতাড়ি করতে পারে। যেমন ৫ সংখ্যা বিশিষ্ট ৬টি রাশির যোগফল করতে দেওয়া হয়, একটি শ্রেণীর ছাত্রদের। কে কত তাড়াতাড়ি, কাজটা নির্ভুল ভাবে করে আনতে পারবে, তা দিয়ে বিচার হবে, কোন্ ছেলে অংকে কতটা বুদ্ধিমান, একে বলে দ্রুততার পরীক্ষা (Speed test)। অবশ্যই, সুবিচার করতে হ'লে, মোটামুটি এক বয়সের, এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিয়ে পরীক্ষাটা করতে হবে।

আর একরকম পরীক্ষা হচ্ছে,—নির্ভুলভাবে সূক্ষ্ম কাজের যোগ্যতার পরীক্ষা বা নির্ভুলতার পরীক্ষা (accuracy test)। দশটি ছেলের প্রত্যেককেই, কাগজে একটি স্থূলকোণ এঁকে দেওয়া হ'ল। বলা হ'ল, চোখের আন্দাজে, কোণটিকে তিনটি সমান ভাগে ভাগ করতে হবে। অথবা আরো সোজা উদাহরণ নেওয়া যাক্, ইস্কুলের আমগাছে দেখা গেল একটি আম খুব উঁচু ডালে পেকে রয়েছে। ষষ্ঠ ক্লাশের তের জন ছেলে দাঁড়িয়ে গেল, হাতে ঢিল নিয়ে। প্রতিযোগিতা সুরু হ'ল—কার ঢিলে আম পড়ে। যে পারলো সেই সব চেয়ে বাহাদুর।

আবার অন্য আর একরকম পরীক্ষা কঠিনতার পরীক্ষা (Difficuty test)। যেমন উচ্চ উল্লম্ফন বা High Jump প্রতিযোগিতায়। ক্রমেই উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে। একজন দুজন করে প্রতিযোগী খসে পড়েছে। সব চেয়ে উঁচুতে লাফিয়ে পুরস্কার পেলো একজন, সে যোগ্যতম।

র‍্য স্কোর, এ্যাভারেজ স্কোর, মেডিয়ান্ স্কোর্ (Raw score, Average score, Median score)—যোগ্যতা বিচার করতে হ'লে একটা মান (norm) চাই,—তেমনি মাপবার একক বা unit'ও চাই। অনেক সময় নম্বর দিয়ে সেটা বোঝা যায়,—যেমন বলা হ'ল, মানকড় ১১৭ রাণ করেছেন। আবার বলা হয় ইষ্টবেঙ্গল দল ফুটবল খেলায়, এ'বছর এখন পর্য্যন্ত ১৪ point পেয়েছে। একটা খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি ইভেন্টস্ (events) থাকে। তাতে অনেক সময় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অনুসারে ৫, ৩ ও ২ নম্বর দেওয়া হয়। একজন বা একদল পেয়েছে ১৩ নম্বর। এটাকে বলে, 'র‍্য স্কোর'। 'র‍্য-স্কোর'

দিয়ে যোগ্যতা ঠিক বোঝা গেল না। ব্যক্তিটি ক'টা বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, কোনটায় যে কোন স্থানে ছিল তা না জানলে অর্থাৎ অন্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা না করলে, তার কৃতিত্ব কতটা তা বোঝা যায় না। কোন ব্যক্তির 'র‍্য স্কোর' তখনই অর্থপূর্ণ হয়, যখন একই পরীক্ষায় অন্যান্য ব্যক্তিদের র‍্য-স্কোরের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়।[১১]

কোন ব্যক্তির কৃতিত্বের বিচার করতে গেলে, কার সঙ্গে তুলনায় সেটা করা যাবে ? সে হচ্ছে মাঝারী বা Average। যে ভাল, সে এই মাঝারীর তুলনায় ভালো, যে মন্দ, সেও এই মাঝারীর তুলনায়ই মন্দ। কাজেই, এ মাঝারী ঠিক করা, দরকার। সেটা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। ধরা যাক, একটা শ্রেণীর ছেলেদের গড় (Average) দৈর্ঘ্য স্থির করতে হ'বে। ক্লাশে ২০ জন ছেলে। প্রত্যেক ছেলের দৈর্ঘ্য মাপা হোল। তারপর সব ছেলের দৈর্ঘ্যের যোগফল নির্ণয় করা হ'ল, ধরা যাক্ তা হোল ১০৫´ ফিট। সেই যোগফলকে ছেলেদের সংখ্যা (২০) দিয়ে ভাগ করা হোল। দেখা গেল, গড়টা হচ্ছে ৫´ ফিট ৩´´ ইঞ্চি। এখন নরেনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৫ ফিট ৬´´ ইঞ্চি। স্পষ্টতঃই বোঝা গেল, নরেন তার ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে ঢ্যাঙা। এ্যাভারেজ্ বা এ্যারিথম্যাটিক মীন্ এর সংজ্ঞা, ও তা নির্দ্ধারণের আংকিক সূত্র, গ্যারেট্ দিচ্ছেন এ ভাবে, এ হচ্ছে আলাদা আলাদা প্রত্যেকের স্কোর্ বা সংখ্যা যোগ করে মোট ব্যক্তিদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা।

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$

মেডিয়ান্টাও মাঝারীর মাপ। কিন্তু সেটা ঠিক এভারেজ বা মীন্ নয়। একদল মানুষের স্কোরগুলি যদি ছোটর থেকে বড়, এভাবে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে ঠিক মধ্যবর্তী সংখ্যাটি হবে মেডিয়ান্, ধরা যাক, সাতজন ছেলে, তারা এক মাসে কতদিন ক্লাশে উপস্থিত থেকেছে তার হিসাব হচ্ছে—

১৭ ৭ ১৫ ১০ ৯ ১৯ ১৪

এখন, ছোটর থেকে বড় করে সাজিয়ে গেলে, সংখ্যাগুলি হবে—

৭ ৯ ১০ ১৪ ১৫ ১৭ ১৯

[১১] Woodworth—Psychology, P. 59.

[১২] H. E. Garrett—Statistics in Psychology & Education. P. 32.

এখানে ১৪ হ'ল মেডিয়ান্ কারণ তার বড় আছে তিনটি সংখ্যা আর ছোটও আছে তিনটি সংখ্যা। কিন্তু এ্যাভারেজ্ বা মীন্ হোত $\frac{৯১}{৭}$ = ১৩। ১৩

এখানে মেডিয়ান্ দেখান হ'য়েছে, যেখানে ব্যক্তির সংখ্যা বিজোড়। কিন্তু যদি জোড় হয়, তবে কি করে তা নির্ণয় হবে? ধরা যাক্ স্কোরগুলি এখানে হচ্ছে—

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

তা'হলে মেডিয়ান্ হবে ৯ ও ১০ এর ঠিক মাঝামাঝি, মানে ৯.৫। ১৪

গুণানুযায়ী ব্যক্তিদের ছড়িয়ে থাকা রেখাঙ্কন দিয়ে প্রকাশ— গ্যাসিয়ান কার্ভ, ফ্রিকোএন্সী পেন্টাগন, ও হিষ্টোগ্রাম—(The distribution of Individuals according to abilities— Gaussian Curve, Frequency pentagon and Histogram)—

যে কোন গুণ বা যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করলেই দেখা যায়, যে মানুষেরা ছড়িয়ে আছে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভাল, মন্দ, মাঝারী হিসাবে। এমন প্রায় দেখাই যায় না, যে একটা গুণ বা যোগ্যতা একদল লোকের আছে, আর এক দল লোকের একেবারেই নেই। সাধারণতঃ দেখা যায়, একটা যোগ্যতা অল্প অল্প করে বাড়তে বাড়তে শেষ সীমা পর্যন্ত প্রায় একটানা চলে যায়। আর সেই যোগ্যতা যাদের খুব কম, তাদের সংখ্যা অল্প,—সেটা বাড়তে বাড়তে মাঝামাঝি জায়গায় দেখা যায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় মাঝারি দল, আর ধীরে ধীরে সংখ্যা কমে, খুব ভালোতে এসে থামে। এ ছড়িয়ে থাকা বা distribution বা scatter নানা উপায়ে ছবি এঁকে দেখানো যায়। একটা প্রচলিত উপায় হচ্ছে একটা ঢেউ বা ঘণ্টার আকারে যোগ্যতা অনুসারে মানুষগুলিকে সাজিয়ে যাওয়া। যাদের সে যোগ্যতা একেবারে কম (তাদের সংখ্যাও একেবারে কম)—তাদের থেকে সুরু করে বক্র রেখাটি ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে উঠতে থাকে। সেখানে সংখ্যা সব চেয়ে বেশী, যেখানে মাঝারীদের ভিড়

১৩ L. R. Shukla—Elements of Educational Psychology, P: 371

১৪ গ্যারেট মেডিয়ানের এর সংজ্ঞা দিচ্ছেন, "When ungrouped scores or other measures are arranged in order of size, the median is the midpoint in the series".

মেডিয়াম্ নির্ণয়ের ফর্মুলা Garrett দিচ্ছেন—

Median (Mdn.)—the $\frac{(N=1}{2}$ th measure in order of size.

H. E. Garret—Statistics in Psychology & Education. P. 34.

জমেছে। সেখানে বক্র রেখাটি সর্ব্বোচ্চ শীর্ষ বা mode। সেখান থেকে যোগ্যতা যতই বাড়ছে, লোকের সংখ্যাও ততই কমছে, তাই বক্র রেখাটিও ক্রমশঃ নিম্নগতি নিয়ে, ভূমিতে এসে মিশেছে। এই যে সমান একটানা তরঙ্গাকৃতি বা ঘণ্টাকৃতি বক্ররেখা দিয়ে, মানুষদের ছড়িয়ে থাকা বোঝানো হ'ল, একে বলে গ্যসিয়ান্ কার্ভ বা সাধারণ ছড়িয়ে থাকার বক্ররেখা (Gaussian Curve বা Normal curve of distribution.)।

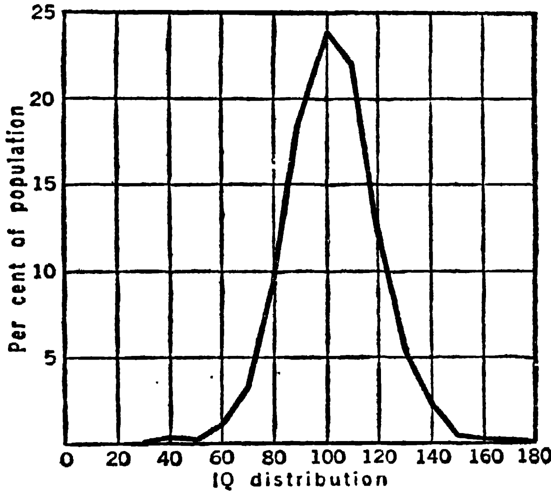


Fig. 38. The distribution of individuals according to I. Q.
A normal distrbution curve or Gaussian curve.
(Woodworth — Psychology, P. 112. Methuen)

আবার এই ছড়িয়ে থাকাটা দেখানো যায়, কতজনের এ যোগ্যতা কতটা পরিমাণে আছে, তা দিয়ে ক্রমে ক্রমে সাজিয়ে, সেই ক্রমোচ্চ সরল রেখাগুলির মাথাগুলি সরল রেখা দিয়ে যোগ করে, যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা (mode), সে পর্য্যন্ত পৌঁছে আবার সংখ্যা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংযোজক রেখাটি ক্রমে ক্রমে নীচে নামিয়ে শেষ করতে হবে। একে বলে ফ্রিকোএন্সী পলিগন্ (Frequency polygon. Fig. 39)

এ ছবিতে দেখা যাচ্ছে অঙ্ক কষায় ০ পেয়েছে ১ জন, ১ পেয়েছে ৩ জন, ২ পেয়েছে ৭ জন ইত্যাদি। যোগ্যতাটা কতজনের মধ্যে কি পরিমাণে আছে

(যেমন, ১, ৩, ৭ ইত্যাদি) তাকে বলে frequency বা সংক্ষেপে f। আবার আর এক রকমে এই ছড়িয়ে থাকাটা প্রকাশ করা যায়, তাকে বলে হিষ্টোগ্রাম (histogram)। এখানে একটানা বক্ররেখা বা অসমান সরল রেখা যোগ করে করে, ছড়ানো না বুঝিয়ে, সমান দূরত্বপূর্ণ কতগুলি ধাপে ধাপে, স্কোর বা যোগ্যতার পরিমাণ সাজিয়ে যাওয়া হয়—যেমন স্কোর ৫-১০ প্রথম ধাপ, ১০-১৫ দ্বিতীয় ধাপ, ১৫-২০ তৃতীয় ধাপ। কোন ধাপে কতজন আছে সে অনুযায়ী ধাপগুলি উঁচু বা নীচু হবে। (Fig. 40)

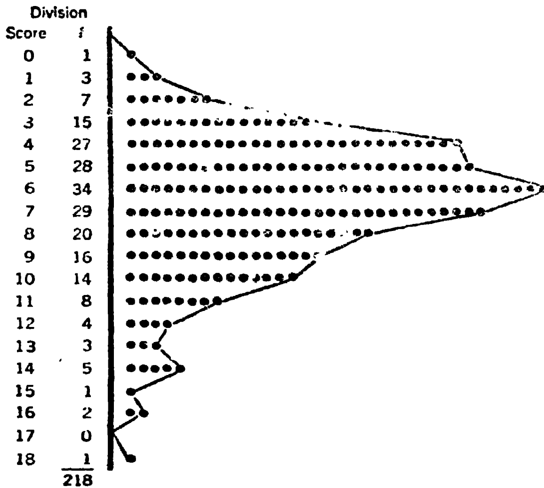
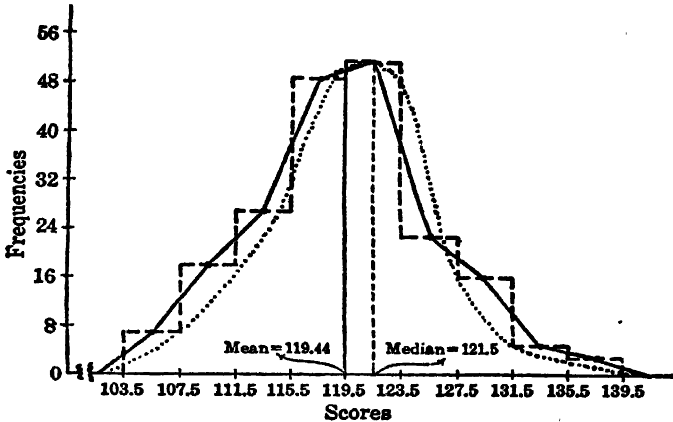


Fig. 39. Distribution of scores in a test. Frequency Pentagon, skew distribution, mode etc,—Woodworth, P. 63. Methuen.

এখন এই ছড়িয়ে থাকাটা সমান বা অসমান হতে পারে। সাধারণতঃ কোন উল্লেখযোগ্য গুণ অনুসারে আ বাছাই বৃহৎ জনসংখ্যাকে ভাগ করলে দেখা যায়, সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় থাকে, মাঝারীরা। তাই শীর্ষ বা modeটা থাকে মাঝামাঝি। একেই বলে সাধারণ ছড়িয়ে থাকা (normal distribution, Fig. 38)। কিন্তু এমন হতে পারে যে, যে ব্যক্তিদের নিয়ে পরীক্ষা করা হ'ল তারা ঠিক আ-বাছাই করা নয়, অথবা তারা যথেষ্ট সংখ্যক নয়, সেখানে দেখা যায়, মাঝারীরা সর্বোচ্চ সংখ্যা নয়। mode বা শীর্ষটা তা হ'লে ঠিক মাঝখানে না

থেকে একপাশে থাকবে,—একে বলে একদেশে ছড়ানো (skew distribution, Fig. 39)। ছড়িয়ে থাকা বা distribution প্রকাশ করবার, তিন রকম পন্থার ছবিই বুঝবার স্থবিধার জন্য একসঙ্গে দেওয়া হল (Fig. 40)।



Fig, 40. Histogram, Gaussian curve, Frequency pentagon Mean, Median etc. (Garrett : Statistics in Psychology & Education, P. 20 modified. Longmans Green & Co.)

এ ছড়িয়ে থাকার ছবিগুলিতে, প্রায় সর্বদাই সর্বোচ্চ সংখ্যা বা mode একটিই থাকে, কাজেই সাধারণ ছড়িয়ে থাকার বক্ররেখা হচ্ছে এক-শীর্ষক, বা unimodal। কিন্তু যদি দুটি বিভিন্ন আ-বাছাইকরা দলকে একত্র করে কোন এক যোগ্যতা অনুসারে সাজানো যায় তা হ'লে দেখা যাবে দুই বিভিন্ন দলের মাঝারীদের ভিড় (mode) দুটি বিভিন্ন জায়গায়। তা হ'লে ছড়িয়ে থাকার বক্র রেখাটা দ্বিশীর্ষক বা bimodal হবে। যদি অনেকগুলি দল একত্র করে, ছড়িয়ে থাকার বক্র রেখাটা আঁকা যায় তবে তা হয় বহু-শীর্ষক বা multimodal। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। ৪-৬ বৎসরের একদল শিশু, ১০-১২ বৎসরের একদল স্ত্রীলোক, আর ৩০-৩৫ বৎসরের একদল পুরুষ মানুষদের একত্র করে, যদি হাতের কব্জীর জোর (grip test) পরীক্ষা করা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে, তিন রকম মাঝারীদের ভিড় তিন জায়গায় জমেছে, এবং ছড়ানোটা একটা ঢেউএর আকারে না হয়ে, তিনটে ঢেউএর আকারে হবে।

বিভিন্ন রকম যোগ্যতার ছড়িয়ে থাকার বক্ররেখা পরীক্ষা করে এ কথাটা

খুব স্পষ্ট বোঝা যায় মানুষদের কয়েকটি টাইপ অনুযায়ী ভাগ করা যায় না। যদি টাইপ মতবাদ সত্য হত তা হ'লে মানুষদের ছড়িয়ে থাকাটা একটানা হ'ত না—বিচ্ছিন্ন কতগুলি শীর্ষ বা modes আমার পেতাম। বাস্তবিকপক্ষে, তা আমরা পাই না।

মাঝারী হইতে গড় দুরত্ব (Mean Deviation, Standard Deviation)—আগেই বলেছি কোন ব্যক্তির যোগ্যতার বিচার হয় Average বা মাঝারীর তুলনায়। সে বিচারটা বৈজ্ঞানিকভাবে সূক্ষ্ম হ'তে হ'লে বলতে পারা যায়, মাঝারীর তুলনায় ব্যক্তিটি কতটা ভাল বা কতটা মন্দ। অর্থাৎ মাঝারী থেকে দুরত্ব বা deviation কতটা। এই দুরত্বের মাপকাঠি হচ্ছে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ডিভিয়েশ্যন, মীন্ ডিভিয়েশ্যন্ (Standard Deviation, Mean Deviation) ইত্যাদি।*

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। পাঁচজন ব্যক্তির কোন এক যোগ্যতার স্কোর হচ্ছে ক্রমান্বয়ে ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪। এখন তাহলে এ্যাভারেজ হচ্ছে ১০। প্রথম ব্যক্তি, এই এ্যাভারেজ থেকে ৪ কম, অর্থাৎ, তার মূল্য —৪ ; দ্বিতীয় ব্যক্তি এ্যাভারেজ থেকে ২ কম, তার মূল্য —২ ; তৃতীয় ব্যক্তি, এ্যাভারেজের সমান, তার মূল্য ০ ; চতুর্থ এ্যাভারেজ থেকে ২ বেশী, তার মূল্য+২ ; পঞ্চম ব্যক্তি, এ্যাভারেজ থেকে ৪ বেশী তার মূল্য+৪। এখন যোগ বিয়োগের চিহ্নগুলি বিবেচনা না করলে এদের যোগফল হবে ৪+২+০+২+৪=১২। এখন এই ১২কে ৫ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ২·৪। এটা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির এ্যাভারেজ (Average) থেকে গড় দুরত্ব বা Mean Deviation। গ্যারেট এটা নির্ধারণের ফরমূলা দিচ্ছেন,

$$MD = \frac{[\Sigma X]}{N}$$

মীন ডিভিয়েশ্যন ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ডিভিয়েশ্যন (Mean Deviation, Standard Deviation.) মূলতঃ একই জিনিষ, কিন্তু, তা নির্ধারণ করবার পদ্ধতি ভিন্ন। এখানেও আগের উদাহরণ নেওয়া যাক্। পাঁচজন ব্যক্তির যোগ্যতার স্কোর যথাক্রমে ৬, ৮, ১০, ১২, ১৫। Average পেলাম ১০। প্রথম ব্যক্তির

* The mean Deviation, or MD (also written Average Deviation or AD and Mean Variation or MV) is the mean of the deviations of all the separate measures in a series taken from their central tendency (Average or Arithmetic Mean).

মূল্য —৪, দ্বিতীয় ব্যক্তির মূল্য —২, তৃতীয়ের ০, চতুর্থের +২, পঞ্চমের +৫। এবার প্রত্যেকটি মূল্য বর্গ করলে পাচ্ছি ১৬, ৪, ০, ৪, ১৬। এদের যোগফলকে ৫ দিয়ে ভাগ করলে পেলাম ৮। এর বর্গমূল করলে পাওয়া যাচ্ছে ২·৮৩। এটা হোল ষ্ট্যাণ্ডার্ড ডিভিয়েশন (Standard Deviation)। গ্যারেট ফরমূলা দিচ্ছেন,

$$SD = \frac{\sqrt{\Sigma x^2}}{N}$$

ব্যক্তির র্য স্কোর, এ্যাভারেজ স্কোর (Average score) এর কত SD উপরে, বা নীচে তা দিয়ে দলের তুলনায় ব্যক্তির কৃতিত্ব নির্ণয় করা হয়।[১৫]

পার্সেণ্টাইল, কোয়ার্টাইল (Percentile, Quartile)—আগে বলেছি মেডিয়ান হচ্ছে মধ্যবিন্দু—সেটা ঠিক মীন্ বা এ্যাভারেজ না হতেও পারে। তা হলে মেডিয়ানের নীচে থাকবে দলের ৫০% এর স্কোর। কোয়ার্টাইল্ হচ্ছে চতুর্থাংশ বা ২৫%। Q_1 দিয়ে বোঝায় দলের ২৫% এর স্কোরের নীচে। Q_2 হচ্ছে মেডিয়ান্ বা মধ্যবিন্দু, যেখানে ৫০% হচ্ছে তার নীচে। Q_3 হচ্ছে যেখানে দলের ৭৫% তার নীচে। ঠিক তেমনি ভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি ১০% ৪৩% বা ৮৫% স্কোর, যে বিন্দুর নীচে। এদের বলে পারসেণ্টাইল্ (Percentiles) এবং এ প্রকাশ করা হয়, Pp এই চিহ্ন দিয়ে। P_{10} দিয়ে বুঝতে হবে, ১০% স্কোর এই বিন্দুর নীচে, P_{43} বোঝাবে, ৪৩% এ বিন্দুর নীচে, P_{85} বোঝাবে ৮৫% এ বিন্দুর নীচে। এ নির্ধারণের ফর্মূলা মেডিয়ান্ নির্ধারণের ফর্মূলারই অনুরূপ।

$$Pp = 1 + \left(\frac{pN - F}{fp}\right) \times i \text{ (interval)}.$$

যোগ্যতার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ (Correlation of abilities)—আগেই বলা গেছে, মানুষের বিভিন্ন যোগ্যতা পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়, এমন নয় যে একজনের মধ্যে একটা যোগ্যতা বেশী পরিমাণে থাকলে, আর একটা যোগ্যতা একেবারেই থাকবে না। বরং, দেখা যায়, কতগুলি যোগ্যতার সঙ্গে যেন যোগ আছে। এ যোগ বা মিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রকম। এ সব মিলকে বলে কোরেলেশন্। এ রকম মিল বা অমিল অংক দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যদি এমন হয় যে দু'টো

১৫ The SD score is plus or minus according as the raw score is above or below the average and it is so many times the SD above, or below the average. Woodworth,—Psychology, P. 87.

১৬ Garret : Statistics in Psychology and Education P. 78.

যোগ্যতা একেবারে সমান, তাহ'লে বলা হবে দুটোর মধ্যে পসিটিভ (Positive) কোরেলেসন্ হচ্ছে ১ = +১। যদি দুটোর মধ্যে একেবারে বিপরীত সম্বন্ধ হয়,—অর্থাৎ একটা থাকলে আর একটা থাকেই না, তা হলে পারফেক্ট নেগেটিভ কোরেলেশন্ (perfect negative correlation), তার চিহ্ন হল—১। সাধারণতঃ, মানুষের দুটি যোগ্যতার বেলায়, এ দুটির কোনটিই দেখা যায় না। তবে বিভিন্ন পরিমাণের মিল বা অমিল দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি যোগ বা বিয়োগ চিহ্ন-যুক্ত দশমিক সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন +·৭২, +·৩০, —·৪৫ ইত্যাদি। যেখানে দুটি যোগ্যতা নিতান্তই অকস্মাৎ একত্র দেখা যাচ্ছে যেখানে তাদের মধ্যে কোন যোগ নেই, তা প্রকাশ করা হয় O চিহ্ন দিয়ে। এবার কটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। মানুষের উচ্চতার সঙ্গে ওজনের পজিটিভ্ কোরেলেশ্যন্ আছে, তার পরিমাণ হচ্ছে +·৫৯। উচ্চতার সঙ্গে বাহু বিস্তারের দৈর্ঘ্যের মধ্যে পজিটিভ্ কোরেলেশ্যন্ আরো বেশী, +·৮২। সাধারণতঃ দুটি যোগ্যতার মধ্যে +·৮৫ এর বেশী ইতিবাচক মিল দেখতে পাওয়া যায় না। বয়সের সঙ্গে বুদ্ধির ইতিবাচক মিল আছে। I. Q.র সাথে বিভিন্ন পড়া-শোনার বিষয়ে সাফল্যেরও ইতিবাচক মিল আছে, তার পরিমাণ নীচু ক্লাশে প্রায় =৭৫, মধ্যবিদ্যালয়ে গিয়ে সে মিল কমে দাঁড়ায় +·৬০ হ'তে +·৬৫, কলেজে উঠে, সেটা আরো কমে। তখন পরিমাণটা হয় প্রায় +·৫০।

শিক্ষকের পক্ষে কোন কোন যোগ্যতা বা গুণের মধ্যে গভীর বা নিয়ত সম্বন্ধ আছে, এবং কোন কোন গুণের মধ্যে সম্বন্ধটা নিতান্তই আকস্মিক, তা জানা দরকার। যদি দেখা যায় ভাল পড়তে পারার সঙ্গে, ভাল আবৃত্তি করার গভীর সম্বন্ধ আছে, তবে শিক্ষক আবৃত্তির পথেই শিশুর পড়ার উৎকর্ষ সাধন করতে চেষ্টিত হবেন। কারণ, হয়তো দেখা যাচ্ছে এ শিশুর আবৃত্তিতে আগ্রহ আছে, কিন্তু পড়ায় উৎসাহ নেই। আবার যদি দেখা যায়, ব্যাকরণের সঙ্গে সাহিত্যে রুচির খুব বেশী ইতিবাচক মিল নেই, তাহ'লে বুদ্ধিমান্ শিক্ষক ব্যাকরণের পথ ধরে, শিশুর সাহিত্যে রুচি বিকাশের চেষ্টায় বৃথা সময় ও শক্তির অপব্যয় করবেন না। এ রকম ক'টা মিলের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

শব্দের অর্থবোধ ও প্যারাগ্রাফের অর্থবোধ		...	+ ৮০
অংক ও হিসাব —	...	...	+·৭০
পাঠ ও সাধারণ জ্ঞান	...	..	+·৪০
(স্কুলে) বীজগণিত ও জ্যামিতি	...	...	+·৬৫

	ইংরাজী ও চিত্রাংকন	....	+ ·১৫
(কলে	ইংরাজী ও ইতিহাস	... ...	+ ·৬৮
	ইংরাজী ও অঙ্ক	... ...	+ ·৪৯
	ইংরাজী ও পদার্থবিদ্যা	... ...	+ ·৪৮
	অংক ও ইতিহাস	... ...	+ ·৪৪

এই কোরেলেশ্যন এর মাপ থেকে এটা বোঝা যায়, একটা সাধারণ যোগ্যতা (general ability) সব যোগ্যতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে, তা নয়। তাহ'লে যে কোন দুটি যোগ্যতার মধ্যেই + ·৫০র বেশী কোরেলেশ্যন্ থাকতো।

যোগ্যতাগুলি সবই আলাদা বা বিভিন্ন ও সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক-বিহীন, তাও নয়। তাহ'লে কোন ইতিবাচক মিলই তাদের মধ্যে থাকতো না। বরং দেখা যায়, কতকগুলি যোগ্যতা যেন দল বেঁধে থাকে। অর্থাৎ এখানে গ্রুপ ফ্যাক্টর মতবাদই সত্য মনে হয়, যেমন দেখেছি আমরা বুদ্ধির বেলায়। অবশ্য এটা স্মরণ রাখা দরকার যে বুদ্ধিও একটা ability বা যোগ্যতা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

"মহাপুরুষদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—তাঁহাদের জীবনের মূল সূত্র হইতেছে আদর্শ নিষ্ঠা। তাঁহারা কঠিন সাধনা দ্বারা সত্যকে নিজ জীবনে রূপায়িত করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তোলেন এবং বহুজনের অন্তরে তাঁহারা যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন ইহাই তাহার গোপন রহস্য।" কোন মহাপুরুষের জীবনীকার এইভাবে তাঁহার জীবন কাহিনী সুরু করছেন। কিন্তু শুধু মহাপুরুষদেরই কি চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব আছে? না, প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব আছে? চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝায়? কি করে তার বিশ্লেষণ সম্ভবপর? ব্যক্তিত্বের মূল সূত্র কিছু আছে কি? ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা কি? ব্যক্তিত্বের প্রভাব কি করে বিস্তার করা যায়? এ প্রশ্নগুলি মনোবিজ্ঞানী বিশেষতঃ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গোড়াতেই বলা হয়েছে, শিশুকে শিক্ষাদান করতে হ'লে জানতে হবে শিশুকে। জানতে হবে সে 'মানুষটি' কেমন, কি তার শক্তি ও সম্ভাবনা, জানতে হবে কোথায় তার উৎকর্ষ কোথায় তার দুর্বলতা, জানতে হবে ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করবার ও প্রভাবান্বিত করবার মূল সূত্রগুলি।

ব্যক্তিত্ব মানে হচ্ছে সমগ্র মানুষটির পরিপূর্ণ রূপ। এতক্ষণ আমরা মানুষের বিচ্ছিন্ন শক্তি, ক্রিয়া, বৃত্তি, অনুভূতি, আগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। যেমন, বুদ্ধির স্বরূপ, তার পরিমাপ, তার উন্নতির উপায় এসব কথা বলেছি। এ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষটি নয়। ব্যক্তিত্বের এ একটা উপাদান। বহু মানুষের মধ্যে বুদ্ধি হচ্ছে সাধারণ উপাদান। কিন্তু কৃষ্ণা, মালবিকা, সত্যেন, করিম এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা মানুষ। এদের সবারই বুদ্ধি আছে—কারু বেশী কারু কম। সেটা তাদের সাধারণ গুণ। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের ভাষায় তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে "বিশেষত্ব" তাই দিয়ে তারা প্রত্যেকে একে অন্যের থেকে পৃথক। প্রত্যেকেই 'বিশেষ'।

একটা মানুষের চেহারা, স্বাস্থ্য, কথা বলবার ধরণ, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষগুণ সবটা মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্ব, তার বিশেষত্ব। ঠিক এই এই দেহ, মন, বুদ্ধি,

অভ্যাস, অনুভূতির সংমিশ্রণটি আর কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিত্ব যে দোষগুণ, শক্তি সম্ভাবনার সমষ্টিমাত্র তাত নয় তার মধ্যে একটা অখণ্ডতা আছে, আছে একটি জীবন্ত ঐক্য।১ ওই ঐক্যকে বাদ দিয়ে দোষ, গুণ, শক্তি সম্ভাবনাগুলি প্রত্যেকটিই সাধারণ। আর, একটি ব্যক্তির দোষ গুণের মস্ত এক তালিকা দাখিল করেও ব্যক্তিত্বের রূপটি অস্পষ্ট থেকে যায়—এই দোষগুণগুলি সব শুনেও এ কথা বলা চলে, তা যেন সবই বুঝলুম কিন্তু সে লোকটি "কেমন" অর্থাৎ ওই গুণ দোষের তালিকার অরণ্যে "লোকটি" হারিয়ে গেছে।২

ব্যক্তিত্ব বা "পার্সেনালিটি" কথাটা সব সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণ লোকে যখন বলে "অমুকের একটা পার্সেনালিটি আছে" অথবা বলে "হোয়াট্ এ চার্মিং পার্সেনালিটি!" তখন একথাটাই বোঝাতে চায় যে লোকটির অন্যের উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা আছে। এর মধ্যে একটা দামী সত্য আছে যে 'পার্সেনালিটি' বা ব্যক্তিত্বের সামাজিক তাৎপর্য আছে। অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করবার (অনুকূল বা প্রতিকূল) ক্ষমতা ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান বা মূল লক্ষণ।

ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুরু হয়েছে খুব বেশী দিন নয়। তার পূর্বে পার্সেনালিটি বা ব্যক্তিত্ব একটা রহস্যময় আত্মিক সত্তা যা ব্যক্তির বিভিন্ন শক্তি বা কার্যকে ঐক্যদান করে, এ অর্থে ব্যবহার করা হোত। তখন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'মন' বা 'আত্মা'কেও একটা সত্তা বা দ্রব্য বলে বিবেচনা করা হোত। 'ব্যক্তিত্ব' ব্যক্তির ক্রিয়া, গুণ, সম্ভাবনার থেকে আলাদা, রহস্যময় ও অবিভাজ্য একটা আত্মিক শক্তি একথা কল্পনা করলে এর কোন বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলে না। তাই বর্তমান বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিত্বের উপাদান গুলি বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত।

ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী—ব্যক্তিত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনা-কালেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জনে ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে

1 "Personality is, in a sense,...the whole individual considered as a whole...personality is not a mere juxtaposition of parts or segments—it is an integration, a blend, merger, an organised whole in which particular functions, unless we attend to them separately for purposes of analysis, lose their identity within the total pattern"—Munn. Psychology P. 455

2 G. G. Thompson. Child Psychology—P.592.

দেখছেন। কেউ শারীরিক ও স্নায়বিক গঠনের দিক থেকে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, কেউ বা মানসিক গঠন বৃত্তির দিক থেকে ব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ করছেন, কেউ জোর দিচ্ছেন ব্যক্তিত্বের জন্মগত প্রবৃত্তি বা ক্ষমতার উপর, কেউ জোর দিচ্ছেন সামাজিক ও অন্যান্য বাহ্য পরিবেশ ও অবস্থার জন্যে ব্যক্তির পরিবর্তনের উপর, আবার ফ্রয়েডীয় অবচেতনবাদে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা ব্যক্তিত্বের মূল খুঁজেছেন অবচেতন মনের গভীর গহনে। কাজেই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার 'থিয়োরী' বা মতবাদ প্রচলিত আছে। এ মতবাদগুলির বিরোধ মীমাংসা করে একটা সুসঙ্গত সর্ব্বজনগ্রাহ্য মতবাদ গড়ে তোলা যায় কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ বিভিন্ন মতবাদগুলি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা Murphy র Personality, Cattell এর Personality, Murry & Kluckhohn এর Outline of a conception of personality ইত্যাদি বইতে পাওয়া যাবে। আমরা সংক্ষেপে অল্প কয়েকটি সংজ্ঞা ও মতামতের উল্লেখ করব।

ম্যাক ডুগ্যালের অনুবর্তীরা জন্মগত প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের পক্ষপাতী। মর্টন প্রিন্স ব্যক্তিত্ব অভিজ্ঞতা এবং জন্মগত বংশানুক্রম সূত্রে প্রাপ্ত প্রবৃত্তি ও সম্ভাবনার সম্মিলিত ফল বলে উল্লেখ করেছেন।৩ সোয়েজিঙ্গার (Schwesinger)৪ অলপোর্ট (Allport) ৫ ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সামাজিক তাৎপর্যের উপর জোর দিয়েছেন এবং ব্যক্তির যে গুণগুলি বাহ্য যথা তার বেশ, চলন, ধরণ, ইত্যাদি তা দিয়েই ব্যক্তিত্বের বিচার করছেন। উড্ওয়ার্থ ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তির সমগ্র ব্যবহারের প্রতিফলন হিসাবে দেখেছেন। ব্যক্তির সামাজিক বিভিন্ন সম্বন্ধের মধ্যে প্রতিক্রিয়া এবং তার গুণগত বৈশিষ্ট্যকে এ বিচারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৬ ল্যাভেটার দৈহিক গড়নের দিক থেকে ব্যক্তিদের বিভাগ করে গিয়েছেন। বর্তমান কালে সেলডন দৈহিক ও স্নায়বিক গঠনের সঙ্গে মানসিক প্রবণতার সম্বন্ধ মিলিয়ে মানুষদের ভাগ করেছেন ভিসেরোটোনিক (Visurotonic), সোমাটোটোনিক (Somatotonic) আর সেরিব্রোটোনিক (cerebro-

---

3 Morton Prince, The Unconscious.

4 Schwesinger. Heredity & Environment.

5 Allport. Social Psychslogy.
Woodworth & Marquis. Psychology.

tonic) এই তিনটি প্রধান দলে।[৭] মানসিক গঠনের দিক থেকে য়্যুঙ্ এর ইন্‌ট্রোভার্ট (Introvert), এক্‌স্‌ট্রোভার্ট (extrovert) ও এ্যাম্বিভার্ট ambivert) এর বিভাগ প্রসিদ্ধ। ক্রেটস্‌মার (Kretschmer)[৮] ভাগ করেছেন মানুষদের এস্‌থেনিক (asthenic), পিক্‌নিক্ (pyknic), এ্যাথ্‌লেটিক (athletic) ও ডিস্‌প্ল্যাসটিক্ (dysplastic) টাইপে। রোজানফ (Rosanoff)[৯] মানসিক বিকারের প্রবণতার দিক থেকে ভাগ করেছেন মানুষদের নর্মাল (normal), হিষ্টেরয়ড্ (hysteroid), সাইক্লয়েড্ (cycloid), সিজয়ড্ (schizoid), আর এপিলেপ্‌টয়েড্ (epileptoid) দলে।

ম্যারে (Murray) ব্যক্তিত্বের মতবাদগুলিকে দুইটি প্রধান দলে ভাগ করেছেন —পেরিফেরালিষ্টস্ (peripheralists) আর সেণ্ট্রালিষ্টস্ (centralists)। পেরিফেরালিষ্টরা ব্যক্তিত্বকে বুঝতে চাচ্ছেন তার বাইরের দৈহিক বা মানসিক বা স্নায়বিক শক্তি বা প্রকৃতি অনুযায়ী। কিন্তু সেণ্ট্রালিষ্টরা ব্যক্তিত্বের মূল বা কেন্দ্রে পৌঁছতে চেষ্টা কচ্ছেন, তার অবচেতন ভূমি আবিষ্কারের দ্বারা (in terms of a dynamic complex of psychological needs, motor systems and characteristic modes of conflict-resolution)। এ দলের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হবে ফ্রয়েডের। তারপর লিউয়িন (Lewin), ম্যরে (Murry) ও টম্‌সন (Thompson) ও রর্‌সাক্ (Rorschach)ও মোটামুটি এই দলে।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব (Character & Personality)—এখানে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ বা প্রভেদ নিয়ে আলোচনা করা যাক। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী, বিশেষ করে যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী দর্শনপ্রভাবান্বিত, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অভিন্ন বলেই মনে করেন। তাঁদের মতে মানুষের প্রত্যেক ক্রিয়া, শক্তি বা প্রবণতারই নৈতিক মূল্য আছে। মানুষের নীতি-বুদ্ধি-বিচার চালিত ক্রিয়া দ্বারা মানুষের চরিত্রের বিকাশ। সমগ্র মানুষটির শ্রেষ্ঠ ও সার্থক প্রকাশ হচ্ছে তার চরিত্রে। তাই মহৎ ব্যক্তিত্ব না থাকলে মহৎ চরিত্র গঠনও সম্ভব নয়। আর নীতিগত বিচার যখন আমরা করি তখন তার কাজগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করি না, বিচার করি সমগ্র মানুষটিকেই।*

কিন্তু অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর মতে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অভিন্ন নয়। চরিত্র

৭ Sheldon. Varieties of Temperament.

৮ Kretschmer, Physique & Character.

৯ Rosanoff. Manual of Psychiatry.

* Hertmann বলেন "... a superior personality is also a superior character and the term, personality contains all that character connotates'.

সমগ্র ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের যে ব্যবহার সামাজিক নীতি-বুদ্ধি ও বিচারের অধীন তা তার চরিত্রের প্রকাশক। কিন্তু ব্যক্তির দৈহিক গঠন, সুশ্রীতা, কুশ্রীতা, নিপুণতা, মুদ্রাদোষ এগুলিও তো ব্যক্তিত্বের প্রকাশক, যদিও এদের নৈতিক কোন তাৎপর্য নেই। কাজেই ব্যক্তিত্বের সব উপাদানই চরিত্রগত নয়। যার চেহারা ভাল তার একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের উপাদান আছে কিন্তু তার চরিত্রটি আকর্ষণীয় না হতে পারে। উড্ওয়ার্থ বলছেন, "চরিত্র বলতে মোটামুটি ব্যক্তির সেই সব ব্যবহার বোঝায় যাকে সমাজের গৃহীত মান অনুযায়ী ন্যায় বা অন্যায় বলা যায়", [১০] গিলিল্যাণ্ড (Gilliland)ও সে রকম বলেছেন "চরিত্র হচ্ছে ব্যক্তিত্বের নৈতিক উপাদান।"[১১]

এজন্য ব্যক্তির কতগুলি দোষগুণকে "চরিত্র প্রকাশক উপাদান (character traits)" আর অন্য গুলিকে "ব্যক্তিত্বপ্রকাশক উপাদান (personality traits)" বলা হয়। যেমন, সততাকে বলা হবে চরিত্র প্রকাশক উপাদান, কিন্তু লম্বা দৌড়ে পারদর্শিতাকে বলব ব্যক্তিত্ব প্রকাশক উপাদান।

আবার ব্যক্তিত্ব প্রকাশক উপাদানগুলির সবগুলিই সমান মূল্যবান নয়। ব্যক্তির যে গুণগুলি মূল্যবান্ (Primary traits) যেমন, বুদ্ধি, রসবোধ ইত্যাদি সেগুলির আবিষ্কার ও পরিমাপেই আমরা অধিকতর তৎপর।

ব্যক্তিত্বের বিবরণ (Describing Personality)—একটা মানুষ কেমন, এটা বোঝাতে গেলে আমরা বিশেষ অবস্থায় লোকটির ব্যবহার বর্ণনা করতে পারি। এটাকে বলা যায় নাটকীয় পদ্ধতি (dramatic method)। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

"জুড়ী গাড়ী হাঁকাইয়া একদিন এক ব্যক্তি খাঁটি বাঙ্গালীর পোষাক পরিহিত হইয়া ময়দানের নিকটস্থ 'রেড্রোডে'র ফটকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোরা পাহারাওয়ালা বাধা দিল। বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার রোষনেত্র তুলিয়া বলিলেন, "জানিস্, আমি কে? স্যার আশুতোষ মুখার্জি, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ।" পাহারাওয়ালা সেই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভয়ে ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। আশুতোষ কিন্তু সেইখানেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি বাড়ী ফিরিয়াই সোজা বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলকে ফোন করিলেন—"আমি

১০ Woodworth and Marquis—Psychology, P. 87.
১১ Gilliland, A R.—Genetic Psychology.

স্যার আশুতোষ মুখার্জি, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্, আপনাকে একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কলিকাতার রেড্ রোডের উপর দিয়া এ দেশের লোকদের চলাচল নিষিদ্ধ কি?" গভর্ণর উত্তর দিলেন, 'You may go'. 'You' শব্দের অর্থ এখানে তুমি, না তোমরা? তাই আশুতোষ লাটসাহেবকে আবার প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কেবলমাত্র আমার কথা বলিতেছেন, না রেড্ রোড দিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর যাতায়াতের অধিকারের কথা বলিতেছেন? আমি কোন ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আপনাকে ফোন্ করি নাই, আমার সকল দেশবাসীর জন্যই আপনার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছি।" লর্ড কারমাইকেল বুঝিলেন, এ বড় কঠিন ঠাঁই। লাটসাহেবের হুকুমে সে দিনই রেড্ রোড সমানভাবে দেশীয়-বিদেশীয় সকলের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল।[১২] এ নাটকীয় পদ্ধতিতে বাংলার পুরুষসিংহ আশুতোষকে আমরা সহজে চিনতে পারি।

আবার হয়তো কতগুলি বিশেষণের মালা গেঁথে ব্যক্তিটিকে পরিচিত করা হয়। অথবা তার ক্রিয়ার একটা তালিকা দেওয়া হয়। এ হচ্ছে বর্ণনা পদ্ধতি (descriptive method) যেমন, "তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী। তুমিই বুদ্ধি, তুমিই শুদ্ধবোধস্বরূপা। তুমিই হ্রী, তুমিই লজ্জা। পুষ্টি-তুষ্টি, শান্তি-কান্তিও তুমিই। কেউ সৌভাগ্যে আরূঢ় হয়েছে, দেখি শ্রী-রূপিনী তুমি, তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ প্রতাপে পর্বতায়মান হইয়াছে, দেখি ঈশ্বরীরূপিনী তুমি, তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ দুষ্কার্য করে নিন্দার ভয়ে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছে, দেখি হ্রী-রূপিনী তুমি, তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। তোমার কোলে ছাড়া আর স্থান নেই।"[১৩] মা সারদামণির একটি ভক্তি-আবেগ রঞ্জিত চিত্র।

কিন্তু এ দুই পদ্ধতিতে ব্যক্তির পরিচয় অসম্পূর্ণ এবং একেবারেই গুণ-গত। গুণগুলি তো সাধারণ। এদের মধ্যে প্রধান অপ্রধান নিশ্চয়ই আছে। ব্যক্তির অনেক গুণদোষই সামাজিক পরিবেশ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই প্রকাশমান্। আমরা যদি কোন লোককে বলি রসিক, তাহ'লে এটা বোঝায় না যে সে পাত্রে অপাত্রে যত্র তত্র রস বিতরণ করেই যাচ্ছে। রসবেত্তার আপনজনের কাছেই রসিক মনের প্রকাশ। কাজেই কেউ কেউ হয়তো বলে বসবেন—ব্যক্তিত্বটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সমাজগত ব্যাপার। এটা আবার

১২ দক্ষিণারঞ্জন বসু—বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী স্যার আশুতোষ—পৃ ২৭
১৩ অচিন্ত্যকুমার সেন—পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি—পৃ ২৮

অবশ্য অতিভাষণ হয়ে গেল। ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন দোষগুণ একেবারেই না থাকত, তা হলে সামাজিক পরিবেশ বা সম্বন্ধে তা' হঠাৎ সৃষ্টি হতে পারতো না। তা হলে সব ব্যক্তিই নিগু´ণ (neutral) হোত এবং সব মানুষের মধ্যে সম্বন্ধও তা হলে একই হোত। তা যে নয়, তা আর কে না জানে?[১৪]

অভিধান খুঁজলে আঠারো হাজারের উপরে ব্যক্তিত্ব প্রকাশক গুণ বা দোষ বাচক শব্দ পাওয়া যাবে। এর মধ্যে অনেকগুলি শব্দ একই গুণ বোঝায়, কারণ পরিমাপ করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে মিল (correlation) ৯০% বা তারও বেশী। কাজেই বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান (Primary traits) কয়টি তা খুঁজে বের করবার জন্যে এমন গুণগুলি বেছে নিচ্ছেন যাদের পরস্পরের মধ্যে মিল একেবারেই নেই বা অতি সামান্যই আছে। এ গুণ বা দোষগুলি তা হলে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন দিক্ (independent dimensions)। উড্ওয়ার্থ ও মারকিস্ এ রকম ১২টি প্রধান গুণ ও তাদের বিপরীত দোষগুলিকে ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণ (Primary traits) বলে উল্লেখ করেছেন। নীচে তালিকাটি দেওয়া গেল।

মৌলিক গুণ (Primary traits)	বিপরীত (Opposites)
১। আয়াসী, আমুদে, দরদী	অমননীয়, হৃদয়হীন, ভীরু, বিদ্বিষ্ট, লাজুক
২। বুদ্ধিমান্, স্বাধীনচেতা, নির্ভরযোগ্য	বুদ্ধিহীন, অপরিণামদর্শী, চঞ্চলমতি
৩। ধীরস্থির, বস্তুনিষ্ঠ, একাগ্র	স্নায়বিক রুগ্ন, এড়ানো-স্বভাব, অস্থিরচিত্ত
৪। 'দাবাখাবা গোছের', নেতৃত্বাভিমানী, নিজের মত জোর করে চালাতে অভ্যস্ত	বিনীত, বাধ্য, আত্মবিলুপ্তিতে অভ্যস্ত
৫। শান্ত, আনন্দময়, মিশুক, 'গল্পে'	বিষণ্ণ, ভগ্নোদ্যম, একাচোরা, উদ্বিগ্ন
৬। সংবেদনশীল, কোমলহৃদয়, সহানুভূতিসম্পন্ন	কঠিনহৃদয়, উদাসীন, স্পষ্টভাষী, দয়া-মায়া শূন্য
৭। মার্জিত, বিদগ্ধ রুচিসম্পন্ন	স্থূল-রুচি, অমার্জিত

[১৪] Woodworth & Marquis. Psychology, P. 90

মৌলিক গুণ	বিপরীত
৮। বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন, দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, পরিশ্রমী	পরনির্ভর, আবেগচালিত, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য
৯। দুঃসাহসী, নির্ভীক, সদয়	পরাঙ্‌মুখ, সাবধানী, হিসাবী, অসরল
১০। উদ্যোগী, ক্রিয়াশীল, নাছোড়-বান্দা, তৎপর	'যাই-যাচ্ছি' ভাবের, অলস,
১১। অতি-অভিমানী, অল্পে উত্তেজিত	নিস্তেজ, 'যা-আছে বেশ-আছে' বলে-যারা নিরুদ্যম
১২। বন্ধুভাবাপন্ন, বিশ্বাসপরায়ণ	সন্দিগ্ধচিত্ত, পরছিদ্রান্বেষী

এ ছাড়াও ব্যক্তিত্বের উপাদান বা লক্ষণ হিসাবে আরও নানা রকম ভাবে মানুষের ভাগ করা হয়েছে তা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু টাইপ হিসাবে মানুষকে ভাগ করার অসুবিধা আছে, যদিও এভাবে ভাগ করাটাই জনপ্রিয় রীতি। অনেকবারই আমরা বলেছি যে কোন একটা গুণ বা দোষ একদল মানুষের আছে, আর একদলের একেবারেই নেই এরকম ভাগ চলে না। সেই গুণ বা দোষের সব চেয়ে বেশী থেকে, সব চেয়ে কম, এরকম সব মাত্রারই মানুষেরা ছড়িয়ে আছে। আর সব চেয়ে বেশী সংখ্যক হচ্ছে, মাঝামাঝি। আর সব মানুষের মধ্যে বিপরীত দোষ বা গুণ দুইটিই একসঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেমন ধরা যাক্ একস্‌ট্রোভার্ট ও ইনট্রোভার্ট দলে য়্যুঙ্গ এর বিভাগ। শুধুই একস্‌ট্রোভার্ট মানুষও যেমন বিরল তেমনি একদম ইনট্রোভার্টও নেই বললেই হয়। তাই য়্যুঙ্গকে স্বীকার করতে হোল, এক মিশ্রদল তাদের নাম দিলেন এম্বিভার্ট। অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে এই দলের। এ রকম ভাবে ভাগ করাটা বাস্তবিক পক্ষে **আমাদের কাছে তাদের কেমন লাগে,** তারই ভাগ। আমরা বলি লোকটা দাম্ভিক—মানে, আমাদের কাছে মনে হোল, লোকটার গর্ব কিছু বেশী। এটা কিন্তু সত্য নাও হতে পারে। কাজেই এ বিবরণ কতটা বস্তুগত (Objective) তা বলা শক্ত। তা ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিবরণে শুধু তার সম্বন্ধে সামাজিক প্রতিক্রিয়া জানলেই চলে না, জানা দরকার এই গুণ বা দোষের হেতু। জানা দরকার কি অবস্থায় বা কি কারণ বর্তমান থাকলে একটা লোক দাম্ভিক, বা আমুদে, বা খামখেয়ালী বা সাবধানী হয়। এটা জানা এ

জন্যে আরো দরকার কারণ শিক্ষক ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সম্ভব হলে তার অনুকূল পরিবর্তনের প্রয়াসী। এটা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।[১৫]

ব্যক্তিত্বের বিচার (Judging Personality)—ব্যক্তিত্ব নিরূপণ বা বিচারের উপায় নানাবিধ দৈহিক গঠন বা চোখমুখের ভাব ব্যক্তিত্বের দ্যোতক। এ সবের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ব বিচারের চেষ্টা চিরকালই চলছে। প্রাচীনদের মধ্যে ল্যাভেটার (Lavater) আর আধুনিকতমদের মধ্যে সেলডন (Sheldon) এর দেহ স্নায়ু, পেশী, রক্ত, ইত্যাদির বিভিন্নতা মিশ্রণ দিয়ে মানুষের শ্রেণী বিভাগের কথা বলেছি। নিম্নলিখিত আর কয়টি উপায়ের (methods of investigating personality) উল্লেখ কচ্ছি। (১) জীবন-ইতিহাস অনুসরণ (case history, longitudinal studies) (২) গুণের পরিমাণ বা মিশ্রণ অনুযায়ী ব্যক্তিদের স্তর বিভেদ (Rating) (৩) কাগজ পেন্সিল দিয়ে ব্যক্তির ইচ্ছা, আকাঙ্খা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি পরিমাপ (pencil & paper personality measuriug devices) (৪) ব্যবহার পরীক্ষা (behaviour test) (৬) দেখা করে মৌলিক আলোচনা দ্বারা ব্যক্তিত্ব নিরূপণ (interviews) (৭) মনঃসমীক্ষণ ও স্বপ্নবিচার (free association and dream analysis) (৮) ছবি ইত্যাদি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া হতে ব্যক্তির স্বপ্নবিচার (projective procedures)[১৬]

(১) জীবনেতিহাস সযত্নে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে দীর্ঘকাল সংগ্রহ করলে কোন ব্যক্তির স্বরূপটি জানবার সহায়তা হয়। তবে অনেক সময়ই ইতিহাস লেখকের অনুরাগ ও বিরাগ তার কাজকে রঞ্জিত করে। এটা বৈজ্ঞানিক বিচারের পথে বাধা।

(২) ব্যক্তিত্ব বিচারে শুধু গুণ দোষের তালিকা বা মিশ্রণ জানা যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক গুণেরই ভাল, মন্দ, মাঝারী আছে। কাজেই গুণের পরিমাণগত মাপ জানলে ব্যক্তিটিকে অন্য দশজনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বুদ্ধির বেলায় আমরা দেখেছি বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) দিয়ে এ রকম পরিমাপ করা যায়। এখন প্রধান গুণগুলি (primary traits) ধরে প্রত্যেকটির সম্পর্কেই যদি ব্যক্তির স্থানটি কোথায় এটা নির্দ্ধারণ (rating) করা যায় তা হলে তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়। যেমন ব্যক্তিটি সততাগুণে সাধারণের চেয়ে বেশ কিছুটা উঁচুতে, বলা যাক্ শতকরা ৭০ জন তার চেয়ে সততা গুণে নিকৃষ্ট ; তাহ'লে

15 Woodworth & Marquis—Psychology, P. 94
16 N. L. Munn.—Psychology, P. 458

মাঝারী বা ৫০ পার্সেণ্টাইলের রেখার দুটি দশক উপরে তার স্থান নির্দেশ করা যাবে। আবার এই ব্যক্তিটিকেই, অন্য একটি গুণ, যেমন কাজে উৎসাহ তাতে তার স্থান কোথায় তা দিয়ে অন্য দশজনের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেল সে অনেকের চেয়ে এ বিষয়ে নিকৃষ্ট (যেমন তাকে রাখা গেল ৪০ পার্সেণ্টাইলের কোঠায়)। এবার সবগুলি গুণে তার অবস্থান চিহ্নগুলি যদি যোগ করা যায় তাহ'লে তার একটা ব্যক্তিত্বের মোটামুটি মাপ (Personality Profit বা Psychograph) পাওয়া গেল।[১৭]

মার্ফি (Murphy), বনহাম্ সারজেণ্ট (Bonham-Sergent) রেটিং স্কেল্ এর উদাহরণ দিয়েছেন। এটা শিশুদের বেলায় প্রযোজ্য। কতগুলি গুণ (items) নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। যেমন, শিশু অন্য শিশুকে জ্বালাতন করে কিনা? খাওয়ার সময় গোলমাল করে কিনা? কোন জিনিষ পেড়ে আনবার জন্যে শিশু বাইতে (climbing) চেষ্টা করে কিনা? এবার প্রত্যেকটি গুণ সাতটি স্তরে ভাগ করা হোল—যেমন গুণটির সম্পূর্ণ অভাব, খুব সামান্য পরিমাণে বর্তমান, সামান্য, মাঝামাঝি, গুণটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বর্তমান, যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য, অত্যন্ত বেশী—স্তর অনুযায়ী ব্যক্তিটিকে নির্দেশ করা হোল। এবার যিনি পরীক্ষক তাঁর এ পরীক্ষা সম্বন্ধে সংশয় আছে, মোটামুটি নিঃসংশয়, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এটাও দেখা হোল।[১৮] এভাবে অসম্পূর্ণ হ'লেও ব্যক্তিত্বের বৈজ্ঞানিক পরিমাপের চেষ্টা হয়।

(৩) ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাবার উদ্দেশ্যে সযত্নে বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্নমালা (Questionnaire) তৈরী করে তার মনের আগ্রহ, রুচি, বুদ্ধি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি জানতে চেষ্টা করা হয়। সে প্রশ্নমালার উত্তর ব্যক্তি যথাযথ ও সত্যভাবে দিলে এ পরীক্ষা দ্বারা তার ব্যক্তিত্বের কতগুলি প্রধান উপাদানের সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। কাগজ পেন্সিলে এ পরীক্ষা চলে। বুদ্ধির বেলায়ও এ পদ্ধতির ব্যবহার আছে। বিশেষ একটি সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তির ব্যবহার পরীক্ষার একটি উদাহরণ।

একটি যুবক একটি যুবতী সঙ্গিনীকে সিনেমা যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছে। সিনেমা হাউসে পৌঁছে ছেলেটির খেয়াল হয় সে টাকার থলিটি ঘরে ফেলে এসেছে— এ অবস্থায় কি করা উচিত হবে।

17 Woodworth Marquis—Psychology P. 114
18 Murphy G. and Murphy L. B. Experimental Social Psychology

—নিজের ঘড়িটি বাঁধা রেখে ধারে টিকিট কেনার চেষ্টা করবে।

—কোন বন্ধু পাওয়া যায় কিনা তা খোঁজ করে, তার থেকে টাকা ধার করবে।

—মেয়েটির সঙ্গে আলোচনা করবে।

—কোন একটা ছুতা করে মেয়েটিকে বসিয়ে রেখে বাড়ী গিয়ে টাকা নিয়ে আসবে।

ব্যক্তির নীতিবোধের পরীক্ষা :—

কতগুলি ক্রিয়ার নাম দেওয়া আছে। ব্যক্তিকে বলা হোল এর মধ্যে অন্যায় কাজগুলির নীচে দাগ দিতে। এবার তাকে বলা হোল এ অন্যায় কাজগুলির মধ্যে যেটা সব চেয়ে অন্যায় মনে করে সেটাকে গোল বন্ধনী দিয়ে চিহ্নিত করতে ইত্যাদি।[19]

(৪) ব্যবহার পরীক্ষা—সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে অতর্কিতে ব্যক্তিকে ফেলে তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা। এ রকম পরীক্ষা শিশুদের বেলা করা অনেকটা সহজ। সৈনিক, বৈমানিক ইত্যাদির কাজে লোক নেবার সময় প্রার্থীদের শারীরিক যোগ্যতা, উপস্থিত বুদ্ধি, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি এরকম নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিচার করা হয়। এমনি কৃত্রিম পূর্বসৃষ্ট অবস্থার মধ্যে ব্যক্তিকে ফেলে তার সততা বা অন্যগুণও পরীক্ষা করা চলে। একটা উদাহরণ। একটা শ্রেণীর ছাত্রদের শ্রুতলিপি দেওয়া হল কাগজ পেন্সিল দিয়ে। তাদের উত্তরগুলো নিয়ে শিক্ষক প্রত্যেকটি উত্তরের যথাযথ প্রতিলিপি (photograph) রেখে দিলেন। সেটা ছাত্ররা জানলো না। পরদিন শিক্ষক বললেন তোমরা প্রত্যেকে নিজের খাতা পরীক্ষা করে ঠিক ঠিক নম্বর দেবে। তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে শুদ্ধ উত্তরটি এবং কি ভাবে পরীক্ষা করতে হবে তার ছাপান উপদেশ (instruction) দিয়ে দিলেন। কোন কোন ছেলে নিজেদের ভুলগুলি রবার দিয়ে ঘষে তুলে ঠিক উত্তর লিখে নিজের খাতায় বেশী নম্বর দিলে। কিন্তু ফটো দেখেই তাদের চালাকী ধরা পড়লো। পরীক্ষা হোল তাদের সততার। সহজেই বোঝা যায় এ পরীক্ষার ক্ষেত্র সংকীর্ণ।

(৫) সাক্ষাৎকার ও আলাপ করে ব্যক্তিকে কিছুটা হয়তো বোঝা যায়। তাই চাকুরীতে লোক নিয়োগ করবার আগে প্রার্থীদের দেখা ও আলাপ করার রীতি আছে। তবে খুব অল্প সময়ের জন্যে সাক্ষাৎকার ও আলাপ হয়

19 Munn. Psychology P. 460-462

এবং মানসিক উদ্বেগ নিয়ে প্রার্থীরা আসে, একথা স্মরণ রাখলে সহজেই বোঝা যায় এতে অনেক সময় সুবিচার হয় না। ইন্টারভিউ নেওয়া আর তার মধ্য দিয়ে লোক চেনা সহজ কাজ নয়। এটি সবাই পারে না।

(৬) ফ্রয়েড্‌পন্থীরা জানেন ব্যক্তিত্বের রহস্যের মূল আছে অবচেতন মনে। তাই তাঁরা বলেন ব্যক্তিকে জানতে হলে মনঃসমীক্ষণ প্রণালীর সাহায্য নিতে হবে। মুক্ত অনুবন্ধ পদ্ধতি (free association technique) দ্বারা তাঁরা অসতর্ক মুহূর্তে ব্যক্তির মনে যে সংঘাত (conflict) বা বাধা আছে তা জেনে নিতে চেষ্টা করেন। স্বপ্নের বিশ্লেষণ তাদের মতে ব্যক্তিত্বজ্ঞানের চাবিকাঠি। এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি। উইল্‌হেল্‌ম ষ্টেকেল্‌ (Stekel) বহু উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। যাঁদের এ বিষয়ে উৎসাহ আছে তাঁরা তাঁর ছোট বইটি দেখতে পারেন।২০

(৭) ফ্রয়েডের অনুগামীদের মধ্যে লিউয়িন্‌, রর্‌সাক্‌, ম্যারে ইত্যাদি কিছুটা নূতন পথে ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি নিরূপণের নানা অভিনব পরীক্ষা কচ্ছেন। লিউয়িন মানুষের মানসিক অবচেতন ও সামাজিক প্রভাবগুলো ব্যক্তিত্বের নির্ণায়ক এ কথা মনে করেন। তিনি গেষ্টল্টএর সমগ্রবাদে বিশ্বাসী এবং সমস্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের মন বিচ্ছিন্ন খণ্ডতাকে সমগ্রতায় পরিপূর্ণ করতে চায়, একথা বিশ্বাস করেন। বিভিন্ন মানুষে এ চেষ্টা বিভিন্নভাবে হয়। তিনি এসব শক্তিগুলোকে বলবিদ্যা ও পদার্থ-বিদ্যার নীতি অনুযায়ী মনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে চেষ্টা কচ্ছেন (vector, valence, quasi-need ; life-space, boundary, barrier ইত্যাদি ধারণার ব্যবহার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ) এবং মানুষের মনের মানচিত্র (topology) আঁকবার চেষ্টা কচ্ছেন। ২১

রর্‌সাক্‌ (Rorschach) এর অবদান হচ্ছে কালির দাগ নিয়ে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা। এ কালির দাগ কতগুলি সাদা কালোয়, কতগুলি রঙীন। এ দাগগুলি কোন লোকের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করা হয় এর মধ্যে সে কি দেখছে—কেউ হয়তো বলে একটা প্রজাপতি, কেউ বলে দুটো ডাইনী ঝগড়া কচ্ছে, কারু মনে কোন ছবি জাগে না, কেউ হয়তো সলজ্জভাবে বলে ছবিটা স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের। রর্‌সাকের মতে এ উত্তরগুলি সযত্নে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মনের পরিচয় মেলে। ২২

20. Wilhelm Stekel—How to understand your dreams.
21. Lewin. K.—Principles of Topological Psychology.
22. Rorschach, H.—Psycho-diagnostics.

ম্যারে কালির দাগের পরিবর্তে ব্যবহার কচ্ছেন কতগুলি ছবি। এ ছবিগুলি বিভিন্ন ভাব বিভিন্ন মানুষের মনের জাগায় (Thematic Apperaption Test)। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা বন্ধ দরজার সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। এক হাত তার দরজার উপরে আর এক হাতে মুখ ঢাকা, চুলগুলি অবিন্যস্ত। এ ছবি দেখে কি মনে হয়? একজন উত্তর দিচ্ছে "মেয়েটি বমি কচ্ছে, সে কিছু খারাপ জিনিষ খেয়ে অসুস্থ হয়েছে", আর একজন বলছে "মেয়েটি দুঃখে ও লজ্জায় ভেঙে পড়েছে—খুব কিছু অন্যায় সে করে ফেলেছে—সে কথা বলতে হবে তার মাকে যিনি ওকে এতদিন অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করেছেন।" তৃতীয় ব্যক্তির উত্তর হচ্ছে, "মেয়েটি নিজের চেষ্টায় দরিদ্র অবস্থার থেকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে কিন্তু উঁচু সমাজে মিশতে গিয়ে সে খুব ঘা খেয়েছে, তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে।" চতুর্থ উত্তর হচ্ছে "মেয়েটি বিষম রাগের মাথায় স্বামীকে হত্যা করেছে কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে কি ভয়ানক পাপ সে করেছে—সে অনুতপ্ত ও শোকক্লিষ্ট এবং পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করবার জন্যে মনে মনে তৈরী হচ্ছে।" এ উত্তরগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের মনে প্রতিফলন (Projcetion)। [২৩]

এসব পদ্ধতির কোনটি দিয়েই সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে না। এ পদ্ধতিগুলিতে যথাসাধ্য সাবধানতা সত্ত্বেও ভুলের সম্ভাবনা থাকে। বুদ্ধির মাপের বেলায় যে কথা বলেছি ব্যক্তিত্ব মাপের বেলায় সে কথা আরো বেশী সত্য। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব একটা নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় শক্তি নয়—এর বিকাশ ও পরিবর্তন আছে, কাজেই ব্যক্তিত্ব বিচারের সম্পূর্ণ নির্ভুল পন্থা আজও আমাদের জানা নেই।

ব্যক্তিত্বের আরম্ভ ও বিকাশ—শিশু যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তখনই সে কতগুলি দোষগুণ সম্ভাবনা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। এই সম্ভাবনা ও সংমিশ্রণ যা জন্মগত তাকে যদি ব্যক্তিত্ব বলি, তা হলে প্রত্যেক শিশুরও ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তখন নিতান্ত অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট। ক্রমে যত বয়স বাড়ে তার দেহ ও মনের পরিণতি (maturity) হয় ততই তার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। অলপোর্ট এই প্রকাশকেই ব্যক্তিত্ব বলতে ইচ্ছুক। তাই তাঁর মতে জন্মকালে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না, জন্মের পর থেকেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ, কারণ ব্যক্তিত্ব মানেই হচ্ছে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে

23 Murray, H, Explorations in Personality.

কি নির্দিষ্ট ব্যবহারের মধ্য দিয়ে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে তা। অলপোর্ট এর মতে চতুর্থ মাসের আগে পর্য্যন্ত শিশু অল্প কয়েকটি অঙ্গসঞ্চালন (motility) ও মৌলিক অনুভূতির প্রকাশে (temperament) সমর্থ। এবং এতে চারমাসের আগ পর্য্যন্ত শিশুতে শিশুতে তফাৎ খুব সামান্যই। এ দুটি উপাদানই প্রধানতঃ জন্মগত। চারমাসের পর থেকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা কিছুটা বিভিন্ন অভ্যাসে পরিণত হয়। এর কারণ শিশু দ্রুত তখন শিখছে ও তার দেহ, স্নায়ু ইত্যাদিও পরিণতি লাভ কচ্ছে (learning & maturation)। এখানে শিশুতে শিশুতে মোটামুটি মিল থাকলেও পার্থক্যও ক্রমশঃ লক্ষণীয় হয়। তারপর থেকে বিশিষ্ট গুণ দোষ অভ্যাসগুলি বয়স্ক জীবনেও চলতে থাকে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।২৪ অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পরিবর্তন বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিত্বের একটা অংশ জন্মগত হলেও আর একটা প্রকাণ্ড অংশ পরিবেশগত। এদের মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব কতটুকু, এদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি তা নিয়ে 'বংশানুক্রম ও পরিবেশ' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

ব্যক্তিত্ব গঠনে বিভিন্ন প্রভাব—জন্মগত

এর কতগুলি প্রভাব জীবের দেহগত (Biological influence) এই জৈবিক প্রভাবগুলির **প্রথম** হচ্ছে এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডস্ বা রসক্ষরা। গ্রন্থির ক্ষরণ। বিভিন্ন গ্রন্থির মধ্যে প্রধান হচ্ছে পিটুইট্যারী, থাইরয়েড্, এ্যাড্রিন্যাল্ ও ওভ্যারী বা টেষ্টিস। এদের থেকে ক্ষরিত দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ ব্যক্তির বুদ্ধি, অনুভূতি, ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। পূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় দেহের গঠন—বিভিন্ন গঠনের লোকের মানসিক গঠনও আলাদা আলাদা হয়। এ গঠন অন্যের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তার নিজের ব্যবহারও প্রভাবান্বিত করে। একটি সাড়ে ছয় ফুট লম্বা জোয়ান মানুষকে অন্য মানুষে সমীহ করে—সেও তা জানে। তা দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হয়ই। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী তরুণী মেয়ে তার চার পাশের ভক্ত মণ্ডলীকে চকিত করে তোলে—নিজেও যদি তাই একটু 'ভাবুনী' হয় তা হ'লে আর আশ্চর্য্য কি ? বর্তমানকালে দৈহিক গঠনের সঙ্গে মনের ধরণের (temperament) সম্বন্ধ নিয়ে শেল্‌ডনের পরীক্ষা সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। একথা পূর্বেও সামান্য আলোচনা করা গেছে।

24 Allport G. W. Personality.

তৃতীয় হচ্ছে স্নায়বিক গঠন—আমাদের স্নায়ুগুলি নমনীয় (plastic)—তাদের মধ্যে যেমন আছে পরিবর্তন বিরোধিতা তেমনি আছে পরিবর্তন প্রবণতা। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সামনে যা আসছে, যা আমাদের স্মৃতিকে বা কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ কচ্ছে, তা আমাদের স্নায়বিক গঠনকে নানাভাবে ধাক্কা দিচ্ছে, পরিবর্তন কচ্ছে। ব্যক্তিত্বের শক্তি ও ঐক্য বিশেষ করে এই স্নায়বিক গঠনের উপর নির্ভরশীল। দেহের পরিবর্তন উপেক্ষা করা যেতে পারে—কিন্তু একটা বিষম স্নায়বিক উত্তেজনা চিরকালের জন্যে ব্যক্তিত্বের উপর দাগ রেখে যায়।

ব্যক্তিত্ব গঠনে বিভিন্ন প্রভাব—পরিবেশগত

স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে শিশুর জীবনে সব চেয়ে প্রবল প্রভাব হচ্ছে গৃহ পরিবেশ। এখানেই শিশুর জীবনের প্রথম আরম্ভ, প্রথম বিকাশ। পিতামাতার স্নেহ-মমতা, ভাই বোনদের সঙ্গ, তাদের সঙ্গে ঝগড়া-ভালবাসা, পিতার আর্থিক সঙ্গতি, গৃহের স্বাস্থ্য, সকলের উপর পিতামাতার চরিত্র শিশুর জীবনে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। গৃহ পরিবেশ যেখানে স্নেহপূর্ণ, নিরাপদ, নির্মল, স্বাস্থ্যকর ও উৎসাহপূর্ণ সেখানে ভাল ছেলে মেয়ে তৈরী হয়। এতে সু-অভ্যাস সুরুচি গঠিত হয়, উৎকৃষ্ট সামাজিক গুণের বিকাশ সম্ভব হয়। যেখানে পিতামাতা কলহপরায়ণ, নির্মম, উৎপীড়ক, খামখেয়ালী, সেখানে শিশু ভীরু, অসামাজিক, ক্রুর, সন্দিগ্ধ অথবা অসামাজিক বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। তাই দুষ্ট গৃহপরিবেশ থেকে উদ্ধার করে নির্মল, স্নেহপূর্ণ পরিবেশে শিশুদের লালনের ব্যবস্থা করলে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অবশ্য একই অবস্থায় দুইটি শিশুর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হতে পারে কারণ বংশক্রমের জন্মগত প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়। তবুও পরিবেশ অনুকূল হলে বুদ্ধির যেমন উন্নতি হয়, সমগ্র ব্যক্তিত্বেরই তেমনি উন্নতি হয়। যদিও সব পিতামাতাই মনে করেন সন্তান পালনের উপযুক্ত শিক্ষা তাঁদের আছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় কথাটা মোটেই সত্য নয়। এ জন্যে আমেরিকায় পিতামাতাদের সুগৃহ রচনা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া ব্যবস্থা আছে। সেখানে চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক এর অভিজ্ঞ কর্মীরা পিতামাতাকে সাহায্য করে থাকেন, শিশুদের পরীক্ষা করেন, প্রয়োজন হলে তাদের চিকিৎসা করেন। যেখানে পিতামাতা শিশুদের উপর উৎপীড়ন করেন বা অত্যন্ত অবহেলা করেন, সেখানে পিতামাতার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। যে সব গৃহপরিবেশ নিতান্ত

অবাঞ্ছিত, অথবা যেখানে শিশু পরিত্যক্ত সেখানে তাকে সরকারী 'হোমে' উদ্ধার করে নিয়ে পালন করেন। এতে সুফল পাওয়া যায়। তবে এ কথা সত্য পিতামাতার স্বাভাবিক স্নেহের প্রকৃত বিকল্প নেই।

এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষা খুবই কঠিন—তথাপি কিছু অভিনব পরীক্ষার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে "ফেল্‌স্ পেরেণ্ট বিহেভিয়ার্ রেটিং স্কেলস্" (Fels Parent Behaviour Rating Scales) এ।[২৫] এতে গৃহপরিবেশ ও তার প্রভাব পরিমাপ করা হয়। পিতামাতার ৩০টি প্রধান দোষগুণ বেছে নিয়ে এবং শিশুর উপর তার প্রভাব দিয়ে গৃহগুলিকে ভাল, মন্দ, মাঝারী ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়। এ স্কেলকে ভিত্তি করে আরো নূতন নূতন পরীক্ষা নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। রফ্ (Roff) এই ত্রিশটি গুণকে সাতটি প্রধান গুণে কমিয়ে তাদের মধ্যে কোরেলেশন্ স্থির করতে চেষ্টা করেছেন। এ সাতটি গুণ হচ্ছে—১। শিশুর প্রতি স্নেহ (Concern for child) ২। প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী অনুযায়ী শিশুকে পরিচালনা (democratic guidance) ৩। শিশুকে স্বাধীন ক্রিয়ার অনুমতি-দান (Permissiveness) ৪। পিতা-মাতা ও শিশুর মধ্যে মনের মিল, (Parent child harmony) ৫। পিতা-মাতার মধ্যে মিল, সমাজের সঙ্গে মিল (sociability-adjustment of parents) ৬। গৃহে উৎসাহ ও ক্রিয়াশীলতায় আগ্রহ (activeness of home) ৭। শিশুকে সক্রিয় ইঙ্গিত দ্বারা পরিচালনার অভাব (non-readiness of suggestion)।[২৬] এ সব পরীক্ষায়ও এই সত্যটিই প্রমাণিত হয় যে—যে গৃহ স্নেহপূর্ণ, নির্মল ও উৎসাহপূর্ণ, যেখানে শিশুর ইচ্ছা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয় না, যেখানে তার কিছুটা স্বাধীনতা আছে অথচ শাসনও আছে সেখানেই শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র। বলডুইন্ ক্যাল্‌হর্ণ এবং ব্রীস্ (Baldwin, Kalhorn & Breese) ফেলস্ রেটিং স্কেল্ ১২৫ টি পরিবারে ব্যবহার করে তিনটি প্রধান সিন্‌ড্রোম (major syndromes) লক্ষ্য করেছেন।

১। যেখানে প্রজাতন্ত্র শাসন পদ্ধতি বর্তমান (democracy in the home) অথবা অভাব (or parent dominance.)

২। যেখানে শিশু পিতামাতার স্নেহে নিরাপদে অবস্থিত অথবা যেখানে শিশু পিতামাতার স্নেহ বঞ্চিত (acceptance or rejectance)

25 Champney. H. Child Development P 131-166
26 Roff. M. Child Development P 29-45

৩। যেখানে শিশু অতিরিক্ত আদর পায় (indulgence)

এ পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যেখানে শিশু স্নেহবঞ্চিত সেখানে সে বিদ্রোহী, কলহপরায়ণ, নিষ্ঠুর ইত্যাদি। যেখানে শিশু অতিরিক্ত আদর পায় সেখানে সে পরনির্ভর, স্বার্থপর, মৎলববাজ হয়। যেখানে শিশু পিতামাতার স্নেহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অথচ যেখানে অতিরিক্ত আদর নেই—যেখানে শিশুর অধিকার ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি পিতামাতার শ্রদ্ধা আছে, সেখানে শিশুর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে।[২৭]

ব্যক্তিত্বের উপর বিদ্যালয় ও শিক্ষকের প্রভাব ঃ—শিশুর জীবনের সব চেয়ে গ্রহণোন্মুখ ও বিকাশ সম্ভাবনার কাল যখন তারা বিদ্যালয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে তার জ্ঞান, অনুভূতি ও ক্রিয়ার কতগুলি মৌলিক প্রয়োজন মিটতে পারে বা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এখানে বহু অনিশ্চয়তা, ভয়, দুঃখ, বেদনা ও নিরাশারও কেন্দ্র। এখানে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, বন্ধুত্ব, ঈর্ষা, নেতৃত্ব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠিত, বিকশিত, বা বিকৃত হয়ে ওঠে। সামাজিক ব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্র গৃহের চেয়ে এখানে বিস্তৃততর। এসব কারণে বহু ব্যক্তির জীবনে বিদ্যালয়ের প্রভাব অবিস্মরণীয়। তাঁদের ভাল বা মন্দ হয়ে গড়ে ওঠার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ এখানেই উপ্ত। বর্তমান জগতের শিক্ষার ধারায় বিদ্যালয়ের প্রসার ও দায়িত্ব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ বিশ্বাস কচ্ছে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুগঠিত করবার প্রধান দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। এ বিশ্বাস ভাল কি মন্দ এ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন কিন্তু শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে ও পরিবর্তনে বিদ্যালয় সাহায্য করতে পারে এ কথা সমস্ত শিক্ষানীতির মূল।

বিদ্যালয়ের যে প্রভাব ছাত্রের জীবনে সর্বাধিক সে হচ্ছে শিক্ষক—তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র—তার পরেই হচ্ছে তার সহপাঠিরা। শিশুর দেহের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার প্রধান দায়িত্ব পিতামাতার কিন্তু তার মানসিক প্রয়োজন (Psychological need) গুলি মেটাবার অনেকখানি দায়িত্ব শিক্ষকের। প্রত্যেক শিশু চায় শিখতে, জানতে, গড়তে, দশের মধ্যে, দলের মধ্যে গৃহীত হতে। শিক্ষক ও সহকর্মীরা এ অভাবগুলি যেখানে মোটামুটিভাবে মেটায় সেখানে শিশুর ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে। যেখানে এ প্রয়োজনগুলি মেটেনা বা প্রায়শঃ ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার

27 Baldwin, Kalhorn & Breese. The appraisal of parent Behviour. Psychol. Monogram. 1949, 63 No 4.

অনুভূতির স্বচ্ছন্দ পরিতৃপ্তির অভাবে মানসিক নানা বিকৃতি দেখা দেয় এবং এমন শিশু সমাজজীবনে খাপ খাইয়ে চলতে অসুবিধা বোধ করে।

প্রত্যেক শিশুই শিখতে চায়, এবং সে যে শিখছে তা জানাতে চায়। শিক্ষকের পক্ষে তাই প্রয়োজন শিশুর এই স্বাভাবিক আকাঙ্খাকে কি করে কাজে লাগাতে হয় তা জানা। কি করে শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়, কি করে এ আগ্রহ রক্ষা করা যায়, বৃদ্ধি করা যায়, তা তাঁর জানা চাই। আগ্রহ সৃষ্টি ও তাকে কাজে লাগানো এর মধ্য দিয়ে শিশুর বুদ্ধিরই বিকাশ হয় না তার সমগ্র ব্যক্তিত্বটিই বিকশিত হয়। প্রত্যেক শিশুর সাধ্য ও ক্ষমতানুযায়ী কাজ বা পড়া দিলে, সে শিখতে বা কাজ করতে স্বভাবতঃই আগ্রহান্বিত হয়। উল্টোটি হলে সে নিরুৎসাহ হয়, এবং এর জন্যে বেশী শাস্তি দিলে সে ভয় পায়, বিরক্ত হয়, পালাতে চায়, বিদ্রোহী হয়। এতে তার মনের গঠনটাই বিরূপ গতি নেয়। এখানে একটা খুব দরকারী কথা জানা দরকার। প্রত্যেক শিশুই শিক্ষক ও পিতামাতার প্রশংসাকাঙ্ক্ষী—এর মূল্য শিশুর জীবনে অসামান্য। সে যেখানে ঠেকে গেছে, সেখানে শিক্ষকের সামান্য একটু মনোযোগ, সামান্য একটু সহানুভূতি, সামান্য একটু সাহায্য শিশুকে অনেকখানি এগিয়ে দেয়।২৮ শিক্ষার ব্যাপারে প্রশংসা ও নিন্দার মূল্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। টমসন্ দেখেছেন উচ্চপ্রশংসা ও মৃদু-নিন্দা ছাত্রদের ক্লাশে পড়ায় উন্নতি, সামাজিক অবস্থায় ভাল মানিয়ে নেওয়া, ইত্যাদি অনুকূল ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক। তীব্রনিন্দা ও মৃদু প্রশংসায় ছাত্রেরা পিছিয়ে পড়ে।২৯ বিশেষতঃ যে ছাত্রেরা অভিমানী (introvert) তাদের উপর তীব্রনিন্দার ফল অধিকতর প্রতিকূল। টম্‌সন্ ও হানিকাটের পরীক্ষায় এ তথ্যাদি জানা যায়।৩০

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের কোন কোন গুণ ছাত্রদের উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। যে শিক্ষক স্নেহশীল, অপক্ষপাত, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, যাঁর রসবোধ আছে, যিনি দ্বিধাগ্রস্ত নন্ তিনি সহজেই ছাত্রদের চিত্ত জয় করতে পারেন। যিনি কথায় কথায় শাস্তি দেন, যিনি ক্লাশে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব দেখান, যিনি ভাল পড়াতে পারেন না, যাঁর মুদ্রাদোষ আছে, যিনি অতিরিক্ত পরিমাণে লঘু তাঁকে ছাত্রেরা গ্রহণ করে না। তাই ছাত্রদের উপর তাঁর প্রভাব

28 Millard, Child growth & Development P. 398

29 Thompson G. G. Child Psychology P 530-31

30 Thompson Hunnicuts G. W. The effect of repeated praise or blame on the work achivement of introvert. and extroverts J. Edn Psycho 1944

অনুকূল নয়। আরসিল্ড এবং লীড্স্ ও কুক্ ছাত্রেরা শিক্ষকের কোন্ গুণ দ্বারা আকৃষ্ট অথবা অনাকৃষ্ট এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা করে দেখেছেন। আরসিল্ড দেখেছেন শিক্ষকের নিম্নলিখিত গুণগুলিকে ছাত্রেরা সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে।

(১) মানবিক গুণ (human qualities)—সহানুভূতি, স্বাভাবিকত্ব, ভাল মেজাজ ইত্যাদি।

(২) শৃংখলা রক্ষা সংক্রান্ত গুণ (disciplinarian qualities)—অপক্ষপাত, নিয়মনিষ্ঠ, অনির্মম, দৃঢ় ইত্যাদি।

(৩) দৈহিক গুণ (physical appearance)—ভাল চেহারা, পরিচ্ছন্ন পোষাক, সুন্দর উচ্চারণ ইত্যাদি।

(৪) শিক্ষকতা গুণ (teaching qualities)—বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, উৎসাহ, মনোজ্ঞ প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি।

দেখা যায়, শিক্ষকের মানবিক গুণই ছাত্রদের উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। শিক্ষকের চেহারা বা সাজপোষাক সম্বন্ধে মেয়েদের ঔৎসুক্য বেশী। লীডস্ আর কুক্ দেখেছেন, যাঁরা অযথা বকাবকি করেন, বেশী টাস্ক দেন, পক্ষপাত করেন, তাঁদের ছাত্রেরা সব চেয়ে বেশী অপছন্দ করে। আমাদের দেশের ছাত্রদের সম্বন্ধে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তারা শিক্ষকের নৈতিক চরিত্রগুণের প্রতি সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধান্বিত।

যে শিক্ষক জীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতায় বিষাক্ত, সন্দিগ্ধ, মানুষের মহত্ত্বে শ্রদ্ধাহীন, যিনি নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করেন অর্থাৎ সমাজজীবনের সঙ্গে যাঁর মিল হচ্ছে না (mal-adjusted) তেমন শিক্ষক ছাত্রদের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি খিটখিটে মেজাজ, ছাত্রদের সততায় সন্দিগ্ধ, নির্মম ও নেতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন হন্। এ সম্বন্ধে বয়নটন্, বারুচ্, স্নাইডার ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানী নানা পরীক্ষার ফলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যে অসন্তুষ্ট, অবিশ্বাসী, অশ্রদ্ধাশীল শিক্ষক ছাত্রদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে বাধাই সৃষ্টি করেন এবং ছাত্রদের মানসিক বিকৃতির জন্য এঁরা অনেক সময় দায়ী। গ্ল্যাড্স্টোন্ কিন্তু কতকটা বিপরীত সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেন অনেক সময় দেখা যায়, যে সব শিক্ষক জীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতায় আগুনে পোড় খেয়েছেন তাঁরাই বেশী যত্নবান্ হন ছাত্রদের অনুরূপ দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে। তাঁরা নিজেরা সমাজ-বিচ্ছিন্ন বলেই এর কারণ ও এর বিপদ সম্বন্ধে বেশী সচেতন। তাই

ছাত্রদের সম্বন্ধে এঁদের যত্ন ও সাবধানতা বেশী। এটা কখনো কখনো সত্য কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রথম মতটাই বেশী সত্য মনে হয়।

ছাত্রেরা নিজেরা চেষ্টা করে কিছু করতে চায়, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা মতামতের কিছুটা মূল্য আছে, এটা বুঝতে চায়। যে শিক্ষক তাদের এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিপদেই বাধা দেন তিনি ছাত্রদের হয় পরনির্ভর, না হয় মনে মনে বিদ্রোহী করে তুলছেন। শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের হাতে প্রভূত ক্ষমতা। কাজ সহজ করবার জন্যে অহংকার পরিতৃপ্তির স্বভাব থেকেই অনেক শিক্ষক স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের উপর এর কুফল তাঁরা চিন্তা করে দেখেন না। এ বিষয়ে মাওরার (Mowrer) এবং লিউয়িন (Lewin) কতগুলি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করে দেখেছেন যে যেখানে গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানেই ছাত্রদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, তাদের দায়িত্ববোধ, কর্ম্মোদ্যম, সামাজিক বোধের সুস্পষ্ট অনুকূল পরিবর্তন ঘটেছে। রাশিয়াতে অনুরূপ পরীক্ষায় আশানুরূপ সুফলই পাওয়া গেছে।[৩১] লিউয়িনের মতে অটক্র্যাটিক পদ্ধতির বিপদ হচ্ছে এতে ছাত্ররা অনেক বেশী সহজে প্রভাবান্বিত হয় কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শে অভ্যস্ত হওয়া সময়-সাপেক্ষ।

শিক্ষকেরা ছাত্রদের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তা কখনো কখনো গভীর ও স্থায়ী। কিন্তু এ প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে করা যায় না। অপ্রত্যক্ষভাবে এবং অচেতনভাবেই অনেক সময় শিক্ষকের চরিত্র, ব্যবহার, আদর্শ ছাত্রদের মনের উপর দাগ কাটে। কিন্তু নৈতিক শিক্ষা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তির 'চেষ্টায়' প্রায়ই সম্ভব হয়। সামাজিক পরিবেশটি যেখানে প্রতিকূল সেখানে শিক্ষকের শিক্ষা ব্যাহত হতে পারে। নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে সমাজে এমন কি শিক্ষকে শিক্ষকে বিভিন্নতা বা বিরোধিতা রয়েছে। তাই বিদ্যালয়ে নৈতিকশিক্ষা বর্ত্তমানে নিতান্তই আকস্মিক এবং অ-ফলপ্রসূ। হার্টসর্ন ও মে এ বিষয়ে বহু আলোচনা করে রচনাত্মক এবং সুসমঞ্জস নীতি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।[৩২] এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতের আশ্রম বিদ্যালয়ের

---

31 Lewin. K. Experiments in Social Sci Har. Edn. Rev 19 9 No 1

32 Hartshorn & May & Shuttleworth. Studies in the nature character ;

আদর্শ অধিকতর কার্যকরী কারণ সেখানে গুরুর প্রভাব ছাত্রের উপর অনেক প্রত্যক্ষ ও প্রাণবন্ত।

সহপাঠীদের প্রভাব—যেমন শিক্ষকের প্রভাব আছে ছাত্রের ব্যক্তিত্ব গঠনে, তেমনি তার সহপাঠীদেরও প্রভাব সামান্য নয়। তাদের সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, পরিবর্তিত হয়। গৃহের ক্ষুদ্রতর গণ্ডীতে তার বহু দোষগুণ ক্ষমতা, বিকাশের সুযোগ পায় না। বিদ্যালয়ের বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন আছে তাকে উদ্বুদ্ধ করে, উৎসাহিত করে, আত্মপ্রকাশে উৎসুক করে তোলার জন্য। সামাজিক সামঞ্জস্য অর্জনের শিক্ষা ব্যক্তিত্ব গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে খেলা, একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে গান করা, বিশ্রাম করা ছাত্রের ব্যক্তিত্বের নানা দিককে ফুটিয়ে তোলে। একটা দলের দ্বারা গৃহীত হওয়া একটা মৌলিক জৈব প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানীরা একে যথেষ্ট মূল্য দেন। কিন্তু 'দল' যেমন ভালর দিকে টেনে তুলতে পারে, মন্দের দিকে টেনে নামাতেও পারে। হিংসা, ঈর্ষা, কলহ, মিল না হওয়া ছাত্রের জীবনে বহু দুঃখের কারণ হতে পারে। বর্তমান যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ চায় ব্যক্তি প্রচলিত গণ্ডী, প্রচলিত ব্যবস্থা মেনে চলুক। তাই যাদের তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব আছে, যারা নূতন পথে চলতে চায় তারা দুঃখ পায়, বাধা পায়। এ সমাজ-ব্যবস্থা বৃহৎ ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল নয়। তাই বার্টরাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনীষী ব্যক্তিরা বর্তমান অসহিষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থার নিন্দা করেছেন।

ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব—গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয় ছাত্রদের উপর নানা-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে এ কথা সত্য, তাই গৃহপরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশ উন্নততর করবার সব প্রচেষ্টাই প্রশংসনীয়। কিন্তু ছাত্র শুধুই কি গ্রহণ করে, শুধুই প্রভাবান্বিত হয়? তা নয়। সব প্রভাব সে সমানভাবে গ্রহণ করে না, করতে পারে না। তার নিজের মধ্যে কোন প্রভাব গ্রহণ করবার যোগ্যতা আছে, প্রবণতা আছে। এ তার হয়ত বা জন্মগত গঠন। তাই সব শিক্ষাই ছাত্রের কাছে পৌঁছে না—তার নিজের মধ্যেই আছে তার বাধা ও বিরুদ্ধতা। কাজেই মনে রাখতে হবে এক হিসাবে একথাটি মূলতঃ সত্য—আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলি। ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেমন আছে কতকটা অপরিবর্তনীয়তা, তেমনি আছে পরিবর্তন প্রবণতা। সচেতন চেষ্টায় আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের পরিবর্তন করতে পারি। এমন ঘটনা বিরল

নয়। হঠাৎ একটি শুভ মুহূর্তে ডাক এসে পৌঁছে, "বেলা যে যায়" তখন ঘোর সংসারী লালাবাবুর শান্তিহীন প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে—অসম্ভব সম্ভব হয়—বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করে। ভারতীয় সাধকেরা বলেন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে 'ব্রহ্মসত্তা', ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত আবরণের জঞ্জাল ছাড়িয়ে ফেলতে পারলে সে আগুন স্বীয় ভাস্বরতায় আত্মপ্রকাশ করে। তবে তা আরামের পথে—সুখের পথে আসে না। তার জন্য চাই আন্তরিক প্রয়াস,—কঠোর সাধনা

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কি ?—কোন ব্যক্তিত্বটি শ্রেষ্ঠ ? যাঁর বিভিন্ন বৃত্তি, শক্তি, অনুভূতি ও ক্রিয়া সুসমঞ্জস—যিনি নানা সাময়িক ও বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার দাস নন—যিনি তাঁর জীবনকে একটি স্থির কেন্দ্রে সংহত করেছেন তিনিই ব্যক্তিশ্রেষ্ঠ —তাঁকেই ভারতীয় দর্শন বলে যোগী, স্থিতধী। খুব কম মানুষই এই আদর্শে পৌঁছতে পারে। তবুও সব মানুষের মধ্যেই কিছুটা কেন্দ্রীভূত ও সমঞ্জস (centredness and consistency) হওয়ার চেষ্টা আছে। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও তাই আমাদের প্রত্যেকেরই একটা 'একতা' আছে।

ব্যক্তিত্বের বিকার—কিন্তু কখনো কখনো শারীরিক বা মানসিক বিকারের ফলে ব্যক্তিত্বের এই একতা বিপন্ন হয়। বিষম এবং চূড়ান্ত বিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের একতা ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, অথবা মানুষ উন্মাদ হয়ে যেতে পারে। এসব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অন্যত্র করেছি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অবচেতন মন ও মনঃসমীক্ষণ

Psychology of the Unconscious and Psycho-analysis

১৮৮০ সালে ভিয়েনায় ডাক্তারের যোশেফ্ ব্রয়ার এর কাছে, একটি হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণী এল চিকিৎসার জন্য। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখা গেল, মেয়েটির গ্লাস থেকে জল খেতে, বিষম ঘৃণা। মেয়েটির জীবন ইতিহাসে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানতে পারা গেল না, যার সঙ্গে ওর রোগের বা এই বিষম বিরূপতার কোন সম্বন্ধ থাকতে পরে। মেয়েটিকে ডাক্তার সম্মোহিত (hypnotised) করলেন, এবং তার অতীত জীবনের কাহিনী বলতে বললেন। কথায় কথায় মেয়েটি বল্ল, অনেকদিন আগে, ও এক ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়েছিল, সেখানে দেখল ভদ্রলোকটি পোষা কুকুরকে গ্লাস থেকে জল খাওয়াচ্ছেন। এ দৃশ্যে, ওর মনে একটা বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে ও ব্যাপারটা চেপে গেল, ঘেন্নাটা আর প্রকাশ কল্লে না। খুব আশ্চর্য্যের কথা যে, সম্মোহিত অবস্থায় এ কথাটা প্রকাশ করবার আগে, ও ঘটনাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল এবং আরো আশ্চর্যের কথা, মনের মধ্যে এই যে অপ্রীতিকর অনুভূতি বিস্মৃত ও নিরুদ্ধ হয়েছিল—সম্মোহিত অবস্থায় তা মুক্তি পেয়ে, মেয়েটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুললো।[1]

এই সামান্য ঘটনাটি, মনোবিজ্ঞানের জগতে যুগান্তকারী একটি মতবাদ ও পদ্ধতি সৃষ্টির সূত্রপাত করল। ব্রয়ারের সহকর্মী, আর একজন তরুণ ডাক্তার, সিগ্‌মুণ্ড ফ্রএড এই ঘটনার মধ্যে, একটা নূতন আলোকরেখার সন্ধান পেলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্ত করলেন, যে (১) চেতনমানসই আমাদের সম্পূর্ণ মনোজগৎ নয়। (২) চেতন মনের কোন কোন ক্রিয়া, কোন কারণে, মনের সেই আলোকিত স্তর থেকে বিচ্যুত হয়ে, মনের গভীরতর কোন গোপন স্তরে নিরুদ্ধ হয়ে থাকে। (৩) অবচেতন মনের এই নিরুদ্ধ কামনা, সমস্ত মানসিক বিকারের মূলে বিদ্যমান থাকে। (৪) এই নিরুদ্ধ কামনা বা অনুভূতি, চেতনমানসে মুক্তি পেলে, মানসিক বিকার আরোগ্য হয়। অবশ্য একদিনেই তিনি এ

1 Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology, P. 311.

সিদ্ধান্তে পৌঁছেন নি। শারকোঁ (Charcot) অবশ্য ইতিপূর্বে সম্মোহন দ্বারা (hypnotic suggestion) মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু তিনি অবচেতন মনের অস্তিত্ব বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। ফ্রএড এ ঘটনার কিছুদিন পর শারকোঁর কাছে প্যারীতে বিদ্যালাভ করতে যান। তাঁর আর একজন সহপাঠি ছিলেন জ্যানেট্। জ্যানেট্ অবচেতন মন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করেছিলেন। এবং তিনি একটি মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, যে মন একটা অবিচ্ছিন্ন স্রোত নয়। তার মধ্যে কখনো কখনো, একাধিক পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্রোত চলতে থাকে। মানসিক শক্তির দুর্বলতার জন্তে, ব্যক্তির চেতনমানস এই বিচ্ছিন্ন স্রোতগুলিকে একত্র করতে না পারলেই মানসিক বিকার ঘটে। এ ঘটনাকে তিনি বলছেন ডিসোসিয়েস্তান্।[২] এই ডিসোসিয়েস্তান্ তত্ত্ব ফ্রএড্ এর দর্শনে ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু জ্যানেট ও ফ্রএড্ এর মধ্যে এ বিষয়ে পার্থক্য যথেষ্ট আছে। জ্যানেটই প্রথম ডিসোসিয়েস্তন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন সত্য, কিন্তু কেন মনের কোন একটি অভিজ্ঞতা সমগ্র চেতনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, অবচেতন মনে বিস্মৃতির অন্ধকারে আত্মগোপন করে, এবং কি শক্তির দ্বারাই বা এই বিচ্ছিন্নতা ঘটে তার সুব্যাখ্যা দেন নি। ফ্রএড্ এই ডিসোসিয়েস্তনের 'কেন'র উত্তর দিতে গিয়েই, তাঁর বহু বিচিত্র দর্শন-হর্ম্যের ভিত্তিমূলের সন্ধান পান। ফ্রএড্ বল্লেন যে মনের কোন আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা মূল স্রোতমানস থেকে তখনই বিচ্ছিন্ন হয়, যখন তা ব্যক্তির সমগ্র চেতনমানসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বিরোধী এবং এ বিরোধের প্রধান কারণ হল যে সেই অভিজ্ঞতা বা আকাঙ্ক্ষা সমাজের দৃষ্টিতে দোষণীয়। জ্যানেট কিন্তু বলেছিলেন যে ব্যক্তির মানসিক শক্তির দুর্বলতা বিভিন্ন বিরুদ্ধ স্রোতকে একত্র সংহত করতে পারে না বলে এই বিচ্ছেদ (dissociation) ঘটে।[৩] একদিন আর একটি হিষ্টিরিয়া রোগিণীর সম্বন্ধে শারকোঁর ছাত্ররা আলোচনা কচ্ছিলেন এবং তাঁদের একজন শারকোঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন বিশেষ

২ Hart—The Psychology of Insatity (Introduction to 4th edn,, Xvii.)

৩ 'Whereas Janet considers that it is due to a lack of power, on the part of the feeble subject, to gather together, to condense his psychological phenomena, and assimsiate them to his personality, Freud thinks that dissociatien is due to an active incompatibility, between the dissociated elements and the rest of the mind'. Flugel—A Hundred Years' of Psychology, P. 280

কতগুলি উপসর্গ, এ বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা দেয় ? শারকোঁ বেশ উত্তেজিতভাবে উত্তর দেন যে এ জাতীয় উপসর্গের মূল, সর্বদাই কোন না কোন প্রকার যৌন-আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। একটু থেমে, তিনি খুব জোর দিয়ে বল্লেন, "সর্বদা, সর্বদা, সর্বদাই !" এ কথাগুলি ফ্রএড্ এর মনে গভীর রেখাপাত করলো, এবং তিনি মানসিক বিকার ও ডিসোসিয়েশন্ এর 'ক্লুস'র যে উত্তর খুঁজছিলেন, তার নিশ্চিত সন্ধান পেয়েছেন বলে তাঁর বিশ্বাস হোল। পরবর্তী কালে 'সেক্স' কথাটির তাৎপর্য ফ্রএডীয় দর্শনে বহু পরিবর্তিত হয়েছে এবং তা ব্যাপকতর মর্যাদা লাভ করেছে। অর্থাৎ কাম শুধু মানসিক বিকারেরই মূল কারণ নয়—তা মানব জীবনের সমগ্র ক্রিয়া ও উত্তমের মূল ভিত্তি, এই বিশ্বাস ফ্রএডীয় বিচিত্র দর্শন সৌধের একটি প্রধান স্তম্ভ।

যাহোক্ ফ্রএড্ ফিরে এসে ক্রয়ারের সহযোগিতায় হিষ্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসা সুরু করলেন। তাঁরা রোগীদের সম্মোহিত করে তাঁদের অতীত জীবনের তুচ্ছ, বৃহৎ সমস্ত কাহিনী বলতে উৎসাহিত করে দেখলেন, অনেক সময় তাদের নিরুদ্ধ ও বিস্মৃত কোন গোপন আবেগ মুক্তি পেয়ে তারা নিরাময় হয় এই মনের কথা বলে, ভার লাঘব পদ্ধতির (the talking out method) উন্নতি বিধান করেই, পরে ফ্রয়েড্ বিখ্যাত মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির (Psycho-analysis) প্রবর্তন করেছিলেন। এ ভার-লাঘবপদ্ধতিকে তাঁরা মানসিক রেচন (mental catharsis বা abreaction) বলেছেন। এ হচ্ছে দেহাভ্যন্তরস্থ দুষ্ট পদার্থ নিষ্কাশন করে, দেহকে সুস্থ করে তুলবারই অনুরূপ ব্যবস্থা।[4]

কিন্তু এ সম্মোহন দ্বারা চিকিৎসার কতগুলি গুরুতর অসুবিধা দেখা যেতে লাগল। খুব গভীর সম্মোহন (deep hypnosis) না হলে এ চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না দেখা গেল। আর অনেক রোগীকে এরকম সম্মোহিত করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া অনেকের রোগ বর্তমানে উপশম হলে ও আবার দেখা দেখা। এর থেকে ফ্রএড এর মনে এ ধারণা হোল, সম্মোহন দ্বারা চিকিৎসা রোগের মূলে পৌছাচ্ছেন না,—তাকে কোন প্রকারে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

4 They called their new method that of mental catharsis, because it operated to eliminte sources of disturbance from the system. They also used the term abreaction, with the sense that talking out the trouble afforded an expression or outlet for the pent-up emotion and then removed it' Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, P·138

রোগীর অবচেতন মনে কোন একটা 'বাধা' সম্পূর্ণ উল্লংঘন করা যাচ্ছে না বলেই, এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ সফল হচ্ছে না। ৫

আর একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটল, তার ফলে ব্রুয়ার তো ভয়ে ভয়ে এ পদ্ধতি ছেড়েই দিলেন। তাঁর একটি রোগিণীর এই সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগে চিকিৎসার ফলে হিষ্টিরিয়া রোগ সারলো বটে কিন্তু গভীরভাবে ডাক্তারের প্রেমে পড়ে গেলেন,—সে এক নাছোড়বান্দা ব্যাপার! ফ্রএড এরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে দমে গেলেন না। বরং এ রকম আরো ঘটনা দেখে, তাঁর বৈজ্ঞানিক মনে এ ধারণা জন্মালো, যে রোগিণী যে ডাক্তারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার কারণ এ নয় যে, সে ডাক্তার ব্যক্তিটিকে ভালবাসে। তার কারণ হচ্ছে, চিকিৎসার ফলে রোগিণীর মনের অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা মুক্তি পেয়ে—সামনে ডাক্তার রূপ বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল একটি পাত্রে, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খোঁজে। ডাক্তার এখানে বিকল্প (substitute) প্রেমপাত্র (love object) মাত্র। এ অবস্থাটাকে তিনি বললেন পাত্রান্তর (transference)। তিনি এটাও বললেন, এ অবস্থাটা সম্পূর্ণ রোগমুক্তির একটা পূর্ব অবস্থা; এতে তাই আশান্বিত হওয়ারই কারণ আছে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এতে ভয়ের কারণ নেই। তবে ডাক্তারের পক্ষে অনাসক্ত বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ মনোভাব রক্ষা করা চাই। ৬

ফ্রএড এবার ব্রুয়ারএর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ও চিন্তায় রত হলেন। তাঁর এ ধারণা দৃঢ়তর হোল যে মানসিক বিকারের মূল, অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা। এটাও তিনি বুঝতে পারলেন, সম্মোহন তখনই চিকিৎসার পদ্ধতি হিসাবে সফল যখন, তা রোগিণীর নিরুদ্ধ কামনাকে সচেতন মনে এনে তার মুক্তি দিতে পারে। রোগী তার মনের সব গোপন কথা খুলে বলে না, বলতে পারে না, কারণ সচেতন মনে আসবার পথে অনেক বাধা

5 'Some obstacles or barriers were circumvented, rather than overcome, by the hypnotic method.' Flugel—A Hunered Years, of Psychology, P 281.

6 "he concluded that it was not his (doctor's) own personality that was attracting these women, but that he was simply 'taken as a subustitute or surrogate for the original object of their love. The love was transferred to him, If he for his part, could continue to treat them while maintaining an impersonal attitude, he might even utilize this transference in the cure'.
Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, P. 13 ?

(resistance)। এ বাধা দূর করাই হচ্ছে চিকিৎসকের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন কাজ। ফ্রএড সম্মোহন করে, রোগীকে মন খুলে তার সব কথা বলতে বললেন। কিন্তু তিনি দেখলেন রোগীর কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সে ভুলে যাচ্ছে—অথবা বলছে, 'তার কিছু মনে আসচে না,' অথবা কিছু বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ কচ্ছে। ফ্রএড বহু পরীক্ষার পরে দেখলেন, এই যে 'ভুলে যাওয়া' এটা সুস্থ জীবনের স্বাভাবিক ভুলে যাওয়া নয়,—এখানে একটা শক্তি কোন কোন ঘটনা বা আকাঙ্ক্ষার স্মৃতিকে, জোর করে আটকে রাখছে। যে ঘটনার স্মৃতি এ রকম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দার্হ বা অপ্রীতিকর। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক বুদ্ধি বা Super Ego, যেন (censor) কাজ কচ্ছে, তার মৌলিক আকাঙ্ক্ষার (libido) উপর। এই জাগ্রত প্রহরীর 'ছি! ছি!'র জন্যেই, এ আকাঙ্ক্ষাগুলি সচেতন মনে আসতে পারে না। তারা তাই অবচেতন মনের গুহায় আশ্রয় নিয়ে সহজ মুক্তির পথ না পেয়ে নানা বিকার (neurosis) ও জটিল গ্রন্থির (complexes) সৃষ্টি করে। এই অবরুদ্ধ, অতৃপ্ত, অসামাজিক কামনাগুলি আত্মরক্ষার জন্যে, সচেতন জীবনের মূল স্রোত-ধারা থেকে বিভিন্ন হয়ে, নিজেদের চারপাশে দুর্ভেদ্য দুর্গ সৃষ্টি করে। এরই নাম ডিসোসিয়েশন। এই যে অভিশপ্ত, নির্বাসিত, অন্ত্যজ আকাঙ্ক্ষার দল, এরা সচেতন জীবনে ঠাঁই না পেলেও, মরে গেল না, এই অশান্ত বন্দীর দল স্বাভাবিক মুক্তির পথ না পেয়ে ক্রমেই চেতনজীবনের ভিত্তিমূলক আহত কচ্ছে। তাই ঘটছে মানসিক বিকার। ওদের সহজ পথে মুক্তি দিতে পারলেই, বাস্তবিক রোগের আরোগ্য। রোগী যখন নিঃসংকোচে তাদের সচেতন জীবনের আলোকে দাঁড় করিয়ে তাদের সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়া করতে পারবে, তখনই সে কলুষমুক্ত হবে। শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যপাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যার শাপমোচন হয়েছিল, এ পৌরাণিক কাহিনী বুঝি মানুষের সেই শৃংখল মুক্তি সাধনারই প্রতীক। না, একথা ঠিক হোল না। কারণ—মানসিক বিকারের শৃংখল-মুক্তি বাইরের থেকে আসে না। চিকিৎসক বাইরের থেকে ঔষধ দিয়ে রোগীকে নিরাময় কচ্ছেন না। রোগীকে সুস্থ হতে হবে, নিজ চেষ্টায়। নিজের সঙ্গে তার বোঝাপড়া করে নিতে হবে। তার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরোধ ঘটাতে হবে, সচেতন জ্ঞানের আলোর সাহায্যে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে। এ মুক্তির মধ্যে ফাঁকির স্থান নেই। এ পথ সহজ নয়। এ আত্মজয়ের পথ,—চিকিৎসক পথপ্রদর্শক মাত্র।

[অবশ্য এত কথা, অত স্পষ্ট করে ফ্রএড্ তখনো বলেন নি। তবে তিনি এটা বুঝেছিলেন ওই বাধা (resistance)-গুলির মধ্যেই আছে রোগের মূল। ওই জট খোলা চাই। তিনি ক্রমে ক্রমে সম্মোহন পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। রোগীকে সম্মোহিত না করে, তাকে আরামে শুইয়ে মন শান্ত হলে, যা তার মনে আসে, যে যে ভাব যে কথা, যে আকাঙ্ক্ষা, তা সে যত তুচ্ছ, যত অর্থহীন, যত অশ্লীলই হোক্—তা বলতে বলা হ'ল। অবশ্য ডাক্তারকে যেখানে রোগী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে, তার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যখন সে নিশ্চিন্ত, তখনই এ পদ্ধতিতে সুফল পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় এক কথা থেকে আর এক কথা, এক ভাবের সঙ্গে আরেক ভাব যুক্ত হয়ে, শেষ পর্য্যন্ত অসতর্ক মুহূর্তে, রোগীর জীবনের বিকারের মূল্যের আভাস পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিকে বলা হোল মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী (Free Association method)। এখানেও অবশ্য বাধা (resistance) দেখা গেল। কিন্তু দেখা গেল, কিছুদিন ধরে এই পদ্ধতি অনুযায়ী রোগীকে কথা বলালে, অসতর্ক মুহূর্তে অচেতন মনের গ্রন্থিটি কোথায় তার আভাষ পাওয়া যায়। আর এই কথা বলার মধ্য দিয়েই রোগীর নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা বা আবেগ, অনেক সময় মুক্তিলাভ করে এবং সম্মোহনের সাহায্যে যেমন তাকে নিরাময় করা যায়, এতেও তাই করা যায়। অবচেতন মনের এ বিশ্লেষণ পদ্ধতিই ফ্রএড এর প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis)। এতে সম্মোহন-পদ্ধতির অসুবিধাগুলি নেই,—আর সকলের থেকে বড় কথা, এখানে রোগীর সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। সম্মোহিত অবস্থায়, রোগী চিকিৎসকের ইঙ্গিত (suggestion) দ্বারা চালিত এবং তার রোগমুক্তির জন্যে সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে চিকিৎসকের উপর। কিন্তু রোগী এখানে বোঝে, তার রোগ সারবে কি না সারবে, তা নির্ভর কচ্ছে তার নিজের উপর। তার মনের ময়লা নিজের চেষ্টায় দুর করেই, তাকে নির্মল হয়ে উঠতে হবে। আমাদের মনে হয়, ফ্রএড্ এর চিকিৎসা পদ্ধতির সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য এইখানে।৭]

৭ এ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, "Through the patient's gradual recall of the emotional episodes which had precipated the conflict, and in particular, through the free recognition and release of pent-up emotion, the struggle could sometimes be terminated and the patients mental health restored. More adequate co operation was secured than was possible through hynosis for, instead of dealing with a passive subject (and all hypnotic subject, Who merely follow the suggestion of the hypnotizer, are passive) he had the patient's active assistance towards revealing the deeply sub-merged tendencies in personality.'

Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology, P, 313.

এই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিই ফ্রএড্-এর জীবন-দর্শন মহীরুহকে পুষ্টি জুগিয়েছে। কিন্তু তাই বলে মনঃসমীক্ষণ ও ফ্রয়েডীয় দর্শনকে অভিন্ন মনে করলে, ভুল হবে। ফ্রএর এর অনুগামীরা সকলেই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁদের মধ্যে সবাই ফ্রএডীয় দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন না। বরং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফ্রএড্-এর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং কোন কোন সময়, নূতন ও ফলপ্রসূ পরীক্ষার পথ দেখিয়েছেন। তবে এদের মধ্যে এই যোগসূত্র রয়েছে, যে এরা সবাই অচেতন মনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং পদ্ধতি হিসাবে মনঃসমীক্ষণকে (খুঁটিনাটি প্রভেদ বাদ দিয়ে) সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

[আমরা মানসিক বিকারের কারণ হিসাবে, অবচেতন মনে নিরুদ্ধ কামনার কথা অনেকবার উল্লেখ করেছি। এ আলোচনা থেকে এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে আমরা পরিণতবয়স্ক মানুষদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাই বলছি। প্রথম প্রথম ফ্রএড্ এরও এই ধারণাই ছিল। কিন্তু এই নিরুদ্ধ কামনার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন, সেগুলি শৈশব কালে গিয়ে পৌঁছেচে। তা ছাড়া তিনি আরো দেখলেন, অল্পবয়স্ক শিশুদের মধ্যেও মানসিক বিকার দেখা দেয়। এ থেকে তাঁর ধারণা হোল, পরিণত জীবনের অশান্তির মূল রয়েছে—শৈশবের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায়। শিশুর মধ্যেই রয়েছে যৌন-অতৃপ্তির প্রথম আভাষ। এ কথাটা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক এবং কুৎসিত মনে হতে পারে এবং বাস্তবিক পক্ষে তাঁর এর মত তুমুল বিরোধিতার ঝড় তোলে। কিন্তু ফ্রএড্-এর সত্যনিষ্ঠ মন এতে বিচলিত হয়নি। তিনি যতই নূতন নূতন পরীক্ষা করতে লাগলেন, ততই তাঁর এ মত দৃঢ় হোল যে শিশু জীবনের কোন অবরুদ্ধ আবেগই পরবর্তী জীবনের বহু অসঙ্গতির (mal-adjustment) কারণ। ৮]

শিশুর জীবনে অবরুদ্ধ তীব্র আবেগ বরং বোঝা যায়—যেমন, হঠাৎ বিষম ভয় পাওয়া, কিন্তু তার উপযুক্ত প্রকাশের উপায় না থাকা। কিন্তু শিশুর আবার যৌন আকাঙ্ক্ষা কি? অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পরিণত মানুষের যৌন-আকাঙ্ক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, শিশুর বেলায় তেমন কিছু হতেই পারে না। কিন্তু ফ্রএড্ এর মনে সেক্স হচ্ছে জীবনের সমস্ত উদ্যম, কর্ম ও আকাঙ্ক্ষার মূল, তাই এর বীজও শিশুর মধ্যে থাকবেই। শিশু তার দেহের কোন কোন প্রত্যঙ্গ

8 "Adult experience seemed to call for emphasis upon the importance of childhood conflicts as basic for acjustment".

Murphy—Historical Introduction to Contemporary Psychology. P, 313.

নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে, দুলতে ভালবাসে, মায়ের কোমল উষ্ণ স্পর্শ ভালবাসে—এ সবই সেই মৌলিক আকাঙ্খার অস্ফুট প্রকাশ। [ফ্রএড্ শিশুর আকাঙ্ক্ষাকে সেক্স না বলে, সেক্সুয়ালিটি বলেছেন, এবং শৈশব হতে যৌন আকাঙ্ক্ষার ক্রমবিকাশ তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন, তাঁর "Three contributions to the theory of sex" গ্রন্থে (1908) তিনি এই ক্রমবিকাশের কয়েকটি স্তর নির্দেশ করেছেন। শিশুর জীবনে যৌন চেতনা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট এবং কোন নির্দিষ্ট বাহ্য বস্তুতে তা তখনও কেন্দ্রীভূত হয় না। বরং তখন নিজ দেহের কতগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাকে তৃপ্তি দেয়, যা মূলতঃ যৌন আকাঙ্ক্ষা-রই তৃপ্তি। এই স্তরকে বলেছেন তিনি আত্ম-রতির (auto-eroticism) স্তর। শিশু বুড়ো আঙুল চুষে আনন্দ পায়। ফ্রএড্ বললেন একপ্রকার যৌন-তৃপ্তি। যৌন-আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন। শিশুর অস্পষ্ট এবং অব্যক্তিকেন্দ্রিক উত্তেজনা সেই স্বাভাবিক পরিণতির একটি স্তর। তাই শিশুকে তিনি বলেছেন polymorphous pervert, কারণ তার যৌন-তৃপ্তির বস্তু বহু—দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উত্তেজনার মধ্যেই তার তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে। যৌন-আকাঙ্ক্ষা (Sex-instinct) একটা অখণ্ড জন্মগত সংস্থা নয়, কতগুলি জন্মগত সংস্কারের (component-instinct) সমষ্টি। পরিণত জীবনে এই আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় হচ্ছে যোনি এবং স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে, বিপরীত যোনির সঙ্গে সঙ্গম—সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। যখন সেই মূল উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত না হয়ে খণ্ড সংস্কার (comqonent-instinc)-গুলি প্রধান হয়ে পরিণত মানুষের জীবনে দেখা দেয়, তখন তাকে বলা হয় বিকার বা Perversion—যেমন Sadism বা ধর্ষণেচ্ছা। এর বিপরীত রূপ হচ্ছে masochism বা পীড়ন পাবার ইচ্ছা-ধর্ষণেচ্ছা। এখানে ব্যক্তির যৌন-আকাঙ্ক্ষা-রূপ সংস্কার তার প্রকৃত উদ্দেশ্যমুখী না হয়ে সেই সংস্কার এর একটা খণ্ড উপাদনাকে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দিচ্ছে। সেই অর্থে তিনি শিশুর এই প্রথম আত্মরতির স্তরকেও বিকার (perversion) বলেছেন।৯]

এর পরের স্তরে শিশুর ভালবাসা স্বভাবতঃই মাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শিশুর জীবনের এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা কতটা রূঢ়ভাবেই আহত হয়, যখন সে দেখে মায়ের উপর তার দাবী খণ্ডিত হচ্ছে। কারণ মাতার ভালবাসার প্রবলতর দাবীদার হচ্ছে পিতা, কাজেই এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি তার

৯ Fluge!—A Hundred Years of Psychology, P. 284.

অবচেতন মনে ঈর্ষা বা হিংসা জন্মে। এতে তার মনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তাকে তিনি নাম দিয়েছেন ইডিপাস কম্‌প্লেক্স (Oedipus Complex) ; এর বিপরীত রূপ হচ্ছে ইলেকট্রা কম্‌প্লেক্স (Electra Complex)।১০

এর পরের স্তর (এর কথা, ১৯১৪ সালে প্রথম স্পষ্ট করে ফ্রএড্ বলেন) হচ্ছে —স্বকামভাব (Narcissism)। এখানে যৌন আকাঙ্ক্ষা দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে নেই, এ কেন্দ্রীভূত হয়েছে—সমগ্রভাবে নিজ দেহের দিকে। আপনাকেই শিশু এ অবস্থায় ভালবাসে—নিজের প্রেমেই সে মাতোয়ারা। খেলাধুলা তার নিজেকে নিয়েই। এর থেকেই ক্রমে ক্রমে, সে আপনার মতো (অর্থাৎ সমলিঙ্গ) অন্ত শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়—তাদের সঙ্গে মিলে মিশে খেলা করতে ভালবাসে।

এ স্তরকে বলা হয়েছে—সমলিঙ্গ-কাম (Homosexuality)। বন্ধু-বান্ধবদের ভালবাসা, যৌন-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির একটা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় স্তর। সর্বশেষ, যৌবনাগমে ব্যক্তি আকৃষ্ট হয় বিপরীত লিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি এবং তাকে সে সচেতন ভাবেই সন্তান উৎপাদনার্থে কামনা করে। এটাই যৌন-আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি।

[কিন্তু নানা কারণে, ব্যক্তি যৌন-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির যে স্তরগুলির কথা উল্লেখ করা হোল, তা স্বাভাবিকভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে না তার ফলে তার মনে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়, এবং যে স্তরের যে স্বাভাবিক কামবস্তু, (love-object) না পেলে অথবা সে স্তরের স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির গরমিল (mal-adjustment) হলে, সে অনেক সময়ে পূর্ববর্তী স্তরের কামবস্তুকে আঁকড়ে ধরতে চায় (fixation) এবং এ রকম পশ্চাদাবর্তনকে রিগ্রেশ্যন্ (regression) বলা হয়। এমন সব ব্যক্তি তাই দেখা যায়, যথেষ্ট বড় হলেও যারা মায়ের ‘আঁচলধরা’ হয়ে থাকে। এই শিশুসুলভ আচরণকে তাই ইনফ্যাণ্টাই-লিজম্ (Infantilism)ও বলা হয়।]

[ফ্রএডের মতে শৈশব থেকে যৌবনাগম পর্য্যন্ত স্বাভাবিক পরিণত তিনটি প্রধান স্তরে (Infancy Period, Latency Period, Adolescent Period) বিভক্ত। এর মধ্যেও আবার উপবিভাগ আছে। যথা, শৈশবে (Oral stage—early oral, late oral) প্রত্যেক স্তরে কামনা তৃপ্তির জন্ত দেহের বিভিন্ন কেন্দ্র, কামনা তৃপ্তির বিভিন্ন উপায় ও বিভিন্ন কাম্যবস্তু

10 Murphy—Historical Introduction to Contemporary Psychology, P.33

থাকে। যেমন early oral stage এ শিশু চুষে বা গিলে আস্বাদ করে আনন্দ পায়—তখন পর্যন্ত অবশ্য কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য থাকে না। নির্বিচারে সব জিনিষ মুখে তুলে চুষতে থাকে। আর একটু পরের অবস্থায় (late oral stage) শিশু জিনিষ কামড়ায়, দাঁত দিয়ে চিবিয়ে গিলে খেয়ে ধ্বংশ করবার আনন্দভোগ করে। এর পরের স্তরে দেহে কামচরিতার্থের স্থান হচ্ছে পায়ু (Anal stage)। এরও উপবিভাগ হচ্ছে early & late stage এসব স্তরে মল ত্যাগ করে বা বেগ ধারণ করে, ত্যাগ করা (rejecting) ও চালনা করার (Possessing, controlling) আনন্দ শিশু অবচেতন ভাবে লাভ করে। মলত্যাগের ও মল বেগ ধারণের ব্যাপারটাকে সভ্য মানুষ সহজ ভাবে নেয় না। এ সম্বন্ধে শাসন তাড়না দ্বারা শিশুকে বিচলিত করে তোলে। ফ্রএডের মতে এর ফলে শিশুর স্বাভাবিক মানসিক পরিণতিতে বাধা সৃষ্টি হয়। এর পরের স্তরে প্রাথমিক লিঙ্গ সচেতনতা (early genital period) দেখা দেয়। শিশু নিজের লিঙ্গ ধরতে, দেখতে, ঘষতে, অন্যের সঙ্গে তুলনা করতে কৌতুহল প্রকাশ করে। এ স্তরের শিশুর স্বাভাবিক কামবস্তু হচ্ছে মাতা বা পিতা।

এর পরের স্তর কৈশোরে (latency) দেহের কোন নূতন কামকেন্দ্র সৃষ্টি হয় না। আত্মরতি (auto-eroticism) বা স্বকামের (narcissm) কিছুটা উপশম হয়, সে বন্ধু ও সমবয়সী সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সামাজিক সম্বন্ধ সৃষ্টি এ বয়স থেকেই সুরু হয়।

এর পরে যৌবনাগম (Adolescent Period) এর প্রথম অবস্থায় (Late Genital Period) শৈশবের আত্মলিঙ্গ সচেতনতা প্রবলতর হয়, আত্মরতি ও স্বকাম ভাব বৃদ্ধি পায়, কামদ্রব্য হিসাবে পিতামাতার প্রতি আকর্ষণও (Oedipus complex) প্রবলতর হয়। এর পরের স্তরে (Later, functioning of vaginal zone) পরলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়। কামবস্তু হয় সমলিঙ্গ বন্ধু ও সঙ্গিনী ও সর্বশেষ বিপরীত লিঙ্গ স্ত্রী বা পুরুষ। সঙ্গম-ক্রিয়ার মধ্যে সচেতন আনন্দলাভ এ স্তরের স্বাভাবিক অবস্থা (Healy, Bronner Boiser এর Meaning of Psycho-analysis গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ফ্রএডের মতে স্বাভাবিক পরিণতি যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানেই মানসিক বিকৃতি ঘটে।

মনে রাখতে হবে, এ স্তরগুলি পরস্পর বিভিন্ন নয় এবং একই বয়সে সকলে একই স্তরে উপনীত হয় না এবং বিভিন্ন স্তরের অবস্থাই ব্যক্তির মনে এক সঙ্গে অবস্থান করতে পারে।

আমরা আলোচনার মূলসূত্র থেকে দূরে সরে এসেছি। আবার সেখানে ফেরা যাক্। [ফ্রএড ১৮৯২ সালের কাছাকাছি আবিষ্কার করলেন যে অবচেতন মনের সন্ধান পাওয়ার আর একটি অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্র হচ্ছে স্বপ্ন (dreams)।] অবচেতন মনের সাহায্যে, স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (Interpretation of Dreams, 1900), ফ্রএডের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। [স্বপ্ন অনেক সময়ই, আমাদের কাছে অর্থহীন ও সঙ্গতিশূন্য মনে হয়। আবার অশিক্ষিতের কাছে, স্বপ্ন অতিপ্রাকৃত শক্তি বা জগতের দ্যোতক। কিন্তু ফ্রএড বহু সহস্র ব্যক্তির স্বপ্ন তুলনা করে দেখলেন যে কতগুলি ছবি বা অবস্থা অধিকাংশ স্বপ্নেই দেখা যায়। তিনি সন্দেহ করলেন যে এটা আকস্মিক হতে পারে না। এবং মুক্ত অনুসঙ্গ পদ্ধতি ব্যবহার করে, তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করলেন, যে স্বপ্নে অচেতন মনের নিরুদ্ধ কোন না কোন ইচ্ছা পূর্ণ হয়। স্বপ্নে দৃষ্ট ছবি বা অবস্থা (যেমন নদীর স্বপ্ন, উড়ে যাওয়ার স্বপ্ন) প্রতীক্ (symbols) মাত্র।] তারা আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের বিকল্প। কখনো কখনো, অবশ্য স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষা পূরণ সোজাসুজিভাবেই হয়—যেমন পেটরোগা শিশু, ইলিশমাছ খাবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোজাসুজিভাবে ইচ্ছাপূরণ হয় না। কেন এ লুকোচুরি? এর কারণ অনুসন্ধান করে ফ্রএড্ বুঝলেন হিষ্টিরিয়ার বেলায় যেমন অবদমন (suppression) ঘটে, এখানেও ঠিক তাই—একই সূত্র দুই ক্ষেত্রে কাজ কচ্ছে। [মনের মধ্যে গোপন আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই যৌন কেন্দ্রিক ও অসামাজিক, তাই সচেতন সমাজনীতিবুদ্ধি-সম্পন্ন মন (super-ego), তাদের নির্বাসন দেয় অবচেতন মনের অন্ধকার গুহায়। মনের এই খবরদারীর (censor) জন্তে এ আকাঙ্ক্ষাগুলি সচেতন মনে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। ঘুমের মধ্যে এই প্রহরী যখন অসতর্ক হয় তখন এরা ছদ্মবেশে স্বপ্নের মধ্যে নিজেদের পরিতৃপ্তি খোঁজে। প্রতীকগুলি হচ্ছে অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলির ছদ্মবেশ। কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণ করেও ওরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, কারণ সমাজবুদ্ধির প্রহরী বড়ই প্রখর-দৃষ্টি, তাই অনেক সময় অবদমিত ইচ্ছা পরিপূরণের জন্তে আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বা বস্তুর সংক্ষেপীকরণ (condensation) বা স্থানান্তর (displacement) ঘটে।[১১] তাই স্বপ্নের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ছবিতে (manifest content) তার প্রকৃত পরিচয় নয়। তার প্রকৃত তাৎপর্য

১১ Freud—The Interpretation of Dreams.

বোঝা যাবে, তার প্রতীকগুলির অর্থ নির্ধারণে—সেগুলিই হোল স্বপ্ন ব্যাখ্যার গোপন উপাদান (latent content)। স্বপ্নের মধ্যেও আমরা দেখি, চেতন ও ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব এবং তাদের মধ্যে একটা সাময়িক রফাচুক্তি। স্বপ্নের মধ্যে ও অবচেতনের বিরোধটা যখন অসহ হয়ে ওঠে, আর অবচেতন ইচ্ছা বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তখন চেতন প্রহরী অসহিষ্ণু হয়ে ঘুম ভাঙ্গিযে দেয়। এ অবস্থাটাকে আমরা বলি 'বোবায় ধরা'।

একটি স্বপ্ন কাহিনী ও তার ফ্রএডীয় ব্যাখ্যা—এক অবিবাহিত মহিলা স্বপ্ন দেখলেন তাঁর একটি প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, তিনি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজেই আশ্চর্য হলেন, এ ঘটনায় তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। এ স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, এ মহিলার আর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ইতিপূর্বে যখন মারা গিয়েছিল, তখন এ মহিলা যার প্রতি প্রণয়াসক্ত, এমন একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। কাজেই এ স্বপ্নের তাৎপর্য হচ্ছে, যে মহিলা সেই ডাক্তারের সঙ্গ কামনা কচ্ছেন, কারণ, যদি আর একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু ঘটে তখন তাঁর প্রণয়ী আবার উপস্থিত হবেন। ফ্রএড্ তাঁর সূত্র অনুযায়ী বহু স্বপ্নের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন (তাঁর The Interpretation of Dreams গ্রন্থে ১১৯ পৃষ্ঠায়, একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন, সেটি দ্রষ্টব্য)। Dr. A. A. Brill তাঁর "Psycho analysis" পুস্তকেও বহু স্বপ্নের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে ৪৯ পৃষ্ঠায় একটি স্বপ্ন-বিশ্লেষণ আছে যেটি হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ। ছোট বই এর মধ্যে Wilhelm Stekel এর How to understand your dream এ বহু উদাহরণ আছে।

ফ্রএডের স্বপ্নতত্ত্বের মূল কথা যে স্বপ্ন অবচেতন মনের অবদমিত ইচ্ছা পূরণ—এটা মোটামুটি স্বীকৃত হলেও সমস্ত স্বপ্নই এক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, এটা সকলে স্বীকার করেন না। অবচেতন ইচ্ছা যৌনকেন্দ্রিক এবং তার মূল শৈশবে এ নিয়ে গুরুতর মতভেদ আছে। প্রতীকের তাৎপর্যও সর্বজন-গ্রাহ্য

12 'The dream like the neurotic symptom, is a compromise between the suppressed and the suppressing tendencies. The nature of such struggle and compromise is shown in the nightmare, which becomes more and more trrifying until the dreamer wakes up. The disguise covering the suppressed tendencies becomes too thin, and the self terrified lest the suppressed wishes break forth into clear consciousness, takes full control of the situatian."

—Murphy—Historical Introduction to Contemporary Psychology P. 317

নয়। ম্যাকৃডুগ্যাল বলেছেন "সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত কচ্ছি যে স্বপ্ন ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডের সূত্র কোন কোন স্বপ্ন সম্বন্ধে বিশেষ করে মানসিক অসুস্থ মানুষদের স্বপ্ন সম্বন্ধে সত্য হতে পারে এবং কখনও কখনও লিঙ্গ বা লিঙ্গক্রিয়া স্বপ্নে প্রতীকের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে কিন্তু সমস্ত স্বপ্ন সম্বন্ধেই এই ব্যাখ্যা উপযুক্ত, এমন যথেষ্ট প্রমাণ নেই—স্বপ্ন ও মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে ফ্রএড এর ব্যাখ্যার ত্রুটি হচ্ছে এতে বড় সহজে যা কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র সত্য, সেটা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।১৩

স্বপ্নের আলোচনায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার, ক্রমশঃই মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। ১৯০১ সালে একদল উৎসাহী ছাত্র ফ্রএড্-কে ঘিরে ভিয়েনাতে একটি মনঃসমীক্ষণ কেন্দ্র (a school of psycho-analysis) খুললেন। ফ্রয়েড-এর অফুরন্ত উদ্যমে ও তাঁর ছাত্রদের আগ্রহে, ফ্রয়েড-দর্শন ক্রমশঃ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত ও পল্লবিত হতে থাকল। ১৯০৪ সালে ফ্রএড্ তাঁর **The Psychopathology of Everyday Life** প্রকাশ করলেন। তিনি দেখালেন অবচেতন তত্ত্ব দিয়ে শুধু যে মানসিক বিকারেরই ব্যাখ্যা চলে তা নয়, এ দিয়ে মানুষের বহু আপাতদৃষ্টে খামখেয়ালী বা অর্থহীন ব্যবহারেরও সুব্যাখ্যা সম্ভবপর। ভুলে যাওয়া, তোৎলামী, লেখার সময় কোন বাক্য বা অক্ষর বাদ যাওয়া (slips tor gue or pen), মুদ্রাদোষ, এ সবের পেছনেই এই অবচেতন মনের যন্ত্র (mechanism) কাজ কচ্ছে, এটা তিনি দেখতে চেষ্টা করলেন। একটা ভুলে যাওয়ার কাহিনী ও তার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে। এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর উপর বিরূপ হয়েছিলেন। কিছুদিন থেকে স্বামী-স্ত্রীতে মন কষাকষি চলছিল। স্ত্রী, স্বামীকে খুশী করবার জন্যে একখানা বই উপহার দিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক বইখানা হারিয়ে ফেললেন। কিছুতেই তিনি মনে করতে পারলেন না, কোথায় তিনি বইখানা রেখেছেন। এর পরেই ভদ্রলোকের মা গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়লেন। স্ত্রী আপ্রাণ সেবা করে শাশুড়ীকে সুস্থ করে তুললেন। এতে ভদ্রলোকের স্ত্রীর প্রতি বিরূপতা দূর হ'ল। সেদিন তাই তিনি খুশী হয়ে একটু আগেই অফিস থেকে ফিরে এলেন। বাড়ী এসেই তার মনে পড়ে গেল বইখানা কোথায় রেখেছেন এবং বইখানা তৎক্ষণাৎ খুঁজে পাওয়া গেল। এখানে স্ত্রীর দেওয়া বইখামা

13 McDougal —Outline of Abnormal Psychology, P. 186-87.

ভদ্রলোকের মনে, স্ত্রীর প্রতীক। তাঁর অবচেতন মনে, স্ত্রীর ভালবাসাকে অস্বীকার জিনিষটা রূপ নিলে, বইখানার সম্বন্ধে বিস্মৃতি রূপে। যখন সে বিরূপতা দূর হ'ল, তখন অবচেতন মনে বাধাটি দূর হ'ল এবং স্ত্রীর দেওয়া বই (অর্থাৎ তাঁর ভালবাসা) ফিরে পাওয়া গেল।

শৈশবে হঠাৎ কোন অবরুদ্ধ আবেগের ফলে, অনেক সময় স্বরভঙ্গ, তোৎলামী বা অন্য নানাপ্রকার মুদ্রাদোষ সৃষ্টি হয়। তোৎলামী সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা করে দেখা গেছে। অনেক সময় আবেগ বা অন্য কোন মানসিক উত্তেজনা থেকে এর উৎপত্তি। শিশু যখন—বিষম কোন সংঘাতের সামনে পড়ে, যেখানে পরিবেশ বা অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া তার পক্ষে খুব কঠিন হচ্ছে, যেখানে সে বিষম মানসিক আঘাত (shock) ভোগ করে এবং তখন থেকে তার তোৎলামী শুরু হতে পারে।১৪

শৈশবে, অনুভূতির জীবনে সঙ্গতির অভাব (mal-adjustment), দৈহিক ক্রিয়ার নানা রকম বিকারে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে। একটা উদাহরণ। একটি ছেলের হাতের লেখা ভাল। কিন্তু অদ্ভুত তার দোষ। সে M অক্ষরটা সর্বদা উল্টে Wর মত করে লেখে। কিছুতেই তার এ দোষ শোধরানো গেল না। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, এ ছেলেটির বাবা যুদ্ধে গেছে। বাড়ীতে থাকে, সে আর মা। কিন্তু M. . . . .নামে এক ভদ্রলোক প্রায় রোজই আসে ওর মার কাছে। এই অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা সে পছন্দ করে না—কিন্তু ভয়ে সে কিছু বলতেও পারে না। অবচেতন মনে ভদ্রলোকের প্রতি রাগটা পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং তা প্রকাশ পেয়েছে Mটার ঘাড় মটকে দিয়ে।

অনেক ছেলে বেঁয়ে বা "ন্যাটা" হয়। অনেক সময় তাদের শৈশবের ইতিহাস অনুসন্ধান করে জানা যায়; তারা কোন কারণে পিতামাতার স্বাভাবিক স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়েছিল।

অনর্থক ভয় (Phobia) বা বাতিকের (mania) ও ফ্রএড অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ক্লস্‌ট্রোফোবিয়া (claustrophobia) হচ্ছে আবদ্ধ স্থানের ভয়। একজন নির্ভীক বীর সৈনিকের মধ্যে দেখা যায়, তাঁর মনে ছোট আবদ্ধ জায়গা সম্বন্ধে হাস্যকর একটা ভয়। অথচ কামান, বন্দুক, বিপদ, সব কিছুকেই তিনি তুচ্ছ করেন। অনুসন্ধান করে জানা গেল, অতি শৈশবে এক অন্ধকার বদ্ধগলি দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কুকুরের উচ্চ চীৎকারে তিনি

14 Bowley—The Natural Development of the Child, P. P 135

অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু সে ভয় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবার তাঁর উপায় ছিল না।

✓**ক্লিপ্‌টোম্যানিয়া (kleiptomania)** হচ্ছে, অনর্থক ছোটখাটো জিনিষ চুরি করার অভ্যাস। অনেক সময় বিত্তশালী ভদ্র ব্যক্তিদের মধ্যেও, এ অদ্ভুত অভ্যাস দেখা যায়। খোঁজ করলে হয়তো জানা যাবে, বাল্যকালে তাঁর পিতামাতা তাঁর সামান্য স্বাভাবিক ইচ্ছাগুলিও পূরণ করেন নি। তার অবচেতন মনে তাই ক্ষোভ জমেছিল, যা পরিণত জীবনে এমন অদ্ভুতভাবে পিতামাতার অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

অবচেতন মনের গভীর বিক্ষোভ কখনো কখনো বাক্‌যন্ত্র, দৃষ্টি-শক্তি বা কোন ✓**অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবশতা** (**paralysis**) পর্য্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে। এ জাতীয় দুর্ঘটনাকে কনভার্সন হিষ্টিরিয়াও বলা হয়েছে।

ফ্রএড দেখলেন, মানুষের অবচেতন মন তার সমগ্র চেতন মানসকেই প্রভাবান্বিত করে। ইতিপূর্বে মনোবিজ্ঞানীরা মনকে ব্যাখ্যা করেছেন তার চেতন প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে, কিন্তু ফ্রএড তাঁর ভূয়োদর্শন থেকে এ সিদ্ধান্তই করলেন, যে মানুষের চেতনমানসের প্রকৃত ব্যাখ্যা অবচেতন মনে। সেখানেই লুক্কায়িত থাকে সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয়।

১৯০৫ সালে তাঁর **Wit and its Relation to the Unconscious** পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি দেখাতে চাইলেন যে, বাস্তব জগতের কঠিন বাধা (The Reality Principle) মানুষের মনকে অশান্ত করে তোলে, অবচেতন মনের এ বিদ্রোহ ও প্রতিশোধ স্পৃহাই ছদ্মভাবে প্রকাশ পায় ✓**পরিহাস, শ্লেষ বা নিন্দার** মধ্য দিয়ে। হাসির গল্প, অবচেতন মনের অবরুদ্ধ আবেগকে হঠাৎ মুক্তি দেয় বলেই, তা এত প্রিয়। "অপদস্থ করে যে ঠাট্টা (practical joke) তা আমোদজনক কারণ যাকে জব্দ করা হোল তার বিরুদ্ধে একটা সত্যিকারের বিরূপতা আছে তাই, বিষম দেমাকী, বা বড় বেশী সাধু বা যে প্রতিযোগীকে খুব ঘৃণা করে, তাদের ঠাট্টা করে সুখ বেশী। যখনই মনের মধ্যে আবদ্ধ শক্তি ছাড়া পায় তখনই আকস্মিক এবং 'ফেটে-পড়া আনন্দ পাওয়া যায়।" ১৫

শৃংখলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মানুষের মজ্জাগত। তাই সমাজ ও সভ্যতার সমগ্র বাধা-নিষেধকে সে খুসী মনে মেনে নেয় না। কল্পনায়, আরব বেদুইনের

41 43rd Year Book of the N. S. S. E.

মত সে বাধাবন্ধনহীনভাবে বিচরণ করতে চায়। এর থেকেই জন্ম হয়েছে **সাহিত্য, শিল্প চারুকলার**। এর মধ্যে অবচেতন মনের বন্দী আবেগ, আকাঙ্ক্ষা মুক্তির স্বাদ পায়। এ হচ্ছে রূঢ় বাস্তবের শাসনকে অস্বীকার করবার একটা নিরাপদ পন্থা। এ হচ্ছে এক ধরণের **পলায়ন (Escape)**। মানুষ নিজেকে বড় ভালবাসে। কিন্তু তার নিজ খেয়াল খুসীমত চলবার উপায় নেই, 'সভ্য' সমাজে। তাই প্রায়ই আমাদের সম্মুখীন হতে হয়, সামাজিক নিন্দার বা সমালোচনার। এ পৃথিবীতে যে কৃতকার্য, তারই দাম। কিন্তু আমাদের সব সময় যথেষ্ট শক্তি বা নিপুণতা না থাকায় আমরা কৃতকার্য্য হতে পারি না। তখন মানুষেরা আমাদের আর মূল্য দেয় না। এতে আমাদের আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এর থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের অবচেতন মন নানা কৌশল অবলম্বন করে। এদের বলে **ডিফেন্স মেকানিজম্ (defense mechanism)**। এর এক জাতীয় প্রধান উদাহরণকে আর্ণেষ্ট জোন্‌স্ (Ernest Jones—ফ্রএড্-এর অনুগামী ছাত্র) নাম দিয়েছেন **র‍্যাশনেলিজেশ্যন্ (Rationalisation)**। একটা অন্যায় বা অসঙ্গত কাজ করেছি।—সেটা নিয়ে মানুষে নিন্দা কচ্ছে—সেটা নিজের মনেও জানি খারাপ, তবুও আমাদের অবচেতন অহং অন্যের নিন্দা সহজে স্বীকার করে নিতে চায় না। সে কাজটির সমর্থনে যুক্তি খোঁজে এবং নিজের মনকেও চোখ ঠারে। মনিবের টাকা চুরি করেছি। কাজটা নিঃসন্দেহেই অন্যায়—কিন্তু নিজের মনকে বোঝাই, "ব্যাটা আমার মত অনেক গরীব লোককে ঠকিয়ে টাকা করেছে, ওর দুশো টাকা মারলে অন্যায় কিছুই নেই—তা ছাড়া হয়তো ব্যাটা মদ খেয়ে টাকা ওড়াতো—এ টাকা আমি বরং খরচ কচ্ছি, ছেলে-মেয়েদের জামা কাপড়ের জন্যে"। আর এক রকমের আত্ম-সমর্থনের নাম হচ্ছে **প্রজেকশ্যান (Projection)**। এ হচ্ছে নিজের অপরাধটা পরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের কাছে নিজেকে সাধু বলে জাহির করবার দুশ্চেষ্টা। সন্দেহ বাই হচ্ছে—অনেক সময়ই এই প্রজেকশ্যান্। স্বামী, স্ত্রীর চরিত্রে অকারণ সন্দিহান। সম্ভবতঃ তার নিজ অবচেতন মনে পর-নারীর প্রতি আসক্তি লুকিয়ে আছে,—অথবা কোন যৌন অপরাধের লজ্জা তার অবচেতন মনে অহঃরহ তাকে পীড়া দিচ্ছে—তার হাত থেকে সে মুক্তি খুঁজছে, তার নিজ কলঙ্ক অন্যে আরোপ করে। যারা উচ্চৈঃস্বরে কেবল বলে "সব শালা চোর", হয়তো তার অবচেতন মনে রয়েছে প্রবল চৌর্য্যাকাঙ্ক্ষা—তাই সে পরনিন্দায় মুখর। বাস্তবিক পক্ষে যারা বেশী মুখর বা অপরিচিত মহলেরও বড় বাচালতা

করে, হয়তো বা তাদের অবচেতন মনে আছে কোন গভীর অস্বস্তি বা পাপবোধ —যাকে তারা চাপ দিতে যাচ্ছে কথার পাহাড় দিয়ে। কখনো কখনো অবচেতন মনের অবরুদ্ধ বিরোধ কতগুলি যান্ত্রিক অর্থহীন কার্য্যের মধ্যেও প্রকাশ পায়। বাস্তবিক পক্ষে ক্রিয়াটি অবচেতন মনের একটা জোর তাগিদ মেটাচ্ছে,— একে বলা হয় **কম্পালশ্যন্** **(compulsion)**। এর প্রসিদ্ধ উদাহরণ হচ্ছে লেডী ম্যাক্‌বেথ। ডানকান্ এর হত্যার পর কাল্পনিক রক্তের দাগ ও গন্ধ লোপ করবার জন্যে লেডী ম্যাকবেথ বারে বারে হাত প্রক্ষালন কচ্ছেন—তবু তাঁর অবচেতন মনের গভীর পাপবোধ দূর করতে পাচ্ছেন না—আর্তনাদ করে বলেছেন, **"Here's the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand."**

ফ্রএড বলেন "ধর্মবাই বা "শুচিবাই", অবচেতন মনে পাপবোধের আর্তনাদ।

যে যৌন-আকর্ষণ মানুষের অনেক পাপ ও সর্বনাশের মূল—যার অস্বাভাবিক বিকার তার জীবনে আনে নানা অশান্তি ও অভিশাপ তাই আবার স্বর্গের পথও দেখায়। শুধু প্রয়োজন সেই শক্তির দিক পরিবর্তন। যৌন-চেতনার এই বিশুদ্ধিকে বলা হয় **সবলিমেশ্যন** **(sublimation)**। কত কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন, সমাজসেবা ধর্ম-সংস্কারের প্রেরণা যুগিয়েছে—ব্যর্থ-প্রেমের বেদনা তার কি ইয়ত্তা আছে? নারীর বিশ্বাসঘাতকতা সৃষ্টি করেছে অনেক কবি, অনেক শিল্পী, অনেক বৈজ্ঞানিক। পুরুষের অবহেলা সৃষ্টি করেছে মীরাবাই, ম্যাডাম ক্যুরী ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল্।

মানস বিকারগুলিকে কখনো কখনো দুটি প্রধান দলে ভাগ করা হয়। **সাইকোনিউরোসিস্ ও সাইকোসিস্**। সাইকোনিউরোসিসের নানারূপ আছে। তাদের সাধারণতঃ (১) **নিউর্‌্যাস্থেনিয়া** (২) **সাইকেস্থেনিয়া** (৩) **হিষ্টিরিয়া** এই তিন দলে ভাগ করা হয়। এই দলগুলির মধ্যেও আবার নানা উপবিভাগ আছে। যেমন হিষ্টিরিয়ার মধ্যে আছে। **(ক) এ্যানগ্‌জাইটি হিষ্টিরিয়া। (খ) কনভার্সন হিষ্টিরিয়া (গ) ট্রমাটিক হিষ্টিরিয়া** ইত্যাদি।

নিউর‍্যাস্থেনিয়া (Neurasthenia)—এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে স্নায়বিক দুর্বলতা। এ রোগীদের লক্ষণ হচ্ছে কোন কাজে অনিচ্ছা, নিরুৎসাহতা, দুর্বলতা মাথাধরা, পিঠ ব্যথা ইত্যাদি। মনঃ সমীক্ষণের দ্বারা বহু রোগী আরোগ্য হয়। এ রোগীদের খুব বেশী প্রয়োজন জীবনে কোন একটা জীবন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করা।

এরকম একটা অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদির কেন্দ্র সৃষ্টি হ'লে এরা তাকে অবলম্বন করে নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারে।

সাইকেস্‌থেনিয়া (Psychasthenia)—এর মূলগত অর্থ হচ্ছে মানসিক অবসন্নতা (mental exhaustion)। এ রোগের নানা লক্ষণ আছে। কোন বিষয়ে মনস্থির করতে না পারা (the grasshopper mind), অস্থিরতা, শুচিবাই, মুদ্রাদোষ, অকারণ দুশ্চিন্তা, চুরি করিবার ইচ্ছা kleiptomania) এসবই স্নায়বিক বিকার (neurosis)। এরও পেছনে আছে নিজেকে পরিবেশ বা অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার অক্ষমতা। এসব ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ দ্বারা রোগী নিরাময় হয়।

হিষ্টিরিয়া (hysteria)—নানাভাবীয় আছে, কিন্তু সবের পিছনেই সাধারণ অবস্থা হচ্ছে ডিসোসিয়েশন্। কোন একটা ক্রিয়া হঠাৎ জীবনের সমগ্রতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হিষ্টিরিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ। সম্মোহন (hypnotism) দ্বারা অনেক সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। যুদ্ধে সেল্ শকের (shell-shock) ফলে অনেক সময় হিষ্টিরিয়া সৃষ্ট হয়। কখনো কখনো সাময়িক ভাবে, দৃষ্টিশক্তি, বাক্‌শক্তি, স্পর্শশক্তি লোপ পায়। কখনো বা পেশী আপনা থেকেই অনবরত স্পন্দিত হতে থাকে অথবা অবশ হয়ে যায়। কখনো কখনো স্মৃতিশক্তি লোপ হয়। কখনো বা নানা রকম ভ্রান্তি (delusion) দেখা দেয়। সাধারণতঃ যে হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত সেখানে রোগী (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) হাসি, কান্না বা রাগ থামাতে পারে না। এ সব ক্ষেত্রে রোগী বা রোগিণী জীবনের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে এর মূলে আছে যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি।

এ সবই হচ্ছে মানস-যন্ত্রের বিকার জনিত (structural) রোগ। মানস-ক্রিয়ার বিকারকে (functional disorder) বলা হয় **সাইকোসিস (Psychosil)**।

সাইকোসিস (Psychosis)গুলিকে দুই দলে ভাগ করা হয়—অর্গানিক (organic) ও ফাংশন্যাল (functional)। সাইকোসিসগুলিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অর্গানিক সাইকোসিসকে সাধারণতঃ (১) **প্যারেসিস্** (২) **সেনাইল্ সাই-কোসিস্** ও (৩) **অ্যালকোহলিক সাইকোসিস্** এই তিন দলে ভাগ করা হয়।

প্যারেসিস্—মস্তিষ্ক সিফিলিস বিষে আক্রান্ত হওয়া এর কারণ। এ রোগে কতগুলি তৎক্ষণাৎ ক্রিয়া লুপ্ত হয়, কতগুলি তৎক্ষণাৎ ক্রিয়া অতিরিক্ত সক্রিয়তা

লাভ করে, কথা জড়িয়ে যায়, চলার সময় রোগী মাতালের মত টলতে থাকে-- চোখ বুজে খুব ঢুলতে থাকে। অনেক সময় ম্যালেরিয়ার বীজাণু প্রবেশ করিয়ে অথবা নানা মাদক ভেষজ দিয়ে চিকিৎসা হয়। এ রোগ হলে বাঁচার সম্ভাবনা কম।

সেনাইল ও এ্যালকোহলিক সাইকোসিস—বার্ধক্যজনিত অথবা অতিরিক্ত মদ্যপান জনিত মস্তিষ্ক স্নায়ুর ক্ষয় বা বিষক্রিয়া জনিত মানসিক বিকার। এ রোগ অনেক সময় নানা ভ্রান্তি (delusion of grandeur, delusion of persecution) দেখা দেয়। যে সব ঘটনা অল্পদিন হ'ল ঘটেছে তা রোগী ভুলে যায় অথবা মিথ্যা স্মৃতি আয়ত্ত হয়। **ফ্যাংশ্যন্যাল সাইকোসিসের** প্রধান উদাহরণ হচ্ছে (১) ম্যানিক্ ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস (২) সিজোফ্রেনিয়া বা ডেমেনসিয়া প্রিকস্ (dementia praecox)।

ম্যানিক্ ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস (manic depressive psychosis) —এই মানসিক বিকারে রোগী কখনও ভয়ানক উত্তেজিত (manic) আবার কখনও বা নিতান্ত অবসন্ন (depressive)। প্রায়ই ভ্রম (hallucination) ও ভ্রান্তি (delusion) থাকে। ম্যানিক্ অবস্থায় রোগী বিষম চীৎকার করে, কুৎসিৎ গালাগালি করে, অনবরত নাচে বা হাত পা নাড়ে, অস্বাভাবিক আনন্দ প্রকাশ করে, গান গায় ইত্যাদি। ডিপ্রেসিভ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত বিষন্ন, অনুতপ্ত হয়। কিছু খেতে চায় না, কাজ করতে চায় না, কখনো বা আত্মহত্যা করতে চায়। এ অবস্থায় একে টিউব দিয়ে খাইয়ে দিতে হয় এবং সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হয় পাছে কোন বিপদ না ঘটায়। ম্যানিক্ অবস্থা আর ডিপ্রেসিভ্ অবস্থা একটার পর একটা আসে।

সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)—এর ধাতুগত অর্থ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া (splitting of the mind)। পূর্বে এ অবস্থাগুলিকে ডেমেনসিয়া প্রিকক্স বা যৌবনকালে উন্মাদাবস্থা বলা হোত কারণ সাধারণতঃ যৌবনে এই বিকারগুলি দেখা যায়। এ রোগের নানা ধরণ আছে—

১। **সাধারণ সিজোফ্রেনিয়া (simple schizophrenia)**—এতে মানসিক স্থবিরতা দেখা যায়। এসব রোগীদের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। মানুষের সঙ্গে মিশিতে অনিচ্ছা, নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা (introverted), সমস্ত বিষয়ে নিরুৎসাহতা, বা নিরাসক্তি এ বিকারের লক্ষণ। সাধারণতঃ এরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে না।

২। হেবিফ্রেনিক সিজোফ্রেনিয়া (Hebephrenic Schizophrenia)—এরা বোকার মত হাসে, কাঁদে, কাপড় চোপর খুলে ফেলে। এদের কাজগুলির মধ্যে সঙ্গতি ও বিবেচনার অভাব দেখা যায়। যদি বলা হয় "তোমার মা মরে গেছে" তা হলে হয়তো সে হি হি করে হাসতে থাকবে।

৩। ক্যাটাটোনিক সিজোফ্রেনিয়া (Catatonic Schizophrenia) এদের মধ্যে অদ্ভুত গতিহীনতা ও আড়ষ্টতা দেখা দেয়। এদের দেহ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন মোম দিয়ে তৈরী (waxy in flexibility)। একভাবে বসে আছে তো বসেই আছে, হাতখানা একভাবে বাঁকিয়ে দিলে সে ভাবেই থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হয়তো কথাই বলে না, বৎসর ধরে। এদের সমস্ত ব্যবহারই নেতিবাচক (negativism)। হয়তো নিজের সঙ্গে বিড় বিড় করে কথা বলে, বা একটুখানি হাসে। বাইরের জগৎ এদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত, নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়ে থাকে (shut-in, encapsulated, insulated)।

৪। প্যারানয়েড্ সিজোফ্রেনিয়া (Paranoid Schizophrenia) এরা সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মনোবিজ্ঞানীদের। এরা এদের ভ্রান্তির (delusion) জগতে বাস করে। কেউ ভাবছে সে লক্ষ টাকার মালিক (delutions of grandeur) কেউ ভাবছে তাকে সবাই বিষ দিতে চেষ্টা কচ্ছে (delutions of persecution), কেউ ভাবছে সবাই তার কথাই বলাবলি কচ্ছে (delusions of reference), কেউ ভাবছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রবার দিয়ে তৈরী, কেউ ভাবছে দেহে তাদের রক্ত নেই। তাদের ভ্রান্তির বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে হয়তো তারা স্বাভাবিক মানুষের মতই ব্যবহার করে। এদের ইন্সুলিন, মেট্রাজোল্ ইলেকট্রিক নক থেরাপী দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। অনেক সময় সারেও। এদের সবার রোগের মূলেই আছে ডিসোসিয়েশন।

অনুভূতির জীবন যেখানে রুদ্ধ, আবেগের স্বাভাবিক প্রকাশের অভাবে সঙ্গতি শূন্য (mal-adjusted), সেখানে কোন একটি স্মৃতি চেতনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবচেতন মনে নিজের চারদিকে একটি দুর্ভেদ্য জাল সৃষ্টি করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারে, তাকে ডিসোসিয়েশন বলে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে; এর থেকে ভ্রান্তি (delusion) সৃষ্টি হতে পারে তাও আলোচনা করা গিয়েছে—কিন্তু চেতন মানসে আরো গভীরতর বিপর্যয়ও ঘটতে পারে। [সুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হচ্ছে সে তার অন্তরের সমস্ত বিরোধী ক্রিয়া ও শক্তিকে সংহত করে

একত্বের বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে। কিন্তু অবচেতন মনে গভীর বিরোধের ফলে ব্যক্তিত্ব সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি দুটি বিভিন্ন চরিত্রবিশিষ্ট দুটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। **(splitting of personality)**। সাহিত্যে এর অমর উদাহরণ হচ্ছে—**Dr. Jekyll and Mr. Hyde**। এর বাস্তব উদাহরণও অনেক আছে। অবচেতন মনের গভীরতম বিকারের পরিণতি, উন্মত্ততা।

ফ্রএড ও তাঁর সহগামী ও অনুগামীদের অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে ফয়েডের মূল তত্ত্বের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। বিরোধের ফলে বিচ্ছেদও ঘটেছে। ফ্রএড এর ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ কোন গুরুতর বিষয়ে ফ্রএড এর বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং ফ্রএড এর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন। এদের মধ্যে **য়্যুঙ্গ (Jung)** ও **এ্যাডলার (Adler)** এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সমালোচনার ফলে ফ্রএডও তাঁর মতামত অনেক সময় পরিবর্তন করেছেন।

যে দুটি বিষয়ে ফ্রএডীর দর্শন সব চেয়ে বেশী নিন্দা ও সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে, তা হচ্ছে ফ্রএডের দুটি মত (১) সেক্স (কাম)-ই সমস্ত চেতন ও অবচেতন মনের মূল—জীবনের সমস্ত ক্রিয়া ও শক্তির উৎস। (২) এই যৌন-চেতনার প্রথম উদ্ভব শৈশবেই এবং শৈশবের যৌন-আকাঙ্খার অতৃপ্তিই পরিণত জীবনের সমস্ত মানসিক বিকারের কারণ।

ফ্রএড এর এ দুটি মতই পরবর্তীদের মধ্যে কেউ কেউ অস্বীকার করেছেন। এ্যাডলার্ এবং য়্যুঙ্গ দুজনেই মনে করেন ফ্রএড সেক্সকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন, কামই জীবনের একমাত্র মৌলিক শক্তি, একথা তাঁরা গ্রহণ করেন নি।

এ্যাডলার্ মনে করেন, মানসিক বিকারের মূল কারণ হচ্ছে, ব্যক্তির মনে **হীনতা-বোধ (inferiority complex)**। মানুষের সমগ্র উদ্যমের পেছনে রয়েছে এই হীনমন্যতাকে জয় করবার আকাঙ্খা, এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা, যে আমি ছোট নই। যখন তার এ প্রচেষ্টা তাকে উদ্বুদ্ধ করে, নিজ ক্ষমতা ও নিপুণতা বৃদ্ধির দিকে, তখন তার চরিত্রে বাস্তবিক উন্নতি ঘটে—যেমন ডেমোসস্থিনীস্ প্রথম অসাফল্যের পর জিভের উপর পাথরের টুকরো রেখে পণ করলেন, যে তোৎলামী দূর করতেই হবে। তিনিই একদিন গ্রীসদেশের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হয়েছিলেন। আর যেখানে ব্যক্তির মধ্যে সেই ক্ষমতার বাস্তবিক অভাব, সেখানে সে নিজের অসাফল্য অন্য কোন বিষয়ে সাফল্য দিয়ে মুছে

দিতে চেষ্টা করে। অথবা যদি সে অত্যন্ত দুর্বল চরিত্র হয়, তবে সে নিজের দুর্বলতার সমর্থক একটা বাহ্য অবস্থা আবিষ্কার করতে, অথবা নিজের মধ্যে কোন রোগ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে—যাতে সে নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে পারে, যে "এ কাজটা বাস্তবিক আমি পারি,—কিন্তু কি করবো, এ মাথা ধরাটাই আমাকে খেলে।" বাস্তবিক পক্ষে তার আত্মমর্যাদা যাতে অক্ষুন্ন থাকে, এমন একটি জীবনধারার (Style of life) অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়—সত্যি তখন তার কেবলই মাথা ধরে থাকে। পরিবেশ তার উপর যে দাবী করে তা এড়াবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বাইরের কোন অসুবিধার অজুহাত অথবা কোন ব্যাধি বা মানসিক বিকার সৃষ্টি করে তার পিছনে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।১৬ ব্যক্তি যদি দুর্ব্বল হয় তবে পরিবেশের দাবী এড়াবার উদ্দেশ্যে এবং নিজের কাছে নিজের দাম যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেজন্য নিজের জীবনধারার কোন একটা ব্যবস্থা অথবা ব্যবহারের কোন একটা বিশেষ ধরণ অবলম্বন করে থাকে।১৭ তিনি কামকে অস্বীকার করে নি, কিন্তু তিনি মনে করেন শিশুর জীবনে ফ্রএড কামের যে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটা বাড়াবাড়ি এবং পরিণত জীবনের সমস্ত ক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্যে, কামকে ডেকে আনার প্রয়োজন নেই। চিকিৎসক ও শিক্ষকের প্রয়োজন হচ্ছে, শিশুর মনে সাহস জন্মে দেওয়া এবং তার প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করা। এসব লোক, যারা জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না তাদের চিকিৎসা করতে হ'লে ধীরে ধীরে তার অবচেতন মনে হীনমন্যতার যে গ্রন্থিটি আছে তার এবং আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য যে মজ্জাগত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তার স্বরূপ যাতে নিজে বুঝতে পারে তা করতে হবে, যাতে সে পরিষ্কার করে বুঝতে পারে কি সে করতে চেষ্টা কচ্ছে আর কিই বা সে ভয় কচ্ছে বা এড়াতে চাচ্ছে।১৮

শিশুর সুস্থ জীবনের উপরই নির্ভর করে, পরিণত জীবনের সুস্থ ও সবল বিকাশ, এই এ্যাডলারেব বিশ্বাস। সুতরাং ফ্রএডের মত শিশুর জীবন গঠনের উপর তিনিও গুরুত্ব দেন।

এ্যাডলারের 'Individual Psychology' ফ্রএডের মনোবিজ্ঞানের চেয়ে অনেক কম জটিল এবং তার দর্শনে স্বতঃবিরোধিতাও ফ্রএডের তুলনায় কম।

16 Flugel—Hundred Years of Psychology. P. 173.

17 Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, P. 173.

18 Woodworth—Contemporary School of Psychology, P. 177,

য়্যুঙ্গ এর 'Analytic Psychology'ও অবচেতন মনোবিজ্ঞানবিষয়ে মূল্যবান্ গ্রন্থ। [য়্যুঙ্গ (Jung) ফ্রএড (Freud) এর সেক্স সম্বন্ধে মতকে গুরুত্ব দিলেও, এ্যাড্লারের মত তিনিও মনে করেন, ফ্রএড্ এ নিয়ে বাড়াবাড়ি কচ্ছেন। ফ্রএড্ এর মত অপরিণত এবং একপেশে। শিশুর জীবনের মানসিক বিরোধই পরিণত জীবনের বিকার ও অসঙ্গতির কারণ, একথা তিনি মনে করেন না। পরিণত জীবনের কোন্ মানসিক ক্রিয়ার বিকৃতি বুঝতে গেলে, তার বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও বুঝতে হবে, তাকে উপেক্ষা করে, শুধু মাত্র শৈশবের অভিজ্ঞতার পশ্চাদ্ধাবন করলে, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কখনও পাওয়া যেতে পারে না। মানসিক বিকার চিকিৎসায় য়্যুঙ্গ্ ফ্রএডের এর মুক্ত অনুসঙ্গ পদ্ধতি ও স্বপ্নবিশ্লেষণ প্রণালী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি রোগীর বিকারের মূল খুঁজেছেন তার বর্তমান সমস্যা ও তা সমাধানে তার দুর্ব্বলতার মধ্যে।] ১৯

[জীবনের মূল শক্তি **লিবিডো** (**libido**)—একেবারেই যৌনকেন্দ্রিক, ফ্রএডের এ মত তিনি স্বীকার করেন না। য়্যুঙ্গ্ প্রসিদ্ধ হয়েছেন, তাঁর "Psychological types" মতবাদ দিয়ে। তিনি বলেন, মানুষ সাধারণতঃ দুই জাতের, একটি হচ্ছে বহির্মুখী কর্মকুশল, সামাজিক ও বস্তুনিষ্ঠ। এদের তিনি বলেছেন—**একস্‌ট্রোভার্টস্** (**Extroverts**) বা **একস্ট্রাভার্টস্** (**Extraverts**), আর একদল আত্মকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী, চিন্তাশীল, অভিমানীর দল—এরা হলেন **ইনট্রোভার্টস্** (**Introverts**)। একদলের মানসিক শক্তির লক্ষ্য বহির্জগত, আর একদলের লক্ষ্য মনোজগৎ। য়্যুঙ্গ মনে করেন ফ্রএড্ এবং এ্যাড্লার্ এই দুই বিভিন্ন দলের মুখপাত্র। তিনি তাঁর Analytic Psycholgy তে এই দুই বিরোধী মতের সমন্বয় করতে চেয়েছেন। য়্যুঙ্গ এর মতে যে ব্যক্তি সচেতনভাবে একস্‌ট্রোভার্ট, সেই আবার অবচেতন মনে ইনট্রোভার্ট, তেমনি যার সচেতন মন ইন্‌ট্রোভার্ট দলের, তার অবচেতন মনের গতি হচ্ছে, একস্‌ট্রোভার্ট এর দিকে। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে, এ দুটি **এ্যাটিটুড্ টাইপস্** (**attitude types**,), আবার ক্রিয়ার দিক দিয়ে চারটি **ফাংসন্ টাইপস্** (**function types**)—thinking type, feeling type, আর intuition types. ২০

19 Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, P. 180.

20 Flugel—Hundred Years of Psychology P. 301.

["Kant would be an example of the thinking type, when introvert; Darwin, of the same type' when extravert. A person of the feeling tyye is swayed more by his emotions than by his reason; when introvert, his

পরবর্তীকালে ক্রেটস্‌মার ও মানুষকে দেহের গঠন অনুযায়ী নানা টাইপ এ ভাগ করেছেন—**এ্যাথলেটিক্, এস্‌থেনিক, পিক্‌নিক্ আর ডিসপ্ল্যাস্‌টিক্।** আবার কেউ মানসিক গড়ন দিয়ে মানসিক বিকারগ্রস্তদের **ম্যানিক ডিপ্রেসিভ্ (Manic-depressive)** আর **ডেমিন্‌সিয়া প্রিকস্ (Dementia Praecox)** এ দু দলে ফেলেছেন। রোজানফ্ (Rosanoff) সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের ভাগ করেছেন **নর্মাল হিষ্টেরয়ড, সাইক্লয়ড ও সিজয়ড্** এ কয় দলে।

মানুষের এ রকম টাইপএ ভাগ চমৎকার হতে পারে, কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষই টাইপ নয়। তাদের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত বিপরীত উপাদানে তৈরী, কাজেই সম্পূর্ণভাবে এবং সন্তোষজনকভাবে কোন একটা দলের তাদের ফেলে দেওয়া যায় না।

য়্যুঙ্গ্ এর মনোবিজ্ঞান যথেষ্ট জটিল এবং কোন কোন বিষয়ে দুর্বোধ্য।

ফ্রএড্ ও তাঁর অনুগামীরা অবচেতন মনের তত্ত্ব কথা নিয়ে যে বিচিত্র সৌধ গড়ে তুলেছেন,—তার বিচার সহজ নয়—কারণ এ দর্শন এখনও পুষ্টিলাভ কচ্ছে; সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ব, ধর্ম অর্থাৎ মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এর সূত্রগুলি ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। একদিন ক্রমবিকাশ তত্ত্ব (theory of evolution) ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে যেমন গুরুত্ব লাভ করেছিল আজ ফ্রয়েডীয় দর্শনের অবচেতন-তত্ত্বও তেমনি মর্য্যাদার দাবী রাখছে। 'ফলেন পরিচীয়তে' ইংরাজীতে বলে "The test of the pudding is in its eating," ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকেও তার ফল দিয়ে বিচার করতে হবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ফ্রএড্ দর্শনে যৌনতা সম্বন্ধে অতিভাষণ আছে, সম্ভবতঃ ফ্রএড এর কোন কোন মত স্বতঃবিরোধী বা অস্পষ্ট, তথাপি, মনোবিকারের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মনোবিকলন পদ্ধতি প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে এ কথা স্বীকার কর্তেই

feeling is intensive and strong, when extrovert he (or more usually...she) is governed by the the "logic"...An example of the introvert sensation type would be, the artist, who is interested in the outer visible world, for what it suggests to him, whereas the country squire, who has a blunt crude interest in outer things, for what they are would represent the extrovert sensation type. Finally, Blaee, the mystic might stand for the introvert intuition type. Llod George, the politician with an amazing adaptibility to the particular audience or situation with which he confronted, for the extrovert intuition type,"

হবে এবং মনোবিজ্ঞান চর্চায় ফ্রএড একটি বহু সম্ভাবনাপূর্ণ নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন, তাও না মেনে উপায় নেই।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ—ফ্রয়েডের পন্থা অনুযায়ী মনোবিশ্লেষণ সময়সাপেক্ষ এবং ফ্রএডের অনেক অনুগামী তাঁর পথ পূর্ণভাবে অনুসরণ করেন নি। এ্যাডলার সহজতর ও অল্পসময়সাপেক্ষ এরূপ একটি উপায় অবলম্বন করেন। তিনি ঠিক শৈশব বা অতীতে কোন কারণবশতঃ বর্তমান জীবনধারা (style of life') রোগী গ্রহণ করেছে তা বার করার চেষ্টা করেন নি। তিনি কয়েকবার রোগীকে দেখে ও তার সঙ্গে আলোচনা করে (interview) বুঝতে পেরেছেন রোগীর 'জীবনধারা কি, এবং কোথায় সে নিজেকে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। তারপর তিনি রোগীকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন তার বর্তমান জীবনের অবস্থা, এবং ব্যর্থ পন্থাকে পরিত্যাগ করে, অন্য কি উপায় গ্রহণ করলে, সে অধিকতর সুখী হতে পারবে ও বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে।

শিশুর মনোবিশ্লেষণ বড়দের বিশ্লেষণ চাইতে একটু তফাৎ। বড়রা নিজেই বুঝতে পারেন, কোথায় নিজের অশান্তির ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাব, এবং বুঝতে পেরেই নিজে থেকেই মনঃসমীক্ষকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু শিশুরা বুঝতে পারে না, যে তাদের মনোবিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন আছে—তারা বোঝে না যে অন্যদের চেয়ে তারা আলাদা। তাদের পিতামাতা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে সাহায্য করলে,—তবেই তারা মনঃসমীক্ষকের কাছে আসবে।

তারপর যে উপায়ে শিশুর মনোবিশ্লেষণ চলতে পারে, তা নিয়ে মতবিরোধ যথেষ্টই আছে। এ বিষয়ে আলোচনায় মেলানী ক্লীন্ ও এ্যানা ফ্রএডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেলানী ক্লীন্ (Melani Klein) মুক্ত অনুসঙ্গের বদলে খেলার মাধ্যমে শিশুর মনোবিশ্লেষণের পক্ষপাতী। তাঁর মতে শিশু যখন ক্লিনিক এ বিশেষভাবে তৈরী খেলনা দিয়ে খেলা করে, তখন তার প্রতি কাজেরই একটা প্রতীকগত (symbolic) অর্থ থাকে, যেমন একটা ল্যাম্প-পোষ্ট যখন উল্টে ফেলে বা কোন পুতুলকে ভেঙ্গে ফেলে, তার মধ্যে তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বিরূপ ভাব প্রকাশ পায়, গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কার অর্থ পিতামাতার সঙ্গম ইত্যাদি।

আনা ফ্রয়েড মনে করেন যে, শিশুমনোবিশ্লেষণের সঙ্গে বড়দের বিশ্লেষণের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, সর্বপ্রকার খেলারই যে একটা প্রতীকগত অর্থ

আছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ, শিশু-বিশ্লেষণের একটা প্রাথমিক অবস্থা আছে। শিশুর সঙ্গে মনঃসমীক্ষকের সৌহার্দ্য ও সখ্যের ভাব প্রথমে গড়ে তুলতে হয়। শিশুর পিতার প্রতি যে ভালবাসা ও নির্ভরতা মেশান মনোভাব আছে, সেই প্রকার মনোভাব মনঃসমীক্ষকের প্রতি হওয়া দরকার। পিতার প্রতিনিধি হবার মতো আস্থা যখন মনঃসমীক্ষক শিশু-মনে সৃষ্টি করতে পারেন, তখন প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধ (relationship of transferance) স্থাপিত হয়। তা হলেই বিশ্লেষণ ও চিকিৎসা সম্ভব হয়। আনা ফ্রয়েডের মতে এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারলে শিশুর স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার মনের গহনে প্রবেশ করা সম্ভব হয়। তখন মনঃসমীক্ষকের সহায়তায় ধীরে ধীরে নিজ সমস্যার সমাধান সে স্বাধীনভাবে করতে শেখে, এবং ক্রমে সমীক্ষকের প্রতি যে নির্ভরতার ভাব হয়েছিল, সেটা চলে যায়।

মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে শতকরা কত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেছে, তার বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের নেই। কার্ল রোজার্স (Carl Rogers) তাঁর The Clinical Treatment of the Problem Child নামক বইতে দু'একটি ফলাফলের কথা লিখেছেন এবং বলেছেন যে আরোগ্য-লাভের সংখ্যা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। কেসেল ও হাইম্যান Cassell & High man) ৩৩টি বয়স্ক ব্যক্তির উপর এ পরীক্ষার ফল অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন ও প্রকাশ করছেন। এ অল্প সংখ্যার মধ্যে ৫ জন এ চিকিৎসার ফলেই সম্পূর্ণ নিরাময় হযেছেন, ৬ জন এ পরীক্ষা এবং পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা আরাম হয়েছেন, ৮ জনের অবস্থার কিঞ্চিৎ উপশম হয়েছে। ১৪ জনের অবস্থা পূর্ববৎই রয়ে গেছে, অথবা আরো অবনতি হয়েছে। এ শেষোক্ত দলে একজন আত্মহত্যা করেছেন আর ৬ জনের গুরুতর মানসিক বৈকল্য দেখা দিয়েছে।২১

মনঃসমীক্ষণ দ্বারা আরোগ্য লাভের সংখ্যাল্পতার কারণ রোজার্সের মতে, দুটি। প্রথমতঃ সমীক্ষকেরা রোগের মূল কারণটি খুঁজে বার করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, মনে করেন। কিন্তু অন্তর্নিহিত কারণটি খুঁজে পাওয়ার পরেও অনেক সময রোগী নিজকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। কারণ ব্যক্তির ভাবজীবন (emotional life) ছাড়া আরো কতগুলি দিক আছে, তার অশান্তিকর পারিবারিক অবস্থা, অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষার সুযোগের অভাব ইত্যাদি বহু সমস্যাই থেকে যায়। বিখ্যাত মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাঃ হীলি ও ডাঃ আলেকজাণ্ডার মনঃসমীক্ষণের সাফল্যের

21 C. E. Rogers—The Clinical Treatment of the Problem Child. P. 338

জন্য আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের উপর খুব জোর দেন। হীলি বলছেন "কেউ হয়তো বলবেন একদিন পুরাতন পাপীকে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দেওয়া খুবই ভাল কিন্তু এ রকম ব্যক্তির পক্ষে শান্ত অবস্থা লাভ করতে হলে পরিবেশের সঙ্গে নূতন সম্বন্ধ স্থাপনও বিশেষ দরকার। মনঃসমীক্ষণের পর সে যদি প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই থাকতে বাধ্য হয় তা হ'লে ভাল ফল আশা করা যেতে পারে না। জেলে থেকে মুক্তি পেলেও এমন ব্যক্তি তার পূর্ব দুর্নামের জন্যে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় বিষম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। তা ছাড়া অভ্যাস গঠনের ও তার প্রভাবের সহজ কথাটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে এ সব ক্ষেত্রে অভ্যাস গঠন মানে হচ্ছে অপরাধ করবার কতগুলি কৌশল আয়ত্ত করা। এটা খুবই সম্ভব যে তার পুরাতন সঙ্গীরা তার সঙ্গে দেখা করে তার পূর্ব নিপুণতা ব্যবহার করবার জন্যে তাকে প্রলুব্ধ করে এবং এর জন্য সুযোগও ঘটে। আমি এটা স্বীকার করতে বাধ্য, যে যদি আমরা উন্নততর সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারি, তা হ'লে মনঃসমীক্ষণ দ্বারা চিকিৎসায় সামান্যই ফল হবে।২২ ঠিক এই কারণেই রাশিয়াতে মনঃসমীক্ষণের উপর সামান্যই আস্থা রাখা হয়। অপরাধ দমনের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাদের মতে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশের উন্নতি।

শিশুদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মনঃসমীক্ষণ এখনও পরীক্ষার স্তরেই রয়েছে, বলা চলে। তবে মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদ পাওয়া যায়, তার মূল্য যথেষ্টই। যদি এই সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি বাইরের দিকটাকেও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত করা যায়, তবে শিশু সহজেই আবার নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সহজভাবে চলতে পারে।

অনেক সময় মনঃসমীক্ষণের ব্যর্থতার একটি কারণ এই যে, সমীক্ষক কতকগুলি নির্ধারিত পথে ছাড়া চলতে পারেন না। কথা, স্বপ্ন, বা কাজের যে প্রতীকগত অর্থ তারা মেনে নিয়েছেন, এবং যে তত্ত্ব তারা মানেন, তারই ফেলে শিশুর ব্যবহারকে দেখতে চান, এবং সে জন্য সমীক্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পরিণত হয়ে যায়।

আরোগ্য লাভের উপায় হিসাবে, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি কতটা সাফল্য লাভের অধিকারী হয়েছে বলা মুস্কিল, কিন্তু এর পেছনে মানুষের অবচেতনা মনের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সন্ধান মনঃসমীক্ষকেরা দিয়েছেন, তার মূল্য অসীম। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব আমরা বিশেষ করেই দেখতে পাই। যুদ্ধোত্তর যুগেও

২২ Healy. W.—"Psycho-analysis of Older Offenders". American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 5. Ref. Cited by K. Rogers, P 339

মতাববাদীদের কাছে (naturalists) ফ্রয়েডীয় মতবাদ বিশেষ করেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। তাদের মতে,—শিশুদের দিতে হবে অবাধ স্বাধীনতা, কোন বন্ধনের নাগপাশ তাতে থাকবে না, বড়দের চোখরাঙ্গানীর ভয় থেকে দিতে হবে তাদের পূর্ণ মুক্তি। এই মতবাদের উপর আলোর বন্যা নিয়ে এল, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ। এখন জানা গেল যে শিশুর স্বাভাবিক আনন্দে-চঞ্চল নিয়ম, শৃংখল ও শাসনের ভারে বিব্রত করে তুলে ক্ষতিগ্রস্তই করা হয়, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভয়কে চেপে রেখে মনোবৈকল্যের সম্ভাবনাই শুধু বাড়ান হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার, বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ দিয়েছেন এইচ, এস নীল তাঁর সামারহিল এর বিদ্যালয়ে। তিনি "দি ড্রেডফুল স্কুল" নামক বইতে অবদমনের ফলে শিশুর করুণ অবস্থার ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন। এ প্রকার চরম মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায়, যে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বভাববাদের একটা বড় স্থান আছে এবং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে যে কোন প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে স্বভাববাদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সেই বিদ্রোহ আরো শক্তিশালী হয়েছে—ফ্রয়েড প্রমুখ মনঃস্তাত্ত্বিকদের যুগান্তকারী আবিষ্কারে, যে অবদমন দ্বারা মানবমনের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনাই অধিক।

এখানে একটা কথা আলোচনা করা দরকার, যে শিক্ষকদের নিকট মনঃ-সমীক্ষণবাদের বাস্তব মূল্য ঠিক কোথায়? শিক্ষক কি বিদ্যালয়ে শিশুর মনোবৈকল্যের সম্ভাবনা দেখলে মনঃসমীক্ষণ করবেন? এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, যে বিশেষজ্ঞ মনঃসমীক্ষক ছাড়া, অপর কারো পক্ষে মনঃসমীক্ষণ করা নিতান্তই অনুচিত হবে, কারণ মনঃসমীক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজন, বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। শিক্ষক মনঃসমীক্ষককে সহায়তা করতে পারেন, প্রথমতঃ শিশুর মধ্যে বৈকল্যের লক্ষণ দেখলে, তাকে জানিয়ে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, এবং দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল দরদী বন্ধুর মত ব্যবহার করে তার সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করে ও দমননীতির সাহায্য নিয়ে শিশুর জীবনের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত না করে। শিক্ষকের পক্ষে এই কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়, যদি তিনি মনঃসমীক্ষণবাদের সঙ্গে পরিচিত থাকেন, এবং নিজেও মানসিক সুস্থ হন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

জীবন পরিক্রমা—শৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি

ছোট অসহায় শিশু, ধীরে, ধীরে, বড়ো হয়ে ওঠে। শৈশবের অস্ফুট কলকাকলী, সুসম্বদ্ধ ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে সে দীপ্ত হয়ে ওঠে। জীবনের এই রহস্যময় অভিযান মনোবিজ্ঞানীকে আকর্ষণ করেছে, এবং বহু শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করে, তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণায় তাঁরা উপনীত হয়েছেন।

সাধারণভাবে, বিকাশমান শিশুর জীবনকে (the developing child) কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, ইত্যাদি এই বিভাগগুলি সম্বন্ধে একথা মনে রাখা উচিত যে শিশুর জীবনকে ঠিক আলাদা আলাদা কতকগুলি প্রকোষ্ঠে আমরা ভাগ করে ফেলতে পারি না। একটি ছয় বছরের শিশুর সঙ্গে, সাত বছরের বালকের মানসিক প্রভেদ নিশ্চয়ই খুব বেশী নয়, আবার এগার বছর বয়সের বালকের সঙ্গে, তার বার বছরের কিশোর ভাইর সঙ্গে, প্রভেদ বিশেষ লক্ষিত হয় না। শুধু মনোবিজ্ঞানী তার তথ্য আহরণের সুবিধার জন্য ও বৃদ্ধির মূল নীতিগুলিকে বুঝাবার সুবিধার জন্য মানুষের জীবন পরিক্রমাকে স্তর-বিভক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগের মূলে কিছু সত্য নেই, তাও নয়। ছয়-সাত বছর বয়স হলে পর শিশুরা, নিশ্চয়ই বোধ করে, যে তারা মা'র কোলের খোকা বা খুকু নয়, তাদেরও একটা পৃথক সত্তা ও স্বাধীনতা আছে, এবং তারা তা দাবী করে। তার পেছনে ফেলে আসা শৈশব থেকে সে একটা আলাদা রকমের, তা' সে বোঝে। বিভিন্ন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তরের (phases) মধ্য দিয়ে শিশুকে যেতে হয়। সে হিসাবে এই শ্রেণীবিভাগগুলি বাস্তবিকই সত্য। তবে এই কথাটি আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় উন্নীত হওয়ার মাঝে কোন ফাঁক নেই একদিনেই চট করে কেউ বড়ো হয়ে যায় না, আবার পরিবর্তনগুলিও বিশেষভাবে অনুভূত হয় না। অত্যন্ত ধীরে, ক্রমশঃ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা আসে, শৈশবের পর বাল্য, তারপর কৈশোর। এই ক্রম-পরিবর্তনের গতি ধীর, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থার মধ্যে কোন তীক্ষ্ণ বিচ্ছেদ

রেখা নেই, একথা মনে রেখে ক্রমবিকাশমান শিশুর জীবনকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নিতে পারি।

শিশুর জীবনের বিভিন্ন স্তর ও প্রত্যেক স্তরের বয়ঃক্রমের সীমা—Periods and approximate age limits :—

(১) **শৈশব** (Infancy)

(ক) অতি শৈশবাবস্থা — ১—২ বৎসর বয়ঃকাল

(খ) শৈশবের দ্বিতীয় স্তর — ২—৪ " "

(২) **বাল্য** (Childhood)

(ক) প্রথম অবস্থা (Pre-school period or infant's school period) — — ৪—৭ " "

(খ) দ্বিতীয় অবস্থা (Primary school period) — — ৭—১১ " "

(৩) **কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি** (Adolescence)

(ক) প্রথম অবস্থা (Pre-pubertal stage) — — ১১—১৪ " "

(খ) দ্বিতীয় অবস্থা (Puberty) — ১৪—১৮ " "

(গ) তৃতীয় অবস্থা (Later adolescence) :— — ১৮—২১ " "

এই শ্রেণীবিভাগ ও বয়সের সীমা, এক এক লেখক, এক এক রকম ভাবে, করে থাকেন। এবং সব শিশুর জীবনে বিভিন্ন স্তরের সীমা ঠিক এক নয়, তবে এই ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগই মোটামুটিভাবে প্রচলিত।

শিশুর ক্রমবিকাশ ও তার প্রকৃতি আলোচনা করার আগে, একটি মতবাদ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। পুনরাবর্তন মতবাদ (Recapitulation Theory) অনুযায়ী ছোট শিশুর জীবনে অগ্রগতি হচ্ছে মানব জাতির ক্রম-বিকাশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই মতবাদের বিশেষ সমর্থক ষ্ট্যানলি হল (Stanley Hall)। বর্তমানে এই মতবাদ অচল। শিশুর ক্রমবিকাশ তার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় বহুলাংশে এবং অসভ্য আদিম মানবের সহজ সরল জীবন থেকে সুরু করে, বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল সভ্য মানবের জীবন পর্য্যন্ত, কতগুলি ছক্ কেটে নিয়ে, তার মধ্যে শিশুর জীবনকে ফেলে দেখা যায় না।

শৈশব (১-২ বৎসর)—শিশু তার জীবন আরম্ভ করে নিতান্ত অসহায় একটি জীব হিসাবে। খাদ্য ও জীবনের জন্য সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী। প্রাণতত্ত্বের দিক দিয়ে এর যথেষ্ট তাৎপর্য্য আছে। সাধারণতঃ, দেখা যায়, যে সব জীব-জন্তুর শৈশবকাল বেশীদিন স্থায়ী হয়, তারা ভবিষ্যৎ জীবনের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের ভাল খাপ খাওয়াতে পারে, তাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হবার অবকাশ ও প্রয়োজন বেশী মেলে, এবং তাদের বুদ্ধির বিকাশও তাই বেশী হয়। প্রথম শৈশবের এ স্তরে ইন্দ্রিয়বোধ স্পষ্টতা লাভ করতে সুরু করে, তবে বুদ্ধি বা বিচার তখনও দেখা দেয় না।

এ বয়সে যে ভাবাবেগ সব চেয়ে বেশী লক্ষিত হয়, সে হচ্ছে স্নেহ, ভালবাসা ও ভয়; কোন সুসংবদ্ধ যুক্তি বা বুদ্ধি দেখা যায় না, শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতি। শিশুর কাছে তার মা এলেই, হাসিতে তার মুখ ভরে যায়, দু'হাত বাড়িয়ে দেয় মার কোলে যাবার জন্য, এবং মার সামান্য হাসি, আদর ও অঙ্গ স্পর্শে তৃপ্ত হয়ে, ঘুমিয়ে পড়ে। মার ভালবাসায় শিশু-মনে আসে পরম নিরাপত্তার (security) ভাব। এই নিরাপত্তার ভাবের মূল্য শিশু-জীবনে অসীম, এ বয়সে শিশু মাতৃ স্নেহে বঞ্চিত হ'লে তার ভবিষ্যৎ মানসিক জীবন সুস্থ হতে পারে না। ডাঃ সাটির (Dr. Suttie) মতে ব্যক্তি জীবনের পরবর্তী সামাজিক বিকাশের মূল নিহিত থাকে, অতি শৈশবে শিশু ও তার মাতার গভীর ভালবাসার সম্বন্ধের মধ্যে।[1] আবেগ ও অনুভূতির সুস্থ বিকাশের সঙ্গে, সামাজিক জীবনের ক্রম-বিকাশের অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ বর্তমান। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সুখময়, স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ হতে হলে, বিশেষ প্রয়োজন, শৈশব প্রকৃত স্নেহ ও ভালবাসা পাওয়া। শিশু যে শুধু ভালবাসা পেতেই চায়, তা নয়, সে ভালবাসতেও চায়। ডাঃ সাটির মতে পরিণত জীবনে ঘৃণা, উদ্বেগ, বা ভয়-এর মূল কারণ হচ্ছে শৈশবের স্বাভাবিক স্নেহাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির অভাব।

শৈশবে নিরাপত্তার ভাবের অভাব হলে, সেই অভাববোধ কৈশোরে আবার বিশেষ করে দেখা দেয়। যে শিশু মাতৃস্নেহের নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় গড়ে উঠলো না, কৈশোর ও যৌবনেও সে নিজেকে অসহায় মনে করে। আমরা দেখি, মনঃসমীক্ষকগণ সর্বদাই মানসিক ব্যাধির কারণ খোঁজেন, শৈশবের ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতায় মানসিক ব্যাধির মূল কারণ হচ্ছে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত

1 Dr. I. Suttie—Origins of Hate and Love. All later social development depends upon love and relationship between mother and child.

হওয়ার ক্ষোভ, ভালবাসা পাওয়ার অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা। এতে আমাদের মানসিক বিকারের মূল হচ্ছে অবরুদ্ধ কাম, এই সূত্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ভালবাসা সর্বদাই কামান্ধ নয়, ভালবাসার মধ্যে কামও যেমন আছে তেমনি আছে রক্ষা করবার আগ্রহ এবং মানসিক বিকারের চিকিৎসায় কাম চরিতার্থের চেয়ে বেশী প্রয়োজন বুক দিয়ে ঢেকে রাখবে এমন ভালবাসা আর নিরাপত্তা বোধেরও।

শিশুর সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন বিপদ থেকে রক্ষণ ও নিরাপত্তা বোধ; এটা শিশুর প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত, কারণ বাল্যে শিশু সম্পূর্ণ অসহায় আর তার বিশেষ প্রয়োজন, যিনি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন তাঁর আন্তরিক স্নেহ। এ হচ্ছে জৈব প্রয়োজন, কেন না বাস্তবিক পক্ষে শিশুকে অপরের উপরই নির্ভর করতে হয় তার খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু এ প্রয়োজন মানসিকও বটে; কারণ শিশুর প্রয়োজন শুধু রক্ষণের নয়। সে রক্ষিত হচ্ছে, এ বোধেরও।২

দুটি মানসিক ব্যাধি, বন্ধ ঘরের ভয়, ক্লস্ট্রোফোবিয়া এবং কোলাহলপূর্ণ উন্মুক্ত স্থানের ভয় এ্যাগেরাফোবিয়ার কারণ—নিহিত থাকে শৈশবে স্নেহ যত্নের অভাব ও তার ফলে নিরাপত্তার বোধের অভাবে।

শৈশব (২-৪ বৎসর)—এ সময়টা শিশুর জীবনে বিশেষ গুরুত্ব ও সঙ্কট-পূর্ণ অধ্যায়। শিশু হাঁটতে শেখে। অনেকে এ সময়ে হাঁটি হাঁটি পা পা বয়স (period of toddlerhood) বলেন। শিশু আর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে না। চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে সুরু করে, জগৎটা হঠাৎ বড় হয়ে দেখা দেয়, শিশুর কাছে। ঔৎসুক্য (curiosity) হচ্ছে তার জীবনে প্রধান আবেগ ডাঃ হ্যাড্‌ফিল্ড (Dr. Hadfield) বলেন, দু'বছরের শিশু হচ্ছে বৈজ্ঞানিক, সব কিছুর প্রকৃতিকে বুঝতে চায় এবং চার বছরের শিশুর ইন্দ্রিয়বোধ এ সময় প্রখর হয়ে উঠে, ও বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বোধ বিকশিত হয়।

স্বাধীনতার ভাব আসতে সুরু করে ও নিজের অহংকে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ বয়সে তাই তার কান্নাকাটি মর্জি (temper-tantram) প্রবল ভাবে দেখা যায়। এবং শিশু সবার কাছে নিজেকে জাহির করতে চায়,

২ Hadfield, J. A.—"Mental Health and Psychoneurosis", P. 45-46.
"The most sharply marked crisis in the whole of child's development after birth in tho change over from true infancy to toddler-hood. !'

সবাই তাকে স্বীকার করুক, এটা সে চায় এ জন্ত দু-তিন বছরের ছেলে-মেয়েরা অনেক সময়ই বেশী হেসে কথা বলে, গোলমাল করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। এ স্বীকৃতি না পেলে, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়, এবং তার শৈশবের অতি-পরনির্ভরশীল অবস্থায় ফিরে যাবার (regression) ভয় থাকে।

এ সময়টা শিশুর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হবার আর একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে, শিশুর অহং ভাবের (ego-consciousness) সৃষ্টি, এবং নৈতিক জীবনের আদর্শ (ego-ideal) মোটামুটি ভাবে, এ সময় থেকে, তার মনে মূল বিস্তার করতে সুরু করে। শিশুর কান্নাকাটির মর্জির একটি প্রধান কারণ, তার এই অহং ভাব। অনেক সময় পিতামাতা শিশুর জেদকে অন্যায় জেদ মনে করে, তাকে অগ্রাহ্য করতেই পছন্দ করেন বেশী, কিন্তু সেটা অন্যায়। তার ফলে, শিশুর আত্ম-নির্ভরশীলতা গড়ে উঠতে পারে না। পরবর্তী জীবনে এসব শিশুর প্রবল ইচ্ছা শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। এমন শিশু ভবিষ্যতে অত্যন্ত নার্ভাস্ ও দুর্বল প্রকৃতির লোক হয়, না হয় উৎপীড়ক হয়। শিশু হচ্ছে দার্শনিক, সব কিছুর কারণ সে জানতে চায়। তাদের অফুরন্ত "কি" এবং "কেন"র জবাব দিতে অনেক সময় ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত বোধ হলেও, যতদূর সম্ভব দেওয়া উচিত।

শিশুর অহং-আদর্শের গোড়াপত্তন হতে থাকে মোটামুটিভাবে আড়াই থেকে চার বছর বয়সের মধ্যে। এর মধ্যে তিনটি স্তর আছে (১) ইঙ্গিতময়তা বা অভিভাবন (Suggestibity)—এটি শিশু মনকে অচেতনভাবেই প্রভাবান্বিত করে। (২) তদাত্মীকরণ (Identifiability), এ স্তরে শিশু অচেতন এবং কিছুটা সচেতনভাবে তার পরিবেশকে অনুকরণ করে। (৩) অহং ভাবাদর্শ—(Ego-ideal), এটা সচেতন চিন্তার ফল।

প্রথমতঃ শিশু যে পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়, সেই পরিবেশের ব্যবহার ও আদর্শ, নিজের অজ্ঞাতেই, সে গ্রহণ করে। পিতামাতার ইঙ্গিতের মারফৎ, এই পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যে। বাবার মতো বড় হওয়া, বা যে কাজটা করলে মার ভাল লাগবে, সেই কাজ করা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে না জেনেও শিশু পরিবারের আচরণের আদর্শ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। তাই পিতামাতার মধ্যে কলহ বা তাদের নৈতিক শিথিল জীবন শিশুর অবচেতন মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। শিশুর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে পিতামাতার জীবনও সুন্দর, আনন্দময় ও নির্মল হওয়া চাই। পরে কিছুটা সচেতনভাবেই,

শিশু অপরের আদর্শ অনুসরণ করে, নিজেকে অপরের স্থানে বসিয়ে নানাপ্রকার make-believe, যেন-যেন খেলা করতে ভালবাসে। ছোট মেয়ে, তার মার অংশ অভিনয় করতে ভালবাসে। পুতুল নিয়ে তাকে খাওয়ায়, সাজায়, ঘুম পাড়ায়। আবার পিয়ন, ড্রাইভার ইত্যাদি যত লোককে সে জানে, প্রত্যেকের চরিত্র নিখুঁতভাবে অভিনয় সে করতে চায় ও ভালবাসে। গল্প-শোনা নানা বীরত্বের কাহিনী যখন তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, খেলাচ্ছলে নিজেকে সেই সব বীর চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় (identification), ও সেই বীর-আদর্শ অনুকরণ করে (imitation)। এ ভাবে গড়ে ওঠে, শিশুর নৈতিক চরিত্রের বুনিয়াদ। এখন যদি আবার পিতামাতা বেশী চাপ দেন, অতিরিক্ত ভাল হয়ে ওঠার জন্য, ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। জোর করে চাপান অহং ভাবাদর্শের সঙ্গে, নিজের সত্যিকারের অহংএর একটা বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এটা অবাঞ্ছনীয়। মোটামুটিভাবে, এ সময় পরিবেশের নৈতিক আবহাওয়া, শিশুমনে গভীর রেখাপাত করে। তাই তার চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশটি নির্মল, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও উৎসাহব্যঞ্জক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাল্যকাল (৪-৭ বৎসর)—স্বাধীন হবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবলতর হতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে, শিশু তখনও চায় না। সে নির্ভর করতেও চায়। দুই পরস্পর-বিরোধী-শক্তি একই সময়ে কাজ করে। বড়দের কাছে হুকুম পেতে ভালবাসে, তা এনে দেয় নিরাপত্তার ভাব। আবার নিজের ইচ্ছানুসারে-স্বাধীনভাবে কাজ করতেও তার ভাল লাগে, তাতে হয় তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

এ সময় বহিঃপ্রকৃতির দিকে শিশুর দৃষ্টি পড়ে। গাছ-পালা, পশু-পাখী তার ভাল লাগে, জন্তু বা পাখী পুষতে পছন্দ করে।

তার দেহ, বিশেষ করে পেশীগুলি অনেকটা পুষ্টিলাভ করে, ও অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক নৈপুণ্য সে আয়ত্ত করে, যেমন দৌড়ান, লাফান,—(hopping, skipping, etc) এ সব দৈহিক নৈপুণ্য লাভের দরুণ, শুধু যে পেশীসঞ্চালনের উপর কর্তৃত্বই বাড়ে তা নয়, শিশুর মনে আত্মবিশ্বাস, আত্ম নির্ভরতা ও স্বাধীনতার ভাব আসে। এর ফলে তার অনুভূতির জীবনেরও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। পেশীগুলির সক্রিয়তা বাড়ে—তাদের পরস্পরের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্যবিধানও ঘটে। তা ছাড়া, শিশুর ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা বাড়ে এবং তার ভাষার উপর দখলও আগের চেয়ে বেশী হয়।

এখন থেকে শিশুর চিন্তাশক্তি ও যুক্তিতর্কের ক্ষমতার খানিকটা বিকাশ হয়। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। (Piaget) পিয়াজেঁর মতে ৮ বছরের নীচে শিশুরা যুক্তিপূর্ণ চিন্তা (logical thinking) করতে পারে না। এ বয়সের শিশুরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক থাকে, অর্থাৎ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে জগৎটাকে তারা বুঝবার চেষ্টা করে, অপরের দৃষ্টিভঙ্গী তারা বোঝে না। পিয়াজের মত সুজান আইজ্যাকস্ (Susan Isaaes) এ ভাবে প্রকাশ করেছেন—শৈশবের চিন্তা ও বয়স্কদের চিন্তার মধ্যে মৌলিক প্রভেদ হচ্ছে যে, শিশু সব জিনিষকে জীবন্ত (animistic) মনে করে, তাদের অদ্ভুত ক্ষমতায় বিশ্বাস করে (magic) আর অসম্ভব স্বতঃ বিরোধী ভাব একসঙ্গে মনের মধ্যে পোষণ করে (Syncretistic)।৩ কিন্তু সুজান আইজ্যাকস্, হ্যাজলিট প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে এ বয়সে শিশুদের অভিজ্ঞতা সামান্য হলেও, তার উপর নির্ভর করে তাদের নিজ সমস্যাগুলির সমাধান করতে তারা অনেকটা সক্ষম হয়, এবং তারা সাধারণভাবে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতেও তখন পারে। সুজ্যান আইজ্যাকসের ভাষায়, শৈশবের মধ্য বয়স পর্যন্ত চিন্তার ধারা থাকে হাত পা দিয়ে নাড়াচাড়া কাজ করা ইত্যাদির সহায়ক।৪ তারা কল্পনা করতে ভালবাসে, কিন্তু কাল্পনিক বস্তু যে কাল্পনিক, সত্য নয়, সে বোধ, তাদের কিছুটা থাকে।

তাদের সামাজিক বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশ সম্বন্ধে বলা যায় যে তারা এখনও সম্পূর্ণভাবে সামাজিক জীব হয়ে ওঠে না। অন্য শিশুদের প্রতি এ বয়সে বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায় না, বরং ঔদাসীন্যই বেশী। কৎনো কখনো অন্যদের প্রতি হিংসা ও বিরক্তি যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু, ধীরে সে বন্ধুত্ব করতে শেখে, এবং মিলে মিশে খেলতে পছন্দ করে। দু'তিন বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, মেজাজ-মর্জি, রাগ ও দুঃখের আতিশয্য (Intensity) দেখা যায়। নার্সারী স্কুলে এলে পর, এটা অনেক কমে যায়, কিন্তু ঈর্ষা বেশ যথেষ্টই থাকে। এর পেছনে সাধারণতঃ মা'র ভালবাসা কমে যাবার ভয়ই বেশী, এবং ছোট ভাই-বোনের প্রতি হিংসার ভাব থাকে। সেজন্য মনঃস্তাত্ত্বিকগণ শিশুকে নিজমনে যথেচ্ছ খেলা করতে দেবার পক্ষপাতী, কারণ এর ভেতর দিয়ে শিশু

3 Susan Isacs—The Psychological Aspects of Development. See. II. Year Book of Education, 1935

4 Isaacs, S,—"The Psychological aspects of child Development." P. 22, sec. II. Year Book of Edocation, 1935.

নিজের মনের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে, সামাজিক বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশও সহজ হয়।

কৈশোর—(৭-১১ বৎসর)—এ বয়সে, বস্তুবিরহিত শুদ্ধচিন্তার (abstract thinking) ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ে। তাদের স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগ করবার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এ সময় কিছু করবার, কিছু গড়বার ইচ্ছাটা বেশ প্রবল হয়, তাই এই কালকে অনেক সময় বলা হয়, প্রভুত্ব ও গঠনের বয়স (the age of mastery and achievements.)

এ বয়সে শিশুদের সমাজ-জীবন ও বুদ্ধির বিকাশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। পিয়াজে'র মতে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে, ঘটে বুদ্ধির বিকাশ। তাঁর মতে, ৭।৮ বছর বয়স থেকে শিশু অন্যের মতামত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে (socialised), ও আত্মকেন্দ্রিকতা তার কমে যায়। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে সে বুঝতে শেখে। এর ফলে, সে বস্তুবিবর্জিত সার্বজনীন (abstract and universal) চিন্তা করতে সক্ষম হয়, তার চিন্তার মধ্যে যৌক্তিকতা দেখা দেয়।

অপর পক্ষে, এ কথাও সত্য যে অনেক সময় বুদ্ধির বিকাশের দ্বারাই শিশুর সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। তার বুদ্ধিই তার সমাজ-জীবন অনুযায়ী অনুভূতির প্রকৃতি ও বিস্তরে নির্ধারণ করে। মানসিক ক্লৈব্যগ্রস্ত শিশুদের Mentally deficient) বুদ্ধি কখনই যুক্তিপূর্ণ চিন্তার রাজ্যে পৌঁছাতে পারে না এবং তাদের জীবন নিজ নিজ সুখ ও দুঃখের সাধারণ অনুভূতি দিয়ে পরিচালিত হয়।

দুই মতবাদই একপেশে ও কোনটিই সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সমাজ-জীবন, ও বুদ্ধি উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সুজান আইজ্যাক্স বলেন, বুদ্ধি ও সামাজিক বোধ এই দুইএর একটিকে কারণ আর একটিকে কার্য এ রকম না বলাই ভালো। শিশুর পরিণতি তার সমস্ত দিক মিলিয়ে, সমস্ত বয়সেই এক ও অবিভাজ্য এ রকম মনে করাই উচিত। কোন একদিকে পরিবর্তনের সঙ্গে অন্য পরিবর্তনও যুক্ত এবং তারা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে।

শিশু জগতের পরিসর বেড়ে যায়, পিতমাতার ভালবাসা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও ছোট ভাই-বোনদের প্রতি ঈর্ষা থেকে সে অনেকটাই দূরে সরে আসে! সে অনেক বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করে, ও ক্রমে সামাজিক হয়ে ওঠে। আগে সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, অন্য শিশুরা ছিল, বড়োদের ভালবাসা বা নিজের খেলার জিনিষ কেড়ে নেওয়ার প্রতীক, সুতরাং হিংসা বা ঈর্ষার পাত্র। ছোটদের সঙ্গে

মিলে খেলা করলেও, আপন আনন্দই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য, এবং বড়োদের কাছে প্রশংসা অর্জনের জন্য যে কোন মুহূর্তে খেলার সঙ্গীকে ত্যাগ করতে, বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে, তার বাধে না। কল্পনার জগতটাই তার বেশী প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন দলগত বোধ তার প্রবল হয়, এবং শিশু অনেকটাই সামাজিক হয়ে ওঠে ও নিজের দৃষ্টি ভঙ্গীকেই একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী মনে করে না। সহযোগিতার ভাব ক্রমে তার মনে জাগে, ও অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলে খেলতে সে ভালবাসে। সে দল (team) বানায়, ও নিজেকে সেই ক্ষুদ্র সমাজের অঙ্গ হিসাবে দেখে। পিতামাতা ও শিক্ষকের মতামতের চেয়ে, বন্ধুদের মতামতের মূল্য তখন বেশী হয়ে দাঁড়ায়।

এ বয়সকে অনেক সময় বলা হয় দল গড়বার বয়স (gang age) এবং এ বয়সের সীমা (the peak of gang age) হচ্ছে, এগার বছর বয়স। ঠিকভাবে পরিচালিত না হলে, দুষ্ট দলের সঙ্গে মিশে যাবার সম্ভাবনা থাকে, এবং অপরাধ-প্রবণতা (delinquency), এ সময়েই আত্মপ্রকাশ করে যায়।

দলের প্রতি আনুগত্য ভাব প্রবল থাকে তাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন মেনে তারা চলে। বয়স্কাউট, ব্রতচারী, গার্ল গাইড, ইয়ুথ ক্লাব এর মূল্য এই বয়সে যথেষ্ট।

গড্‌ফ্রে টমসন্ (Godfrey Thompson) বলেছেন, সকলে একথাটা স্বীকার করেন এ বয়সের কোন না কোন কালে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দেয়। আর এ সময়েই আসে নানা রকম দলে থাকবার ও নানা রকম কাজে মিশবার আগ্রহ। এ বয়সে বয়স্কাউট বা অন্য কোন সংস্থা তা সে যে নামেই হোক্ না কেন, শিশুর পক্ষে ভাল।

কিন্তু দলগত মনোভাব সুরু হলেও তাকেই সে সবচেয়ে বড় মূল্য দেয় না। সে দলের অংশ হিসাবে কাজ করে কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর নয়। সে তার নিজের যশের জন্য বেশী ব্যগ্র থাকে। কোন নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের জন্য পূর্ণ আত্মসমর্পণ তখনও সে করতে পারে না, যদি না, সেই আদর্শ তার বিশেষ পরিচিত কোন ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠতে দেখে। তবে, অন্যদের সঙ্গে খেলার মধ্য দিয়ে, সামাজিক আদান প্রদানের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, ভবিষ্যতে আদর্শের জন্য, ও সমাজের জন্য নিস্বার্থপর আত্মাহুতির ভিত্তি রচিত হয়ে থাকে।

এ সময়ে শিশুরা নাচ, গান, বাজনা, অভিনয়, ছবি আঁকা ইত্যাদির প্রতি

আকৃষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে অভিনয়, নানাপ্রকার কারু ও চারুশিল্প-কর্মের সাহায্যে তাদের সামাজিক বুদ্ধি বিকাশের সহায়তা করা উচিত। দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান এ বয়সে কতকটা হয়, সেজন্য এ বয়সের শিশুকে কিছু কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে, তার আত্মবিকাশের সাহায্য করা উচিত।

শিশু নানা জিনিষ সঞ্চয় করতে ভালবাসে। শিশুর পকেটে ভাঙ্গা ছুরি, কলম, রবার, ডাকটিকিট কী না থাকে এবং যার একটি পকেট থাকে না জামায়, তার বোধ হয় দুঃখের আর অন্ত থাকে না। তাদের জামায পকেট দেওয়া হ'ত না, এ অগৌরব শিশু রবীন্দ্রনাথকে বড পীডা দিত, তাই তাদের সকাতর আবেদন ছিল খলিফা নেযামত আলির কাছে যাতে এ ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

শিশুর এই প্রভুত্ব বা মালিকানা বোধ (sense of property), ভবিষ্যৎ জীবনের বহু সুখ ও দুঃখের মূল। এ একটি প্রবল মানসিক ও সামাজিক সংস্কার, কাজেই এর সুস্থ বিকাশ খুবই প্রযোজন। এ সংস্কার উপযুক্ত পরিতৃপ্তির সুযোগ না পেলে বা অযথা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে অবচেতন মনে তার "জটিল মূল সুদূরে প্রসারে, নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল"।৬ ফলে শিশু ঈর্ষা, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি গোপন অপরাধের প্রতি আকৃষ্ট হযে, সে সংস্কারের তৃপ্তি খোঁজে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সংস্কারকে শিশুর সুস্থ মর্যাদা-বোধের সহায়ক হিসাবে কাজে লাগানো বুদ্ধিমান শিক্ষকের কর্তব্য। মালিকানাবোধ এ বয়সে যেমন প্রবল হয়, তেমন আর কখনো হয় না। এ প্রবৃত্তি অনাদৃত হলে, অথবা সম্পূর্ণ অতৃপ্ত থাকলে অবচেতন মনে এ ক্ষোভ আত্মগোপন করে এবং ঈর্ষা, চৌর্য্য-বৃত্তি ইত্যাদিতে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রবৃত্তি বুদ্ধি ও দূর-দৃষ্টি অনুসারে ব্যবহার করলে একটা আত্মমর্যাদা ও অপরের সম্পর্কে বিবেচনা-রূপ সৎগুণে পরিণত হয়। শিশু তার নিজ ডেস্ক, বই-পত্র ইত্যাদির জন্য বিশেষ গর্ব বোধ করে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এ অত্যন্ত প্রবল অস্ত্র। ৭

শিশু নিজ লিঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন হযে ওঠে, কিন্তু যৌন-আকর্ষণ (দুষ্ট প্রভাবে পড়লে) সাধারণতঃ এ বযসে দেখা যায না।

উত্তর কৈশোর (Adolescence)—বলতে আমরা সেই বয়ঃসন্ধিকালকেই

5 রবীন্দ্রনাথ—ছেলেবেলা।
6 „ —গান্ধারীর আবেদন।
7 Susan Isaacs—"The psychological aspects of child development"

বুঝি যখন শিশু তার কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদাপণ করে। এই বয়সেই শিশুর দেহ ও মন অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থা থেকে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। এ হচ্ছে একটা পরিবর্তনের কাল, যখন শিশু বাল্যের অবস্থা থেকে বয়স্কের মর্যাদা পেতে যাচ্ছে। এ বয়সে শিশু পরিপূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

কোন বয়সে শিশু কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে, তার সঠিক সীমারেখা টানা ঠিক সম্ভব নয়। অবশ্য এ বিষয়ে গবেষণার অন্ত নেই।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জগতে বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলি এক বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যানলী হল এর Adolescence নামে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, এ নিয়ে বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চলেছে এবং এ সম্বন্ধে বহু বই লেখা হয়েছে। পূর্বেই বলেছি ষ্ট্যানলি হল এর মতে, একজন ব্যক্তির মানসিক বিকাশের ইতিহাস সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বয়ঃসন্ধিকাল নূতন করে প্রাণীজীবনের অতীতে প্রত্যাবর্তনে এ সময়ে জাতির জীবনের পরবর্তীকালের ইতিহাসই প্রকট হয়ে ওঠে! পরিণতিটা তখন ক্রমশও ধীর নয় উল্লম্ফনকারী (saltatory) এবং এতে জীবজগতের ইতিহাসে ঝড় ঝঞ্ঝার একটি অধ্যায়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট। সে দুর্যোগে প্রাচীন বন্ধনগুলি ছিন্ন হয়ে, উন্নতির অবস্থায় জীব উন্নীত হয়। ৮

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কিছুকাল পর্য্যন্ত, মনোবিজ্ঞানীদের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল, যে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলি আসে বিপ্লবের মত, হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার মত এসে পুরাণো জীবনের ধারাকে বদলে, নতুন ধারার প্রবর্তন করে। বয়ঃসন্ধিকাল নবজন্মলাভ ; কারণ এ সময়ই উন্নততর ও সম্পূর্ণতর মানব লক্ষণগুলি প্রকট হয়। এ এক অত্যাশ্চর্য্য নব-জীবন। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থেও বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণার মধ্যে কিছু অতিশয়োক্তি আছে এবং মনঃস্তত্বের দিক থেকে ধারণাটা সত্য নয়। বয়ঃসন্ধি হঠাৎ আসে না, শিশুর বিকাশ চলেছিল জন্মের পর হতেই, সেই ক্রমবিকাশেরই এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে এই বয়ঃসন্ধিকাল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর মতে যৌবনাগম একটা আকস্মিক ছেদ যা সমস্ত মানবের জীবনে একই বয়সে আসে তা নয়, বরং এটা একটা ধীর পরিণতি

8 **Stanley Hall—Adolescence.**

প্রক্রিয়ার শেষ অবস্থা। এ পরিণতির প্রক্রিয়া জন্মকাল থেকেই, বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন ব্যক্তিতে চলতে থাকে। অপেক্ষাকৃত আদিম সমাজে যৌবনাগম কোন সমস্যা নিয়ে আসে না। স্যামোয়া, নিউগিনি (Samoa, New Guinea) ইত্যাদি স্থানে কৈশোর উত্তীর্ণ হবার সময় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কয়েক সপ্তাহ বা বেশ কিছুদিন ধরে উৎসব চলে, এবং শারীরিক পরিবর্তনের কালটি কেটে গেলেই কিশোরকে বড়দের সমাজে স্থান দেওয়া হয় এবং নাগরিকের দায়িত্ব তাকে বর্তায়। প্রকৃতপক্ষে বয়ঃসন্ধি বলে কোন বিশেষ কাল তাদের নেই বল্লেই চলে, এবং সমস্যাও তাই কিছু সৃষ্টি হয় না। এজন্য কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে, বিশেষ করে বিখ্যাত সমাজ তত্ত্ববিদ্ মার্গারেট মীডের (Margaret Mead) মতে, বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলি আধুনিক সভ্যসমাজের সৃষ্টি। বাল্যকাল উত্তীর্ণ হযে যাবার পরও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসতে অনেক দেরী হয়, ফলে সমাজে কৈশোরোত্তর শিশুর মর্যাদা থাকে না, ও বয়ঃসন্ধিকাল নামক সময়ে কতগুলি তথাকথিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোল্ (Cole) তাঁর 'Psychology of Adolescence' পুস্তকেও এই মতের সমর্থন করছেন।' বয়ঃসন্ধিকালের সামাজিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই দেখা দিয়েছে, যদিও বহু অতীত শতাব্দী থেকে এ কালের দৈহিক পরিবর্তনের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া, অন্য দিক থেকেও, এ বয়ঃকালকে বিবেচনা করা চলে। বয়ঃসন্ধিকালের মনঃস্তত্ত্ব বলতে অনেকে মনে করেন তা শুধু মনের উপর শারীরিক পরিবর্তনের প্রভাবের কাহিনী মাত্র। এ একটা জৈব ব্যাপার মাত্র। যৌবনাগমের মনস্তত্ত্ব, এ জৈব পরিবর্তন ব্যক্তির ব্যবহারের উপরে কি প্রভাব বিস্তার করে, তা আলোচনা করে। আবার অনেকে মনে করেন, বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা মানেই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর নানাবিধ সমস্যা। আমরা এই সব দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় করতে চেষ্টা করব এবং এ কথা মেনে নেব, যে বয়ঃসন্ধি একটা সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার নয়। ষ্ট্যানলী হলের মতবাদ যে যৌবনাগম একটা সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা একথা আমরা সত্য মনে করি না। শিশুর দেহ ও মনে ক্রমাগত একটা বিকাশ চলছিলই, এই বয়সটায় তা দ্রুততর হয়ে সর্ব্বশেষে আমাদের কাছে একটা বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। একটা ধীর ও ক্রমান্বয় পরিণতি চলতে থাকে। হয়তো কিছুকালের জন্য গতি দ্রুততর

9 Cole—Psychology of adolescence.

হয়ে যৌবনাগম চোখে পড়ে, যেমন ১২ বছ'র বা তার চেয়ে ছোট ছেলে মেয়েকে ১৬ বছরের তরুণ তরুণীর সঙ্গে তুলনা করে তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য চোখে ধরা পড়ে।১০

পরিবর্তনগুলি এত ধীরে ধীরে ও অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলে যে ঠিক কখন কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে, বয়ঃসন্ধিকাল সুরু হয়, তা বলা বড় কঠিন। এ বয়সটি নির্দিষ্ট নয়,—বিভিন্ন ছেলেমেয়ের মধ্যে এ কালটি ১১ থেকে ১৪ বৎসরের মধ্যে আসে। মানসিক পরিবর্তনগুলি এত অবিচ্ছিন্ন ধীর গতিতে হয় যে এগারো বৎসর বা বারো বৎসর বা তারও পরে তা ধরা পড়ে। কখন প্রথম যৌবনাগম হয় তা বলা অসম্ভব। হঠাৎ কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে না—ঘটে না কোন অগস্ত্যযাত্রা। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যদি কিছু ঘটে, সেটা শিশুর জীবনে নয়— পরীক্ষকের মনে।" ১১

ক্র্যাম্পটন (Crampton) প্রমুখ বিশিষ্ট মনঃতাত্ত্বিকদের মতে বয়ঃসন্ধিকাল সুরু হয় মেয়েদের বেলায়, প্রথম রজঃ নিঃসারণের বা মাসিক ঋতুর সঙ্গে, এবং ছেলেদের বেলায় শরীরের কয়েকটি স্থান বিশেষে রোম দেখা দিলে। গড়পড়তা কোন বয়সে কোন জলবায়ুতে, কোন সামাজিক শ্রেণীর কোন জাতির মেয়েদের প্রথম ঋতু দেখা দেয়, এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং তাতে দেখা যায়, এ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

হারভার্ড গ্রোথ ষ্টাডিস্ (Harvard Growth Studies)এর ফলের উপর নির্ভর ক'রে ডিয়ারবর্ণ ও রথনী এই মতে উপনীত হয়েছেন যে, দেহ ও মনের সর্বাধিক পরিণতির বয়সটা (Maximum growth age) হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকালের মাপকাঠি অর্থাৎ যখন শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হয়, তখনই যৌবনাগম হয়েছে বুঝতে হয়। এদের মতে কৈশোরে বৃদ্ধির হার দ্রুত হয়। প্রত্যেক কিশোরকে আলাদা ভাবে পরীক্ষা করে তাদের পরিণতির হারের লেখ তৈরী করলে দেখা যায় যে, তথাকথিত বয়ঃসন্ধিকালের অব্যবহিত পূর্বেই একটা খুব জোর বাড়বার তাগিদ (intense growth spurt) আসে। সাধারণের গতির হারের লেখের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তির এই হঠাৎ বাড়তির রেখাটা ধরা পড়ে না। "সাধারণের পরিণতির হারের লেখের মধ্যে ব্যক্তির

10 C. Burt—British Journal of Psychology 1943—The Education of the Young Adolescent.

11 C. Burt—British Journal of Psychology 1943—The Education of the Young Adolescent.

পরিণতির শেষের অনিয়মিততা চোখে পড়ে না। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে সব চেয়ে বেশী বাড়বার কাল আর মেয়েদের প্রথম ঋতুকাল ও ছেলেদের লিঙ্গরোমোদ্গমের কাল একই। এ চিহ্নগুলি যৌবনাগমের সব চেয়ে নির্ভর-যোগ্য লক্ষণ।[১২] ডিয়ারবর্ণ ও রথনী ৭৪৭ জন মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করে, সর্বোচ্চ বৃদ্ধির গড় বয়স পেয়েছেন ১২.৫ বৎসর, আর ৭১১ জন ছেলেকে পরীক্ষা করে গড় বয়স পেয়েছেন, ১৪.৮ বৎসর।

এ কথা আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে যে, এ সমস্ত বয়সই হচ্ছে গড় বয়স, এবং যদিও অধিকাংশেরই যৌবনাগম অবস্থাটা এই গড় বয়সের কাছাকাছি ঘটে, তবুও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে। দেশ, কাল, জলবায়ু অনেক কারণই এর পেছনে থাকে। তবে মোটামুটিভাবে বলতে পারি যে, বয়ঃসন্ধিকাল বলতে আমরা এগার কি বার হতে কুড়ি কি একুশ বছরের ছেলেমেয়েদের বয়সটাকে সাধারণতঃ বোঝাই। এ বয়সে শারীরিক পরিবর্তন যথেষ্টই ঘটে এবং যৌবনাগম ঘটে। কিন্তু তবুও শারীরিক ও মানসিক দিক হতে বড়দের মতো স্থিতাবস্থা তখনো আসে না। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনাগম আগে হয় এবং দেহ-মনের পরিণতির শেষ সীমায় মেয়েরা আগে পৌঁছায়। আবার সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (tropical climates) যৌবনাগম আগে হয়।

যৌবনাগম বা প্যুবার্টি কথাটির তাৎপর্য একটু আলোচনা করা দরকার। সাধারণতঃ, যে সব শারীরিক পরিবর্তন ঘটলে, সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা জন্মে, তাকে বলা হয় যৌবনাগম। মেয়েদেব ক্ষেত্রে যৌবনাগমের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে প্রথম ঋতু হওয়া। ছেলেদের ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে না, যার থেকে সঠিকভাবে বলা যায় যে যৌবনাগম হয়েছে। সাধারণতঃ গলার স্বরের পরিবর্তন, গোঁফ-দাড়ীর রেখা ও লিঙ্গমূলে রোমোদ্গম থেকে ধরা যায়, যে যৌবনাগম হয়েছে। যৌবনাগম বা প্যুবার্টি কথার তাৎপর্য শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ। বয়ঃসন্ধি বা এ্যাডোলেসেন্স্ (Adolescence) কথার অর্থ আরো ব্যাপকতর, এর একটা সামাজিক ও মানসিক দিক রয়ে গেছে।

সাধারণতঃ প্যুবার্টির সময় থেকে সুরু করে, পূর্ণাঙ্গ যুবক বা যুবতী হওয়া পর্য্যন্ত বয়ঃকালকে, বলা হয় বয়ঃসন্ধি বা এ্যাডোলেসেন্স। আমরা প্রাক্‌যৌবনাগম কালকে প্রস্তুতি হিসাবে বয়ঃসন্ধিকালেরই অন্যতম অঙ্গ হিসাবে দেখেছি এখানে।

12 Dearborn & Rothney—Predicting the child's Development.

বয়ঃসন্ধিকাল কখন শেষ হয়ে পূর্ণ যৌবন আসে, তারও শেষ সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি এত ধীরে কমে আসে যে, কখন থেমেছে ধরা যায় না। উচ্চতর হার দিয়ে যদি বিচার করি, হয়ত বলা যায় যে মেয়েদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বন্ধ হয ১৯।২০ বৎসর বয়সে, এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২০।২১ বৎসর বয়সে। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, এবং বহু ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখা যায়।

শারীরিক পরিবর্তন—

(১) বয়ঃসন্ধিকালে সর্বাঙ্গের পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্ল্যাণ্ড, মাংশপেশী, হাড়, মস্তিষ্ক প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ও সুগঠিত হয়ে ওঠে, এবং প্রত্যেক অঙ্গের বৃদ্ধি নিজস্ব গতিতে চলে।

যৌবনাগমের কিছুকাল পূর্ব্বে, শারীরিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। দৈর্ঘ্যের গতি বিশেষ করে দ্রুত হয়। ক্র্যাম্পটন (Crampton), সাটল্‌ওয়ার্থ (Shuttleworth) ডিয়ারবর্ণ (Dearborn) এরা সকলেই এই ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। হাত ও পায়ের লম্বা হাড়গুলি এত দ্রুত লম্বা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে এক বছরে ৬ ইঞ্চি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায়। শরীরের ওজনও বাড়ে, কিন্তু দৈর্ঘ্যের অনুপাতে কম। কাজেই কিছুদিনের জন্য আমরা দেখি শরীরের তুলনায় হাতপাগুলো লম্বা ছেলেমেয়ের দল যাদের দেখলে মনে হয়, শুধু হাঁটু, কনুই ইত্যাদি কোণেরই সমষ্টি। যৌবনাগমের পরে দৈহিক বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমে আসে, এবং প্রতি বছরেই অল্প অল্প কমতে কমতে একেবারেই শেষে থেমে যায়। তখন বলা যায় পূর্ণ যৌবন এসেছে।

এই দৈহিক পরিবর্তনের হার সকলের পক্ষে সমান নয়। মেয়েরা প্রথম দিকে ছেলেদের চেয়ে বেশী লম্বা হয়। কিন্তু বছর দুয়েক পরেই, হঠাৎ যেন ছেলেরা লম্বা হয়ে যায়। যাদের পরিবর্তন শীঘ্র হয়, তারা সময় পায় নিজেদের সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে, আবার অসুবিধাও তাদের প্রচুর থাকে। অনেক সময়ই তাদের একটু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে হয়, এবং যতদিন তাদের সমবয়সী বন্ধুরা তাদের মত বিকশিত না হয়ে ওঠে, ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আবার, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি একই হারে, না হতে পারে। যে মেয়েটি অল্প বয়সে খুব লম্বা হয়ে গেছে, সে হয়ত অন্যান্যদিকে অপরিপূর্ণ থাকতে পারে।

এই সামঞ্জস্যের অভাবে, তার শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক অসুবিধা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

(২) মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ, ঠিক সমানভাবে বিকশিত হয় না। মুখের বিভিন্ন অংশের যে অনুপাত পূর্বে ছিল তার পরিবর্তন ঘটে। মেয়েদের মুখ কোমলতর ও লাবণ্যময় হয়ে ওঠে, পুরন্ত ও গোলগাল হয়। ছেলেদের মুখে কাঠিন্যের ছাপ আসতে সুরু করে, চোয়ালের হাড় যেন উঁচু হয়ে বেরিয়ে পড়ে, মাংস দৃঢ়তর হয়।

(৩) যৌবনাগমে রোমোদ্গম হয়—বিশেষ করে, ছেলেদের বেলায়, গোঁফ দাড়ী দেখা দেয়।

(৪) গলায় স্বরের পরিবর্তন—মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষিত হয় না। ছেলেদের ল্যারিংনক্স বা কণ্ঠমণি বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং স্বরনালী লম্বায় অনেকটা বেড়ে যায়। কিন্তু এই পরিবর্তন সাধিত হতে প্রায় এক বছর কি তারো বেশী সময় লাগে। সেই পরিবর্তনকালে, গলার স্বর অনেক সময়, কর্কশ, ভাঙ্গা (harsh) ও বেসুরা (discordant) হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক খাদ থেকে অপর খাদে স্বর নেমে যায়।

এ সব দৈহিক পরিবর্তন অর্থাৎ যৌন অঙ্গ ব্যতীত অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন গৌন যৌন পরিবতন বলা হয়। ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিভিন্ন ধরণের।

(৫) বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক শক্তি বাড়ে, পেশী ইত্যাদির উপর শাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ লোকের ধারণা যে কিশোর কিশোরীরা শারীরিক শক্তির কাজে নৈপুণ্য দেখাতে পারে না। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের গঠন চলন কেমন যেন বেখাপ্পা ও বেমানান। মার্গারেট মীড্ সামোয়া দ্বীপের মেয়ের কথা বলছেন—সামোয়ার মেয়েদের বেখাপ চলন। সাধারণতঃ, এর কারণ যে হাত ও পা অন্য অঙ্গের তুলনায় এত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় যে ছেলেমেয়েরা তাদের পরিচালনা করতে, একটু দিশাহারা হয়ে পড়ে।" মীড এর এ ধারণা খুব সত্য নয়। বরং এবয়সে ছেলেমেয়েদের অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাদের ব্যবহার ও চলায় মাঝে মাঝে যে জড়তা দেখা যায়, তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে, আত্মসচেতনতা ও অস্বস্তিবোধ। সাধারণতঃ তাদের আকৃতিগত পরিবর্তন এত বেশী চোখে পড়ে যে লোকেরা অনেক সময়ই নানা মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে। ফলে কিছু পরিমাণে আত্মসচেতন তারা হয়ে ওঠে, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুসমঞ্জস

সঞ্চালনের প্রধান শত্রু হচ্ছে, আত্মসচেতনতা। লোক-চক্ষুর আড়ালে গেলেই অনেক সময়, জড়, লজ্জিত, পরিণত কিশোরটি অদ্ভুত হস্তনৈপুণ্য দেখাতে পারে, এবং খেলার মাঠে, ব্যায়ামাগারে সুন্দর ও নিপুণ দৈহিক কর্মের এরা পরিচয় দেয়।

(৬) রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তন—রসক্ষরা গ্রন্থির অনেক পরিবর্তন হয়। উপযুক্ত গ্রন্থিগুলি থেকে সেক্স হর্মোন্‌স্‌ নিঃসৃত হয়, এবং যৌন অঙ্গের ও সমগ্র দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে আসে যৌন-চেতনা। তবে এই যৌন-চেতনা হঠাৎ যৌবনাগম সময়ে নতুন করে দেখা দেয় না। শৈশবে, বাল্যে এই চেতনা ছিল, তবে সে চেতনা অনেক পরিমাণে সুপ্ত ছিল. বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ করে জাগ্রত হয়। উইলোবি বলেন যৌবনাগমে যৌন ব্যবহার আরম্ভ হয় না, উগ্রতর হয় মাত্র।

এই যৌন চেতনার বিকাশের কয়েকটি ধাপ আছে। সে কথা আলোচনা পরে করব, কিশোরের অনুভূতির জীবনের বিকাশের আলোচনা সূত্রে।

এ সব পরিবর্তন ছাড়াও রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও পরিপাক যন্ত্রগুলিও পরিবর্তিত হয় এবং তাদের ক্রিয়ার গতিরও পরিবর্তন হয়। এর ফলে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা বেড়ে যায়। কখনও কখনও তাদের মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, বুকধরফর করা, মূর্ছা ইত্যাদি লক্ষণও দেখা দেয়। অনেক সময় এ অবস্থা গুলি নিতান্তই সাময়িক, এবং বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য পেলে, অল্প সময়েই সেরে যায়। তবে এ সব লক্ষণ দেখা দিলে, বুঝতে হবে, বাড়ন্ত ছেলে বা মেয়ে দেহ ও মনের দ্রুত পরিবর্তনগুলির সামঞ্জস্যবিধান করতে পাচ্ছে না,—হয়তো বা তার নিজের অন্তর্জগতে বা সামাজিক জীবনে কোন সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, যার সমাধান সে কর্তে পাচ্ছে না।

বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধির বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে দু'টি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। প্রথমতঃ, বুদ্ধির বিকাশের শেষ সীমারেখা কখন টানা যায়? দ্বিতীয়তঃ, মানসিক বিকাশের প্রকৃতি ও গতি কি প্রকার? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের সমস্যা নিহিত আছে। আমাদের জানতে হবে, বুদ্ধির গতি একই হারে চলে কিনা, এবং বিভিন্ন কিশোরের বুদ্ধির বিকাশের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি?

(১) বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সব চেয়ে বেশী হয়, এবং এখানেই তার উর্দ্ধগতির সমাপ্তি। এই সমাপ্তি যে কখন হয়, তা ধরা শক্ত। কারণ

বিকাশের গতি অতি ধীরে কমে যায়। আগে মনস্তাত্ত্বিকেরা সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশের শেষ সীমা নির্দ্ধারণ করেছিলেন ১৪ বছর হতে ১৮ বছর বয়স অবধি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে টারম্যান বলেন যে, ১৬ বছরের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষাদির ফলে শেষ সীমাকে আরো উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছে। থর্ণডাইক তার টেষ্ট রিটেষ্ট উপায়ের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ১৯ বছর বয়স অবধি বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। বর্তমানে ফ্রীম্যান ও ফ্লোরি এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। তারা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০ শত ছেলেমেয়ের উপর পরীক্ষা করেন, অনেক বছর ধরে। তারা দেখেছেন যে ১৬ বছরের পরেও মাননিক উন্নতি চলতে থাকে, এবং বুদ্ধির বিকাশ পরিমাপক বক্র রেখার উর্দ্ধগতি অব্যাহত থাকে। তা ছাড়া তারা সাধারর প্রচলিত ধারণা যে বোকা ছেলেদের শিক্ষার হ্রাস করা উচিত এর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের পরিণতির কাল দীর্ঘতম, কাজেই এটা ধরে নেওয়াই সঙ্গত যে এ সব ছেলেনেয়েদের জন্য দীর্ঘতর কাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আবার যারা তেমন বুদ্ধিমান নয় অথবা যাদের বুদ্ধির পরিপক্কতা অন্যদের তুলনায় মন্থরগতিতে হয়, সে সব ছেলেদের এমন সব সহজতর শি..য় ভর্তি করা উচিত যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাল হ্রস্বতর হয়। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে সব ছো লমেয়ের পরিপক্কতার হার হ্রস্বতর তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাল দীর্ঘতর করলে তারা বুদ্ধিনান ছেলেদের মতই অথবা তার চেয়ে বেশীই বরং উপকৃত হয়।

ডিয়ারবর্ণ ও রথনী তাদের প্রেডিক্‌টিং দি চাইণ্ডস্ ডিভেলস্ ডিভেলপমেণ্ট পুস্তকে লিখেছেন, "পক্ষান্তরে আমাদের পরীক্ষার ফল থেকে দেখা যায় যে মোটামুটি ত্রিশ বৎসর পর্যান্ত মানসিক পরিণতি চলতে থাকে; সাধারণতঃ গড় বুদ্ধির বিকশের পতকা ২ অংশ একুশ বা বাইশ বছরের পরে ঘটে। ১৪

মানসিক বিকাশের হারের নিয়মিততা—সাধারণভাবে বলতে গেলে, যৌবনাগমের পূর্বাহ্নে মানসিক বিকাশের গতি দ্রুততর হয়, তার পরে বৃদ্ধির হার অনেকটাই কমে যায় ও বয়ঃসন্ধির শেষ পর্য্যন্ত প্রায় একই হারে চলতে থাকে ও ধীরে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

"সাধারণের বুদ্ধির বিকাশের গতির বক্ররেখা বা লেখ সম্বন্ধে ফ্রীম্যান্ ও ফ্লোরি বুদ্ধির বিভিন্ন পরীক্ষার (CAVD) বিচারে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে

13 43rd Year Book of National Sociely for the Study of Education.
14 Dearborn & Rothney—Predicting the Child's Development.

পৌঁছেছেন। (১) যৌবনাগমের ঠিক প্রারম্ভে এর গতি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। (২) যৌবনাগমের সঙ্গে এ গতি সামান্য হ্রাস হয় (৩) এবং আর হ্রাস না হয়ে, মোটামুটি একই ভাবে যৌবনাগমের শেষ সীমা পর্যন্ত বিকাশ চলতে থাকে। যদিও সাধারণের বুদ্ধি বিকাশের গতির বক্ররেখা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিবিকাশের গতির রেখার সঙ্গে মিলিতে না পারে, তবুও সাধারণ বুদ্ধির বিকাশের গতির বক্ররেখার মধ্য দিয়েই মোটামুটি বুদ্ধি বিকাশের রূপ প্রকাশিত হয়। সাধারণ নিয়ম এই যে এই দুইটি রেখা সমান্তরালভাবে চলে তবে কখনো কখনো এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েই থাকে।১৫

কাজেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ছাড়াও, একই ব্যক্তির বিকাশের হারও সর্বদা একই রকম থাকে না। কাজেই যে ১১ বছর বয়সে বুদ্ধিপরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, ১৬ বছর বয়সেও সেই ছেলেই অন্যান্যদের তুলনায় বেশী নম্বর পাবে, এমন ভবিষ্যৎ বাণী করা চলে না। কারো কারো বিকাশের গতি প্রথম দিকে মন্থর হলে, শেষে দ্রুত হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়।

(২) বয়ঃসন্ধিকালেই এই ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। কারণ, এই সময় সাধারণ ও বিশেষ যোগ্যতা উভয়রূপ বুদ্ধিই বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

(৩) বুদ্ধির বিকাশের গতি ও প্রকৃতি ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে একই প্রকার ও ছেলে-মেয়েতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য অনুভূত হয় না। বরঞ্চ বিভিন্ন ছেলেদের মধ্যে বা মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য তার চেয়ে বেশী দেখা যায়।

(৪) মানসিক বুদ্ধির সঙ্গে শারীরিক বৃদ্ধির কোন নিয়ত সম্বন্ধ নেই। অনেক সময় উল্টো সম্বন্ধ দেখা যায়। যেমন দুর্বল, অপুষ্ট-দেহী ছেলে অত্যন্ত প্রতিভাশালী হ'বার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ ছেলেমেয়েদের দৈহিক পরিণতি সাধারণের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়।

অনুভূতি ও সামাজিক বুদ্ধির বিকাশ—

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন যথেষ্টই ঘটে, তার সাধারণ ও বিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতার চরম বিকাশ এ সময় দেখা দেয়। কিন্তু বুদ্ধি ও দেহের পরিবর্তন অপেক্ষাও প্রবলতর ভাবে দেখা দেয়, তার আবেগ ও ভাবরাজ্যে আলোড়ন।

15 43rd Year Book of the N. S. S. E.

মণীন্দ্রলাল বসু'জীবনায়নে' এ বয়সের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'তরুণ যুবকের অন্তরলোক যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্যামল ছায়া-ঘন অরণ্য। এখনও চারিদিকে জল ও স্থলের বিভাগ স্থির হয় নাই। ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতে কোথাও পর্বত ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের সৃষ্টি হয়, কোথায়ও সমুদ্রত হইতে পর্বতশৃঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত তপ্ত বাষ্পের আলোড়নে কত অচিন্ত্যনীয় তাণ্ডব-নৃত্য। ৬

রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তন ও যৌন অঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মধ্যে একটা মানসিক চঞ্চলতা বা মানসিক স্থৈর্যের অভাব দেখা দেয়। সকল প্রকার প্রধান আবেগগুলি গভীরভাবে অনুভূত হয়। খুব বড় কিছু করবার আকাঙ্খা, দুর্গমকে জয় করবার দুর্নিবার আবেগ এ বয়সে খুব স্বাভাবিক। এ বয়স সম্পর্কে হলিংওয়ার্থ বলছেন, এই বয়সে ব্যক্তি নানা কৌতূহলী অনুভূতি ও আকাঙ্খার বেগ অনুভব করে, সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ অত্যন্ত সাহস, বীরত্ব এবং গুরুজনদের বিরক্তিকর শাসনের প্রতি মৃদু অবজ্ঞা বোধ করে। ১৭

মুজাফর সেরিফ তাঁর 'দি আউট্‌লাইনস্‌ অফ সোস্যাল সাইকোলজী পুস্তকে এ প্রসঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন এণ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থিগুলির সামাজিক তাৎপর্য্যবাদ দিলেও এ সব দৈহিক পরিবর্তনের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তনে ঘটে তরুণের অনুভূতি ও আগ্রহের বস্তু শৈশবের থেকে পৃথক হয়। ১৮

বিশেষ করে যৌন-চেতনা ও স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসার আকাঙ্খা উদগ্রভাবে দেখা দেয়। যৌন-চেতনার বিকাশ সম্বন্ধে দুটি ভুল ধারণার প্রচলন আছে। একটি মত হচ্ছে যে, যৌবনাগমেই যৌন-চেতনা প্রথম জাগে। দ্বিতীয়তঃ ফ্রয়েড-পন্থীদের মতে শৈশবকাল হতেই এই চেতনা বিদ্যমান থাকে। শৈশবে এই চেতনার প্রকাশ পায় ছেলের মার প্রতি আকর্ষণে ও মেয়ের পিতার প্রতি আকর্ষণে। প্রথম মত অপেক্ষা ফ্রয়েডীয় মত অধিকতর সত্য কিন্তু শৈশবে ঠিক যৌন-চেতনা দেখা যায় না, শৈশবে ভালবাসার আকাঙ্খা দেখা যায়।

দৈহিক দিক হতে দেখলে, পরিবর্তন সুরু হয় কৈশোরের পূর্ব হতেই

19 মণীন্দ্রলাল বসু—জীবনায়ন।
I7 L, S, Hollingworth Psychology of the Adolescent,
I8 Muzafer Sherif The Outlines of Social Psychology, P, 322.

কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে যৌন-চেতনা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং দেহের পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা জাগে।

শৈশবের ভালবাসার অভাব হ'লে সেই অভাব বোধ বিশেষভাবে কিশোর মনে পরবর্তীকালে আবার জাগরিত হয় এবং বিদ্যালয়ে ও বাইরে সে বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হয়ে উঠে। এ বয়সে স্নেহ ও ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার বিকাশের কয়েকটি বিশেষ পর্য্যায় লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ একই লিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়। ছেলেরা ছেলে বন্ধু পছন্দ করে, ও মেয়েরা মেয়ে বন্ধু। বিশেষ কোন একজনকেই বন্ধু তারা করে না, তারা দলকেই বেশী ভালবাসে এবং একসঙ্গে মিলে কাজ করতে চায়। এভাবেই হয়, গৃহে পিতামাতার স্নেহ-শাসনের হাত হ'তে মুক্তি, ও বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত ও অন্তরঙ্গতা।

তারপর, সমলিঙ্গ-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হয়। তখন বন্ধুত্বের জন্য তারা উৎসুক হয়, যে প্রিয় বন্ধুর কাছে আপন অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে। কৈশোরের বন্ধুত্ব অনেক সময় অতি গভীর ও চিরস্থায়ী হতে দেখা যায়। এর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট, কারণ বন্ধুর কাছে মনের কথা বলার মধ্যে আছে নিজের মানসিক উদ্বেগ, অস্বস্তি ও সংঘাতের হাত হ'তে অব্যাহতি। কেউ কেউ এই স্তর আর অতিক্রম করতে পারে না; সেটা অস্বাভাবিক।

সম্প্রতি ১৯৫৪ সনের জানুয়ারী মাসের Illustrated Weekly নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে এরূপ একটি অস্বাভাবিক ভালবাসা ও অপরাধের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। জুলিয়েট হিউম ও পলিন পার্কার নামে নিউজিল্যাণ্ডের দু'টি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ষোল বছরের মেয়ে একত্র হ'য়ে পলিনের মাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। জুলিয়েটের বাবা অধ্যাপক হিউম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট পদ বর্ত্তমানে অধিকার করেন, ও এ্যাটম্ বোমা সম্বন্ধে বৃটিশ গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম পেণীর সহকর্মী। অধ্যাপক হিউম যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ গ্রহণ করেন ও সপরিবারে সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তখন কন্যা জুলিয়েট তার বান্ধবী পলিনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পলিনের মাতা তাতে বাধা দেন। উভয়ের আসক্তি এত অস্বাভাবিক ও গভীর ছিল যে তারা ষড়যন্ত্র করে পলিনের মাতাকে ইঁট দিয়ে থেতলে মেরে ফেলে। তারা দুজনেই এখন ভিন্ন ভিন্ন জেলে আছে, ও পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্কাদি রাখতে দেওয়া হয় না।

জুলিয়েটের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক হতে অনেক উচ্চ স্তরের। মানসিক রোগের চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, যখন সে তার কৃতকর্মের ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হবে, তখন অপরাধের গুরুত্ব বুঝে যদি সে অভিভূত হয়ে ভেঙ্গে না পড়ে, তা হলে হয়ত বা পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্না নারীর সমকক্ষ সে হতে পারবে। বর্ত্তমানে তার মাতার প্রতি প্রবল বিদ্বেষের ফলে আপন অপরাধ সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। সে তার মাতাকে (বর্ত্তমানে মিসেস পেরী) মিঃ পেরীর (তখন পিতৃবন্ধু) সঙ্গে এক শয্যায় দেখতে পায়, তার ডায়েরীর এই কথার সত্যতা তার মাতা আদালতে অস্বীকার করেন। জুলিয়েট নিজেকে সত্যবাদী বলে। তার সঙ্গীরা এখন সব নীচ শ্রেণীর খুনী আসামীর দল। সে সময় কাটায় সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে। চিকিৎসকরা মনে করেন, এই রচনার মারফতই হয়ত জগত তার মনের পরিচয় পাবে।

শৈশব হতে মা ও বাবার ভালবাসা বা ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্বন্ধ হতে বঞ্চিত জীবন সভ্য সমাজে কত বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়, উপরোক্ত ঘটনা তারই একটি উদাহরণ মাত্র।

বয়ঃসন্ধিকাল সমগ্র জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অংশ নয়। শৈশবেও যে চাহিদাগুলি প্রধান ছিল এখনও তাই আছে, রূপগত কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু বস্তুর। এখনও চাই পরিবারের, একান্ত আপন জনের ভালবাসায় আপন মূল্যবোধ, অপরকে ভালবাসা, ও বন্ধুদলের বা জগতের চক্ষে নিজেকে মূল্যবান প্রমাণিত করা, ও সর্বশেষে কোনও আদর্শ, ধর্ম বা দর্শনকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করা।

ধীরে অপর শ্রেণীর প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নয়, বিপরীত-লিঙ্গের প্রতিই ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ দেখা যায়। মেয়েদের সম্বন্ধে ছেলেরা, ও ছেলেদের সম্বন্ধে মেয়েরা সচেতন হ'য়ে ওঠে ও আলোচনা করে।

এর পরেই আসে বিপরীত লিঙ্গের কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আকর্ষণ। প্রথম পর্যায়ে এই আকর্ষণ থাকে বিদেহী, আদর্শবাদী ও কল্পনা-বিলাসী। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে যৌবনের প্রাক্কালে এ প্রেম ও ভালবাসা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এ আকাঙ্খা স্পষ্টভাবেই দেহধর্মী ও যৌনকেন্দ্রিক।

অধিকাংশ আমেরিকান্ মনোবিজ্ঞানী যৌবনাগমে যৌন-চেতনার প্রাবল্য ও বিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁরা একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন। তার কারণ তাঁরা আমেরিকার তরুণ তরুণীদেরই বিশেষ করে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন।

যে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনগ্রসর বা গ্রামকেন্দ্রিক ও পরিশ্রমী বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের অভিমত যে আমেরিকান্ তরুণীদের যৌন চেতনা (Kinsey Report দ্রষ্টব্য) বিলাসী, কৃত্রিম ও বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার ফল। যেখানে শিশুরা সহজ গ্রামীন্ পরিবেশে বর্ধিত হয়, যেখানে জীবনধারণের কঠিন সংগ্রামে অল্প বয়স থেকেই তরুণদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয় এবং যেখানে বড়দের মধ্যে স্বাভাবিক যৌনতথ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত গোপনতার প্রয়াস নেই সেখানে এ বোধ তেমন উগ্র হয়ে ওঠে না। যৌন-আবেদন-মূলক সিনেমা, বিজ্ঞান, পত্রিকা ইত্যাদির দায়িত্ব এ সম্বন্ধে সামান্য নয়। রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় এ সমস্যা তরুণদের মধ্যে এখন অত্যুগ হয়ে উঠেনি একথা অনেক নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছেন।”[১৯]

কিশোরের মানসিক স্বাস্থ্যের দিক হতে বলা যায় যে যাতে যৌনচেতনা সম্বন্ধে একটা সুস্থ মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে, অবৈধ কৌতুহলের কোন অবকাশ না জন্মে, তাই দেখা উচিত। যৌন-আকাঙ্খা ও প্রেম বা অনুরাগের বিকাশ একই তালে বিকশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যৌন-জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অস্বাভাবিক কৌতুহল মানসিক স্বাস্থ্যহানিকর। তাই এ বিষয়ে সুশিক্ষার প্রয়োজন যথেষ্ট।

এ সম্বন্ধে পিংকেভিচ্ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কাজেই যথেষ্ট সাবধানতা প্রয়োজন ——যৌনজীবন সম্বন্ধে জ্ঞান নিয়মিত পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমেই দিতে হবে। এ বিষয়ে শিশু বা তরুণদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সামাজিক জীবন আলোচনা কালে প্রসঙ্গতঃ শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের এ বিষয়ের আলোচনাতে নিয়ে যাবেন।”[২০]

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বশ্যতা স্বীকার—এ সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আনুগত্য বা বশ্যতা-স্বীকাররূপ দুই বিপরীত সহজাত সংস্কার বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, এবং এর সঙ্গে বিশেষ আবেগ—অহং বোধ ও হীনমন্যতা যুক্ত থাকে! কিশোরের ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল হয়ে ওঠে, এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেক সময়ই সে বিদ্রোহী হয়, কারু বশ্যতা সে মানতে চায় না। এবং প্রায়ই বড়দের সঙ্গে মতের বিরোধ হয় এবং সংঘাত বাধে। এই সংগ্রামী ও বিদ্রোহী মনোভাব অবশ্য স্থায়ী হয় না।

19 K. Davis Adolescence & Soeial Social Structure, P. 15.
20 Pinkevith—Education in Soviet Russia, P. 334.

বড়দের সঙ্গে তরুণদের সংঘাতের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মুজাফর সেরিফ্ বলেছেন যৌবনাগমে একদিকে তরুণের মনে নানা তীব্র আকাঙ্খা জাগে এবং নিজেকে বয়স্কের পর্য্যায়ে স্থাপন করবার জন্যে তার সাধ যায়, কিন্তু অন্য দিকে সে গুরুজনদের কাছে পায় নানা বাধা নিষেধ—এসব বাধা নিষেধও অনেক সময় বিপরীত ও স্বতঃবিরোধী। কখনও তাঁরা তাকে নিতান্ত বালক বলে জ্ঞান করেন, এবং 'জ্যাঠামীর' জন্য তিরস্কার করেন, আবার কখনো বা বয়স্কোচিত আচরণ তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। এর ফলে তার নিজস্ব স্থানটি কি, সে সম্বন্ধে তার মনে অনিশ্চয়তা জন্মে। সে বোধ করতে থাকে তার চারপাশের জগৎ বিরূদ্ধভাবাপন্ন, "পৃথিবীতে কেউ ভাল তো বাসে না—এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,"—সে পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ।" তার মনে সমস্ত জিনিষের মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে—এবং কোন কোন চরম ক্ষেত্রে সে নিজ জীবনটাই নিরর্থক মনে করে। সে তার দুঃখ ও বেদনার জন্য গুরুজনদের দায়ী করে। তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বিদ্রোহ করে। তাদের কাছ থেকে নিবিড় আদরের গোপন লোভ তার মনে থাকে, তা তৃপ্ত না হওয়াতে তার মন ক্ষুব্ধ হয়।[২১]

তার এই অহংবোধের পেছনে থাকে আত্মসচেতনতা. তার মধ্যে পরিবর্তনগুলি বিশেষ ভাবেই সে অনুভব করে। বিদ্রোহ করে, কিন্তু বিদ্রোহের পশ্চাতে থাকে লজ্জা, অপ্রতিভ ভাব ও এক প্রকার হীনমন্যতা যে কোন সহৃদয় সমব্যথী, যোগ্যতর ব্যক্তির নেতৃত্ব অনুকরণ করতে তার ভাল লাগে।

দুই আপাত-বিরোধী শক্তির কার্য্যের ফলে কিশোরকে মনে হয়, সে স্বতঃ বিরোধিতার সমষ্টি। কোন সময় লোকসমক্ষে সে লজ্জিত, অপ্রতিভ ও বিব্রত, কোন সময় সে বিদ্রোহী, রাগী ও অহংকারী।

এ সম্বন্ধে বাউলি বলছেন, "যৌবনাগমে তরুণদের সঙ্গে বাস শক্ত ব্যাপার। তারা খিট্‌খিটে, চিন্তাশীল সেন্টিমেণ্টাল্। তারা অন্যের দোষ ধরতে ব্যগ্র, বহ্বাড়ম্বরে পটু, আত্মসচেতন এবং চলন ধরণে অসচ্ছন্দ। তাদের বিরক্তব্যবহারের কারণ অনেক সময়ই হচ্ছে তাদের অনুভূতির বিকাশের গর্ভযন্ত্রনা। তারা নিজেদের মত খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করে, তার কারণ তারা মনে মনে জানে তারা নিতান্ত অজ্ঞ, তারা বহ্বাড়ম্বরে পটু কারণ নিজেদের গুণের অভাব সম্বন্ধে তারা সচেতন ; তারা নিজেদের দাবী ও অধিকার অন্যেরা স্বীকার করে নিক্, এ জন্যই ব্যস্ত—কিন্তু কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।[২২]

---

21 Muzafer Sherif—An Outline of Social Psychology P. 314.
22 A Bowley—The Natural Development of the Child, P. 143.

রবীন্দ্রনাথ এ বয়সের ছেলেদের সম্বন্ধে বলেছেন :—

"তেরো চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না! স্নেহও উদ্রেক করে না। তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি আর কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাৎ কাপড় চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্দ্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশবের ও যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের স্বাভাবিক অনিবার্য্যত্রুটিও যেন অসহ্যবোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে পৃথিবীতে কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না। এই জন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে—চারিদিকের স্নেহ শূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারী-জাতীকে কোন এক শ্রেষ্ঠস্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।" রবীন্দ্রনাথ—ছুটি, গল্পগুচ্ছ

আত্মসচেতনতা ও আদর্শবাদ—আত্মসচেতনতার ফলে কিশোর নিজের কঠোর সমালোচনা করে। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সে সন্ধিহান হয় ও বাইরের মানের দিকে লক্ষ্য থাকে। তার অন্তরের অপূর্ণতা-বোধ অনেক সময়ই আদর্শবাদে ও যৌন-কামনায় পরিণত হয়। নানাপ্রকার আদর্শবাদ ও জীবন-দর্শনও তাকে আকৃষ্ট করতে পারে। শিল্পকলা, ধর্ম, নীতিজ্ঞান—নিজেকে ভাল করা ও অপরকে উন্নত করা,—সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনে আদর্শবাদ—পৃথিবীর কাঠামো বদলে দেবার ইচ্ছা,—ইত্যাদি ভাবে সে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, এবং অপরের প্রদর্শিত পথে আত্মবিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ বয়সে তাই কোন কোন ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। দেখা গেছে, নাৎসী

ও কম্যুনিষ্ট জীবনদর্শন কিশোর ও কিশোরীরা বিশেষ গভীর ভাবে অন্তরের সহিত গ্রহণ করেছে। তার কারণ অনেকটা এই যে, এই বয়সে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা অনেক সময় বিশেষ প্রবল হয় ও যে জীবন-দর্শন বা ধর্ম্ম সহজ ও সুস্পষ্টভাবে জীবনের পথ নির্দেশ করে, যার প্রতি আনুগত্য সহজ—, যাকে আঁকড়িয়ে ধরা যায়, তার প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক। যে ধর্ম্ম অত্যন্ত abstract, সাধারণ জীবনের সহিত সম্পর্কহীন সে ধর্ম্মে তাদের আকড়িয়ে ধরবার চাহিদা পূর্ণ হয় না, এবং তাদের নিরাপত্তা-বোধ তাতে ক্ষুণ্ণ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ছাত্রদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও চঞ্চলতা দেখা যায়, তার বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ, বর্ত্তমান জগতের আঙ্গিকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এমন ব্যবহারিক ধর্ম্ম ও জীবনদর্শনের অভাব। যে মূল্যবোধ, যে ধর্ম্ম-বোধ, যে পাপপুণ্যবোধ আমাদের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, গত দুই যুদ্ধের আঘাতে, দেশবিভাগের ফলে, ও আর্থিক কারণে তার ভিত্তি অনেকটাই শিথিল হয়েছে।

বয়স্ক তরুণদের সুস্থ বিকাশের জন্য সুন্দর নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে খৃষ্টধর্মের প্রতি, বা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী কোন দার্শনিক মতবাদের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিশেষ করে শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের মনে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ও বীরত্বের প্রতি আকর্ষণ সমাজসেবা, দেশভ্রমণ, যুবসমিতি গঠন রূপ রচনাত্মক কাজে লাগবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ স্পৃহা যাতে উদ্দেশ্যমূলক হয় ও অস্থিরমতিত্বে পরিণত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

"যৌবনাগমের প্রত্যুষে নিজ দেশ ত্যাগ করে দূরদেশ ভ্রমণের স্পৃহা হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল হয়। জীবন যেন মধুঋতুর আগমনে অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে ("এ কী আকুলতা ভুবনে, এ কী চঞ্চলতা পবনে")। গৃহ যেন বড় সংকীর্ণ, একঘেয়ে, অসহনীয় মনে হয় এবং বিচিত্র জন মুখর পথ যেন দূরদিগন্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে।.. এ প্রবৃত্তি যদি সুস্থভাবে বিকশিত না হতে পারে, এবং উপযুক্ত শাসনের দ্বারা যদি একে সীমায়িত করা না যায় তা হলে বয়স্ক জীবনে এর থেকেই সৃষ্টি হবে, অস্থির ভ্রমণকারী, পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী, ভবঘুরে, ইত্যাদি মানুষ, অথবা এমন সব মানসিক স্থৈর্য্যহীন মানুষ যারা কেবলই তাদের জীবিকার পরিবর্তন করে—যারা সহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে আবার সহরে, বাড়ীঘর থেকে হোটেলে কেবলই ছুটাছুটি করে বেড়ায়; এরা

হয় তেমন ঘুরে-বেড়ানোর দল যাদের ঘোরা ছাড়া আর কোন নিদিষ্ট উদ্দেশ্য নেই।" ২৩

কিশোরের দৈহিক, মানসিক ও আনুভূতিক দিক বিবেচনা করে তার শিক্ষার ব্যবস্থা কি প্রকার হলে ভাল হয় ও পিতামাতা ও শিক্ষক তার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করলে, সে সর্বতোভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, সে আলোচনা সংক্ষেপে করছি।

বয়ঃসন্ধিকালে পরিবেশ কি হওয়া উচিত—(১) **গৃহ**—কিশোরের পক্ষে প্রয়োজন, ঘরের অতিরিক্ত শাসন ও অতিরিক্ত যত্ন এ দুই থেকেই মুক্তি। এগার বার বছর বয়স হ'তে চলে এই বন্ধন-মুক্তির পালা, যাতে কুড়ি একুশ বছরে সে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারবে। সুতরাং—শিশুর পক্ষে যে পদে পদে শাসনের প্রয়োজন ছিল, কিশোরের বেলায় সেই শাসন শিথিল করতে হবে, এবং চেষ্টা করতে হবে যেন সে আপনাকে আপনি শাসন করতে শেখে ও সংযম অভ্যাস করে (self-dicipline and self-control).

তাকে মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, এবং তার নতুন ব্যক্তিত্ব বোধকে দমিয়ে দেওয়া অন্যায়। কারণ, তার ফলে সে বিদ্রোহ করবে, অথবা ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। চাণক্য বলেছেন—'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে—পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ' তাকে বন্ধুনির্বাচনেও যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া ভাল।

(২) কিশোরের পক্ষে প্রয়োজন, গৃহে স্নেহ, যত্ন, নিরাপত্তা বোধ। যখন তার মনে নানা ভাবের আলোড়ন বা ঝড় চলে, তখন পান্তি ও প্রীতিপূর্ণ গৃহের অত্যন্ত প্রয়োজন, তার বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করবার জন্য! তার পিতমাতা যদি জীবনে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, সে ব্যর্থতার ক্ষোভজনিত মানসিক বিকার নিশ্চই তিনি তার সন্তানদের জীবনে সংক্রামিত করবেন না। এ বয়সের অনুভূতি বড় তীক্ষ্ণ. তাই কিশোরেরা সহজেই পিতামাতার জীবনের প্রশান্তি বা মানসিক দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তাই এ উপদেশ খুবই সঙ্গত, যে পিতামাতা যদি আধুনিক সামাজিক জীবন বা আদর্শের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে থাকেন, তবে সে বেচনা ও ক্ষোভ তাঁর সন্তানদের মধ্যে কিছুতেই ছড়িয়ে দেবেন না বর্তমান পৃথিবীর যে অবস্থা আছে তাতেই বর্তমান কালের কিশোরদের বাস করতে হবে এবং নিজের চেষ্টায় তার সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে নিতে হবে।

23 Stanley Hall—Adolescence.

(৩) নিজ গৃহ সম্বন্ধে কিশোর মনের গর্ব থাকা প্রয়োজন। নিজ গৃহ পরিজন সম্বন্ধে লজ্জিত হবার কারণ থাকলে, জীবনে গুরুতর অসঙ্গতি বা বিকার ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

যে সব কিশোর আপনাকে গৃহের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না, হয় তারা গড়ে ওঠে অত্যন্ত নির্ভরশীল স্বাধীন চিন্তাশক্তিবিহীন ব্যক্তি হিসাবে; তারা সর্বদাই খোঁজে মায়ের আঁচল, সর্বদাই খোঁজে কোন দরদী প্রাণীর আশ্রয়-ছায়া। অথবা সম্পূর্ণ বিপরীতটিই ঘটে, অর্থাৎ তারা খুব ঘটা করে দেখাতে চায় যে তারা কিছু গ্রাহ্য করে না,—কোন নীতির শাসন তারা মানে না। একটি অশিষ্ট ছেলে এ ভাবটি প্রকাশ করেছে এ ভাষায় "আমি নীতির শাসন মানিনি কারণ আমি এক-চোখা পৃথিবীটাকে দেখাতে চেয়েছি, আমি আসল মরদ।"

বিদ্যালয়—কিশোরের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করার বিরাট দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা (a varied curriculum) কিশোরের, আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী।

ইংল্যাণ্ডের বর্তমান শিক্ষা আইন (১৯৪৪), একথা মেনে নিয়েছে, যে কৈশোরে বুদ্ধি ও বিশেষ যোগ্যতার স্ফুরণ হয়। তারই উপর নির্ভর করে, এগার বছর বয়সে, আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনাগুলিও মোটামুটি একথা স্বীকার করে নিয়েছে।

এ বিষয়ে একটু সতর্কতাসূচক কথা বলা যেতে পারে। যদিও এ কথা সত্য যে সাধারণ যোগ্যতা বা জেনারেল ইনটেলিজেন্সের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা দেয়, কিন্তু বিশেষ যোগ্যতা বা স্পেশাল এবিলিটিজ অনেকটা পরে প্রকাশ পায়।[২৪] এবং সব কিশোরের বিকাশের হার সমান নয়। সে হিসাবে কৈশোরের গোড়াতেই সবাইকে একই সময়ে পরীক্ষা করে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রেরণের পরিকল্পনা মনস্তত্ত্ব দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে গডফ্রে টমসন্ তাই বলেছেন, যৌবনাগমের শেষে শিক্ষার বিষয়বস্তু বিশিষ্ট (স্পেসালাইজড্) করার পদ্ধতি স্বাভাবিক এবং এটা নিন্দনীয় নয় তবে দেখতে হবে যাতে বিশিষ্ট বিষয়টি শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে সমগ্র বিষয়টি বোধের সহায়ক হয়। মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ের বিশিষ্ট বিভাগ করণের (স্পেশালাইজেশন্)

24 Cyril Burt.—B. I. E. P. 1943.

প্রকৃত বিপদ এই নয় যে ছাত্রেরা বিশেষ পারদর্শিতা লাভ কচ্ছে, বিপদ হচ্ছে শিক্ষকেরা সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিষয় বস্তুকে দেখেন তার ফলে ছাত্রের মনে তার নির্বাচিত বিশেষ বিষয়টি ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি একটা উপেক্ষার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়। ২৫

এখানে প্রথম প্রয়োজন হবে, প্রত্যেক কিশোরের ব্যক্তিগত বুদ্ধির বিকাশের প্রথম থেকে একটি হিসাব রাখা, ও প্রত্যেক কিশোরের প্রতিভার স্ফুরণ কোন দিকে, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, ও তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

শুধু বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই নয়, সে শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন হতে হবে, যে কিশোর যেন শিক্ষার মূল্য বা উদ্দেশ্য খুঁজে পায়, তার আগ্রহ ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে। একঘেয়ে কাজ তাদের ভাল লাগে না, কিন্তু অভ্যাস ও অনুশীলনের মূল্য আছে, এ কথা যখন তারা বুঝতে পারবে, আর বিষয় বস্তুগুলির সাধারণ সূত্রগুলি যখন আয়ত্ব ক'রে বিষয় বস্তুতে রস পাবে, তখন তাঁদের মনোযোগ সহজে আসবে। তাদের কাজ করার জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। এবং স্বাধীন চিন্তা, ও নূতন পরীক্ষার দিকে তাদের উৎসাহিত করা খুব দরকার।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীবিভাগ কি করে করা যায়, এ নিয়ে অনেক আলোচনা ও পরীক্ষা হয়েছে। সমজাতীয়তা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করতে হলে, তাদের যোগ্যতা, শিক্ষা, সামাজিক ও শারীরিক বিকাশের মাপকাঠি অনুযায়ীই তা করা উচিত। তবে, যারা এ্যাভারেজ বা সাধারণ ছেলে, তাদের পক্ষে সমজাতীয় শ্রেণীবিভাগই সবচেয়ে ভাল। যারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী বা নিতান্ত নির্বোধ, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সম্ভব হলে প্রত্যেকের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

এ বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে, ইস্কুল শুধুই একটা লেখা-পড়া শেখবার জায়গা। ইস্কুলের সমাজ জীবন ছেলেমেয়েদের দেহ মনের সহজ স্বাভাবিক বিকাশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। খেলা-ধুলা, বন্ধুত্ব, মারমোরি, বিতর্ক সভা, নাটক অভিনয়, দল বেঁধে পিকনিক্ (চড় ইভাতি) ভ্রমণ, এ সবের মধ্যে দিয়েই দেহ মনের জড়তা কাটে, আত্মপ্রকাশের আনন্দলাভ হয়, দশজনের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা বাড়ে, আত্মপ্রত্যয় আসে, বশ্যতা ও নেতৃত্ব শিক্ষা হয়, দায়িত্ববোধ

25 Godfrey Thomson—A Modern Philosophy of Education P, 222·

বাড়ে, সংগঠনের কৌশল আয়ত্ব হয়। সকলের থেকে বড় কথা, এ সব আনন্দময় উৎসাহ-পূর্ণ উদ্যমের মধ্য দিয়ে অনুভূতির জীবনের জটিলতা ও সংঘাতের স্বচ্ছন্দ মুক্তি ঘটে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও ক্লাশঘরের কাজের অতিরিক্ত এ জাতীয় বিচিত্র উদ্যমের extra-curricular activities) ব্যবস্থা থাকা চাই। শিক্ষকের কর্তব্য দেখা যাতে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে, এ সব স্বাভাবিক উদ্যমের মধ্য দিয়ে তার রুচি ও নৈপুণ্য বিকাশের সুযোগ পায়, এবং যাতে যে আত্ম-প্রত্যয়, আত্মসংযম, সমাজ-সচেতনতা এ সব সদগুণ আয়ত্ব করতে পারে ও আনন্দময় চিত্তে প্রশান্তি লাভ ক'রে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশলাভ করতে পারে।)

বিদ্যালয়ে কিশোরদের উপর শৃঙ্খলা-বিধি আরোপ করা, ও শাস্তি দান একটি সমস্যা। যতদূর সম্ভব শাস্তি, বিশেষ করে দৈহিক শাস্তি না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং শাস্তি দেবার প্রয়োজন ঘটলে, তার কৃতকর্মের ফল হিসাবে ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সে শাস্তি দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার, যে শাস্তি যেন ভয়-বিহ্বল না করে। ভয় ও নিরাপত্তা বোধের অভাব সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে প্রবল অন্তরায়। বারট্রাণ্ড রাসেল্ এ কথাটির উপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন। তার মতে বর্ত্তমান জগতের বহু সমস্যার মূলে রয়েছে অহেতুক ভয়। ভয় মানুষকে পঙ্গু করে, বিকৃত করে, নষ্ট করে। শিশুকে ভয়-জয়ের মন্ত্রই শেখাতে হবে। শিশুকে ভয় দিয়ে বশ করার মত কাপুরুষতা ও মূঢ়তা আর কিছু নেই। এ ভয় অনেক সময়, নানা শারীরিক বিকার ও মুদ্রাদোষের কারণ। বাউলি বলছেন, ভয় এবং তার সঙ্গী দুর্ভাবনা এ দুটি আবেগই অনেক সময় কিশোরদের তোৎলামীর কারণ, কাজেই ছাত্রদের দায়িত্ব যে পিতামাতা ও শিক্ষকের উপর ন্যস্ত, তাদের পক্ষে এদিকে দৃষ্টি রাখা খুবই প্রয়োজন যাতে ছাত্রদের এ আবেগ-গুলি অতি তীব্রভাবে বা খুব ঘন ঘন অনুভব করতে না হয়।২৬

আর একটা জিনিষও দেখা দরকার। শাস্তির ফলে, কিশোর যেন এ কথা মনে না করে, যে সে "একেবারে বাজে", শিক্ষকের কাছে বা তার বন্ধুদের কাছে তার আর কোন দাম নেই। এ মূল্যহীনতা বোধ (the sense of rejection) এ বয়সে ছেলে-মেয়েদের মনে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। এর ফল অনেক সময় উল্টোই হয়। তাই শাস্তি নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে, প্রকাশ্যভাবে না দেওয়াই উচিত। আর সকলের থেকে বড় কথা, শাস্তি যাকে দেওয়া হ'ল সে যেন এটা বোধ করতে পারে যে, শিক্ষক বা পিতামাতা যদিও শাস্তি দিচ্ছেন

26 Bowley—The Naturul Developmentof the Child. P. 136.

তাঁর স্নেহ ও বিশ্বাস সে হারাচ্ছে না। শাস্তি যেন তার আত্মমর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করে। এ সম্বন্ধে ফ্লেমিং বলছেন, "যৌবনাগমে তরুণদের প্রয়োজন প্রশংসমান্ একটি দলে অন্তর্ভুক্তি—পিতামাতা বা শিক্ষক কোন কিশোরকে কোন কারণে নিন্দা বা তিরস্কার করলে তখন যেন সে বুঝতে পারে তার পিতামাতা ও শিক্ষকের আন্তরিক স্নেহ সে হারায়নি। ভৎর্সনা কালেও পিতামাতা বা শিক্ষক তাকে যেন বলেন, 'তুমি যত অন্যায়ই করো তবু তোমাকে আমরা স্নেহ করি; কিন্তু তোমার ব্যবহারটি আপত্তিজনক হয়েছে। এ ব্যবহার আমরা অনুমোদন করি না।" মিথ্যা ভয় ও তাড়না কিশোরের সুস্থ বিকাশের জন্য যে নিরাপত্তাবোধে প্রয়োজন তা নষ্ট করে দেয়।২৭

সংঘাত ও সঙ্গতির অভাবে যে সব সমস্যা দেখা দেয়, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। অন্ততঃ যে সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা কিশোরদের মনে অসুবিধা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে, তা নিয়ে আলোচনা করা ভাল। এর ফলে সে জানবে যে তার মত ভুক্তভোগী আরো অনেকে আছে এবং প্রত্যেককেই এ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যদি সে জানে যে তার গুরুতর ভাব-বিপর্যায়, যেমন বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা, এমন কি, আত্মহত্যা করার কল্পনা, তার একার জীবনেই শুধু ঘটে না, তা'হলে তার মনে খানিকটা ভরসা আসতে পারে। বিশেষ করে, তার দৈহিক পরিবর্ত্তনগুলি সম্বন্ধে, পূর্ব হতে কিছু জ্ঞান থাকলে পরিবর্তনগুলিকে সে শান্তভাবেই গ্রহণ করতে পারবে। বিদ্যালয়ে শরীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এ সবের সাহায্যে মানব-দেহ ও যৌন-জীবন সম্বন্ধ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জ্ঞানলাভ, যৌনজীবন সম্বন্ধে একটা সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টীভঙ্গ আনতে সহাযতা করে।

কিশোরদের মধ্যে অনেক সময়ই নানা রকম 'হবি' ও নানাবিষয়ে উৎসাহ যেমন, কাঠ, টিন দিয়ে নানা খেলনা তৈরী করা, মাটির মূর্তি গড়া, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি, দেখা যায। কিন্তু তাদের এই আগ্রহ ও উৎসাহ বেশীদিন স্থায়ী না ও হ'তে পারে। বাড়ীতে, ক্লাবে বা বিদ্যালয়ে, সর্ব্বত্রই এই অস্থিরতা দেখা যেতে পারে। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ভ্যালেনটিন্ বলেন. যে এই অস্থিরতা ও অনবরত মত দিয়েই, সে তার নিজস্ব রুচির সন্ধান পাবে, ও স্থায়ী আনন্দ ও উৎসাহের কেন্দ্র কোন ক্রিয়া বা বস্তু সে আবিষ্কার করবে।

20 C M Fleming—The Social Psychology of Edn,, P 87

কৈশোরের একটি বড় সমস্যা—অপরাধপ্রবণতা বা ডিলিংকোয়েনসী। এগার, বার, তের বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা বেশী দেখা যায়। সিরিল বার্ট তার দি ইয়ং ডিলিংকোয়েণ্ট নামক .পুস্তকে বলেছেন যে কিশোর অপরাধীদের ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশ, শৈশবকাল হতেই কোন না কোন কারণে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না, এবং তাদের ব্যবহার সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারছে না।

কু-সংসর্গ ও চৌর্য্য ইত্যাদি অপরাধের হাত হতে কিশোরদের রক্ষা করতে হলে, প্রয়োজন,—শান্তিপূর্ণ, সদাচারী ও আনন্দময় গৃহের পরিবেশ, ভাল বন্ধুর সঙ্গ এবং বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা। কিশোরের শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় যাতে না হয় যাতে তা পূর্ণভাবে কাজে লাগান যায়, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে পিংকেভিচ বলেছেন, কাজেই এটা খুবই প্রয়োজন যে এই শক্তির উৎসকে শিক্ষার জন্য যে ক্রিয়া সব চেয়ে মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ সে ক্রিয়াগুলির সহায়ক হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। এ প্রাণ শক্তিকে প্রচুর শারীরিক শ্রম যাতে প্রয়োজন হয় দৈহিক ব্যায়াম, খেলা ধুলা, ক্ষেত চাষ, গাছকাটা ইত্যাদি কাজ ও বুদ্ধির চর্চ্চা, যুব সংগঠন ইত্যাদি শুভকার্য্যে নিয়োজিত করতে হবে। যদি কিশোরের শক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে এ রকম ভাবে বৃহৎক্ষেত্রে মুক্তিদানের সুব্যবস্থা করা যায় তা হলে এ মৌলিক জৈব শক্তি তীব্র যৌন-আকাঙ্খায় অপচয়কর পথে ধাবিত হবে না। ২৮

অস্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিবেশ থেকে যে কিশোরেরা আসে, তাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন, নানা প্রকার যুব সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া ও বিদ্যালয়ে স্নেহশীল কিন্তু কঠোর শিক্ষকের অধীনে নিজেকে পরিচালিত করা।

পরিশেষে শিক্ষক অভিভাবক ও ছাত্র নেতাকে অতি সন্তর্পণে ও ধৈর্য্যের সঙ্গে কিশোরের সমস্যা সমাধানে রত হতে হবে। কিশোরের কোমল মন স্বাধীনতা প্রয়াসী, কিন্তু বাস্তবের রূঢ়তাকে সে ভয় পায়। তাই তার প্রয়োজন বাস্তবিক দরদী বন্ধু ও পথ প্রদর্শকের, যে তাকে জীবনের মূল্য বুঝতে ও তার ক্ষমতা অনুযায়ী পথ নির্ব্বাচন করতে সাহায্যতা করবে। অপরাধীদের সম্বন্ধে সমাজ, পিতামাতা ও শিক্ষকের সহানুভূতিহীন নিষ্ঠুর ঘৃণার ভাব, তাদের সুস্থ হওয়ার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। কৃতাপরাধদের মনে যদি এ ধারণা জন্মে দেওয়া হয় যে,

28 Pinkevitch—Education in Soviet Russia

সে "গোল্লায় গেছে", "ওর আর কিছু হবে না" তা হ'লে তার নীচুতে নেমে যাবার পথ আরো সুগম করে দেওয়া হয়। শিক্ষকের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে অপরাধীও মানুষে, অপরাধী বা ক্রিমিন্যাল বলে আলাদা একটা ঘৃণ্য জাত নেই এবং সকলেরই সংস্কারের আশা আছে। রাশিয়ার শিক্ষাবিদ্ তাই বলেন, কোন কোন মানুষ অপরাধপ্রবণতা মজ্জাগত এটা নিতান্ত মিথ্যা কথা। —(রাশিয়াতে) এটাই স্বীকার করে নেওয়া হয় যে অপরাধকারী ব্যক্তিরা বুদ্ধি বা মানসিক বৃত্তিতে মূলতঃ স্বাভাবিক এবং তাদের ব্যবহারের বিকার চিকিৎসাযোগ্য ও সংশোধিতব্য।"২৯

ভারতবর্ষ চিরদিন বিশ্বাস করেছে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বে, তাই শিক্ষকের মূলমন্ত্র হবে, "নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।"

রাশিয়াতে এ কথাটির উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে যে, অপরাধপ্রবণতার মূল কারণ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক (Soeio-economic)। যে দুষ্ট ও অসঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থায় অপরাধ জন্মগ্রহণ করে, মানুষের শুভাকাঙ্খী সকলেরই উচিত, সে ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ভবিষ্যতে সুস্থ ও সুখী মানুষ সৃষ্টির সম্ভাবনাযুক্ত অর্থসাম্যের ভিত্তিতে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলবার।

উত্তর কৈশোরের আর একটি বড় সমস্যা কর্ম-সংস্থান বা জীবিকার পথনির্দেশ (vocational guidance) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ কবার পর অধিকাংশ তরুণ ও তরুণীর প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় কর্ম-সংস্থান। সুরক্ষিত জীবন যাপনের পর হঠাৎ সমস্যা-সংকুল বিরাট জগতের মধ্যে তাদের দিশাহারা হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। অদম্য উৎসাহ-ভরা কিশোরচিত্ত নৈরাশ্যের বেদনায় ভেঙ্গে পড়বে, যদি সে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ না করে, ও নিজ ক্ষমতা, রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মের সন্ধান না পায়।

গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জীবিকার পথ নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে উপলব্ধি করা হয়েছে ও শিক্ষকদের এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই পথনির্দ্দেশের মনস্তত্ত্বসম্মত কয়েকটি বিশেষ সুচিন্তিত ধাপ রয়েছে যেমন, সাধারণ বুদ্ধির মাপ গ্রহণ, বিশেষ ক্ষমতার মাপ নির্ধারণ, (general intelligence, special ability aptitude, scholastic level) ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে কে অধিক সাফল্য লাভ করবে তার মাপ, স্কুল কলেজে যে কতটা

29 Pinkevitch—Education in Soviet Russia.

শিক্ষালাভ করেছে, স্বাস্থ্য ও চেহারা, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দ, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। তারপর বিভিন্ন কর্মের সংবাদ প্রদান ও স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান ও সর্বশেষ কর্মের সংস্থান—কিশোরদের পক্ষে অপরিহার্য।

সংযোজনা

অপরাধ-প্রবণতার হেতু (Causes of delinquency)—অপরাধ-প্রবণতার মূল হেতু কি, এ সমস্যা নিয়ে এত বিস্তর আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে যে তার খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও শক্ত। সিরিল বার্ট অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে যে অবস্থায়ই প্রায়ই যুক্ত আছে বলে দেখা যায়, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপরাধপ্রবণদের অনুভূতির জীবনে একটা সমতা বা সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায় (innate emotional instability)। উড্ওয়ার্থ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Psychoneuorotic Questionnaire method) দিয়ে মামসিক স্থৈর্য্য পরীক্ষা করে দেখেছেন, অপরাধপ্রবণতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির মানসিক অস্থিরতার সঙ্গে যুক্ত।৩০ শৈশবকাল থেকে তারা কোন না কোন কারণে অসুস্থ, স্বাভাবিক ব্যবহার তাদের নয় (behaviour dificulties)। কখনো কখনো এর কারণ কোন দৈহিক ত্রুটি হতে পারে (কালা, খোঁড়া বোবা)। সমাজের ব্যবহারে তাদের অনুভূতির জীবন অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। কখনো কখনো দেখা যায় এই অপরাধ-প্রবণ ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধি অপরিণত। গডার্ড বুদ্ধিপরিমাপক পরীক্ষা নিয়ে দেখেছেন যে এ জাতীয় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৯০ জনই ক্ষীণবুদ্ধি।৩১

হীলিও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন, এসব অপরাধীদের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি বা নৈতিক বিচারের ক্ষমতার অভাব দেখা যায় না—অভাব দেখা যায় মানসিক ক্ষমতার—এরা ক্ষীণবুদ্ধি।৩২

ট্রেড্গোল্ডএর সিদ্ধান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর মতে অধিকাংশ অপরাধ-প্রবণ ছেলে-মেয়ের বুদ্ধি সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ কখনো তারা সাধারণ বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী,—কিন্তু তাদের নীতিজ্ঞান অত্যন্ত অপরিণত বা বিকৃত।৩৩

অন্যান্য যে অবস্থাগুলি কখনো কখনো অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে দেখা যায়, তা

30 R. S. Woodworth—Personal Data Sheet.
31 H. H Goddard—Feeble mindedness.
32 W. Healy—The Individual Delinqu*nt, P. 783.
33 A. F. Tredgold—Mental Deficiency, P. 326.

হচ্ছে অবসর সময়ে নির্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থার অভাব,(undesirable recreational facilities), এবং বাড়ীতে ঠাসাঠাসি ভিড় (congested condition of one's place of residence)। সাংসারিক অসচ্ছলতা কথনো কথনো অপরাধ-প্রবণতার সহগামী অবস্থা। কিন্তু দারিদ্র্য প্রত্যক্ষভাবে অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু "দারিদ্র্যদোষগুণরাশিনাশী", কাজেই দারিদ্র্যের সঙ্গে অনেক সময় এমন সব অবস্থা আসে যা অপরাধ-প্রবণতার অনুকূল। বার্ট দেখেছেন অপরাধ-প্রবণ ছেলেমেয়েদের শতকরা ১০ জন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এবং শতকরা ৩৭ জন মোটামুটি দুঃস্থ পরিবার থেকে আসে। পক্ষান্তরে দেখা যায়, যে সব ছেলেমেয়ে অপরাধ-প্রবণ নয়, তাদের মধ্যে শতকরা ৮ জন অতি দরিদ্র পরিবারের এবং শতকরা ২২ জন মধ্যবিত্ত পরিবারের। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং স্বীয় চেষ্টায় তাঁরা যশস্বী হয়েছেন এমন বহু উদাহরণ, স্বদেশ ও বিদেশ থেকে দেওয়া যাবে। কাজেই সিরিল বার্ট কেবল মাত্র দারিদ্র্যকে অপরাধ প্রবণতার কারণ বলে মনে করেন না।

অপরাধ-প্রবণতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গী হচ্ছে, কুসঙ্গ ও সুশাসনের অভাব। সাধারণতঃ, দেখা যায় এ বয়সে ছেলেমেয়েরা দল বেধে অপরাধ করে। এদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও নেতার নির্দেশ মেনে চলবার অভ্যাসরূপ সদ্‌গুণ প্রায়ই দেখা যায়। আমেরিকার ইলিনয় সহরে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা যত অপরাধ করে তার শতকরা নব্বইটিই দলবদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে দেখা গেছে। এই গোষ্ঠিচেতনাকে সুকৌশলে মোড় ফিরিয়ে সৎকাজে প্রবৃত্ত করানো, শিক্ষক, ছাত্রনেতা, সমাজসংস্কারকের একটি প্রধান কর্তব্য।

শৈশবে পিতামাতা পরিজনের অতিশয় প্রশ্রয়, অথবা অতি নির্মম শাসন দুই-ই মানসিক বিকার সৃষ্টির জন্যে দায়ী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই আমরা এর ভূরি ভূরি উদাহরণ দিতে পারি।

কিন্তু অপরাধ প্রবণতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গী অবস্থা, যা প্রায় সর্বদাই অপরাধ-প্রবণতার ক্ষেত্রে দেখা যায়,—তা হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খল, কদর্য, অপরিচ্ছন্ন ও অশান্তিপূর্ণ গৃহ-পরিবেশ (unsatisfactory home environment)। যেখানে পিতামাতার মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ নেই, যেখানে তাঁদের জীবন কলুষপূর্ণ, তাঁরা কলহ-পরায়ণ, সংকীর্ণচেতা, পরনিন্দা-তৎপর, মিথ্যাচারী নিষ্ঠুর ও প্রবঞ্চক, সেখানে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকার না

ঘটলেই তা আশ্চর্য্যের কথা। যেখানে গৃহ বিপর্যস্ত (broken homes) হয়েছে, পিতা বা মাতার অকাল মৃত্যুতে, অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদ অথবা অন্য কোন অসামাজিক কারণে সেখানে এ বিপর্য্যয় সকলের থেকে বেশী 'প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে সন্তানদের উপর। বার্ট দেখিয়েছেন অপরাধীদের শতকরা ৫০ থেকে ৫৮ জন আসে "বিপর্য্যস্তগৃহ" থেকে। অনেক ক্ষেত্রেই এদের গৃহে যৌন-নীতিহীনতা, অতিরিক্ত মদ্যপান, এবং কলহ অশান্তি দেখা যায়—সাধারণের তুলনায় এসব পরিবারে পানাশক্তি ৩ গুণ বেশী, যৌন-নীতিহীনতা ৪ গুণ বেশী, অতিরিক্ত কলহপরায়ণতা ৬ গুণ বেশী।৩৪

হীল ও ব্রনার—অপরাধ-প্রবণতার বাহ্য কারণ থেকে, মানসিক ও অনুভূতি মূলক কারণের উপর বেশী গুরুত্ব স্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে, যেখানে ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত বোধ করে, সেখানেই অপরাধ প্রবণতার সূত্রপাত হয়। অপরাধ-প্রবণতার কারণ কোন না কোন (স্নেহ প্রীতি) আকর্ষনীয় বস্তু থেকে বঞ্চিত হওয়া (some form :of deprivation)। এমন ছেলেমেয়েদের মনে নিরানন্দতা এবং অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়, অথবা কোন গভীর ভয় বা ঘৃণাব্যঞ্জক অনুভূতি দ্বারা তারা মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়। এর পরিণাম, (১) পলায়নের প্রবৃত্তি—দুঃখময় পরিবেশ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা, (২) নিজের যোগ্যতা বা নৈতিকতা প্রমাণ করবার জন্যে একটু বেশী বাহাদুরী ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, (৩) পরিবার পরিজন, বিশেষ করে পিতামাতার প্রতি হিংসার প্রবৃত্তি, (৪) অস্বাভাবিক পাপবোধ ও আত্মপীড়নের চেষ্টা।৩৫ বহু মনঃস্তাত্ত্বিকই অপরাধীর মানসিক অসুস্থতার প্রতি দৃষ্টি নির্দে'শ করেছেন। উপযুক্ত মনঃসমীক্ষণ প্রণালীসম্মত সুচিকিৎসায় বহু কৃতাপরাধ কিশোর কিশোরী অন্তর্দ্ব'ন্দের অভিশাপ থেকে মুক্ত হ'য়ে সুস্থ হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনুভূতির জগতে অতৃপ্তি ও সামঞ্জস্যের অভাবই অপরাধ প্রবণতার প্রধান কারণ—এমত বাউলিও সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন শিশুমনের মৌলিক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি যেখানে সহজ পরিতৃপ্তির পথ পায় না, সেখানে অস্বাভাবিক পথে সে তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে, এমন ইঙ্গিত (যা এ বয়সে ছেলেমেয়ের গল্পের বই, সিনেমা, বা কুসঙ্গীদের কাছ থেকে পেতে পারে) তাকে

34 Cyril Rurt—The Young Delinquent, P. 65.
35 Healy & Bronner—A New light on Delinquency.

সহজেই এই অবাঞ্ছিত পথে পদক্ষেপ করতে প্রলুব্ধ করে। যে শিশু স্নেহবঞ্চিত, যে শিশুর মনে এ বোধ জন্মেছে যে সে তার প্রাপ্য স্নেহ পাচ্ছে না ; সে অনাদৃত, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, যার মনে নিরাপত্তাবোধের অভাব—অধিকাংশ জারজ সন্তান—তাদের মনে গোপন ক্ষোভ সঞ্চিত হয়, তারা প্রথমতঃ পিতামাতার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং পরে সমগ্র সমাজের প্রতিই বিরূপ হয়। যে শিশু নিজেকে বঞ্চিত বোধ করে, সে অসন্তুষ্ট, সে তার অবরুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশের পথ খোঁজে। যদি বন্ধুবান্ধব, সিনেমা, গল্পের বই-এ তার আবেগ প্রকাশের অসামাজিক ও অপরাধ-প্রবণ কর্মের উৎসাহ বা ইঙ্গিত পায় তা হলে তার মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান সে অপরাধের মধ্যেই খোঁজে।৩৬

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাবিদগণ তরুণদের অপরাধ-প্রবণতার প্রশ্নকে ব্যক্তিগত সমস্যা হিসাবে না দেখে, সামাজিক-অর্থ নৈতিক সমস্যা হিসাবে দেখেছেন। তাঁদের মতে, এই সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অসাম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। তারই ফল, দারিদ্র্য, পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অশান্তি, তারই ফল অসুখী ও অপরিচ্ছন্ন গৃহপরিবেশ। যেখানে সমাজের ভিত্তি মূলে আছে সাম্য ও ন্যায়পরতা সেখানে কোন তরুণই নিজেকে বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত মনে করবে না, তাই তার মানসিক স্থৈর্যও বিপর্যস্ত হবে না। সুস্থ পরিবেশেই ব্যক্তিকে সুস্থ করে তুলবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

36 A. Bowley The Natural Development of the Child. P, 120.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শৈশব ও কৈশোরের কয়েকটি সমস্যা

বুড়ো আঙ্গুল চোষা (Thumb sucking)—চোষা (sucking) মানব শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। মাতৃস্তন্য পানে এই প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি। এতেই শিশু পায় তার জীবনপ্রদ খাদ্য ও গভীরতম তৃপ্তি। যেখানে মায়ের বুকে যথেষ্ট দুধ থাকে না, সেখানে শিশু বিকল্প সান্ত্বনা হিসাবে বুড়ো আঙ্গুল চোষে। এ অভ্যাসটি এক বছর বয়সের মধ্যেই হয়।১ যে সব শিশু মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত ও বোতলে দুধ খেতে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে অভ্যাসটি বেশী দেখা যায়।২ এ অভ্যাসটি অল্পদিনের মধ্যেই গঠিত হয়ে যায় এবং অনেক শিশু রাত্রিতেও ঘুমের মধ্যে আঙ্গুল চোষে।

একেবারে ছোট শিশুর মধ্যে এ অভ্যাস চিন্তার কারণ নয়। বোধ হয় সমস্ত শিশুই মাঝে মাঝে মায়ের বুকের পরিবর্ত্তে নিজের হাতের আঙ্গুল চোষে। এটা যে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে করে তা নয়। চোষার মধ্যেই সে কোন বিশেষ পরিতৃপ্তি পায়। মায়ের বুকের স্নেহময় স্পর্শ শিশু আকাঙ্ক্ষা করে—এটা তার অনুভূতির জীবনের একটি গভীর প্রয়োজন মেটায়। প্রথম ছ'মাস পর্য্যন্ত শিশু প্রত্যেকবার মায়ের দুধ (বা বোতল) অন্ততঃ কুড়ি মিনিট চোষে।৩ যদি মায়ের বুকে দুধ অতিরিক্ত থাকে বা বোতলের চুষির ফুটো বড় থাকে তা হ'লে অল্প সময়েই শিশুর পেট ভরে যায়, কিন্তু সে অতৃপ্ত থেকে যায়। এ অতৃপ্তির প্রকাশই অনেক সময়ে দেখা যায়। প্রথম ছ'মাস যে সব শিশু মায়ের বুকের দুধ খেয়ে এবং আদর পেয়ে তৃপ্ত হয় তারা সাধারণতঃ আঙ্গুল চোষার প্রয়োজন বোধ করে না। একবার অভ্যাসটি গঠিত হয়ে গেলে, যথেষ্ট খাদ্য পেলেও শিশু আঙ্গুল চোষে। খুব শৈশবে চোয়ালের হাড় নরম থাকে এবং আঙ্গুল চোষার অভ্যাস বেশী হলে শিশুর মুখ ছুঁচলো হয়ে যায় দাঁতের মাড়িও সরে যায়।৪ অধিকাংশক্ষেত্রে দু'বছরের সময় ঐ অভ্যাস দূর হয়ে যায়। শিশু তখন অধিকতর

---

1. Skinner of Harriman.—Child Psychology. P. 45.
2. Dr. Benjamin Spock. Baby & Child care. P. 334
3. Skinner & Harriman, Child Psychology. P, 45
4. Bowley The Natural Development of the child. P, 23

খাদ্য পায়, তার মন অন্য নানা ক্রিয়ায় উৎসুক হয়। কাজেই সে আর আঙুল চুষে সান্ত্বনা খোঁজে না।

তিন চার বৎসর বা তার বেশী বয়সের ছেলে মেয়ে যারা আঙুল চোষে তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তাদের জীবনে অতৃপ্তি আছে এটা বোঝা যায়। সম্ভবতঃ মার আদর এ শিশু যথেষ্ট পায়নি। তাই অতি শৈশবের এ জৈব ক্রিয়ায় সে ফিরে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে নিজের অতৃপ্তির সান্ত্বনা খুঁজছে। অনেক সময় মায়েরা এ সব শিশুদের বুড়ো আঙুলে তেতো বা ঝাল মাখিয়ে দেন বা ধাতব আঙুল-ঢাকা পরিয়ে এ অভ্যাস দূর করতে চেষ্টা করেন। এতে কখনো কখনো ফল হলেও ডাক্তার ও মনোবিজ্ঞানীরা এর বিরোধী। ৪ এতে শিশুর অতৃপ্তি ও স্নায়বিক অস্বস্তি অনেক সময় বাড়িয়েই দেওয়া হয়। একেবারে শৈশবে এ অভ্যাস যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে ছাড়ানো কষ্টকর। শিশুর পরিবেশ যাতে স্নেহ পরিপূর্ণ হয়, মায়ের আদরে তার যেন কমতি না হয়, পেট ভরে যাতে সে দুধ পায় আর তার উপযুক্ত নানা বিষয়ে তার বিকাশ যাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

তোৎলামী (Stammering)—তোৎলামী হচ্ছে কথা আটকে আটকে যাওয়া। সাধারণতঃ আট বছরের আগেই এ দোষটি দেখা দেয় এবং শতকরা নব্বুই বা তারো বেশী সংখ্যক শিশুদের তোৎলামী বিনা চিকিৎসায়ই সেরে যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে এদোষটি বেশী দেখা যায়।৫

এর বহু কারণ থাকতে পারে। এ দোষ সম্ভবতঃ কিছুটা পরিমাণ বংশগত। মস্তিষ্কে বাক্য উচ্চারণ কেন্দ্রে কোন আঘাত বা অসুস্থতাও এর জন্য দায়ী হতে পারে। ভারী জিহ্বা এর জন্যে দায়ী, এমন কথা কেউ কেউ বলেন। প্রসিদ্ধ বক্তা ডেমোস্থিনিস্ বাল্যে তোৎলা ছিলেন। তিনি সংকল্প করলেন তোৎলামী সারাতে হবে, তাই তিনি নাকি সর্ব্বদা জিবের উপর পাথরের নুড়ি রাখতেন। মস্তিষ্কের বাম গোলার্দ্ধ (যা দেহের সমস্ত ডান দিকের অঙ্গাদি চালনা করে), দক্ষিণ গোলার্ধে তার আধিপত্য (dominance) স্থাপনে সম্পূর্ণ সক্ষম না হলেও এটা হতে পারে। ৬

অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী একথা মনে করেন যে শিশুর অনুভূতিগত

5. Syecch pathology in L. E' Travie Handbook of child Psychology.
6. Skjnner & Harriman Child Psychology. P. 833

কোন অস্বস্তি বা অশান্তি তার তোৎলামীর একটা প্রধান হেতু। এটা দেখা যায়, যে সব ছেলেরা ভীতু ও আত্মসচেতন তাদের মধ্যেই তোৎলার সংখ্যা বেশী। ভয় পেলে, ক্ষেপে গেলে, ঘাবড়ে গেলে তোৎলামী বাড়ে।৭ তোৎলারা সব কথাই যে আটকে যায় তা নয়। এক একজন এক একটা কথায় বেশী আটকে যায়। ডাঃ স্পক্ এর মতে দু'তিন বৎসর বয়সের সময়, যখন শিশু কিছু কিছু কথা শিখেছে অথচ সব মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে তার ভাষার পুঁজি যথেষ্ট নয় তখন যে আকুলি বিকুলি, তা অনেক সময় তোৎলামীর কারণ। তার পাওনা আদরে কম পড়ছে এমন মানসিক অশান্তি বা ঈর্ষা শিশুর তোৎলামী-রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। একটি ছোট শিশুর তোৎলামী সুরু হ'ল, যেদিন তার ছোট্ট নতুন আর একটি বোনকে নিয়ে মা হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। বাবা বাড়ীতে হঠাৎ খুব ধমক ধামক করেছেন এর পরেই আর একটি শিশুর তোৎলামী সুরু হ'ল। মা হয়তো খুকুর বাহাদুরী দেখাবার জন্যে খুকুকে নূতন একদল অতিথির সামনে সদ্য-শেখা কবিতা আবৃত্তির জন্য দাঁড় করিয়ে দিলেন, হয়তো তার পরেই সুরু হ'ল খুকুর তোৎলামী।৮ ৯অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে বেঁয়ে বা ন্যাটা ছেলেদের জোর করে অভ্যাস পরিবর্তন করিয়ে ডান হাতে কাজ করাতে চেষ্টা করালে তোৎলামী দেখা যায়। অনেকে মনে করেন বেঁয়ে হওয়ারই একটা প্রধান কারণ শিশুর জীবনে মানসিক অশান্তি বা স্নেহের অভাব।

যদিও এটা খুব মারাত্মক দোষ নয় তথাপি তোৎলাকে বন্ধুবান্ধবেরা অনেক সময় ক্যাপায়। যারা অভিমানী তারা এর ফলে সমবয়সীদের সঙ্গ এড়ায়, বিমর্ষ হয়ে পড়ে, এটা তাদের ব্যক্তিত্বস্ফুরণের পরিপন্থী, এতে বুদ্ধির দিক থেকেও তারা কখনো কিছুটা পিছিয়ে পড়ে।

তোৎলামীর লক্ষণ দেখা দেলেই পিতামাতার সতর্ক হওয়া উচিত। শিশুর শারীরিক কোন কারণে এটা হয়ে থাকলে বিশেষ করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার হতে পারে। সর্ব্বক্ষেত্রেই শিশুর পরিবেশে অশান্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধান করে তা দূর করা প্রয়োজন। পিতামাতা, শিক্ষক, ভাই বোন বন্ধুদের কাছে স্নেহ ও সহানুভূতি পেলে সহজেই এটা সেরে যেতে পারে। কিন্তু বাপ-মা এর জন্যে অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করলে তাও

7 A. Bowley. The Natural Development of the Child. P. 186.

8 Benjamin Spock Baby & child care P. 213

9. A. W. Oates Left-handedness in relation to Speech defects.

ভাল নয়। এটা শিশুর উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করা দরকার, তার ত্রুটির জন্যে অতিরিক্ত দয়া দেখালেও, শিশু মনে মনে বিরক্ত হয়। শিশুর দেহ মনের সমস্ত বৈকল্যের চিকিৎসার বেলায়ই পিতামাতা ও শিক্ষকের একথা স্মরণ রাখা ভাল যে স্বচ্ছ বুদ্ধি-মার্জিত সহানুভূতি শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান।

নখ কামড়ানো (Nail biting)—স্কুলের নীচু ক্লাসে কোন কোন ছেলেমেয়ে নিশাহারা হলে নখ কামড়ায়। কখনো কখনো এর ফলে নখে ঘা হয়ে যায়। কোন কোন ছেলেমেয়ে বিষম রেগে গেলে বা ভয় পেলে মাথা ঠোকে (head hanging) বা নিজের গায়ের চামড়া খোটে। এ সবই অনুভূতির জীবনে অস্বস্তি বা অসন্তোষের লক্ষণ। হয়তো বাপ মা বা শিক্ষক মারধোর করেন, জোরে গালাগালি করেন এতে শিশু নিজের উপর ভরসা হারিয়ে ফেলে, অসহায় বোধ করে। কখনো কখনো বদরাগী শিক্ষক বা পিতামাতার উপর শোধ তুলবার আকাঙ্ক্ষাটা নিজের উপর পীড়ন দ্বারাই পরোক্ষভাবে মেটায়।১১ কখনো কখনো এমনি করেই সে হয়তো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তার স্নেহবঞ্চিত হৃদয়ের অভিযোগ জানায়।

বোঝা শক্ত নয়, এর চিকিৎসা হচ্ছে শিশুর জীবনে, ভয় রাগ বা অশান্তির কারণটি খোঁজ করা। শাস্তি দিয়ে তা দূর করার ফল বরং উল্টো হয়। যে সব ছেলের এ অভ্যাস আছে তাদের ভয়ের গল্প পড়তে না দেওয়া, ভয়ের ছবি না দেখতে দেওয়া উচিত। মেয়ের বেলায়, তাকে আদর করে সুন্দর নেইল পলিশ ইত্যাদির সেট্ উপহার দিলে উপকার হতে পারে। পলিশ দিলে তার হাত সুন্দর দেখায়, মানুষে প্রশংসা করে, এ দেখলে আর সে নখ কামড়ে হাতের চেহারা কুশ্রী করবে না।১২

শয্যামূত্র (Enuress or bedwetting)—একেবারে বাচ্চারা দু তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিছানায় মোতেই। প্রস্রাবটা ধরে রাখাটাও শিক্ষা সাপেক্ষ। ছোট শিশু সেটা আয়ত্ত করতে পারে না। তবে বিছানা ভিজে গেলে ঠাণ্ডা লাগে, শোবার আরাম নষ্ট হয়, মা বিরক্ত হন এ কথা অস্পষ্টভাবে শিশু বোঝে। আর অনেক মাই ছোট বয়স থেকেই বিছানার বাইরে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে শিশুকে প্রস্রাব করান। এ সব থেকে অভ্যাসটা অধিকাংশ শিশুই আয়ত্ত

10 Psychology—Skinner & Harriman P. 193:

11 Bowley The Natural Development of the Child—P. 64-65

12 Dr. B. Spock—Baby and Child care P. 295.

করে ফেলে আর একটু বড় হলে বিছানায় মুতলে সবাই ঠাট্টা করে, বাবা মা হয়তো শাস্তি দেন, মানুষের কাছে লজ্জা পেতে হয় কাজেই অধিকাংশ শিশুই সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত বিছানায় মোতার দৃষ্টান্ত কম নয়। কথনো কথনো দশ বারো বৎসর পর্য্যন্তও এ বদভ্যাস দেখা যায়। এমন কি পরিণত বয়সেও বিছানা নষ্ট করে এমন মানুষ আছে।১৩

কোন দৈহিক কারণ যথা মূত্রাশয়ের পেশীর দৌর্বল্য এর মূলে থাকতে পারে। শিশুকালে বিছানার বাইরে নিয়মিত সময়ে প্রস্রাব করবার অভ্যাসটির অভাবও এর কারণ হ'তে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পশ্চাতে মানসিক অশান্তি থাকে। ভীতু, অভিমানী ছেলেদের মধ্যে এ বদভ্যাস বেশী দেখা যায়।১৪

নূতন একটি ভাই বা বোন জন্মালে অনেক শিশু বিছানায় মুততে সুরু করে। তার মায়ের স্নেহের অংশীদারকে শিশু খুসীর চোখে দেখে না। মার স্নেহ সে আর পাবে না এমন ভয় শিশুর মনে জাগে।১৫ মার উপর তার রাগ ও অভিমান হয়। সে তার নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় আর বাবা মার উপর রাগ (aggressive feeling) প্রকাশ করে। শয্যামূত্রের এও একটা প্রধান কারণ।১৬ মা অল্পবয়সে মারা গেলে শিশুদের অনুভূতির জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে শয্যামূত্র দেখা যায়। মা-মরা অথবা পরিত্যক্ত শিশু, যারা নার্সারীতে মানুষ হচ্ছে তাদের মধ্যে এ অভ্যাস বেশী দেখা যায়। মায়ের স্নেহের অভাবে শিশুর কতরকমের যে বৈকল্য দেখা দেয়, তা বর্তমানের শিশুমনোবিজ্ঞানীরা বহু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানতে পেরেছেন।

এ রোগ সারাবার উপায়—শিশুর দৈহিক ত্রুটি আছে কিনা এটা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসা করানো উচিত। নিয়মিত সময় বিছানার বাইরে প্রস্রাব করানো অভ্যাসটির দিকে মার দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তবে এ বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করে শিশুকে উত্যক্ত ও উদ্বিগ্ন করে তুললে ফল অনেক সময় উল্টো হয়। রাত্রে শোবার আগে প্রস্রাব করানো উচিত। রাত্রে জল কম খেতে দিলে অথবা গ্লুকোজ খেতে দিলে উপকার হতে পারে। কিন্তু সকলের

---

13. Bowley The Natural development of the Child. P 140
14. Dr. Benjamin spock, Baby & Child care P. 406
15. Bowley The Natural development of the child P. 49 & 130
16. F. M. Tengaden Child Phychology for Professional workers P. 117

থেকে বিছিন্ন হচ্ছে, স্নেহবঞ্চিত পারিবারিক পরিবেশ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। সেখানে সমস্যা তাই, শিশুর জীবনে ও শিক্ষায় মাতৃস্নেহের জীবন্ত স্পর্শের অভাব থেকে উদ্ভূত।

সেখানে ছোট শিশুদের শিক্ষার ভার, নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন্ স্কুলগুলির উপর রয়েছে। ইংল্যাণ্ডে এই নার্সারী স্কুল সুরু হয়, যখন থেকে সেদেশে শিল্পোন্নতির গোড়াপত্তন হয়। তখন যে সব দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ শ্রমিকরা, ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে যেতো, তাদের ছেলেমেয়েদের দেখে শুনে রাখাও কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করা ক্রমেই বেশী প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। একশত বৎসরেরও কিছু আগে দরিদ্র শ্রমিকদের নোংরাপল্লীতে রবার্ট ওয়েন্ নার্সারী স্কুল প্রথম স্থাপন করেন। সেখানে মায়েরা কাজে বেরিয়ে যাবার পথে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রেখে যেতেন। সন্ধ্যাবেলা আবার বাড়ী ফেরার পথে তাদের নিয়ে যেতেন বাড়ীতে। সারাদিন ওয়েন্ ও তাঁর স্ত্রী এ ছোটদের আগলাতেন, ঘুম পাড়াতেন, খেতে দিতেন আর খোলা আলো বাতাসের মধ্যে, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে, তাদের নানা বিষয় শেখাতেন। প্রথম প্রথম জনসাধারণ কিন্তু তাঁর এই পরীক্ষাকে সুদৃষ্টিতে দেখে নি। লোকে ভাবতো, ছেলেমেয়েগুলোর মাথা খাওয়া হচ্ছে, ওরা "জংলী" হচ্ছে। বেত না মারলে বুঝি পড়াশোনা হয়? - বড়লোক আর মধ্যবিত্তদের ছেলেমেয়েরা তো, ওয়েন এর স্কুলে যেতোই না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, এই নার্সারি স্কুল জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো। ছেলেমেয়েদের মায়েদের যেখানে ঘরের বাইরে খাটতে যেতেই হয়, তাদের জন্যে, নার্সারী স্কুল তো খুব বেশী দরকারী ছিল। ইংল্যাণ্ডের নার্সারী স্কুলের আধুনিক রূপ দিয়েছেন, দু'বোন—মার্গারেট ও র‍্যাসেল্ ম্যাক্‌মিলান্। নার্সারী স্কুলগুলি এখন সুশিক্ষিতা শিক্ষিকারা চালান এবং সেখানে শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষা, ব্যায়াম-চর্চ্চা এবং প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। এখন শুধু দরিদ্র শ্রমিকদের সন্তানেরা নয়, মধ্যবিত্ত ও ধনীদের দুলালেরাও নার্সারী স্কুলে সুশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। গত মহাযুদ্ধের সময় বিমান-আক্রমণ থেকে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষা করবার জন্যে নগর অঞ্চলের অধিকাংশ শিশুকে পিতা-মাতা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষিকা এবং নার্সদের পরিচালনায় রাখবার ব্যবস্থা হয়। এর ফলে নার্সারী স্কুলের সংখ্যা স্বভাবতঃ খুব বৃদ্ধি প্রায়। দেশে নার্সারী চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং বহুক্ষেত্রে সরকার এ স্কুলের

পরিচালনার ব্যয়ভার বহন কচ্ছেন। এতে যে জনসাধারণের অনেকখানি সুবিধে হয়েছে, শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে সঙ্গেই দেশের শিশুদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির ফলে, শিশুদের চিকিৎসার জন্যেও তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পিতামাতাকে উপদেশ ও সাহায্য দেবার জন্যে, অনেক হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি খোলা হয়েছে। স্কুল গুলিতেও খেলাধূলা, ব্যায়াম ও নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে' শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। এ সবই হচ্ছে নার্সারী স্কুলের ভালর দিক। আমাদের দেশেও এ রকম নার্সারী স্কুল অনেক খোলা দরকার। আমাদের দেশে, অধিকাংশ পিতামাতার আর্থিক সাধ্যও নেই, মানসিক যোগ্যতাও নেই বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার। দেশের জনমত সচেতন হ'লে এ বিষয়ে অর্থাভাব সত্ত্বেও, দৃষ্টি দিতে সরকার বাধ্য হবেন।

কিন্তু এর মন্দের দিক আছে। এবং সেটাই বিশেষ করে, এই সম্মেলনে আলোচিত হয়েছিল। এই নার্সারী জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ফলে দেখা যাচ্ছে—বাপমায়েরা ক্রমশঃই তাঁদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে দায়িত্বটা ঝেড়ে ফেলে, সরকারের কাঁধেই সবটা বোঝা চাপাতে চাচ্ছেন। যাঁদের সঙ্গতি আছে, যথেষ্ট শিক্ষাও আছে, তাঁরাও তাদের ছোট বাচ্চাদের নার্সারী স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাচ্ছেন। ডে-নার্সারীতে ছেলেমেয়েদের দিনের বেলায় রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। বিকেলে ছেলেমেয়েরা বাপমায়ের কাছে ফিরে যায়। কিন্তু রেসিডেন্সিয়াল্ বা বোর্ডিং হাউস নার্সারীও আছে—যেখানে শিশুরা সম্পূর্ণভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, শিক্ষিকা ও পরিচারিকাদের তত্ত্বাবধানেই থাকে-ছুটি-ছাটায় অভিভাবকদের কাছে ফিরে যায়। যারা পিতৃমাতৃহীন, যারা নাম গোত্রহীন, যাদের হয়তো বা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া গেছে, অথবা যেখানে পিতা, মাতা বা উভয়ের কুৎসিৎ রোগ বা অপরাধের জন্য আদালতের হুকুমে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসা হয়েছে—তাদের জন্যে এ জাতীয় বোর্ডিং স্কুলের খুবই দরকার আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যেখানে সঙ্গত কারণ নেই, সেখানেও ছোট শিশুদের বোর্ডিং স্কুল বা নার্সারীতে পাঠাবার ঝোঁক বেড়ে গেছে। তেমনি শিশুরা রুগ্ন হলে, হাসপাতালে বা ক্লিনিকে পাঠাবার উৎসাহও আগের তুলনায় বেড়েছে। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে যাঁদের আগ্রহ আছে, এমন সমস্ত বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন বাপ মায়ের কাছ থেকে ছোট শিশুদের এ বিচ্ছেদ তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান ডাঃ জি, আর, হারগ্রীভস্

বলেছেন, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে ছ-মাস থেকে সাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া শিশুর পক্ষে হানিকর। এতে সমস্ত শিশুরই মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়; শৈশবের এই আকস্মিক মানসিক আঘাত পরবর্তী জীবনে নানা ব্যবহারের বিকারের কারণ হয়। অথচ বর্তমানে মায়ের থেকে শিশুদের যখম বোর্ডিং হাউসে বা ক্লিনিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে—তা হচ্ছে নিতান্ত স্বেচ্ছায় এবং অনিবার্য্য কারণে। তিনি আরও বলেছেন, অসুস্থ হলে ছোট শিশুদের হাসপাতালে পাঠানো হয়, এ যুক্তিতে যে সেখানে সুচিকিৎসা হবে। কিন্তু এতে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের অপুরণীয় ক্ষতি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা নিষ্প্রয়োজন এবং অমার্জ্জনীয় নিষ্ঠুরতা।

ডেরোথী বার্লিংহাম্‌ ও আন্না ফ্রএড্‌ (বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড্‌ ফ্রএডের ভগ্নী) বিগত যুদ্ধকালে যে সব শিশু পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন নার্সারীতে প্রেরিত ও লালিত পালিত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে বহু পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সুযোগ পেযেছেন। তাঁরা প্রসিদ্ধ হ্যাম্পষ্টেড্‌ নার্সারীর অধীনে কাজ করেছেন এবং এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের প্রচুর সুযোগ লাভ করেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার ফলাফল এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত তাঁরা "ইনফ্যাণ্টস্‌ উইদাউট্‌ ফ্যামিলিজ্‌" এবং "ইয়ং চিল্‌ড্রেন্‌ ইন্‌ ওয়ার টাইম্‌" এ দুটি বইয়ে বিবৃত করেছেন। তাদের মূল সিদ্ধংন্ত হচ্ছে এসব নার্সারীতে শিশুদের দৈহিক যত্ন বাড়ীর চেয়ে অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয় কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। কিন্তু মানসিক ও অনুভূতির সুস্থ বিকাশ অনেকে ক্ষেত্রেই ব্যহত হয় এবং এ শিশুরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনোবৃত্তি নিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। পিতামাতার স্নেহের অভাব এরা নানা কাল্পনিক বিকল্পের মধ্য দিয়ে পূরণ করতে চেষ্টা করে। তাঁদের মতে শিশুরা দিনের অনেকটা অংশ এবং রাত্রিতে বাড়ীর পিতামাতার পরিবাবের স্বাভাবিক পরিবেশে থাকবে এবং দিনের কিছু অংশ অন্যান্য ছেলেমেযের সঙ্গে একত্র হযে নার্সারী বিদ্যালয়ে কাটাবে এ ব্যবস্থা সব দিক থেকে বাঞ্চনীয়।

মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছ এমন কোন প্রমাণ দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, সে প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যাচ্ছে। শিশুদের মধ্যে মানসিক রোগ বা অসুস্থতার সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। যে সব শিশু পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না তাদের সংখ্যা বাড়ছে, শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেড়েছে। এ নিয়ে সে দেশের

চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ্‌রা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এ সম্মেলনেই আর একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ ক্রীক বলেছেন, যদিও শিশুপালন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেবার উপযুক্ত ক্লিনিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে কিন্তু গত কয় বৎসর ধরে শিশুদের মানসিক বিকার যার চিকিৎসা প্রয়োজন এর সংখ্যা ক্রমে ধীরে ধীরেই বেড়েই যাচ্ছে এবং এটা একটা আতঙ্ককর এবং অত্যন্ত জরুরী সমস্যায় দাঁড়িয়েছে।

এই সম্মেলন যখন বসেছিল, তখন অন্যত্র অনুরূপ আর একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটা হচ্ছে ন্যাশন্যাল বেবী ওয়েলফেয়ার কাউন্‌সিল এর বার্ষিক অধিবেশন। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল, অপরাধের জন্য অভিযুক্ত :শিশু (Children in trouble)। সে সম্মেলনেও মিসেস্ ডব্লিউ, ই, ক্যাভানা (ইনি বার্মিহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সোস্যাল ষ্টাডিজ-এর অধ্যাপক, এবং বার্মিংহাম শিশু-বিচারালয় ও জুভেনাইল কোর্টের একজন সদস্য শিশুদের অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তিনিও এ অবস্থার কারণ নির্দে´শ করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া অত্যন্ত কঠিন হলেও আধুনিক অধিকাংশ পরীক্ষার ফল এই যে এর সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে, অসন্তোষজনক পারিবারিক পরিচয়। সিরিল বার্ট তাঁর 'দি ইয়ং ডিলিকোয়েণ্ট' নামক প্রামানিক গ্রন্থে বহু গবেষণার পর শিশুর অপরাধপ্রবণতার পনেরোটি প্রধান কারণ নির্দে´শ করেছেন ; তাতে গৃহে পিতামাতার স্নেহ এ সুশাসনের অভাবকে প্রথম স্থান দিয়েছেন, এবং আশ্চর্য মনে হলেও, দারিদ্র্যের স্থান নির্দে´শ করেছেন, প্রায় সর্ব্বশেষ। শিশুদের অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে সন্তানদের প্রতি অমনোযোগ বা নিষ্ঠুরতার অপরাধে দণ্ডিত, পিতা বা মাতার সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়েছে। ১৯৩৯ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৫৩, ১৯৪৬ সালে ৬২৭, ১৯৪৯এ ৪৮৮, ১৯৫০ সালে ৫১০, আর ১৯৫১ সালে সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬১০। সমাজ-বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা এ দু'টি ঘটনাকে কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে করেন। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে দেখা যাচ্ছে পারিবারিক জীবন শিথিল হচ্ছে, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটছে। তাই ডাঃ মিলড্রেড ক্রীক স্বাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে বর্ত্তমান সমাজে এমন সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যাতে হয়তো সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবন পূর্বাপেক্ষা কঠিন হয়েছে। শিশু যেখানে মায়ের স্নেহের নিশ্চিন্ত নির্ভর থেকে বঞ্চিত, সেখানে সে মানসিক স্থৈর্য হারায় এবং সেখানে সে সবল ও নিঃশঙ্ক